অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী

প্রথম খণ্ড

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ ॥ কলকাতা-১২

Achintya Kumar Rachanavali (Vol. 1)
Achintya Kumar Sengupta
(Chronological Collected Writings)

প্রথম প্রকাশ : ১৩৫৯

উপদেষ্টামণ্ডলী :
ডঃ সরোজমোহন মিত্র
শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
নিরঞ্জন চক্রবর্তী

প্রকাশক :
যোগজীবন চক্রবর্তী,
গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড,
১১এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-১২

মুদ্রক :
শুকদেবচন্দ্র চন্দ
বিবেকানন্দ প্রেস,
১।১এ, গোয়াবাগান স্ট্রীট, কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ-শিল্পী :
রূপায়ণ, কলকাতা-৬

আলোকচিত্র :
অজিত দত্ত

সূচীপত্র

পূর্ববর্তী কবিতা। (১—৩৮ পৃষ্ঠা)॥

অমাবস্যা। (কবিতা)। (৩৯—৬৬ পৃষ্ঠা)॥

সমসাময়িক কবিতা। (৬৭—৮০ পৃষ্ঠা)॥

পূর্ববর্তী কবিতা

অনাগত কবি

কোথা তুমি আছ কবি
কল্পনা-গরবী,
অনাগত যুগের সম্রাট
হে বিরাট,
নিস্তব্ধ নিষ্কম্প মৃত অন্ধকার-তলে
নয়তো বা গতি-দ্যুতি সৃষ্টির তরঙ্গ-কলরোলে
কোথা তুমি লুক্কায়িত অমর সন্ন্যাসী
আনন্দ-বিলাসী !
নতচক্ষু নিবিড় ব্যথায় নম্র সন্ধ্যা-ম্লানিমায়
কিম্বা কোন যৌবন-স্পর্ধিত তনু নগ্ন পূর্ণিমায়
ধূসর দিগন্ত-প্রান্তে, নয়তো বা কুহেলি-বিলীন ক্লান্ত নভে
কিম্বা কোন স্বপ্নাতুর অর্ধস্ফুট পুষ্পের সৌরভে
বন্ধহীন নিরুদ্দেশ মেঘের যাত্রায়
দুর্মদ দুরন্ত ঝটিকায়
কিম্বা কোন কলস্বনা তটিনীর পুলকিত উপল-ব্যথায়
শীত রিক্ততায়
কোথা তুমি সর্বকাল দৃশ্যের পশ্চাতে
মৌনতাতে
এক মনে করিছ ধেয়ান
সাধিতেছ বীণা,
তিমিরান্ধ কোন রাত্রি পথচিহ্নহীনা,
উন্মোচিছে শুনে তব জ্যোতি-অভিনন্দনের গান !
আমাদের অশ্রুস্নাত ধরণীর ধূলির প্রাঙ্গণে
কখন গোপনে
নিঃশব্দ নিশার মত একান্ত নিভৃতে
হেথায় আসিবে তুমি কী গান গাহিতে
কত দিনে ?

নীলাভ্র নিবিড় সে কি শেফালিকা-সুরভি আশ্বিনে
না কি শ্যামল-অঞ্জন-স্নিগ্ধ নিঃসঙ্গ বর্ষায়
না কি কোনো উদ্বেলিত বসন্ত-বিহ্বল ফুল্লতায় ?
ক্লান্ত বেদনায়
ধরিত্রীর দুই চোখে ব্যথা উথলায়।
যুগে যুগে একস্পৃহা চেয়ে আছে তব প্রতীক্ষায়।
কখন বাজিবে তব চরণের ধ্বনি,
আনিবে অমৃত-সঞ্জীবনী।

হে কবি, হেথায় আসি
কোন সুরে বাজাইবে বাঁশি
কোন নব ছন্দের আঘাতে
কী ভৈরব সুরের আহ্লাদে
খুলি দেবে ধরিত্রীর বন্ধ দ্বার বিমুখ অর্গল
কী অ-পূর্ব মমতায় মুছাইবে তপ্ত আঁখিজল।
অতৃপ্তি-পীড়িত ক্ষত-কণ্টকিত ধরিত্রীর বুকে
আবার জাগিবে সুখে
অনাবৃত অপরূপ পবিত্র যৌবন,
তার দুই রিক্ত করে পরাইবে কল্যাণ কঙ্কণ,
উজ্জ্বল সিন্দুর-বিন্দু আঁকি দিবে সীমন্তসীমায়
ওষ্ঠাধর উলসিবে রাগ-রক্তিমায়,
চুম্বনে মুছিয়া দিবে দুঃখদগ্ধ ললাটের রেখা
হাসিতে উদ্ভাসি তুলি আনন্দ-চপল শশী-লেখা,
নীলাম্বুধি ঊর্মিজালে গড়িবে মেখলা
নবস্ফুটশস্পশ্যামাঞ্চলা
পরিবে মহিমালক্ষ্মী শিরে দীপ্ত সূর্যের মুকুট
পূর্ণ করি নক্ষত্রকুসুমে যুগ্ম করপুট
কোন শুচি বরমাল্যখানি
উপহার দিবে তার কণ্ঠতটতলে,

সাজাইয়া কোন শতদলে
তাহা নাহি জানি।
এই ম্লান দুঃখী ধরিত্রীরে
হৃতভাগিনীরে
মুঞ্জরিবে কোন গানে কী আশ্বাসে দেবে সরসিয়া
কী বিশ্বাসে ক্লান্ত ক্লিন্ন ধরিত্রীর হিয়া
বিগততিমিরঝঞ্ঝা প্রভাতের মত
হবে প্রস্ফুটিত ?

ছিন্নবাসা এ দীনারে
কোন আঢ্য সজ্জা-উপহারে
সম্রাজ্ঞী করিবে তুমি কোন প্রেম-মন্ত্র-উচ্চারণে ?
তব শুভ শঙ্খের স্বননে
পৃথিবীর যত দুঃখ যত দৈন্য গ্লানি
যত মৃত্যু ম্লানি
লোলবৃন্ত জীর্ণ পত্রসম যাবে উড়ে,
দিবে দেখা মহা-মাটি আদ্যোপান্ত প্রগাঢ়ে-প্রচুরে।
মুছে ফেলে সর্ব ক্ষত-ক্ষতি
এ পৃথিবী হবে হৈমবতী।

হে কবি, আসিবে ব'লে
মোরা এই তপ্ত ধূলি সিক্ত করি আর্দ্র আঁখিজলে
নিরালায়,
পাছে এ ধূলার কাঁটায়
তোমার চরণপ্রান্তে ব্যথা বিঁধে যায়।
কণ্টকিত পথের উপরে
সাজায়ে রেখেছি স্তরে-স্তরে
আমাদের ব্যর্থ চিত্তগুলি,
তুমি যবে আসিবে হেথায়
মিলন-মেলায়

তোমার পথের কাছে যেটুকু রয়েছে ধূলি
হাতে নিয়ো তুলি,
মোদেরে কি পারিবে চিনিতে তার মাঝে ?
যে অশ্রুত হাহাকার বাজে
পঞ্জরের ঝঞ্ঝা-রাগিণীতে
তাহারে কি পাইবে শুনিতে ?
বুঝিবে কি আমাদের নিষ্ফলের অশ্রুজল
পাষাণ হইয়া আছে সুকঠিন,
যত শত আয়োজন নিরর্থক ফুৎকার-সম্বল
বাতাসে বিলীন।
বুঝিবে কি মোদের বেদনা
অপুষ্প অফল প্রাণে জীবনের বল্কল-সাধনা ?
শুনিবে দমিত দীর্ঘশ্বাস,
পিপাসাপঙ্কিল যত আশ ?

তবু একবার দুটি ফোঁটা আঁখিনীরে
ধন্য কোরো কলঙ্কী ধূলিরে,
তারপরে ফেলে দিও
বাজাইও
নববীণাতন্ত্রীলীন নব সামগান,
হে কবি, হে মহীয়ান!
আমাদের যদি কভু পড়ে মনে
উদাসী একাকী,
এক বিন্দু অশ্রু শুধু এনো ডাকি
নয়নের কোণে,
ক্ষণমাত্র এই শুধু সাধ
হে সন্তান, তব তরে এই আশীর্বাদ॥

১৩৩১

স্রষ্টা

আমিও তোমারই মত স্বজিয়াছি একখানি অপূর্ব ভুবন
সেথা রাত্রি নেমে আসে বক্ষে নিয়ে অন্ধকারে রৌদ্রের রোদন
রিক্তা নিরাভরণার মত
অঙ্গে ধরি প্রতীক্ষার ব্রত।
প্রেমের প্রাচুর্য দিয়া রচিয়াছি আকাশের মঙ্গল মহিমা
ব্যথার লাবণ্য ঢালি লেপিয়াছি শরতের প্রশান্ত নীলিমা
রামধনু আঁকিয়াছি রক্তিম চুম্বনে,
গগন কম্পন-ব্যথা মুগ্ধ আলিঙ্গনে।
অসংখ্য আশার আলো জ্বালিয়াছি নয়নে তারার
অশ্রু দিয়া গড়িয়াছি মৌনঘন পুঞ্জিত আষাঢ়।
যৌবনের ইচ্ছাখানি ছন্দি তুলি জলদের অবাধ আনন্দে
মনের নিকুঞ্জতল পুঞ্জ-পুঞ্জ বেদনার কেতকী-সুগন্ধে
আন্দোলিয়া উঠিছে উতলি
আকাঙ্ক্ষার বিহঙ্গ-কাকলী।
যেমন তুমি হে কবি, রচিয়াছ এ সুন্দর স্বষ্টির কবিতা
আপনার লীলারসে মেলিয়াছ নব-নব বর্ণ-বিলাসিতা—
তেমনি আমিও কবি, আমার কল্পনা
করে নিত্য বিচিত্রের বন্দনা-বর্ধনা।

মহারাস মহোৎসব আমার সে মর্মরিত মর্মের জগতে
বিলাস-বান্ধবী প্রিয়া চিরযাত্রী বসন্তের রথে
স্তবের কুসুম গাঁথি সেথা করি মাল্য বিরচন
নিস্তব্ধ ধ্যানের গৃহে সেথা মোর বাসক-শয়ন,
ক্ষণে-ক্ষণে আশা যায় বুনি
আকাশের ফুলের ফাল্গুনী!
আমিও তোমার মত হে মায়াবী শিল্পকার, হে ক্ষ্যাপা খেয়ালী,
বেদনার রসায়নে রচি নিত্য মধুরের দীপের দেয়ালি,

অন্তর-ব্যঞ্জনা দিয়া মঞ্জুল করেছি মোর মনের মঞ্জুষা
সেথা রাত্রি-উদ্‌যাপনে দেখা দেয় স্বর্ণগাত্রী জ্যোতির্ময়ী উষা,
সেথা সূর্য-সন্তানের নব-নব জন্মের উৎসব
আলোকের স্তোত্রে-স্তোত্রে আনন্দের মন্ত্র-কলরব—
সেথা ফোটে পরিপূর্ণ প্রেমের মালতী
তাই সেথা অরতি-আরতি।

যেমন তুমি হে তারপর
ভেঙে ফেল স্বপ্ন-খেলাঘর
ধূলির সঞ্চয় কাড়ি নিঃসম্বল কর ধরণীরে
সৃষ্টির কবিতাখানি অবহেলে ফেলে দাও ছিঁড়ে,
তেমনি আমিও একদিন
অশান্ত, বিরক্ত, তৃপ্তিহীন
দারুণ হেলার ভরে চূর্ণ করি হাতের লেখনী
দীর্ঘশ্বাসে ভস্ম করে দিয়ে যাই স্বপ্নের বিপণি।
দুই জনে ভয়ঙ্কর বীভৎস নিষ্ঠুর
শুধু ছবি আঁকি বসে জীবন-মৃত্যুর
দুই ক্ষুধাতুর।

আমার ভুবনে আমি তোমা-সম খুশি-ক্ষ্যাপা স্রষ্টা ভগবান
কাহারে বঞ্চিত করি, বক্ষ ভরি কাহারে সর্বস্ব করি দান।
মিলন-আশ্লেষ কারে, কাহারে বা আতপ্ত বিরহ
কারে দগ্ধ মরুভূমি, কারে বর্ষা-স্নিগ্ধ অনুগ্রহ।
আমার খেয়ালমত গান গাহি ভৈরবী বিভাসে
ধন্য করি কারে প্রেমে খিন্ন করি কারে দীর্ঘশ্বাসে;
কারে কণ্টকের মালা কারে বা মাধবী
কারে করি ভিখারিনী কারে বা বাসবী।
আমিও তোমার মত পাইয়াছি উচ্ছৃঙ্খল স্বৈর-সিংহাসন
রাত্রি-দিন একচ্ছত্র, মূল্যহীন রাজত্বের করি আয়োজন;

অকারণে বসে বসে ক্ষণিকের ক্ষণপ্রভা হানি,
তারপরে ইচ্ছা হলে মৃত্যুর গুণ্ঠন দিই টানি।
একে একে মিশে যায় রঙ-রস-স্বপ্নের বুদ্‌বুদ্
আতঙ্কে নিবিয়া যায় সৃষ্টির সে রহস্য-বিদ্যুৎ,
পড়ে থাকে বিদীর্ণ বাঁশরী
ভগ্ন যত ভাবের গাগরী॥

১৩৩২

সূর্য

হে মার্তণ্ড
প্রদীপ্ত প্রচণ্ড
জগন্নেতা, আজি বারম্বার
তোমারে করিব নমস্কার।

হানো হানো রুদ্র অগ্নিবীণা
আকাশে আবর্তি তোলো জ্যোতির ঝঞ্ঝনা
রৌদ্রের প্রলয়
হে দুর্জয়
হে প্রকাশময়!
দীপকে আন্দোলি
খেল আজ আগুনের হোলি
বিদ্ধ করো হে নির্মম, আকাশের বুক
হে সূর্য, হে সর্বভুক,
বিদ্ধ করো তিমিরেরে তীব্র যন্ত্রণায়
হে জলন্ত, দুরন্ত জ্বালায়
উড়াইয়া দাও উচ্চে অগ্নির পতাকা
স্ফুলিঙ্গ-বলাকা!

হে প্রখর, জ্যোতির শাণিত অস্ত্রে করো হে জর্জর
যাহা জড়
স্থবির অনড়
নিশ্চেতন,
তোমার প্রাণদ মন্ত্র করো উচ্চারণ
ভৈরব উল্লাসে,
ত্রাসে-ত্রাসে
প্রকম্পিয়া পঙ্গু হিম কুঞ্চিত জরারে
হানো মন্ত্র রুদ্র হাহাকারে
ধ্বংসের মদিরা করো পান
বিবস্বান।
আনো আনো অনল-প্লাবন
ছিঁড়ে ফেল তমিস্রার সহস্র বন্ধন
অশুচি জঞ্জাল
হানো করবাল।
প্লাবনে প্রক্ষালি দাও যত মর্ত শোক
পৃথিবীরে করে তোলো আলোক-দ্যুলোক!
হে উদ্‌গাতা! তোমার অনিদ্র নেত্র হতে
প্রস্রবন-স্রোতে
পাবক-পবিত্র উদ্বোধন
ঝরিয়া পড়ুক সারাক্ষণ
প্রচণ্ড ভাষায়
অনির্বাণ লেলিহ ক্ষুধায়
সমগ্র বিশ্বেরে করো তোমার অরণি
লুপ্ত করো দিকে-দেশে বন্ধনী-বেষ্টনী।

হে উত্তপ্ত ভয়ঙ্কর,
দিগম্বর,
আনো তব মুক্ত তরবারি
আকাশের বস্ত্র নাও কাড়ি,

সূর্য

ধরিত্রীরে নগ্ন করি দাও
হে নির্লজ্জ দুঃশাসন,
ছিঁড়ে ফেল কুহেলি-গুণ্ঠন
যাহা কিছু সঙ্গোপন
মুক্ত করি তাহারে দেখাও।
আবরণ ফেলে দাও ছিঁড়ে
আত্মা আছে সত্তার গভীরে
তাহারে উদঘাটি তোলো ভিতরে-বাহিরে
হিরণ্ময় মুক্তির মন্দিরে।
সঙ্কোচ-লজ্জিত ম্লান যত ব্যথা জমে ছিল শীতে
বাষ্প হয়ে যাক উড়ে তব সৌম্য নয়ন-ইঙ্গিতে।
ধূলিতে-মাটিতে
মর্তদেহ প্রস্ফুরন্ত সন্দীপ্ত অমৃতে।
আনো আনো অগ্নির ঝটিকা
মরণের যজ্ঞে জ্বালো যৌবনের দীপ্ত হোমশিখা
হে পবিত্র, সর্বপ্রকাশক,
আকাশ-বিকাশ তুমি নক্ষত্রনায়ক,
রহস্যের যবনিকা
ছিন্ন করো দীর্ণ করো যত কুজ্ঝটিকা,
প্রহেলিকা কোথা নেই, সব কুহেলিকা—
এক শ্বাসে অপস্থত তোমার শাসনে,
সুপ্তি থেকে উত্তোলিয়া নিয়ে চলো দীপ্ত উত্তরণে
হে নির্মল, হে নির্মম,
অমিতবিক্রম,
আচ্ছাদিত যাহা কিছু পাপে দৈন্যে ঘৃণায় নিন্দায়
মূঢ় মত্ততায়
তাহারে সুবর্ণ করো তোমার জ্যোতিতে,
বুকের শোণিতে
রঞ্জিত সুন্দর করো তাহার কলঙ্ক
সমস্ত সংস্কারমুক্ত সর্বাধীশ, হে উলঙ্গ,

পরম প্রকাশে,
সবারে সাহস দাও স্বরূপ-উদ্ভাসে,
দাও সেই বহ্নিদীক্ষা বহ্নি-অনাময়
নগ্নতায় হতে পারি যেন জ্যোতির্ময়
তোমার সংস্পর্শে, জ্যোতিষ্মান,
নমো নমো নমো হে কল্যাণ !

১৩৩২

বাসর-রাত্রি

আজি এ মাধবী রাত্রে যে প্রফুল্ল ফুলশয্যা করেছি রচনা
অন্তরালে সঞ্চিত রয়েছে কত ক্ষুধার্তের বঞ্চিত কামনা—
শীতার্ত বিবস্ত্র কত পীড়িতের করুণ তিয়াষ
মুমূর্ষু মূর্ছিত কত হতাশের শেষ অভিলাষ !
গৃহহীন পথিকের নিদ্রাহীন নিষ্ঠুর রোদন
সিক্ত করি' দেয় মোর ব্যাকুল-বকুল-গন্ধ বাসক-শয়ন ;
সদ্যোজাত যত শিশু মরেছিল নগ্ন মৃত্তিকায়
আমার গলার মালা জ্বলে গেল তাহাদের না-বলা জ্বালায়
পর্ণপুট-স্ফুটন-ব্যথায়।

যে মহার্ঘ বস্ত্রখানি করিয়াছি পরিধান আজ
তার মাঝে হেরি আমি বহু শত বিবসনা রমণীর লাজ
কুরূপ কঙ্কালসার পুরুষের ক্লান্ত কাতরতা
লালসা-লাঞ্ছিত কত বিধবার বিষণ্ণ ব্যর্থতা,
কত গর্ভধারিণীর বীভৎস কাকুতি
কুঙ্কুম-কুসুম-কম কুমারীর কদর্য বিচ্যুতি ;
কত শত সতীত্বের নির্মম নির্লজ্জ বলিদান
কত মা'র কান্নের নিশান।

কত দুঃখী ভিখারিনী চীর ফেলি সেজেছে পতিতা
সর্ব অঙ্গে জ্বালিয়াছে নব নব পিপাসুর চুম্বনের চিতা
নিজেরে উলঙ্গ করি কত নারী গ্রীবাতটে বেঁধেছিল ফাঁসি
তাহাদের প্রেত অট্টহাসি
এ বস্ত্রের প্রতি সূত্রে উঠিছে উচ্ছ্বাসি' !
বীভৎস পাপের আর পিপাসার গ্রন্থ এ বসন
প্রতি সূত্রে শোনা যায় কত দূর-দূরান্তের অশান্ত ক্রন্দন ।

আমার মুখের কাছে তুলিয়াছি পরিপূর্ণ যে অন্নের গ্রাস
তার মাঝে শুনি যেন কত শত ক্ষুধার্তের দীন দীর্ঘশ্বাস ।
শীর্ণ দুটি হাত মেলি তারা সবে উৎসুক উৎসাহে
মোর কাছে এক মুষ্টি ভাত ভিক্ষা চাহে ।
যত শিশু জননীর শুষ্ক জীর্ণ নিঃশেষিত স্তনে
বিন্দু দুগ্ধ পেল নাকো তৃষ্ণাতীক্ষ্ণ দংশনে দংশনে,
দুর্ভিক্ষে জননী যত পুত্রের মুখের গ্রাস নির্বিবাদে কাড়ি
তাতেও না পেয়ে তৃপ্তি নিজের গর্ভের পুত্রে স্বহস্তে বিদারি
ক্ষুন্নিবৃত্তি করে আপনার,
ভেসে আসে সেই সব শেফালি-শোভন শুভ্র শিশুর চীৎকার ।

জঠরজ্বালায় অন্ধ যত নারী করিয়াছে শরীর বিক্রয়
ক্ষুধার সামান্য মূল্যে করিয়াছে সতীত্বের সুধা-বিনিময়
বাধ্য হয়ে সাজিয়াছে পণ্য বারাঙ্গনা
বুকে জ্বালি সন্তানের সন্তপ্ত কামনা—
কিম্বা বন্ধ্যা মৃত্তিকায় আপনার স্বেদবিন্দু করিয়া সেচন
নির্ভীক কৃষাণ যত সুশ্যামল প্রাচুর্যেরে করি উদ্ঘাটন
উপবাসী রহে আপনারা
সবুজের চারিধারে প্রসারিয়া প্রজ্বলিত ক্ষুধার সাহারা,
তাহাদের অসহায় বিদীর্ণ বিলাপ
হানে অভিশাপ !

অন্ন আর রোচে নাকো পড়ে থাকে একান্ত বিস্বাদ
যেন শুধু মনে হয় করিয়াছি ঘোর অপরাধ।

আমার শকট চলে রাজপথে মহোল্লাসে মাতি
মনে হয় যেন কারা চক্রতলে বুক দেছে পাতি—
কোটি-কোটি পদাহত ধূলায় বিলীন
তাদের গলিত অশ্রু শুষ্ক স্তব্ধ উদাসীন প্রস্তর-কঠিন!
কলুষিত নগরীর ভূষা-কৃত্রিমতা
লুকাইয়া রাখিয়াছে অগণন জীবনের ভীষণ শূন্যতা।
এর যান, পথ, সেতু, অট্টালিকা, গঠন-খনন
লুকায়েছে সংখ্যাহীন মানবের প্রাণের হনন।
যত দেখি বিজ্ঞাপন লোচনলোভন
তার পিছে আছে ক্রূর বঞ্চন-শোষণ
প্রাচীরের প্রতিটি প্রস্তর
যেন কার ঘূণে-খাওয়া বুকের পঞ্জর।

ওগো প্রিয়া, উদাসিয়া, তোমারে যে করেছি চুম্বন
প্রচুর প্রবল সুখে সর্বাঙ্গীণ দেহলতাখানি
ক্ষুধাক্লিষ্ট তপ্ত বুকে টানি
করি যে নিবিড় নিপীড়ন
আনন্দের অম্বুধি-বর্ধন,
জানো তুমি কত মূল্য তার?
কোটি ব্যর্থ প্রেমিকের মূক হাহাকার।
যাহারা না পেয়ে প্রেম ব্যভিচারী সেজেছে পিশাচ
মণির বিহনে যারা কুড়াইল কামনার কাচ,
নিদ্রাহীন রাত্রি জাগি নেত্রে যারা নিরাশ্বাস ভরি'
স্তব্ধ এক জ্যোৎস্নারাতে চলে গেল আত্মহত্যা করি,
পঙ্কিল কদর্য রোগে পঙ্গু হল যারা
অপ্রচুর প্রাণ নিয়ে যারা তৃপ্তিহারা

তাদের বুকের রক্ত—যারা ব্যর্থকাম
মনোরথপ্রিয়তমা, আমাদের মিলনের দাম।

তাই শুধু মনে হয় সব মিথ্যা, যেন মোর কাছে নাই তুমি
আমি একা ব্যর্থ পঙ্গু সঙ্গীহীন হতাশ্বাস নিঃস্ব মরুভূমি,
শুধু খেদ, মর্মদাহ, তাপ, অশ্রুজল
মোদের বাসর-রাত্রি মলিন, বিফল॥

১৩৩২

ধরাতে চরণ রাখি' আকাশেরে লইব মাথায়

ধরাতে চরণ রাখি' আকাশেরে লইব মাথায়
মৃত্তিকার মলিন ধূলায়
আমার এ ছিন্ন জীর্ণ শয্যা বিরচিয়া
অন্তরঙ্গ মৃত্তিকার বক্ষ আঁকড়িয়া
র'ব শুয়ে মার স্নেহ-সুশীতল ম্লান অঙ্কটিতে
মা'র বুকে মরণের স্তন্য করি পান;
আর মোর প্রাণের প্রদীপখানি প্রেমে প্রজ্বালিয়া
দীপ্ত শিখা কল্পনা মহান
পাঠাইব ঊর্ধ্বে স্থির আকাশেরে পূর্ণ পরশিতে।

বসুধার ভাণ্ড ভরি পুঞ্জিত করিয়া রাখি মোর অশ্রু-গ্লানি
অবশেষ অনন্ত আনন্দখানি
পাঠাইব আকাশের নীলিমায়
জ্যোৎস্নায় বিছায়ে দিব তরঙ্গিত সুরভি-সুধায়
রৌদ্রে বা বিলায়ে দিব, মেঘে-মেঘে রাখিব ঝুলায়ে
অনিমিখ-আঁখি
আমি যেন নামহারা তৃষ্ণাতুর ক্ষণিকের পাখি
আকাশে মেলিয়া ডানা খুঁজিতেছি কোন অজানারে
আকাঙ্ক্ষার পরপারে চিরন্তন স্বপ্ন-পারাবারে।

তারপর ক্লান্তপক্ষে নেমে আসি ধরণীর ধূলির কুলায়ে
সুরু হয় পুনর্বার অভ্যাস-অধ্যায়
কণ্ঠে আর গান নাই হাহা বাজে মৃত্যুর আতঙ্কে
পঙ্কে পঙ্কে
জীবনের ভিক্ষাপাত্র পূর্ণ করি কলঙ্ক-কলুষ-কালিমায়।

মৃন্ময় কামনাখানি ধূলিতে ঢাকিয়া রাখি
প্রেমের কামনা মোর অন্তহীন আকাশের থালে
মেঘের বিচিত্র বর্ণে রাখি আঁকি
প্রাণের চন্দনে,
কামনা যে শতশিখা দীপখানি জ্বালে
নিজে তাতে দগ্ধ হয়ে দিব্য জ্যোতি করে বিতরণ
সে আলোকে মর্ত ইচ্ছা প্রেম হয়ে উর্ধ্ব হতে উর্ধ্বের গগনে
করে আরোহণ
প্রার্থনার মত।
এ ধরণী প্রসারিয়া ব্যগ্র বাহু-ফণা শত শত
আমার এ শরীরেরে রয়েছে আঁকড়ি,
কিন্তু ওই মহোজ্জ্বল আকাশ অবাক
আমার আত্মারে আজি দিয়েছে যে ডাক
পার করি লিপ্সার লহরী
জাগায়েছে নিষ্কলঙ্ক প্রেমেরে আমার।
এ দেহে পেয়েছে খুঁজে ধরা তার বাসের আগার
কামনার খনি,
আর ওই স্মিতজ্যোতি স্নিগ্ধচক্ষু আকাশ-সংসার
স্তরে স্তরে বিস্তারিছে প্রেমের বিপণি।
কামনা ও প্রেমেরে যে বাঁধিয়াছি এক বীণা-তারে
পারে ও অপারে
মিলায়েছি আমিই দুয়েরে, মোর বুকে, তৃপ্ত-তৃষ্ণাতুর
এ নিকট আর ও সুদূর।

একজন বিরহিণী নিদারুণ ভুখে
পিপাসায় দুরন্ত উৎসুকে
পঙ্কেরে করিছে পান,
আর জন ত্যাগের পতাকা নিয়ে গেরুয়া করিয়া পরিধান
উদাসী সন্ন্যাসী
তপস্যার অগ্নিকুণ্ডে দগ্ধ করে তমিস্রার রাশি
বিস্তারিয়া অধ্যাত্ম-প্রদাহ
মোর এই অঙ্গের অঙ্গনে,
ওদের বিবাহ
আনন্দে-ক্রন্দনে।
আমিই বাঁধিনু রাখী ধরণী ও আকাশের হাতে
অপসৃত-অন্ধকার পবিত্র প্রভাতে
মোর বক্ষমাঝে
সে মিলন-বাদ্য সদা বাজে
মোর রক্তে স্নায়ুতে শিরায়
অনির্বাচ্যতায়।
পিপাসাজর্জর মোর বুকের পঞ্জর
এক পার্শ্বে রাক্ষসের অন্য পার্শ্বে দেবতার ঘর।
মোর বুকে তারা আজ হ'ল প্রতিবেশী
যারা ছিল যাযাবর, দূরের বিদেশী
এক সাথে তারা আজ বাঁধিয়াছে বাসা মোর বুকে
একজন যাতনায় আর জন ক্লান্তিহীন সুখে'

একজন অগ্নি হ'ল আর জন ধূপ
আমি হ'নু ধূলার ধূপতি।
মন্দির-স্থপতি।
আমি যদি না থাকিতাম,
কোনোদিন ঘুচিত না আকাশ ও ধরণীর বিপুল বিরহ অবিরাম
ঘুচিত না এই ব্যবধান।

আমি আসি ভরে দিনু উহাদের শূন্যতার স্থান
মুছে দিনু দুরন্ত-ক্রন্দন।
তাই শুনি দিবারাতি
মোর বুকে বাসক-শয়ন পাতি
এই দুই বর-বধূ
করে নব প্রেম-বার্তা মৃদু গুঞ্জরন,
আকাশ মধুপ হয়,
আর ধরা বক্ষে ভরি বয়
পঙ্কের কলুষ-মধু মৃত্যুর সঙ্গীত,
উহাদের মিলনের যজ্ঞে অমি হ'নু পুরোহিত।
প্রসারিয়া প্রীতি
ডাকিয়াছি মোর ঘরে এই দুই ঘর-ছাড়া পথিক অতিথি।
দগ্ধ হয়ে এ মাটির ধূপ
ধরে দূর আকাশের রূপ।

১৩৩৩

গাব আজ আনন্দের গান

মৃন্ময় দেহের পাত্রে পান করি তপ্ত তিক্ত প্রাণ
গাব আজ আনন্দের গান।

বিশ্বের অমৃতরস যে আনন্দে করিয়া মন্থন
লভিয়াছে নারী তার সুখোদ্বেল তপ্ত পূর্ণ স্তন,
লাবণ্যললিত তনু যৌবনপুষ্পিত পূত অঙ্গের মন্দিরে
রচিয়াছে যে আনন্দ কামনার সমুদ্রের তীরে
সংসার শিয়রে,
যে আনন্দ আন্দোলিত সুগন্ধনন্দিত স্নিগ্ধ চুম্বন-তৃষ্ণায়
বঙ্কিম গ্রীবার ভঙ্গে, অপাঙ্গে, জঙ্ঘায়,

লীলায়িত কটিতটে ললাটে ও কটু ভ্রূকুটিতে,
চম্পা-অঙ্গুলিতে,
পুরুষ-পীড়নতলে যে আনন্দে কম্প্র মুহ্যমান
গাব সেই আনন্দের গান।
যে আনন্দে বুকে বাজে নব-নব দেবতার পদনৃত্যধ্বনি
যে আনন্দে হয় সে জননী।

যে আনন্দে সতেজ প্রফুল্ল নর দম্ভদৃপ্ত, নির্ভীক, বর্বর,
ব্যাকুল বাহুর বন্ধে কুন্দকান্তি সুন্দরীরে করিছে জর্জর,
শক্তির উৎসব নিত্য যে আনন্দে স্নায়ুতে শিরায়
যে আনন্দ সম্ভোগ-স্পৃহায়,
যে আনন্দে বিন্দু-বিন্দু রক্তপাতে গড়িছে সন্তান
গাব সেই আনন্দের গান।

যে আনন্দে ঝটিকার নগ্ন অভিসার
সমুদ্রের কল্লোল-উদ্গার,
যে আনন্দে আকাশের মাতৃদেহ জর্জরিয়া প্রসবব্যথায়
অন্ধকার-গর্ভ হতে তারা বাহিরায়,
যে আনন্দে জ্যোতির্মঞ্চে সূর্য-চন্দ্র-নীহারিকা নিত্য নৃত্যশীল
যে আনন্দে এ মত্ত নিখিল
ছুটে চলে খ্যাপা, দিশাহারা,
যে আনন্দে কদম্ব-জাগানো ঘন শ্রাবণের ধারা
আনে ডাকি কাজল মেঘের সনে সজল সলীল নীল
অনাবিল
নয়নের মোহ,
আনে তৃণ-মঞ্জরীর প্রাণ-সমারোহ,
যে আনন্দে ঋতুতে-ঋতুতে এত অজস্রের বর্ণ-বিলাসিতা
সে আনন্দে রচিব কবিতা।

যে আনন্দে পিঞ্জরের দ্বার টুটি মুক্তি পায় বন্দী বিহঙ্গম
শিবের তপস্যা ভাঙে যে আনন্দে মন্মথের মিলিলে সঙ্গম,
যে আনন্দে ভস্ম করে অগ্নি যত সম্ভারের স্তূপ
যে আনন্দে গন্ধ দেয় দগ্ধ ম্লান ধূপ,
নিরানন্দ বন্দরের অন্ধকার ছাড়ি
যে আনন্দে দেয় দীর্ঘ পাড়ি
ছিন্নপাল ভগ্নহাল জীর্ণ তরী কাণ্ডারীবিহীন
শুধু জানে মৃত্যু সম্মুখীন—
যে আনন্দে সৈন্যদল জিঘাংসু লোলুপ মাতে শত্রুর হত্যায়
শোণিতের প্রস্রবণ প্রবাহিত যে আনন্দে কৃপাণ-কৃপায়,
মদিরার পাত্র ভরি যে আনন্দ স্বচ্ছ টলমল
সৌরভবিহ্বল,
দ্রাক্ষা আর রমণীর বক্ষ হতে যে মদিরা হয় নিষ্কর্ষণ
যে আনন্দে বৃদ্ধ পিতা করেছিল ভিক্ষা তার
সন্তানের প্রফুল্ল যৌবন,
যে আনন্দে পূর্ণ হয়ে অশ্রুজলে আপনারে করি যায় দান
গাব সেই আনন্দের গান।

যে আনন্দে পতঙ্গেরা পাখা মেলি আগুনেরে করে আলিঙ্গন
যে আনন্দে চঞ্চরীরা গুঞ্জরিয়া করে পুষ্প-মঞ্জরীর
মদিরা-ভুঞ্জন,
যে আনন্দে উপবাসী পতিতার শুষ্ক ওষ্ঠে করে লুব্ধ
ক্ষুধার্ত চুম্বন,
যে আনন্দে প্রেয়সীর নব অবগুণ্ঠনের লজ্জা-উন্মোচন,
যে আনন্দে পত্রে-পত্রে বাতাসের দীপ্ত করতাল
সে আনন্দে হইব মাতাল।
যে আনন্দে সন্ন্যাসীরা দেহ হতে জীর্ণ বস্ত্র ফেলে দেয় টানি
স্কন্ধে বহে বৈরাগ্যের একতারাখানি,
যে আনন্দে ভিখারিনী আপনারে নগ্ন করি দিয়াছিল চীর
যে আনন্দে মৃত্তিকার গর্ভলীন তৃণদল প্রকাশ-অস্থির

যে আনন্দে মানুষেরা নিজ-নিজ ভাব দিয়া গড়ে ভগবান
গাব সেই আনন্দের গান ॥

১৩৩৩

ঝটিকা

মুক্ত করে দিনু মোর বন্ধ দ্বার, রুদ্ধ বাতায়ন,
এস দৃপ্ত প্রভঞ্জন
উচ্ছৃঙ্খল দুর্মদ বিদ্রোহী
দুরন্ত আনন্দখানি বহি
চূর্ণ আজি করো হে আমারে,
মৃত্যুর ফুৎকারে
নির্বাপিত করো দীপ, ভগ্ন করো ভাণ্ডের ভাণ্ডার।
হে ঝটিকা, নিমন্ত্রিত অতিথি আমার,
নটবর, হে ভোলা ভৈরব,
সুরু করো ধ্বংসের তাণ্ডব
মোর সুপ্ত জীর্ণ বক্ষতলে,
প্রাণনে স্পন্দনে তারে
আন্দোলিয়া তোলো তুমি ক্রন্দনের আনন্দ-কল্লোলে।
ক্রুদ্ধ অহঙ্কারে
বন্ধনেরে পদতলে করি নিষ্পেষণ
এস বাধা-ব্যাধি-বিনাশন,
দৃঢ়হস্তে কাড়ি লও সঞ্চয়-সম্ভার আড়ম্বর
এস সর্বহারা তুমি, এস সর্বেশ্বর,
চূর্ণ করি প্রাচীরের ক্ষুদ্র পরিসীমা
সুন্দর ভীষণ তব উলঙ্গ মহিমা
আমাকে দেখাও।

মোরে তুমি নিঃসম্বল নিঃস্ব করে দাও
বন্ধহীন বিরহী বৈরাগী
প্রলয়ের প্রেমে অনুরাগী,
এস হে অপরিমিত, অশান্ত, ব্যাকুল,
মোরে করে গৃহহীনা পথের বাউল
হে চির-পথিক সহচর।
হে মোর অশেষ
নিত্য অগ্রসর
অনির্ণীত, এস অনিমেষ,
নেত্র হতে মুছে নিয়ে নিদ্রার কুজ্ঝটি
এস হে ধূর্জটি।

ওই যেথা সুরু হল প্রলয়ের আনন্দ-উৎসব
তোমার তাথৈ-থৈ নৃত্যের তাণ্ডব
সেথা মোরে নিয়ে যাও নিরুদ্দেশ করি
হাত ধরি ধরি
নটরাজ, তব সাথে মোরে তুমি ভাঙিতে শেখাও,
মোরে তুমি নিয়ে যাও
হে উধাও,
যেথায় বজ্রের তীব্র বিজয়-উল্লাস
বিদ্যুতের তীক্ষ্ণ অট্টহাস
যেথা দৃপ্ত বিস্ফোরণে উচ্চনাদ শব্দসমারোহ,
মিশাইব সেথা মোর পুঞ্জীভূত প্রাণের বিদ্রোহ
প্রতপ্ত, প্রচুর।
এস দস্যু, দুর্দান্ত নিষ্ঠুর,
মোরে তুমি ছিন্ন করে নিয়ে যাও
তোমার কেতনতলে
সেথা নিত্য রুদ্র কোলাহলে
তব সাথে দিব করতালি,

এস কালবৈশাখী বৈকালী
শিষ্য করে নিয়ে যাও মোরে হে সন্ন্যাসী
সর্বনাশী,
নিষ্ঠুর আঘাত দাও, হেথা মোর নিদ্রা যে গভীর,
নিয়ে চলো যেথা আছে সমাহিত সর্বশান্ত স্থির
শাশ্বতের নীড়।
সমস্ত গতির লক্ষ্য চিরন্তন স্থিতি
পত্রের যে সম্বোধন, খুঁজে ফেরে কোথা তার ইতি
নিঃশব্দেই অর্থের নিশ্চিতি।
শব্দজাল মহারণ্য, সেথা হতে নিয়ে যাও মোরে
নীরবের ক্রোড়ে।
নিয়ে চলো চরিতার্থ অশেষের দেশ,
মুখরের শেষ আছে মৌনই অশেষ॥

১৩৩২

সুদূর

হে অবগুণ্ঠিত মৌনী, অনাদ্যন্ত, বিরহবিধুর,
অপরূপ সুন্দর সুদূর!
মোরে তুমি ডাক দিলে নিদ্রাহীন নক্ষত্রের নিঃশব্দ ভাষায়,
যেথা রাত্রি কলঙ্কিনী প্রেমোজ্জ্বল আদিত্যের দীপ্তির আশায়
চলে যায় দিগন্তের শেষে,
যেথা নবজীবনের বিদ্যুৎ খেলিছে নিত্য নৃত্যপরা মরণের কেশে
যেথা বাজে এক সঙ্গে নৃত্যচ্ছন্দ জীবন-মৃত্যুর
সেথা ডাক দিয়েছ, সুদূর।

অতৃপ্তির অগ্নিশিখা জ্বালাইলে মর্মের প্রদীপে
ক্ষুদ্র এ আয়ুর দুঃখ-দ্বীপে।

সীমায় সঙ্কীর্ণ যাহা, সরল সহজলভ্য, তাহে নাহি সুখ
তাই ক্ষুদ্র বাহু মেলি নিরন্তর আলিঙ্গিতে রয়েছি উৎসুক
হে আকাশ গহন মহান,
তাই শুধু সাধ যায় নীলিমার মহিমায় অনিরুদ্ধ করি দীর্ঘ স্নান,
তোমারে দেখাই এনে কী বিস্ময় করেছি সঞ্চয়
কিসে হয় মৃন্ময় চিন্ময়।

হে বৃহৎ প্রসন্নতা, তব ডাকে যাব বন্ধহীন
সুদূর হয়েও সম্মুখীন
হেরিব তোমার রূপ, হে অরূপ, মরণের খুলিয়া গুণ্ঠন
আমারি প্রার্থনা দিয়া তোমার রহস্য-দ্বার করি উন্মোচন,
সেথা দেখি বিপুল বেদনা
সেথা দেখি মোর তরে তব ঘরে নির্নিমেষ নিবিরাম একাগ্রভাবনা,
সেথা আমি তব কাছে অমূল্য ও দুষ্প্রাপ্য সুদূর
গোপনীয় লোভন মধুর।

দিকে দিকে লিখে রাখ তব গাঢ় বিরহ-লিপিকা
আমি যেন দূর মরীচিকা,
মোরে চাও এই আর্তি সর্বক্ষণ শুনি যেন নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে
প্রভাসে উত্তীর্ণ হব দুইজনে কেহ আর রব না আভাসে
সুদূরই প্রকট নিকটে।
যে আকাশ, অনির্ণেয় অপ্রমেয় তাই আজি ভরা মোর ঘটে,
তবু কেন, হে অদৃশ্য, দৃশ্যমান, নাহি পূর্ণ মিলনের সাড়া
শুধু করো চলার ইশারা।

তাই যাত্রা, যাত্রা তাই তরঙ্গিত জীবন-সিন্ধুতে
গান শুনি বিরহ-বেণুতে।
প্রাণের প্রাচুর্যে যেথা তৃণ যাত্রী তেমনি আমার উদ্দীপনা
জ্যোতিষ্কেরা যাত্রী যেথা নিয়ে নব প্রকাশের অসীম ব্যঞ্জনা
তেমনি মোদের অভিযান,

অনিশ্চিত চলিয়াছি নিরন্তর বক্ষে জ্বালি দুঃখের প্রদীপ অনির্বাণ,
রূপ হতে রূপান্তরে চলিয়াছে অনন্ত উৎসব
দুজনেই দুর্লভ বল্লভ ॥

১৩৩২

প্রেমপত্র

বিস্তীর্ণ বেদনা দিয়া আবরিয়া রাখিয়াছ দূর নীলাম্বরে
বিন্দু-বিন্দু অশ্রু সম পুঞ্জ-পুঞ্জ নক্ষত্রের অক্ষয় অক্ষরে
লিখিয়াছ অন্তরঙ্গ কী উদার বিরাট সুন্দর লিপিখানি
বহুশত বসন্তের বাণী !
যেন কত রাত্রি জাগি কী একাগ্র মৌন অনিদ্রায়
এ বৃহৎ শূন্যতারে ভরিয়াছ বিপুল ব্যথায়,
যেন তব কাছে চাও কারে
তাই দূরদেশিনী প্রিয়ারে
পত্র লেখ ধ্যানমগ্ন স্নেহাচ্ছন্ন আর্দ্র অন্ধকারে।
তাই বুঝি জলে-স্থলে প্রসারিয়া রাখিয়াছ অসীম আকুতি
একখানি দরিদ্র মিনতি।

রজনীগন্ধার গন্ধে পাঠাইলে অতৃপ্তির বিহ্বল কামনা
চাঁদের চোখের জলে চামেলীতে করিয়াছ স্বপনরচনা ;
আশীর্বাদ পাঠায়েছ সুনির্মল প্রসন্ন প্রভাতে
গন্ধহীন কিংশুকেরে সাজায়েছ রাঙা ব্যর্থতাতে
বিষণ্ণ সায়াহ্ন তলে সুকোমল ম্লান
আঁকিয়াছ সিক্ত নেত্রে স্তব্ধ অভিমান !
উগ্রগন্ধা গরবিনী করবীতে, প্রগলভা চম্পায়
জাগায়েছ যৌবনেরে সমর্পণ-তর্পণ-তৃষ্ণায়,

গোলাপে প্রলাপ তব, আকন্দে আবেশ
নিবিড় বর্ষার মেঘে পাঠালে আশ্লেষ,
উদাসীন চৈত্রের বাতাস
আনিল মর্মের দীর্ঘশ্বাস।
নিশীথে যে বিস্তারিত নিদ্রাহীন নিঃস্ব নীরবতা
ভরিয়া রেখেছ তাতে অনিমেষ নয়নের ভাব-আকুলতা,
দীপান্বিত বাসনার মন্ত্র-আঁকা তারকার চোখে
রিক্ততারে মূর্তি দিলে মাধ্যন্দিন মার্তণ্ড-আলোকে ;
কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন শীতে কঠোর বিরাগ
উদ্বেল ফাল্গুনে হেম-প্রেম-পদ্মরাগ
দখিনার স্পর্শে দিলে পুরি'
চিতচোর চুম্বন-চাতুরী।

রোমাঞ্চিত তৃণে-তৃণে বিছায়েছ শ্যামল পুলক
নিঃশব্দ শিশিরে তুমি ঢালিয়াছ নয়ন-উদক,
প্রত্যাশারে রাখিয়াছ গ্রীষ্ম-তপস্যায়
দেহের সুষমা তব উদ্ঘাটিলে আরণ্য শোভায়,
কেয়াফুলে পাঠালে যন্ত্রণা
যূথিকায় কুশল-প্রার্থনা।

যৌবন-গৌরব-গাঢ় দান-সুখ-ভারাক্রান্ত বৈশাখের মেঘ
নিয়ে এল, প্রিয়, তব প্রথম প্রলয়ঙ্কর উচ্ছ্বাস-উদ্বেগ,
দগ্ধ রৌদ্রে মরুভূতে পাঠালে আহ্লাদ
ব্যাকুলতা নিয়ে এল উদধি উন্মাদ,
রাত্রি জাগি চুপে-চুপে কানে-কানে কথা-কওয়াটিরে
জাগালে অস্ফুটধ্বনি বাদলিকা-ভিজানো তিমিরে।
মিলনের আনন্দেরে রাখিয়াছ তুলে
শুচিগাত্র চারুচক্ষু পবিত্র পারুলে।
লইয়াছে বুক পাতি মর্মরব্যাকুল মত্ত ঘন বনভূমি
আমাদের খুনসুড়ি চুমুখেলা হেলাফেলা সুমিষ্ট দুষ্টুমি,

বিহারিণী নির্ঝরিণী শিখিয়াছে আমাদের ভাষা
অতলের গভীরের গম্ভীরের দূর ভালোবাসা।

আমি যেন তব দূর-বিদেশিনী উদাসিনী বধূ
বাসনা-বিষণ্ণ চিত্তে ক্ষণে-ক্ষণে বিরহ-বেপথু
জাগে, জ্বলে অনির্বেয় দুঃখ-দীপশিখা
পড়িবারে তব প্রেম-প্রসাদ-লিপিকা।
কিন্তু প্রিয়, মহারাজ, আদি কবি, আনন্দনির্ঝর,
এ প্রকাণ্ড পত্রিকার আমি ক্ষুদ্র কী দিব উত্তর ?
তবু নিত্য চেষ্টা করি—চেষ্টাই নির্ভর।
ভাষা নাই, ছন্দ নাই, রঙ নাই, রস নাই, তবু তুলি লইনু তুলিকা
অশ্রু দিয়ে রক্ত দিয়ে অপ্রাপ্যের ক্ষুধা দিয়ে লিখে যাই নিষ্ফল লিপিকা
উত্তরে তোমার
নিরঞ্জন স্তোত্র বেদনার।
তাই ছবি, তাই কাব্য, তাই নৃত্য, তাই কথা, তাই সুর-গান
তাই দেহ তাই সত্তা তাই মন-প্রাণ,
পত্রের উত্তর দিয়ে যাব ভগবান॥

১৩৩২

কে মোরে চিনিতে পারে

কে মোরে চিনিতে পারে ?
কখনো সঙ্কোচে থাকি কখনো প্রসারে।
পথ চলি
কখনো তির্যক, ঋজু, কখনো কুণ্ডলী।
আজি আমি স্নিগ্ধস্রোতা তটিনীর ক্ষীণ প্রাণধারা
বাজাইয়া চলি একতারা

শ্যামলী পল্লীর মেয়ে
মেদুর-মৃদুল
নাচন-দোদুল
হেসে খেলে চলি গান গেয়ে,
কাল আমি মুক্তকেশী প্রলয়-দুলালী
শত হাতে দিয়ে করতালি
উল্লাসে-উচ্ছ্বাসে মাতি
মরণের সর্বনাশা গান গাঁথি-গাঁথি
সারা বেলা।
পূর্ণে-শূন্যে এ কী খেলা
দুর্নিবার
দুরন্ত আমার!

কে মোরে চিনিবে
কে আমার পরিচয় দিবে
কোথা মোর ধ্রুবধাম, প্রতিষ্ঠা পূর্ণতা
আদি কথা
কে বলিবে শেষ করি?
রন্ধ্রহীন রহস্য-শর্বরী
আদ্যোপান্ত ঢেকেছে আমারে,
কে বলিতে পারে
কত দূরে কোথা যেতে চাই?
কারে চাই? তারে কোথা পাই?
কে বলিবে, কাহারে শুধাই?
কে দিবে উত্তর?

প্রহার-প্রখর
সৃষ্টির দুর্মদ প্রভঞ্জনে
ক্ষণ হতে ক্ষণে
অন্ধগতি চলিয়াছি লক্ষ্যহীন
বিরামবিহীন।

এর মাঝে দুটি দণ্ড কোথা মেলে
নিরালা নির্জনে
নিজেরে দেখিব একমনে
কারে পেতে কারে দেব ফেলে ?
এ দেখার সূত্র কোথা, কী বা তার বিধি
কোথা কেন্দ্রবিন্দু, কোথা সত্তার পরিধি ?
আমি শিখা উদ্দীপ্ত অগ্নির
উধ্বর্গ অস্থির,
দীপ্র অন্বেষণা
আকাশের কাছে মোর কিসের প্রার্থনা
সে কি কান্না না কি গুপ্ত আনন্দ-লিপিকা ?
দলে-দলে নীহারিকা
আদিহীন সৃষ্টির পশ্চাতে
কাঁদে একসাথে
প্রকাশ ব্যথায়,
কেহ হতে চায়
তেজস্বী ভাস্কর, কেহ চন্দ্র সুধাকর
কেহ বা তারকা-কণা স্বতন্ত্র সুন্দর।
আমিও তেমনি এক রূপহীন ভ্রূণ,
জ্বলিতেছে পুষ্পিত আগুন
প্রাণের মৃণালে,
কে মোর আড়ালে
রক্ত-অস্থি-মজ্জায়-শিরায়
বৈপুল্যের বহু প্রত্যাশায়
কাঁদিতেছে, ডাকিতেছে অনিবার
খোলো দ্বার, খোলো রুদ্ধ দ্বার
আমারে ফুটিতে দাও
অগ্নি থেকে প্রদীপ জ্বালাও !
অন্ধকার, ঘোর অন্ধকার
কোথা দ্বার

খুঁজে নাহি পাই
কোথা দীপ, কাহারে জ্বালাই ?

ভগবান ! কে আমার ভগবান ?
এমন করিয়া কাঁদে
নিষ্ঠুর আহ্লাদে
কোথা তার মিলিবে সন্ধান ?
পুণ্যে পাপে আতঙ্কে অভয়ে
জীর্ণে-দীর্ণে উদয়ে-বিলয়ে
কোথায় ফোটাব তারে ?
তাই হাহাকারে
ঘুরে মরি আমি
প্রস্ফুটনকামী
দেয়ালে-দেয়ালে মাথা কুটি
শুধু ছুটি, শুধু ছুটি
ছোটা থেকে নেই বিন্দু ছুটি ।
যোগে থেকে আবার বিয়োগে
পূরণে গিয়েও ফের ফিরে আসি
উপবাসী
বিভাগের ভোগে ।
অহনিশ এ আত্মখণ্ডন
কখনো বিশীর্ণ শুষ্ক কভু বিস্ফারণ,
কোথা মোর অখণ্ডমণ্ডন ?
বিরাটের মুক্তছন্দ আমি
অগ্রগামী হয়ে ফের মৃত্যু-অনুগামী
বহু আমি সর্ব আমি বিচিত্র আমি যে
জানি না কখনো নিজে
কী আমার প্রাপ্য আছে কী আমার দেয়,
শুধু প্রাণ বহমান অমিয় অমেয়—

এর বেশি কে বা জানে জানিতে চাহি না,
শুধু যাই বাজাইয়া জীবনের বীণা।
বর্তমান হতে ভবিষ্যতে
কুসুম-আস্তীর্ণ কিবা কণ্টকিত পথে
লক্ষ্যহারা,
ভাঙি সব বন্ধনের কারা
আবার বাঁধন পরি গতির মায়ায়
অতল অথই,
আজ মোর বীণাখানি ধুলায় লুটায়
কাল ফের বুকে তুলে লই ॥

১৩৩৩

চিত্তরঞ্জন

যেই প্রাণ-মহানন্দ ছুটিয়াছে গ্রহ হতে তৃণের তরঙ্গে,
আগ্নেয় পর্বতোদ্গারে, বিহঙ্গে পতঙ্গে আর শার্দূলে ভুজঙ্গে,
সূর্যের তূর্যের ছন্দে, উল্লাসিনী কল্লোলিনী-হিল্লোল-লীলায়,
নটিনী সে ঝটিকার উন্মত্ত নর্তনে, তারে তুমি বেঁধেছিলে
তোমার দুর্বল ক্ষীণ মৃন্ময় দেহের প্রতি স্নায়ুতে শিরায়
ক্ষুদ্র এই আয়ুকুণ্ডে ; রক্তে-রক্তে আবর্তিয়া তুমি তুলেছিলে
শক্তি-মুক্তধারা ! তাই শৃঙ্খলের নিপীড়ন করি উল্লঙ্ঘন
কৃত্রিমেরে চূর্ণ করি বাহিরিয়া এলে হে সন্ন্যাসী বিবন্ধন,
জ্বলন্ত জটার তলে উত্তরঙ্গ গঙ্গা নিয়ে এসেছিলে শিব,
সে তরঙ্গ-রঙ্গ-ভঙ্গে মূর্ছাহত মৃত্তিকার নিষ্প্রভ নির্জীব
যত গুল্ম তৃণ-বৎস স্তন্য পিয়া স্কন্ধে তুলি প্রাণের পতাকা
করেছে সম্মুখযাত্রা অপ্রকম্প তেজে বীর্যে বীজের বলাকা
তব মুক্তি-বীজমন্ত্রে জন্ম লভি মৃত্তিকার গর্ভ দীর্ণ করি'
রৌদ্রের প্রসাদ পেল অমেয়জীবন। উঠেছে শিহরি অরি
তোমার দৃষ্টির ত্রাসে, হে আদিত্য, যত মিথ্যা দৈত্য দুরাচার।

হে বিহঙ্গ, তব পক্ষ-বিধুননে চূর্ণ যত পিঞ্জরের দ্বার—
কে তোমা রাখিবে রুধি? রুধিরে বারিধি তব উন্মত্ত উধাও!
হে করাল, হে কালবৈশাখী, অবশেষে তাই তুমি ভেঙে যাও
ভঙ্গুর দেহের কারা চিরমুক্তি-তীর্থমুখে ওহে তীর্থভূত!
মন্দার-সুগন্ধ নিয়া প্রাণানন্দে বন্ধহারা নন্দন-বিচ্যুত
এসেছিলে মর্তভূমে, হিমালয় হল তব নব পীঠস্থান
হে মহেন্দ্র, মানবেন্দ্র। প্রাণের আগুন জ্বালি তপ্ত লেলিহান
খাণ্ডব দাহন করি' দানবেরে দলিয়াছ তাণ্ডবে-তাণ্ডবে
জ্বলজ্জটা হে ধূর্জটি! হে দুর্জয় লয়ঙ্কর, বিষাণ-ভৈরবে
জাগালে বাত্যা ও বন্যা, উত্তালিলে উদাত্ত-উদার অম্বুনিধি,
কে মাপিবে অঙ্ক কষি তোমার এ উচ্ছ্বসিত প্রাণের পরিধি
শবের শ্মশানতলে তব নগ্ন তপস্যার কে বোঝে মহিমা?
তুমি যে সমুদ্র রুদ্র, তাই লঙ্ঘি ক্ষুদ্র দুই বদ্ধ তট-সীমা
বিদীর্ণ বিকীর্ণ করি আপনারে চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ করিয়া
পরিপূর্ণ পান করি প্রাণের মদিরা, এলে তুমি উৎপাটিয়া
মহীধ্র ও মহীরুহ। হে বিদ্রোহী মেঘনাদ, হে বজ্র জাগ্রত,
আবার প্রশান্ত তুমি নিশান্তের স্নিগ্ধস্মিত আকাশের মত,
তোমার ললাটে সূর্য, নয়নে চন্দ্রমা, চিত্তে গন্ধ-শতদল,
বুকে মরুভূর জ্বালা, প্রাণে তৃণ-মঞ্জরীর প্রচুর-প্রবল
শ্যামলতা, নিত্য নব জন্মের উৎসব। তুমি কৃষ্ণ চক্রধারী
হানো অক্ষৌহিণী সেনা, আবার প্রেমের বেণু বিরলে ফুকারি
আনন্দের বৃন্দাবন করিলে সৃজন। হে নবীন গীতার উদ্গাতা,
শিখালে ব্রহ্মণ্যতেজ অকর্মণ্যে, আমাদের একমাত্র ত্রাতা
নির্ভীকতা—সেই মন্ত্রে ভুজঙ্গেরা হয়ে গেছে লবঙ্গলতিকা,
শৃঙ্খল হয়েছে মাল্য, স্বাধীনতা মায়াবিনী মরু-মরীচিকা
হল বুঝি হস্তধৃত আমলক। নির্মল-নির্মম সর্বভুক,
ধূলায় নামিয়া আসি, হে সন্ন্যাসী ভিক্ষুশ্রেষ্ঠ, সেজেছ ভিক্ষুক,
কমণ্ডলু ভরিয়াছ মুক্তি-তীর্থোদকে, করিয়াছ প্রাণভিক্ষা
দ্বারে-দ্বারে অকপট কণ্টকের তপস্যায়, দুঃখে বহ্নি-দীক্ষা,

যে প্রাণ প্রহ্লাদসম দুরন্ত আহ্লাদে নাচে উত্তপ্ত কটাহে
তারে তুমি ডাক দিয়া ফিরিয়াছ পথে পথে অশ্রান্ত উৎসাহে
ভূষাহীন কবি মুসাফের। প্রতিটি নিশ্বাসে তুমি, ঋষিরাজ,
মুক্তি চেয়েছিলে, তাই সঞ্চিত নিরর্থ যত ঐশ্বর্যের সাজ
নিক্ষেপিয়া তুচ্ছ ঘৃণ্য আবর্জনা, সেজেছিলে রিক্ত নিঃসম্বল
মুক্তির নিশ্বাস ফেলি, তাতেও ছিল না তৃপ্তি, তাই অনর্গল
প্রাণের পবিত্র হবি রুদ্র মুক্তি-যজ্ঞাগ্নিতে অর্ঘ্য করি দান
দেহের বন্ধন টুটি বাহিরিলে চিরমুক্তিতীর্থপথে হে মহান,
কে তোমারে বন্দী করে এ আয়ুর আয়তনে, তুমি যে দুর্বার,
মৃত্যুতেও অপর্যাপ্ত, তুমি নিত্য প্রেরয়িতা সম্মুখযাত্রার
নিরন্ত অশ্রুর সাথে নীরন্ধ্র আনন্দ! তুমি বঙ্গের অঙ্গনে
আরম্ভিলা যেই যজ্ঞ, তার অগ্নি অনিরুদ্ধ উঠেছে গগনে
হেরিতে তোমার মুখে সর্বশেষ বিজয়ের নিঃশব্দ আহ্লাদ,
মৃত্যুতে, হে পুরোহিত, রেখে গেলে এই মন্ত্র, এই আশীর্বাদ॥

১৩৩২

রম্যাঁ রলাঁ

বিলাসের স্তব নহে, রচিয়াছ বেদনার বেদ,
হে সৌম্য সন্ন্যাসী, তুমি গাহিলে সাম্যের সাম গান!
নর-নারায়ণে তুমি হেরিয়াছ অখণ্ড অভেদ
কলহের হলাহল ফেলি কর শান্তি-সোম-পান।

দুঃখের দহনযজ্ঞে বোধিসত্ত্ব লভিলে নির্বাণ
তোমার চরণস্পর্শে মুক্তি পায় সভ্যতা অসতী,
ভূমারে চিনেছ তুমি অমৃতের পুত্র মহীয়ান
ব্যথার তুষারপুঞ্জে বহালে আনন্দ-সরস্বতী!
লহ এই ভারতের অকুণ্ঠ অম্লান নম্র প্রেম ও প্রণতি॥

১৩৩২

রবীন্দ্রনাথ

আমি তো ছিলাম ঘুমে
তুমি মোর শির চুমে
গুঞ্জরিলে কী উদাত্ত মহামন্ত্র মোর কানে-কানে,
চলো রে অলস কবি
ডেকেছে মধ্যাহ্ন রবি
হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।
চমকি উঠিনু জাগি
ওগো মৃত্যু-অনুরাগী
উন্মুক্ত ডানায় কোন অভিসারে দূর পানে ধাও,
আমারো বুকের কাছে
সহসা যে পাখা নাচে
ঝড়ের ঝাপট লাগি হয়েছে সে উদাসী উধাও।
দেখি চন্দ্র সূর্য তারা
মত্ত নৃত্যদিশাহারা
দামাল যে তৃণশিশু, নীহারিকা হয়েছে বিবাগী
তোমার দূরের সুরে
সকলি চলেছে উড়ে
অনির্ণীত অনিশ্চিত অসীমের অশেষের লাগি
আমারে জাগায়ে দিলে
চেয়ে দেখি এ নিখিলে
সন্ধ্যা উষা বিভাবরী বসুন্ধরা-বধূ বৈরাগিনী
জলে স্থলে নভতলে
গতির আগুন জ্বলে
কূল হতে নিল মোরে সর্বনাশা গতির তটিনী।
তুমি ছাড়া কে পারিত
নিয়ে যেতে অবারিত
মরণের মহাকাশে মহেন্দ্রের মন্দির-সন্ধানে,

তুমি ছাড়া আর কার
এ উদাত্ত হাহাকার
হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে ॥

১৩৩৩

রবীন্দ্রনাথ

আমি আজো দেখি নাই সাজাহান গড়িয়াছে যে তাজমহল
আমি শুধু পড়িয়াছি তোমার কবিতা,
আমার কল্পনাবধু তাই আজি উচ্ছ্বসিত উদ্দাম চঞ্চল
অনবগুণ্ঠিতা !
তোমার বেদনা তারে উদাসিনী করেছে উতলা
নাহি জানে কারুকার্য, নাহি জানে চারুশিল্পকলা,
শুধু তব আঁখি হতে চুরি করি আনি অশ্রুজল
আমার অন্তরলোকে গড়িয়াছে শুভ্র সমুজ্জ্বল
এ তাজমহল।
যে প্রিয়ারে চিনি নাই আজিকে চিনায় তারে তব দগ্ধব্যথা
তাহারে হারায়ে তুমি বুঝায়েছ, হে প্রেমিক, তার অমূল্যতা।
ছন্দের বন্ধন ত্যজি যে অন্তর-দুঃখ তব হোল চিরন্তন
মম চিত্ত-অন্তঃপুরে উদ্বেলিছে মৌনতায় সে দূর ক্রন্দন।
তোমার প্রার্থনা সাথে আমারো ব্যাকুল কান্না উর্ধ্বপানে উঠিছে ধ্বনিয়া :
'ভুলি নাই ভুলি নাই, প্রিয়া !'

সে কান্নায় মম চিত্ততীর্থে তুমি গড়িয়াছ আজ
বিশ্বব্যাপ্ত বিরহের তাজ ॥

১৩৩৩

শিশিরকুমার ভাদুড়ি

দীর্ঘ দুই বাহু মেলি আর্তকণ্ঠে ডাক দিলে : সীতা, সীতা, সীতা—
পলাতকা গোধূলি-প্রিয়ারে,
বিরহের অস্তাচলে তীর্থযাত্রী চলে গেল ধরিত্রী-দুহিতা
অন্তহীন মৌন অন্ধকারে।

যে কান্না কেঁদেছে যক্ষ কলকণ্ঠা শিপ্রা-রেবা-বেত্রবতী-তীরে
তারে তুমি দিয়াছ যে ভাষা,
নিখিলের সঙ্গীহীন যত দুঃখী খুঁজে ফেরে বৃথা প্রেয়সীরে,
তব কণ্ঠে তাদের পিপাসা।

এ বিশ্বের মর্মব্যথা উচ্ছ্বসিছে ওই তব উদার ক্রন্দনে
ঘুচে গেছে কালের বন্ধন,
তারে ডাকো—ডাকো তারে—যে প্রেয়সী যুগে যুগে চঞ্চল চরণে
ফেলে যায় ব্যগ্র আলিঙ্গন।

বেদনার বেদমন্ত্রে বিরহের স্বর্গলোক করিলে সৃজন
আদি নাই, নাহি তার সীমা,
তুমি শুধু নট নহ, তুমি কবি, চক্ষে তব প্রত্যুষ-স্বপন
চিত্তে তব ধ্যানীর মহিমা॥

১৩৩৩

দোসরা আশ্বিন

উন্মীলিতনীলচক্ষু আকাশের তলে এই দিন
জন্মেছিনু নিষ্কলঙ্ক—নাম তার দোসরা আশ্বিন।
এই দিন তুমি মোর কাছে ছিলে পড়ে আজি মনে
লজ্জালুলতার মত দুটি বাহু ভীরু আলিঙ্গনে
এনেছিল কী আশঙ্কা, চক্ষে ছিল মৃত্যুর মমতা,

সামীপ্যে ভুলিয়াছিনু সে দিনের সুদূরের ব্যথা।
নম্রকণ্ঠে বলেছিলে,—'আজি এ সুন্দর দিনটিতে
অপরিচয়ের রাজ্যে কী তোমারে পারি আমি দিতে
পরাজিত যার কাছে মৃত্যুর দস্যুতা?' 'কিছু নহে',
বলেছিনু: 'ঊর্ধ্বে মোর নীলাকাশ যেন সদা বহে
রিক্ততার সম্পূর্ণতা—প্রসারিণী বিপুলা পৃথিবী
পদতলে চিরনৃত্যশীলা, যেন হই দীর্ঘজীবী,
প্রেমপরমান্ন মোর অনন্ত পাথেয়; কিছু নহে—
তোমার অমরস্পর্শ মর্মমূলে নিত্য যেন রহে,
মুহূর্তের মত যেন ক্ষণে-ক্ষণে নবজন্ম লভি,
হই যেন অন্তহীন আকাশের অন্তহীন রবি।'
এই বলে মদির গভীর স্পর্শে করিনু প্রণাম,
সেদিন তো কাছে ছিলে—আরো কত দিতে পারিতাম!

আজি আর কাছে নও, আসিয়াছে দোসরা আশ্বিন,
ব্যথায় সুনীল চোখ পাণ্ডুর বিষণ্ণ বিমলিন!
নিরখিয়া চিনিবে কি আজিকার উদাসী আকাশ?
মনে কি পড়িবে, সখি, সেদিনের শীতল নিঃশ্বাস
পাণ্ডুর গণ্ডের 'পরে, স্মিতাধরে সুচারু রুচির?
সেদিনের ভুরুদুটি আজিও কি বিদ্যুৎ-বল্লীর
চঞ্চলতা ডাকি আনে? আজিও কি তুলসীতলায়
নিরাকাঙ্ক্ষ দীপশিখা জ্বালি দিবে বিনম্র সন্ধ্যায়
আমারে স্মরণ করি? নেত্রকোণে স্নিগ্ধ অশ্রুকণা
সিক্ত করে দিবে আজো ভাষাহীন কুশলকামনা?
বাহিরে আকাশতলে দাঁড়াবে কি ওগো লগ্নপাণি,
তারকালোকের তীর্থে পাঠাইবে প্রার্থনার বাণী
করিতে আমার স্পর্শলাভ মর্তের অতীত তীরে?
চিনিবে কি সেই তারা? ভুলিবে কি সেই দিনটিরে?
যদি বা ভুলিয়া থাকো, চোখে স্নেহ নাহি যদি আর
কার্পণ্যে কুণ্ঠিত যদি—তাই মোর হোক উপহার!

তোমার সে বিস্মৃতিরে রেখে দেব অম্লান অক্ষত,
তোমারি সীমন্তশোভী গর্বদীপ্ত সিন্দুরের মত ॥

১৩৩৪

আলাপ

একদিন কাছে আসি
কয়েছিলে, 'ভালোবাসি।'
বলেছিনু, 'বলো না কী চাহ?'
কী যেন চাহিয়াছিলে,
শোণিতে লিখিয়া দিলে
ছুটি কথা—'বিরহের দাহ।'

ধরিয়া তোমার নাম
মৃদুকণ্ঠে ডাকিলাম
বলিলাম, 'আমারে কী দিবে?'
কিছুই বলিলে নাকো
শুধু চোখ ঢেকে রাখো,
বুঝিলাম—প্রদীপ নিভিবে।

বলিলাম, 'সে তিমিরে
কভু কি আসিবে ফিরে?'
বলেছিলে, 'না, না, আসিব না।'
'কী নিয়ে থাকিব তবে?'
কয়েছিলে রুদ্ধরবে
ছুটি কথা—'বিস্মৃতির সোনা।'

১৩৩৪

আগুন

প্রদীপের প্রেমে পাগল হয়েছে পতঙ্গ পাখা মেলি
আগুনে হেরেছে প্রেয়সী, পরনে রূপের রক্ত-চেলি,
আগুন দেখেছে হায়,
তাই তো তাতিয়া উঠিয়াছে পাখা সূর্যেরি পিপাসায়।
দেখেছে তারার পাথায় আলোর সঙ্গীত দিশাহারা
আগুনের ধ্যানে আভরণহীনা সাহারা হয়েছে হারা,
দেখেছে অগ্নি-ভ্রূণ-চাপল্য পাগলিনী নীহারিকা
জ্যৈষ্ঠের মরু-ক্ষুধা জ্বলন্ত, দেখেছে খদ্যোতিকা।
তাহাদের হতে সাথি
পোকার পাখার পলকা পালক পাগল যে রাতারাতি।

সৃজন-পুরীর খিল-দেওয়া সাত-নিদমহলের তলে
কোন রূপসীর দেহধূপদানে মরণের ধুনা জ্বলে।
নাম নাহি তার জানা
তারে আঁকড়িতে মেলিয়াছি দুই তৃষা-মুমূর্ষু ডানা।
বহ্নিপুষ্প পুঞ্জিত তার দেহমালঞ্চ 'পরে,
মৃত্যুর ঘন অমৃতানন্দ সঞ্চিত পয়োধরে ;
আগুনের রাঙা বাসকশয়নে শাশ্বতী নববধূ
অধরসীধুতে ভরিয়া রেখেছে আগুন-ফাগুন-মধু।
আগুন চিনেছি তাই,
আগুনের মালা গলে জড়াইলে আগুনের জ্বালা নাই॥

১৩৩৩

নববর্ষ

পুরোনো দিনের বেদনার বোঝা স্কন্ধে নে ওরে তুলি
কুড়ায়ে যা পেলি দুই মুঠি ভরে পথে যেতে যত ধূলি।
সব নিয়ে চল ভাই,
কিছু ফেলিবার, কিছু ভুলিবার, হারাবার কিছু নাই।

যে ফুল ফোটেনি, ঝরেছে যে পাতা, নিবে গেছে যেই তারা
মরুর পিয়াস মিটাতে বৃথায় কেঁদেছে যে বারিধারা,
সন্ধ্যার তীরে যে আলো ডুবিল, সব সাথে নিয়ে চল,
উতল হয়েছে নিতল নয়নে আবার চোখের জল।
শুরু ফের পথ হাঁটা
ডেকেছে আঁধার, ডেকেছে পাথার, ডেকেছে পথের কাঁটা।
আবার মরণ বাড়ায়েছে বাহু, তুফান তুলেছে ফণা
আবার পথের ধূলায় জ্বলেছে তৃষার অগ্নিকণা।
আবার নিবিছে বাতি
হাত ছেড়ে দিল ভিড়ের মাঝারে জীবনের যত সাথি।
থামিবার ঠাঁই নাই হেথা নাই, তবু হবে চলে যেতে
ব্যথার প্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে আরো আরো ব্যথা পেতে—
কত দূরে কে বা জানে
নতুন বরষ বলে কিছু নাই জীবনের অভিধানে॥

১৩৩৩

দখিনা

লাখো লণ্ঠন লুণ্ঠিত আজি—লুটের লাট্টু ঘোরে,
পরদা বেফাঁস, কপাটের খিল আলগা করেছে চোরে।
দুর্বল যত দূর্বার দল দুর্মদ দুর্বার—
প্রথম মাতার দুই স্তন ভরি দুগ্ধের সঞ্চার।
ইটের ফাটলে ফুটিছে টগর, চিতায় চাঁপার বাটি
দামালের দাপে সবুজে ফাটিছে তামাম তামাটে মাটি।
লালসার রাঙা আঙারেতে ভাঙা বুকের আঙুর পিষে,
কণ্টকক্ষত কণ্টিকারির ভাণ্ড ভরেছে বিষে।
মড়ার খুলিতে মদ্য ভরিছে মৃত্যু মহৌষধি
রক্তের মাঝে ফেন-ফণা তুলে ফুঁসিছে বাসনা-নদী।
তারকার লাগি অতসীর শাখা করিতেছে আঁকুপাঁকু
নব-বিধবার ঠোঁট কাটে গত রাতের চুমার চাকু॥

১৩৩৩

অমাবস্যা

হে অসূর্যম্পশ্যা, তুমি অমাবস্যা মোর

অমাবস্যার কবিতাগুলির রচনাকাল
১৩৩২ থেকে ১৩৩৬

আমার পরাণ মুখর হয়েছে

আমার পরাণ মুখর হয়েছে সিন্ধুর কলরোলে,
প্রভঞ্জনের প্রতি পদপাতে আমার পরাণ দোলে।
আমার পরাণে ভাই,
কোটি মানবের অশ্রুজলের জোয়ার শুনিতে পাই।
সূর্যের বুকে কী ভুখ জাগিছে, আমার পরাণ জানে,
কীটের পাখার অস্ফুটতম বেদনা আমারে হানে।
আমার পরাণে ভরা
এ পথ-চারিণী বসুন্ধরার অকারণ ঘুরে-মরা।
বনানী-বীণায় মর্মরি ওঠে আমার ব্যাকুল প্রাণ,
আমার পরাণ তৃণের সভাতে হয়েছে শ্যামায়মান।
আমার পরাণে শিহরিছে প্রতি পুষ্পের ঝিলিমিল্,
আমার পরাণ নিঙাড়ি নিঙাড়ি আকাশ হয়েছে নীল
রহেনি কোথাও ফাঁক,
আমার পরাণে জমেছে বিশ্ব-বেদনার মৌচাক।
দীর্ঘশ্বাসের দরিয়া তুলিছে, মরুভূর শূন্যতা,
অন্ধকারের কাতর কাকুতি, ঝরা মুকুলের ব্যথা—
আমার পরাণ ভরি
মূর্চ্ছিত আছে যুগান্তরের মৃত্যুর বিভাবরী॥

হেরি যে চমৎকার

তোমাদের দেশে এনু আমি ভাই, পথ ভাঙি বহুদূর,
শুধু ধূলি দিয়ে ভরি নিব মুঠি, না মিলুক কোহিনুর।
হেরি যে চমৎকার—
অন্তরে আর অম্বরে দোলে অশ্রুর উৎসার।
শশাঙ্কে হায় হেরি কলঙ্ক, গুলের গলায় কাঁটা,
পউষের দেশে যৌবন-হারা গোঙায় গাঙের ভাঁটা।

ঝড়ে উড়ে গেছে পাখিদের নীড়, দুলালচাঁপার গুচ্ছি,
পিয়ালের রেণু বুনো মাছি এসে নিয়ে যায় হায় মুছি।
সবি হেথা মধুময়,
হৃদয়ের দামে যদিও মেলে না হৃদয়ের বিনিময়।
ভোর হল ভেবে কাকজ্যোৎস্নায় ফুকারিয়া ওঠে পাখি,
নারী নব অবগুণ্ঠনছলে ছলনারে রাখে ঢাকি।
পথের কাদায় ছেলে
আকাশেরে চাহে মা বলি ধরিতে ছোট দুটি মুঠি মেলে!
গৃহচূড়ে জ্বলে আকাশপ্রদীপ সন্ধ্যাতারার লাগি,
বন্ধুর দেশে বন্ধু-র মতো বন্ধুলি আছে জাগি।
সুশীতল সবি ব্যথা,
হরিণহৃদয়া ভীরু প্রেয়সীর নয়নে নিষ্ঠুরতা॥

আমি এসেছিনু

আমি এসেছিনু পথ ভুল করি তোমাদের খেলা-গেহে,
স্নান করিবারে তোমাদের ভিজা অশ্রুজলের স্নেহে;
আমারে ভুলিয়ো ভাই,
ভালো যদি বাসো, ভুলিবার মতো সহজ কিছুই নাই।
দিনের আলোকে আঁধার ভুলেছো, ভুলেছো রাতের তারা,
নিদয় নিদাঘে ভুলেছো যেমনি নেমেছে শ্রাবণ-ধারা।
ঘুমের ঘোমটা টানিয়া ভুলেছো জাগর-জ্বালার দাহ,
নীলিমা ভুলেছো মেলিয়াছে পাখা যবে কালো বারিবাহ।
আমারে যাইয়ো ভুলি,
শীতের শিয়রে দখিনার তরে বাতায়ন দিয়ো খুলি।
ঘরে নিয়ো নাকো শুকালো যা মাঠে নীবারের মঞ্জরী,
তুলো না সে-ফুল কাঁটায় যাহার বৃন্ত গিয়াছে ভরি।
যে-পাখি ভুলিলো গান,
পিঞ্জর হতে তোমরা তাহারে দিয়ো গো পরিত্রাণ।

তোমরা হেথায় অশ্রুবেলায় বাঁধিয়ো বালির বাসা,
প্রিয়ার নয়নে হেরিয়ো গোপনে সে-ভালোবাসার আশা।
আমি আসিব না ফিরে,
আমি চলে যাই তীর্থপথিক তিমিরতমসাতীরে ॥

মিলনের রাতে

মিলনের রাতে উঠানের কোণে জ্বলিছে বিরহ-বাতি,
জ্যৈষ্ঠের রোদে কপাল কুটিছে অমাবস্যার রাতি।
তোমার হাসির পিছে
প্রতিবেশিনীর নিবানো দীপের বেদনা নিঃশ্বসিছে।
আষাঢ়ের রাতে মনে রেখো ভাই, মৃতা তটিনীর ব্যথা,
চন্দ্রোৎসবে ভুলিয়া যেয়ো না দিনের দরিদ্রতা।
নব-কদম্ব হেরিয়া ভুলো না কেয়ার কাঁটার ক্ষত,
ক্ষণ-তরে ভাই, মনে করে রেখো যে-তারা অস্তগত।
যে-তৃণ পায়নি প্রাণ,
নব-ধান্যের উৎসবে তারে কোরো নাকো অপমান।
যে-আশা আজি-ও পায় নাই ভাষা, মরমে রয়েছে জমা,
তব সুর-সুরধুনী-কল্লোলে করিয়ো তাহারে ক্ষমা।
কাঁদিতে যে পারে নাই,
তারে তব মধু প্রেম-কান্নায় স্মরণ করিয়ো ভাই।
ঘরের দরজা বন্ধ কোরো না অতিথি ঝড়ের ডরে,
উপুড় করিয়া রাখিয়ো পেয়ালা যদি কভু নাহি ভরে।
থেকো নাকো ভুলে যেয়ে,
তোমার বাসর-ঘরের দুয়ারে কাঁদিছে বিধবা মেয়ে ॥

ভৃঙ্গার ভরে

ভৃঙ্গার ভরে মদ রেখেছিনু, জানি নে কখন হায়,
তুঁতের মতন তিতা হয়ে গেছে তাতল সে-রসনায়।
মনের গলিতে ভাই,
মনসার দেখা নাই যদি মেলে, নাগের নাগাল পাই।
জুঁই-জ্যোৎস্নায় ফুলের ফরাসে বিছানা বিছালো বিছা,
গোধূলির ঘরে গরিব রবির গর্ব হয়েছে মিছা।
দুধের ভাণ্ডে ধুতুরা-গোটার বিষ কে ঢেলেছে ফাউ,
সকালের ভাতে তাত নেই আর, বিকালে হয়েছে জাউ।
পাকা ভেবে ফল পাড়ি—
ডাসা ডালিমেতে বাসা বাঁধিয়াছে কুটিল কীটের সারি।
লোহু-জমা লোর লোনা লাগে ভাই, চুমা যে লাগিছে চুকা,
ভালোবাসা বাসি, চাউনি মিউনো, রাহু যে আজি-ও ভুখা।
রাত্রে ফুটুক ভাই
তোমার রজনীগন্ধা, আমার সূর্যমুখী তো নাই।
বেবাক বুকেতে কাদা পচিয়াছে, পড়েছে চাকার দাগ,
কামনার কূপে বন্দী মাগিছে সুন্দর-অনুরাগ!
লইয়ো অধরে তুলি
হৃদয় তো আর ভালো লাগিল না, মরিলে মাথার খুলি॥

আমি হেথা পরবাসী

আজিকার রোদে রোদন ভুলেছি বৈশাখী সন্ধ্যার,
পদ্মার ঢেউয়ে পদ্ম ভাসায়ে গন্ধ ভুলেছি তার।
সকলি যে ভুলিয়াছি—
কবে তুমি ছিলে মোর মধু-চাকে উন্মন মউ মাছি!
ফুলের সৌসর দোসর পাইনু কবে সে বাসর-রাতে,
তোমার চোখের কাজল মেজেছি আমার আঁখির পাতে

কবে তব কোলে কপোল রাখিয়া কপোলকল্পনায়,
ক্ষয়হীন রাতি গোঙাইনু দোঁহে অক্ষয়তৃতীয়ায় ;
কিছুই যে মনে নাই,
সোতের শ্যাওলা ঘাটে ঠেকেছিনু, আবার ভেসেছি ভাই।
বিদ্যুল্লতা-দ্যুতির দ্রুততা মন্থর মেঘে ঢাকা,
ব্যঞ্জন আজি আলুনি হয়েছে, কালকূট ঠোঁটে মাখা।
আজি ওগো, প্রিয়সখি,
অলক্ষ্মী-রাতে নাগে-কাটা শুধু লখিন্দরেরে লখি।
সরাইখানার সরা-র সরাব হঠাৎ গিয়াছে চুকে,
অনুরাধা-তারা মুখ ঢাকিয়াছে অন্ধকারের মুখে।
আমি হেথা পরবাসী,
ভুলে গেছি সখি, সেই আশাতীত দূর ভাষা : 'ভালোবাসি' ॥

এই মোর অপরাধ

ভালোবেসেছিনু, আর বলেছিনু : বাহুতলে এস প্রিয়া,
চুম্বনে দাও পুলকাঞ্চিত তনুরে রোমাঞ্চিয়া !
এই মোর অপরাধ—
কেন বলেছিনু সাগরের কানে সেই শুভ সংবাদ !
দেহের ভাণ্ডে সঞ্চিত ছিল আনন্দ-সন্দোহ,
শিরার শোণিতে স্পন্দিত হল বাত্যার বিদ্রোহ,
মোহ-অঞ্জনে দুটি চোখে ছিল মুগ্ধ মঞ্জুলতা,
রবির আলো ও মোর প্রেমে ছিল অন্ধ অজস্রতা।
বলেছিনু স্নেহভরে :
তোমারে হেরিয়া একাকী বিরহী বিধাতারে মনে পড়ে।
নারী, তবু ছিলে নারীর অধিক অতীত আমার কাছে,
এবে মনে হয়, সে-কথা কি কভু নারীরে বলিতে আছে ?
তবু বলেছিনু বলে,
কঠিন উপল হল উৎপল উতল চোখের জলে।

মোর আঁখি দিয়া তোমারে ও মোর প্রেমেরে আবিষ্কার
করিনু প্রথম—তাই ঢেউ দোলে এ হৃদয়-গঙ্গার।
চির মধুশর্বরী—
তুমি মক্ষিকা, মধু-উৎসবে করো শুধু মাধুকরী॥

হবো যবে অবসান

কাফুরের মতো ফুরায়ে ফতুর আমি যবে যাবো উবে,
মুচকি হাসিয়া চাঁদ যেন ওঠে; রবি যেন ওঠে পুবে।
নয়নে কাজল দিয়া
উলু দিয়ো, সখি, তব সাথে নয়, মৃত্যুর সাথে বিয়া।
জুঁই আর ভুঁই-চম্পা করবী কবরীতে গেঁথে নিয়ো,
তোমার হাতের মাটির বাতিটি জানালায় জ্বালি দিয়ো।
হৃদয়ের লালে চরণ রাঙিয়ো, ভুরু ভেঙো নীল টিপে,
খেলো সে খয়েরি শাড়িখানি পোরো, মানাবে সন্ধ্যাদীপে।
হবো যবে অবসান,
শীতললক্ষ্যা লক্ষ্মী নদীটি চলে যেন গেয়ে গান।
মাঝি যেন তার গুণ্ টেনে যায়, মাছি ফেরে দ্রোণ-ফুলে,
পাতার আড়ালে মুখ ঢাকে যেন লজ্জাবতীরে ছুঁলে।
তোমাদের তরে ভাই,
অক্ষয় থাক এই পৃথিবীর অফুরান পরমাই।
সন্ধ্যামণিতে সন্ধ্যাতারার সুদূর স্বপ্ন-লেখা,
বিধুর বিধু-র অধরে ভানুর গোপন চুমন-রেখা।
আমি যবে যাবো মরে
ডালিমের ডাল নুয়ে পড়ে যেন নবীন পুষ্পভরে॥

প্রথমতম

তোমার প্রথম গুণ্ঠনখানি সোহাগে টানিয়া দিয়ো,
বিবাহের বাঁশি বেজে উঠিয়াছে, এল পরমাত্মীয় ।
কণ্ঠে মিলন-মালা,
সে-জ্বালা জুড়াও—বিধাতা ও মোর বুকে জ্বলে যেই জ্বালা !
সীমন্তে নব শুভ শৃঙ্গারভূষণ শোভিছে কি বা,
কার লীলায়িত ভুজবন্ধনে বন্দী মৃণাল-গ্রীবা !
জলতরঙ্গ বাজিল কি দেহে অপূর্ব ঝঙ্কার,
পুরাতন রস-রভসে শিহরি উঠিয়ো পুনর্বার !
নয়ন করিয়া নত
অস্ফুটমুখে বোলো : 'ভুলিব না' সেই সে-দিনের মতো !
তব বন্ধুর রাত্রির পারে এসো কল্যাণী উষা,
দুই হাতে আনো স্নেহ সান্ত্বনা অনাবিল শুশ্রূষা !
পরাণ ভরিয়া প্রীতি,
পুণ্য প্রভাতে শুধু আনিয়ো না গত গোধূলির স্মৃতি !
হেথা নগরীর ধূলি-কুৎসিত পথে আমি একা চলি,
সেবায় পূর্ণ থাকুক সে-গৃহলক্ষ্মীর অঞ্জলি !
অকারণ চলা মম,
প্রিয়তম তবু তোমারি, যদিও নহেকো প্রথমতম ॥

সোনার কর্ণফুলি

হেথায় না হয় শস্য ফলে না—তোমার নদীর তীর
শ্যামলি উঠুক চরণচিহ্নে হেমন্তলক্ষ্মীর !
হেথায় ফটিক-জল,
বাহুবন্ধন তপ্ত ওপারে, চুম্বন সুশীতল ।
হেথায় দিবস কাটিতে চাহে না, ক্লান্তির নাহি সীমা,
তোমাদের দেশে হয়তো বা সেই পুরাতন পূর্ণিমা ।

হেথায় জীবন জুড়ায়ে এসেছে—নীরব নিরর্থক,
তাই ভেবে শিরে সিন্দুর দিয়ো, চরণে অলক্তক !
হেথায় উড়িছে ধূলি,
ওপারে তোমার দুলিয়া উঠেছে সোনার কর্ণফুলি ।
হেথায় ঝরিছে ঘনবর্ষণ ডাকিছে নিদয় দেয়া,
ওপারে তোমার ফুটিলো কি তাই কোমল কদম কেয়া ?
হেথায় ক্ষুধিত মন,
তাই ভেবে শিরে ব্রীড়ায় শিথিল দিয়ো অবগুণ্ঠন !
জলহীন চোখে কাজল আঁকিয়ো, ললাটে হলুদ টিপ,
হেথা শুধু মেঘ মলিন মধুর, কোথা তুমি মেঘদীপ !
হেথায় জ্বলিছে চিতা,
সেই আলোতেই তোমার রাত্রি হয়েছে দীপান্বিতা ॥

অতিথি

আমার প্রিয়ার ঘরের অতিথি, শুধাই তোমারে ভাই,
হেরিছ তেমনি তার দুই চোখে বসন্ত-বাসনাই ?
কোন নামে তারে ডাকো ?
তোমারো আকাশে ফুটিয়াছে তারা তেমনি কি লাখো লাখো ?
তোমরা দুজনে মাঠের কিনারে তেমনি কি থাকো বসি,
তোমাদের দেশে তেমনি কি আসে চৈতের চৌদশী ?
শয়ন-শিয়রে রজনীগন্ধা ফেলিছে কি নিঃশ্বাস,
নিরালা জাগিয়া দুজনে তেমনি ভুঞ্জিছো অবকাশ ?
আমারে বলিবে না কি ?—
তেমনি কোমল দুটি করতল, শীতল তেমনি আঁখি ?
তুমি না চাহিতে অধর আনিয়া অধরে কি আর রাখে,
বারেক আধেক 'ভালোবাসি' বলে তেমনি কি থেমে থাকে ?

রঙিন বসন পরি
তোমারে তুষিতে খোঁপায় গোঁজে কি ধান্যের মঞ্জরী ?
নব নবনীর মতো সুকোমল তার দুটি পয়োধরে
সঞ্চিত করি রাখিয়াছে সুধা তোমার শিশুর তরে ?
আর কি বেহাগ গায় ?
তোমার চোখে কি আমার চোখের জলের আভাস পায় ?

দ্বিতীয় নিমন্ত্রণ

তখনও তুমি আস নাই ভাই, ছিলাম অদ্বিতীয়,
কবিতার বাতি জ্বালায়ে তাহারে রেখেছিনু রমণীয় !
তবুও জানিত মন,
তৃতীয়ের তরে আছে তার চোখে দ্বিতীয় নিমন্ত্রণ !
বিপথ-অতিথি, জানি যে আসিবে, তাই আমি কবে থেকে
অমাবস্যার রহস্য দিয়ে রেখেছি তাহারে ঢেকে।
নিকটের চেয়ে দূর যে অধিক—আমি শিখালাম তারে,
আমি যে আজিকে দূর—সে-দুরাশা ভুলেছে সে একেবারে।
আছে সব ভুলিয়া সে,
আকাশ হইতে নামায়েছি তারে বসাতে তোমার পাশে।
তোমার প্রিয়ার এত যে আদর চোখের চাহনি বেচি,
জানো কি বন্ধু, সে-চোখের মায়া আমি তারে শিখায়েছি !
জানো কি বন্ধু হায়,
তোমার প্রিয়ারে অমর করিনু আমার এ-কবিতায়।
করতলে সেবা, বক্ষে অমৃত, নয়নে দিলাম আলো,
যদি পারো, বেশি—নতুবা আমারি মতন বাসিয়ো ভালো।
তোমার চুমার তরে
আমার চুমায় লালিমা লেপিনু তাহার ওষ্ঠাধরে ॥

বলিতে পারো কি পাখি

কেন যে তখন খুলে রেখেছিনু দখিনের বাতায়ন,
ছোট পাখি, ঘরে এসেছিল উড়ে—সুকোমল, সুশোভন!
কেবা জানে কোথা থেকে—
কোন নীল-নীর নিরালা নদীর নিবিড় মমতা মেখে।
দুই ডানা জুড়ে এনেছো চলা-র শ্রান্তিবিহীন ব্যথা,
এনেছো কাহার ভীরু প্রণয়ের ক্ষণিক চঞ্চলতা।
পাখা ভরে কার সুখ-উত্তাপ আনিয়াছো নিরুপম,
বনের বিহগ, তুমি কি আমার মনের বিহঙ্গম?
এনেছো বনের বাণী,
দূর আকাশের টুকরো নীলের একটুকু হাতছানি।
ভাবি, ভালোবেসে খড়কুটো দিয়ে নীড় করে দিই তোরে,
যে নামে তাহারে ডাকিতাম তোরে ডাকি সেই নাম ধরে।
বলিতে পারো কি পাখি—
আমার প্রিয়ারে কোথা দেখে এলে, সজল কি তার আঁখি?
আমারে স্মরণ করিয়া তোমারে দিলো কি নীবারকণা?
আমারে বলিতে কানে-কানে তব কী কহিলো সান্ত্বনা!
—চলে গেলো বায়ুভরে,
বলে গেলো পাখি: 'তোমার প্রিয়ারে রেখে গেনু এই ঘরে॥'

বসিতে বলিলে কাছে

বহুদিন পরে তোমার দুয়ারে করিলাম করাঘাত,
দোর খুলে মোরে নিয়ে এলে ঘরে ধরি মোর দুটি হাত।
বসিতে বলিলে কাছে—
বলিলে: 'আমার দেওয়া পাখিটি কি এখনো বাঁচিয়া আছে?

আমার চুমায় মতন জ্যোছনা নয়ন ছোঁয় কি হেসে,
তোমার বেড়ার ঝুমকো লতাটি—কত বড়ো হয়েছে সে ?
তোমার উঠানে এঁকে এসেছিনু লক্ষ্মীর আলপনা,
কোনো পসারীর পদধূলিপাতে সে কি আজো মুছিলো না ?'
বলিলে বসিতে কাছে—
বলিলে : 'আসিবে, তাই আজি মোর বাম চোখ নাচিয়াছে।
ফুলে-ফুলে ভরা কালো দীঘি সেই, তেমনি উতলা বাও ?
মদির দুপুরে উদাসী ঘুঘুর কাঁদন শুনিতে পাও ?
তোমার হাসনুহানা
তেমনি আকুল ; আমারে ভুলিতে করিয়াছো বুঝি মানা !
ফলটুকি আর মৃদু প্রজাপতি আর কি তেমন ওড়ে ?
সাধ হয়, বলি আর একবার সেই কথা ভুল করে !'
বসিতে বলিলে কাছে—
বলিলে : 'রাতের শেষ তারকাটি এখনো জাগিয়া আছে ॥'

যদি কোনো দিন

যদি কোনো দিন বেদনার মতো বাদল ঘনায়ে আসে,
কাজল আকাশে আমার আঁখির সজল কাকুতি ভাসে,
বসিয়া তাহার বামে,
একবার শুধু ভুল করে তারে ডাকিয়ো আমার নামে।
আমার দেশের ব্যথিত পবন যদি কভু যায় ভেসে,
আদরের মতো লুটায় তোমার লুলিত আকুল কেশে,
গুণ্ঠন খুলে দেখে নেয় যদি মুখখানি কমনীয়,
আমারি সোহাগ ভেবে তারে সখি, কণ্ঠ জড়াতে দিয়ো
যখন ফুরাবে কথা,
আমারি লাগিয়া অনুভব কোরো একটু নির্জনতা।

যদি কোনো রাতে ঘুম ভেঙে যায়, চাঁদ জাগে বাতায়নে,
আমিও জাগিয়া দেখিতেছি চাঁদ সে কথা করিয়ো মনে।
দিবা যবে অবসান,
মোরে ভেবে চোখে আঁকিয়ো একটি অতৃপ্ত অভিমান।
মহুয়া-মদির মিলনের মোহে ভুলিয়ো আমার কথা,
উৎসবশেষে বাজে যেন বুকে মধুর অপূর্ণতা।
যখন নিভিবে আলো,
ভেবো সেই নীল নিবিড় তিমির লাগিত আমার ভালো ॥

প্রথম যখন দেখা হয়েছিল

প্রথম যখন দেখা হয়েছিলো, কয়েছিলে মৃদুভাষে :
'কোথায় তোমারে দেখেছি বলো তো—কিছুতে মনে না আসে।
কালি পূর্ণিমা রাতে
ঘুমায়ে ছিলে কি আমার আতুর নয়নের বিছানাতে ?
মোর জীবনের হে রাজপুত্র, বুকের মধ্যমণি,
প্রতি নিঃশ্বাসে শুনেছি তোমার স্তব্ধ পদধ্বনি !
তখনো হয় তো আঁধার কাটেনি—সৃষ্টির শৈশব,
এলে তরুণীর বুকে হে প্রথম অরুণের অনুভব !'
আমি বলেছিনু : 'জানি,
স্তবগুঞ্জন ভুলি তোরে ঘিরে হে মোর মক্ষিরাণী !'
যাপিলাম কত পরশতপ্ত রজনী নিদ্রাহীন,
দুচোখে দুচোখ পাতিয়া শুধালে : 'কোথা ছিলে এত দিন ?'
লঘু দুটি বাহু মেলে
মোর বলিবার আগেই বলিলে : 'যেয়ো না আমারে ফেলে।'
আজি ভাবি বসে বহুদিন পরে ফের যদি দেখা হয়,
তেমনি দুচোখে বিশ্বাসাতীত জাগিবে কি বিস্ময় ?
কহিবে কি মৃদুহাসে :
'কোথায় তোমারে দেখেছি বলো তো—কিছুতে মনে না আসে ॥'

কোনো কাজ নেই

আজ দিনটিতে কোনো কাজ নেই, বসে আছি নিরালায়,
বাদলের বেলা থেমে থেমে চলে, যেন ধিমে-তেতালায়।
অন্তরো মন্থর,
বলিতে কি পারো এ দিন কাটিলে কি করি অতঃপর ?
গৃহবাতায়নে বসেছো কি আজি করতল রাখি কোলে,
লোটনখোঁপায় দোলনচাঁপা বা পাটের থোপা কি দোলে ?
গুঞ্জমালা কি গলে দুলায়েছো, করঞ্জা ফুলে ভারি,
পায়ে কি সোনার ঘুঙুর, গায়ে কি মেঘডুম্বুর শাড়ি ?
আমারে কি পড়ে মনে ?
যদি পড়ে, সখি, আজি দিবাশেষে দীপ জেলো গৃহকোণে।
কামিনীধানের ক্ষেত ভরে আজি জল-নির্ঝর বাজে,
আমি ও আকাশ দুজনে আজিকে একেবারে একেলা যে।
বুকে মোর ব্যথা খুব,
ডুবারি হইয়া চোখের বারিতে একবার দিবে ডুব ?
দেখি বসে শুধু ভিজিছে কেমনে তপ্ত পথের ধুলা,
অনাবৃষ্টির হৃদয়ে পেতেছি শুখানো বালির চুলা।
কি করিব ভাবি বসে,
শাঙন গগনে তোমার শাঙল চিকুর গেছে কি খসে ?

তবু সবি লাগে ভালো

মলিন দিনের মাধুরী হেরিয়া মধুর হয়েছে মন,
রোগশয্যায় একা শুয়ে আছি একান্ত অকারণ।
তবু সবি লাগে ভালো,
বিদায়বেলায় গোধুলির চোখে মৃদু মুমূর্ষু আলো

পাশের ছাতের আলিসা হইতে কাপড়টি নিতে আসা,
পথে যেতে-যেতে ছুটি বন্ধুর দরদী দরাজ হাসা ;
তৃণের ডগায় ছোট আলোটুকু, একটি তারকা ফোটে,
শুকনো পাতাটি নীড়ে-ফিরে-যাওয়া ভীরু শালিকের ঠোঁটে !
শুয়ে রোগশয্যায়
আকাশের চোখে ক্লান্ত কাকুতি মোর চোখে পৌঁছায়।
কোমল করিয়া ডাকেনিকো কেহ, জ্বালেনিকো দীপশিখা,
আজিকে আঁধারে তারাটির সনে মোর মুখচন্দ্রিকা !
সন্ধ্যা কোমলকায়া
ছোট বোনটির মতো পাশে ব'সে, নয়নে করুণ মায়া !
তুমি কি এখন চঞ্চলপদে গৃহচর্যায় রত,
তোমার চোখে কি সন্ধ্যা নেমেছে আমার স্নেহের মতো ?
শুয়ে আছি চুপচাপ,
কান পেতে শুনি রাতের পাখায় বাজে আজি কি বিলাপ !

এত বড়ো এ নিখিলে

ছোট ঘরটিতে বসে আছি একা মোর ছোট ঘরটিতে,
একদা যেখানে চুপি-চুপি এসে ছোট ছুটি পা রাখিতে।
পদ্মের ছুটি কুঁড়ি !
ছুটি কালো চোখে আমারি পিপাসা করিয়া আনিতে চুরি !
সাগরমেখলা পৃথিবী চাহি না, চাহি না প্রিয়ার প্রেম,
এই ঘরটির ঠাণ্ডা হাওয়াটি ভারি মিঠা মোলায়েম।
মাকড়সাগুলি জাল বিছায়েছে দেয়ালে ও কড়িকাঠে,
ভাবের সূতায় বাসা বেঁধে-বেঁধে আমারো সময় কাটে।
নাই কোনো অভিলাষ,
দূরে বসে আজি তোমারি মতন ফেলিতেছি নিঃশ্বাস !
মেঘের আড়ালে রামধনু দেখ—ধরা দিতে অবনত,
মনে হয় যেন তোমার খোঁপার লাল ফিতাটির মতো !

হে তন্দ্রসঞ্চারিণী,
নয়ন তোমারে ভুলেছে যদিও, মন বলে : 'চিনি চিনি'।
বাহিরে মোদের পৃথিবী টলিছে, খসিছে কাহার তারা,
খবর রাখি না, এই বেশ আছি—অতীতে আত্মহারা!
এত বড়ো এ-নিখিলে,
এই মনে আছে, একদিন তুমি খুব কাছে এসেছিলে॥

মধুর মিথ্যা কথা

রজনীতে আর জীবনে বিরাজে বিস্তৃত স্তব্ধতা,
শুধু মনে পড়ে তোমার মুখের মধুর মিথ্যা কথা।
'ভালোবাসি' বলেছিলে,
নিমেষে আকাশ ভরে উঠেছিলো নয়নভুলানো নীলে!
রোমাঞ্চ তুলি মাঠে জেগেছিলো তরুণ তৃণাঙ্কুর,
নভ-সীমন্তে হয়েছিলো গাঢ় সন্ধ্যার সিন্দুর।
হয়েছিলো আঁখিতারা ও তারায় সুদূর সম্ভাষণ,
বুকে বেজেছিলো সাগর-শঙ্খ, কাননের কঙ্কণ।
বলেছিলে : 'ভালোবাসি',
দুঃসহ সুখে বিধাতার মুখ উঠেছিলো উদ্ভাসি।
মনে হয়েছিলো পার হয়ে এনু শেষহারা সে-সাহারা,
নয় আকাশের, তুমি ছিলে মোর মাটির সন্ধ্যাতারা।
জীবনে জ্যোৎস্না-রাতি
তুমি মোর গৃহ-তুলসীর মূলে ছিলে মৃন্ময়-বাতি।
তবু একদিন বলেছিলে বলে জোয়ার জেগেছে জলে,
সুখ-সৌরভ লেগেছে আমার বেদনার শতদলে।
নাই আর কোনো সাধ,
তবু তো একদা বলেছিলে, তাই জানাই ধন্যবাদ॥

সবি অবিনশ্বর

জ্যোৎস্না বলিয়া গৃহকোণে দীপ ছিলো বুঝি মিটিমিটি,
আধো-জ্যোৎস্নায় আধো-দীপালোকে লিখেছো প্রথম চিঠি।
হয় তো বা দুপহরে
সহসা আমারে মনে পড়েছিলো উদাস ঘুঘু-র স্বরে।
দেখেছি চিঠিতে তব দুটি চারু ভীরু ভুরুলতা আঁকা,
কপোত-কণ্ঠ-কোমল কপোল নরম সরমে মাখা!
বিদ্রুম-লতা-লোহিত অধর পেলব পরশাতুর,
বঙ্কিম তব গ্রীবা-ভঙ্গিমা, স্নিগ্ধ নখাঙ্কুর!
দেখি দুটি আঁখি থির,
আখরে টলিছে ব্যগ্র শিহর স্তনাগ্রচূড়াটির!
ক্ষণিক সত্য তোমার মদির স্বপ্ন রয়েছে মেশা,
অক্ষয় আছে চিঠিতে তোমার নত নয়নের নেশা!
একটি চপল ক্ষণ,
একটি কুশল-প্রশ্ন, একটি ভঙ্গুর চুম্বন!
বিরহ-রজনী-জাগর-ক্লান্ত অশ্রুর উৎসবে
অক্ষয় আছে সেই জিজ্ঞাসা : 'আবার আসিবে কবে?'
—সবি অবিনশ্বর,
হে দূরচারিণী, মুখর প্রাণের লহ এই উত্তর ॥

আছ কি নিদ্রাগত

আজি রজনীতে জানালার ধারে ফুটেছে আমার হেনা,
ওর পানে চেয়ে মনে পড়ে সেই বলেছিলে—ভুলিবে না!
আছ কি নিদ্রাগত,
চোখের পাতায় ঘুম নেমেছে কি আমার স্নেহের মতো?
সফেনপুঞ্জা তটিনীর নীরে তুমি নবেন্দুরেখা,
দুখ-জাগানিয়া কোন বাঁশরীর অস্ফুট গীতলেখা!

শেষবিস্তারপাণ্ডুর তব স্তনকোরকের জ্যোতি—
শিথিল শিথানে কারে মোহিয়াছো—ব্রীড়ায় বেপথুমতী!
গোপনমিলনসুখে
মৃণালমৃদুল দুটি বাহু দিয়ে জড়ায়েছো কারে বুকে!
পল্লবরাগতাম্র অধরে কার তরে এত মধু,
কার করে লীলাকমল তুমি গো, কার তুমি লীলাবধূ!
তনুতট উচ্ছল—
শিশিরশীতল কপোলে পড়েছে বিচূর্ণকুন্তল!
হেথায় আঁধার নেমেছে নিবিড় কাকপক্ষের মতো,
মনে আনে কার কালো দুটি আঁখি মমতায় সন্নত!
ফুটেছে ব্যথার হেনা—
কেন ঘুমাইলে—আমার মতন কেন তারে চিনিলে না?

তুমি শুধু আস নাই

কেহ আসিয়াছে চকিত চপল বন-হরিণীর মতো,
গুণ্ঠনহীন দুখানি নয়ন কুণ্ঠায় অবনত!
দেহে যৌবনভার,
এনেছে অতল গাঢ় রহস্য কালো অমাবস্যার!
মদিরেক্ষণা কেহ আনিয়াছে রাঙা মদিরার ফেনা,
কবরীকলাপে যূথিকামুকুল গুঁজেছে করবী হেনা।
স্ফুরিততড়িৎ কেহ আসিয়াছে দেহ-তট বন্ধুর,
পয়োধরে আর অধরে এনেছে মধুরতা মৃত্যুর!
মমতামাখানো চোখে
মিলনহীনার মিনতি এনেছে কেহ বা সন্ধ্যালোকে!
ভ্রূকুটিভূষণ আনিয়াছে কেহ, চরণে চঞ্চলতা,
স্ফুরণ এনেছে লোচনকোণায়, বচনে অস্ফুটতা!
কেহ এসে বসি দূরে
সিঁথির সীমায় বাঁকা বিদ্যুৎ আঁকে রাঙা সিন্দুরে।

কেহ অকলুষা আকাশের উষা এসেছে নম্র অতি,
সুন্দরী কেহ সন্ধ্যা-তারকা, কেহ বা অরুন্ধতী!
তবু ভাবি বসে তাই—
আমার আহ্বানে সকলে এসেছে, তুমি শুধু আস নাই

তাজমহলের ধারে

তাজমহলের ধারে বসে ছিনু—মোর ডাক-নাম ধরি
কে যেন ডাকিল! ঘন ঘুম থেকে উঠিল কি বিভাবরী?
নয়ন করিয়া গাঢ়
কে যেন সমুখে আসিয়া শুধালো: 'মোরে কি চিনিতে পারো?'
চমকি চাহিনু: 'কে তুমি, চিনি না; কোথা থেকে তুমি এলে?'
হাসিয়া কহিল: 'আসিয়াছি আমি যমুনার ঢেউ ঠেলে।
ধরো মোর হাত পাঁচটি আঙুলে, বোস এসে এইখানে,
শোনাব তোমারে—যে-কথা কেবল পাষাণ কহিতে জানে!
দেখেছ, উঠেছে চাঁদ,
তোমার স্কন্ধে রাখিব আবার ভুবাহুর অবসাদ!
নিটোল ললাটে তোমার পরশ-জ্যোৎস্না পড়িবে ঝরে,
ননীর কলসে অবনীর স্নেহ এনেছি তোমার তরে।
অচপল অবকাশ—
শ্বাসরোধ করি শোনো একবার পাষাণের নিঃশ্বাস!
অদূরে যমুনা শুকায়ে এসেছে বিরহশীর্ণকায়া,
চেয়ে দেখ দেখি আমার চোখে কি পড়েনি তাহার ছায়া?'
তাজমহলের ধারে
একা বসে ছিনু, কে যেন ডাকিল—চিনিতে নারিনু তারে॥

মেঘনার তীরে

মেঘনার তীরে বাসা বাঁধিয়াছি ছোট একখানি নীড়,
ফিরি করে আর ফিরি না পরাণ, নই আর মুসাফির।
আমার মেঘনা নদী
শুকাইত, ওর সাথে মোর আঁখিজল না মিশিত যদি!
ছোট গ্রামখানি লাজুক শ্যামল নববধূটির মতো,
শূন্যতাভারে বিরহী আকাশ চুম্বনে অবনত।
জেগে বসে মেঘগর্জন আর জলকল্লোল শুনি,
শ্রান্ত শ্রাবণ নয়নে ও নভে, নাই ফুল-ফাল্গুনি।
নদী মাটি মাছি ধান—
আপনার মাঝে শুনি সবাকার প্রাণধারণের গান!
হে বিদেশী নাও, কোথা যাও ভেসে, বারেক আসিবে হেথা,
তোমার কক্ষে যাপিছে কি নিশি আমার মহাশ্বেতা?
মেঘনা মেঘের প্রিয়া,
পরাণের সে যে নাই, এ যে মোর নয়নের আত্মীয়া!
তাহার শিয়রে রূপার প্রদীপ, মৃত্যু শিয়রে মোর,
তাহার আকাশে ঊষা উদ্ভাসে, হেথা হায় ঘনঘোর।
তাহার চন্দ্রহার—
মোর আছে শুধু মেঘলা আকাশ আর জল মেঘনার॥

তবু তুমি মোর মিতা

ভেবেছিনু প্রেম মরিবে একদা মরিল কপট ঘৃণা,
আবার মেলেছি ব্যথার আকাশ, চিনিবে কি উদাসীনা?
তবু তুমি মোর মিতা,
অবিচার করে ক্ষমা করিলাম তোমার এ-দ্বিচারিতা!

জানি আমি জানি আমারো নয়ন হইয়াছে বহুচারী,
যারে ঘরে ডাকি সে-ই এসে দেখে তুমি-ই রয়েছ দ্বারী।
যারে ঘরে ডাকি তারি আগে থেকে কখন পেতেছ ঘর,
হৃদয় আমার পিয়াসী ম.দ-ও, হৃদয় অপরিসর।
তারা সবে চলে যায়,
পায়ে পায়ে বাজে বিদায় বিদায় বিরহশূন্যতায়!
ভালো করে সখি, চেয়ে দেখ দেখি তোমারো মনের কোণে
হেন কোনো ব্যথা নাই যাহা আজো সুখের স্বপন বোনে!
হেন কোনো ভোলা হাসি
জানিতে পারো না—তবু-ও বিরহ রাখিয়াছে উদ্ভাসি।
অতীতের নীড়ে মাঝে-মাঝে ফিরে নাও নাকি বিশ্রাম,
সেথায় তোমার নিজের আখরে লেখা নাই কারো নাম?
জীবন অনেক বড়ো,
ভবিষ্যতের চেয়ে সে-অতীত তবু-ও মধুরতরো॥

শাঙনের গাঙ্

শাঙনের গাঙ্ ভাঙন ধরেছে—এমনি তোমার দেহ,
বুকের সোনার গাগরী ভরিয়া এনেছ কি অনুলেহ!
ময়ূরপঙ্খী তনু
ময়ূরের মত পেখম মেলেছে—দেখিয়া উতলা হ'নু।
প্রবালের ডিবা দুটি ঠোঁটে কি বা প্রবল কামনা মাখি
আমার নয়নে রেখেছিলে তব মদমুকুলিত আঁখি!
গিরিকর্ণিকা কর্ণে দুলিত বক্ষে ললন্তিকা,
দেহদীপাধারে জ্বলিত লেলিহ যৌবন-জয়শিখা!
সব পুড়ে হল ছাই,
তোমার মাঝে যে বিধবা বিরাজে সে কথা তো জানি নাই।
কই তব সেই মণিকঙ্কণ, কই মালাচন্দন,
উদয়-তারার শাড়ি কই সই, কই বেণী-বন্ধন?

আজি সখি গিয়ে দূরে
রজনী ভরিয়া তারার আলোয় খুঁজিছো কি বন্ধুরে ?
বিস্মরণের তীর হতে তবু তোমারেই শুধু দেখি,
সন্ধ্যার ঐ সন্ধ্যাভাষায় মোরে তুমি ডাকিলে কি ?
অন্তরঙ্গতার
সুখসৌরভ আনিল কি বহে মৃত্যু-অন্ধকার ?

ললিতা অপরিচিতা

ঠিক আছে খোঁপা, বারে বারে নাই পরখের প্রয়োজন,
জানি জানি আছে তবু তুটি করে কাঞ্চন-কঙ্কণ।
ললিতা অপরিচিতা,
তেমনি তুমি কি নমিতা সরমে, প্রথম-পরশ-ভীতা ?
কনককুম্ভে কী মদিরা, চারু চটুল চাতুরী চোখে,
তুমি কি পদ্মা নৃত্যমুখরা ফেনিল চন্দ্রালোকে ?
কৃশ কটিতটে বাঁধি অঞ্চল এক পল নহ থির,
চুরি করে কি গো এনেছ কান্তি বিদ্যুৎ-ব্রততীর ?
আমি যে তোমারে চিনি,
কবির চিত্তলক্ষ্মী তুমি যে ক্ষণকালবিহারিণী !
সমুখে দাঁড়াই যদি, তবে আঁখি নাচিবে কি কৌতুকে,
সহসা থমকি শুধাবে কুশল, চিনিবে আগন্তুকে ?
হে অনতিযৌবনা,
আগামী আষাঢ়ে ঘনমেঘভারে আর তোরে হেরিব না।
সেই কত সুখ—বিস্মৃত দিন সৌরভে যাবে মিশি,
তবু বসে জাগি কোজাগরী-তিথি আর কুহু-অমানিশি !
ওগো ও অপরিচিতা,
তুমি কি আমার পরাণবাসিনী মধুমালতীর মিতা ?

নহে শুধু বন্ধুতা

হে অপরিচিতা, মোর কবিতার একটি-ও পড়েছ কি ?
যদি পড়ে থাকো, বলিবে কি তবে কার তুমি প্রিয়সখী ?
বলিবে কি কারে চাহ,
কার কবিতার উৎসের মূলে তুমি চির-উৎসাহ !
কার প্রেম দিয়া প্রসাধন করো তোমার রুচির তনু,
তোমার চোখের সলিলে-হাসিতে কে রচিল রামধনু !
সৃষ্টি করিছ নব-বিধাতারে কার দেহ-মন্দিরে,
কার মায়া মৃগতৃষ্ণিকা তুমি কৃষ্ণতিথির তীরে !
হে তরুণী, কথা রাখো,
যে তব শুক্লতিথির অতিথি, তারে তুমি ফেলো নাকো !
সন্ধ্যায় শুধু সন্ধ্যামণি না, দিবসে সূর্যমুখী,
রজনীতে হয়ো রজনীগন্ধা—সমর্পণেই সুখী !
নহে শুধু বন্ধুতা,
হস্তে তাহার বাঁধিয়ো একটি হলুদ রঙের সুতা !
আমারে ডাকিয়ো তোমাদের ঘরে দিন যবে অবসান,
গাহিব যা পারি মরণোন্মুখ রাজহংসের গান ।
তোমরা ঘুমালে রাতে
এই কবিতার ব্যথাটি রাখিব তোমাদের আঁখিপাতে ॥

অনাগতা

আসুক আকাশে, ভেবেছিনু মেঘ চোখে না নামিবে ফের,
কে জানে আনিবে মৃদু সৌরভ সেই বাঁসি আষাঢ়ের !
ওগো মোর নবাগত
শুনিতে এলে কি, গোপনে তাহাকে বলেছিনু সে কি কথা !

অধরে ধরিয়া এনেছ কাহার রাঙা চুমা উন্মুখ,
খলবলা! চঞ্চল কার স্নিগ্ধস্তনাংশুক!
চোখেতে কাজল এঁকেছ নিঙাড়ি কার নয়নের লোহ,
আত্মীয়তার রসে কে রাখিল অপরিচয়ের মোহ!
হে ব্রীড়াবনতমুখী,
আঁখির কিনারে এনেছ লিখিয়া কার সেই বাঁকা উঁকি!
হে অমৃতলতা! রাত্রির ব্যথা বল আনিয়াছ কার,
কাহার করুণ ক্লান্তি এনেছ স্তব্ধ প্রতীক্ষার!
তুমি বুঝি তারি দূতী,
মাখিয়া দিয়াছে নয়নে তোমার নীরব সহানুভূতি।
আমি চলে যাই।—মানা করিবে কি বাজাইয়া কিঙ্কিনি?
তেমনি থমকি দাঁড়ায়ে রহিবে, দ্বারান্তবর্তিনী!
ওগো মোর অনাগতা,
বলিতে ভুলেছি—ক্ষমা কোরো—তারে বলেছিনু সে কি কথা

কী-ই বা বলিবে কথা

ভালোবাসিবার ভান করিয়ো না, প্রেম আর চাহি নাকো,
শুধু করতলে হাতটি তোমার উপুড় করিয়া রাখো।
কী-ই বা বলিবে কথা,
তব মদকলকূজন থামাও, সুলভ প্রগল্‌ভতা।
নূতন করিয়া কি আর কহিবে, সকলি তো আছে জানা,
প্রেমের প্রমাণ হয় না কখনো, জানো না লজ্জমানা?
যদি ভালো লাগে, মৃত্যুর মতো সরে এসো ধীরে আরো,
স্তব্ধতা দিয়ে অনুভূতিটিরে করিয়া রাখিয়ো গাঢ়।
কোনো কথা বোলো নাকো,
স্পর্শে গভীর তব সুনিবিড় চক্ষু বুজিয়া থাকো।
সন্ধ্যা নামিছে দূর বনপারে গেরুয়া নদীর জলে,
স্বেদ-কণিকার সুখ-শীতলতা দাও মোর করতলে!

বসে থাকা শুধু কাছে—
অপরিণত এ ক্ষণ-বন্ধুতা—এর কি তুলনা আছে ?
গৃহ নাই, গৃহদীপ নহ তুমি, অবকাশরঙ্গিনী ;
বাহুবন্ধনে নহে গো, ছন্দে করিলাম বন্দিনী !
লভিলে অমর কায়া,
এই কবিতার প্রতিটি আখরে পড়েছে তোমার ছায়া

সঙ্কেতময়ী

মুকুরে বসিয়া বেণী বাঁধিতেছ, আঁচল্ পড়েনি খসে ;
যদি আজ যাই, নিশ্চয় চোখ ভরিবে না সন্তোষে।
আজি তুমি কত দূরে—
শুভকামনার প্রদীপ জ্বালিবে একদিন সিন্দুরে !
দু'হাত বাড়ায়ে আকাশ চেয়েছি, চেয়েছি বসুন্ধরা,
একদা চমকি চাহিয়া দেখিব, তুমি এসে দেছ ধরা।
আকাশ আনিয়ো অঞ্চল ভরে, সাগর সাশ্রুচোখে,
স্বল্পক্ষণের তরে মোরে নিয়ো কবির কল্পলোকে।
কোমল দেহাবরণে
সুধার সৌধ লুকায়ে রাখিয়ো অপরিচয়ের ক্ষণে।
সঙ্কেতময়ী ! প্রার্থনা করি, হয়ো না আবিষ্কৃত,
তোমার মাঝারে যেন অনুভবি—জীবন অপরিমিত।
বড়ো করে দাও ঘর,
অরণ্য হতে এনো লাবণ্য—চঞ্চল মর্মর।
ঊষার ভূষণ কোথা পাব, তারা করি নাই আহরণ,
এতদিন শুধু স্বপ্ন দেখেছি—তাই কোরো আভরণ।
অপার সে পারাবার—
গভীর অগাধ স্বাদ নিয়ে এসো অপরিপূর্ণতার ॥

সেই দিনটি

সেই দিনটিরে আজো মনে পড়ে তুমি যারে গেছ ভুলে
মনে নাই জুঁই গেঁথেছিলে কিনা গালভরা এলোচুলে।
আজি সন্ধ্যার তীরে
ক্ষীণায়ু স্বপন-সোনায় রাঙাই সেই ছোট দিনটিরে।
আকাশের মুখ চুন ছিল কিনা—আগাগোড়া মেঘলাই
কিম্বা সেদিন তারকিনী নিশি—তা কিছুই মনে নাই।
ফুলের পুঁটুলি ঠোঁটে ছিল কিনা, পরনে খড়কে ডুরে,
চোখে কি কাজল, আলতা কি ছিল চরণনখাঙ্কুরে,
বসে মোর মুখোমুখি
কিছু মনে নাই খেলেছিলে কিনা লুকোচুরি ফাঁকিজুকি!
সোনার সুতুলি গলে ছিল কিনা, কনকবেতসলতা!
বক্ষের কাছে মুখ এনে তুমি শুনেছিলে সে কী কথা!
হে তনুসঞ্চারিণী!
চোখের দোকানে খুচরো মাশুলে করেছিলে বিকিকিনি!
কিছু মনে নাই, শুধু বসে-বসে সময়ের সুতো কাটি,
মুছে গেছে রেখা, ধুয়ে গেছে রঙ, ভুলে গেছি খুঁটিনাটি।
আমাদের এ নিখিলে
এই মনে আছে—সেই দিন তুমি খুব কাছে এসেছিলে॥

তবুও কাটিবে দিন

চলে যাব একা, আর শুনিব না ভ্রমরের গুঞ্জন,
আর জাগিবে না প্রথম প্রেমের পবিত্র শিহরণ।
আমি কি রে যেতে পারি,
রজনীগন্ধা, বসুন্ধরা ও অন্ধকারেরে ছাড়ি?

আমি চলে গেলে কে আর বহিবে নীল আকাশের ব্যথা,
নীল সাগরের প্রাণবিস্তার, তারার বিনিদ্রতা !
ভঙ্গুর দেহ ভরি কে মাখিবে দুখিনী ধরার ধুলি,
তপ্ত ললাটে কেহ বুলাবে না চম্পক-অঙ্গুলি !
তবু যদি ফিরে আসি
এমনি যেন গো হারাই আবার এমনিই ভালোবাসি।
বিহানের হেনা, বিকালে বকুল, থাকুক অপরাজিতা
সূর্যের সনে সূর্যমুখীর সুদূর কুটুম্বিতা।
রিক্ততা সিন্ধুর
উজ্জ্বল থাক দিগঙ্গনার আর তব সিন্দুর।
থাক প্রজাপতি আর তব সাথি আর তার থাকো তুমি,
নদীটির কোলে থাকুক আমার শ্যামলী জন্মভূমি !
তবুও কাটিবে দিন
যদিও একদা চলে যাব জানি অতি প্রতিনিধিহীন ॥

অমাবস্যা সমাপ্ত ।

সমসাময়িক কবিতা

গ্রন্থাকারে অগ্রথিত

আবিষ্কার

এ মোর অত্যুক্তি নয়, এ মোর যথার্থ অহঙ্কার—
যদি পাই দীর্ঘ আয়ু, হাতে যদি থাকে এ লেখনী,
কা'রেও ডরি না কভু, সুকঠোর হউক সংসার,
বন্ধুর বিচ্ছেদ তুচ্ছ, তুচ্ছতর বন্ধুর সরণি।

পশ্চাতে শত্রুরা শর অগণন হানুক ধারালো,
সম্মুখে থাকুন বসে পথ রুধি' রবীন্দ্র ঠাকুর—
আপন চক্ষের থেকে জ্বালিব যে তীব্র তীক্ষ্ণ আলো
যুগ-সূর্য ম্লান তার কাছে—মোর পথ আরো দূর।

গভীর আত্মোপলব্ধি—এ আমার দুর্দান্ত সাহস,
উচ্চকণ্ঠে ঘোষিতেছি নব নব জন্ম-সম্ভাবনা,
অক্ষরতুলিকা মোর হস্তে যেন রহে নিরলস
ভবিষ্যৎ বৎসরের শঙ্খ আমি—নবীন প্রেরণা।

শক্তির বিলাস নহে, তপস্যায় শক্তি-আবিষ্কার
শুনিয়াছি সীমাশূন্য মহা-কাল-সমুদ্রের ধ্বনি
আপন বক্ষের তলে, আপনারে তাই নমস্কার—
চক্ষে থাক আয়ু-ঊর্মি, হস্তে থাক অক্ষয় লেখনী।

১৩৩৪

বিধাতার মত ভাই

ঠুনকো কাচের বাসন বানাই
বিধাতার মত ভাই,
খেলো বেলোয়ারি যত চুড়ি :
ঘি-র দীপ জ্বেলে ফুঁ দিয়ে নিভাই
বিধাতার মত ভাই,
সংসারে করি রংদার যত রাংতার কারিগুরি।
নাম রাখি ভালোবাসা
চোখের পানিতে বাসি পদুমের পিদিম রয়েছে ভাসা ॥

ভুখের উনানে পরান উনাই
বিধাতার মত ভাই,
যত খুশি বেচি ভুসি মাল,
খুয়ে তাঁতি হয়ে গরদ বুনাই
বিধাতার মত ভাই,
তছনছ করি দোকান-বেসাতি করি সবি পয়মাল,
ভেজাল আড়তদার—
ঘসা পয়সা ও সিসের সিকিতে করি যত কারবার ॥

ভণ্ডুল করি কঞ্জুস মোরা
বিধাতার মত ভাই,
ছেঁদো কথা গেঁথে গাহি গান,
দিলদার নই, দিলগির মোরা
বিধাতার মত ভাই,
ছয়কোট করি চিরকুট পরে খাপছাড়া গদীয়ান,
কাজ নাই গড়ি তাজ
ধসকা মহল ধ্বসে পড়ে—মোরা ফকির ফেরেববাজ ॥

১৩৩৫

চাকা

ঊর্ধ্ব আকাশে ঘুরিছে চাকা
আমরা পৃথিবী-পোকার পাখা,
ঘুরিছে চাকা।
গতি-তরঙ্গে কেহ না মূর্ত,
দ্রুত তরঙ্গ — প্রতি মুহূর্ত,
বিদ্যুৎ-উদ্দাম ;
উপরে মৃত্যু, নিম্নে সময়
উদ্বেল সংগ্রাম।

চক্র ঘোরে—
জ্যোতি-পতঙ্গ সূর্য ওড়ে,
চক্র ঘোরে।
ধাবমান কাল ফেনিলাবর্ত
পরিণতিহীন কী পরিবর্ত,
পৃথ্বী ভিত্তিহীন ;
তিমির-পতাকা মৃত্যুর পাখা
মর্মর-মসৃণ।

নিখিল নিশা
মানুষের আশা হারায় দিশা,
নিখিল-নিশা।
আজি বসি কাঁদে আগামী কল্য
প্রখর-প্রহর-বেগ-চাপল্য
বিস্মৃতি-বিস্তার,
তারায়-তারায় বহ্নি উড়ায়
মৃত্যুর ফুৎকার।

নাই কিছুই—
ছায়ায় মিলায় যাহাই ছুঁই,
নাই কিছুই।
কোথায় দুঃখ, নেয় কে দীক্ষা,
প্রতিকারনাই, নাই প্রতীক্ষা
শুধুই উন্মাদনা—
ক্ষণ-সমুদ্র দুলিছে রুদ্র
লেলিহ ফেনিল ফণা।

নাই সময়—
দোলে ভবিষ্য বিশ্বময়,
নাই সময়।
পারাপারে নাই ব্যগ্র বতি,
পারাবারে তবু অগ্রবর্তী
কোথা নাই সংশয়।
বিশ্রামহীন কল্লোললীন
অজস্র আশ্রয়।

কে চায় পিছে—
প্রতি নিশ্বাসে চাকা ঘুরিছে
কে চায় পিছে।
পরিচয় দিবে কী তব সাক্ষ্য
দিগন্তে ঝড় হানে কটাক্ষ
সঙ্কেত-উৎসুক,
এ তবু দম্ভ—শুধু আরম্ভ
অনন্ত সম্মুখ।

ঘুরিছে চাকা
আমরা পৃথিবী-পোকার পাখা,
ঘুরিছে চাকা।

বিমুক্তবেণী বিপুলা রাত্রি
আমরা চলেছি তীর্থযাত্রী
অস্থায়ী, অস্থির।
প্রাচীরবিহীন সুচির শূন্য
আনন্দ-মন্দির ॥

১৩৩৮

মরুভূমি

প্রজ্বলিতা হে শূন্যতা, পিপাসিনী হে ভৈরবী মরু,
বাজাও বাজাও তব নৈরাশ্যের প্রচণ্ড ডমরু,
যন্ত্রণার কর্কশ ঝঙ্কার,
হে করালী, নৃত্য করো অনির্বাণ রৌদ্রের আহ্লাদে
চিত্তেরে বিস্ফুরি তোলো বালুকা-বিক্ষিপ্ত আর্তনাদে
ভয়াবহ দুঃসহ দুর্বার!

তৃষ্ণার অনলকুণ্ডে স্নান করি' হে রুদ্রা তাপসী,
পবিত্র পাবক-স্তোত্র দিগ্বিদিকে তুলিছ উচ্ছ্বসি
দুর্দাম জ্বালার জয়োল্লাসে,
নবসূর্যে জন্ম দিলে আকাঙ্ক্ষার উদ্দীপ্ত স্তুতিতে
নাস্তিক্য-নির্ঘোষ ঘোষ' শোণিতের শাণিত দ্যুতিতে
নিদারুণ তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে।

দীপ্তরুচি শুভ্রশুচি, খুলেছ কৃত্রিম আবরণ,
বৈরাগিনী, দিয়াছ যে দুর্বল লজ্জারে বিসর্জন—
কী সুন্দর জ্বলন্ত নগ্নতা!
বন্ধন বিচূর্ণ করি দেখায়েছ গুপ্ত ভয়ঙ্করে
আদ্যন্ত সরল ছবি অহোরাত্র বাহিরে-অন্তরে
বিস্তীর্ণ বিপুল লোলুপতা।

হে নির্লজ্জা, জরাহীনা, আপনারে করি' উন্মোচন
দেখাইলে স্বতঃস্ফূর্ত ভীষণ সে অনন্ত যৌবন
প্রতিচ্ছায়া অনন্ত ক্ষুধার,
বক্ষ ভরি' কার তরে সঞ্চিয়াছ বিস্তীর্ণ বিরহ
প্রতপ্ত ললাটে নাই বর্ষার সজল অনুগ্রহ
এক বিন্দু অশ্রুর আসার।

কোনো শষ্প-তৃণ-শস্যে স্তন্য নাহি দিলে হে পাষাণী,
তোমার বক্ষের মুক্ত দুর্ভিক্ষের হাহাকার হানি'
নিরন্তর বিদ্ধ করো কারে ?
প্রতিমা বালুকাময়ী, ধ্যানাসীনা তুমি কার তরে ?
কে সে স্তব্ধ নিরুত্তর, দুঃখে-রুক্ষে রৌদ্রের অক্ষরে
পত্র তবু লেখ বারে-বারে।

মায়াবিনী, হে ছলনাময়ী মরু-ভূমি-মালবিকা,
চোখে কাঁপে দিশাহারা পথভোলা তৃষা-মরীচিকা
আপনারে দেখাও স্বপন,
হে প্রিয়া পিপাসাক্লিষ্টা, জানি কারে করিছ সন্ধান
হেথা এস দুঃখ নিয়ে এই বুকে অগ্নি-অনির্বাণ
পাতিয়াছি বাসক-শয়ন।

মরুভূ অরণ্য হবে, এস তবে এই বুকে, প্রিয়া,
তোমার বিপুল দাহ মোর দুঃখে দাও সঞ্চারিয়া,
জেলে দাও অনন্তের সুর,
দাহে-দুঃখে সে-মিলনে, বহ্নি-প্রিয়া, পূর্ণ অবগাহে
দেখি জন্ম নেয় কিনা আস্পৃহার আতীব্র উৎসাহে
মৃত্যুহীন শ্যামল অঙ্কুর ॥

১৩৩২

আমরা

আমরা পুলিনে বসে শ্রান্ত হই গুনে-গুনে ঢেউয়ের কুসুম
আমাদের ঘুম আসে, সাগরের চোখে নাই ঘুম।
আমরা বেদনা ভুলি দুটি ফোঁটা আঁখিজলে ধুয়ে
তৃষ্ণা মেটে যদি পাই দুটি ক্ষীণ ক্ষণ,
হেসে বুঝি কথা কই যদি ফের হাতে হাত থুয়ে
কেহ ধীরে রাখে চোখে গভীর নয়ন—
ভুলে যাই আঁখি-কোণে লবণাক্ত জলের পিপাসা,
ভুলে যাই সাগরের ভাষা ;
চুলগুলি যদি ফের মুখে এসে পড়ে
ভুলে যাই ঝড়ের সাগরে।

দূরে-দূরে বুজে গেছে মুক্ত সিন্ধু-বিহঙ্গের ডানা
থেমে গেছে ডাক
সে পাখিরো পথ আছে, সে পথেরো রয়েছে সীমানা
আকাশেরে সে কথা জানাক।
আকাশেরো চক্ষু আসে মুদে
মেঘে নামে ঘুম,
সাগর ঘুমায় না তো, জেগে জেগে কথা কয় বিহ্বল বুদ্বুদে
কান্নার কুসুম।

মোদের প্রতীক্ষা ক্ষুদ্র ক্ষণস্থায়ী, নক্ষত্রেরো তাই,
নক্ষত্র নিবিয়া যায়, আমরাও প্রদীপ নিবাই।
রুক্ষ লাগে দিনগুলি, কর্মক্লান্ত ভালে লাগে রোদ
শরীরে আঘাত,
রাত আসে—জেগে-জেগে কত কথা কহিবার রাত
রাত আসে—ঘুম এসে কেড়ে নেয় ঘুমের আমোদ।

তবু জানি সাগরের ব্যথা যাব ভুলে
আবার জড়ায় যদি কেহ এসে আঙুল আঙুলে

এতটুকু আয়ু চাই, ক্ষুধা মেটে মেলে যদি একটি গণ্ডূষ
আমরা সঙ্কীর্ণ অতি, হীন কাপুরুষ।
অন্ধকারে ব্যঙ্গ করি মৃদুশ্বাস প্রদীপ-শিখায়
দুর্ভিক্ষেরো রাখিনা সম্মান,
মরুভূর পারে বসি বারি মাগি নখের কণায়
জীবন বীজন করে, মৃত্যু উপাধান।
চতুর্দিকে স্তূপীভূত ক্ষুদ্রতা ও ক্ষয়,
আমাদের হয় না সময়,
বুঝিবার নাহি পাই ভাষা
সাগরের প্রত্যহের বিপুল প্রত্যাশা।

বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ দীপ্তি আকস্মিকা, চাহিনা সে বেগের ঝঙ্কার
আমাদের ঘিরে আসে পুঞ্জ-পুঞ্জ তিমিরের নিঃশব্দ সঞ্চার,
মিলনে বিতৃষ্ণা আসে, পূর্ণিমান্তে আসে কৃষ্ণ তিথি,
বিরহ বিশ্রাম চায়, ব্যথা চায় বিস্তীর্ণ বিস্মৃতি।
শান্তি আসে তার পরে নির্মম অভ্যাস
দিনের তরঙ্গগুলি শব্দহীন, লঘু, অনায়াস
শান্তি আসে—জরার পসরা,
সাগর তখনো জেগে—ঘুমাই আমরা॥

১৩৩৭

তারে নিয়ে তবু ভালোবাসা

যে দিবস অস্তাচলে চলিল নিঃশব্দ পদচারে
যেতে দাও তারে।
আসুক নমিতনেত্রা, পাণ্ডুম্লান শিথিলকবরী
বিধবা শর্বরী।
নিতল নয়নতলে নিব তারে বরি'।
প্রদীপ নিবায়ে যদি দেয় দিক মৃত্যুর ফুৎকার,
আছে মোর অন্ধ অন্ধকার।

গান যদি থেমে যায়, ছিঁড়ে যদি যায় বীণা-তার,
ঘোচে যদি যাক ঘুচে কথার করুণ ব্যাকুলতা,
মর্মে মোর মর্মরিবে সুরের স্মৃতির হাহাকার
মূর্ছিয়া রহিবে বুকে বিস্তীর্ণ স্তব্ধতা
সুন্দর শূন্যতা।

গোলাপ ঝরিয়া যদি যায়, আছে তো কণ্টক,
বৃষ্টি যদি যায় ঘুচে, মরিবে না তৃষার্ত চাতক।

প্রিয়া যদি যায় চলে, আছে তো মানসী,
অমাবস্যা দেখা দিক, লুপ্ত যদি হয় পূর্ণশশী,
তার তরে কেন বৃথা শোক
নিবিড় তিমির আছে, ডুবে যাক অহঙ্কারী মধ্যাহ্ন-আলোক!

মৃত্যু যদি নাহি আসে, নাহি তাহে দুর্বল ক্রন্দন,
আছে তো বিক্ষত পাংশু পিপাসার্ত বিকৃত জীবন,
তারে নিয়ে কর আয়োজন,
তারে ঘিরি বুনে চল আশা
তারে নিয়ে তবু ভালোবাসা॥

দুই জন

সে দেখে তোমার মাঝে শুভ্র 'আফ্রিদিতি'
সৌম্য শান্ত সুষমায় পূর্ণ-পরিমিতা,
আমি দেখি শূন্যময় আকাশ-পরিধি
ধ্যান-আনমিত দৃষ্টি 'প্রজ্ঞাপারমিতা'।

সে দেখে উদ্বেল রূপ, আমি দেখি রেখা
যে-রেখা সঙ্কেতময়ী দিগন্ত-সীমায়,
তার তুমি উদ্‌ঘাটিত, আমার অদেখা
মোর তুমি প্রতিভায়, তার প্রতিমায়।

তার বাণী, মোর তুমি অনুচ্চার সুর
দুই জনে মিলায়েছি অপূর্ব কী গান—
শ্যামল পৃথিবী আর বারিদ-বিধুর
কল্পনা-রোমাঞ্চময় গগন মহান।

আমি আর সেই জন—মৃত্যু আর মায়া
দুই কূলে দুই স্রষ্টা, হে মধ্যবর্তিনী,
তার ছবি সীমাঙ্কিতা, মোর বিশ্বছায়া,
সে তোমারে চিনিলনা, আমি শুধু চিনি॥

১৩৩৮

এক সত্য

এক সত্য নিত্য নীল মহাকাশ মাথার উপর,
এক সুখ—জীবন অনন্ত প্রশ্ন, মৃত্যু নিরুত্তর।
দৈন্য দ্বেষ দ্রোহ দাহ তার মাঝে একটি বিস্ময়
শীতান্তে বিশীর্ণ শাখে শ্যামলাভ জাগে কিশলয়

১৩৩৯

একেকটি সন্ধ্যা যায়

একেকটি সন্ধ্যা যায়, জীবনের ভাঙা জানালায়
একেকটি পাখি বুজে আসে। স্পন্দমান অন্ধকারে
নেই সেই শব্দময় নিস্তব্ধতা, আকাশ নিরাভ,
রাত্রিময় রোমাঞ্চিত প্রতীক্ষার বহ্নিমান ভাষা
নিবে গেছে তারাদের চোখে, ঘূর্ণ্যমান কালচক্রে
শুনি না সে সঙ্ঘর্ষের সানন্দ গুঞ্জন, নেই সেই
প্রাণসিন্ধুবিস্ফারবেদনা। মাত্র প্রাণধারণের
তিক্ত সেই মধুরতা, লবণাক্ত সে শাণিত স্বাদ
গেছে মরে, তেজস্বী উড্ডীন পক্ষে স্তব্ধ হল আজ
সেই বর্ণচ্ছটাময় যাত্রার জোয়ার। আছি শুধু
রুক্ষকায়া মরু-নদী, দুই পারে বালির বিছানা,
বাঁকা-চোরা ক'টি চাঁদ ভাঙা-ভাঙা জলের উপরে
ম্লানরেখা, স্তিমিত, শীতল ; শুধু ক্ষীণ প্রেতচ্ছায়া
সে প্রথম বেগমত্ততার, ধাবমান উল্লাসের
মৃতশ্বাস, বিশীর্ণ কঙ্কাল। আজ শুধু স্তূপীকৃত
প্রত্যহের কর্মক্লান্তি, রাশীভূত বিমর্ষ বিশ্রাম
অনর্থক, দিনানুদৈনিক ; নেই সেই বিরহের
সীমাহীন মহাকাশে সৃষ্টির উদাত্ত সমুচ্ছ্বাস,
আজ শুধু দিগ্ব্যাপিনী শারীর শূন্যতা। একদিন
যে অমর্তলোকের আলোকে পৃথিবীকে মনে হত
সুচির গোধূলি, যেন স্পর্শাতীত রহস্যধূসর,
সে আলো গিয়েছে অস্ত। সে আধ-উন্মীল ভীরু চোখে
পড়িয়াছে নিষ্ঠুর আঘাত, নির্লজ্জ সে জাগরণ—
তাই আজ রূঢ় গদ্য, স্পষ্ট, স্থূল, প্রত্যক্ষ, বাস্তব
সুকঠিন কুটিল সন্দেহ, জিজ্ঞাসায় সুতীক্ষ্ণ লেখনী
সমাধান-সন্ধান ব্যাকুল। নেই সেই স্বপ্নাভাস,

সে আদিম বিস্ময়ের বিশাল চেতনা, নেই সেই
গভীর মদির মিথ্যা, অপরূপ—অনির্বচনীয়,
নেই আর ছন্দোময় পরমজীবন, লেখনীতে
নেই সেই উত্তেজিত কল্পনার মন্থর গাঢ়তা।
কেন এই অপমৃত্যু? জানো না কি? জানো না কি তুমি?
প্রেম নেই। পৃথিবীতে প্রেম নেই। প্রেম গেছে চলে।

১৩৩৯

সংক্রান্তি

নির্দয় হও, নির্ভয় হও, থাকো দৃঢ় নিঃসঙ্গ,
স্থূল হস্তের স্পর্শে মলিন হবে না ফুলের অঙ্গ।
নিরাপদ দূরে বসে দয়া কার দিও কিছু স্নেহদৃষ্টি,
তাই দিয়ে শ্যাম-সরস করিব জীবনের অনাবৃষ্টি।
মুখখানি থাক অলিখিত লিপি পবিত্রতার সাক্ষ্য
রচন করিও বচনে মধুর কবিতার স্তোক বাক্য।
আমার তাহাতে তৃপ্তি যাহাতে তোমার সহজ শান্তি,
তোমার মাসের প্রথম কেবলি, মোর চির সংক্রান্তি।

১৩৩৯

নীলিমা

দিগন্তে অরণ্য যদি
আকাশের প্রেমে পায় ব্যাপ্তি আর সীমা,
আকাশ বনানী হয়
শ্যামলেরে বুকে নেয় প্রশান্ত নীলিমা॥

১৩৩৯

প্রিয়া ও পৃথিবী

প্রিয়া ও পৃথিবী

নিঃশঙ্ক, নিঃশব্দপদে একদিন এসেছিলে কাছে
ঈপ্সিত মৃত্যুর মত ; নয়নে যেটুকু হ্রু আছে,
অধরে যেটুকু ক্ষুধা—সব দিয়ে লইলাম মুছে
লোলুপ লাবণ্য তব ; দিনান্তের দুঃখ গেল ঘুচে,
উদিলো সন্ধ্যার তারা দিগ্বধূর ললাটের টিপ।
কদম্বপ্রসবসম জ্বলে' ওঠে কামনা-প্রদীপ
যুগ্ম দেহে ; শ্মশানে অতসী হাসে, নিকষে কনক ;
মেঘলগ্ন ঘনবল্লী আকুল পুলকে নিষ্পলক।
কঙ্করে অঙ্কুর জাগে, মরুভূতে ফুটিলো মালতী—
তুমি রতি মূর্তিমতী, আর আমি আনন্দ-আরতি।
দেহের ধূপতি হ'তে জ্বলে' ওঠে বাসনার ধুনা
লেলিহরসনা, তবু কালো চোখে কোমল করুণা।
শুভ্র ভালে খেলা করে তৃতীয়ার ম্লান শিশু-শশী,
তোমার বরাঙ্গ যেন সন্ধ্যাস্নিগ্ধ, শ্যামল তুলসী।
ভুজের ভুজঙ্গতলে হে নতাঙ্গী, নির্ভয় নির্ভরে
তোমার স্তনাগ্রচূড়া কাঁপিলো নিবিড় থরথরে।
স্ফুরৎপ্রবাল-ওষ্ঠে গূঢ়ফণা চুম্বন উৎসুক,
এক পারে রক্তাশোক, অন্য তটে হিংসুক কিংশুক।
শ্লথ হ'লো নীবিবন্ধ, চূর্ণালক, শিথিল কিঙ্কিণী,
কজ্জলে মলিন হ'লো পাণ্ডু গণ্ড, কাটিলো যামিনী।
দূরে বুঝি দেখা দিলো দিগ্বালার রজত-বলয়,
বলিলাম কানে কানে : 'মরণের মধুর সময়।'

আজি তুমি পলাতকা, মুক্তপক্ষ পাখি উদাসীন,
ক্লান্ত, দূরনভচারী দিগন্তের সীমান্তে বিলীন।
বিদ্যুৎ ফুরায়ে গেছে, কখন বিদায় নিলো মেঘ,
অবিচল শূন্যতার নভোব্যাপী নিস্তব্ধ উদ্বেগ

আবরিয়া রহিয়াছে হৃদয়ের অনন্ত পরিধি,
চাহি না ঘৃণিত মৃত্যু, তব গুপ্ত, হীন প্রতিনিধি।
নীবিবন্ধ শিথিলিতে কটিতটে যদিও কিঙ্কিণী
বাজে আজো, কজ্জলে মলিন গণ্ড, তবু, কলঙ্কিনি,
চাহি না অতীত মৃত্যু। নভস্তলে অনিবদ্ধনীবি
ঘুম যায় মোর পার্শ্বে বীরভোগ্যা প্রেয়সী পৃথিবী।
তা'রে চাই; তাহারি সুধার তরে অসাধ্য-সাধনা,
বিস্মিত আকাশ ঘিরি' সস্মিত, সুনীল অভ্যর্থনা,
অজস্র প্রশ্রয়। মৃত্তিকার উদ্বেলিত পয়োধরে
সম্ভোগের সুরাস্রোত ওষ্ঠাধরে উচ্ছ্বসিয়া পড়ে,
শস্য ফলে, নদী বহে, ঊর্ধ্বে জাগে উত্তুঙ্গ পর্বত,
হাস্য করে মৌনমুখে উলঙ্গ, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।
আয়ুর সমুদ্র মোর দুই চক্ষে, মৃত্যু পদলীন,
তোমার বিস্মৃতি দিয়া পৃথিবীরে করেছি রঙিন।
নক্ষত্র-আলোক হ'তে সমুদ্রের তরঙ্গ-অবধি
বহে' চলে একখানি পরিপূর্ণ যৌবনের নদী—
তা'রি তলে করি স্নান, নাহি কূল, নাহি পরিমিতি,
তুমি নাই, আছে মুক্তি,—পৃথ্বীব্যাপী প্রচুর বিস্মৃতি।

১৩৩৯

বিরহ

ওগো প্রিয়া,
শ্যামলিয়া,
মরি মরি,
অপরূপ আকাশেরে কি বিস্ময়ে রাখিয়াছ ধরি'
নয়নের অন্তর-মণিতে—নীলের নিতল পারাবার!
বাঁধিয়াছ কি অপূর্ব লীলাছন্দ জ্যোতি-মূর্ছনার
সুকোমল স্নেহে!

মরি মরি, কি বাসনা রচিয়াছ তনু, শ্যাম, স্নিগ্ধ, দীর্ঘ দেহে
সুগন্ধ-নন্দিত সুষমায় !
পিপাসার অসহ ব্যথায়
দেহের ভঙ্গুর ভাণ্ডে কি অমৃত আনিয়াছ বহি' ;
রহি' রহি'
রক্তিম, চম্পকবর্ণ কি আনন্দ কম্পমান অধর-সীমায় !
যৌবনের সহস্র শিখায়
দেহের প্রদীপখানি পূর্ণ প্রজ্জ্বালিয়া,
সৌরভে-সৌরভে,
এলে প্রিয়া,
লীলামত্ত নির্ঝরের ভঙ্গিমা-গৌরবে
শিহরিয়া ধরিত্রীকে,
লালিত্যের তরঙ্গ তুলিয়া দিকে-দিকে
মুহুর্মুহু ! আলোক-নির্মাল্য ভাসে পুণ্য তব শুভ্র করতলে,
শ্রাবণের লাবণ্যেরে মৌন অশ্রুজলে
মমতায় বাঁধিয়া রাখিয়া,
বক্ষের ভাণ্ডারে কোন দগ্ধ দুঃখ কিম্বা তৃপ্তি, শান্তি, স্নেহ নিয়া
এলে প্রিয়া,
বৈশাখের প্রভাতের মতো !

আমি শুধু ভাবি বসে' বসে'
বেদনা-বিধৌত দুঃখ-মলিন প্রদোষে
আকাশের স্তিমিত তন্দ্রায়,—
অন্তহীন যে অক্লান্ত বিরহ-ব্যথায়
আচ্ছন্ন হইল মোর পৃথিবী, আকাশ,
অন্ধকার, রৌদ্র, বৃষ্টি, বাতাস-নিশ্বাস,
সমুদ্রের কল্লোল-উচ্ছ্বাস,
নক্ষত্রের জ্যোতি-স্বপ্ন-আনাগোনা-পথ,
এ সৌরজগৎ,

ধ্বংসলীন, নামহারা, সদ্যোজাত গ্রহ,—
সে কি প্রিয়া, তোমার বিরহ ?
অহরহ
বিরহের মেঘে এ যে অশ্রুর আষাঢ় ঝরে প্লাবিয়া-প্লাবিয়া,
সে কি শুধু তোমা' তরে, প্রিয়া ?
ব্যথায় ব্যাকুল তীক্ষ্ণ কাঁপে যে পিপাসা এই,
সে কি শুধু চায় তোমারেই ?
তোমারেই করে কি বন্দনা ?
মোর এই নিগূঢ় বেদনা ?

আজ যদি প্রচণ্ড উৎসুকে,
সৃষ্টির উন্মত্ত সুখে,
তোমার বিগাঢ় বক্ষ দ্রাক্ষাসম নিষ্পেষিয়া লই মম বুকে,
কানে-কানে মিলনের কথা কই,
অধরে অধর রাখি' ধরিত্রীর অঙ্কতলে লীন হ'য়ে রই—
তোমার দেহের শুচি রোমাঞ্চের মঞ্জু সমারোহে,
মাধুরী-মদিরা-মোহে
আচ্ছন্ন করিয়া দাও স্পর্শে, গানে, চুম্বনে, ব্যথায়,
সুখঘন ম্লান স্তব্ধতায়,
তবে কি তোমারে পাওয়া হ'য়ে যায় শেষ ?
পূর্ণিমার ইন্দ্রজালে রচিবে আবেশ
অনাদি আকাশ ;
দক্ষিণের নিমন্ত্রণ নিয়ে-নিয়ে দক্ষিণা বাতাস
আসিবে মালতী চাঁপা যূথিকার বনে,
স্বপ্ন হতে জাগাইবে চুম্বনে-চুম্বনে,
বুকের গুণ্ঠন খুলি' কিশোরীরা বিলাবে সৌরভ
দক্ষিণের দিকে-দিকে।
তুমি, প্রিয়া, মোর পানে চেয়ে অনিমিখে
সহসা জড়াবে কণ্ঠে স্নিগ্ধ বাহু-ব্রততী পেলব,

বণ্টন করিবে সুধা বুক হ'তে বুকে,
কভু মত্ততায়, সুখে, ব্রীড়ায়, কৌতুকে !
তখন তোমারে পাওয়া শেষ হ'য়ে যাবে কি গো, প্রিয়া ?
আবার কভু বা আন্দোলিয়া
ঝরঝর বরিষণ,
বৃষ্টির নূপুর বাঁধি উতলা শ্রাবণ
নামিবে, নাচিবে সুখে দেবদারুবনে,
গগনে-গগনে
বাজিয়া উঠিবে মত্ত যৌবনের গুরুগুরু ;
তেমনি মোদের বক্ষ আনন্দে কাঁপিবে দুরুদুরু
বর্ষার সজল সুষমায় ;
তপ্ত, ঘন সান্নিধ্যের সুখ-মত্ততায়
আনন্দ-লুণ্ঠন-লুব্ধতায়
কাটিবে রজনী বারে বারে
অমৃত-সঞ্চারে,
তবে, প্রিয়া, সাঙ্গ হ'বে পাওয়া কি তোমারে ?

তবু কেন, দেখি চেয়ে অহরহ,
কি প্রকাণ্ড, প্রচণ্ড বিরহ
করে' আছে গ্রাস
আমাদের মাঝেকার অনন্ত আকাশ !
নিদারুণ, নির্মম শূন্যতা
একান্তে বহিছে তা'র ব্যঞ্জনার ব্যথা
মুহ্যমান,
অপূর্ণ এ ব্যবধান !
এই মোর জীবনের সর্বোত্তম, সর্বনাশী ক্ষুধা
মিটাইতে পারে হেন নাহি কোনো সুধা
দেহে, প্রাণে, ওষ্ঠে প্রিয়া, তব ;
অভিনব
এ বিরহ আকাশের সমান-বয়সী !

ভাবি বসি',
তোমারেই শুধু আমি ভালোবাসি নাই,
তোমারে তো সদাই হারাই।
জীবনের প্রতি রক্তবিন্দু দিয়া যা'রে আমি চাই,
যুগে-যুগে চাহিয়াছি আমি যা'রে,
বাসিয়াছি ভালো যা'রে গ্রহে-গ্রহে, তারায়-তারায়,
আজি এই নবজন্মে নব-বসুধায়
বিরহের তীব্র হাহাকারে
তাহারেই বেসেছি যে ভালো!
অন্তরজ্যোতিতে দীপ্ত যে জ্বালালো
পূরবের দিক্‌প্রান্তে আনন্দের শিখা,
জ্যোৎস্নার চন্দনে স্নিগ্ধ যে আঁকিলো টিকা
আকাশের ভালে,
ফাল্গুনের স্পর্শ-লাগা মঞ্জরিত নব ডালে-ডালে
সদ্যফুল্ল কিশলয় হ'য়ে
যে হাসে শিশুর হাসি,
কল্যাণী নারীর মতো একখানি দিৎসা বয়ে,
যে তটিনী কলকণ্ঠে উঠিছে উচ্ছ্বাসি'
বক্ষে নিয়া দুরন্ত পিপাসা,
সে আজি বেঁধেছে বাসা
হে প্রিয়া, তোমার মাঝে;
তাই শুনি মুহুর্মুহু তব দেহে ঝঙ্কারিয়া বাজে
অসীমের রুদ্র মহাগান,
ঘুচিতে চাহে না তাই এই ব্যবধান!
মরি মরি,
তোমারে হয় না পাওয়া তাই শেষ করি'!
বিরহের দগ্ধ কান্না কল্লোলিয়া ওঠে অবিরাম,
তোমার দেহের তটে সব প্রেম হয়েছে প্রণাম॥

১৩৩২

নারী

এ মোর একার গর্ব আজি এ নিখিলে,—
তুমি যাহা নও,—তাই, তাই তুমি মোর কাছে ছিলে।
এ মোর একার অহঙ্কার।

তুমি ছিলে কায়াহীন, নিশ্চল, নীরন্ধ্র অন্ধকার—
তা'রি মাঝে অমর্তলোকের বিভা
খুঁজিয়া করেছে আবিষ্কার
একমাত্র আমার প্রতিভা।
তুমি ছিলে কলঙ্কিনী অমা,
হেরিলাম তা'রি মাঝে আমি শুধু পূর্ণিমার সম্পূর্ণ সুষমা—
একমাত্র আমি।—এই গর্ব মোর।
যাহা নও,—তা'রি স্বপ্নে রেখেছিনু তোমারে বিভোর।
তুমি কভু জানিতে না কি তোমার দাম,
আমার চোখের জলে তাই দেখালাম।
বিধাতার সৃষ্টি তুমি, হে নিরাভরণা নারী,—বাসনার সোনার প্রতিমা,
কারারুদ্ধা,—চতুর্দিকে বন্ধনের সীমা :
ক্ষণিকা ও ক্ষীণ।
মোর প্রেম-স্বর্গ হ'তে পরম উৎসর্গ-পত্র লভিলে প্রথম যেই দিন,
লভিলে বিস্তীর্ণ মুক্তি,—আপন আয়ত্তাতীত, অপূর্ব মহিমা,
বিরাট সম্মান;
মোর কণ্ঠ-মাল্য-দানে তোমারে করেছি মূল্যবান।
মোর বুকে বেজেছিলো তব ক্ষুদ্র ব্যর্থতার ব্যথা।
মণ্ডিত করেছি তোমা' উদ্বৃত্ত ঐশ্বর্যে মোর—দিয়েছি অনন্ত সম্পূর্ণতা।

বিধাতার সৃষ্টি তুমি, হে লীলাললিতা, কান্তা, কামাক্ষী কামিনী,
রাশীকৃত চুম্বনের ফেনা—

মোর কাছে চিরজন্ম, চিরমৃত্যু র'বে তুমি ঋণী,
তুমি যাহা,—মোর কাছে তুমি তা ছিলে না।

পুরুষের কাম্য তুমি, জীর্ণ কাব্য তুমি বিধাতার,
সেই কাব্য একদিন মোর হস্তে লভেছিলো নবীন সংস্কার।

তুমি স্থূল, সুপ্রত্যক্ষ,—সন্ধান করিছে তোমা' উদগ্র ইন্দ্রিয়,
তুমি প্রয়োজন :
স্পর্শের রোমাঞ্চ-হর্ষে আমি শুধু লভিয়াছি অকূল অমিয়—
মানস-আকাশে তোমা' রাখিয়াছি করি' চিরন্তন
হে অচিরদ্যুতি,
শুনিয়াছি তব মাঝে স্বর্গের কাকুতি।

অনন্ত মৃত্যুর তীরে তব তরে রেখেছিনু স্নেহদীপশিখা,
নিকটে আছিলে যবে, ডেকেছিনু—ওগো সুদূরিকা।

তুমি নারী মানুষের বিধাতার, শুধু মোর নহ,
তবু তোমা' দিনু ভিক্ষা,—কবির বিরহ—
শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।
এ নিখিলে এ গর্ব তোমার।

১৩৩৫

লীলাবধূ ও আত্মাবধূ

সুন্দর সিন্দুরবিন্দু গৌরভালে মহিমা-উজ্জ্বল,
শুক্লাপাঙ্গে বক্রভঙ্গি, কি আনন্দ পক্কবিম্বাধরে !
অলক অবেণীবদ্ধ, সমীকরণ চুম্বনচঞ্চল,—
দু'টি নব-বলয়িতা বাহুলতা ব্যগ্র কা'র তরে !
চটুলোল চারুনেত্র, কি বিচিত্র ভ্রূলতাবিভ্রম !
মঞ্জুল যৌবনকুঞ্জে উগ্রগন্ধ ফুটেছে বকুল ;
বিকচ, রুচির গণ্ড স্ফুটোন্মুখ, কবিমনোরম,
মুখ-পূর্ণিমার পার্শ্বে অমাবস্যা কালো এলোচুল !
তুমি রতি লীলাবধূ, ছন্দোময়, কান্ত পদাবলী,
স্ফুটফেনা স্রোতস্বিনী উত্তরঙ্গ, যৌবন-উন্মদ ;
গৃহাঙ্গন মুখরিছে নিত্য তব কঙ্কণ-কাকলী,
সান্ত্বনার হেমপাত্র উরসের যুগ্ম কোকনদ !
কোথা গৃহ-শকুন্তলা নম্রমুখী বল্কলবসনা,
আমার প্রেয়সী বুঝি পলাতকা, যৌবনে যোগিনী ;
আজিও সে নেত্রে বহে মোর তরে নির্বাক প্রার্থনা,
আজিও প্রতীক্ষমানা মোর তরে সে অভিমানিনী !
পাণ্ডুরচন্দ্রিকাবর্ণা, কৃশতনু, ক্লেশরেখা ভালে—
কোথা মোর আত্মাবধূ, হায় কোথা কণ্ঠমণি মোর !
অমৃতের ভাণ্ড আছে মৃত্তিকার মৃত্যুর আড়ালে,
তা'রি তরে চিরকাল জাগে মম লোচন-চকোর ॥

১৩৩৫

স্বপ্ন

তখন অনেক রাত দেখিলাম অদ্ভুত স্বপন
পৃথিবীর পার হতে বহুদূর আসিয়াছি চ'লে
যেখানে ফলেনা শস্য, তৃণহীন বালির আঁচলে
বহে না নিরালা নদী, বহে না দক্ষিণ সমীরণ।
অনভ্র আকাশ রুক্ষ অবারিত উলঙ্গ দুঃসহ
পরিব্যাপ্ত শূন্যতায় উচ্ছ্বসিছে স্তব্ধতার গান
যেথা স্পর্শ-প্রতীক্ষায় প্রাণ নহে শিহরায়মান
যেথায় পুঞ্জিত মোর মৃত-মৌন বিস্তীর্ণ বিরহ।
সেখানে দেখিনু তোমা, শুভ্রতার জ্বলন্ত বিস্ময়
একাকিনী শুয়ে আছ, সৌন্দর্যের রজত তুষার,
সেথা আর কেহ নাই, নাই মৃত্যু, নাই বা সময়,
আলোর কণিকা নাই, নাই কণা কালো অন্ধকার
সেথায় দেখিনু তোমা অব্যাহত অস্পৃশ্য বিরতি
শুয়ে আছ একাকিনী নির্বসনা বাসনার জ্যোতি॥

১৩৩৫

রাত্রি ও প্রভাত

অন্ধকারে শুনিলাম সর্ব অঙ্গে অরণ্য-মর্মর,
লীলায় তরল তনু, পিপাসায় পিচ্ছল, সর্পিল,
সকল প্রচ্ছন্ন রেখা বিস্ফুরিলো শাণিত, প্রখর,
লাবণ্যের জলধারা ভঙ্গিমায় উজ্জ্বল, উর্মিল।
প্রদীপ নিবেছে, রক্তে জ্বলিতেছে রোমাঞ্চের দ্যুতি,
নিঃশব্দ-মুখর দেহ পরস্পর প্রতিধ্বনিমান ;

অন্ধকারে তারকার শুনিতেছি মুক্তির কাকুতি,
সকল প্রশ্নের শেষে মিলিয়াছে সম্পূর্ণ সন্ধান।
নিঃশেষ তোমার মূল্য, মনে হ'লো তব লজ্জালুতা
তৃষ্ণারি অব্যক্ত ছটা, তুমি যেন স্নায়ু আর শিরা ;
যৌবনের বন্যতায় বিস্তারিছে লাবণ্যের লুতা,
যজ্ঞের আহিত হবি—বহিতেছো রুধির-মদিরা।

আবিল বন্যার শেষে তমস্বিনী রাত্রি হ'লো ভোর,
নেমেছে নতুন আলো গৃহচূড়ে, জানালায়, খাটে ;
জেগে উঠে দেখিলাম নম্র চোখে, সেবায় বিভোর,
পূজার সে-ফুল ক'টি থরে-থরে সাজাইছ টাটে।
নির্মল দু'খানি হাত শুচিতায় শিশির-উছল,
গায়ে-গায়ে স্খলিতেছে নরম গরদ ; দুই কাঁধে,
ঈষৎ আনত পিঠে, ক্ষীণোন্নত বুকে, অবিরল
সদ্যস্নাত চুলগুলি চূর্ণ হ'য়ে পড়েছে অবাধে।
স্তব্ধ হ'য়ে চাহিলাম ক্ষণকাল বিস্মিতের মতো,
সেই তুমি ? ছায়াচ্ছন্ন, নিরুচ্ছ্বাস তনুর আবেশ :
প্রভাতের পানে চেয়ে মোর রাত্রি নিমেষ-নিহত,
তোমারে চিনি না যেন, তুমি যেন আবার অশেষ॥

১৩৩৯

তোমারে ভুলিয়া গেছি

তোমারে ভুলিয়া গেছি,—পরিপূর্ণ, পরিতৃপ্ত আজি মোর মন,
আমার মুহূর্তগুলি উড়ে' চলে লঘুপক্ষ বকের মতন!
তোমারে ভুলিয়া গেছি—নভচারী শ্রান্ত ডানা ধীরে বুজে আসে
কূলের কুলায়ে হায়—কুয়াশার ঘুম ভাঙে চৈত্রের বাতাসে।
শ্মশান ঘুমায়ে আছে, আষাঢ়ের অশ্রুজলে নিবে গেছে চিতা,
শীতার্ত বিশীর্ণ নদী—নাহি আর আবেগের অমিতব্যয়িতা!
হাতে আজ কতো কাজ: ভুলে' গেছি কখন ফুটেছে ছোট জুঁই,
ক্ষুদ্র গৃহনীড় ছেড়ে কখন বিদায় নিলো চটুল চড়ুই!
তোমারে ভুলিয়া গেছি—উদ্বেগ-উদ্বেল তনু লভেছে বিশ্রাম,
প্রতীক্ষার ক্লান্তি হ'তে লভিয়াছি শূন্যতার আরোগ্য-আরাম।
রৌদ্রের দারিদ্র্য মাঝে ভুলে' গেছি নক্ষত্রের মধুক্ষরা চিঠি,
গায়ে-হলুদের দিনে, ভুলে' গেছি, পরেছিলে হলুদ শাড়িটি।
দ্বার রুদ্ধ করি নাকো—জানি আর বাজিবে না ভীরু করাঘাত,
রজনীর সুপ্তিশেষে জানি শুধু দেখা দিবে প্রসন্ন প্রভাত।
তোমারে ভুলিয়া গেছি—জীবনেরে তাই যেন আরো বড়ো লাগে,
অনুর্বরা মৃত্তিকার রুক্ষদেহ ভরে' গেছে আতাম্র বিরাগে!
তোমারে মানায় কি-বা সিন্দুরেতে, কে বা জানে! হাতে এতো কাজ!
বেদনার অপব্যয়ে গড়িব না, ভয় নাই, বিরহের তাজ!
ছিলাম সঙ্কীর্ণ গৃহে, চলে' গিয়ে, ফেলে গেলে এত বড়ো ফাঁকা,
আমার কানের কাছে মুহুর্মুহু বেজে চলে মুহূর্তের পাখা।
তোমারে ভুলিয়া গেছি,—কে জানিতো এর মাঝে এতো তৃপ্তি আছে,
আমার বক্ষের মাঝে মহাকাশ বাসা বেঁধে যেন বাঁচিয়াছে॥

কবিতা

আমি জেগে কাব্য লিখি, ঘুমে লীন তোমার দেহটি,
রিক্ত করতল,
অধরে অন্তিম চাঁদ, স্রস্ত বেণী, অবসন্ন কটি,
আলুল আঁচল।

প্রাপ্তির পৃথিবী থেকে অতৃপ্ত নভের খুঁজি পার,
নাই, তবু ফিরি ;
মৌনময়ী বাণী কি গো মূর্ত প্রান্তে সলজ্জ শয্যার,
সুর কি শরীরী ?

অগণন দেবতারে পূজি ভাবি, নহি দেহসেবী,
সৃজি স্নিগ্ধ নীড় ;
প্রস্তরের বেদী ছিলে, মোর ধ্যানে হও তুমি দেবী-
মদির মন্দির।

তোমারে উত্তীর্ণ হ'বো সেই ভয়ে হাত রাখি হাতে,
তবুও বিরহী—
তারার তরণী চলে, একা আমি—জানো না কি তা'তে
নিঃসঙ্গ আরোহী।

কামনার দীর্ঘশ্বাসে শ্লথ অবগুণ্ঠ পড়ে খসে'
হে সীমা-লাঞ্ছিতা,
তাই জেগে অর্ধরাতে চুপি-চুপি লিখিতেছি বসে'
কোমল কবিতা।

আমার রোমাঞ্চ দিয়া গড়িতেছি নতুন আকাশ
নব অনুভব :
আমি তুমি কেহ নাই—আদিম অনন্ত অবকাশ
মূর্ছিত, নীরব।

সে মৌন মনস্থ করি' আবির্ভূতা কে একটি নারী
নাহি তা'র নাম,
প্রথমা সে প্রিয়া নহে, নহ তুমি জীবনবিহারী ;
তবু চিনিলাম।

লঘুছায়াসঞ্চারিণী, ক্ষণাশ্রিতা—জানি আমি জানি
হাতে তা'র শিখা ;
পথে চলি অন্ধকারে, দূর হ'তে দেয় হাতছানি
নেপথ্য-নায়িকা ॥

আশ্বাস

সভ্যতা শ্মশান-ভস্ম
রক্তলিপ্ত ধরণীর ঘাস,
তবুও আকাশে হেরি
নীল শান্ত অভ্রান্ত আশ্বাস

একটি স্তব্ধতা

যতো কথা বলেছিলে ভুলে' গেছি সব কথা তা'র,
যাহা কিছু বলো নাই শুনি তা'র নিঃশব্দ ঝঙ্কার।
কথার করুণ চাঁদ ঘুমাইতো অধরের কোলে,
ছোট-ছোট কথাগুলি উদ্ভাসিতো কবোষ্ণ কপোলে।
উড়িতো কথার পাখি নয়নের নভে অগণন,
চুলে তব মর্মরিতো এলোমেলো কথার কানন।
নামিতো কথার জ্যোৎস্না, ভরে' যেতে রাশি-রাশি ফুলে,
উচ্ছল বুকের মুখে, অনর্গল ভুরুতে আঙুলে।
রেখায়-রেখায় কথা, লীলায়িত, আঁকাবাঁকা সাপ :
মেলিতে শরীরময় রোমাঞ্চিত কথার কলাপ।
প্রেমের মরুভূ 'পরে উড়াইতে কথার সিকতা,
সে-সকল ভুলে' গেছি, ভুলে' গেছি সব তা'র কথা।

আজ যদি কোনদিন তব কথা পড়ে মোর মনে,
স্তব্ধতার শব্দ শুনি মৃতপক্ষ পাখির গগনে।
তোমার ছবিটি আজ রেখাহীন, নিশ্চিহ্ন, ধূসর,
জেগেছে কথার জলে স্তব্ধতার শাদা বালুচর।
কী ললিত লতা-ভঙ্গি রেখেছিলে শাড়িতে জড়ায়ে,
লাল, নীল, মনে নাই, কী ব্লাউজ দিয়েছিলে গায়ে ;
চুলগুলি খোঁপা-বাঁধা, না-বা ছিলো কাঁধে অগোছালো,
মুখে এসে পড়েছিলো কা'র ম্লান চুম্বনের আলো ;
ঠোঁটের হাসির 'পরে স্বপ্নসম সুষুপ্ত বেদনা,
বিষের মতন মধু কোনো আশা ছিলো কি ছিলো না
সব তা'র ভুলে' গেছি। আছে শুধু একটি স্তব্ধতা,
তা'র তীব্র শূন্যতায় শুনিতেছি উজ্জ্বল শুভ্রতা॥

দূরের মেয়ে

তোমারে চিনি না, তাই বুঝি আজ
এতোই দূর :
জানো না কি তুমি সেই পরিচয়
কতো মধুর ।
চোখ দু'টি তব ঠাণ্ডা, নীরব,
গা থেকে গড়ায় রুপালি গরব,
নিজের কঠিন দেহের আড়ালে
আছো আপনি :
দেয়ালে কখনো ফুটবে না যেন
প্রতিধ্বনি ।

কিন্তু কে জানে মিললে আমার
চোখের কণা,
ঘটে' যেতে পারে তোমার জীবনে
দুর্ঘটনা ।
এ উদাস মেঘ চলে' যেতে পারে,
তনুর তুষার গলে' যেতে পারে,
চোখের দু' পাতা স্বপনের ভারে
আসবে নেমে,
এক নিমেষেই পড়ে যেতে পারো
আমার প্রেমে ।

আসবে কখন সোনার সময়
আছে কি ঠিক ?
জাগবে তারকা দেহের আঁধারে
আকস্মিক ।

ঝিরঝির করে' গায়ে দেবে হাওয়া,
উঠবে রসিয়ে নয়নের চাওয়া,
ধারালো তনুর রেখায় ঝরবে
লীলা পিছল,
আঙুলের মুখে মুখর হৃদয়
কথা-চপল।
আকাশের নিচে কখন কী হয়
যায় না বলা,
হয়তো শুনবো আমারি দুয়ারে
তোমার গলা।
হয়তো চমকে দেখবো হঠাৎ,
আমার দু' কাঁধে রেখেছো দু' হাত ;
'হ'তেই পারে না'—বলতে কি পারো ?
বলা কি যায় ?
সময়-কখন ডাক দিয়ে যাবে
তা র পাখায় !

সেই যদি তুমি একদিন মোর
আসবে কাছে,
মিছিমিছি তবে দেরি করে' বলো
লাভ কি আছে ?
জানো তো মোদের নেই বেশিক্ষণ,
আসবেই যদি, এসো না এখন,
বিকেলের আলো ফিকে হ'য়ে আসে,
ঘন, ঘোলাটে,
তুমি নাই এলে কী করে' বলো এ
সময় কাটে ?

বলো তো না-হয় আলোর শিখাটি
দেবো কমিয়ে,

নেহাৎ চাও তো, দূরেই না-হয়
বসবে, প্রিয়ে !
না-হয় কিছু-না বললে কথায়,
শুনবো তনুর উদ্বেলতায় ;
শাড়িতে জড়ানো শরীর-লতায়
জ্বলবে বাতি,
থাকুক না-হয় আমাদের ঘিরে
অচেনা রাতি ।

পারতো যা হ'তে, কী হয় তা হ'লে ?
হ'লোই বা না,
মুহূর্তে ফের উড়ে' চলে' যাবে
মেলিয়া ডানা ।
চুল বাঁধো নাই, কী-বা এসে গেলো,
গায়ে-গায়ে থাক শাড়ি এলোমেলো,
পা দু'টি আজকে নাই-বা রাঙালে
আলতা-রাগে,
আসবেই যদি, এলেই না-হয়
দু' দিন আগে ॥

১৩৩৭

সার্থক

কোনো ক্ষোভ কোরো নাকো, যাহা আছে তাই শুধু আনো,
জানি যা এনেছ তাহা নিতান্তই ভেজাল, পুরানো,
জীর্ণ আবর্জনা,
ভয় নাই, তবু তাহা ফিরায়ে দিবো না।

যে-কলঙ্ক শুভ্রগণ্ডে এঁকে দিলো প্রেমিকের প্রথম চুম্বন,
আমার চুম্বন-চিহ্নে সে-কলঙ্ক করিবো মোচন।
যদি চাহ, মোর তরে আলিঙ্গন করিয়ো বিস্তার—
আকুলকুন্তলে!
ঢেকে দিবো সব লজ্জা প্রথম দিনের তব প্রেমিকের সে-আত্মহত্যার
এ বাহুর তলে।
বারম্বার তা'রি মন্ত্র জপ করি তব কানে-কানে :
'ভালোবাসি, নিত্য ভালোবাসি'—
তা'রি 'পরে নিই শোধ যে তোমারে বিঁধিয়াছে পরম, নির্মম অপমানে
নিজে রহি' নিরালা, উপাসী!
নিজেরে বঞ্চিত রেখে আঘাত করেছে তোমা' সেই যে নিষ্ঠুর,
তোমার সীমন্তে আমি তা'রি রক্তে এঁকেছি সিঁদুর।
তোমার প্রথম স্পর্শ তা'র কাছে লাগে নাই হিম,
তাই কভু ভাবি নাকো তুমি ক্রুর, কৃপণ, কৃত্রিম।
মুগ্ধ তা'রে করেছিলো তোমার ও-রূপ,
তাই তো করিতে নারি কঠিন বিদ্রূপ ;
সব করি ক্ষমা—
তোমার ভাণ্ডার শূন্য,—জানি সবি—রমা নহ, শুধু মনোরমা।
তবু কিছু মানি নাকো ক্ষতি,
তুমি আছো, আমি আছি, আর আছে দেহ-ভোগবতী,
সুন্দরী অসতী।
আনো আনো যা দিবার, ভয় নাই, কিছু ফেলিবো না,
এ ক'দিন সঙ্গোপনে যাহা কিছু করেছ রচনা,—

চটুল কপটপটু চাহনি,
বাসনার খনি।
আনিয়ো না শুধু সেই অতীতের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি।
আনিয়োনা ভাঙা বাসা,
সেই ক'টি ভীরু আশা,
সেই দু'টি অর্থহীন কথা,
সেই সে মধুর নিষ্ফলত।
তুমি মোর, আর কারো নহ,—
ভুলিয়ো না এই সত্য ; ভুলে' যেয়ো আদিম বিরহ

১৩৩৫

জটিল

নভস্তল ছিল নগ্ন, নীল,
তারপর অন্ধ হ'ল মেঘে ;
তেমনি আমার এই ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ আরণ্য আবেগে
সহজ তোমারে সখি, অকারণে করেছি জটিল
বড় বেশি বলেছিনু কথা,
সেই স্রোতে ধুয়ে গেছে তোমার সমস্ত সরলতা—
রৌদ্রের মতন যাহা স্পষ্ট আর
অস্ত্রের মতন যাহা নির্ভুল ধারালো।
সূর্যের সম্মুখে বসি জ্বালালাম মৃত্তিকার আলো।
বড় বেশি এঁকেছিনু ছবি,
মরুভূর তপ্ত রক্তে ভাবিলাম মদিরা মাধবী।
তাই কভু ভাবি নাই দীপ্তি পেতে দগ্ধ হও
চেতনার চিতা!
আমার ব্যথার রঙে রাখিনু তোমারে চিত্রার্পিতা।

তারপরে দূরে থেকে অতি-সন্তর্পণে
হেরিতে গেলাম মুখ ম্লান তব নখের দর্পণে।
দেখিলাম, সিক্ত শ্যাম মৃত্তিকার পর
অনুর্বর, নিষ্ঠুর প্রস্তর।
তবু, হায় চিত্ত নির্বিরোধ,
বলিলাম, অতীব দুর্বোধ।
আমারি মূর্খতা সবি জানি তা, নচেৎ
তোমারে খুঁজিব বলে' খুঁজিতাম নাহি শুধু তোমার সংকেত।
তার চেয়ে এড়ায়ে সর্পিল গলিঘুঁজি
অন্ধকার রাজপথে তোমারে দিতাম ডাক নির্লজ্জ, নিঃশব্দ সোজাসুজি,
ভীষণ সংক্ষেপে ;
চোখে না আসিত বাষ্প, কণ্ঠস্বর না উঠিত কেঁপে,
দুই হাতে না আসিত দ্বিধা,
হীনমনা চোরের মতন, নাহি দেখে ফিরিতাম আংশিক সুবিধা,
তীরের মতন দ্রুত,
সম্মুখে অপরাভূত,
বীতনিদ্র বীর,
দুই হাতে দুই প্রাণ দুই মুষ্টি আরক্ত আবীর—
তা হলে ছুরির কাছে লাল রক্ত যেমন তরল,
তেমনি সিদ্ধান্ত হ'ত, কত তুমি সহজ, সরল,
কত তুমি নিতান্ত নিকট,
কত তুমি স্পষ্ট অকপট।

তাহা হ'লে আজিকার মোর এ নিখিল
নাহি হ'ত গ্রন্থিল, জটিল॥

একদিন

আমাদের দুই হাত কর্মক্লান্ত, কিণাঙ্ক-কঠিন,
ঘিরে আছে চারিধারে ম্রিয়মান মুহূর্তের ভিড় ;
দিনগুলি একটানা, ধরা-বাঁধা, অভ্যাস-মলিন,
রক্তে গাঢ় মদিরার নাই সেই তীব্রতা নিবিড়,
মৃৎ-পাত্র দেহ আজ, নাই সেই কামনার শিখা,
উর্মিল সমুদ্র নয়, পায়ে-পায়ে খুঁজি মৃত তীর,
ক্ষুধায় ধুসর জিহ্বা, জীবনের সমাপ্তি জীবিকা।
অকস্মাৎ একদিন কোথা থেকে আসে যে সময়,
শ্মশানের কূল হ'তে সদ্যোজাত ফুলের আঘ্রাণ ;
আকাশে দেখি না সীমা, তারস্বরে তারারা কী কয়
বুঝি না তাহারো ভাষা, তবু দেহ গীতদীপ্যমান।
সৃষ্টির উড্ডীন পক্ষে আমি আছি,—আমি এক তিল,
একদিন,—তারপরে দিন নাই, দিনের মিছিল॥

১৩৩৯

প্রেম

কী করে দেখাবো প্রেম যদি দেহ রহে নিরুত্তর,
শাণিত শোণিতে যদি নাহি পায় উষ্ণ উন্মাদনা,
ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রজালে নহে যদি আচ্ছন্ন প্রহর,
তবু প্রেম ? প্রেম নহে কায়াহীন কথার ছলনা।
আমার এ-প্রেম, সখি, কামনা সে নিরবগুণ্ঠনা,

উদ্বেলিত উদধির ফেনিল রুধির ; মোর গান
দেহের দুর্দান্ত দাহ, অস্থিময় অস্তিত্ব-চেতনা ;
আমার শরীরে সখি, সীমাহীন প্রেমের প্রমাণ

প্রেম নহে ভাবপদ্ম, প্রেম শুধু আমার শরীর :
আমি তা'র চিত্রবহা, মর্তরূপ, আমি তা'র চিতা ;
আমার শরীরে সখি, মুহুর্মুহু মদির নদীর
তরঙ্গসঙ্ঘাততীক্ষ্ণ বেগোময় উলঙ্গ শুচিতা।
দেহেরে নিরুদ্ধ করি' এ-প্রেমের কোথা পাই ভাষা ?
কী করে' বোঝাবো তা'রে ? দেহে তার প্রকাশ-পিপাসা ॥
১৩৩৯

রহস্য

বলিতে পারো কি কেহ কেন এই বসুন্ধরা সমুদ্র-সুনীল,
এত স্বাদ অন্ধকারে, এত স্বাদ গহনের ঘন অন্ধকারে,
বলিতে পারো কি কেহ কী কারণে কাননের সবুজ কিনারে
একাকী শীতল চাঁদ নিদ্রাহীন শুভ্রতায় জাগে অনাবিল ?
কেহ কি বলিতে পারে কেন তব দেহ ভরি হয়েছে পিচ্ছিল
লীলার ললিত ধারা, কেন তব দুই স্তনে তপ্ত অভ্যর্থনা,
কেহ কি বলিতে পারে কেন মোর দীর্ঘমান এ গীতবেদনা ?

তোমারে বাসিব ভালো, জানো না কি একদিন হারাব আবার
শরীরে সঞ্চীয়মান তাই তব পুঞ্জ-পুঞ্জ আগ্নেয় নগ্নতা
সমুদ্রে ফেনিল ঝড়, শীত-রিদ্ধ অরণ্যের রোরুদ্যমানতা,

বিপাণ্ডুর চন্দ্রলেখা, কখনো বা বিছানায় নিঃস্ব অন্ধকার
তোমারে বাসিব ভালো তাই মোর দীপ্যমান তৃষ্ণার্ত আত্মার
অসমাপ্য অন্বেষণে পৃথুতর এ পৃথিবী ক্রম-পলাতক,
তোমারে পাব না তাই এ জীবন চিরন্তন সুন্দর সার্থক ॥

১৩৩৯

প্রাণ-জাহ্নবী

জটিল জটার জালে বন্দী করে' রেখো নাকো মোরে, ওগো কবি,
বিস্তৃত করিয়া দাও বিশ্বমাঝে বন্ধহারা এ প্রাণ জাহ্নবী !
আমারে আকাশ করো, অবারিত নির্নিমেষ নিঃসীম নীলিমা,
তব মুক্ত উচ্ছ্বসিত অন্তরের আনন্দ প্রতিমা :
নক্ষত্রের শোভাযাত্রা, সূর্যের দুর্ধর্ষ বেগ, গ্রহের নর্তন,
কম্পিত করুক মোর তীব্রজ্যোতি অনাবৃত উদার জীবন।
প্রতি রজনীর দীর্ঘ-নিশ্বসিত ব্যথা,
দগ্ধ দুঃখী দিবসের দীন নিঃসঙ্গতা,
আমার জীবন ভরি' হউক ছন্দিত,
প্রত্যেক পুষ্পিত লতা সৌরভ-বেদনা-রসে মোর অঙ্গে হউক স্ফুরিত,
চুম্বন- স্খলিত !
যে তারা কাঁদিয়া ওঠে শূন্যে অন্ধকারে,
সে কান্না বাজুক মোর দেহ-বীণা তারে
অপূর্ব ঝঙ্কারে !
যে পাখি যাত্রার সুখে পাখার আনন্দ ছন্দে ভুলিয়াছে পথ,
ভুলিয়াছে কি বা মনোরথ,
শুধু দুই ডানা মেলি দূর পানে চলিয়াছে ভাসি'
সে পাখি আমার বুকে হয়েছে উদাসী।

গর্ভ-গৃহে ক্ষুদ্রতম জীবাণুর জনম-প্রত্যাশা
মোর প্রাণে বাঁধিয়াছে বাসা।
আমারে ধরণী করো, বিস্তৃত-অঞ্চল শান্ত স্নিগ্ধ শ্যামলতা,
বিরাট সহিষ্ণু স্থির স্পন্দনহীনতা।
প্রতি শ্যামশষ্পশিশু জন্ম পা'ক আমার শরীরে,
প্রতি পুষ্প গন্ধ পা'ক স্নান করি' মোর স্নিগ্ধ অশ্রুর শিশিরে ;
প্রতি বৃষ্টি-বিন্দুপাত প্রতি রোমকূপে মোর আনুক পিপাসা,
দুরন্ত দুরাশা!
যে সন্ন্যাসী তোমা' লাগি হয়েছে বৈরাগী, গাত্রে মাখিয়াছে ধূলি,
সংসারে হয়েছে পথহারা ;
মোর গৃহে দেখি যেন গৈরিক-রঞ্জিত তা'র ছিন্ন ভিক্ষাঝুলি,
জীর্ণ একতারা!
যে ব্যথার স্তোত্র ওঠে বন্দী মানবের প্রাণে জীবনের অমানিশা ভরি',
সে প্রার্থনা নেত্রতলে রাখিয়াছি রাশীকৃত করি'!
স্রোত দাও, চাহি নাকো পিঞ্জর-আবদ্ধ এই প্রাণ-পরিমিতি,
দাও, দাও প্রসারিত সুবিপুল মৃত্যুর বিস্তৃতি॥

১৩৩২

যাবার ঠিকানা

প্রজাপতি, কোথা থেকে এলি মোর ঘরে
বুলায়ে রঙিন তুলি আমার কল্পনাগুলি
আঁকিলো কে বল তোর পাখার উপরে ?
বল কে দিয়েছে লিখি আখরের ঝিকিমিকি
এলোমেলো আঁকিবুঁকি হালকা রেখায়,

আমাকে কাজের থেকে নিতে হবে দূরে ডেকে
এমন অকেজো কথা কে তোকে শেখায় !
ফুরতিতে ফুরফুরে উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরে
কী চাস আমার কাছে কী আমারে দিবি ?
জানাতে চাস মোরে এখনো প্রতিটি ভোরে
ঘুম থেকে জেগে ওঠে নবীন পৃথিবী ?
তাই কিরে ডাক দিলি নিরালায় নিরিবিলি
মাঠের সবুজে আর আকাশের নীলে,
তাই কি রে স্বপ্নমাখা চকিতে নাচালি পাখা
ইশারায় নিয়ে গেলি তারার মিছিলে।
আমার অনেক কাজ ভাঁজের উপরে ভাঁজ
লাল ফিতে দিয়ে বাঁধা জমানো কাগজ—
তবু যেন মনে হয় এ ভীষণ সুসময়
তোর সাথে চলে যাওয়া কতই সহজ।
চলে যাওয়া সেই দিনে পথ ভুলে চিনে-চিনে
নির্জন দুপুর-রোদে গাছের ছায়ায়।
যেখানে মাঠের থেকে সবুজ গিয়েছে বেঁকে
অনন্ত সে দিগন্তের সাদা সীমানায়।
তোরে কানে-কানে বলি ইচ্ছে করে যাই চলি
কোথা যাই কেন যাই নেই কিছু জানা,
শুধু জানি তুই এলি রঙচঙে পাখা মেলি
দিয়ে গেলি মোরে শুধু যাবার ঠিকানা ॥

১৩৪০

আমরা

যদিও ধরায় এসেছি নামি',
ছুটিয়া চলেছি অগ্রগামী—
কী বা হ'বে খুঁজে নভ-কিনার
মেঘলোকে নাই মণি-মিনার ;
গতি-প্রতিযোগে পড়িনি থামি',
পাখার বদলে চাকা :
মূক হ'ল সুর জ্যোতি-বীণার,
হাতে শুধু মাটি মাখা।

পাথরে-লোহায় গড়ি শহর,
স্নায়ু ভরে' চাই খর শিহর,
না-মানা যুগের মোরা মানুষ,
চোখে জ্বলিতেছে তাজা জলুস—
বেগ-উদ্বেল লোক-লহর,
গতি সে নিরুদ্দেশা :
বেসাতি মোদের কালি-কলুষ,
কিছু-না পাওয়ার নেশা।

সকলে আমরা শরীরী কল,
এই সে গর্ব মোরা বিফল,—
মানি না কিছুই, খুঁজি না মিল,
ভ্রূকুটি-ভয়াল ভালে কুটিল
প্রথা-প্রাচীরের ভাঙি শিকল,
দাহময় মর দেহ :
গতি-উচ্ছ্বাসে ছুটি ফেনিল,
সুতীব্র সন্দেহ।

দুঃখেরে মোরা করি না ক্ষমা,
পরাজয়ে হেরি পরা-সুষমা,
পাপ করি, ভালো লাগে যে পাপ,
প্রেম শুধু ফাঁকি—ফাঁকা প্রলাপ,
রমণীর মাঝে হেরি না রমা,
পিপাসা-পাষাণ মন ;
অণুতম নাই অনুবিলাপ,
ক্ষণিকের প্রসাধন।

মোদের আকাশ ধূম-ধূসর,
ঠেলে ফেলে যাই সুখ-বাসর,
ধোঁয়া-ধূলি নিয়ে রজনী-দিন,
বিপণিতে শুনি কাঁদে বিপিন,
আমাদের জ্বরে মাটি ঊষর,
প্রিয়া নহে প্রিয়তমা :
ছিনিমিনি খেলি আশাবিহীন,
নদী হ'লো নর্দমা।

জিজ্ঞাসা মোরা কিছু না করি,
চাকার নিয়ত করি চাকুরি,
যাহা কাছে পাই ধরি আঁকড়ি'
কেন মরি কী যে খুঁজে !

জানি না যে যাবো কোন্ সে দিকে, তারারা তাকায় নির্নিমিখে,
আকাশ বেড়ায় মলিন ফিকে চিমনি ও গম্বুজে।

মোদের ঘিরিয়া করেছে ভিড় চুম্বনানত কেশ নিবিড়,
বিস্মৃতিময় ঘন তিমির, মৃত্যুর মহানিশা;
জানি একদিন ছিঁড়িবে মূল এই শিহরণে স্রোতে তুমুল
ফেনতরঙ্গে ভাসি অকূল না মানি' তীরের তৃষা॥

১৩৩৮

চাষা

মাটির ছেলে মাটির মতন প্রীতি-শীতল বুকখানি,
মাটির বাতির ম্লান-শিখাটির মতন মৃদুল মুখখানি!
মাটি-মায়ের হৃদয় উজাড় করছ তুমি প্রেম দিয়ে,
মাঠের কবি, বন্দনা মা'য় করছ খুশীর গান গেয়ে!
ধু-ধু ধুসর যে-ক্ষেত ছিল শুক্‌নো ধুলোর আস্তানা,
যাদুকরের ছোঁয়াচ্ লেগে রঙ্-চঙী তার ভাব্ খানা!
রঙ্-সোহাগী নীল-বিলাসী ক্ষেতের তুমি হও রাজা,
ভুঁয়েতে ভুঁই-চম্পা ফোটাও, ফুল-মুলুকের নওরোজা!
শণের ক্ষেতে সোনার আঁজন যখন বুলায় ভাস্করে,
বানাও মাটির আলি, সবাই ভাবে—এ কোন্ ভাস্কর এ!
লাঙ্গলেতে ছন্দ বাজাও, মাটির মেদুর বুক মাতে
শ্যামার শীসের জল্‌সা চলে ঋীরি-শালিক-পিক সাথে!
নীল-বেগুনী-জর্দ্দা লালের পাখ্‌না মেলে মেঘ্-পরী,
আলোর বীণায় বিভাস বাজায় বেড়ায় বিভোল্ সন্তরি!
কাঠ্-বেরালি ঠোকর মারে, শিশির পড়ে ঠিক্‌রিয়া,
সির্‌সিরানির ঝুমুর বাজায় বাতাস আলোর মদ পিয়া!
ফড়িঙ্ আসে পাখ্‌না মেলে মৌমাছিদের মজ্‌লিসে,
প্রজাপতির পাখার রঙে গাঁদার রঙ্‌টি রয় মিশে!

ঘুম-সুষমায় ঘুমিয়ে চলে সুষমী নদী ঢেউ তুলি,
রূপার আঁচল শিথিল-শীতল, আল্‌পনা দেয় লাল গুলি
আলোর নূপুর বাজ্‌ল যখন, ফিঙে যখন গান গাহে,
মাটির মালী মাঠের মুকুট মাটির মালিক বাদ্‌শা হে,
ছন্দ বাজাও পেশীর তালে, বাজাও লাঙল-তান্‌পুরা,
ছন্দ শুনে চক্ষু খোলে মাটির জীবন-তন্তুরা!
প্রাণ-পতাকা বহন করি' মাতাল তৃণের মঞ্জরী,
মন্ত্র শুনি তোমার কবি, উঠেছ পুলক গুঞ্জরি!
মরুর বুকে ঐন্দ্রজালিক, বহাও বাদল-ঝর্ণাকে,
যৌবনেতে পেলব কর তাপসী অপর্ণাকে!
সুর-খেয়ালী কি সুর বাজাও! তোমায় করে বন্দনা
বন-শালিক আর দোয়েল চড়ুই তিতির পাখী চন্দনা।
গৈরিকেতে ধ্যান-উদাসী নয়ন মুদি চুপ করে'
বসুধা আজ সুধায় উছল উঠল বিহ্বল রূপ ধরে'!
সে কোন্ রাজার দুলাল তুমি! জীয়ন্-কাঠির চুম্ লাগি'
চোখ্-জানালার খিল্‌টি খুলি গেল তাহার ঘুম ভাগি'!
এলিয়ে দিল অলক-গুছি, রাঙালো চোখ সুর্মাতে,
হাতছানি দেয় আকাশকে নীল, চোখে অলখ সুর মাতে!
শ্যাম-কিশোরী ফুর্তি-আতর ছড়ায় মুহু দিল্-ভোলা,
দিল্ দরিয়া খিল্ খোলা আজ চোখে স্বপন-নীল-গোলা!
দৃষ্টিটি তার চোখ্ জুড়ানো, গন্ধ ভারী মিষ্টি সে,
মাঠের কবি, এই কবিতা—তোমার মোহন সৃষ্টি সে!

কলের ধোঁয়ায় আকাশ কালো করছে ওরা মিস্তিরি,
তুমি বহাও মাটির বুকে রঙের সুরের পিচ্‌কিরি!
ভূত-বাদুড়ের ছানা ওড়ায় উড়ো জাহাজ অম্বরে,
তুমি তখন চর্কা ঘুরাও ঘুরন-চাকীর মন্তরে!
ঘুঘু ডাকে ঘুমপাড়ানি, নিঝুম দুপুর থম্‌থমে,
টহল মারে, ব্যস্ত ওরা, জাঁক-জমকী জম্‌জমে।

ওরা যখন মানুষ মারে 'হাউইট্জার' ও বন্দুকে,
অশথ্ তলায় অধর পরশ দাও বাঁশরী-বন্ধুকে !
পাল্কী চলে ঠুংরী তালে, খেম্টা তালে বয় হাওয়া,
মেঘের ফাঁকে সজল-শীতল একটি তারার রয় চাওয়া !
ওরা যখন মড়ক লাগায়, কান্নাতে দেশ দেয় ভরি,
মঞ্জু তুমি বিনিদ্ কবি, কাটাও জ্যোছন-শর্বরী !
সুষ্মী নদীর ও-তীরটিকে পীড়ছে হাজার বস্তিতে,
তুমি হেথায় পাতার কুঁড়ে বানাও নীরব স্বস্তিতে।
হাউই ছাড়ে পাহাড় উড়ায়, 'ডিনামাইটের' কারখানা,
রাজ-কারিগর, লাঙল-কাছে সকল যন্ত্র হারমানা।
লাল ইমারৎ গড়্ছে বটে,—সকলই কুকীর্তি যে,
দীর্ঘশ্বাস ও কান্না আছে অসংখ্য তার ভিত্তিতে।
লক্ষ শোণিত-বিন্দুতে হায় একটি পাথর হয় রাঙা,
তবু শুনি সে কুঠিতে খুঁত থেকে যায়, রয় ভাঙা !
পাতার কুঁড়ে, মাটির বেড়া, একটি ছোট দীপ তাতে
দীপটি তুমি দাও নিবিয়ে ফুলেল্ হাওয়ায় জ্যোৎস্নাতে !
যে নীলাকাশ স্নিগ্ধ-করা চমৎকারের ফাগ দিয়ে,
কলঙ্কিত কর্ল ওরা ধূম-দানবের দাঁত দিয়ে।
সওদা কর মাটির তুমি, হাট কর না ঢাক পিটে,
বন-কাপাসে কাপড় বানাও, রাঙায় নাক' মার্পিটে।
স্বাস্থ্য এবং শক্তি বলি দাও না হেয় লুব্ধতায়,
মাটির বুকে বুক পেতে শোও, নওক' কিছু ক্ষুব্ধ তায় !
মিনার-মহল চাও না কিছু মোহর পাবার নেই আশা,
পিয়াল-ফুলী মঞ্জু মাটির আঙ্গিনাতেই সুখ-বাসা !
যন্ত্রাসুরের যন্ত্রণাতে গোঙায় ওরা দিনরাতি,
তুমি তোমার জীবন কাটাও মাটির গলার হার গাঁথি।
মাটির দুলাল, মাঠের কবি, ক্ষেতের তুমি হও রাজা,
সবখানে পাপ বীভৎসতা, হেথায় ফুলের নওরোজা !

১৩৩১

ধর্মঘট

চামারের ছেলে চামড়া ছোঁবে না,
কসাই ছেড়েছে ছুরি,
মুটে মোটে আর মোট বহিবে না
নামায়ে রেখেছে ঝুড়ি।

অথই-অথির দক্ষিণা-ভরা
আজিকে দক্ষিণায়,
ধুলা ঝেড়ে ফেলে, গাও মেলে দিয়ে
মজুর জুড়াতে চায়।

গাড়োয়ান আর গাড়ি হাঁকাবে না,
শস্য নেবে না হাটে,
অশথের তলে গাঢ় চোখ মেলে
গরুরা জাবর কাটে।

জাহাজ আজিকে বেজান্ হয়েছে,
মাস্তুল চৌচির :
ভিড় লেগে গেছে সাগরের তীরে
খালি গায়ে খালাসির।

হাল আর হল হয়েছে বিকল;
কলু আর কালো কুলি
আজি দখিনায় ঘেঁষে গায়-গায়
করিতেছে কোলাকুলি।

ঝাড়ুদার-ঝি'র লজ্জা হয়েছে,
চালাবে না পথে ঝাড়ু;

একেলা বসিয়া পারুলের ফুলে
বানায় পায়ের খাড়ু।

হাতের সঙ্গে হাতুড়ি থেমেছে,
ছুতোর করেছে ছুতো;
হঠাৎ তাঁতির তাঁত ছিঁড়ে গেছে,
ফুরায়ে গিয়াছে সুতো।

কাৎরানি এতো কেরদানি যা'র
সে-কল হয়েছে কাত;
আজি দখিনায় মজুর জুড়ায়,
আজিকে সুপ্রভাত!

কেরানিরা সব কলম ছুঁড়েছে,
উপুড় করেছে কালি;
আকাশ আজিকে চায় তা'র চোখে
জ্যোৎস্না-জোনাকি জ্বালি'।

ফিরিওয়ালারা আর ফিরিবে না
ঠাঠ-পড়া চড়া রোদে;
খাঙর আজিকে নোঙর নিয়েছে,
মুচি সে নয়ন মোদে।

কেরানির রাণী উনুনের কোণে
ঠেলিবে না আর হাঁড়ি;
আজ দখিনায় খোঁপা খসে' যায়,
গোছালো থাকে না শাড়ি।

বস্তা যাহারা বয় আর যারা
বস্তিতে বাস করে,

খোলা রাস্তায় ভরা দখিনার
নিশ্বাস আজি ভরে।

দখিনার ফুঁয়ে গিয়েছে উড়িয়া
কবাটের ছেঁড়া চট,
আকাশে বাজিছে ছুটির ঘণ্টা,
আজিকে ধর্মঘট।

১৩৩৩

আষাঢ় এসেছে অবেলায়

আকাশ করেছে গোসা আজি ভাই,
আষাঢ় এসেছে অবেলায়;
দোপাটির দীপ জ্বলে বটে মাঠে,
কুটিরের দীপ নিবে যায়।

গরিবের কুঁড়ে ফুঁড়ে জল ঝরে,
মাটি খুঁড়ে ওঠে কেঁচো চোর;
জ্বরে পুড়ে দীন এ দিন-মজুর,
একদম আজি কম্‌জোর।

ওলো উলু দিয়ে কাজ নেই আজ,
বাজ ধম্‌কায় চারিধার;
পাঁকে খালি-পায়ে ছোড়ে টো-টো করে'
চাকরির যত উমেদার।

এঁদো বাদলেরে কে বলে বাউল?
চাউলের দাম গেছে বেড়ে;

বেসাতি বেহাল্—দোকানি বেকার,
ব্যাজার বাজার একটেরে।

বিকালে গোহালে গরু ফেরে নাই,
ছাগল ফেরার সারা রাত;
কলের খারিজ খোঁড়া কুলিগুলি
মাগিছে মাগ গি মুঠো ভাত।

উঠোনের ঠুটো বেঁটে বটগাছ
উপুড়, ঝড়ের বাড়ি খেয়ে,
ডাঙা নাহি পায়, ডাঙা ডুবে যায়,
বানে ফুল ভাসে,—মরা মেয়ে

জমির মাশুল হয়নি উশুল,
কারকুন হাঁকে দুনো সুদ;
নিজের আঙুল চোষে আজি শিশু—
মা'র বুকে তার নাই দুধ!

আষাঢ়ের আশু ভাষায়ে দিয়েছে
আউশের ক্ষেত অবেলায়;
শকুন চাখিছে করোটির বাটি,
চিতার চুলা যে নিবে যায়॥

১৩৩৪

মমতা

খুঁজে ফের অকপট মানুষের জনতা
অনুভব করে যাও হৃদয়ের ঘনতা।
সুস্বাদু সুপ্রিয়
ঘনিষ্ঠ আত্মীয়
আকাশ-কুসুম নয়, মৃত্তিকা-মমতা॥

১৩৭৫

ঋতু মঙ্গল

নিদাঘ-সাঁঝেতে দখিনা বহিবে মরি,
দুটি বুকে খুশি কাঁপে দুরু থরি থরি,
পিঠের উপরে চুলটি এলায়ে দিও
বিকচ অধর মৃদু হাসি কমনীয়।
বুকের আঁচল শিথিল, ঘোমটা খোলা
একটি চুমুতে সরমের লাল গোলা
নীলিমার ফাঁকে তারার চপল আঁখি
গান গেয়ো চুপে কাঁধেতে মাথাটি রাখি।

ঝরঝরঝর আষাঢ় নামিবে বনে
আবার বসিব খোলা এই বাতায়নে,
জলের ঝামটে ভিজিবে আঁচল চুল
আঁখির পাতায় লাগিবে মেঘের ঢুল!
দুইখানি বাহু কণ্ঠে জড়ায়ে দিও।
বর্ষা-শীতল ঠোঁটের তৃষাটি নিও।
মনে হবে বুঝি কেহ কারে নাহি চিনি
কাছাকাছি তবু বিরহী ও বিরহিণী।

শঙ্খধবল নিদ-হারা রূপা রাতে
বসিব দুজনে নিরালা নিঝুম ছাতে,
মেঘলা আনন থমথম অভিমান
অধরে আঁকিব অধরা হাসির টান,
বৃষ্টির পরে রোদের সোনালি হাসি
শিউলির মত ঝরে পড়ে রাশি-রাশি।
কোলের কুলায়ে মাথাটি টানিয়া নিও
রিনিঝিনিঠিনি চুড়ি কটি বাজাইও।

হালকা হিমের ওড়না নামিবে সাঁঝে
বসিব দুজনে ঝাউ-হিজলের মাঝে,
কনক-ধান্যে দখিনা লাগাবে দোল
শিরীষের বুকে মাছিদের কলরোল।
আলগোছে যেই ঘোমটা তোমার খসে
রাঙাই অধর রাঙা ডালিমের রসে।
পরীর মেয়েটি খেলিবে গালের টোলে
আঁধার ঘনাবে নিরালা বনের কোলে।

শীতের নিশীথ, ঢুলুঢুলু দুটি আঁখি
বসিব দুজনে হয়ে ঘন ঢাকাঢাকি,
বাহুর মাল্য ভূষিবে দোঁহের গলা
শীত-ঢাকা কথা আবছা আদরে বলা।
হিমের লেপনে অধর শুকাবে, গাল,
যতই শুকাবে ততই ঢালিব লাল।
ঘুমে বাহু-বাঁধ শিথিল যদি বা হয়
তুলে নিও ফের, সেইটুকু সুসময়।

তারপর আসে মদিরার মোহ-নিশা
মহুয়া ফুলের বারতা, গোলাপী তৃষা
খুশির পেয়ালা ভরে-ভরে ওঠে ঠোঁটে
নয়নে-নয়নে হাসির ফিনিক ছোটে।
নিশাসে নিশাস, মিশিবে বুকেতে বুক
রাঙা হয়ে ওঠে ভাঙা পরানের দুখ।
সর্বশরীরে গেরুয়ার শাড়ি পোরো
নিশি না পোহাতে আমারে মারিয়া মোরো।

১৩৩২

রাজার হুকুমে হাজার মজুর রাস্তা খোঁড়ে

রাজার হুকুমে হাজার মজুর রাস্তা খোঁড়ে,
দুই দিন বাদে মদের বাজার বসিবে মোড়ে।
মুখে ওঠে ফেনা, বুকে ঝরে ঘাম,
ছিনা ছিঁড়ে যায়, পুড়ে যায় চাম ;
ফুলেল্ দখিনা, বও তুমি আর একটু জোরে,
এঁটেল মাটিতে খেটেল মজুর রাস্তা খোঁড়ে।

চৌঘুড়ি চড়ে' এই পথে যাবে তশিলদার,
সওদাগরের ফুলিবে আড়ত, পুঁজির ভার।
পথের কিনারে পেলো ফারুখৎ,
আবগারি আর ছেঁদো আদালত ;
দাদ-ফরিয়াদে জোত-জমি সব ফক্কিকার।
পাইকার আর বেকার শুধুই টহলদার।

রাজার হুকুমে হাজার মজুর রাস্তা খোঁড়ে,
সিঁধকাঠি ফেলে গাঁইতি ধরেছে উপোসী চোর।
ঢাক-ঢোল পিটে করে বিকিকিনি
ঠাট-ঠমকেতে হাট-বিলাসিনী ;
শিশুর বদলে মদের বোতল বসেছে ক্রোড়ে।
তাই বেলদার গা-গতর ঢেলে রাস্তা খোঁড়ে।

দুয়া মেয়েটারে দুয়ারে কাঁদায়ে,— নাহিক মায়া।
দুই পয়সায় ঝুড়ি ধরিয়াছে মজুর-জায়া।
দেনো কথা কয়, খেনো মদ খায়,
শুধু ফোঁড় গনে, আস্কে না পায় ;
তবু আহ্লাদে কী ফুটকড়াই—এত বেহায়া।
নামহীন কাম-শিশুদের তরে নাহিক মায়া।

জহর-পানির সাগর শুষিয়া শহর পাতে;
দরদালানের কামড়াকামড়ি নখে ও দাঁতে।
লোহা আর লোহু লেহিতেছে মাটি,
বামন-বীরেরা চলিয়াছে হাঁটি',
মড়কের ত'রে পাথর গুঁড়ায়ে সড়ক গাঁথে,
অরণ্য আজি ভিক্ষা মাগিছে উর্ধ্ব হাতে।

ও লোচনকোণা আর হানিয়ো না প্রেয়সী, মোরে,
দেখিছ না কি গো হাজার মজুর রৌদ্রে পোড়ে!
তুমি কি দেখিতে আজো পেলে নাকো,
তটিনীর টুঁটি টিপে আছে সাঁকো?
বনমানুষের বংশধরেরা ললাট খোঁড়ে;
চলো, যেথা লাখো জীবনের জাঁতা ঘুরিছে জোরে॥

১৩৩৫

প্রসাদ

যদি কিছু আছে ধরায় আছেই শুধু অন্ধ,
সাধ্য যদি না হয়, ভালো, সাধন করো সন্ধ।
যদিও জানে সন্ধে হলেই ঝরবে
তবুও দেখ অনুভবের গর্বে
পুষ্প কেমন প্রাণের পুটে রাখে মধুর মন্ধ
বৃন্তে নিশ্চিন্ত সুখে প্রসাদ নিরবন্ধ॥

১৩৩৫

প্রিয়া ও পৃথিবী সমাপ্ত

উপন্যাস

বেদে

"কল্লোল"-এর বন্ধুদের দিলাম

আহ্লাদি

ন পেরিয়েছি, কিন্তু আহ্লাদিকে দেখেই আমার ভালো লাগল।

জীবনারম্ভে সেই প্রথম ভালো-লাগাটি আজকের বিষণ্ণ অপরাহ্ণে ঠিক ধরতে পারছি না। সেটা ভৈরবী না ভূপালির স্বর তাও বা কে বলবে?

—কাদায় পড়ে গিয়েছিলে বুঝি?

কথা বলতে পারছিলাম না। কাঁদছিলাম।

—ইস! কপাল কেটে যে রক্ত বেরিয়েছে।

চারটি আঙুল আমার কপালে এসে লাগল। দেখলাম ওর চারটি আঙুলের ডগা রক্তে টুকটুক করছে।

কোমরে কাপড় জড়ানো একটি ছেলে, খালি গা, হাঁটু পর্যন্ত ধুলো, এসে বললে—তোকে মাস্টারমশাই ডাকছে, আহ্লাদি।

—কেন রে? বল গে আমি পারব না এখন উঠোন লেপতে। বামনি উনুনে আগুন দিক।

পাশের দেবদারু গাছটায় কচি পাতার জন্মোৎসব চলেছে। ভোরের বাতাস ঝিরঝির করছিল।

ছেলেটি বললে—আমি ফিরে গিয়ে যদি বলি যে আহ্লাদি আসবে না, আমার পিঠেই তো বেত ভাঙবে। তোকে তো আর ছোঁবে না। কিন্তু উঠোন লেপতে তোকে ডাকেনি। বামনিই লেপছে।

আহ্লাদি ফিরে দাঁড়িয়ে বললে—আমি এখুনি আসছি ভাই।

ছেলেটি আমার হাত ধরে ফেললে। বললে—বড্ড লেগেছে বুঝি? কেমন করে লাগল?

—গঙ্গার ঘাটের সিঁড়ির কোনায় লেগে। পিছলে পড়ে গেছলাম।

—কলকাতায় এই বুঝি প্রথম এসেছিস? বাড়ি থেকে পালিয়ে না পথ ভুলে?

আহ্লাদি ছুটতে-ছুটতে এল। হাতে একটা গেরুয়া রঙের কাপড়। ওর ছোট্ট তর্জনীটি হেলিয়ে বললে—এবার যাও তুমি মাস্টারমশাইর কাছে, বসন্ত বলে দিয়েছে তুমি কাল লুকিয়ে মাস্টারমশাইর হুঁকোতে টান মেরেছ। মাস্টারমশাই তাঁর পায়ের খড়ম উঁচিয়ে বসে আছেন, নটরুর পিঠ ভাঙবেন তবে হুঁকোয় টান দেবেন। যাও এবার!

নটরু কোমরের কাপড়টা আরো একটু কষে বেঁধে একেবারে ক্ষেপে উঠল—বসন্ত বলুক দেখি তো আমার মুখের ওপর! জোচ্চোর কোথাকার! দেব থাবড়া মেরে শুয়োরের মুখ ভেঙে। আমি হুঁকো কোথায় তাই জানি না। যাবই তো মাস্টারের কাছে। আমি কেয়ার করি কিনা! কিন্তু আগে বসন্তর দাঁত বত্রিশটা থেঁতলে না দিলেই নয়।

আহ্লাদি ওর হাতটা চেপে ধরে বললে—সক্কালবেলাই মারামারি করতে ছুটিসনি নটরু!

আহ্লাদির মুঠি ভারি কোমল কিন্তু। নটরু তাতে বাঁধা পড়ে না।

আমার হাত ধরে ও বললে—এস ভাই।

প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছ, ছায়া পড়েছে। মা'র কোলের মতো! একটা-ডোবা, ঘাট বাঁধানো নয়, পানায় জল নীলচে হয়ে এসেছে, কলমিলতা ভাসছে, দুটো হাঁস পাঁক খুঁড়ছে।

আহ্লাদি আমার কপালে জল দিয়ে দিতে লাগল।

—এখানে কি করে এলে ভাই?

—মামার সঙ্গে কলকাতায় আজ ভোরেই পৌঁছেচি।

—মামা? তিনি কোথায়?

—তিনি আমাকে গঙ্গার ঘাটে ফেলে রেখে কোথায় যে চলে গেলেন, পাত্তা পেলাম না।

ছেলেরা নামতা মুখস্থ করছে। বেতের আওয়াজ আর আর্তধ্বনিও কানে ভেসে আসছিল।

—তাঁর নাম কি? কোথায় তোমাদের গাঁ?

—তা বলব না। সেখানে আর ফিরে যেতে চাই না।

—কেন ভাই?

চোখে জল এসে পড়েছিল।

—আমাকে ওরা মারে। মামী একদিন একটা বঁটি ছুঁড়ে মেরেছিল।

পিঠের কাপড়টা তুলে দেখালাম।

আহ্লাদি আমার পিঠের উপর ঝুঁকে পড়ল দুই হাত রেখে। ওর দুটি হাতই ভেজা। চুলগুলিও খোঁপায় জড়ানো ছিল না।

আঁহ্লাদির তখন কত বয়সই বা হবে? এগারোর বেশি?

—কিন্তু মামা যদি একদিন নিতে আসে?

—তা হলে বুঝি লুকিয়ে গঙ্গার ঘাটে ভিড়ের মধ্যে হাত ছেড়ে পালিয়ে যায়?

—মাস্টারমশাই যদি তোমাকে বাড়িতে রেখে দিয়ে আসেন?

—তিনি যখন গঙ্গাস্নান করে ফিরছিলেন, আমাকে কাঁদতে দেখে ডেকে নিলেন সঙ্গে। তাঁকে সব বলেছি, তিনি আমাকে এখানে রাখবেন বলেছেন।

—সত্যি?—আহ্লাদির দুটি চোখ ছেপে খুশি উছলে উঠেছে।—বেশ হবে কিন্তু তা হলে। তোমার নাম কি ভাই?

—পচা।

—ধ্যেৎ! আহ্লাদি ভুরু কুঁচকেছে।—তোমার নাম কাঁচা। এই নাও, ভেজা কাপড়টা ছেড়ে এই আলখাল্লাটা পর।

কাপড়টার রঙ গেরুয়া।

মাস্টারমশাই আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে।

এটাকে ইস্কুল না বলে আস্তাবল বলতে কারুর বাধবে না হয়তো।

নটরু মাস্টারের কাছে বাইরে যাবার অনুমতি চাইল।

—না।

—থাকতে পারছি না স্যর, কল্ড্ বাই নেচার—

—পাজি, নচ্ছার—মাস্টার মেহেদির ভাঙা ডাল দিয়ে নটরুর ঘাড়ের উপর সপাং করলে। কিন্তু নটরু প্রকৃতির আহ্বান অবহেলা করতে শেখেনি—আর যায় কোথা! সমস্ত ইস্কুলঘরে যেন আগুন লেগে গেছে। নটরুর নাক কেটে গেছে তবু মাস্টার ক্ষান্ত হয় না।

নটরুকে বেঞ্চির উপর দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল। সে দুই হাতে চোখের জল কানের দিকে ঠেলে দিয়ে বইয়ের আড়ালে মুখ লুকিয়ে ভেঙচে নিচ্ছে। আহ্লাদি গোলমাল শুনে দরজা পর্যন্ত এসেছিল। নটরুর মুখ-ভেঙচানো দেখে মুচকে একটু হেসে গেল। নটরু কি ওর হাসিকেও ভেঙচায়?

—লেখাপড়া কিছু জানিস, না একেবারে স্বরে-অ?

—গাঁয়ের ইস্কুলের সিক্‌সথ্‌ ক্লাশ সারা হয়েছে, এবার—

—বেশ, অঙ্ক কদ্দুর ?

—জি সি এম।

সব ছেলেগুলি হাঁ হয়ে গেছে দেখছি। নটরুর মুখে ইংরিজিটা তা হলে নিতান্ত অকেজো, তুচ্ছ। ওটা ওদের বুলি শেখানো হয়েছে। কেন না একটি পাঁচ বছরের ছেলে মুখখানি কাঁচুমাচু করে এসে বললে—আই এম কল বাই নেচার স্যর! নটরু তো হেসেই খুন!

আমাকে একটা ভাগ দিয়ে বললে—পাঁচ মিনিটে—

দুমিনিট বেশি লেগে গেল বুঝি। মাস্টার তো সপাং করে বেতের বাড়ি মেরে দিল। অঙ্কটা শুদ্ধ হয়েছিল কিন্তু। তাতে কি যায় আসে? ডিসিপ্লিন্! ছেলেগুলো কিন্তু গুণও জানে না।

গঙ্গার ধারে যে-লোকটি আমার হাত ধরেছিল তার দুটি উদাস চোখের করুণা দেখেছিলাম, এখন দেখি লোকটির সারা মুখে বসন্তের দাগ, নাকের নিচে প্রকাণ্ড একটা ঘা হয়ে শুকিয়ে কদর্য একটা দাগ হয়ে আছে!

কেরোসিনের বাক্স সাজিয়ে বেঞ্চি। আশ্রমের কর্তা যথেষ্ট টাকা দিচ্ছে না বলে এখনো কিছুই তৈরি হল না—এ-কথা মাস্টার এরই মধ্যে বার পাঁচ-সাত উল্লেখ করলে। সেটাকে বোর্ড বলা চলে না। তক্তা। একটা অঙ্ক লিখতে-লিখতে মাস্টার বলতে লাগল—অনাথ আশ্রমটা যেন দেশোদ্ধারের তালিকায় কিছুই না।

একটা যোগ অঙ্ক লিখতে না লিখতেই মাস্টার হেঁকে উঠল—সাত মিনিট—সমস্ত ছেলে চঞ্চল হয়ে উঠল। আমাকে মাস্টার একটা ভাঙা শ্লেট আর কড়ে আঙুলের আধখানা একটা পেন্সিল দিলে। টপাটপ অঙ্কটা কষে ফেললুম একেবারে।

আমাকে শ্লেটটা মাস্টারের হাতের কাছে বাড়িয়ে দিতে দেখেই সব ছেলেগুলো যেন উন্মাদ হয়ে উঠল। অঙ্ক যে করে হোক শেষ করে সব একেবারে ভিড় করে এসে দাঁড়াল। নটরু কিন্তু দেয়ালে ঠেস দিয়ে তেমনিই দাঁড়িয়ে আছে। নির্বিকার!

শুধু আমার অঙ্কটাই রাইট হয়েছে। মাস্টার আর সবাইকে ঠেলে দিল। ছেলেগুলি যে যার জায়গায় গিয়ে হাত মেলে দাঁড়িয়েছে। কেন রে? মাস্টার বেতটাকে শূন্যে দুবার রিহার্সাল দিইয়ে নিয়ে গুনে-গুনে ছেলেগুলির কচি-কচি হাতে পাঁচ-সাত নয়-বারো যেমন খুশি সপাং করতে লাগল। নটরুর কাছে এসে হাঁকলে—তেইশ!

নটরু চেঁচিয়ে উঠল—দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে অঙ্ক কি করে হয়?

মাস্টারের কথার নড়চড় হয়নি। একটি-একটি করে দুকুড়ি তিন হল তো হল। মারাই তো মাস্টারের পেশা।

আমার অঙ্ক রাইট হওয়াটা প্রকাণ্ড অপরাধের মতো মনে হচ্ছিল।

ইস্কুল ভেঙে গেল।

রোজ এমনি করেই ভাঙে। মাস্টারের হাতের ও জিভের ব্যায়াম হয় খুব, আর নটরুর মাড়ির আর দাঁতের।

অশ্বথের পাতায় রোদ পিছলে পড়ে—ছেলেরা শ্লেটখাতা বগলে নিয়ে বানের জলের মতো বেরিয়ে আসে। আটটায় ইস্কুল শেষ করে এবার আমাদের মাটি কোপাবার পালা। এটা আশ্রমকর্তার ইস্কুল-পরিচালনার নতুন রুটিন। ছেলেরা খাপরার ঘরে তাদের ছেঁড়া খাতাবই ছড়িয়ে রেখে এসে কোদাল নিয়ে মাটি খুঁড়তে লেগে যায়। নটরু এখানে 'ফার্স্ট বয়'। আমার হাতে একটা কোদল দিয়ে বললে— কোপা।

মাটির গন্ধে বুক ভরে আসে। হাঁটু পর্যন্ত মাটি, মাথায় মাটি—যেন এতগুলি ছেলের কোন একটি মা তাঁর স্নেহ বেঁটে দিচ্ছেন। মাস্টার একটা দেবদারুর চারা-গাছের তলায় বসে দেখে আর হুকুম করে। মাঝে-মাঝে আহ্লাদি ছুটে এসে ছুটে চলে যায়। যেন গেরুয়া মাটির দেশে তরতর করে একটি রজতলেখা নদী বয়ে গেল।

গঙ্গা গাং নয়—খাল। তখন তা শিটিয়ে এসেছে।

নটরু ছেলের দলের পাণ্ডা হয়ে গঙ্গাস্নান করতে নিয়ে আসে। মাস্টার সাঁইত্রিশ মিনিট কবুল করে দেয়—অথচ লোহার ঘড়িটা নিজের ট্যাকেই রাখে। আমাদের সাঁইত্রিশ মিনিট তাই সাতান্নতে গিয়ে ঠেকে। ভাত খাবার আগে পেট ভরে আর একবার মার খেয়ে নিই।

নটরু ট্যাক থেকে বিড়ি আর দেশলাই বার করলে।—খাবি?

মতামত দেবার আগেই নটরু ধরিয়ে ধোঁয়া দিতে শুরু করেছে। কৌতূহল যে হচ্ছিল না তা নয়। বললাম—মাস্টারকে যদি ওরা বলে দেয়—

নটরু একগাল হেসে বললে—তোরা বলে দিবি নাকি রে বসন্ত?

—পাগল! কোনোদিন বলেছি?

বললাম—তুই যে মাস্টারের হুঁকোয় টান দিয়েছিলি সে-কথা তো বসন্তই বলে দিয়েছিল! আহ্লাদি বললে।

—আহ্লাদি বললে?—বসন্ত রুখে উঠেছে।—ছুঁড়ি ভারি মিথ্যুক তো!

হাঁরে, বলেছি নটরু ? তা হলে আমারই কি দাঁত কটা আস্ত থাকত ?

বললাম—না, না, আহ্লাদি মিথ্যে বলেনি, ঠাট্টা করেছে।

বিড়িতে টান দিতে হল বৈকি ! কিন্তু পাঁজরা দুখানা খসে পড়তে চাইল। বসন্তটা হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে। কজ্জা ঢাকতে গিয়ে আমিও হাসছি, আরো টানছি, আরো পাঁজরা চিমটে যাচ্ছে। বিড়িটা নিবে গেল। যেন বাঁচলাম।

নদীর পাড় বেশ ঢালু। পলি মাটির কোমল কাদায় সমস্তটা পাড় পিছল হয়ে নেমেছে। ছেলেগুলি পাড়ের ধারে বসে হাত ছেড়ে দিয়ে ছরছর করতে-করতে জলের মধ্যে এসে পড়ছে। বেজায় ফূর্তি। নটরুর পর্যন্ত। একহাঁটু জলের মধ্যে থলবল করছে। ওরা সাঁতার জানে না। তবু নটরুই ওদের পাণ্ডা।

সাঁতার কাটতে-কাটতে মনে হল আহ্লাদি এলে বেশ হত। কত মেয়েরাই তো আসছে, নাইছে, চুল ধুচ্ছে, গাল ফুলিয়ে জল কুলকুচো করছে। মাস্টার না আসে—না আসুক। কিন্তু আহ্লাদি যদি আসত, আমি ডুব সাঁতার দিয়ে ওর পা ছুঁয়ে যেতাম। ছুঁয়েই সাঁতরে—হোই দূরে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতাম। ভাবত, মাছে ঠোকর দিয়ে পালিয়েছে বুঝি।

আহ্লাদি আসে না।

—এবার ফিরে চল নটরু। দেরি হয়ে যাবে।

নটরু কেয়ার করে না। বলে—দেরি না হলেও বরাতে মার আছেই আছে। মাস্টারের ট্যাঁক থেকে ঘড়ি আর কে ছিনিয়ে দেখতে যাচ্ছে ? ঘড়ি দেখতে জানিস তুই ?

হারান বললে—ঘড়ি আজ তিনদিন বন্ধ। ষাট গুনে-গুনে ওর মিনিট।

মারকে ওরা ডরায় না। ওটা ওদের দৈনন্দিন বরাদ্দের মতো। নটরু ওর দল নিয়ে পাড় বেয়ে-বেয়ে জলে ঝাঁপাতেই থাকে। পাল্লা দেয়—লাইন বাঁধে—যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলে ; নদীটা ওদের বিপক্ষ, ওকে এক সঙ্গে আক্রমণ করা হচ্ছে—এমনি।

আমি উঠে আসি। আহ্লাদি হয় তো সেই ডোবাটায় গা ডোবায়। ইস !

ডিম-ওলা ট্যাংরামাছটা আমার পাতে পড়তেই নটরু খাওয়া ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ভাবলাম, ঠাট্টা করছে বুঝি। আহ্লাদি মাছের বাসনটা হাত থেকে মাটিতে নাবিয়ে শুধোল—কি হল রে নটরু ?

বললাম—ডিমটা চাস, না খালি মাছটা ?

আহ্লাদি হেসে উঠল। নটরুর মুখ লাল হয়ে উঠেছে।

—নে, নে, গোটা মাছটাই নে।

পাত থেকে মাছটা তাড়াতাড়ি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নটরু বললে—তোর পাতেরটা আমি খাই কিনা!

ছুটে যাচ্ছিল, আহ্লাদি ওর হাত ফের ধরে ফেললে।

—ছাড়, আমার খিদে নেই আহ্লাদি।

আমরা এঁটো কুড়িয়ে পাতাগুলি আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিয়ে আসি। আহ্লাদি গোবর দিয়ে মাটি লেপে, কোমরে কাপড় জড়ায়।

তারপর আমাদের দু'তিন ঘণ্টা ছুটি। যা খুশি তাই করি। যার খুশি ডাংগুলি, যার খুশি গাব্বুগুলি, যার খুশি দোলনা-দোলনা।

গত রাতের বৃষ্টিতে কাঁচা পেয়ারাগুলি বুঝি ডাঁসিয়েছে।

নটরু আগডালেতে চড়ে বেছে-বেছে পেয়ারা নিচে আহ্লাদির ছোট্ট কোঁচড়টিতে ছুঁড়ে মারছে। ওর কোঁচড় ভরে গেল।

—আমায় একটা দিবি রে নটরু?—তলায় এসে দাঁড়ালাম।

হঠাৎ নটরুর লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ে গেল। একনাগাড়ে তিন-চারটে পেয়ারা আহ্লাদির কোঁচড়ে না পড়ে একেবারে আমার কপালে মাথায় এসে লাগতে লাগল।

ওর হাতের টিপ-এর এ হেন ভুল দেখে আহ্লাদি ব্যস্ত হয়ে আমার মাথাটা দুহাতে ধরে ফেলে বুকের কাছে টেনে এনে বললে—ওকি, ওকে মারছিস যে?—কোঁচড়ের আশ্রিত সমস্তগুলি পেয়ারাই কিন্তু তখন মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে।

নটরু একেবারে তরতর করে নেমে এল।

—তুই আমার সব পেয়ারা মাটিতে ফেলে দিলি যে! বলেই আহ্লাদির গালে সাঁ করে এক চড়।

ন'বছরের কাঁচা মাংসে পাতলা রক্ত টগবগ করে উঠল বুঝি।' ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

পেয়ারা আমাদের বন্দুকের গোলা, মরা ডাল আমাদের সঙিন আর তলোয়ার।

যুদ্ধে হেরে যাই। পুরনো ঘায়ে আঁচড় লেগে রক্ত ফিনিক দিয়ে ছোটে। আহ্লাদির চোখে জল, তবু গাঁদার পাতা থেঁতলে ঘায়ের মুখে চেপে ধরছে আমার।

নটরু কোমরে কাপড়টা কষে বাঁধতে-বাঁধতে বললে—মাস্টারকে যদি বলিস যে মেরেছি, তা'লে তোর নাকটা চেপটে দেব। বলে রাখছি আহ্লাদি।

আহ্লাদি মাস্টারকে বলে না বটে।

দুপুরের ইস্কুল জমে না কোনো দিন। মাস্টার হুঁকো নিয়ে আসে, ঝিমোয়। বেত মারার উৎসাহ তখন মিইয়ে আসে, অতি কষ্টে হাত বাড়িয়ে শুধু চিমটি, কি বড়

জোর পা বাড়িয়ে বেঞ্চির তলা দিয়ে লাথি। ছেলেদের কড়াকিয়া বলতে হুকুম দেয়। ছেলেরা কলরব করে। মাস্টারের তাতে ঘুম আসে। হুঁকোর জ্বলন্ত কলকেটা কোলের উপর পড়ে যায় হয়তো। মাস্টার বিকট চেঁচিয়ে ওঠে। ছেলেরা হাসে। মাস্টার একজনকে মেহেদির ডাল ভেঙে আনতে বলে। তার পিঠে আগে পঁচিশ ঘা মেরে মাস্টারের বউনি হয়। যেদিন কলকে পড়ে না, সেদিনটা নিশ্চিন্তে কাটে। নটরু কতদিন আলগোছে কলকেটা হুঁকোর মুখ থেকে তুলে সরিয়ে রেখেছে। নিমগাছের ছায়া ছড়িয়ে পড়তেই বুঝি চারটে বেজেছে। একসঙ্গে আমরা দুপদাপ করে উঠি। মাস্টারের ঘুম ভেঙে যায়। ট্যাঁকের ঘড়িটা লুকিয়ে একবার দেখে ছুটি দিয়ে দেয়। পরে ফের জিগগেস করে—নিমগাছের ছায়া পড়েছে তো রে?—বলে জানলার দিকে এগিয়ে আসে।

বিকেলে যেদিন ভিক্ষার মিছিল নিয়ে বেরুতে না হয় সেদিন ফের মাটি কোপাই। বেগুনের চারাগুলি মাটির অবগুণ্ঠন খুলে আকাশকে একটুখানি দেখে নিচ্ছে। মিছিলে এবারও আহ্লাদি আসে না, ঘর নিকোয়, ঝাঁট দেয়, মাস্টারের জন্য তামাক সাজে।

মাথার ঘা তখনো টনটন করলে কি হবে, নটরুর সঙ্গে ভাব করে ফেললাম ফের। খালি চাটাইটার উপর শুয়ে লাগছিল। নটরু ওর বিছানায় নিশ্চয়ই ভাগ দিত না। কেই বা চায়? আমারও বিছানা আসবে। দু-একদিনেরই মধ্যে—মাস্টার তো বললে।

—চিড়িয়াখানা দেখিসনি?

—কি করে দেখব? দেখাবি?

—ওরে বাবা, পঞ্চাশটা হাতি বাহাত্তরটা গণ্ডারের সঙ্গে শুঁড় দিয়ে লড়ে।

—কটার ভাগে কটা করে পড়ে তা'লে?

—তা কে জানে? সিংহগুলো সার বেঁধে দাঁড়ায়, বনমানুষের সঙ্গে যুদ্ধ হয়। ভীষণ জায়গা। ঢুকতে মোটে সাত পয়সা। আছে তোর কাছে?

—আহ্লাদি যে বললে এক আনা করে লোকপিছু, বাকি তিন পয়সার বিড়ি কিনবি বুঝি?

নটরু চটে উঠেছে।—আহ্লাদি তো সবই জানে! রাস্তাই চেনে না, এক আনা! হেঁ!

বেড়ার একটা দিক মেরামত সারা হয়নি এখনো। অশ্বত্থ গাছের গোড়া থেকে আগাগোড়া অন্ধকারে আমাদের ঘর ভরা!

বললাম—আহ্লাদি এখানে কি করে এল রে ?

—কে জানে ? আহ্লাদিকেই শুধোস !

—এতগুলো ছেলের মধ্যে ও কোত্থেকে ভেসে এল। ষোলঘরের নামতা পড়তে-পড়তে ও যেন হঠাৎ একঘরের নামতা—ভারি সোজা।—ঘুমুচ্ছিস নটরু ?

নটরু পাশ ফিরেছে।—মাস্টারকে জিগগেস করলেও খবর পেতে পারিস।

—তার মানে মাথার ঘা-টা আর না শুকোক এই তোর ইচ্ছে !

—রাখ, ঘুমো। রাত ঢের হল। সাঁঝের তারাটা কতদূর উঠে এসেছে দেখেছিস ?

নস্তুটা বেজায় কাশছে। একবার এ-পাশ আরবার ও-পাশ। খুকখুক খুকখুক—ঠায় শুতে পাচ্ছে না। বালিশটায় মাথা গুঁজে হামাগুড়ি দেবার মতো করে একটু শুল।

—ওর কি হল ? নস্তুর ?

—হাঁপানি। রোজ কাশে। বেচারা ঘুমুতে পারে না চোখ ভরে কোনো রাতে। কিন্তু গা-সওয়া।

—না রে, দেখছিস না কেমন হাঁসফাঁস করছে।

—থাক, আমাকে ঘুমুতে দে বলছি। আর বকবক করলে মুখে থুতু দেব। নটরুটা একটুতেই চটে।

নিঝুম। চোখ বুজে পড়ে ছিলাম হাতের উপর মাথা রেখে, হঠাৎ যেন কে এল। চোখ চেয়ে দেখি—আহ্লাদি।

—চাটায়ে শুয়ে ঘুম আসছে না, না রে ?

—আসবেখন।

—এই আমার বালিশটা নে। পরশু থেকেই কাঁথা পাবি। আহ্লাদি আমার মাথাটা দুই হাতে তুলে বালিশটা ঘাড়ের তলায় গুঁজে দিয়ে চলে গেল।

বালিশটায় সোঁদাল গন্ধ ভুরভুর করছে। মামা একদিন আমার দুহাত কড়িকাঠে বেঁধে ঝুলিয়ে রেখেছিল, মামীর বঁটির দাগ আজও মেরুদণ্ডের কাছে ধনুকের মতো বেঁকে আছে ভুলে গেলাম, ভুলে গেলাম মাথায় আমার এর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত জ্বালা করছিল।

সকালবেলা চেয়ে দেখি বালিশটা আশ্চর্যরকম স্থান পরিবর্তন করেছে কিন্তু। আমার ঘাড়ের তলা থেকে একেবারে কখন যে নটরুর বুকের তলায় পৌঁছেচে আবিষ্কার করা কঠিন। তাড়াতাড়ি ধড়মড় করে উঠে বসলাম। ভোরবেলাকার ঘুমে মানুষকে কি সুন্দর দেখায় সেদিন নটরুর মুখের দিকে চেয়ে বুঝেছিলাম। সেদিন নটরুর আর ঘুম ভাঙিনি।

আমাতে বসন্তে দারুণ খোঁজাখুঁজি। সুতোয় মাঞ্জা হল, লাটাই এল, ঘুড়ি তৈরি—নটরু নেই। পিটালি গাছের তলায় নটরু বসে। এগিয়ে দেখি পা ছড়িয়ে বসে ও পুঁতির মালা গাঁথছে।

—কিরে, ঘুড়ি ওড়াবি আয়!

—আজ আর নয় ভাই, কাজ আছে।

হাসি পায়, নটরুর কাজ! বসন্ত পুঁতিগুলি ছড়িয়ে দিয়ে বললে—ঘোড়ার ডিম! নটরু সোজা দাঁড়িয়ে উঠেই বসন্তের পেটে এক লাথি।

—শিগগির গুছিয়ে দে বলছি, নইলে পিলে ফাঁক করে দেব, রাস্‌কেল।

বসন্ত গুছিয়ে দিলে। নটরু ফের পা ছড়িয়ে মালা গাঁথতে বসল। অথচ কাল সারা দুপুরের ছুটিতে ঘুড়ি লাটাই নিয়ে কত তোড়-জোড়। চড়কপুকুরের ছোঁড়াদের ঘুড়ি শুধু কাটবে না, লটকাবে।

—পুঁতি কোত্থেকে যোগাড় করল রে বসন্ত? কিনল?

—হ্যাঁ।

বসন্তর খুব লেগেছে।

—পয়সা কোথায় পেল? জানিস?

—তোকে বলব, কিন্তু ওকে বলিস নে, খবরদার। বলবি না তো?

—কক্ষনো না, কক্ষনো না।

—বললে এবার তাহলে পাঁজরা চুর হবে ভাই! শুনবি কি করে পয়সা পেল? পরশু মিছিল করে যাবার সময়—তুই, মাস্টার সব এগিয়ে ছিলি—একটা অন্ধ ভিখিরী লোহার পুলের কাছে বসে ভিক্ষে করছিল। পাশে তার একটা টিনের বাটি, বাটিটা নটরু খপ করে তুলে নিয়ে পয়সাগুলি মুঠিতে চেপে বাটিটা ড্রেনে ছুঁড়ে দিলে; সাত আনা—আটাশটা পয়সা ভাই। বললাম—একপয়সার ঝালচানা কিনে দে নটরু। দিলে না। ঐ আটাশটা পয়সা দিয়েই পুঁতি কিনলে।

—পুঁতি? কি করবে ও দিয়ে?

—কে জানে?

সন্ধ্যার দিকে সবাই জানলাম। সেই পুঁতির মালা আহ্লাদির গলায় দুলছে। সে-রাত্রে নটরুর পাতে আস্ত কৈ মাছ পড়ল, দুখানা বেগুন ভাজা, দুহাতা টক। আমার খালি চাটাই-ই ভালো। কিছু না বলে বালিশটা নটরুর গায়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। বালিশটা তেমনি ওর বুকের তলায় গিয়ে সেঁধোল। নন্তুর কাশি থামে না। ওর পাশে বসে বুকে একটু হাত বুলিয়ে কে দেবে।

বামনিকে বললাম—বামনি, আমাকে সাতআনা পয়সা দিতে পারিস ?

বামনি দাঁত বার করে হাসে।—পয়সা দিয়ে কি করবি রে পচা ?

বামনি আমাদের বাজার আর রান্না করে। পরিবেশন করে আহ্লাদি।

বললাম—ধারই না হয় দে।

—কি করে শুধবি ?

আমার গালটা টিপে দেয়।

—মাস্টারের এতগুলো দোক্তা তোকে দেব বামনি।

—চুরি করে নাকি রে ?

আমার ঠোঁট দুটো আবার টিপে দেয়।

বাটনা বেটে-বেটে বামনির আঙুলে কড়া পড়েছে।

ইস্কুল যেই ভাঙল, পথে বেরিয়ে এলাম। ধুলোর চিঠিতে ডাক পড়েছে।

নাওয়া নেই, খাওয়া নেই—পথের পর পথ ভাঙছি। গাছের ছায়া গাছের তলায় গুটিয়ে এসেছে।

—আমাকে একটা টাকা দেবেন ?

জুড়ি-গাড়ির মেয়ে অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকায়। সঙ্গিনীর পানে চেয়ে মুচকে হেসে বলে—টাকা ? টাকা দিয়ে কি করবে ?

ঢোক গিলে বললাম—আমার মা আজ তিনদিন উপোসী—আমরা ভারি গরিব, আমার মা'র বড্ড অসুখ, পেটে ভীষণ ব্যথা।

চোখে জল এসে পড়েছিল। মা'র কথা বললেই চোখে জল আসে।

সঙ্গিনী বলে—কি আস্পর্ধা ভিখারী-ছেলেটার! টাকা চায়!

একটি ছেলে দোকান থেকে একটা এসেন্স কিনে এনে পথের পাশে দাঁড়ানো গাড়ির পা-দানিতে পা রাখতে যেতেই এই কথাটি শুনলে।

—যা-যা বেরো, টাকা চাস, টাকায় কপয়সা জানিস ?

আমি দূরে দাঁড়িয়ে মেয়েটির পানে চেয়ে বলি—আমার মা কাল রাতে অনেকগুলি বমি করেছিল, তাতে রক্ত উঠেছে। টাকা নেই বলে ওষুধ নেই। আমার মা খুব যে কাঁদে।

ছেলেটি এসেন্সের ছিপি খুলে মেয়েটির চুলে, বুকের কাছের কাপড়গুলিতে লাগিয়ে দিচ্ছে। মেয়েটির গালে চিবুকে ঠোঁটে চোখের কোলে হাসির হাসনুহানা! এসেন্সের গন্ধে সমস্ত রাস্তা মাতোয়ারা।

একটা এসেন্সের শিশির দাম কত ? এক টাকারও বেশি ?

পথের পাশে বসে পড়েছি। যে-হাত মাস্টারের বেতের জন্য মেলে ধরতে অভ্যস্ত হয়েছিল তা এখন পয়সার জন্য প্রসারিত হচ্ছে। বেত পড়তে পারে, পয়সা পড়ে না।

—বিকেলে বাড়ি গিয়ে আমার মাকে হয়তো আর দেখতে পাব না। ওরা নিশ্চয়ই টেনে ছেঁচড়াতে-ছেঁচড়াতে মাকে কেওড়াতলায় নিয়ে যাবে। বাবু, একটা পয়সা দিয়ে যান।

দুঘণ্টায় দুটি পয়সা রোজগার হয়।

একটা চীনাবাদামওয়ালা হেঁকে যাচ্ছিল।

তখন পথের কাঁকরগুলিও চিবিয়ে খেতে পারি। ডাকলাম—এক পয়সার মিশিয়ে দে।

না, থাক। হয়তো যা কিনতে যাব, তা দুপয়সা কম পড়বে বলেই কেনা যাবে না। এ-রাস্তার মোড়টা ভারি অপয়া নিশ্চয়। আবার পথ ! তার শেষ আছে ?

আরো বাষট্টি পয়সা।

প্রকাণ্ড মাঠ ; বেজায় ভিড়। একদিনে সবাই যেন ঘর ছেড়েছে জোট বেঁধে !

—কি মশাই এখানে ?

—খেলা ; ফুটবল।

চেঁচামেচিতে আকাশের কানে তালা লেগেছে। মাঝে-মাঝে ভিড়ের মধ্য দিয়ে মাথা গলাতে চাই, কনুইয়ের গুঁতো খাওয়ায় মাথা তখনো অভ্যস্ত হয়নি।

ভদ্রলোক খপ করে আমার হাতটা ধরে ফেললে। চারপাশে লোকারণ্য জমে গেল।

—এই টুকুন ছোঁড়া, আমার পকেটের মধ্যে হাত চালিয়ে একটা টাকা সরিয়েছে। দে শিগগির !

চাঁটির পর চাঁটি, চড়ের পর চড়, চুল ধরে দারুণ ঝাঁকুনি ! টাকাটা তখন আমার মুখের মধ্যে জিভের তলায়।

আর একজন বললে—পুলিশে দিন মশায়, সায়েস্তা হোক।

—পুলিশ কি হবে ? আমরা আছি কি করতে ?

আমার দুটো গাল কে একজন ভীষণ জোরে চেপে ধরল, দাঁতগুলো মড়মড় করে উঠেছে। টাকা তবু ছাড়ি না।

পুলিশকে খবর না দিলেও আসে। লাল-পাগড়ি দেখে সমস্ত গা কালিয়ে এল। ভিড় হালকা হয়ে গেল। পুলিশ আমার কাছে এসে বললে—দে-দো। টাকাটা মুখ থেকে

বার করে কাপড় দিয়ে মুছে ওর চকচকে মুখখানির পানে একবার চেয়ে পুলিশের হাতে দিয়ে দিলাম।

কিন্তু আশ্চর্য বলতে হবে। পুলিশ আমার হাত ধরে টানতে-টানতে নিয়ে গেল না। টাকাটা হাতে করে বেমালুম সোজাই চলেছে—এত বড় রাজত্বে সর্বত্রই শান্তি ও শৃঙ্খলা, ওর মুখে সেই ভাব স্পষ্ট আঁকা।

কিন্তু পিছনে ওর ভিড় লেগে গেল।—টাকা নিয়ে কোথায় যাচ্ছ?

পুলিশ সে-কথায় কোনো কানও পাতে না। আপন মনে এঁকে-বেঁকে চলে। ভিড়ের সঙ্গে-সঙ্গে পুলিশের পিছু-পিছু আমিও চলি। পুলিশের পিছু নিয়ে আমাকে সবাই ভুলে গেছে।

ছেলেটিকে ভারি সাহসী বলতে হবে—পুলিশের রুলসুদ্ধু হাতটা ধরে ফেলে বললে—টাকা নিয়ে কোথায় ভাগছিস?

—কিসের টাকা?

পুলিশ বুক চিতিয়ে রুখে দাঁড়ায়।

কে একজন খাপ্পা হয়ে তার সমুখের লোকটিকে পুলিশের গায়ে ঠেলে ফেললে। পুলিশ ধাক্কা খেয়ে মাটিতে একেবারে উপুড় হয়ে পড়ল, তার পাগড়ি গড়িয়ে গেল।

—মার! মার শালাকে।

একটা হুলুস্থূল ব্যাপার। ভিড় পিছনে হটে দাঁড়াল। আমিও সরে যাচ্ছিলাম, দেখি পায়ের কাছে কি একটা গড়াতে-গড়াতে এসে ঠেকছে। তুলে নিয়েই ছুট। তখন সবাই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছে। কেননা—পুলিশ ওর রুল বাগিয়ে নিয়ে মরিয়া হয়ে ভিড়ের মধ্যে অন্ধের মতো চালাতে শুরু করেছে। একটি ছেলের মাথা ফেটে রক্তের ফোয়ারা, আরেকজন অজ্ঞান। লাল পাগড়ির জোয়ার ডেকে এল---একটা প্রকাণ্ড হৈচৈ।

হাঁপাতে-হাঁপাতে একটা গাছতলায় এসে নেতিয়ে পড়লাম। কাপড়ে ফের মুছে নিয়ে ওর চকচকে মুখখানা দেখতেই বুকটার মধ্যে ঝিরঝির করে বাতাস বয়ে গেল। যেন আমার মা কোন দূর দেশ থেকে আমার হাতের তালুতে ছোট্ট একটি চুমু পাঠিয়ে দিয়েছে।

শুয়ে পড়ি। ইচ্ছে করে ফের আহ্লাদি ওর দুই হাতে ঘাড়টা তুলে তলায় ওর ময়লা গন্ধওলা বালিশটা গুঁজে দিক।

মাঠ শুধু প্রকাণ্ড নয়, বাজারও প্রকাণ্ড—আলোয়-আলোয় ঝলমল করছে। ঢুকতে গা ছমছমায়। কি কিনি? দিশা পাই না।

সামনেই একটা পুতুলের দোকান। এগিয়ে গিয়ে শুধোলাম—আমাকে একটা ডল দেবে ?

দোকানী হাসে, ঠাট্টা করে বলে—মাগনা ?

—না, না ; কম দামের মধ্যে। আমার ছোট বোনটি তিনদিন ধরে একটা পুতুলের জন্য কাঁদছে, দুধের বাটি ফেলে দিচ্ছে, কাঁদতে-কাঁদতে তার জ্বর হয়ে গেল। তার জন্য একটা ভালো দেখে ডল দাও। এটার দাম কত ?

— বহুত। এটা নাও। দাম দু আনা।

দোকানী আমাকে ভেবেছে কি ? বলি—এটা ?

— পাঁচসিকে।

—আর কিছু কমিয়ে দাও না! বোনটির যে পুতুলটা ভেঙে গিয়েছিল সেটা ঠিক এমনিই দেখতে—এমনি নীল চোখ, এমনি ঘাঘরাটা। এক টাকা দি, কেমন ?

টাকাটার চকচকে মুখখানি আবার, শেষবার দেখে নিয়ে দোকানীর হাতে দিলাম। দোকানী আপত্তি করল না, চুপ করে রইল।

দুপয়সায় এবার চীনেবাদাম খাওয়া যেতে পারে। কিম্বা বিড়ি।

দোকান থেকে বেরিয়ে এসে একটি ভিক্ষুক দেখে মনে হয়, কত ঘণ্টা ধরেই না জানি ও এমনি নিষ্ফল কাকুতি করছে! পয়সা দুটো ওর পেটেই যাক। এই পুতুলটার মা হবে আহ্লাদি—বেশ হবে। খুকির নাম কী রাখব ?

পথ চিনে-চিনে ইস্কুলে যখন এসে পৌঁছি তখনো বাইরে তুলসীতলায় আহ্লাদির-দেওয়া তেলের বাতিটি নেবেনি।

দোরে পা দিতেই সমস্বরে সম্বর্ধনা এল—এই যে পচা। এই তো এসেছে। কোথায় ছিলি এতক্ষণ ?

—এসেছে ?

আর্তনাদ করে মাস্টার তেড়ে বেরিয়ে এল। লণ্ঠন নিয়ে বেরিয়ে এল আহ্লাদি। পুতুলটা তাড়াতাড়ি কাপড়ের তলায় লুকিয়ে ফেললাম।

অন্ধকার হলেও মাস্টারের মুখ দেখে হৃৎপিণ্ড অসাড় হয়ে গেল। কাউকে পাঠিয়ে মেহেদির ডাল ভেঙে আনবার ধৈর্য মাস্টারের ছিল না। ডান পায়ের খড়ম তুলে নিয়ে হাঁকলে—চৌত্রিশ।

সব সরে দাঁড়াল।

আমার পিঠের হাড় কখানা চূর্ণ হয়ে গেল! চিৎকার করে উঠলাম—আমি পথ

হারিয়ে গেছলাম, এত বড় কলকাতা শহর, কত কষ্টে এসেছি, কিছু খাইনি, আমাকে ছেলেধরা ধরে নিয়ে-গেছল।

মাথায় ছাব্বিশের বাড়িটা পড়তেই মাথাটা দুহাতে চেপে মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম। পুতুলটাও আমার সঙ্গে ধুলিশয্যা নিতেই, মাস্টারের বাঁ পায়ের খড়মের চাপে—চেঁচিয়ে উঠলাম—আমার পুতুল, আহ্লাদি—খুকি খুকি—অনেক অবান্তর কথা কয়ে ককিয়েছি, ও-কথার অর্থও কেউ বোঝেনি।

আহ্লাদি আমার কান্না শুনে কাপড় দিয়ে মুখ ঠাসছে। কিন্তু গলায় যে ওর নটরুর-দেওয়া পুঁতির মালাটা!

সমস্ত বুকে পিঠে ব্যথা, কিন্তু বুকের মধ্যে ব্যথা পুতুলটার জন্য।

চাটায়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। খাওয়া বন্ধ—মাস্টারের হুকুম। নটরুটা বেজায় খুশি; বালিশটা আজও ওর বুকের তলায়।

পা টিপে-টিপে যেমন চলা, তেমনি আস্তে-আস্তে ঘুম ভেঙে গেল।

মাঝরাত, ঝিল্লি ডাকছে। হঠাৎ আহ্লাদির ঘর থেকে আর্ত চীৎকার উঠল—চোর, চোর!

ঘুম ছেড়ে সবাই হল্লা শুরু করেছে। মাস্টার লাঠি নিয়ে বেরিয়ে এল। সবাই আহ্লাদির ঘরে। ভয়ে কেউ একটা লণ্ঠন জ্বালাতে পর্যন্ত পারে না। শেষকালে আমিই জ্বালালাম।

আহ্লাদি তখনো থরথর করে কাঁপছে। মাস্টার বললে—কোথায় চোর?

আহ্লাদি বললে—হ্যাঁ, দরজা ঠেলে ভেতরে এসে আমার বিছানার ধারে বসল।

—তারপর?

সবাই চেঁচিয়ে উঠেছে।

—আমার গলাটা টিপে ধরে মালাটা ছিঁড়ে ছিনিয়ে নিল।

সত্যি-সত্যিই দেখলাম ওর সারা বিছানায় পুঁতিগুলি ঝরে পড়েছে—সোনালি পুঁতি।

—তারপর চোর বলে চেঁচাতেই দরজা খুলে বাঁশ-ঝোপের আড়াল দিয়ে পালিয়েছে—

—চল, চল, সবাই চল।

মাস্টারের হুকুমে বাঁশ-ঝোপের আনাচে-কানাচে খুঁজতে লাগলাম সবাই, লণ্ঠন নিয়ে।

নটরু বললে—সোনালি পুঁতি কিনা, চোর ভেবেছে বুঝি সোনার হার। বেটা ভারি জব্দ হয়েছে তো।

আহ্লাদি ঠোঁট ফাঁক করে হাসে। বলে—বুক আমার এখনো কাঁপছে ভাই! বেটা কি জোয়ান, সিংহের থাবার মতো হাত, আর একটু হলে গলা টিপেই মারছিল আর কি।

নটরু গলা খাটো করে বললে—তোকে আমি সোনার হার দেব আহ্লাদি। তুই ভাবিসনে।

আহ্লাদি মিথ্যে কথা বলে। চোর কক্ষনো ওর গলা টিপে ধরেনি।

কত দিন পরে মনে নেই, ঘুম ভেঙে মনে হল আহ্লাদির সমস্ত গা আহ্লাদে ভরে গেছে। ওর গায়ে একটা ব্লাউজ।

জিগগেস করে ফেলি—কোথায় পেলি রে এ-জামাটা ?

আহ্লাদি মুচকে হাসে, কথা যেন বেরোয় না—মাস্টার।

নটরু এসে বলে—কত দাম নিলে রে আহ্লাদি ?

এ কি অন্ধ ভিখিরীর ডালার আটাশ পয়সা ? ঢের-ঢের দাম। উমির একরত্তি একটা ফ্রক-এর দাম নিয়েছিল সাড়ে-পাঁচটাকা। এমনি তার রঙ। সাড়ে-পাঁচটাকা নটরু দেখেছে ?

উমি আমার পাঁচ বছরের ছোট মামাতো বোন—ঠোঁটের কিনারে ছোট্ট একটি তিল। মনে পড়ে।

বাতিটায় তেল নেই, বইয়ের আখর ঝাপসা হয়ে আসছে। বলি—নস্তু, আহ্লাদির কাছ থেকে একটু তেল চেয়ে আনবি ? পড়াটা তৈরি করে ফেলি।

—তুই যা না। কেশে-কেশে আমার দম আটকে আসছে—আমি উঠতে পারছি না। তুমি কোন নবাব পুত্তুর।

ভুগে-ভুগে নস্তুর মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে উঠেছে।

একটা মোটে বাতি। বাতিটা নিবে গেল।

হারান বললে—আহ্লাদি কি করেই বা তেল দেবে ? ওর তো জ্বর।

—জ্বর ? কে বললে ? বিকেলেও তো পেড়ে-পেড়ে কুল খাচ্ছিল।

—তাতে কি ? মাস্টার ডাক্তার পর্যন্ত ডাকতে গেছে।

কেষ্ট খুব কম কথা কয়। হঠাৎ বলে উঠল—মাস্টারের সব তাতেই বাড়াবাড়ি। জ্বর আসতে না আসতেই ডাক্তার। আর নস্তু আজ পুরো একটা বছর কাশছে।

বাতি নিবতেই নটরু শুয়ে পড়েছিল। মাস্টারের খড়মের আওয়াজ দোরের কাছে আসতেই চেঁচিয়ে উঠল—পচা আলো নিবিয়ে দিয়েছে, পড়া করতে পারছি না।
আমিও চেঁচিয়ে বলি—তোর বালিশের তলায় তো বিড়ি ধরাবার দেশলাই আছে, দে না।
অন্ধকারে তারপর ভীষণ মারামারি শুরু হয়। লাভ হয় না কিছুই। মাস্টার বেত নিয়ে হাঁকে—একুশ।

আহ্লাদির জ্বরটা জোরেই এল বলতে হবে।
সাঁঝ সাতটা থেকে ভোর সাতটা পর্যন্ত বারো ঘণ্টা ভাগ করে তিনজন করে ডিউটি পড়ে।
সবার ভাগে চার ঘণ্টা। মাস্টার ঘুমায়। তার ডিউটি দিনের বেলা। ইস্কুল আর বসে না।
ইস্কুলের খাতায় সব শেষে নাম বলে ডিউটিও পড়ল সব শেষে। সাতটা থেকে এগারোটা—ডিউটি পড়ুক আশা করিনি। ঐ টুকুন রাত তো প্রায় রোজই জাগি। এগারোটা থেকে তিনটে—ভারি সুন্দর সময়! বরাতে নেই। ঘরে ঢুকেই বললাম —ডোবায় নাইবি আর আহ্লাদি?
আহ্লাদি দুটো হাত ধরে একেবারে বুকের কাছে টেনে বসিয়ে দেয়।
হঠাৎ শুধোই—তোর মাকে মনে পড়ে?
আহ্লাদি কি বলেছিল তার তাৎপর্য বুঝিনি। বলেছিল—ওর মা যখন চড়কতলায় খোলার ঘর ভাড়া নিলে তখন ও সাত বছরের। মাস্টারের পয়সায় ওদের দিন চলত। হঠাৎ ওর মা যখন মারা পড়ে, মাস্টার তখনু ওর হাত ধরে শ্মশান থেকে বরাবর এই আশ্রমে নিয়ে আসে।
বলি—মাস্টার তোর কে হয়?
আহ্লাদি শুধু বলে—মাস্টার।
পাখা করতে-করতে আমার হাতে ব্যথা ধরে। ঘুম পায়। কাঁহাতক ঠায় বসে থাকা যায় চুপ করে?
—কি রে, ঢুলছিস? ঘুমোবি?
আবার পাখা চলে।
—আয়, ঘুমো।
আহ্লাদি আমার মুখটা একেবারে ওর বুকের উপর চেপে ধরে।

—কতক্ষণ আর! এগারোটা বাজতেই তো মাস্টার চুলের ঝুঁটি ধরে তুলে নিয়ে যাবে।

—যাক, এখনো তো এগারোটা হয়নি। বলে গুনে-গুনে আহ্লাদি আমার গালে ঠোঁটে এগারোটা চুমু দেয়। শব্দগুলি যেন আজও শুনতে পাচ্ছি।

দক্ষিণের জানলাটা খোলা ছিল।

নটরু একেবারে মারমুখো—কোমর কেছে এসে বলে—তুই আহ্লাদিকে চুমু দিয়েছিস?

প্রশ্ন শুনে তাক লেগে যায়।—দিয়েছি তো দিয়েছি, তোর কি?

—আমার কি? বলে সাঁ করে গালে এক চড় কষিয়ে দিলে।

কিন্তু যুদ্ধে সেদিন হারলাম না। আহ্লাদির চুমো আমার গায়ের সমস্ত রক্ত পাগল করে দিয়েছে।

নটরু কেঁদে ফেলেছে। বললে—মাস্টারকে আমি এখুনি বলতে যাচ্ছি।

—যা না! এও বলিস আহ্লাদির চুমু না পেলেও পচার পঁচিশটা লাথি পেয়েছিস।

নটরু মাস্টারকে বলে না বটে কিন্তু নন্তুর মাঝরাতের ডিউটি কেড়ে নেয়। বললে—খানিক বাদেই তো তোর ঘড়ঘড় শুরু হবে। তুই যা, বালিশে মাথা গুঁজে উবু হয়ে শুয়ে থাক গে যা। হেঁপোরুগী, ডিউটি দেয় না, যা।

নন্তু আপত্তি করে না। কিন্তু আমার মাথাটা যেন কেমন করে ওঠে।

নটরু দরজা ভেজিয়ে দেয়। আমি দক্ষিণের খোলা জানলার তলায় মাটির দেয়ালে পিঠ রেখে ঘুপটি মেরে বসে থাকি।

তেমনিই আহ্লাদি ওকে বুকের মধ্যে মুখ রেখে শুতে বলে। তেমনি একের পর এক ঘনঘন শব্দ হয়।

মাস্টার তখন ছিলিমে বসে ঝিমুচ্ছিল। ছুটে গিয়ে বলি—শিগগির আসুন, আহ্লাদির—

মাস্টার হুঁকো ফেলে দৌড়ে আসে। বলে—কি?

—জানলা দিয়ে দেখুন।

মাস্টারের সঙ্গে আমিও মুখ বাড়াই। নটরুর মুখটা তখনো আহ্লাদির মুখের উপর। ওর খালি এগারো নয়, ওর বুঝি একশো-এগারো।

যা ভেবেছিলাম, তা কিছুই হয় না কিন্তু। মাস্টার শুধু নটরুর কান ধরে আলগোছে তুলে নিয়ে আসে। মাস্টারের পায়ে কি আজ খড়ম নেই!

পরদিন আশ্রমকর্তা এসে নটরুকে আশ্রম থেকে নির্বাসিত করে দিলে। মাস্টারকে বললে—এতগুলো ছেলের মধ্যে এত বড় মেয়ে রাখা উচিত হবে না। ওকে সরাও।

নটরুর যে একটা প্যাটরা ছিল, জানতাম না। যাবার বেলায় সেটা খুলল। দেখলাম, নানান জিনিসে ভরা—লাট্টু, গুলি, আয়না, চিরুনি, এমন কি আহ্লাদির ভাঙা কাঁচের চুড়ি পর্যন্ত।

বলি—কোথায় যাবি এবার ?

—কোথায় আবার ! পথে।

প্যাটরাটা গুছোতে-গুছোতে হঠাৎ থেমে বলে—এটা ঘাড়ে করে কোথায় বা নিয়ে যাব ? এটা থাক। আহ্লাদি ভালো হলে এটা আহ্লাদিকে দিয়ে দিস। ওর ব্লাউজ কাপড় রাখবে। দিবি তো পচা ?—বলে আমার হাত ধরে। প্রথম দিনও ও আমার হাত ধরেছিল।

আমার চোখ ছলছল করে ওঠে।

নটরু বললে—আমার কিন্তু একাই বেরুবার কথা নয়। তুই মাস্টারকে কেন বলতে গেলি ? আমার মতো ডিউটি বদলে নিলেই তো পারতিস।

মাস্টার এসে হুকুম দেয়—পৌনে ছটার আগেই আশ্রম ছাড়তে হবে।

সবারই কাছ থেকে বিদায় নিতে-নিতে দেরি হয়ে যায়। মাস্টার পিছন থেকে ছুটে এসে নটরুর পিঠে সপাং করে একটা বেত আছড়ে বলে—দুমিনিট দেরি হয়ে গেছে, দুমিনিটে আঠেরো।

কেষ্ট রেগে বলে—দেখি কেমন দুমিনিট বেশি হয়েছে ! বার করুন ঘড়ি—আবার বেত পড়তেই নটরু 'মাগো' বলে ছুটে পথে বেরিয়ে গেল। বাকি বেতগুলি এবার নিশ্চয়ই কেষ্টর পিঠে পড়বে।

ডাক্তারের বাড়ি থেকে মাস্টার খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে এল।

মাস্টার নটরুকে পুলিশে দেবে প্রতিজ্ঞা করলে। পথের পাশে অন্ধকারে গা ঢেকে মাস্টারের পায়ে বাঁশ চালিয়েছে।

ঘরে এসে বলি—বেশ হয়েছে। পা দুটো গুঁড়িয়ে গেল না রে !

বালিশ থেকে মুখ তুলে নস্তু উবু শরীরটা একটু দুলিয়ে হাঁপিয়ে-হাঁপিয়ে বলে—মাথাতেই তাক করে মারতে গেছলাম, কিন্তু ফসকে গিয়ে লাগল মাস্টারের পায়ে।

ভয় করছিল বুকের সাঁই-সাঁই আওয়াজ পেয়ে চিনে ফেলে। বেটা এমন চোঁচা ছুটলে ভাই, শেষে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল।

আজ সমস্ত রাত নন্তর পাশে বসে ওর বুকে হাত বুলিয়ে দেব। আহ্লাদির ডিউটি মাস্টার দিক গে।

আহ্লাদিকে কিন্তু মাস্টার সরাল না। ডোবার ধারে ছোট্ট একটি ঘরে আহ্লাদির কোয়ার্টার হল—বেড়া দিয়ে চারধার ঘেরা। হুকুম হল—যে ছেলে ঐ ধারে যাবে তার শাস্তি নির্বাসন।

তারপর—ভাবতে অবাক লাগে—দুবছর কেটে গেল, তিন বছরও প্রায় ভরে এল—আহ্লাদিকে দেখি না। ঐ বেড়ায় ঘেরা ছোট্ট বাড়িটি ভোরের শুকতারার মতো দূর আর সুন্দর মনে হয়।

ঐ বাড়িতে কখন মিটমিট করে বাতি জ্বলে, কখন নিবে যায়, সব চেনা হয়ে গেছে। বেড়ার ঢাকনি দেওয়া ঘাটে বসে গা ধুলে কখন ডোবার নীলচে জল চঞ্চল হয়ে ওঠে, জানি। ঘুড়ি ওড়াবার সময় ইচ্ছে করে ওর উঠোনে ঘুড়ি গোঁত মেরে ফেলে দিই, ও ঘুড়ি ছিঁড়ে রাখে—নীল সবজে বেগনী। তাতে লেখা থাকে-আহ্লাদি, আহ্লাদি, আহ্লাদি!

আমি এখন সকল ছেলের পাণ্ডা—ইস্কুলে, সাঁতারে, খেজুর গাছে, মাটি চষায়, তামাকে আর বিড়িতে। দুপুরের ইস্কুল ছুটি হতেই মাস্টার আমাকে বললে—তিনদিনের জন্য তোকে আশ্রমের ভার দিয়ে যেতে চাই, পারবি? তুই তো এখন বেশ ওস্তাদ হয়েছিস।

—খুব পারব। আপনি কোথায় যাবেন?

—আমি আজ সন্ধ্যার গাড়িতে আহ্লাদিকে নিয়ে দেশে যাব। ওকে আর এখানে রাখব না, ওর পিসির কাছেই থাকবে।

আহ্লাদির আবার পিসি কে? এতদিন কোথায় ছিল? চুলোয়?

যাবার বেলায় আহ্লাদিকে একবার দেখতে পাই না? সন্ধ্যা উতরে গেল। গাড়ি নিশ্চয়ই কত বন নদী পেরিয়ে ছুটেছে। আহ্লাদি ঘুমিয়ে পড়েছে হয়তো। যদি যাবার আগে দূর থেকে বেড়ার ফাঁকে একটুখানির জন্যও ওর চোখ দুটি রাখত!

চেয়ে দেখি বেড়ার ফাঁক দিয়ে বাতি দেখা যাচ্ছে। যাবার বেলায় আহ্লাদি তার বাতির স্মৃতিচিহ্নটি আমাদের জন্য রেখে গেছে। বাতিটা যদি বেড়ায় লেগে একটা ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হয়ে সমস্ত আশ্রম পুড়ে যায়, বেশ হয়।

বারো বছরের ছেলের চোখে ঘুম আসে না। শেয়াল ডাকে, ঝরা পাতার উপর দিয়ে সাপ হেঁটে যায়, ন্যাড়া খেজুর গাছ অন্ধকারে প্রকাণ্ড ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে থাকে—বারো বছরের ছেলের ভয় নেই, ডোবার ধারে পায়চারি করে বেড়ায়।

হঠাৎ একটা চীৎকার শুনতে পেলাম। তিন বছর পর হলেও আহ্লাদির কান্না চিনতে দেরি হল না। তবে কি আহ্লাদিরা যায়নি? ঘুমের মধ্যে ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠেছে?

ছুটে মাস্টারকে জাগাতে গেলাম। কেউ নেই। দেয়ালের কোণে হুঁকোটি পর্যন্ত নেই। তার মানে?

—কেষ্ট, কেষ্ট, কে কাঁদছে শুনতে পাচ্ছিস? আহ্লাদি?

—আহ্লাদি? আহ্লাদি?

ঘুম ভেঙে সব উঠে দাঁড়াল আতঙ্কে! নন্তু পর্যন্ত।—কোথায়?

আমরা সব সজ্জিত হয়ে নিলাম। বাঁশের লাঠি, দরজার খিল, ভাঙা ছাতা, লোহার ডাণ্ডা, পকেট ভরে ঢিল ছুরি দেশলাই নিয়ে এগোলাম। বললাম—আস্তে-আস্তে আয়, হল্লা করিস নে, হৈচৈ করলেই চোর পালিয়ে যাবে কিন্তু।

বসন্ত বললে—আজ নটরু থাকলে কোনো ভাবনা ছিল না।

বললাম—তোরা চারপাশ ঘিরে থাকবি, আমি লোহার ডাণ্ডাটা নিয়ে সটান ঢুকে যাব ঘরে। চেঁচালেই সব হুড়মুড় করে এসে পড়বি।

কান্নার বিরাম নেই, বাতাস চিরছে।

—আর যদি ভূত হয়, আমাদের এতগুলোর চেঁচামেচিতে পাত্তাড়ি গুটোবে। রাম লক্ষ্মণ বুকে আছে, ভয়টা আমার কি?

সবাই বেড়ার চারধারে বিমর্ষ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। নটরুর চেয়ে আমি যে কিছুই কম নই দেখাবার জন্য লোহার ডাণ্ডা নিয়ে সোজা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লাম।

বসন্ত বললে—জোরসে চেঁচাস কিন্তু। আমরা সব হুড়মুড় করে পড়ব।

বাতিটা উসকে দিয়ে দেখলাম, আহ্লাদি মাটির উপর লুটিয়ে পড়ে গোঙাচ্ছে। ভালো করে চেয়ে দেখি, ওর পায়ের কাছে একটা মেয়ে; মরা। মাটি রক্তে ভেজা—আহ্লাদির গা ঠেলা দিয়ে ডাকি—আহ্লাদি! আহ্লাদি!—

ওর গা ঠাণ্ডা!

চীৎকার শুনে বাইরে থেকে সবাই সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল—মার, মার, মাথা ফাটিয়ে দে—

খোলা দরজা দিয়ে সবাই হুড়মুড় করে তেড়ে এসে পড়েছে। দুহাতে ওদের ঠেলে দিয়ে বলি—সরে দাঁড়া।

ওরা সব স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে থাকে। কারো মুখে রা নেই।

আমার পুতুল মাস্টার খড়মের চাপে চেপটে দিয়েছিল, নিজের পুতুল সে নিজেই ভাঙল।

বাতি নিবে যায়।

পথে বেরিয়ে আসি—অনাথ। হঠাৎ সমস্ত শাসন যেন শিথিল হয়ে গেছে। নৌকোর যেন আর নোঙর নেই—ভেসেছে এবার।

তরি-তরকারির বাজার। একজনকে বলি—মুটে লাগবে?

—কত নিবি? মোড়ের ঐ যে দোকান চুল ছাঁটবার—

—যা দেন—

মুন্সি আমাকে ওর দোকানে নিয়ে আসে। বলে—কোথায় থাকিস? কে আছে তোর?

—এখন থেকে কোথায় থাকব জানি না। নেই কেউ।

—কি নাম তোর?

—কাঁচা, কাঞ্চন।

—আচ্ছা, এখেনে থাকবি? শুধু খোরাকি আর আস্তানা।

উৎফুল্ল হয়ে উঠি—হ্যাঁ—

মুন্সি বললে—কিন্তু নাম বদলাতে হবে, ভোল বিলকুল ফেরাতে হবে, কেউ যখন নেই, ভাবনা কি?

ভয় পেলেও মুখে বলি—তাই সই।

আসমানি

মুন্সি ডাকে—এ মকবুল!

বললে—কিচ্ছু ভাবিস নে তু। পথে-পথে তো ঘুত্তিস, এবারে একটা হিল্লে হয়ে গেল। তারপর কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললে—আমার ভাজির সাথে তুর সাদি দেব।

একটি ভদ্রলোক এসে ঢুকল।

—মকবুল!

চেয়ার এগিয়ে দি, কাঁচি ক্ষুর ক্লিপ পাউডারের বাটি গুছোই, ভদ্রলোকের গায়ে একটা শাদা কাপড় জড়াই, হাতপাখা নিয়ে হাওয়া করি।

ভদ্রলোক তার মোটা চশমাটা তাকের উপর ফেলে রাখে, মুখের আধা সিগরেটটা রাস্তায় ছুঁড়ে মারে, গ্যাঁট হয়ে পা মেলে মুন্সিকে বললে—ধারগুলি সব প্লেন।

পাখা করতে-করতে এক ফাঁকে আজিজ মিঞার পাশে বসে ওর বিড়িটায় একটা টান দিয়ে শুধোলাম—মুন্সির ভাজির নাম জানিস?

আজিজ ফট করে বলে বসল—আমিনা। খাসা!

নামটা যেন তার জিভের ডগায়।

বললাম—বয়েস?

আজিজ কালো দাঁতগুলি বার করে ফেললে। বললে—তেত্রিশ।

মুন্সি আবার ড়াকে—মকবুল!

ভদ্রলোকের ঘাড়ের উপর বুরুশ ঘষি, কাপড়টা চট করে সরিয়ে পিছনের দিকে কাত করে আয়না ধরি!

ভদ্রলোক বললে—বেশ।

মাথায় জল ঢেলে মাথা টিপে দি।

ভদ্রলোক বললে—আর একটু।

আমার হাত দুটো টেনে এনে চোখের উপর রাখে, আঙুলগুলি বাবুর চোখের পাতার উপর বুলিয়ে দি। মুন্সিকে দাম চুকিয়ে চশমাটা এঁটে পকেট থেকে সিগরেট

বার করে ধরিয়ে পথে নামবার আগে আমার হাতটা টেনে মুঠোর মধ্যে কি একটা গুঁজে দিল।

আজিজ হাঁ হয়ে গেছে। বলল—মুন্সি আধঘণ্টা ক্লিপ ঘষে যা পেল না, দুমিনিট বুরুশ ঘষে তুই তার দুনো কামালি। লে, বিড়ি আনি গে।

—ইস ?

করকরে আধুলিটা ট্যাঁকে গুঁজে রাখি।

আমি কিন্তু আমিনার বয়স এগারোর বেশি বলে কিছুতেই ভাবতে পারি না। ওর পরনে নিশ্চয়ই ঘাঘরা নেই, কলমিফুলি শাড়ি। দুটি হাতের তালু মেহেদির পাতায় রাঙা ; ওদের বাড়ির উঠোনের ধারে নিশ্চয়ই পানায় ভরা পুকুর, নীলচে জল, দুটো হাঁস পাঁক খোঁড়ে। পুকুরের পাড়ে পেয়ারা গাছ, কচি পাতার তলায়-তলায় কড়া পেয়ারা।

ভদ্রলোক দুদিন অন্তর আসে—পকেটে ক্ষুর সাবান স্ট্রপ নিয়ে। বলে—দাড়িটা কামিয়ে দাও মকবুল মিঞা।

দাড়ি কামিয়ে ড্রেস করি, তেমনি করে চোখের পাতায় আঙুল বুলোই। অনেকক্ষণ। মুন্সির দোকানের প্যাটরার ফাঁকে দুআনি পড়ে, আমার গাঁটে ঢোকে দুনো।

সেদিন আজিজ মিঞা এগিয়ে গেল। ভদ্রলোক বললে—তুই-ই আয় মকবুল!

আজিজ বললে—ওর গা-টা ম্যাজম্যাজ করছে।

—দাড়ি কামানো যায় না ? তাতে কি রে ?

অল্প একটু হাসলাম। আজিজ ক্ষুর-টুর ছড়িয়ে রেখে মুখ ভার করে বেঞ্চিটার উপর বসল।

আজিজকে গিয়ে বললাম—আজকের আধুলিটা তুই-ই নে।

আমার হাতটা ও ছুঁড়ে দিলে ; বললে—তোর রোজগার আমি নিতে যাব কেন ? পরে কি একটা কথা বিড়বিড় করে বললে—স্পষ্ট বোঝা গেল না। সেদিন ভদ্রলোকের আসবার সময়-সময় বেরিয়ে পড়লাম।

আজকে আজিজই দাড়ি চাঁছুক। ঘণ্টাখানেক টহলদারি করে ফিরে এসে শুধোই —বাবু এসেছিল রে আজিজ ?

আজিজের গাল দুটো গুম হয়ে আছে। বললে—তোকে খোঁজ করলে—

—কামাল না ? কত দিলে তোকে ?

—প্রায় দশ মিনিট ধরে ড্রেস করলাম—শালা একটা পয়সাও দিয়ে গেল না।

—মুখ খারাপ করিসনে আজিজ, খবরদার।

—মারবি নাকি ?

এক হাতে লুঙ্গির খানিকটা তুলে ধরে ও তেড়ে এল।

মুন্সি মাঝখানে এসে পড়ল। ওকে ঠেসে ধমকালে, আমাকে টুঁও বললে না।

ও বিড়-বিড় করে বললে—কোন শালা এমনি করে—

দোকান ছেড়ে চলে গেল। মুন্সি বললে—হোটেলে খেতে গেল।

বললাম—আমার সাত পয়সা ?

মুন্সি হাসল, বললে—তুই তো কম কামাচ্ছিস—

—বা, ও তো আমার উপরি পাওনা। আমার বরাদ্দ খাবার পয়সা আমি ছাড়ব কেন ?

—আচ্ছা, এই নে। উপরি পাওনা দিয়ে কি করবি ?

চট করে মুখে আসে না। কিন্তু মনে-মনে দেখি আমার সব সিকি আধুলি সোনার ফুল হয়ে গেছে ; পুঁতির মালা নয়—আমিনার গলায় পুষ্পহার।

আজিজ গামছা ফেলে গেছল। বললাম—খাওয়া হয়ে গেল ?

আমার কথায় রা করলে না।

—আর জন্মে ঠোঁটের কাছের আঁচিলগুলি সব চেঁছে রঙটা আর একটু মেজে আসতে পারিস, এ-দিক ও-দিক দুচার পয়সা ট্যাঁকে গুঁজতেও পাবি আর আমিনাও কপালে লাগ-লাগ লেগে যেতে পারে। এ জন্মে—

আজিজ নিজে কথা কয় না বটে, কিন্তু ওর পাঁচটা আঙুল একসঙ্গে কথা কয় আমার পাঁজরার উপর।

খিলখিল করে হেসে উঠি। তার কারণ আছে—আজিজ মিঞার ঘুঁষির ওজন বিরিশি সিকে।

মাথায় গামছা বেঁধে বেরুতে যাচ্ছি, মুন্সি বললে—আগাম হপ্তায় দরগায় যেতে হবে রে মকবুল। মোল্লা বলে পাঠিয়েছে। সেইদিনই কলমা পড়তে হবে রে।

গা-টা ছমছমায়।

দরগায় যেতে হল না কিন্তু। সেদিন ভদ্রলোক ক্ষুর সাবান নিয়ে এসে নিশ্চয়ই ঘুরে চলে গেছে।

দোকানের ঝাঁপ পড়েছে।

টালিগঞ্জে মুন্সির বাড়ি। রোদে টো-টো—লুঙ্গি ফটফট করতে-করতে এক হাঁটু ধুলো নিয়ে মাটির ঘরের ভাঙা কবাটের কড়া নাড়ি।

মুচি-পটির এঁদো রোগা গলিটা চামড়ার গন্ধে সমসম করছে।

দরজাটা একটু ফাঁক করে কে খুললে। ভাবলাম এই বুঝি তার মেহেদিপাতায় রাঙা হাতের তালু—ছোট-ছোট নখের ধারে আবছা হয়ে এসেছে। সমস্ত হাত পা ঝিঁ-ঝিঁ করে উঠল।

মুন্সি বেরিয়ে এসে বললে—কে, মকবুল?

বললাম—আমার প্যাটরাটা মুন্সি—

—হ্যাঁ, কি হবে প্যাটরা দিয়ে?

—নিয়ে যাব।

—তু ক্ষেপেছিস মকবুল মিঞা! প্যাটরাটা মাথায় করে সারা শহর ঢুঁড়বি নাকি? যদি কোথাও জিরোবার জায়গা পাস, নিয়ে যাবি। এখন থাক না হেতা!

—কোথা আছে ওটা?

—আমিনার ঘরে। খোলবার কিছু দরকার আছে?

একটা প্যাচপেচে ঘরে মুন্সি আমাকে নিয়ে এল। চট করে চারদিক একবার চেয়ে নিলাম। একটা তক্তাপোশের উপর চিটচিটে বিছানায় গুটি কয়েক বেড়ালের বাচ্ছা চোখ মিটমিট করছে। এটাকে আমিনার ঘর ভাববার কোনো জো নেই কিন্তু। পাতলা তক্তাপোশের নিচে একজোড়া মেয়েলি চটি; কিন্তু আমিনার বয়স কি এগারো নয়?

মুন্সি বললে—তোর ওপর ভাজির কিন্তু ভারি টান পড়েছে রে মকবুল। একদিন আমাকে না বলে ক'য়ে প্যাটরা থেকে তোর বইগুলি খুলে সে কি মনোযোগে পড়া। যেন বুকে আঁকড়াতে চায়।

আমার বুকটা চিতোয়। বললাম—পড়তে জানে নাকি ও?

—জানে না আবার! রাতদিন তো বইয়ের মধ্যেই ডুবে থাকে—

ভারি খুশি লাগল।—ওর ভালো লাগলে আমার বইগুলি যেন ও রেখে দেয়।

মুন্সি আহ্লাদে ডেকে উঠল—আমিনা! আমিনা!

ভাবলাম, এই বুঝি ওর ছুটে আসার পায়ের ছোঁয়ায় সমস্ত ঘরটার অদলবদল হয়ে যাবে। কিন্তু আমিনার সাড়া নেই। মুন্সি বললে—বেটির ভারি সরম। প্যাটরাটা খুলে দেখি, কে যেন সব ঘেঁটেছে। আমিনার হাতের ছোঁয়া কি ঘাঁটা পুঁথি-খাতার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে?

গেঞ্জির ও-পিঠে একটা ছিটের তালি লাগিয়ে পকেট করেছিলাম; তার থেকে পাঁচটা

টাকা বার করে বললাম—এই টাকা কটা প্যাটরায় এই টিনের কৌটোর ভেতরে রাখি মুন্সি। আজিজ মিঞার আস্তানায় ছোঁড়াগুলি সুবিধের নয়।

মুন্সি ঘাড় কাত করে তাড়াতাড়ি বললে—হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাই ভালো। আজিজেরা তো গাঁটকাটা। এখানেই থাক। তোর ভাবনা নেই মকবুল।

—তালা নেই কিনা, আমিনা যেন একটু চোখ রাখে। ওর ঘরেই যখন রইল।

—তোর জিনিসের ওপর বেটির ভারি চোখা চোখ।

—আর যদি ওর খুব দরকার হয় এক-আধ আনা খরচও যেন করে।

আমিনা জেনে নিশ্চয়ই গর্ব বোধ করবে যে তার দুলহা ফকির নয়।

মুন্সি ফের আহ্লাদে ডেকে উঠল—আমিনা! আমিনা!

আমিনার সরমের মাত্রাটা একটু বেশি বলতে হবে।

যাবার আগে মুন্সি বললে—দরগায় কবে যাবি রে মকবুল? ভাজি তো দিনের পর দিন ডাগর হতে চলল।

—কামাতে পারি না এক পয়সা, সাদি কি মানায় মুন্সি?

—কি যে বলিস! মোছলমানটা হয়ে নে, তোকে আমি ডিপটি করে ছাড়ব। অঙ্কে তোর এমন মাথা! মোল্লা কালও লোক পাঠিয়েছিল রে।

—আচ্ছা এ-হপ্তাটাও যাক। একটা হিল্লে করে নি।

মুন্সি কিছু বলবার আগেই পথে নেমে পড়লাম। নিজেকে আর একটুও ঢিলে লাগে না। সাঁ-সাঁ করে চলি। গেঞ্জির পকেটে এখনো ন'সিকে—একটা দোকানে গিয়ে বালির কাগজ আর পেনসিল কিনি।

আস্তানায় খালি-খালি বিড়ি পাকাতে ভালো লাগে না। ছোঁড়াগুলোর সঙ্গে পচা ইয়ার্কি দিই, ছপ্পুর সাত বারের বার নিকে করা ছুঁড়ি-বৌটাকে নিয়ে ওরা গান বানায়, আমিও সুর ভাঁজি। তারপর রাত অনেক হয়ে গেলে বাড়ি ঘর দোর আঁধিয়ার আকাশ—সব যেন কেমন করে ওঠে। ঘুম আসে না। কুপিটা জ্বালিয়ে পেনসিল দিয়ে হিজিবিজি আঁচড় কাটি, কি যেন বলে বোঝাতে চাই, পারি না।

কুপির ছিপিটা খুলে খানিকটা কেরোসিন আজিজ মিঞার নাকের মধ্যে ঢেলে দিতে ইচ্ছে করে। ওর নাকের কল বিগড়েছে।

ভাদ্রের গঙ্গা—শান দেওয়া ছুরির মতো ধার!

শান বাঁধানো পিছল ঘাটের সব শেষের সিঁড়িটায় বসে জলে পা ডুবিয়ে চেয়ে থাকি। ইচ্ছে করে ঢেউয়ের মধ্যে দিয়ে সাঁ করে ছুটে যাই ফেরি বোটের চাকার মতো! ঐ বাঘা জাহাজটার চোঙার আওয়াজের মতো জলের হুসহুস করি!

বাঁধানো ঘাটে উড়ে বামুনের দল কেরোসিনের বাক্স সাজিয়ে চন্দনের বাটি নিয়ে বসেছে। সমুখে দলে-দলে মেয়ের ভিড়—কারুর মাথায় ঘোমটা, কারুর বা পিঠের উপর চুল মেলা। উড়ে আমার লুঙ্গি দেখে কিড়মিড় করে উঠল। মেয়েরা একটু সরে বসল, কেউ বা একটু তাকাল, বা তাকাল না। বললাম—ঘণ্টাখানেক বাদে লুঙ্গিটা ছেড়ে গলায় একগাছা ধোলাই পৈতে ঝুলিয়ে এলেই এগোতে দেবে তো বামুন ঠাকুর ?

একটি মেয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল।

পরের দিন গলায় শুধু পৈতে নয়—একেবারে বাক্স জল-চৌকি কোশাকুশি ধূপ চন্দনের বাটি নিয়ে বাঁধানো ঘাটের ধারে অশ্বত্থ গাছের তলায় এসে বসলাম। আজিজ মিঞাকে রোজগারের থেকে কিছু বকশিস দিতে হ'বে। বেচারা মাথায় করে জিনিসগুলি পৌঁছে দিয়েছে কিন্তু।

উড়ের ঘুম তাহলে খুব ভোরে ভাঙে না। বামুন যখন ঢিকোতে-ঢিকোতে আসে নদীর জলে রোদ তখন চটচট করছে। আমাকে দেখে তেড়ে এল, বলে কিনা, মোছলমান !

হেসে বললাম—আড়াই হাত গামছা যেমন তোদের, তেমনি ডোরাকাটা লুঙ্গি হাল-বাবুদের ফ্যাশান।

মেয়েদের বললে—ও আস্ত মোছলমানের বাচ্চা, ওর থেকে ফোঁটা নেবেন না।

—না মা, আমি খাঁটি বামুনের ছেলে, কোন্নগরের চাটুজ্জে আমরা—অবস্থার দোষে—

আরো বললাম—ও ব্যাটা ভারি পাজি, মিথ্যেমিথ্যি যা তা বলে ; পরনে লুঙ্গি থাকলেই যদি মোছলমান, তবে সমস্ত বর্মা দেশটাই পীরের মুলুক।

বুড়ি মেয়েমানুষটি বললে—না বাবা, কাত্তিকের মতো মুখ ; এক্কেবারে আমার ছেনাথের মতো ! ওলাবিবি ছেনাথকে গেরাস করলে বাবা, বাছা আমার কাটা পাঁঠার মতো—

বুড়ি হাপুস কাঁদছে। শ্রীনাথ কবে বঁড়শিতে বেলে-মাছ ধরেছিল, কবে চিনি চুরি করে খেতে গিয়ে নুন খেয়ে ফেলেছিল, বুড়ি সে-কথা উল্লেখ করতেও ভুললে না।

চোখের জল মুছে ফেলতেও দেরি হল না কিন্তু। বললে—ভালো করে ললাটে চন্দন চর্চিত করে দাও তো কাত্তিক। রোদ চড়া হতেই মাথার রগ দুটো দপদপ করতে শুরু করে। বেশ করে লেপে দাও তো ছেলে !

থুতনিটা ধরে আদর করতে চায়। কিন্তু পয়সা দেবার বেলায় সেই একটাই।

রোজগেরে সাড়ে চারআনা পয়সা উড়ে বামুনের হাতে দিয়ে বললাম—একটুখানি ঠাঁই করে নিতে দাও বামুনঠাকুর। তোমার ব্যবসার ক্ষেতি হবে না।

পয়সা খেয়ে উড়েটা হাসে।

ভারিক্কি-কছমের মেয়েরা বললে—এ চুনোপুঁটি বামুনঠাকুরটি আবার কোত্থেকে জুটল? ছেলেবয়েস থেকেই মন্দ ব্যবসা ফাঁদেনি।

উড়ে বললে—সাক্ষাৎ গণেশঠাকুর মা। গোটা মহাভারতটা কণ্ঠস্থ। ওর হাতের ফোঁটা বিষ্টুর চন্নামৃতেরই তুল্য।

এক ফাঁকে বললে—সংস্কৃত শ্লোকটা মুখস্থ করে ফ্যাল্। দুটো লাইন আওড়ায়—অনুস্বার বিসর্গে ভরতি। বার কতক শুনে কোনো রকমে নকল করে কড়মড় করি। ও বললে—এতেই হবে।

ওর কাছে মা, আমার কাছে মেয়ে।

বাঁ হাত দিয়ে চিবুকটা লেপটে ধরি, ডান হাত দিয়ে শ্বেতচন্দনের ফোঁটা কাটি। অশ্বত্থের কচি পাতার মতো মুখ বাতাসে তুলতুল করছে। দুটি ফুরফুরে ঠোঁট ফুঁয়েই যেন উড়ে যাবে।

বললাম—তোমার নাম কি?

লজ্জায় চোখের পাতা দুটি নামায়—কথা কয় না।

— কোথায় থাক?

এবারও না।

—গঙ্গায় নাইতে তোমার খুব ভালো লাগে?

ঘাড় কাত করে চুলবুল করে। একটু হাসে। রা কাড়ে না, সরম খালি একলা আমিনাবিবিরই নয়!

বললাম—পড়তে জানো?

এবার মেয়েটির ঘাড় অনেকখানি হেলে। আওয়াজও একটু বেরোয়—হ্যাঁ।—বাড়ি গিয়ে আয়না দিয়ে মুখ দেখো, কেমন?

আবার ঘাড় বাঁকায়।

ওর কপালে চন্দন দিয়ে উলটো করে লিখে দিয়েছি—কালকে আবার এসো।

কিন্তু কালকে আর মেয়েটি আসে না।

ছপ্পুর বউ হাতছানি দিয়ে ডাকে।

আজিজ বললে—আমাকেই। বলে বিড়ির কুলোটা ফেলে হনহন করে ছুটে গেল। মাঝের ডাস্টবিনটা এক লাফেই ডিঙিয়ে ফেললে। কিন্তু জানলা বন্ধ হয়ে গেল যে। আজিজ শিস দিতে-দিতে ফিরে এসে জিভটা ভারি করে বললে—বেটি ভারি লাজুক তো!

খানিক বাদে আবার জানলা খোলে—আবার হাতছানি।

হামিদ উঠে পড়ল এবার। ছপ্পুর বউ দুই হাত দিয়ে 'না' করে উঠল। তবু হামিদ তেড়ে গেল দেখে জানলা দুটো বন্ধ করে দিলে। হামিদ মাঝ পথ থেকে ফিরে এল। তেমনি আবার আঙুল নেড়ে-নেড়ে ডাকা।

এবার আমি উঠলাম—শেষবার। জানলা বন্ধ হল না। বন্ধ তো হলই না, জানলার ফাঁকে ডিবেটা জ্বালিয়ে ধরল। আমাকে পথ দেখায়।

সরাসর দাওয়ায় উঠে এলাম। ভিতর থেকে ডাক এল—ঘরে আয় মকবুল। ছপ্পুর বউ নাম জানে তাহলে।

মাথাটা চনচন করে উঠল। বললে—ছপ্পু গেছে কামারপোলে কোন বিয়ে বাড়ির ছাপ্পর তুলতে, রাত করে ফিরতে পায়নি। তোর আজ এখানে শুতে হবে।

ও আরো পরিষ্কার করে বললে—রহমৎ দারোগার চাউনি ভারি তেরছা, মকবুল। তা ছাড়া ঐ আজিজ হারামজাদা, আমাকে একলা পেয়ে যদি ব্যাটারা আজ দরজা ধাক্কায়?

বললাম—আর আমিই কি ওদের লাঠি ঠেকাতে পারব?

—তবু তুই একটা ভর, মকবুল।

—আমার পাঁকাটির মতো হাত ওদের কটা ঘুঁষির সঙ্গে লড়বে? একটা জোয়ান লোককে পাহারা দিতে ডাকলেই ভালো হত।

—তা হলে রহমৎকেই ডাকব নাকি রে? বলে কি রকম করে জানি হাসে। হাসটাও নিশ্চয়ই সিধে নয়, তেরছা।

রাত তখন পেকে এসেছে। বিবি বললে—খাবি? গোস্ত ছিল টাটকা।

বললাম—না। ঘুম পাচ্ছে বেজায়।

উঁচু তক্তাপোশটায় বিবি বিছানা করে দিলে। বললে—শো।

—আর তুই?

মাটির উপর মাদুর বিছিয়ে বললে—হেতা, মাটিতে।

—দোরটা ভালো করে এঁটেছিস তো বিবি? দেখিস।

বিবি ডিবেটা নিবিয়ে দিলে। বললে—হ্যাঁ রে হ্যাঁ! আমার চেয়ে যে তোর বেশি ভয়!

আজিজ মিঞা কি ভাবছে? এখনো বিড়ি পাকাচ্ছে বুঝি।

অনেকক্ষণ চুপচাপ থেকে বিবি ডাকল—মকবুল।

বিবির বুঝি ঘুম আসছে না। বললাম—মাটিতে শুলে ব্যায়রাম হবে বিবি, খাটে উঠে আয়!

বিবি কিৎকিৎ করে হাসে; বললে—তোর পাশে?

—কেন, আমি তো আর রহমৎ নই।

বিবির মাটিতে শুয়েই ঘুম আসে কিন্তু।

অনেক রাতে সত্যিসত্যিই কে দরজা ধাক্কায়।

বিবি চেঁচিয়ে উঠে আমাকে জাপটে ধরলে, বললে—রহমৎ দারোগা এল বুঝি! কি হবে মকবুল?

আমাদের হল্লা যতই চড়ে, ধাক্কা ততই বেখাপ্পা হয়।

দরজাটা ভেঙে ফেলেছে। ধুপ করে মাটিতে নেমে দেশলাইটা জ্বালিয়ে দেখি—রহমৎ নয়, আজিজ মিঞা। পিছনে হামিদ আর আলি।

ওরা যার জন্য গান তৈরি করে এতদিন সুরের কসরত করল তার দিকে একটিবার ফিরেও চাইল না। আমার গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমারই জন্য যেন ওরা ওৎ পেতে ছিল—এমনি।

আমার চুলের ঝুঁটি ধরে ঝাঁকি দিতে-দিতে আজিজ বললে—এত রাত হয়ে গেল, আস্তানায় ফিরবার নাম নেই।

হামিদ লাথি মেরে বললে—পরের বাড়ি আস নাই?

ওরা আমার অভিভাবক—শাসন করছে!

রহমৎকে না দেখে বিবির বোধ হয় মন ওঠেনি। আর চেঁচামেচি নেই—প্রতিবাদ নেই, কড়ে আঙুলটিও তুলল না। আস্তে-আস্তে ডিবেটা জ্বালিয়ে দোরের পাশে রাখল। ওরা আমাকে ঠেলে পথের কাদায় ফেলে দিলে। বিবির আর ভয় নেই। এবার ওর তিনজনই রক্ষক। রহমৎ আর ডরে আসবে না।

বাকি রাত আস্তানায় নয়, কাটাই ফুটপাতের উপর। ময়লা গাড়ির সঙ্গে-সঙ্গে পথ চলা শুরু হয়। সকাল থেকে দুপুর---দুপুর থেকে রাতের তারার চোখ চাওয়া তক। খালি রাস্তার জলের কল টিপে-টিপে পথ ভাঙা।

যেখানটায় ভির্মি দিয়ে পড়লাম চোখ চেয়ে দেখি বাড়িটার গায়ে লেখা—মহেশ্বরী ইটিং হাউস।

লুঙ্গি পরনে থাকলে কি হবে, গেঞ্জির তলায় পৈতে দেখে সবাই আশ্বস্ত হল। কর্তা বললে—সারাদিন কিছু খাসনি? এই বিশে, একটা রুটি এনে দে তো।

কর্তা বললে—বাড়ি কোথা?

রুটি খেতে-খেতে একটা দুঃখের কথা বানিয়ে বললাম। বললাম—এখানে একটা কাজ দিন।

—বেশ, থাক, চায়ের কাপ টেবিল সাফ করবি, থেকে যা।

মাইনের কথা কিছুই বলে না।

বিশে বললে—কি নাম তোর?

একটুখানি ভেবে নিতে হল। বললাম—কাঁচা।

বিশেটা হাসে। বললে—ঐ বাবুরা এসেছে। টেবিল পুঁছে দে গে যা।

আবার টালিগঞ্জের পথে।

কড়া নাড়তে হয় না, দরজা খোলাই আছে; আমিনার ঘরও খোলা, বিছানাপত্র কিছুই নেই কিন্তু। ডাকি—মুন্সি! সাড়া পাই না। ডাকি—আমিনা!—আমিনার যে সরম!

আমার প্যাটরাটা এক কোণে পড়ে আছে বটে। খোলা সেটাও। হাটকাই, টিনের কৌটোটা নাড়ি-চাড়ি, কিন্তু ভিতর থেকে কিছুই বাজে না।

মুন্সি যে বলেছিল আমিনা দিনরাত্রি বইয়ের মধ্যে মুখ গুঁজে থাকে তার কিছু প্রমাণ পাওয়া গেল না। শেষকালে বইগুলি প্যাটরায় করে মাথায় নিয়ে টালিগঞ্জের পথ ভাঙতে হয়।

বিশে টেবিলে পা তুলে দিয়ে বললে—পা টিপে দে।

কর্তা ঘাড় নেড়ে সায় দেয়। অগত্যা টিপেই দিতে হয়। কিন্তু বিশেরই জামার পকেট থেকে দুপয়সা সরিয়ে এক টুকরো সাবান কিনে আনতে হবে দেখছি।

চেয়ারের পায়াগুলো অমরত্ব লাভ করেছে, এ-কথায় কোনো সন্দেহ নেই। বিশে তো নয়, হাতি! তে-খাঁজ একটি পৈতৃক ভুঁড়ি রোজ প্রায় এক পো তেল খায়—প্রথম খাঁজে সারিসারি বিড়ি রাখে, দ্বিতীয় খাঁজে দেশলাইর কাঠি। বিশের ঘাড় লাট্টুর আল-এর মতো এইটুকুন!

বললে—ঘাড়টা ডল।
বিশে দোকানের হিসেব রাখে। ওর দোর্দণ্ড প্রতাপ, যখন খুশি থাবড়ায়, যখন খুশি উপোস করিয়ে রাখে।
বিশে কর্তার শালা।

'রেস'-এর দিন। সাঁঝের শেষে বেজায় ভিড়। এইখানে ফাউল কাটলেট, ঐ ওখানে আবার ছোট কাপ। ছুটে-ছুটে হা-ক্লান্ত। বিশেটা খালি বাঁ হাতে বিড়ি টানে, আর হাতে পয়সা গোনে।
—এ মকবুল।
হাতের উপর চায়ের কাপটা কাত হয়ে পড়ে গেল। চমকে উঠলাম—বাবু! বাবু বললে—এখানে কবে থেকে? গলায় যে একেবারে পৈতে ঝুলিয়েছিস! ব্যাপার কি? বাবু হাসে।
— সে অনেক কথা।
—আচ্ছা, চার ডিস কারি এনে দে, ফাউল।
অনেক কথা আর বলা হয় না। যাবার সময় বাবু তেমনি হাতের মধ্যে কি একটা গুঁজে দিলে। বাবুর একজন সঙ্গী বললে—আমাদেরও কনট্রিবিউশন আছে হে!
বিশে নিশ্চয়ই দেখে ফেলেছিল। সাইনবোর্ডের মাথার আলো নিবতেই দৌড়ে থপথপ করতে-করতে পাশের ঘরে এসে হাঁকলে—ট্যাঁকে কি গুঁজেছিলি রে তখন?
—কখন আবার গুঁজতে গেলাম?
—হেই তখন, চশমাচোখো বাবুর ঠেঙে?
—কোথায় চশমা চোখো? কত এল গেল, কে কাকে মনে করে রেখেছে!
— যা-যা ফাজলামো নয়। ছাখা, কত দিলে—বলে ট্যাঁকে হাত দিতে চায়।
—ট্যাঁকে হাত দিস নে বিশে, খবরদার!
রাগে বিশের ভুঁড়িটা হাঁপায়।—কী?—বলে তেড়ে এসে আমাকে একেবারে ওর ভুঁড়ির ওপর আছড়ে ফেললে। বাকি খাঁজটায় এবার আমাকেই গোঁজে আর কি! আধুলিটা ছিনিয়ে নিয়ে বললে—আমার আদ্দেক।
রুখে, লাফিয়ে উঠলাম।—ইঃ? আমার রোজগেরে পয়সা। তোর কি পাওনা আছে এতে?
—আমি দোকানের ক্যাশিয়ার না?

—তাতেই তো তোর অনেক পয়সা রোজগার। এর ওপর আবার চোখ কেন?

—কী?

রাগে বিশের পা-টা ধাঁই করে আমার বুকের উপর এসে লাগল। কেঁদে ফেললাম। কর্তা কিন্তু বাকি মাংসটা শেষ করতে-করতে হাসছে।

চোখের জল মুছতে-মুছতে বললাম—বিশে আমার পয়সা নিয়েছে।

—তা তো নেবেই।—কর্তা বলে।

—বাঃ, আদ্দেকই ও নেবে? এ কেমন কথা!

—সবটাই যে নিতে চায়নি এ তোর চোদ্দ পুরুষের ভাগ্যি।

বিশে ঘোঁত-ঘোঁত করতে-করতে এসে বললে—চার আনা ক্যাশিয়ার, দুআনা তোর বেয়াদবির জন্যে ফাইন—সেটা জেনারেল-ফাণ্ড—আর এই নে।—একটা দুআনি ছুঁড়ে মারল।

কর্তা বললে—এই দুআনা দিয়ে তোর এক ছিলিম বড়-তামাক হত রে বিশে।

বিশে একটা চোখ বুজে বললে—না, ও নিক। ওর খপছুরত চেহারাটার জন্যেই না রোজগার—ওর ওই দুটো কুচকুচে চোখের জন্য!

বিশের অসীম দয়া। কর্তা হাসে। এটা নিশ্চয় ঠিক, ইটিং হাউসের মূলধন কর্তার নয়, বিশের দিদির।

বাবুকে বললাম—খুচরো দিন।

বাবু আধুলি না দিয়ে দুটো সিকি দেয়। একটা জিভের তলায় লুকিয়ে রাখি, আরেকটা যেমন-কে-তেমন ট্যাঁকেই থাকে।

বিশে কিন্তু কিছুতেই বিশ্বাস করলে না। বললে—রোজ-রোজ যে আধুলি দেয়, হঠাৎ তার পয়সার এমনি কমতি হয়ে গেল?

—বাবুর ট্রাম ভাড়ারই পয়সা নেই, পায়ে হেঁটে যাবে ভবানীপুরে, জানিস? কথা বলতে-বলতে জিভটা জড়িয়ে এল। বিশে গাল দুটো দুমড়ে দিতেই সিকিটা টুপ করে বেরিয়ে পড়ল।

কর্তা বললে—বেরিয়ে যে যাচ্ছিস, ভালো হচ্ছে না কাঁচা।

বাবু তেড়ে বললে—আমি ওকে নিয়ে যাচ্ছি, তোমার কী?

—তোমার কী রাইট আছে?

—তোমাদের মারবারই বা কী রাইট ছিল? এইটুকুন ছেলে—মা-বাপ-হারা—কাজ

করতে এসেছে বলেই কি গাধার সামিল হয়ে গেছে যে, তাকে যাচ্ছে-তাই করে পিটবে, তার মাথা থেঁতলে রক্ত বার করে দেবে ?

—আলবত দেব।

বাবু বললে—তোর প্যাঁটরাটা নিয়ে চল তো মকবুল—এক্কেবারে থানায় ; বেটাদের নামে আমি 'কেস্' করব।

বিশে ভয় পেয়ে গেছে। বললে—তোর মাইনেটা ?

বললাম—হিসেব করে তোর দিদিকে ফিরিয়ে দিস।

থানায় নয়—প্রকাণ্ড বাড়ি। লাগোয়া মাঠটায় কে ছুটোছুটি খেলা করছিল।

—দাদা, আমাদের গরু এসেছে। দেখবে এস । ধবধবে শাদা গলাটা কেমন তুলতুলে —তুলোর মতো !—বলে ছুটে চলে গেল।

বাবু ডাকলে—আসমানি, শোন—

আসমানির শোনবার সময় নেই।

মা বললেন—নাম মকবুল, গলায় পৈতে—এ ভারি মজা তো !

বাবু বললে—মাথায় ঝুলিয়ে দেব টিকি, দাড়িতে খোদার নুর !

চাকর-ঠাকুরদের আলাদা ঘর ছিল, তারই ছোট্ট একটা কুঠরিতে আস্তানা গাড়লাম। চাকর পছনকে দিয়ে বাবু একটা হৈচৈ বাধিয়ে তুললে—জল ঢেলে ঝাঁট দেওয়ালে, একটা তক্তাপোশ এনে ফেললে, বিছানা পাতালে, দেয়ালে একটা ব্র্যাকেট টাঙালে পর্যন্ত। পছন বিড়বিড় করে বলছিল—নবাবের নাতি এসেছে।

ঘনিয়ে ঘুম আসবার কথা, কিন্তু আসছিল না। টালিগঞ্জের মুচিপটির পনেরো নম্বরের বাড়ির দরজাটা থাকুকই না খোলা ! আরো অনেক বন্ধ কবাট খুলে গেছে।

কিন্তু আমি আসামাত্রই যে প্রাণীবিশেষের শুভাগমন সংবাদটি ঘোষিত হয়েছিল তার দেখা তো কোথাও পেলাম না। মনটা খট করে উঠল। গোয়ালঘর তা হলে কোনটা ? আমার গলার চামড়াটা তুলতুলে বটে, রঙটা তো ধবধবে শাদা নয়। কে জানে ?

গঙ্গার ঘাটে যে মেয়েটির কপালে চন্দনের ফোঁটা কেটেছিলাম তার নাম জানি না। হয়তো আসমানিই।

রান্নাঘরে নয়—একেবারে কলতলায়ও নয়—মাঝামাঝি।

বাবুদের জুতো বুরুশ করি, কাপড় কোঁচাই, ঘর ঝাঁটাই, ফুট-ফরমাজ করি—দিদিমণিরও।

নটার সময় গাড়ি আসে। খাওয়া হয় কি না হয়—আসমানি ছুটে বেরোয়। সাজগোজ হয় ঘুম থেকে উঠেই। চামড়ার ব্যাগটা হাতে করে গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিই। পা-দানিতে ওঠবার সময় আমার হাত থেকে তুলে নেয়। আঙুলে আঙুল ঠেকে কি না ঠেকে।

চারটে যেন আর বাজতে চায় না। ঘোড়া দুটো যেন জিরিয়ে-জিরিয়ে চলে। আসমানি নেমে আসে, মুখ শুকনো, খিদে পেয়েছে। মাকে ডাকাডাকি করে তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে তোলে। কোনো-কোনো দিন খাবার সময় বলে—এই ছোঁড়া, পাখাটা খুলে দে তো।

যে-ছেলেটি সকালবেলা আসমানির মাস্টারি করে সে বিকেলে সাইকেলে আসমানিকে বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দেয়। সব মেয়েদের নামিয়ে গাড়িটা একা আসমানিকে নিয়ে আসে ঐ পাঁচটা গ্যাসপোস্ট ছাড়িয়ে লাল বাড়িটা থেকে। এইটুকুন পথ—কোথা থেকে কে জানে—সাইকেলে আসতে-আসতে ছেলেটি আসমানির সঙ্গে কথা কয়। হয়তো লেখাপড়ারই কথা!

উঠোনে মস্ত খুঁটিতে গরুটা বাঁধা। আসমানি যতই ওর গলায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে ততই ও ওর বড়-বড় চোখ দুটি স্নেহে ভিজিয়ে মাথাটা আকাশের দিকে তুলছে। সামনে একটা মোড়ায় বসে আসমানির মাস্টার-ছেলেটি। একটা রুমাল নিয়ে লোফালুফি খেলছে।

সবে ভোর। মাস্টারের পড়াতে আসার কথা সাতটায়। মাস্টারের ঘড়িটা নিশ্চয়ই দু-একঘণ্টা ফাস্ট চলে।

আসমানি বললে—এই ছোঁড়া, গরুর দুধ দুইবি? গয়লা আসেনি। জানিস দুইতে?

অক্ষমতার অপযশ বিনা পরীক্ষাতেই কিনতে যাই কেন? একেবারে ভাঁড় নিয়ে এসে বসে গেলাম। বাঁটে সবে দু-তিন টান মেরেছি, আসমানির মাস্টার গরুর মুখে রুমাল দিয়ে বাড়ি মারতে লাগল।

গরুটা এই অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে চাইল সমুখের শিঙ দিয়ে নয়, পিছনের ঠ্যাং তুলে। ভাঁড় শুদ্ধ চিতপাত হয়ে পড়ে গেলাম।

কি হাসি আসমানির! যেন ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে যাবে। আসমানির মাস্টারটার হাসি বিকট! হাসছে না তো কাশছে!

গয়লা কিন্তু এসেছিল। বললে—এ সব কি আনাড়ির কাজ? যা যা গোবর খা গে যা!

আসমানির হাসি কিছুতেই থামতে চায় না।

মাস্টার বললে—ঠ্যাং দুটো ছড়িয়ে ব্যাঙের মতো কেমন পড়ল দেখেছ?

অথচ এই ছেলেটাই দাদাবাবুর হোটেলে খাওয়ার সঙ্গী ছিল। যাবার সময় রোজ বলত—আমাদেরও কনট্রিবিউশন আছে হে!

রাতে সেদিন বাড়ি ফিরে দাদাবাবু চিৎকার করে উঠল—আমার বাইকের এমন দুর্দশা কে করলে?

চিৎকার তো নয়, কান্না।

আসমানি বললে—একটা সিরিয়াস কলিশন হয়েছে দাদা—

—কি করে? আমার বাইক—

—টিমুদার সঙ্গে মকবুল-মিঞার।

—মকবুল? কোথায়? কি করে আমার বাইক পেল?

—হ্যাঁ দাদা, আচ্ছা করে ওকে হুইপ করা উচিত। ও কেন না বলে তোমার বাইক নিয়ে যায়! ওকে পুলিশে দেওয়া যায় পর্যন্ত। টিমুদা আমার গাড়ির সঙ্গে-সঙ্গে আসছিল, ও হঠাৎ পিছন থেকে একেবারে টিমুদার বাইকের সঙ্গে ক্র্যাশ করলে। ক্র্যাশ করেই দুজনে হুড়মুড় করে প্রায় গাড়ির তলায় পড়ে গেছল আর কি!

দাদাবাবু আঁতকে উঠে বললে—বলিস কি রে?

—ভাগ্যিস কোচমানটা গাড়ি বাগিয়ে ফেললে। তখুনি সহিস কোচমান ধরাধরি করে টিমুদাকে বাড়ি নিয়ে এল। ডাক্তার বোসকে মা ফোন করে আনালেন। তেমন কিছু ডেনজেরাস উনড হয়নি বললেন তো ডাক্তারবাবু। ড্রেস করে ওঁরই মোটরে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছেন। ভাগ্যিস গাড়ির চাকাটা আর একটু—ওরে বাবা!

—আর মকবুল?

দাদাবাবু প্রশ্ন করলেন।

—কি জানি! ওটাকে ফ্লগ করা উচিত।

শুয়েছিলাম। দাদাবাবু ঘরে ঢুকে ডাকলে—মকবুল।

—দাদাবাবু!

দাদাবাবু নিজে কুপিটা জ্বালাল। বললে—ডাক্তার তোকে কি বললে?

—ডাক্তার ? কৈ, জানি না তো !

—সে কিরে ? মাথায় কে ব্যাণ্ডেজ করে দিয়েছে ?

—পছন।

—পছন কি রে ? মা ! মা ! ওমা !

মা এসে হাজির, সঙ্গে আসমানিও। দাদাবাবু বললেন—ডাক্তার একে দেখেনি কেন ? এর ব্যাণ্ডেজ ভিজে এখনো রক্ত গড়াচ্ছে—

মা বললেন—ও মা, মকবুলের আবার কখন মাথা ফাটল। খানিক আগে টিমুর মাথা ফাটল মেয়ে-ইস্কুলের গাড়ির চাকায় সাইকেল আটকে। এ আবার কখন এ বিদঘুটে কাণ্ড বাধালে ? ডাব পাড়তে গিয়ে নাকি রে ? যা, যা, শিগগির ডাক্তারবাবুকে ফের একটা কল দে ফোনে। আসমানি, ঠাকুরকে গরম জল চড়িয়ে দিতে বল !

আসমানি যেতে-যেতে বললে—ডাক্তার দেখবে না আর কিছু। উচিত ল্যাশ করা —

জুতো বুরুশ করছিলাম।

টিমুদার মাথার ঘা শুকোয়নি বলে পড়াতে আসেনি। আসমানি একটা অঙ্ক নিয়ে মহা ভাবনায় পড়েছে। শুকনো বেণীর চুলগুলি যেন ছিঁড়ছে।

এরি মধ্যে বললে—বেশ চকচকে করে দিস কিন্তু রে ছোঁড়া।

বললাম—তোমার গাড়ি এখুনিই এসে পড়বে দিদিমণি—

—যা, তোর এত ভাবনা কিসের রে ছোঁড়া। এই অঙ্কটা না করে কিছুতেই আমি উঠছি না। না হয় টিমুদার সঙ্গে হেঁটেই যাব স্কুলে।

টিমুদা পড়াতে পারে না, ইস্কুল পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসতে পারে।

টেবিলের কাছে মুখটা এনে বললাম—কি আঁকটা ?

আসমানি একেবারে তেড়ে উঠল—ফাজলামো করিস নাকি ? যা, জুতোটা আরো চকচকে কর। অঙ্ক দেখতে এসেছেন !—বলে আপন মনে হাসতে লাগল।

বেচারীর মুখখানি বিরক্তিতে ভরা, নোয়ানো ঘাড়টি ঘামে ভিজে উঠেছে। অঙ্কের নম্বরটা দেখে ফেলেছিলাম—রেকারিং ডেসিম্যাল। নিজের ঘরে এসে পাটিগণিত খুলে বসলাম। কতক্ষণই বা লাগে ?

—তোমার অঙ্কের রেজাল্ট কত দিদিমণি ? ওয়ান পয়েন্ট ফোর ফোর।

আসমানি অবাক হয়ে মুখের পানে তাকাল।

বললে—কি করে জানলি ?

— করে এনেছি। এই দেখ।

বালি-কাগজটা মেলে ধরলাম।

আসমানি তাড়াতাড়ি কাগজটা টেনে নিয়ে আঁকটা নিজের খাতায় টপাটপ তুলে ফেললে। বললে—ইউনিটারি মেথড জানিস? রাতে ফরটি টু একজাম্পলের প্রথম দশটা আঁক করে রাখিস তো। বুঝলি?

রাত্ত করে আমার ঘরে এসে হাজির। বললে—বাবাঃ, এত টাস্ক করা যায় না। ভালগার-ফ্র্যাকশান-এর সামগুলো কাল ভোরেই চাই।

বই খাতা ছুঁড়ে দিলে।

বললাম—এখানে বোসো। টপাটপ কষে ফেললাম বলে।

—এখানে বসব কিরে?

আসমানি ভুরু কুঁচকাল।

—তবে চল, তোমার ঘরে যাই—

—হ্যাঁ, লোকে জানুক চাকরের কাছ থেকে আঁক শিখছে! কাল ভোরেই চাই কিন্তু, মনে থাকে যেন।

আশ্চর্য! আসমানি একবারও জিগগেস করে না, কোথা থেকে আঁক শিখলাম! তা জানবার ওর এতটুকু প্রয়োজন নেই।

বুঝতাম, টিমুদা ওর ইংরিজির মাস্টার। বলতাম—অঙ্কের তা হলে একটা আলাদা মাস্টার রাখলেই হয়! বলত—আমার তো অ্যাডিশ্যানাল নেই।

আসমানি অঙ্কের জন্য মাস্টার রাখে না, চাকর রাখে।

সক্কালবেলা ঘুম থেকে উঠেই আসমানি একটা হুলুস্থূল বাধিয়েছে!

দেবদারু আর খেজুর পাতায় ঘরের দেয়াল সাজাচ্ছে—পছন জল ঢেলে ঝাঁট দিচ্ছে মেঝেয়—মেয়ের দল কোমরে আঁচল টেনে ছুটোছুটি করছে। আসমানি বললে—মকবুল, কিছু দিশি ফুল কোথাও থেকে যোগাড় করে আনতে পারিস লক্ষীটি? টিমুদা গেছে মার্কেটে—সেখানে তো বাহার বিলিতি ফুলের! পারবি ভাই?

লক্ষী! ভাই! আসমানির কী আজ? টাটকা জুঁইর মতো দেখতে! পা দুখানি যেন পদ্মের পাপড়ির মতো!

—পারব।

টালিগঞ্জের পথে আবার। ফুল তো দূরের কথা, একটা সিগরেট কেনবার পয়সা নেই। তবু যোগাড় করে দিতেই হবে। আসমানির হুকুম! কোথায় ফুল ফুটেছে কে জানে?

সেদিন রোদে বহুক্ষণ অন্যমনস্কের মতো টহলদারি করেছিলাম মনে আছে। কোথাও ফুল পাইনি। সে-ফুল কোথাও পাওয়া যায় না।

বাড়ি যখন এলাম, আসমানি একবার শুধোলও না কত ফুল আনলাম। ফুলের আর এসেন্সের গন্ধে ঘর আর মেয়েদের শাড়ি ভুরভুর করছে। টিমুদার গরদের পাঞ্জাবিটাও। কত রকমের গান, কত রকমের বাজনা, কত রকমের হাসি। কোনো মেয়ে টিমুদার পাঞ্জাবির বোতামের গর্তে ফুল গোঁজে, ফেরাফিরতি ধূপের কাঠি জ্বালিয়ে টিমুদা মেয়েদের চুলের মধ্যে গুঁজে দেয়। বেজায় ফুর্তি!

আসমানি আমাকে ডেকে নিয়ে বললে—এই ছোঁড়া, আমার মখমলের চটিটা দেখেছিস—যেটা টিমুদা প্রেজেন্ট দিয়েছিল—

—আমি কি জানি?

—তা হলে কে আর জানবে? তুই তো সাফ করতিস। বল শিগগির কোথায় আছে? খোঁজ।

পাতিপাতি করে খুঁজলেও পাওয়া যায় না।

আসমানি একেবারে কান্না জুড়ে দিলে আর কি! মখমলের চটিটা না হলে ড্রেসের সঙ্গে সুটই করবে না। এক মাসও হয়নি টিমুদা কিনে দিয়েছে। ও টিমুদা, জুতো পাচ্ছি না।

টিমুদা হাসতে-হাসতে বললে—কাকে মারতে?

—এই মকবুল ছোঁড়াটাকে।

সমস্ত বাড়ি সজাগ হয়ে উঠল জুতো খুঁজতে। দাদাবাবু বললে—ইস্কুলে কোথায় ফেলে এসেছিস, কিম্বা টিমুদাকেই হয়তো উলটো প্রেজেন্ট দিয়েছিস কে জানে? কি হে টিমু?

হঠাৎ আসমানি ঘোষণা করলে—যে পাবে তাকে দুটো টাকা দেব। ওরে মকবুল, ওরে পছন, খোঁজ, দুটাকা।

টিমুদা পকেট থেকে দুটো টাকা তুলে বাজিয়ে বললে—এই ছাখ।

টাকার ভারি টানাটানি। দুটো টাকা, মন্দ কি! কতদিন একটু ধোঁয়া পর্যন্ত গিলতে পারিনি।

পছনটা একেবারে কোমর কেছে খুঁজতে লেগেছে—আঁস্তাকুড় পর্যন্ত। হাসি পায়। ঘরে এসে প্যাটরাটা খুলে ফেললাম। বইগুলির তলায় জুতো জোড়া।

ছুটতে-ছুটতে এসে বললাম—তোমার জুতো পেয়েছি দিদিমণি, দাও টাকা।

—কই? কোথায় পেলি?

আমতা-আমতা করে বললাম—ঐ ওখানে আলনার তলায়—

একটি মেয়ে বললে—কক্ষনো না। আমি আর শুচিদি ওখানটায় পাঁচবার খুঁজে এসেছি।

টিমুদা বললে—আমিও। তুই মিথ্যে কথা বলছিস। তুই চুরি করেছিলি।

টিমুদার আক্রোশ ছিল। তক্ষুণি কানটা ধরে ফেললে।

—কান ধরবেন না বলছি, খবরদার।

—কী? এই জুতো দিয়ে তোর মুখ ছিঁড়ব। বলেই টিমুদা আসমানির মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলে।

—ছিঃ, একি হচ্ছে টিমু?—বলে দাদাবাবু টিমুদার হাত থেকে জুতোটা ছিনিয়ে নিলে।

টিমুদা বললে—ওকে তাড়াও। ও ব্যাটা চোট্টা, জুতো চুরি করে—

দাদাবাবু বললে—সে বিষয়ে তোমার কোশ্চেন করারই রাইট নেই। জুতো পাওয়া গেলে দুটো টাকা দেবে এই তোমার কনট্র্যাক্ট। আর যে এই জুতো চুরি করবে সে কি জানে না এটার দাম দুটাকার ঢের বেশি?

টিমুদার সত্যবাদিতা এতে একটুও পীড়িত হয় না। দাদাবাবু আসমানির হয়ে টাকা দিতে চায়।

বলি—কি হবে টাকা নিয়ে?

আসমানির জন্মদিনের সন্ধ্যাটা আমার অপমানের অশ্রুতে করুণ হয়ে উঠেছিল—সে কি কেউ জানে? সেইদিনই আমার চোখের জলের সত্যিকারের জন্মদিন।

কদিন থেকে দাদাবাবুর যেন কি হয়েছে। ঘুর-ঘুর ঘুর-ঘুর—কেউ একটু খোঁজও করে না।

দাদাবাবু বললে—কলকাতা থেকে পালাই চল, মকবুল।

মা বাবা কেউ বারণ করেন না, বলেন—যা ভালো বোঝ কর!

যে যা ভালো বোঝে, সে তাই করে। আসমানি যদি বলে, চুল বাঁধবো না, চুল বাঁধেই না; যদি বলে, ইস্কুল কামাই করবই, কে ওকে কামাই না করায়? দুদিনের মধ্যেই সব গোছগাছ হয়ে গেল।—সঙ্গে পাঁড়েজি আর আমি। ট্যাক্সিটা কদ্দূর এগোতেই দাদাবাবু নেমে বললে—আদত জিনিসটাই ফেলে এসেছি।—বন্দুকটা। পিছনের ছ্যাকড়া গাড়িতে মাল আর পাঁড়েজি।

মা বলে দিয়েছিলেন—যে-যে জায়গায়ই যাস সব সময় চিঠি দিস। তুইও দিস মকবুল।

মুঙ্গেরে আসতেই পাঁড়েজি দাদাবাবুর কাছ থেকে টাকা নিয়ে খাবার কিনতে সেই যে গেল আর ফিরল না।

বললাম—গাড়ি যে ছেড়ে দিলে-দাদাবাবু—

—দিক। মুঙ্গেরের কাছাকাছিই ওর বাড়ি। অনেকদিন বাড়ি আসেনি।

—কি হবে তাহলে?

—একটা কুকার কিনে নেব।

দাদাবাবু কর্ক-স্ক্রু দিয়ে বোতল খোলে। তারপর শুয়ে ঘুমোয়। আমি এই ফাঁকে সিগারেটের টিন থেকে গোটা দুই-তিন টানি।

কোনো জায়গায়ই দাদাবাবু দু-তিনদিনের বেশি জিরোতে পারে না। তিন-দিনের দিনই বলে—তল্পিতল্পা গুটো, মকবুল। এ-জায়গাটায় ভারি ধুলো।

অন্য জায়গা আবার বেশি ঘিঞ্জি, কোথাও বা লোক বেশি নেই বলে ভালো লাগে না—বড্ড বেশি ফাঁকা।

কিন্তু সে-ফাঁকায় ফাঁকা মন ভরে ওঠে একদম। দাদাবাবু বললে—চমৎকার জায়গা: এখানে কোনো বাড়িতে আর গেস্ট নয়, একেবারে তাঁবু ফেলব।

দাদাবাবু সত্যিসত্যিই তাঁবু ফেললে।

চারদিকে পাহাড়—ধারে নদী তো নয়, মাটির একটা রগ। যেন মৃত্যুশয্যায় পড়ে আছে। আহ্লাদির কথা মনে পড়ে।

দাদাবাবু কাঁধে বন্দুক ফেলে অনেক দূরে যায় পাখি মারতে। কোনো-কোনো দিন আমিও যাই। মরা পাখিগুলি রাঁধে না, পাহাড়ী মেয়েদের দিয়ে দেয়। কিন্তু সবাইকে তো সমান দেয় না দাদাবাবু! যে-মেয়েটা বেশি পায়, রাত করে চুপিচুপি আসে পয়সা চাইতে, বোতলের লাল পানি চাইতে।

আমি কত রাতে দূরে ঐ মরা নদীটার পাড়ে শুয়ে ঘুমিয়েছি। আমার পাশে পাহাড়ী মেয়ে নয়—আহ্লাদি।

প্রচুর জ্যোৎস্না—বালির মাঝে ছুঁচ চেনা যায়। জ্যোৎস্নায় বসে চিঠি লিখছিলাম। মাকে নয় অবিশ্যি। লিখছিলাম—কত জায়গা দেখলাম—তারই একটা ফর্দ; পাঁড়েজি কেমন টাকা নিয়ে ভাগল; দাদাবাবুর শরীর তেমন সারছে না; আমি বেশ টনকো হচ্ছি—এই সব। আমাকে রোজ ভোরবেলা দাদাবাবু পড়ায়—পাখি শিকার করি, একদিন একটা হরিণ পর্যন্ত মরেছিল আমারই গুলিতে। পরে লিখি—

আমার কলকাতা ফিরে যেতেই ইচ্ছে করে এখন। তোমার চিঠি পেলে খুব খুশি হব। টিমুদা কেমন আছে?

দাদাবাবু বললে—কোথায় গেছলি?

—ইস্টিশানে চিঠি ফেলতে।

আমাদের তাঁবু থেকে ইস্টিশান মাইল তিনেকের পথ। গেঞ্জির উপর দিয়ে কাপড়ের বাঁধ—গেঞ্জির তলায় পোস্টকার্ডটা ফেলে দৌড়ে যাই সাঁ-সাঁ করে। যখন হাঁপাই, আস্তে-আস্তে চলি।

নদীর পাড়ে বালির উপর শুই—ঘুম আসে না। দূরে গাছের পাতাগুলি আকাশের তারার সঙ্গে দুলে-দুলে কথা কইতে চায়। আকাশের তারারাও কথা কইতে চায় নদীর জলের সঙ্গে। কি কথা কইতে চায় ওরা? আমি শোনবার জন্য কান পেতে থাকি।

আসমানির চিঠি আসে না।

এই রাতে তাঁবু ছেড়ে দাদাবাবু কোথায় পালাল? ল্যাম্পটা জ্বলছে, গ্লাশটা পুরো খাওয়া হয়নি, বোতলের ছিপি খোলা—কোথায় দাদাবাবু? রাতে কি শিকারে বেরুল? বন্দুকটা তো বাক্সেই আছে।

দাদাবাবু পাহাড়ের ধারে-ধারে পায়চারি করছে। যাক, বাকি গ্লাশটা আমারই জন্য রেখে গেছে বুঝি!

ঘুম ভাঙতেই দাদাবাবু বললে—কাল রাতে কি খেয়েছিলি রে পাজি?

—তুমি যা খাও তেষ্টা পেলে।

—খবরদার খাবি না আর।

দাদাবাবুর উপর খবরদারি করবার কেউ নেই।

দাদাবাবু বললে—ইস্টিশানে যেতে হবে রে কলকাতার গাড়ি ধরতে।

—আজই যাব নাকি?—লাফিয়ে উঠলাম।

—যাওয়া নয়। এস্‌করট করতে।

কাকে? আসমানিরাই আসবে বুঝি! কাল রাতে যে নতুন আরেকটা চিঠি লিখেছিলাম, ছিঁড়ে ফেললাম। কি দরকার?

আসমানি নয়—লম্বায় দাদাবাবুর মতোই ঢ্যাঙা, মাথায় একটুখানি কাপড় তোলা, সর্বাঙ্গে শীর্ণতা ও ক্লান্তি। কে এ?

কেউ কারুর মুখের দিকে চেয়ে প্রথম সন্দর্শনের পরিচিত হাসিটুকু হাসলে না, একটি সম্ভাষণ পর্যন্ত না। মেয়েটি ধীরে-ধীরে দাদাবাবুর পিছনে আসতে লাগল। দাদাবাবু বললে—মকবুল একটা টাঙা ঠিক কর।

গাড়োয়ানের পাশে আমি—পিছনে দাদাবাবু আর মেয়েটি।

—কিছু মালপত্র আনোনি যে?

—ফিরতি বিকেলের গাড়িতেই চলে যাব।

—ফিরতি গাড়ি তো কাল ভোরে।

—তবে কাল ভোরেই।

আর কথা নেই। শুধু দাদাবাবুর হাতের উপর মেয়েটির শিথিল হাতখানি আলগোছে রাখা। টাঙা টিমিয়ে চলেছে।

—কি করে জানলে আমার ঠিকানা? এলে যে বড়!

—কলকাতার চাকরি ছেড়ে দিয়েছি।

—কি করবে এখন?

—সারাটা পথ তাই ভাবতে-ভাবতে আসছি।

—চাকরি ছাড়লে কেন?

—ভালো লাগল না।

আবার চুপচাপ। একমাইল পথ শেষ হল ঐ বালিয়াড়ির পর থেকে।

—মাধু।

—আমার নাম তোমার এখনো মনে আছে?

—কেন এলে তবে এখানে?

—তাই ভাবছি এখন। সত্যি বলছ বিকেলে গাড়ি নেই?

—থাকতে কি তোমার খুব কষ্ট হবে?

—ভীষণ!

তাঁবুতে এসে পৌঁছুলাম। বললাম—কে ইনি দাদাবাবু?

তারপর ফিসফিস করে বললাম—বৌদি?

—দূর! আসমানিদের মিসট্রেস।

তাহলে এর কাছ থেকে আসমানির খবর পাওয়া যেতে পারে—কেন সে আমার চিঠির জবাব দিচ্ছে না!

দাদাবাবু বললে—নদীতে নাইতে যাবে মাধু? আমার একটা কাপড় দি—সেটা পরে চান করবে খন।

মেয়েটি বললে—না।

বললাম—সে ভারি মজা দিদিমণি। জলে দুদিক থেকে কাপড় মেলে ধরলেই মাছ আটকে যায়। আমি আর দাদাবাবু কতদিন ধরেছি। ধরাই সার, রাঁধা আর হয়নি।

দাদাবাবু বললে—তবে মকবুল বালতি করে জল এনে দিক, মাথাটা ধুয়ে ফেল।

তিন বালতি জল এনে ফেললাম। দাদাবাবু জল ঢেলে দিতে লাগল। তোয়ালে দিয়ে মাথাটা মুছতে যেতেই দাদাবাবু বলে উঠল—তোমার জ্বর মাধু?

—হ্যাঁ, একটু একটু হয়।

চুলটা মেয়েটিই মুছলে তারপর।

মেয়েটি বললে—আজকে আর কুকার নয়, ভালো করে আমিই দুটো রেঁধে দিই।

দাদাবাবু বললে—তোমার শরীর ভালো নেই।

—না হয় আর একটু খারাপ হল—মকবুল!

এমন সুন্দর করে আমাকে যেন কেউ ডাকেনি।—কি দিদিমণি?

দিদিমণি টাকা দেয়—ডিম মাংস কত কি আনতে বলে, গরম মশলা লঙ্কা তেজপাতা পর্যন্ত।

দাদাবাবু বললে—তোমার জ্বর, তুমি কী খাবে?

—একটু সাবু জ্বাল দিয়ে নেব। তা ছাড়া আজ তো এমনিই আমার উপোস।

—কেন?

—নিজের জন্মদিনের তারিখটাও বুঝি মনে নেই, এত ভুলো হয়েছ!

—মকবুল! মকবুল!—দাদাবাবু গলা ফাটিয়ে ডাকতে লেগেছে। ফিরে এলাম।

দাদাবাবু বললে—বাজার হবে না আজকে।

বাজার সত্যিই হল না। জন্মদিনের উৎসব উপবাসের মধ্যে দিয়ে কাটল। এ কেমনতর? বেচারা আমিও না খেয়ে থাকব নাকি?

দিদিমণি বললে—যা পারো পয়সা দিয়ে কিনে খেয়ো।

বাজারে পাহাড়ী মেয়েটার সঙ্গে দেখা। তাকে বলে দিলাম—আজ পয়সা নিতে তাঁবুতে যাসনে ছুঁড়ি। বুঝলি?

মেয়েটা বোঝে, হাসেও।

তাঁবুর বাইরে শুলাম, ভিতরে দুকোণে দুটো ক্যাম্প খাট—দাদাবাবু আর দিদিমণির। ল্যাম্প নিবনো হয় না—কান পেতে থাকি—কথাও শোনা যায় না একটি।

জ্যোৎস্না রাত কালো হয়ে আসছে। চেয়ে দেখি তাঁবু থেকে কে বেরুল—দাদাবাবু।

চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে—আবার গেল ভিতরে। তন্দ্রা এসেছিল, কিসের আওয়াজে ঘুম ভাঙল। দিদিমণি বেরিয়ে এসেছে। ওরও ঘুম আসছে না।

সকালবেলা টাঙায় করে ফের এলাম ইস্টিশানে।

—তোমার জ্বর এখনো আছে?

—সকালবেলাই তো হয়।

তেমনি হাতের উপর হাত। তেমনি কথা কইতে না-পারার অপরূপ অস্থিরতা।

ট্রেনে উঠে দিদিমণি বললে—তোমার জন্মদিন কবে, মকবুল?

—আজই।

—তাই নাকি?—দিদিমণি হাসল।—তবে বাজারের বাকি পয়সাগুলো সব তোমার।

দাদাবাবু বললে—আর যদি দেখা না হয়!

—না হবে! দেখা হওয়াটাই তো মিথ্যে।

—তবে আমার জন্মদিনের সম্মান করো কেন?

—তুমিও আমার মরণের দিনটির সম্মান রেখো।

গাড়ি ছেড়ে দিল।

তারপর শুধু শক্ত কালো লোহার অচল কঠিন দুটো লাইন!

এক হপ্তাও যায়নি। দাদাবাবু একটা টেলি নিয়ে হুড়মুড় করে এসে পড়ল।

—কালই কলকাতা-মুখো রে মকবুল। নে, নে সব গুছিয়ে ফেল।

—কলকাতা? বাঁচলাম যেন।

সন্ধ্যা উতরে যেতেই হাওড়ায় এসে নামলাম। কলকাতা নয় তো আসমান। বাড়িতে কি যেন একটা গোলমাল—দূর থেকে শুনতে পাচ্ছি। কাছে এসেই একেবারে হকচকিয়ে গেলাম। আলোয়-আলোয় ঝলমল, ফুলে-ফুলে আমের পাতায় গেট সাজানো, ছাতের উপর হোগলার ছাউনি। সানাই বাজছে।

—কোথায় এলাম দাদাবাবু?

—কেন, বাড়িতে!

মা বললেন—ঠিক সময়ে এসেছিস যা হোক। আমি তো ভেবে মরছি। এখুনি বর এসে পড়বে। ওলো পটলি, ওঁকে খবর দে, খোকা এসেছে।

মেয়ের দল কি ভেবে উলু দিয়ে উঠল।

আমাকে বললেন—এ কে! মকবুল? বাঃ, দুবছরে খাসা চেহারা হয়েছে তো! চেনাই যাচ্ছে না। মাকে মনে আছে রে মকবুল?

মাকে প্রণাম করলাম। বাবা এলেন—বাবাকেও।

খানিক বাদে একটা তুমুল উল্লাস উঠল—বর এসেছে, বর এসেছে। শাঁখ, উলু, চিৎকার, গান—কত কি!

রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। এত চাকর থাকতে অতিথি-চাকরকে হয়তো আজ দরকার হবে না। ছাই কলকাতা! আমার সেই পাহাড়তলির শুকনো মাঠ ঢের ভালো—সেই কুয়োর ধার, সেই হিজল গাছের তলা, সেই মরা আহ্লাদি-নদীটা!—আর সেই পাহাড়ী মেয়েটাও।

বাসি বিয়ের দুপুর।

চাকরদের ব্যারাকে কোণের ঘরটা আজকাল পছনের। প্যাঁটরাটা তেমনি আছে—সেই পাটিগণিতটা যার তলায় মখমলের চটি লুকানো ছিল—টিনের কৌটোটা, যেটা আমিনার কাছে জিম্মা রেখেছিলাম। তখনো বাড়িটা গিজগিজ করছিল।

তবু কেন যে বারান্দায় এলাম ঘুরতে-ঘুরতে। মোটা থামটার আড়াল দিয়ে কিছু দেখা যাচ্ছিল বুঝি!

হঠাৎ কে যেন ছুটে এল। ছুটে মোটেই হয়তো নয়। না হোক, এমন অসম্ভব কথা কে কবে ভেবেছে?

ওর সর্বাঙ্গে নববধূর নবারুণ লজ্জা—দুটি চোখে সেই পাহাড়দেশের মায়া!

থামের পিছনে দাঁড়িয়ে বললে—কেমন আছ মকবুল?

—ভালো আছি।

ভাবি, আসমানির কোনো অঙ্ক ফের ভুল হয়ে গেল নাকি? না, সেই ফুল তুলে আনার হুকুম?

বললে—আজকে সবাই আমাকে প্রেজেণ্ট দেবে। তুমি কিছুই দেবে না মকবুল?

—আমি কি দেব? কিই বা আছে—ছাড়া প্যাঁটরাটা?

আসমানি একটু হাসলে। পরে আঁচলের তলা থেকে একটা সোনার হার বার করে বললে—তুমি যদি এটা দাও, তাহলে ওরা একেবারে অবাক হয়ে যাবে। এটা আমারই জিনিস, তোমাকে দিলাম—তুমি এটা আবার আমাকে প্রেজেণ্ট দিও। তুমি যদি কিছু না দাও তাহলে ওরা ঠাট্টা করবে।

কেন ঠাট্টা করবে বুঝি না। আমি তো সামান্য একটা চাকর!

বললাম—দাও।

মনে কোনো দুরাকাঙ্ক্ষা ছিল বুঝি। তাই হাত বাড়ালাম না।

আসমানি হারটা আমার পকেটের মধ্যে গুঁজে দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল।

নিজের ঘরে এসে পড়েছি।

পিছন থেকে পছন এসে বললে—কি রে, প্যাটরা গুছোচ্ছিস যে! চললি?

চকচকে সোনার হারটা বুঝি দেখে ফেলেছে।

—ওটা কি রে?

—সোনার হার, কিনাবি?

—কোথায় পেলি? চুরি করেছিস?

—যে করেই পাই না, নিবি কিনা বল্।

হারটা হাতে তুলে নিয়ে পছন বললে—কতোতে ছাড়বি?

—এই গোটা পঞ্চাশ—

—ইঃ? পনেরোটা টাকা আছে, ভাখ—যদি হয়।

—দে, তাই। পনেরো টাকাই সই।

দ্বিধা করবার সময় নেই।

পাহাড়তলির রেল-ভাড়া পনেরো টাকায় হবে? কে জানে? বেড়িয়ে তো পড়ি!

তখনো সানাই বেজে চলেছে—ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে।

একটা কথা না বললেও চলে—বর অবশ্যি টিমুদাই।

দাদাবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল—কি অজস্র বর্ষণ সেদিন! পশ্চিমের একটা খুদে ইস্টিশানে দেখা—গাড়ি তখনো এসে ভেড়েনি, দাঁড়িয়ে ভিজছে। প্রথম তো চিনতেই পারেনি। তারপর বললে—তুই এখানে?

শেড-এর তলায় ওঁকে টেনে এনে বললাম—তোমারই মতো বেরিয়েছি। কিন্তু ট্যাক একেবারে ফাঁক—

সহসা দাদাবাবু বললে—এ-গাড়িতে নয়, শেষরাত্রে কলকাতার গাড়িতেই ফিরে চল।

বলে উঠি—না।

দাদাবাবু বললে—যেতেই হবে।

তখনো বৃষ্টি ধরেনি। রাত গড়িয়ে চলেছে। গাড়িতে উঠে মদের বোতল বার করে দাদাবাবু বললে—খাবি একটু?

বললাম—কোথায় যাচ্ছিলে, কেনই বা ফিরে চললে? আমাকে কয়েকটা টাকা দিলেই তো পারতে, বেরিয়ে পড়তাম—

—কোথায় যেতিস? কি রে, কোথায়?

—কোথাও না। তুমিই বা কোথায় যাচ্ছিলে?

—জানি না। শুধু যাচ্ছিলাম—

কলকাতায় এসে দাদাবাবু একেবারে ক্ষেপে গেল। বললাম—এ-সব কি হচ্ছে দাদাবাবু?

—তোকে আমার মানুষ করতে হবে—মানুষের মতো মানুষ। দুঃখে নিচু হবি না, ধারালো হবি—উন্মুক্ত, উদার, বেগবান!

ইস্কুলের উঁচু ক্লাশে ভরতি করিয়ে দিলে। বললে—যাতে ফেল না করিস ততটুকুন মনোযোগ দিলেই চলবে। মাসে-মাসে টাকা পাবি, হষ্টেলেই থাক। চিঠি দিস বরাবর। আমি চললাম—গাড়ি ছাড়বার আর মিনিট তেরো—

—সে কি, বাড়ি যাবে না?

—কোথায় বাড়ি?—দাদাবাবু বোঁ করে বেরিয়ে গেল।

পিছু নিলাম। ইস্টিশানে যখন এসে পৌছুলাম, পশ্চিমের গাড়ি এই একটা ছাড়ল। জোরে পা ফেলে গাড়ির পিছনে চলতে চাইলাম হয়তো—কাউকে দেখা গেল না। শুধু একটি হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোক সদ্যবিয়োগব্যথায় আকুল হয়ে কাঁদছে—ওর স্বামী নাকি এই গাড়িতেই পালালো।

•

একতলা হস্টেলের কোণের ঘরটায় তক্তাপোশের উপর মুখ গুঁজে পড়ে থাকি—কতক্ষণ বাদে কে এসে ঘরে বাতি জ্বালায়।

খানিক বাদে কাছে এসে ভীরু গলায় বলে—বাড়ির জন্য মন কেমন করছে ভাই?

বাড়িই তো বটে?—দাদাবাবুর হৃদয়!

পাশে বসে বলে—নতুন এলে বুঝি?

চোখ তুলে তাকাই। তাকিয়েই যেন স্নেহসম্ভাষণ করি।

বলে—এই ঘরে আমরা দুজনে থাকব। এস, তোমার বিছানাটা পাতি। বাড়ি থেকে মশারি এনেছ তো? আনোনি? তাহলে আমারটাই আজকে নিয়ো। ভারি মশা এখন।—ও আমার সহ্য হয়ে গেছে—

বলি—কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

—পড়াতে গেছলাম। একটি খোকাকে অ-আ পড়াই। দুটি টাকা দেয় মাসে।

বাবাকে দিই।—ও নিজেই বলে চলে—বাবাকে দেখনি? ঘণ্টাখানেক আগে রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল—

চমকে উঠি—ঐ তোমার বাবা?

—হ্যাঁ।

—কি করেন?

—ভিক্ষে করেন।

ওর দিকে ভালো করে তাকালাম। টুকরো করে ছেঁড়া কাপড়ের একটি ফালি পরনে, গায়ে নোংরা একটা কোট, বোতাম নেই—যে-মশারি নিয়ে এত গর্ব, তার ভিতরে আসতে পারে না এমন জানোয়ার নেই কিছু পৃথিবীতে।

ফের বলে—বাবা পয়সা চাইতে এসেছিলেন। মাইনে পাইনি।

—কি করে চলে তোমার তাহলে?

—ইস্কুলে তো ফ্রী-ই, খাওয়ার খরচ একজন মাস্টার দয়া করে দেন—আর কিছু লাগে না। তুমি এলে ভাই, খুব ভালো হল। এই ঘরটায় একলা-একলা থাকতে ভারি ভয় করত—যেন মাকে দেখি, বাবা যেন হাত পেতে ভিক্ষে করতে আসে।

—কই তোমার মা?

—নেই। একটি বোন ছিল ছোট, বাবা বিক্রি করে দিয়েছেন। কোথায় আছে জানি না। এত দেখতে ইচ্ছে করে। ওর মুখ যেন আর একটুও মনে করতে পারি না।

ঐ বিকাশ। তুঃখের তুরপনেয় অন্ধকার—তবু আনন্দের অনিন্দ্য কমনীয়তা!

বিকাশের সঙ্গে পাঁচ বছর এক নৌকোয় এসেছি, ও টাঙিয়েছে পাল আমি টেনেছি দাঁড়।

ওর বাবা মারা গেল।

এক মাড়োয়ারি পুণ্য করতে কালীঘাট এসেছিলেন, তাঁর চলন্ত গাড়ির সঙ্গে একটি পয়সার জন্য ছুটতে-ছুটতে ওর বাবা ভিরমি খেয়ে পড়ে গিয়েছিল।

খালি খানিকটা রক্ত বমি করবার শক্তিই ছিল তারপর।

বিকাশ এসে বললে—খুঁজতে গেছলাম। শুনলাম হাসপাতালে নিয়ে গেছে। তারা বললে—বেঁচে নেই, তুদিন আগেই সাবাড় হয়েছে, মরার ঘরে আছে। গেলাম সেখানে—

—গেলি?

—হ্যাঁ, অন্ধকার এঁদো ঘর, পচা ভোটকা গন্ধে দম বন্ধ হয়ে নতুন আরেকটা মৃত্যুই

হয় আর কি! দেশলাই জ্বালালাম—টেবিলের উপর সব গাদি করে ফেলা হয়েছে—আমাকে দেখে সবাই যেন একসঙ্গে লাফিয়ে উঠতে চায়—বাবাকে খুঁজে পেলাম না।

বললে—চলে আসবার সময় মনে হল ওরা যেন লক্ষ-লক্ষ হাত বাড়িয়ে আমার কাছে কি ভিক্ষে চাইছে—হয়তো আমার জীবন। না রে?

পাঁচ বছর কাটিয়ে দিলাম ওর সঙ্গে—দেয়ালের আড়ালে—পুঁথির পোকার মতো! এক সঙ্গে বি-এ পাশ করলাম—ঠেলেঠুলে, টায়েটুয়ে।

ও বললে—বেরুই আয় চাকরির খোঁজে।

দুজনে বেরুলাম।

বন্ধ দরজা। বললাম—ফিরে চল ভাই। ফিরে চলাই আমাদের আগে চলা—

ও বলে—না। বন্ধ দরজায় মাথা ঠুকতে হবে। মৃত্যুর দরজা অন্তত খুলবে। তোর মতো গায়ে জোর থাকত, মোট বইতাম। শরীরটা পর্যন্ত ভাঙাকুলো—তারপর—মনের মধ্যে এত ঘুণ। যাক গে, চল সেই কম্পোজিটারির জন্য দাঁড়াইগে, যত দিন না শিখি মাইনে নেব না।

ও অন্য রাস্তা ধরে। আমি বরাবর ইস্টিশানে এসে ট্রেন ধরি।

বিস্তীর্ণ মাঠ—লাঙল লাগিয়েছে।

বলি—জন-মজুরের দরকার আছে তোমার? এই গাঁয়ে নতুন এসেছি, একটা কাজ চাই। আর পাতার একটা কুঁড়েঘর।

মোড়ল আমার চওড়া চিতনো বুকটার দিকে তাকিয়ে বলে—ঐ আমার বাড়ি। একটা ঘরও আলগা আছে বটে। থেকে যেতে পারিস। বাজারে নিয়ে যেতে পারবি শাকসবজি মাথায় করে? মাটি নিড়োতে পারবি?

—খুব পারব। পয়সা চাই না, শুধু দুবেলা দুমুঠো ভাত। পরে যদি দয়া করে দু-চার পয়সা দাও—

থেকে গেলাম।

বাতাসি

যার যা খুশি, সে তাই বলে ডাকে—শ্যাম্‌লী, ডবকা—কেউ-কেউ বা—আখখুটে। ওর নব-নব রূপ। কেউই মিথ্যে বলে না। যখন গা মেলে দিয়ে জিরোয়, সাঁঝের হাওয়া বয়, ওপারের খেজুরগাছের আড়ালে দিনের আলো ঝিমিয়ে আসে, ওকে শ্যাম্‌লী বললে বেমানান হয় না মোটেই। মাঝে মাঝে ভর-দুপুরে জোয়ার আসে, ও তখন যেন কৈশোর পেরিয়েছে মনে হয়—ওর সর্বাঙ্গ তখন উৎসুক লুব্ধ হয়ে ওঠে! তারপর ঝড়ের রাতে মা-হারা দুষ্টু খুকির মতো সে কি গোঙানি, যেন মাথা কুটছে।

নদীটি রঙ্গিনী।

ওপারে ভাঙন ধরেছে ; এপারে মাঠ,ঐ বহুদূরের আকাশ ছুঁতে দৌড়ে ছুটেছে যেন। —বিস্তীর্ণ, বিশাল! কলাগাছের ঝোপে-ঝোপে পাতার কুঁড়ে, মাঝে-মাঝে মাদারের পাহারা। দূরের বেঁটে বটগাছটা মাঠের মধ্যিখানে সাক্ষীগোপালের মতো। সমস্ত মাঠটার কোলভরা খেত আনাজ-তরকারির, যখন যা ফসল ধরে তা-ই—কপি মটর আলু মুলো—কাঁচালঙ্কা ধনেশাক পর্যন্ত। মাটির সবুজ ছেলেপিলে সব।

ওপারের মাটি ভেঙে পড়ার আওয়াজ এপার থেকে শোনা যায়। শোনা যায় জলের নাচের নূপুর।

মাটি নিড়োতে-নিড়োতে মোড়ল বলে—যাক রসাতলে ওপারের বস্তি, এপার আমার শ্রীমন্ত হয়ে উঠুক!

ওপারে পাটের কারখানা। সারাদিন ধোঁয়া ছাড়ে। ওপারের আকাশটুকুর মুখ গোমড়া, যেন মনে সুখ নেই। এপারের আকাশ একেবারে মাটির বুকের কাছে নেমে এসেছে মিতালি পাতাতে, চোখে ওর বন্ধুতার হাসি মাখা—দেখনহাসি।

আলুর চারাগুলি সবে মাথা চাড়া দিয়েছে—কড়ে আঙুলের মতো। ডগাটি দুলিয়ে-দুলিয়ে আকাশকে ডাকে!

আরেক চাপ মাটি পড়ে।

মোড়ল বলে—যাক লোপাট হয়ে। যত জোচ্চুরি-করা পয়সা।—দড়ি দিয়ে কড়ি-

বাঁধা হুঁকোটায় একটা সুখটান দিয়ে বলে—আমার এই বিশ বিঘে জমির উপর মা-লক্ষ্মীর পায়ের ধুলো পড়ুক, এই মাটি নিংড়েই সমস্ত গাঁয়ের মুখে ভাত দেব।

ধানের শীষগুলি হেলেদুলে যেন সায় দেয়।

আরো বলে—জমির আরো বন্দোবস্ত নেব, শুধু রাঙা আলু নয়, মাটির কৌটো থেকে সোনা বেরুবে—সোনা।

বলে চোখ বোজে। স্বপ্ন দেখে হয়তো—পাকা ধানের স্বপ্ন!

এই ফাঁকা মাঠটায় খালি নুলোটাকেই বেখাপ্পা লাগে। ওর বাঁ অঙ্গ যেন আকাশকে ব্যঙ্গ করছে। ও বলে, কোন মারাত্মক জ্বরে দেহের আধখানা কাবু হয়ে পড়েছে। নইলে—বাকি ইঙ্গিতটুকু ওর ডানদিকের অংশটা বেশ জোর করেই জাহির করে। সেদিকটা যেমন টনকো তেমনি জোয়ান, মাংস তো নয় লোহা, টিপলে আঙুলেই টোল পড়ে। তার জন্যেই ও এই খেত নদী আকাশ মাঠকে বেশি করে উপহাস করছে মনে হয়। ওর দিকে চাইলেই ওর খোঁড়া পা আর নুলো হাতটাই চোখে পড়ে।

ওর বাপ কিন্তু বলে উলটো কথা। জন্ম থেকেই নাকি বাঁ দিকটা বরাবর অসাড়—মোড়ল বলে। ওর মা'র দোষেই নাকি। ওর মা মরেছে, তাতে খালি মোড়লেরই হাড় জুড়োয়নি—তার অনাগত বংশধরদেরও। আরো বলে—ওটাকে মানায় ঐ কালো ধোঁয়ার কুণ্ডুলির মধ্যে, ঐ কারখানায়—ওর ঐ থেঁতলানো হাত-পা জুটোকে।

বাপ ছেলেকে দেখতে পারে না।

খুব সকালবেলা জাহাজ আসে। সামনে একটা ইস্টিশান—এখান দিয়ে যাবার সময় ফুঁ দিয়ে যায়। আকাশের বুক যেন ব্যথা করে ওঠে।

মোড়ল বলে—ওর ফুঁ, তক্ষুনি ঘুম ভাঙা চাই। মাঠে যাবার ডাক।

ভালোই হল।

জাহাজটার ডাকের নড়চড় হয় না। যেন অভ্যেস হয়ে গেছে।

আপত্তি করে খালি ভূষণের বৌ। ভূষণকে উঠতে দিতে চায় না, কাঠটার উপর চেপে ধরে রাখবার চেষ্টা করে বলে—ভোরবেলায় ঠাণ্ডা যাওয়ায় কই গা-টা একটু জিরোবে, না জন খাটতে যাওয়া—এখুনি। এ কি আবদার!

ভূষণ বলে—মোড়লের হুকুম। মজুর খাটতে এসে ভোরবেলায় বালিশ পোষায় না। তুই আর একটু না হয় গড়া।

উঠে পড়ে—জোর করেই। বৌ বড় ছেলেটাকে একটা থাবড়া মারে, ছোটটাকে লাথি। দুটো চেঁচাতে থাকে কাকের মতো। আরেকটা কান্নার শব্দ শোনা যায়। কেউ-কেউ প্রশ্ন করে, ভূষণের তৃতীয় শিশু কবে জন্মাল ফের? উঁকি মেরে দেখি, বৌটার নাক ডাকছে।

মোড়ল বলে—বেগুনের চাঙারিটা তুইই নে, কাঁচা। তুই কোনটে নিবি বাতাসি? পুঁইশাকের ঝুড়িটা?

বাতাসি হেসে বলে—আমার মাথাটা কি এতই পটকা যে মচকে যাবে? আমার মাথায় একটা বিড়ে পর্যন্ত লাগে না—খোঁপাই আমার বিড়ে। ঝিঙে-কাঁকুড়ের ঝুড়ি আমার।

দেড় ক্রোশ দূরে শহরতলির বাজার। বালির রাস্তা ধূ-ধূ করে। এক দমকে পার হয়ে যাই।

নুলোটা বাড়িতে থাকে, এক হাতে বেত চাঁছে। বুড়ি কাঁথা সেলায়, চাল ঝাড়ে, শুকনো পাতা গুছিয়ে জ্বালানি করে। আর সময়ে-অসময়ে আমাদের মাথা কোলের উপর টেনে নিয়ে উকুন বাছে।

বাতাসিকে বলে—এক গা বয়েস হল, বলি, চল শহরে, একটা ঘর বেঁধে তোকে রেখে আসি। এখানে কি সোয়াদটা আছে, বয়েস ভাঙিয়ে চড়া রোদে মাড় মলে?

বাতাসি ক্ষেপে ওঠে, বলে—তুই মর মাগী, তুই তো মা নস, রাক্ষুসী। বুড়ি হয়ে—বুড়ি বললেই বুড়ি প্যাঁচার মতো মরাকান্না শুরু করে। সে যে বুড়ি নয় তাই শুধু অস্বীকার করতে চায়। যৌবনের অনেক অপরিজ্ঞাত রহস্যকথা উদ্‌ঘাটিত হয়—এখনো তার কি-কি যোগ্যতা আছে মেয়েকে তারও একটা ফিরিস্তি দিতে ভোলে না।

মেয়েকে শাপ দেয়।—তুইও একদিন বুড়ি হবি হারামজাদি। তোর দাঁত থাকবে না, নাল গড়াবে।

হপ্তায় দুদিন করে হাট বসে। সে দুদিন গরুর গাড়িটা বোঝাই হয়। নুলো হাঁকায়, পাচন চালাতে শিখেছে এক হাতে। হুঁকোটা খালি হস্তান্তরিত হতে থাকে। বাতাসি শেষ টান দিয়ে হুঁকোটা নামিয়ে রাখতে চায় মুছে। বলি—আমাকে দে আর একটু খাই।

ওকে মুছতে দিই না। বাতাসি হুঁকো টানছে মনে হয় না, চুম্বন করছে। মুখে লাগিয়ে আরো খানিকক্ষণ ফুকতে থাকি।

ফিরতে-ফিরতে প্রায় রাত হয়ে যায়। মাঝামাঝি পথে শ্মশান। চিতা জ্বলছিল।

হুলোটা এক হাত তুলে নমস্কার করলে। দেখাদেখি বাতাসিও।

হেসে বললাম—দুগগো পুজো বুঝি ওখানে?

হুলো কিছুই বলে না। বাতাসি বললে—কালীপুজো। আগুনের জিভ মেলেছে। বাস্‌রে—

বললাম—শ্মশান থেকে মড়ার হাড় নিয়ে আসব, দেখবি বাতাসি?

ভূষণ বাধা দিতে চায়, মোড়ল বলে—যাক না দেখি কেমন!

বাতাসি বললে—ইঃ? মড়ার হাড়! আন তো দেখি।

গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়লাম।

হুলো বললে—আর কিছু ছাই আনিস ভাই—

—ছাই? কি হবে? তোর ডালিম গাছটার সার করতে?

—মরা মানুষের ছাই—

শুধু ঐ টুকুন। আর কিছু ব্যাখ্যা করে বলতে পারে না।

দৌড়ে গাড়িটা ধরলাম। বেশি দূর এগোয়নি।

—এই দেখ হাড় এনেছি বাতাসি। চোয়ালের। নিবি?

বাতাসি শিউরে উঠল—না, না, দাঁতে-দাঁতে ঠোকাঠুকি লাগছে আমার।

মোড়ল বললে—ফেলে দে ওটা।—ফেলে দিলাম।

—ছাই আনতিস তো কপালে মাখতাম।

বাতাসির কি ভয়! যেন দুটি বুক ওর থরথর করে কাঁপছে।

বাতাসির নেড়ি কুত্তাটাকে—সবাই দূর-দূর করে। বুড়ির তো দুচোখের ঝাল। বাতাসির কাছে কিন্তু ও-ই সাত রাজার ধন এক মানিক। ওর মুখটা বুকের উপর নিয়ে বাতাসি ওর আঁটুল বাছে, সাবান দিয়ে নাওয়ায়; নিজের কাপড়ের পাড় ছিঁড়ে ওর গলায় ফিতে বেঁধে দেয়। মার খায় বেশি ভূষণের বৌর হাতে। বৌটার দিশে থাকে না, পোড়া কাঠটা দিয়েই মারে।

বাতাসিও তার প্রতিশোধ নেয় ভূষণের ছোট্টটাকে থাবড়ার পর থাবড়া মেরে। মাঝে-মাঝে মাদারের ডাল দিয়েও। বলে—বুঝুক, পরের ছেলেকে মারলে কেমন লাগে—

ভূষণের বৌ তেড়ে এসে বলে—তাই হবে লো, পেটে কুত্তাই ধরবি—

বাতাসি জবাব দেয় না। কুকুরটাকে কোলে নিয়ে পোড়া জায়গাটায় তেল-পটি লাগায়। কুকুরটা জিভ বার করে লেজ নাড়তে থাকে।

নোংরা হলেও ওকে আদর করতে ইচ্ছে হয় মাঝে-মাঝে। গায়ে একটুখানি হাত বুলিয়ে দিই। রাতে নদীর গর্জন শুনে ও যখন চেঁচাতে থাকে, ওর ঘেউ-ঘেউ শুনতে খুব ভালো লাগে আমার। নদীর যে ভাষার মানে আমরা এতদিন বুঝিনি, ও অবলা কুকুরটা যেন তা বুঝে ফেলেছে। নদীর আর কুকুরের নিভৃত আলাপ শোনবার আশায় কান পেতে থাকি।

বটের তলায় চাটায়ে শুই। মুলো বলে—দাওয়ায় উঠে আয়।

বলি—ঠাণ্ডা সইবার মুরোদ আমার আছে। এক জ্বরেই বাত ধরে না গায়।

অকারণে নিষ্ঠুর হয়ে উঠি।

চার পাশে গা-ঢেলে-দেওয়া মাঠের মধ্যিখানে শুয়ে মনে হয়, সমস্ত শূন্য মাটি অফুরন্ত কথায় ভরে উঠেছে। মাঝে-মাঝে অর্ধস্ফুট, কখনো বা নিঃশব্দ—তাই মানুষের কাছে অর্থহীন! ধানের খেতের পোকা থেকে আকাশের তারা পর্যন্ত এই কথার বেতার চলেছে!

আলুর খেত থেকে বেগুনের খেতে কথা চলে। পুঁইর লতা ঝিঙের লতাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে, হাওয়ায় দুলে-দুলে কথা কয়।

কথা চলে মাটির সঙ্গে মেঘের।

ভোরবেলা গা মুড়ি দিয়ে উঠেই কুকুরটা গোয়াল ঘরে গিয়ে ঢোকে। একটু ঘেউ করে গরুগুলোকে সম্ভাষণ জানায়। গরু ল্যাজ নাড়ে—ও ওর কান দুটো। গরু পা-টা একটু নাড়ে, ও পাশেই গুটি মেরে বসে। খানিক বাদে উঠে আবার একটু ঘেউ করে বিদায় জানিয়ে আসে।

যেন দুই অচেনা দেশের রাখীবন্ধন।

এই খোলা আকাশের তলায় সব চেয়ে ভালো মানায় কিন্তু বাতাসির যৌবন। মিতালি ওর বাতাসের সঙ্গে—সব সময়েই দুষ্টুমি লেগে আছে। দুটি হাত তুলে ও যখন ওর ভেজা কাপড়টা মেলে বেড়ার গায়ে গোঁজে, বাতাস ওকে ভারি ব্যতিব্যস্ত করে কিন্তু। মাঝে-মাঝে বাতাসের বেয়াদবিকে শাসন পর্যন্ত করে না।

ও যেন পূর্ণতা। নদীটাকে কখনো-কখনো বাতাসি বলেও ডাকা যায়।

বাজার থেকে ফিরবার সময় রোজ পোস্টাপিসে গিয়ে শুধোই—বেলেপাড়ার মাঠের কোনো চিঠি আছে—কাঁচার নামে?

কে চিঠি লিখবে? তবু—

পাগড়ি মাথায় কাকে বেলেপাড়ার মাঠ ভেঙে আসতে দেখা গেল—পিওন!

মোড়লের নামে মনি-অর্ডার। কিছু-কিছু মহাজনি কারবার আছে ওর। আঙুলের ছাপ নয়—পিওনের কাছ থেকে টুকরো পেনসিলটা নিয়ে হিজিবিজি কি লিখলে। চেষ্টা করলে পড়া যায়।

মোড়ল বলে—কোন গাঁয়ের মাইনর ইস্কুলে নাকি খানিক পড়েছিল ও—অনেক আগে। পড়তে ভুলে গেলেও দস্তখতটা মুখস্ত হয়েই আছে—

আরেক দিন। এবারও মোড়ল এগিয়ে গেল। মনি-অর্ডার নয়, চিঠি—কাঁচার নামে।

বাতাসি বললে—বাঃ, সুন্দর ছাপ মারা তো দেখি! কার ঠেঙে পড়িয়ে নিবি?

—বাজারে কত বাবুই তো আসে—

দাদাবাবুর চিঠি—জাপান থেকে লেখা। লিখেছে, পড়া কেন ছেড়ে দিলি মকবুল? যা টাকা পাঠাতাম, তাতে কি চলত না? চাষবাসের মতলব মন্দ নয়, কিন্তু এম-এ ডিগ্রিটা নিয়ে নে, তোকে আমি বিদেশে আনব।

পরে আরো লিখেছে—এখান থেকে আমি ইউরোপ পাড়ি দেব মাস দুয়েকের মধ্যে। টাকার দরকার হলে লিখবি। ইচ্ছে করে বয়ে যাসনে। কেমন আছিস?

বটের একটা ডালের সঙ্গে মোড়লের বেতো টাট্টুটা দড়ি দিয়ে বাঁধা। ঝিমোয় আর ল্যাজ নেড়ে-নেড়ে মশা তাড়ায়।

ওর জীর্ণ পাঁজরের তলায় কত দীর্ঘশ্বাস পুঞ্জিত হয়ে আছে জানতে ইচ্ছে করে। ওর সারা গায়ে ঘা, ঘাড়ের লোমগুলি সব খসে পড়েছে, মাঝে-মাঝে চেঁচিয়ে ওঠে—বাতাসে কান্নার মতো শোনায়।

শয়ন-ঘরে ও-ই আমার দোসর, কিন্তু কত অচেনা!

ওর দিকে চাইলে আর একটি ছবি মনে পড়ে—সেই শিক্ষয়িত্রী মেয়েটির বিষণ্ণ বিরস মুখ! সেই দাদাবাবুর হাতের উপর হাত রাখা, সেই কথা কইতে না-পারার অকথিত কান্না!

চষা মাটির গন্ধ এসে লাগছে—আলুর খোসার। তারার অস্পষ্ট আলো ধানের শীষের উপর এসে পড়েছে, বেগুনের পাতায়। ঘোড়াটার ঘোলাটে দুই চোখে।

দাদাবাবুকে একটা চিঠি লিখতে হবে। চাষবাসই করব এমন ইচ্ছাই পরম নয়—নাও করতে পারি। নানান ভাবে জীবনটাকে বাজিয়ে যাই। একটা-একটা করে তার ছিঁড়ুক!

ঘরের ছাঁইচে পিঁড়ের উপর বসে হুঁকো টানতে-টানতে মোড়ল বললে—তামাক ভরে দেবে এমন একটি প্রাণী পর্যন্ত নেই।

ঝাঁকার থেকে ধুঁদুল তুলতে-তুলতে বুড়ি বললে—একটিকে রাখলেই হয়!

হুঁকোটা নামিয়ে রেখে, নিবন্ত কলকেটা উপুড় করে পিঁড়ের গায়ে ঠুকতে ঠুকতে মোড়ল বললে—তোর বাতাসিকেই দে না। বেশ তো ডাগর হল।

কোঁচড়ে ধুঁদুলগুলি রাখতে-রাখতে বুড়ি বললে—তোর বয়েস কত হল?—বুড়ির ঠোঁটের কোণে ঠাট্টা।

মোড়ল নিজের বুকের ছাতির দিকে চাইল। বললে—ইয়া বুকের পাটা, এই দেখ হাতের থাবা, মাটি দলে এই পায়ের গাঁথনি—বয়েস? বাতাসি তোর সুখে থাকবে।

কোঁচড়টা বেঁধে বুড়ি মোড়লের কাছে বসে একটা টিকে ধরিয়ে ফুঁ দিতে লাগল। নতুন করে আর এক ছিলিম তামাক সেজে দিতে চায়।

বললে—তোর এই বয়েসে বাতাসির মাকে নিলেই মানায় ভালো।—বলে খিকখিক করে হাসতে লাগল।

মোড়ল বললে—খালি-খালি তামাক সাজতেই নাকি রে?

হুঁকোটা মোড়লের মুখের কাছে তুলে ধরে বুড়ি গম্ভীর হয়ে বললে—দেখিস— যেন ওর সারা গায়ে ভোলা যৌবনের আমেজ এসে লাগল—ভাবখানা এমনি করলে।

মোড়ল বুঝি বুড়ির প্রেম প্রত্যাখ্যান করেছে! বুড়ি উঠে চলল—একটা টান দিয়ে যাবার প্রলোভন পর্যন্ত ত্যাগ করে।

বিড়বিড় করে বলছে—গালের হাড় দুটো ঠেলে বেরিয়েছে, চুল অকালেই পেকে গেল—তা আমি কি করব? নইলে বাতাসি তো সেদিন হল—

মোড়লের হাত থেকে হুঁকোটা টেনে নিয়ে বললাম বাতাসি তো আমার, বুড়ি-মা।

বুড়ি মুখ ঝামটা দিয়ে বললে—মর ছুঁচো, চালচুলো নেই, জন্মের ঠিক নেই—বাতাসি!

পরে বলে—বাতাসির সারা গায়ে হীরে-জহরত। তখন চাষার ছেলে? আপিসের বাবু। কাতারে-কাতারে।

বুড়ির কথায় রাগি না। বটগাছটার তলায় বসে নিজের চওড়া বুকটা ফুলিয়ে চেয়ে থাকি। হাতের 'মাস্‌ল' শক্ত করে টিপে-টিপে দেখি। দেখি—

আশ্চর্য! নিজেকে বলে নিজেকে চমকে দিই।

চট করে বিকাশের কথা মনে পড়ে যায়। কলেজে সেদিন আমাকে ও বলেছিল— আশ্চর্য! দুঃখ যা লাগে তার চেয়ে আশ্চর্য বেশি লাগে, কাঞ্চন। যাকে সাত-সাত বছর ধরে ভালোবাসলাম, সে মাথায় সলজ্জ ঘোমটা টেনে—কথাটা শেষ করতে পারে না, বলে ওঠে—আশ্চর্য!

যেন বিশ্বাস করতে চায় না। যেন নিজে নিজের ভূত দেখছে।

বি-এ ক্লাশের লাস্ট বেঞ্চিতে বসে ও আমাকে ওর প্রেমের গল্প বলত রোজ। বলত —হাত পাতলেই যা পাওয়া যায় হাত উপুড় করলে তা কতক্ষণ?

আশ্চর্য!

চেয়ে দেখি, ডালিম গাছটার তলায় নুলো বসে, আর তার খুব কাছ ঘেঁষে বাতাসি।

এগিয়ে যাই। কোলের উপর নুলোর খোঁড়া পা-টা তুলে নিয়ে বাতাসি তাতে কি খানিকটা মাখছে।

—কি করছিস বাতাসি?

—ওর পায়ে একটা তেল মাখছি। কবরেজ বলে দিয়েছে, অব্যর্থ ওষুধ। এইটুকুন শিশি ভাই, দাম নিলে সাড়ে ন-আনা।

—কোন্ কবরেজ?

— তেলিবাজারের অন্নদা কবরেজ। সেই যে রে—

—বুঝেছি।

বাতাসি শহরে গিয়ে নুলোর জন্যে এই তেল কিনে এনেছে।

বললাম—মোড়ল বুঝি পয়সা দিয়েছিল?

বাতাসি হাতের তেলোয় আরো খানিকটা তেল ঢালতে-ঢালতে বললে—হ্যাঁ, মোড়ল দেবে! জানিস, ওর এই খোঁড়া পা-টায় লাঠির বাড়ি মারে। বাপ তো না সুমুন্দি। পরে নুলোকে বললে—তুই তোর এই জ্যাতা পা-টা ওর মুখের ওপর তুলে দিতে পারিস না?

—তবে কোথায় পেলি?

বাতাসি হাসল, বললে-ট্যাঁড়সের দর আজ চড়িয়ে দিয়েছি। মোড়লকে বলিসনি যেন।

কাছে মাটির ঢিবিটার উপর বসলাম।

আমার মুখে হাসি দেখে নুলো বললে—কিচ্ছু হবে না এতে। তুই বাজে চেষ্টা করছিস।

বাতাসি ধমক দিয়ে বললে—না, হবে না? কালু ধোপার বৌটার সেদিন কি বমি, নাড়িভুঁড়ি উলটে পড়ল। অন্নদা কবরেজ একটা বড়ি দাঁত দিয়ে কেটে আদ্ধেক খাইয়ে দিলে মাগীটাকে। বমিকে যেন যমে গিলে খেল। দেখিস না তোর পা দুদিনেই কেমন টনকো হয়ে ওঠে। এই হাত দিয়েই মারবি কুড়ুল, এই পা দিয়েই তোর বাপের মুখে লাথি। বলে জোরে-জোরে মালিশ করতে লাগল।

মুলোর চোখে ঘোর লেগেছে। ছোট্ট ডালিমগাছটার ডগায় একটা ছোট্ট ফুল ফুটেছে—তার দিকেই চেয়ে আছে। গাছটা ওর নিজের হাতে পোঁতা। দুদিন পর-পরই সন্ধ্যেবেলা একটা বাঁশের কাঠি দিয়ে মাপে—এ দুদিনে কতটুকুন বড় হল। গাছটা প্রথম যেদিন সরু কাঙাল দুটি ডাল আকাশের দিকে মেলে ধরল, মুলো আনন্দে গাছটার চার পাশে খোঁড়া পা-টা নিয়ে খুব নেচেছে। দুটি আঙুলে অতি আলগোছে, যেন অতি কষ্টে সবে-গজানো কচি পাতাগুলি ছুঁয়ে বেড়িয়েছে—যেন ওদের চোখে ব্যথা লেগে যাবে, এই ভয়। কত ডাগরটি তারপর হল, কত পাতার ঘোমটা টেনে দিল—আজ বুঝি অরুণিমার আশীর্বাদ লেগে এতদিনে ফুল ফুটেছে।

বহু দিনের আলাপী বন্ধুর মতো গাছটা মুলোর দিকে চেয়ে আছে যেন।

শুধোলাম— আরাম লাগছে রে মুলো?

বাতাসি ধমক দিয়ে বলে উঠল—একদিনে কি? দিন দুত্তিন যাক।

মনে হয়, মুলোর অসাড় পঙ্গু হাত-পা দুটো যেন সহসা জল-তরঙ্গের বাদ্য হয়ে উঠেছে! এখুনি যেন অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে উঠবে।

তেলে-ভেজা হাত বাতাসির।

মালিশ শেষ করে বাতাসি মুলোর উপরের ঠোঁটের উপর আঙুল বুলিয়ে দিতে লাগল। তাতে মৌমাছির কালো কচি পাখার মতো গোঁফের রেখা উঠেছে।

চলে যাবার সময় বললাম—এই অসাধ্য সাধনা কেন করছিস বাতাসি? মায়ের পেট থেকে যে তে-ব্যাঁকা হয়েই জন্মাল, সে আর সিধে হয় না। যতই তেল মেখে হাত লাল কর না।

বাতাসি এমন করে তাকাল, যেন ওর ধারালো নখ দিয়ে এখুনি এসে মুখের উপর খামচি বসিয়ে দেবে।

বকের ঠ্যাঙের মতো কাহিল পা দুটি ফেলে ছুটতে-ছুটতে হাবা এল।

ওর জ্বর ছেড়েছে। সারা বছরে এই একবার ওর জ্বর ছাড়ে। যখন প্রথম দখিনের হাওয়া দেয়।

ছেলেটা হাবায় ভোগে। রোগা বড়-বড় চোখ দুটো পাণ্ডুটে। আকাশের দিকে চাইতেই খুশিতে উপচে গেল। আকাশের সঙ্গে ওর যেন আজ প্রথম শুভদৃষ্টি। ফাঁকা খেতের মধ্যে দাঁড়িয়ে ও ফ্যালফ্যাল করে তাকায় চার পাশে। সরু গলাটা ঘোরাতে থাকে। শালিক ধরতে হাত বাড়িয়ে ছোটে, রোগা পা নেতিয়ে আসে। শিশির-ভেজা কপির পাতায় পাতলা হাতখানি ধীরে-ধীরে রাখে, বুলোয়।

মোড়ল খেত থেকে কপি তুলে ঝুড়ি ভরে। হাবা রোদে পিঠ দিয়ে পাশে এসে বসে। দুহাতে মাটি ছানতে-ছানতে বলে—এবারে কত কপি হল মোড়ল-কাকা? সবাইর ঘরে যাবে তো একটা করে? আমাকে একটা দাও—ফাউ। আর জ্বরটা ছাড়ল। মাকে বলব কপি রাঁধতে। দুটো হলে বেশি করে—

মোড়ল ওর কথায় কান দেয় না। আপন মনে বলে—নাই বা রইল কেউ পাশে। বাঁ হাতটা কেটেই বা নিক না কেন। এই এক হাতেই লাঙল চষে সোনা ফলাব।

—মোড়ল-কাকা, ধলি-গরুটা ক-সের দুধ দেয় এখন? ওর বাছুরটার রঙ কি করে লালচে হল? কেমন ঢুঁ দিচ্ছে দেখ। বাঃ, ফড়িং ধরব।

আঙুলগুলি বাড়ায়, ফড়িংটা একটু উড়ে গিয়ে সরে বসে—হাবা আর আঙুল বাড়ায় না। দেখে।

মোড়ল আপন মনে বলে—সোনার খেতের লক্ষ্মী হয়ে থাকত! —তা নয়! যাবে যখন লুঠ করবে লাঠিয়াল, বা খোলার ঘরে কাতরাবে যখন ব্যামোয় পড়ে! সেই বুঝি ভালো হবে? যাক, আমার কি? আমি এই খেতে বুক দিয়ে পড়ে থাকব।

হাবা আমার কাছে এসে বললে—আমাকে ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে দাও না, কাঁচাদা! কোনোদিন ঘোড়ায় চড়িনি আমি।

বললাম—ওর সারা পিঠে যে ঘা।

ঘোড়াটার কাছে এগিয়ে এসে বললে—কই ঘা? ও কিছু না, দাও না চড়িয়ে।

একটা কলাপাতা ছিঁড়ে এনে ঘোড়ার পিঠে পেতে দিয়ে আস্তে-আস্তে কোলে করে তুলে দিলাম। ঘোড়াটার দু-পাশে দু-পা ঝুলিয়ে দিয়ে ও এমন ভাবে বসল, যেন ও রাজা—সিংহাসনে বসেছে। নীল আকাশ যেন ওর রাজছত্র। দড়ির লাগামটা একটু টেনে কঞ্চির মতো পা দুটি একটু দুলিয়ে ঘোড়াটাকে চালাতে চাইল জিভ দিয়ে শব্দ করে। ঘোড়াটা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, পরে আস্তে-আস্তে একটু-একটু করে হাঁটতে লাগল—যেন হাঁটতে পারছে না, ঘাগুলো টন্‌টন করছে।

হাবা আর ঘোড়াটা যেন বন্ধু। দৌড়ে যাবার জন্যে ঘোড়াকে একটুও খোঁচাচ্ছে না কিন্তু। ঘোড়াটাও আস্তে চলেছে! ওরা যেন পরস্পরকে ভালোবেসে ফেলেছে।

ওকে কোলে করে নামিয়ে দিলাম। ঘোড়ার পিঠটা একটু চাপড়ালে·। পরে একদৃষ্টে নদীর দিকে চেয়ে রইল—জেলে-নৌকোরা পাল তুলে দিচ্ছে।

ওর এই বাঁশপাতার মতো কাঁপুনে অথচ টলমলে দেহটিকে খাপছাড়া লাগে না। ও যেন মেঘলা আকাশের বুক-চেরা তৃতীয়া-চাঁদের এক টুকরো ঘোলাটে মলিন হাসি।

বললে—কাঁচাদা, নদীতে নাইতে যাব আজ।

—চড়ুই পাখির ডালনা খাওয়াবে—রাঙা আলুর সঙ্গে ?

—বুড়ির মাথায় মারব এই ঢিলটা ?

—নদীর মধ্যে তিমি মাছ হয়ে নৌকোগুলো গিললে কেমন হয় ?

শেষে হাত পেতে বললে—আজ আমার জ্বর ছাড়ল, কিছু বকশিশ দাও না কাঁচাদা। বলে হলদে দাঁতগুলি বার করে হাসতে লাগল।

কোন্ পাড়া থেকে একটা ভেড়ার ছানা এ-পাড়ায় চলে এসেছে পথ ভুলে।

চষা মাটির উপর ছোট-ছোট পায়ের ছোট-ছোট দাগ।

বাতাসি ওর মুখটা বুকে চেপে ধরে বললে—বা, বাঃ, দেখ এসে মুলো, কেমন সুন্দর বাচ্চাটা !

হাবা দু-হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল—আমার কোলে একটু দাও না বাতাসিদিদি !

সমস্তটা দিন বাতাসি ভেড়াটাকে বুকে-বুকে রাখলে। ওকে আর কুকুরটাকে একসঙ্গে নাওয়ালে, চেনা করিয়ে দিলে। কুকুরটা জিভ বার করে ভেড়ার পা-টা একটু চাটল।

বিকেলবেলা দু-হাঁটু ধুলো নিয়ে ও-পাড়ার দুলাল এসে হাজির। বললে—পথ ভুলে হেতায় পালিয়ে এসেছে বুঝি ? আমি সারা শহর তন্নতন্ন—

বললাম—তুই না এসে পড়লে রাত্রে বাতাসি আমাদের মাংস রেঁধে খাওয়াত। দেরি করে এলে নেমন্তন্ন খেয়ে যেতে পারতিস।

বাতাসি রুখে উঠল—কক্‌খনো না। মিথ্যে বলছিস কেন ? ওর গায়ে কে বঁটি তুলবে ?—ওর গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

ওর গালে একটা চুমু খেয়ে বললে—দুষ্টুমি কোরো না। বাড়িতে থেকো—মাঠে। ভেড়াটা চলে গেলে কুকুরটাকে কোলে টেনে নিয়ে আঁটুল বাছতে বসল।

হাটবার। মোড়ল দুদিন বাড়ি ফেরেনি। ভূষণেরও কাল রাতে জ্বর হয়েছে।

বললাম—মোড়ল বউ আনতে গেছে বুঝি ?

বুড়ি ধনেশাক তুলতে-তুলতে বললে—দেখি না কেমন বউ আনে। চল্লিশ বছর ছাড়া কে রাজী হয় দেখি।

এ দুদিন নুলোকে বাতাসিই রেঁধে দিয়েছে। খাইয়েও দিয়েছে এক-আধ গরস।

আমি যদি বলি—আমাকে আর রাঁধাস কেন? ঐ সঙ্গেই আর দুমুঠো চাল নে না! বাতাসি কঠিন হয়ে বলে—তোর সমথ দুটো হাতের তো কত বড়াই করিস! এক হাতে কাঠ ঠেলবি, আর হাতে হাতা দিয়ে ভাত নাড়বি।

বলতাম—কিন্তু ও কি ভাত মাখতেও পারে না?

বাতাসি ক্ষেপে উঠত। বলত—না। খাইয়ে দিয়ে খেতে জানে।

—আমি খাইয়ে দিই তবে?

—দে না। আঙুলে ঘ্যাচ করে কামড়ে দেবে—বলে কাঁধ দুটো ঝাঁকিয়ে হেসেউঠত।

গরুর গাড়িটা বোঝাই করছিলাম। বিকেল হয়ে এসেছে। বললাম—আজ শশার ঝুড়িটায় খুব হাঁক দেওয়া যাবে, কি বলিস বাতাসি?

হাবা ছুটতে-ছুটতে এসে বললে—আমি হাটে যাব কাঁচাদা।

—চল্।

নুলোই গাড়ি হাঁকায়। যত বলি—বাতাসি, একটা কথা শোন। ও শুধু ঘাড়টা একটু কাত করে বলে—বল্। একটুও সরে আসে না।

অগত্যা হাবার সঙ্গেই গল্প করি।

—গাঙশালিকের ঝাঁক চলেছে।

—কাঁথার তলায় আর শুতে হবে না, ভারি মজা!

—আলু তুমি মেপে দেবে আর আমি গুনে-গুনে পয়সা থাক করে সাজব! কেমন?

বাতাসি যে একেবারে শুয়ে পড়ল। শুয়ে-শুয়ে বাতাসি বলছে নুলোকে—রাতে একলা শুতে কাল তোর খুব ভয় করছিল, না?

নুলো বললে—কাঁচাকে আজ শুতে বলব খন।

—দূর!

হাট থেকে ফিরবার মুখে বললাম—তোরা একটুখানি গাড়িটা নিয়ে দাঁড়া। আমি হাবাকে একটু শহর দেখিয়ে আনছি।

হাবা যা দেখে তাই অবাক হয়ে দেখে। বলে—খাবারের দোকান! কত বোলতা ঘুরছে চারপাশে। আচ্ছা, ময়রাদের ক্ষিদে পায় না কাঁচাদা?

—পায় বৈকি! দোকানে ঢুকলাম।

পরে একটা দর্জির দোকানে। বললাম—এর একটা কোটের মাপ নিন তো।

হাবা আনন্দে তার গা থেকে ছেঁড়া চিটচিটে গেঞ্জিটা একটানে খুলে ফেললে। এক, দুই, তিন—আট, পাঁজর গোনা যায়। ষোলো ইঞ্চি ছাতি। দোকানের সুমুখে কতগুলি মেথরের ছেলের ভিড় জমে গেছে। হাবা ওদের দিকে এমন করে চাইছে —ওরা যেন ভিক্ষুক।

—কবে কোটটা হবে কাঁচাদা?

—দু-তিন দিনের মধ্যে।

হাত-তালি দিয়ে বলে ওঠে—মাকে জানতেই দেব না, কাপড়টা গায়ে দিয়ে থাকব। হঠাৎ কাপড়টা খুলে নিলেই জামাটা দেখে ও চমকে যাবে। গোলাপফুল-তোলা ছিট। সব বেছে ওটাই ওর পছন্দ! বলে—কোটটায় ফুল পড়বে? গোটা কুড়ি নিশ্চয়ই।

পরে বলে—গাবার জন্য একটা ঝুমঝুমি কেনো না কাঁচাদা।

গাবা ওর ছোট ভাই।

রাস্তার পারে একটা আম গাছ—কচি আম ধরেছে।

বললে—আমাকে দুটো আম পেড়ে দাও না!

বললাম—টক আম খেলে ফের জ্বর হবে।

—এমনি না খেলেও হবে। আমার তো মোটে এ কটা দিন ছুটি। পরে তো ফের কাঁথার তলায় শোবই। দাও না।

উঠলাম। নামবার সময় পা পিছলে পড়ে গেলাম মাটিতে। হাঁটুটা যেন একটু মচকে গেল। এসে দেখি, ফাঁকা রাস্তা—গাড়ি নেই। ওরা একলা-একলা চলে গেছে।

হাবা বললে—কি হবে তবে?

—হেঁটেই যেতে হবে।

খোঁড়াচ্ছিলাম। হাবাও আস্তে-আস্তে যাচ্ছিল। তখন অন্ধকার তার ডানা মেলেছে।

হাবা হাঁপ নিয়ে বললে—ঘোড়াটা থাকলেও বেশ হত, তুমি হাঁকাতে আর আমি তোমার পিঠ আঁকড়ে বসে থাকতাম।

বললাম—তুই আমার কাঁধে চড়।

—তোমার পায়ে যে লাগবে।

—লাগুক। কাঁধে তুলে নিলাম।

আমার চুলগুলো দুহাতে আঙুল দিয়ে টেনে ধরে হাবা বললে—ওখানে অত আগুন কিসের কাঁচাদা?

—মড়া পুড়ছে! যাবি?
—চল না। একটু জিরিয়ে নেবে?
শ্মশানে এসে নদীর ধারটায় একটু বসলাম।
হাবা বললে—আমার ভারি ভয় করছে কাঁচাদা।
—কেন?
—ঐ তালগাছটার ওপরে কে? দুই লম্বা ঠ্যাং মেলে? এখান থেকে চল—চল।
—কোথায় লম্বা ঠ্যাং? দ্যুৎ।
—না, না। প্রকাণ্ড হাঁ-টা, লাল চোখ। চল কাঁচাদা। শিগগির। এই দিকেই যে আসছে।
কাঁধের উপর তুলে নিলাম ফের। আমার চুলগুলি ভীষণ জোরে টেনে রইল।
বলে—আর কতদূর?

বাতাসিকে গিয়ে বললাম—গাছ থেকে নামতে গিয়ে হাঁটুটা মচকে গেল, বাতাসি। তোর তেলটা দে না একটু মালিশ করে।
বাতাসি বললে—মচকেছে তো নিশুন্দি পাতা বেঁধে রাখ না। ও তো বাতের তেল।
—তবু দে না একটু মালিশ করে। সেরেও যেতে পারে শিগগির।
—কক্ষনো সারবে না এতে।
—একবার মেখেই দেখ না। একদিনেই কি আর ফল হয়?
বাতাসি আমতা-আমতা করে বললে—তেল আর নেইও, ফুরিয়ে গেছে!
—সাড়ে-ন-আনা পয়সা দিলে কাল কিনে এনে মেখে দিবি?
বাতাসি ক্ষেপে উঠল।—কেন, তুই কিনে আনতে পারিস না? তোর হাত দুটো এমন কি অথব্ব হয়েছে যে একেবারে চাকরানি চাই তেল মেখে দিতে?
—চাকরানি কেন? ঐ যে কোণে ইঁটের পাঁজার কাছে শিশিটা, ঐ তো আছে খানিকটা তেল।
এগিয়ে আসতে দেখে বাতাসি তাড়াতাড়ি শিশিটা দু-মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে চেঁচিয়ে বলে উঠল—যা, যাঃ, পালা! অল্প একটুখানি মাত্র আছে। কাল ভোরে ওকে মেখে দিতে হবে না?
চলে গেলাম।
বাতাসি বললে—বেশ হয়েছে। খুব খুশি হয়েছি। আর ক্ষ্যাপাবি খোঁড়া বলে?
মোড়ল ফিরে এসেছে—বউ নিয়ে নয়, কতগুলি টাকা নিয়ে।

আমাদের মাইনে দিলে। মুলোকে পর্যন্ত, গাড়ি হাঁকাবার জন্যে। বাতাসির কাছে রাখতে দিল।

বুড়ি বললে—বউ রাস্তায় গড়াগড়ি যাচ্ছে কি না! পাকা দাড়ি দেখে আগুন নিয়ে আসত।

মোড়ল ধান ভানতে-ভানতে বললে—জমিদার আরো জমির বন্দোবস্ত দেবে। বাগিচা করব—লিচুর। খেতের এধারে খালি সবুজ, ওধারে সোনা। টিকে থাক এখানে। হুঁকো টানবি আর সুখে থাকবি। গায়ে মাটি মেখে কত সুখ।—পরে মাটি চষতে-চষতে বললে চাই না কাউকে। এই খেতটাই আমার বউ।

মুলো এসে বললে—বাবা, বাতাসিকে একটা নাকছাবি কিনে দাও না। ও চাইছিল।

বাপ বললে—তোর টাকার থেকেই দিস।

ওরা হাট থেকে আগেই ফিরেছে। হাবার কোটটা নিয়ে যাবার কথা আছে। তাই আমার যেতে দেরি হবে।

হাবার আবার কাল থেকে জ্বর এসেছে।

ফিরে এসে বাতাসিকে শুধোলাম—কি হয়েছে রে বাতাসি? কে কাঁদছে?

—ভূষণের বৌ।—বাতাসির চোখ মুখ ফোলা, ঝাপসা।

—হাবার হয়ে গেছে।

—কখন? কি করে?

—ঘণ্টা খানেক আগে। জ্বরের মধ্যে শুঁটকি মাছের ঘণ্ট চুরি করে খেয়েছিল বলে ওর মা সেই যে দরজার খিলটা দিয়ে ওর মাথায় বাড়ি মারল, সেই বাড়িতেই—

অথচ নদীর গোঙানির সঙ্গে ভূষণের বৌর মরা-কান্নার পাল্লা চলেছে।

ওপাড়া থেকে দুলাল এল কাঁধ দিতে। আমাকে বললে—মাদার ফেড়ে ফেলি, আয়!

মাদার গাছটার পাঁজরায়-পাঁজরায় যেন কান্না। হয়তো হাবার জন্যেই—

রোগা বেতো ঘোড়াটা পর্যন্ত দড়ি খুলে অস্থির হয়ে বটগাছটার চার পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গরুগুলি গলা তুলে গাঢ় চোখে চেয়ে আছে—জাবর কাটছে না।

বুড়ি আঁচলে চোখ মুছতে-মুছতে হাপুরে গলায় ভূষণের বৌকে বললে—অত কাঁদছিস কেন লো লুটিয়ে-লুটিয়ে?—এক ছেলে গেছে কত আবার হবে—

ভূষণের বৌ বুড়িকে খন্তা নিয়ে তাড়া করে এল।—হারামজাদি বুড়ি, শুকনি—তোর শাপেই তো আমার হাবা—আমার হাবারে—

তারপরে নদীর ককানির সঙ্গে তাল রেখে কান্না, বিনিয়ে-বিনিয়ে।

মুলো মিনতি করে বললে আমাকে—তুই এবার কাঁধটা বদলা, অনেকক্ষণ নিয়ে আছিস। আমাকে দে এবার।

—তুই এতটা কাঁধই পাবি না। তুই পারবি ওদের সঙ্গে চলতে?

মোড়ল বললে—হ্যাঁ, আমরাও ওর সঙ্গে ঠুকে-ঠুকে চলি আর কি!

বাতাসি ডাক দিলে—চলে আয় মুলো, আমরা পিছেপিছে চলি আস্তে-আস্তে।

কাঁধটা বদলালে পারতাম!

চিতায় তোলবার আগে ওর গায়ে কোটটা পরিয়ে দিলাম। মুলো পাশের সজনে গাছ থেকে কতগুলি ফুল ছিঁড়ে ওর মুখে বুকে ছুঁড়তে লাগল।

যেন কোটটা পরে ও হাসছে।

মাটির উপর মুখ থুবড়ে বাতাসির সে কি বুক-ভাঙা কান্না! হাবা যেন ওর কে! হাবা তো পুড়ছে না, ওর গায়েই যেন আগুন লেগেছে—ওর বুকে। তালগাছের মাথা পর্যন্ত আগুনের শীষ ওঠে—যেন দূরের তারাকে ছুঁতে চায়।

পোড়া শেষ হয়ে গেলে মুলো কতগুলো ছাই নিয়ে মুখে বুকে পায়ে সর্বত্র মাখতে লাগল। দেখাদেখি বাতাসিও।

বললাম—তোরা একরাতেই সন্নেসী হয়ে গেলি নাকি?

মুলো তেমনি বললে—মরা মানুষের ছাই—

তারপর মাটির উপর গড় করে প্রণাম। বাতাসি একেবারে সাষ্টাঙ্গে।

ফিরে এসে বাতাসি কুকুরটাকে বুকে নিয়ে কাঁদতে লাগল ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে। কুকুরটা যেন ওর খোকা!

মুলো ওর ডালিমগাছের পাশে চুপ করে বসে রইল।

মোড়ল ভূষণকে ডেকে বললে—মন খারাপ করিসনে ভূষণ! কত আসে যায়। সেই তো সেবার এক খেত মুলোর চারা হয়ে বৃষ্টিতে সব মারা গেল। এও তেমনি।

ভূষণ বললে—নাঃ। গেছে হাড় ক'খানা জুড়িয়েছে। রাত্তিরে ঘুমুতে দিত না। ঝঞ্ঝাট!—মুখে বলে বটে কিন্তু চোখের জল মোছে।

মোড়ল বললে—আমারও মনটা সেবার ভারি দমে গেছল। অত ছোটখাটো দুঃখ নিয়ে থাকলে কিছুই চলে না ভাই। এই প্রকাণ্ড মাঠের প্রতিটি ঘাস আমাদের ছেলে—মাঠটা ওদের মা।

মোড়লের মনও ঠিক নেই। রাতে খেতের আল বেয়ে-বেয়ে চলে, ঘুমুতে যায় না।

ঘোড়াটা মাঝে-মাঝে বিকৃত শব্দ করে ওঠে—ঘায়ের যন্ত্রণায় হয়তো।

সমস্ত মাঠটা যেন খাঁ-খাঁ করছে।

সে-রাতে হঠাৎ বৃষ্টি নেমে এল, আকাশ ভেঙে। সঙ্গে ঝড়ের দুরন্তপনা। মেঘের কালো ঝুঁটি ধরে ঝাঁকানি দিচ্ছে।

কলাগাছগুলি পড়ে গেল—

নদীর জল ফুলে উঠেছে, ঝড়ে মাটির ঢেলা উড়ছে, ধুলোয় সব দিক একাকার।

তার মধ্যে মুশলধারে বৃষ্টি—অন্ধকার চিরে-চিরে তলোয়ারের ঝিলিক দিচ্ছে। মড়-মড় করে একটা মাদারগাছও পড়ল।

শুধু কুকুরটা নদীর সর্বনাশা ডাক শুনে প্রতিধ্বনি করছে। যেন কাকে কামড়ে ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করে দেবে।

বাইরে বেরিয়ে এলাম—নদীর পাড়ে। নদী দুর্দমনীয়, আমার পায়ের নিচের মাটিতে চিড় ধরল। সরে এলাম। হুড়মুড় করে পড়ে গেল মাটির চাপটা।

নদী তাহলে এদিকেও মাথা কুটতে লেগেছে।

পিছনে চেয়ে দেখি—বাতাসি। সব কাপড়-চোপড় ভেজা, দুরন্ত ঝড় ওর সঙ্গে ফাজলামো লাগিয়েছে।

—উঠে এলি যে জলে?

—নুলোকে খুঁজে পাচ্ছি না। ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে।

দুজনে খুঁজতে লাগলাম। ধুলোয় কিছুই দেখা যায় না, চোখের উপর জলের ঝাপটা লাগে।

বললাম—আমার হাতটা ধর বাতাসি। নইলে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবি।

বাতাসি আমার হাত চেপে ধরে—ভেজা হাত, কিন্তু ভিতরের রক্ত যেন ফুটছে।

—ঐ যে, ঐ যে নুলো। একটা বিদ্যুতের ধাঁধালো আলোয় আচমকা দেখতে পেয়ে বাতাসি চেঁচিয়ে উঠল।

এগিয়ে গিয়ে দেখি নুলোর ডালিমগাছটা ঝড়ের বাড়ি খেয়ে কাত হয়ে পড়ে গেছে। নুলো সেটাকে দুহাতে আঁকড়ে ধরে ফের মাটিতে পোঁতবার চেষ্টা করছে।

বললাম—ও কি আর বাঁচে? ফেলে রেখে ঘরে যা। ঠাণ্ডায় এবার ডান দিকটাই বুঝি ঠুঁটো করতে চাস?

নুলো কেমন করে যেন চোখের দিকে চায়—

অমনি করে বিকাশও একদিন চেয়েছিল!

পরের দিনও বৃষ্টি। সমানতালে চলেছে। বুড়ি বললে—কালবোশেখী!

মোড়ল বললে—ঝড়টাই সর্বনেশে। ঝাঁকাগুলি সব পড়ে গেল। নইলে বৃষ্টিটা তো ভালোই। মাটি মেতে উঠবে।

বাজারে আজ আর কারু যাওয়া নেই। মাঠে জল থইথই করছে।

মোড়লের ঘরে আজ সব্বাইর খিচুড়ির নেমন্তন্ন।

রাতেও জল ধরল না। বরং আরো বেগে এল। সঙ্গে-সঙ্গে ঝড়ের দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হাত-পা ছোঁড়া!

মাঝরাতে আবার উঠে এসেছি নদীর পাড়ে। ফেনিল নদী পাক খাচ্ছে—যেন নিজে নিজের চুল ছিঁড়ছে।

পিছনে ফের বাতাসি। তেমনি ভেজা গা, তেমনি বাতাসের ইয়ার্কি ওর সঙ্গে।

বললে—নদী তো নয়, মা-কালী।—বলে হাত জোড় করে প্রণাম করলে। ওপারের পাটের কারখানার খানিকটা ঝুপ করে পড়ে গেল। নদীটা মরিয়া হয়ে উঠেছে।

বললাম—উঠে এলি যে আজও? অসুখ করতে চাস বুঝি?

আমার কাছে সরে এসে বললে—ভারি ভয় করছে, কাঁচা।

হাতটা বুঝি একটু বাড়িয়ে দিলে। জোরে চেপে ধরলাম।

—ঐ দেখ, ঐ কাঁচা, একটা নৌকো ডুবছে।

একটা ডিঙি উলটে গেল প্রায় পাড়ের কিনারে এসে। কোন লক্ষ্মীছাড়ার নৌকো? ঝড়ের তাড়নার মধ্যে আর্তধ্বনি মিলিয়ে গেল হয়তো।

—ওকি, কাপড় কাছছিস যে। ঝাঁপাবি নাকি?

—হাঁ, দেখছিস না, মেয়েলোক—

—ক্ষেপেছিস, কাঁচা? বলে পিছন থেকে আমাকে জড়িয়ে ধরে বাধা দিতে চাইল।

বাতাসির আলিঙ্গন থেকে নদীর বাহুবন্ধন বুঝি বেশি লুব্ধ করেছে। দুই হাত মেলে ঝাঁপ দিলাম। বাতাসি চিৎকার করে উঠল।

আমার হাতে বুকের সন্তানটিকে ফেলে মা তলিয়ে গেলেন, জলে—অন্ধকারে।

পাড়ে যখন উঠে এলাম, শিশুটি আর নেই। আগেই হয়ে গেছে।

—দেখি, দেখি। বলে বাতাসি শিশুটিকে কেড়ে নিয়ে নিজের ভেজা বুকের উপর চেপে ধরল। যেন ওকে গরম করতে চায়। ওর মুখে চুমোর পর চুমো দিতে লাগল। ওই যেন ওর মা, হারা-ছেলে ফিরে পেয়েছে।

—চল-চল ঘরে, কাঁচা। সেঁক দিলে এখনো বাঁচতে পারে। বলে আর অপেক্ষা না

করেই মরা শিশু বুকে নিয়ে ঘরের দিকে ছুটল। ঊর্ধ্বশ্বাসে। যেন পাগলী হয়ে গেছে।

কিন্তু বৃথা!

—তৃতীয় দিনে ঝড়বৃষ্টির মাতলামি আর বুঝি সইল না। রাক্ষসী নদীটা তার দুই পাড়ের বন্ধন ভেঙে হুড়মুড় করে ডাঙায় এসে পড়েছে কোটি-কোটি ফণা তুলে।

ঢেউয়ের পর ঢেউ—যেন মহাসমুদ্র।

সব ভেসে গেল মোড়লের স্বপ্নভরা খেত মাঠ জোত জমি, বাড়ি ঘর দোর সব। দিগন্তসীমা পর্যন্ত জলস্রোত। মধ্যরাত্রির হৃৎপিণ্ডে দুর্বার তরঙ্গতর্জন – সমস্ত মানুষের দুর্বল আর্তকণ্ঠ ছাপিয়ে।

খানিকক্ষণ বাদে আর কিছু শোনা যায় না। কুকুরটাও ভেসেছে।

সবাই ভাসলাম, ভেসে চললাম নদীর অতর্কিত নিমন্ত্রণে—আমি, মোড়ল, ভূষণ, ভূষণের বৌ, বুকের উপরে গাবা, ন্নুলো, ন্নুলোর হাত ধরে বাতাসি, আর বুড়ি। ও-পাড়ার দুলালও। এ-পাড়া ও-পাড়া—সব। গরু, বেতো টাট্টুটাও। আরো কত! হিসেব নেই, পাত্তাও নেই। বটগাছটা পর্যন্ত।

ভোর হয়নি, নদীর তড়কা তখনো থামেনি—তখনো ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মিছিল। বুকের কাছে কি একটা এসে ঠেকল। যেন খানিক ভর পেলাম। ওকে সাপটে ধরে খানিকক্ষণ আরো ভাসা যাবে। আর যদি মরতে হয়, তো ওকে নিয়েই—তলিয়ে গিয়ে!

—কে, বাতাসি? আয়—

ও কোনো জবাব দেয় না। আঠার মতো অন্ধকারে সমস্ত আকাশ আর জল যেন আটকে গেছে।

ওকে দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে অবশিষ্ট শক্তিটুকু প্রয়োগ করে ওর মুখে নিবিড় চুম্বন দিলাম।

আর একটা ঢেউয়ের হেঁচকা ধাক্কায় দুর্বল হাতের বন্ধন থেকে ও খসে ভেসে গেল।

হয়তো বানের জলে শ্মশান থেকে একটা পোড়া গাছের গুঁড়িই ভেসে এসেছিল।

মুক্তি

আবার কলকাতা। সকালে কুয়াশা, দুপুরে ধুলো, বিকেলে ধোঁয়া।

বস্তি, না আঁস্তাকুড়! সমাজের তলানিদের অতল সমুদ্র।—ভিড়ে গেছি। সমস্তই সস্তা এখানে—প্রেম আনন্দ মৃত্যু।

একটা চাকরি পেয়ে গেছি। ট্রামের পয়সা কুড়োই।

জাঁতা ঘুপসি বস্তির বাসিন্দাদের সঙ্গে বন্ধুতা পাতাই—বেনোজলের জোয়ার!

দরজাটা খোলাই ছিল। তবু সে-ঘরে আলোকের পলকটিও পড়ে না। জমিদার-বাড়ির উঁচু পাঁচিলটা ডিঙিয়ে আসতে-আসতেই রোদের হাঁপ ধরে যেন, ঝিমোয়। তারপর মাড়োয়ারিদের বেঢপ ভুঁড়িরই মতো হাসপাতালের মোটা গম্বুজটা রোদকে শুধু আড়াল করে আটকেই রাখে না, চেপটে ওর টুঁটিটা যেন চেপে ধরে। ওটার কবল এড়িয়ে এসেই ও একেবারে ভীতু রোগা ছেলের মতো সন্ধ্যার বুকে মুখ রেখে জিরোয়—অন্ধকারের চোখের জলে গলে-গলে পড়ে তারপর।

কিন্তু ঐ ঘরে ওর চিরকালের কবর—

মরা মানুষের বোজা চোখ দুটো জোর করে টেনে খোলাও যেমনি, তেমনিই ঐ ঘরের জানলা খোলা।

রোদ আসে না। যে-রোদে শুকনো বনে আগুন লাগে আচমকা, মজুররা যে-রোদে উপুড় হয়ে পিঠ পেতে রাস্তা খুঁড়তে খুঁড়তে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে। একটি ছিটেও না।

ডাকলাম—দীনবন্ধু! পাইপ নিয়ে বেরোলি না যে এখনো?

ভোর হয়ে গেল, এখনো দীনবন্ধু ঘুমুচ্ছে কি রকম? বহু কষ্টের টিমটিমে চাকরিটাও খোয়াতে চায় বুঝি?

তক্ষুণিই চিৎকার করে উঠতে হল—পুতলি, ও পুতলি, শিগগির আয়—শিগগির।

হাতে একটা জ্বলন্ত কুপি নিয়ে পুতলি দৌড়ে এল।—কি, কি?

কটা কুপি একসঙ্গে জ্বালিয়ে আকাশের সূর্য—কে তার হিসেব রাখে?

পুতলি হাতের কুপিটা মাটির উপর উলটে ছুঁড়ে ফেলে, গলার সমস্ত রগগুলি চিরে-চিরে ছিঁড়ে, বুকের পাঁজরাগুলি চৌচির করে ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল। মানুষের অভিধানে সে-চিৎকারের ভাষা নেই। যেমন নেই সমুদ্রের অগাধ বন্যার, যেমন নেই কালবোশেখীর।

অকালে ঘুম ভেঙে সবাই হুড়মুড় করে ছুটে এল ভয় পেয়ে, লাঠি সোটা যা হাতের কাছে পেল তাই নিয়ে—হাবুল গণেশ ভজুলাল; ময়লা ছেঁড়া কাপড়টা গায়ের উপর গুছোতে-গুছোতে ও-বস্তি থেকে নির্মলা পর্যন্ত, হাতে একটা কালি-পড়া টিনের লণ্ঠন। ঘুম ভেঙে কেবল এল না কোনো ফাঁকে কৃপণ আকাশের এক বিন্দু রোদ—এক চিলতে।

ঘরের লম্বালম্বি বাঁশটায় একটা নারকেলের দড়ি খাটিয়ে তাতে গলাটা এঁটে বেঁধে দীনবন্ধু ঝুলছে। ওর কোমরের ছেঁড়া পিঁজে-যাওয়া পচা কাপড়ের টুকরোটায় বেড় তো হতই না, ভারও সইত না—তাই বুঝি নারকেলের দড়ি কিনে এনেছে। দড়িটা নতুন।

সবাই ধরাধরি করে নামালাম। নেই।

নির্মলা লণ্ঠনটা ওর মুখের কাছে এনে ধরল। দাঁতের ফাঁক দিয়ে জিভটা বেরিয়ে পড়েছে। যেন লজ্জায় জিভ কাটছে ও।—কাপুরুষতার লজ্জায়, না-খেতে-পাওয়ার লজ্জায়।

মাথার একরাশ জট পাকানো রুক্ষ চুলের মধ্যে উকুনগুলি পর্যন্ত বেঁচে আছে।—ওরাও বাড়ি বদল করবে এবার। পোড়ো-বাড়ি ছেড়ে ভালো বাড়িতে।

সবার আগে, আগে ছিল জল; বিধাতা একলা বসে-বসে যত কেঁদেছিলেন—সেই কান্নার সমুদ্র। তারপর সেই কান্নার মর্ম ছেনে সুশীতল সান্ত্বনার মতো মাটি জন্মালো—সুকোমল, সহিষ্ণু।

সেই মাটি আজ কঠিন, পাষাণ হয়ে গেছে। ওরা মাটিকে বেঁধেছে। পিটছে, বিঁধছে, চাবকাচ্ছে—নিরহঙ্কার, নিরলঙ্কার, নির্বাক মাটি।

ঝুড়ি করে মাটি বিক্রি হয়। এক ঝুড়ি এক পয়সা। মাটির দরে আরও অনেক কিছু—মনুষ্যত্বও।

ট্রাম চলে।

বিধাতার বিদ্যুৎকে ওরা লোহার তার দিয়ে বেঁধেছে—বিনা মেঘের বিদ্যুৎ। যে-বিদ্যুৎ বিধাতার অকারণ অভিসম্পাতের মতো গরিবের খড়ের ঘরেই পড়ে,

যে-বিদ্যুতে সোনাপুকুরের ধারের খেজুর গাছের সারগুলি পুড়ে থাক হয়ে গিয়েছিল—মহান গয়লা সারা বছর ফ্যা-ফ্যা করেছে।

ট্রাম চলে। লোহার লাইনের উপর দিয়ে লোহার চাকা ঘষড়ে-ঘষড়ে—মাটির বুকে এই লোহার ভার। সব লাল লোহু যেন জমে-জমে কালো লোহা হয়ে গেছে।

ডিপো থেকে লাস্ট নাম্বার লিখিয়ে নিয়ে—দুটো ঘণ্টা দিই। ট্রাম চলে। 'টালি' ধরে চেয়ে থাকি। আর ভাবি।

সবাই ওকে খেপাত, বলত—কি সারা দিন-রাত্তির খালি নিজের নাম আওড়াস!

দীনবন্ধু ছাতা-পড়া দাঁতগুলি বার করে বলত—যে বেছে আমার এমন নাম রেখেছে তার খুরে পেন্নাম হই, বাবা। পরের দোরে আর ধন্না দিতে হয় না, নিজেকে নিজেই ডাকি। তোমরাও আমাকে নাম ধরে ডাক, কাজ হবে।

সবাই ওকে ভেংচাত, নাকী সুরে বলত—দীনবন্ধু রে আমার!—নানান দিক থেকে, নানান রকম সুরে।

ও তেমনিই কোদালের মতো দাঁত মেলে বলত—আমি সাড়া দিই না।

সত্যিই। সাড়া দেয় না সে। হয়তো এই দীনবন্ধুর মতোই দাঁত বার করে হাসে। আর—।

দীনবন্ধুর একটি মাত্র ছেলে—সমস্ত জীবনের পুঁজি, মারা পড়ল মোটরের চাকার তলায়।

দীনবন্ধু সারাক্ষণ মরা থেঁতলানো ছেলেটাকে বুকের মধ্যে স্যাপটে রইল, একটু কাঁদলে না পর্যন্ত। অনেকক্ষণ বাদে খালি বললে—আমার ছেলে সারা দিন খাবারের জন্য রাস্তায়-রাস্তায় ভিক্ষে করে ফের আমারই কোলে ফিরে এসেছে। আর ওকে রাস্তায় ভিক্ষে করতে পাঠাব না।

পুতলিকে কাঁদতে দেখে বললে—কাঁদিস কেন? আরে, এ যে দীনবন্ধুরই ছেলে—

ছেলেকে চিতায় শুইয়ে বুড়ো আমাকে বললে—জানিস, আমি সেই মোটরটাকে চিনে রেখেছি। রাস্তায় জল দেবার সময় ঠিক মতো যদি পাই, তো জল ছিটিয়ে বেটাকে নাকাল করে ছাড়ব—

যে গরিব, সে এর চেয়ে আর কি বেশি প্রতিশোধ নেবে? যা বলা উচিত, বলতে পারে না। হয়তো বলা উচিত—আমিও আমার ছেলেরই মতো ঐ মোটরের তলায় বুক পেতে দেব।

তা, প্রতিশোধ তো ও নিলই। পয়সা দিয়ে দড়ি কিনে গলায় বেঁধে।

ঐ পয়সায় যে ওর একবেলা একমুঠি জুটত, সে-কথাটা ও ভুললে কেমন করে?

পুতলি বললে—তখন কত রাত হবে কে জানে? আমার দরজাটার সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল ও, আর বিড়বিড় করে কি বকছিল!

—কি বকছিল?

—কি আবার? নিজের নামটাই বোধ হয়।

ভজুলাল বললে—আমি ওকে ডাকনু পর্যন্ত। ঘুরে বেড়াচ্ছিস কেন রে দীনা? ও খালি বললে—কত রাতেই তো ঘুমুই—

নির্মলা বললে—মাঝ রাতে আমার কপাটে টোকা পড়তেই ধড়মড় করে উঠনু। বললাম—কে? খিলখিল করে হেসে ও বললে—আমি দীনবন্ধু রে, তোর ঘরে শুতে দিবি?—দূর-দূর ঝাড়ু মার মুখে! এক হপ্তার ওপর একটা আধলার মুখ দেখিনি—ছোঃ! টোকা পেয়ে সমস্ত গা এমন করে উঠেছিল ভাই—

ট্রাম চলে, লোহার লাইন দুটো চাকার তলায় পিষে-পিষে—

টিকিটের জন্য হাত পাতলাম।

বন্ধু অবাক হয়ে খানিকক্ষণ মুখের দিকে তাকিয়ে রইল—চিনতে দেরি হচ্ছে। পরে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল—আরে, কাঞ্চন যে! তুমি? এখানে?

—এই, ঘুরতে-ঘুরতে—

—এত ভালো পাশ করে এম-এ পড়তে গেলে না? শেষে এই? এ কি?

বললাম—চাকরি জোটে কই?

—না, তোমার আবার চাকরি জুটত না এ ছাড়া? তুমি পড়তে যাও। আমাদের না হয়—হাতটা ধরে ফেলে বললে—কি হে, লাগবে নাকি টিকিট?

—এই লাইনটা ভারি কড়াকড়ি ভাই। কয়েক স্টপ পরেই ইনস্পেক্টর উঠবে—

ও বুক-পকেটের উপর হাতটা চেপে ধরে বললে—উঠুকই না ইনস্পেক্টর, তখন কেনা যাবে। বুঝলে না, তুমি হলে বন্ধু, সাতটা পয়সা বেঁচে যায় ভাই।

কিন্তু ইনস্পেক্টর উঠলই।

ওর সমস্ত মুখ সহসা যেন ভয় পেয়ে কালিয়ে এল।—সাতটা পয়সার জন্যেই।

তাড়াতাড়ি একটা টিকিট কেটে ওর হাতে দিলাম। ও বললে—পুরোনো টিকিট বুঝি? আমি নম্বরটা আঙুল দিয়ে চেপে রেখেই দেখাব—

বললাম—কোনো দরকার নেই।

নিজের জামার পকেট থেকে সাতটা পয়সা চামড়ার ব্যাগটার মধ্যে রাখলাম।

নেমে যাবার মুখে ও বললে—আপিস যাবার সময় এমনি তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে ভালোই হবে, ভাই। পুরোনো টিকিট দিয়েই এমনি করে পার করে দিও। সাতটা করে পয়সা বাঁচবে—সে কি যে-সে কথা? আসবার সময় তো সেই মাঠ চষেই আসব। তবু সাতটা পয়সা—ইপিকাক থারটি—এক ড্রাম পাঁচ পয়সায়। ছেলেটার জন্য ওষুধ কেনা যাবে। বুঝলে না ভাই—ত্রিশটাকার কেরানী—

মনে-মনে বলি—তবে ট্রাম কণ্ডাক্টারই রইলাম—তোমার সাতটা করে পয়সা বাঁচুক!

একটি মেয়ে উঠল—এমন পাতলা, হাত দিয়ে আলগোছে একটু টেনে তুললে হয়!

ভাবলাম, মেয়েটি কুৎসিত হোক।

কুঁজো হয়ে মুখ গুঁজে বই পড়তে লেগেছে, কোলের উপর এক গাদা বই। বইয়ের ফাঁক থেকে পয়সা বার করে হাতের মধ্যে রেখে দিয়েছে। অল্পতোলা ঘোমটার ভিতর দিয়ে স্বচ্ছ অন্ধকারের মতো কালো চুলের আভাস পাচ্ছি।

দীনবন্ধুর কথা মনে পড়ে। দুই হাতের উপর জট-ওলা উকুনের ঢিপি মাথাটা মেলে রেখে চিত হয়ে শুয়ে থাকত চুপ করে। নিশ্বাস নিচ্ছে—এই যেন ওর পরম সুখ!

মুখ না তুলেই পয়সাগুলি হাতের উপর ফেলে দিল। পয়সাগুলি ভেজা—ঘামে। ফের জামার পকেট থেকে সাতটা পয়সা চামড়ার ব্যাগে রাখলাম। এ কটা থাক।

আশ্চর্য!

ভজুলালকে পুলিশে ধরেছে।

পুতলি বললে—গলায় দড়ি জুটল না রে তোর? আর কিছু না, আস্তাবলে ঢুকে শেষকালে ঘোড়ার গাড়ির চাকার রবার চুরি করলি? •

ভজুলাল বললে—আমি কি দীনবন্ধুর মতো বোকা যে, গলায় দড়ি দিতে যাব?

মাজায় একটা দড়ি বাঁধা—পুলিশের হাতে। কিন্তু মুখে লজ্জার কালিমা নেই—এতটুকুও নয়। বরং চোখ দুটো যেন খুশিতে ফুলে উঠেছে।

পুলিশকে বললাম—মিছিমিছি কেন হাঙ্গামা করছ বাপু? কত চাও?

ভজুলাল বাধা দিয়ে বললে—তুই খেপেছিস কণ্ডাক্টার? নিক না ধরে। বেশ মাগনা খেতে পাওয়া যাবে জেলে!

—কেন, এখানেও তো খাওয়া যেত গতর খাটিয়ে। এত বড় দেহটা—দুটো কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিলাম।

ও বললে—ঘুণ ধরেছে দেহে। দেখলি তো দীনবন্ধুকে।

—ছাড়া পেলে ফের কি করবি ?

পোকা-কাটা দাঁত বার করে বললে—তখন দেখা যাবে। তখন হয়তো ধরা পড়ব না।

সত্যিই তো—ছট্টুলালের কি দোষ ? ও বললে—আমি সেই কখন থেকেই ঘণ্টি দিচ্ছি—

দোষ ছাগলটারই—ঘুমোবার আর জায়গা পায়নি ! একেবারে লোহার লাইনে মাথা রেখে ! পাঁঠা তো নয়, বাদশাজাদা।

ট্রামটা দাঁড়িয়ে পড়ল। অকারণেই। এ তো দীনবন্ধুর ছেলেও নয়।

একটি বাবু বললে—চালাও না। বেলা হয়ে যাবে আপিসের।

আরেকজন বললে—ভারি তো—

বইর পাঁজা নিয়ে মেয়েটি নেমে গেছে। হয়তো ওরও কলেজের দেরি হয়ে যাচ্ছিল। না-ও হতে পারে। হয়তো এই করুণ দৃশ্য ও ওর ঐ দুটি করুণ চোখ মেলে দেখতে পারে না। ওর চোখের জল বুঝি টলটল করে উঠেছে। তাই।

ঝুপঝুপিয়ে এক দমক বৃষ্টি হয়ে গেল। যেন যেতে-যেতে পথের মাঝে মেঘ তার ব্যথার ঘড়াটা উপুড় উজাড় করে ঢেলে দিলে।

কলাপাতা করে রাঁধা-মাছ হাতে নিয়ে পুতলি এসে বললে—মাছ-পাতুরি করন্থ তোর জন্যে। কিরে, রাঁধিসনি আজ ?

বললাম—গায়ে কাপড় টেনে দে পুতলি, জ্বর হবে।

— নে, কি খাবি আজ ?

—উপোস করব।

—কেন ?

এ-কথার কি উত্তর দেওয়া যায় ? বলা যেতে পারে—খিদে নেই, পেটটা ভার। দাদাবাবু কেন উপোস করেছিল ?

গায়ে চারখানার চাদরটা জড়িয়ে নিলাম।

পুতলি বললে—কোথা চললি ? খেয়ে যা।

ঘাসের উপর কে যেন বসে-বসে কেঁদে গেছে ; ভেজা। আমাদের ন্যাড়া বেলগাছটা বাউলের মতো ওর কাহিল কাতর ডালগুলি উঁচিয়ে রয়েছে। যেন গান গাইছে—তাইরে নাইরে নাইরে না।

তাই। নাই, নাই—সে নাই।

মনে হয়, আকাশ তার ললাটে নীলের স্বচ্ছ স্বল্প একটুখানি অবগুণ্ঠন তুলে ধরে কত রহস্যময়! গৈরিক বৈরাগী পৃথিবী শ্যামলিমার স্নেহাঞ্চলখানি দেহের উপর গুটিয়ে টেনে কত মহিমাপরিপূর্ণ! জ্যোতির অবগুণ্ঠন টেনে রাত্রির নক্ষত্র আর মধ্যাহ্নের মার্তণ্ড কত দূর, ধরা-ছোঁয়ার কত বাইরে, কি অনির্বচনীয়! জমিদার-বাড়ির আলিশান গম্বুজটার কিনারে শুক্ল প্রতিপদের তন্বী পাণ্ডু ইন্দুলেখার অবগুণ্ঠনের তলায় কি সুদূর ইশারা!

—প্যাঁটরা খুলছিস যে? পুতলি বললে।

—বাজারে যাব।

—এই রাতে! কেন রে?

আকাশে একটি তারার মণিকা ফুটে উঠেছে। রাস্তায়-রাস্তায় ঢুঁড়তে ভালো লাগে—রাস্তারও একটা সুগোপন রহস্য আছে যেন। ও-ও কথা কয় না, বুক পেতে পড়ে চেয়ে থাকে।

উৎসুক কণ্ঠে পুতলি বললে—বগলের তলায় কী এই পুঁটলিটা, কি আনলি?

—তোরই জন্য।

পুতলি তাড়াতাড়ি খুলে ফেললে মোড়কটা। দেখে একেবারে অবাক, স্তম্ভিত হয়ে গেছে! শেমিজ শাড়ি জ্যাকেট—পুতলি বিস্ময়ে চক্ষু ডাগর করে চেয়ে বললে—আমার?

—হ্যাঁ, তোর। পর এগুলো।

—কেন দিলি ভাই এ-সব?

যদি বলি: এগুলো তোর নতুন জন্মদিনের উপহার—ও তার অর্থ বুঝবে না। বললাম—অমনি। তোর ভালো কাপড় নেই একটাও। গায়ে জামা না থাকলে কখন ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করবে—

চমৎকার মানিয়েছে কিন্তু। আবরণের বিচিত্র বর্ণ ওকে অবর্ণনীয় করেছে। বললাম—মাথায় একটুখানি ঘোমটা টেনে দে। কপালটা একটুখানি শুধু ছোঁবে।

সত্যিই। অবগুণ্ঠনের নিচে ওর দুটি কালো চোখ সত্যিই অপার রহস্যে ভরে উঠেছে। ও হাসল—ঐ হাসির স্থূল ব্যাখ্যা যেন কিছু নেই। ঐ দূর তারকার হাসির মানে যা, যেন তাই।

ও বললে—এবার গাবের আঠায় কালো-করা গন্ধ-ওলা জালটা কাঁধে নিয়ে ডোবায় যাই, বাজারে যাই মাছ বেচতে?

বললাম—আজ তো আর রাঁধিনি। কি দিয়ে খাব তোর মাছ-পাতুরি! শুধু-শুধু?
পুতলি খুশি হয়ে বললে—খাবি? কেন, আমার ভাত তোকে বেড়ে দিচ্ছি। আমি না হয় পরে দুটো ফুটিয়ে নেব।
পিতলের থালায় ও পরিপাটি করে ভাত গুছিয়ে জায়গাটা নিকিয়ে আসন পাতলে। ওর হাতে গড়ানো জল ও থালের ধারে নুনের ছোট স্তূপটি পর্যন্ত মিষ্টি লাগছে আজ। বললে—খা। লজ্জা করিসনে, পেট ভরেই খা। দেব আরো এনে মাছ-পাতুরি?
ওর এই সেবা পেয়ে খিদে যেন বেড়ে গেছে। বললাম—দে। কিন্তু তোর জন্য যে আর রইল না।
সবটা আমার পাতে ঢেলে দিয়ে আনন্দে বললে—না থাক। তুই-ই খা। আমিই না হয় উপোস করলাম।
খাওয়া হয়ে গেলে ঘটি করে জল ভরে দিলে আঁচাবার জন্যে। বিছানাটা টান করে পাতলে, বালিশের কোণের ছারপোকাগুলো দুটি আঙুল দিয়ে ধরে মেঝেয় ফেলে পায়ের আঙুল দিয়ে টিপে-টিপে মারলে।
বললে—শো। ঘুমো। এই জানলাটা বন্ধ করে দি, ঠাণ্ডা লাগবে।
শুলাম। ও ওর ছেঁড়া মশারিটা তুলে এনে আমার বিছানার উপর কোনো রকমে খাটিয়ে দিলে। ছেঁড়া জায়গাটার উপর একটা কাপড় মেলে দিলে। পাখা করে-করে মশা তাড়িয়ে মশারি ফেলে ধারগুলো বিছানার চারপাশে গুঁজে দিলে পর্যন্ত।
আবার বললে—চুপটি করে ঘুমো।
চলে গেল।
একটি কথা কইলাম না। একটি আঙুল ছুঁলাম না। বাইরে রেখে, ওকে কত সামনে মনে হচ্ছে। ওর দেহের এই বিস্তীর্ণ অবগুণ্ঠনের অন্তরালে যেন বিদেশিনী বিদেহিনী প্রিয়াকে আবিষ্কার করছি।
মশারিটা তুলে আস্তে-আস্তে বেরিয়ে এলুম। পুতলি সেই সব জামা কাপড় সুদ্ধুই পাটির উপর শুয়ে ঘুমিয়ে আছে—না খেয়েই!
বাইরে এসে পড়েছি, সন্ন্যাসী-বেলগাছটার তলায়। একাকিনী তারার মণিকাটি এখনো জ্বলছে, ডোবেনি। খালি বলতে ইচ্ছে করছে ওকে—তুমি দূর বটে, কিন্তু পর নও।

একাকিনী নয়।

পিতলের হাতলটা জোরে চেপে ধরে সমস্ত শরীরটায় একটা ঘূর্ণি দিয়ে চলন্ত ট্রামটায় কে উঠল—বাঙালী সাহেব। চোখে প্যাঁশনে।

মাটির বাতির স্তিমিত শিখার মতো ম্লানাভ কার আর একটি দেহেও সহসা তরঙ্গ জেগে উঠল যেন, হিল্লোল। একটা ঠাসা তুবড়ি যেন ফেটে গেল, বা একটা ডাঁশা ডালিম!

—তুমি অরুণ, আরে! কলম্বো থেকে ডিরেক্ট, না ম্যাড্রাস হয়ে?

মেয়েটি লেলিহান দীপশিখার মতো ওর দেহ দীর্ঘায়ত করে দাঁড়িয়ে পড়ল।

—তুমি মুক্তা, সারপ্রাইজ! চমৎকার!

আমাকে ঘণ্টা দিতে ইশারা করে। গাড়িটা দাঁড়ায়।

ওরা হাত ধরাধরি করে নেমে যায় তারপর। তক্ষুণি ট্যাক্সি ডেকে লাফিয়ে ওঠে। দেখি। আবার ঘণ্টা দিই—দুটো। ট্রাম চলে।

পথিক মেঘ আসে—অভিসারিক। সন্ধ্যাতারাকে শুধু আড়াল করে রাখে না, ডুবিয়ে ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

অবগুণ্ঠনেরই নিচে।

পুতলি ওর জামার গলাটা দেখিয়ে বললে—ছিঁড়ে যাচ্ছে।

বললাম—ছিঁড়ুক। টেনে-টেনে ছিঁড়ে ফ্যাল। কাপড়টাও। আর কেন?

—আমাকে আর একটা কিনে দিতে হবে কিন্তু, গোলাপী দেখে—

—দোকানীরা সব আমার স্মুন্দি কিনা—

দান যেমন অযাচিত, প্রত্যাখ্যানও। ও খালি বলতে পারল—বোঁচকা বাঁধছিস যে?

—চললাম কাঁধে ফেলে।

—এই রাতে? কোথায়?

—তা কে জানে?

ও আমার হাত ধরে বললে—পাগলামো করিসনে। থাম।

হাত ছাড়িয়ে নিলাম ওকে আঘাত দিয়েই। ফের বললে—কেন যাচ্ছিস?

—ছোঃ! এই ঘিনঘিনে মশারির তলায় কারু ঘুম হয়—এই এঁদো খোলার ঘরে? পিতলের থালায় খেয়ে-খেয়ে আমার পিলে হয়েছে। তারপর ঢেপসি ঘুটঘুট্টি কালো একটা মেয়েমানুষ, সারা দিনরাত কানের কাছে ব্যাঙের মতো ঘ্যাঙর-ঘ্যাঙ করছে, জামার জন্যে বায়না, কোনোদিন বা জুতোর জন্যেই হবে—কে আর তিষ্ঠোয় হেতা?

—কিন্তু চাকরি?

—তোর ভাতারের জন্যে খালি রেখে যাচ্ছি—দেখা হলে বলিস। নে, ছাড় দরজা।

দরজা ছেড়ে দেয়। পিছন থেকে একবার শুধু বলে—একটা কথা শুনে যা—মাথা খাস, পায়ে পড়ি তোর—

কে কথা শোনে ? বোঁচকাটা পিঠের উপর ভালো করে ফেলি খালি।

পথ চলি।

অন্ধকার যেন ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে—

মোটর সুরথ সিং-এর। চালাই আমি।

অবগুণ্ঠন শুধু উন্মোচন নয়, ছিন্ন করব, টুকরো-টুকরো করে। মনে এই সাধ জাগে। যেমন দীনবন্ধু অবগুণ্ঠন ছিন্ন করেছিল—

মোটর তো নয়, বাদ্যযন্ত্র একটা। নিজে তো বাজেই, আমাকেও বাজায়। বা, ও যেন ময়দানবের বুড়ো বয়সের ছোট্ট ছেলে—দামাল।

ইচ্ছে করে কোনো দুর্দান্ত বিপক্ষের সঙ্গে ধাক্কা লেগে এই বাদ্যযন্ত্র চুরমার হয়ে যাক, সঙ্গে-সঙ্গে ওর কাপালিক কালোয়াৎ-ও। কিন্তু কেউই সামনে আসে না, আমিও এগোই না হয়তো।

খালি পাশ কাটিয়ে চলা—খালি ঔদাসীন্য !

বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। বললে—চাকরিটা কেন ছাড়লে ভাই ?

বললাম—আস্তে চলে বলে, থেমে-থেমে।

—কি করবে এখন ?

—রেল ইস্টিশানে গিয়ে বস্তার নিচে পিঠে দেব।

ও ঝাপসা চোখ ছোট করে বললে—ঝগড়া করে ছাড়লে বুঝি ? যেমন আমারটা গেল।

—গেছে ?

ঘাড় কাত করে আস্তে বললে—গেছে। ছেলেটা মরন্ত, তবু ছুটি দেবে না, দুঘণ্টাও না—ছেলেটার দাম যেন তিরিশ টাকারও কম।

পরে থেমে ঢোক গিলে বললে—হয়তো তাই। ছেলেটাও গেছে।

শুধু অন্ধকার নয়, দিনের রৌদ্রও কাঁদে, তেমনি ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে।

পরের দিনও দেখা হল। রাস্তায় দাঁড়িয়ে নয়, সঙ্গে মোটর ছিল সেদিন।

—এই করছ বল, তা বেশ।

—চড়বে ?

চড়ল। বললে—এ-চড়ায় আর কি ? শুধু-শুধু—

—তোমার কাজ তো কিছু নেই। মন্দ কি, হাওয়া খেয়ে নাও একটু ! হাওয়াও তো পেট ভরে খেতে পায় না সবাই।

হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসতে যেন ওর সঙ্কোচ হচ্ছে। এক কোণে একটুখানি জায়গা নিয়ে ও বললে—আপিস থাকলে না হয় বলতাম পৌঁছে দিয়ে আসতে। সাতটা পয়সা বাঁচত।

পরে ব্যর্থ পরিহাসের চেষ্টায় ফিকে লজ্জিত হাসি হেসে বললে—ছেলে আবার হবে, কিন্তু চাকরি কবে হবে তা যমও জানে না।

পাটের কারখানায় আগুন লাগে, খোলার বস্তিতে লাগে বসন্ত। সাবাড়, উজাড় হয়ে যায়। ভাঙা থুথ্‌ড়ো বাড়ি হঠাৎ একদিন বেচারী পথচারীদের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। পাগলা ঘোড়া গাড়ি উলটে দেয়। ছাতের উপর গায়ে কেরোসিন লাগিয়ে অবোলা বৌ ছটফট করে চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে মরে। রাস্তার উপরে গরু জবাই হয়, আর দেবীর দুয়ারে পাঁঠা ! কসাইর ছুরি চক্‌চক করে।

একটা অনন্ত দীর্ঘশ্বাসের মতো মোটর চলে—একটা অফুরন্ত হাউই।

বেটি আর একটু হলেই মোটরের তলায় পড়ে গিয়েছিল আর কি ; ব্রেক টিপে ধরি। রাস্তা যেন বেটির ফুল-বাগিচা ; হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে রাস্তা পার হচ্ছে ! ধমক দিয়ে উঠলাম। ও তক্ষুণিই অভ্যেস মতো হাত মেলে ভিক্ষা চেয়ে বসল। খানিকক্ষণ মুখের দিকে চেয়ে থেকে উঁচু মাড়িগুলি খুলে বললে—তুই যে রে—

বললাম—তুই আজকাল ভিক্ষে করছিস নাকি ? তোর চোখের পাতায় কিসের ঘা ও ? একি, গলায়, হাতে, বুকে—সবখানে ? কী এ-সব ?

—তাইতেই তো ভিক্ষে করছি। এ-ঘা নিয়ে তো আর রাস্তায় বেরুনো যায় না, ঢাকাও যায় না কিছুতে।

—হাসপাতালে যাসনি কেন ?

—নিলে না। ভরতি।

—চল দেখি তো আমার সঙ্গে, কেমন নেয় না।—দরজা খুলে দিলাম।

বন্ধুকে বললাম—তবু ওর নাম ছিল নির্মলা !

বন্ধু বললে—এখনো আছে।

ওকে বললে—বোস। আমার পাশেই !

মোটর চলতে থাকে।

বললাম—পুতলি কি করছে রে নির্মলা ?

—সেবারে বসন্ত হয়েছিল, বাঁ চোখটা কানা হয়ে গেছে।

—আর ? মুখটা পাঁচিয়ে যায়নি ?

—গলি-বদল করবার সময় কাদি ওর ফালতু বেটপকা ছেলেটা ওকে দিয়ে গেছে। সেটা পালছে।

—আর কিছু নয় ?

—আর আবার কি ? বাজারে তেমনি মাছ বেচে, চালের আড়তে ধান ঝাড়ে।

—ভজুলাল ফিরেছে জেল থেকে ?

—হ্যাঁ, সে তো কবে। আবার যে জেলে গেছে জানিস না বুঝি !

—এবার কী চুরি করেছিল ?

নির্মলা তেমনি মাড়ি বার করে বললে—মেয়েমানুষ।

অগোচরে গ্রহে-গ্রহে সঙ্ঘর্ষ লাগে, ধূমকেতু তার পুচ্ছ ছোঁয়ায় ! বাসুকি ঠাট্টা করে গা-মোড়া দিলে লজ্জিতা মাটি হয়রান হয়ে ওঠে। শাদা মানুষ আর কালো মানুষ পরস্পরের টুঁটি আঁকড়ে কামড়া-কামড়ি করে, শেষকালে দুজনের লাল রক্তে-রক্তে কোলাকুলি হয়। রাজা সমস্ত দেশে আগুন লাগিয়ে হাততালি দিয়ে নাচে, মা শহরের গলিতে আঁচলের তলায় নিয়ে মেয়ে ফিরি করে বেড়ায়। সাহারা হাহাকার করে—মোড়লের সবুজ খেতের উপর দিয়ে গর্জমানা ভৈরবী নদী তার গাত্রবাস উড়িয়ে নিয়ে চলে গিয়েছিল। তারপর—

সুরথ সিং পাশে বসে বললে—এবার ডিপোয়। তাই যাচ্ছিলাম। কে একটা লোক এসে বললে—হাওড়ায় যেতে হবে। সামনেই সোয়ারি—দু-পা।

—এই কিরায়াটা নিই। শেষ।

আরও দুটো ট্যাক্সি এসে জমেছে। তাতে মালপত্র বিছানা বাক্স। আমারটাতেই ওরা উঠল।

দুয়ারের পাশে পুরনারীরা শঙ্খ বাজাচ্ছে, ওদের কপালে চন্দন লেপে দিচ্ছে, আশীর্বাদ করছে। আঁচলের গেরোটা ভালো করে এঁটে বেঁধে দিচ্ছে। একটি মেয়ে বললে—রাস্তায় খুলে ফেলবে জানি, শুধু কাপড়ের গেরোটা। মনেরটা—

মোটরের চিৎকারে বাকিটা শোনা যায় না। মেয়েটির কণ্ঠস্বর কেন জানি কানে ভারি করুণ লাগে।

মুক্তার কলরব মোটরের আর্তনাদকে লজ্জা দিচ্ছে। মোটরটা থামিয়ে কান পেতে শুনতে ইচ্ছা করে।

মুক্তা খালি বলছে—ছুটি, ছুটি, আকাশে আজ ছুটির ঘণ্টা বাজল।

অরুণ বলছে—পাশে তুমি, পকেটে টাকা। গোঁফটা নেই, থাকলে তা দিতাম।

অরুণ যেন শৌখিন দখিন হাওয়া, আর মুক্তা যেন চাঁপার পেয়ালা।

ইস্টিশানে পৌঁছে সুরথ সিংকে বললাম—বোস একটু, এই আসছি, এলাম বলে।—মোটর থেকে লাফিয়ে পড়লাম।

সুরথ সিং সেদিন মোটরটা নিয়ে একলাই ডিপোয় ফিরেছে। আমার জন্যে কতক্ষণ অপেক্ষা করেছিল, কে জানে?

ট্রেন চলে।

ভীষণ ভিড়। দরজার ধারে খালি দাঁড়াতে পাই একটু। মুখ বাড়িয়ে চেয়ে থাকি বাইরে—অন্ধকার দেখি। দূরে চাষার ঘরে মাটির বাতি জ্বলে, বাঁশের বনে ঝিঁঝিঁ ডাকে, জোনাকিরা হলদে পলকা পাখা মেলে নেচে-নেচে নিবে যায়।

কোথায় চলেছি জানি না। সারা দিনের রোজগার সুরথ সিং-এর পাওনা অনেকগুলি টাকা পকেটে আছে। যতদূর নিয়ে যেতে পারে—

একটা ইস্টিশানে সেই চাকরটার সঙ্গে ভাব করলাম। ওর নাম, সুন্দর। বললাম—কোথায় যাচ্ছ তোমরা?

—সে অনেক দূরে। পাঞ্জাবে। তুমি কোথায়?

—সেইখানেই।

এবার খোঁজ নিলাম। ওরা যেখানে যাবে ততদূর আমার টাকা টানবে না। তার সাতাশ মাইল এদিকে নেমে হাঁ করে বাতাস খেতে হবে। যাক গে, তাই সই।

নখ দিয়ে মাটি আঁচড়ালে নখ ভিজে ওঠে না—বাঙলার মাটির মতো সান্ত্বনায় ভেজা, নরম নয়—রুক্ষ, তামাটে। গায়ে সবুজ নয়, গেরুয়া।

সুদূরপ্রসারিত মাঠের মধ্যে একা চুপ করে বসে আছি।

দূরে রেল-ইস্টিশানের ভাঙাচোরা কোলাহল আকাশের তন্দ্রালুতায় ব্যাঘাত করছে। ওরা আমাকে সাতাশ মাইল পিছনে ফেলে গেল।

পকেটে কানাকড়িও নেই। দাদাবাবু আর চিঠি লেখেনি, বহুদিন। কোথায় ভেসে গেছে—কিছুই জানি না।

দাঁড়াই। তারপর পা ফেলে-ফেলে চলি, রেল-লাইন ধরে, সামনে খাল পড়লে সাঁতরে পার হয়ে যাই।

মুহূর্তের শোভাযাত্রা চলেছে, ঋতুর মিছিল, তৃণের অভিযান, তারার নৃত্য, প্রাণবুদবুদের স্রোত। আমি চলতে চাই, আমার বুকে অগাধের সাধ জেগেছে—অবাধ। পা যখনই তুমড়ে পড়তে চায়, তখন দৌড়ে চলতে চেষ্টা করি। পরিশ্রান্ত হয়ে যেতে ইচ্ছা করে।

কার সন্ধানে চলেছি। নীল পাখির, নীল ফুলের, নীল আকাশের।

পৌঁছনো গেল। কিন্তু পয়সা নেই। জীবনে সব চেয়ে প্রকাণ্ড 'নেই'। কিম্বা হয়তো সব চেয়ে প্রকাণ্ড 'থাকা', এই অসীম ক্ষুধা, এই রিক্ত নগ্ন উদার দারিদ্র্য—অসহায় নিদারুণ মৃত্যু!

সত্যিসত্যিই বস্তা বইব। এক বাবুকে বললাম—কেন মিছিমিছি গাড়ি করছেন? মাইল দুয়েকের মধ্যে বাড়ি হয় তো বলুন, কাঁধে করে নিয়ে যাই। সঙ্গে তো জেনানা নেই—এটুকু হাঁটতে আপনার কষ্ট হওয়া উচিত নয়। ভদ্রলোক মুখের দিকে চেয়ে খুশি হয়ে বললেন—বেশ তো, পারবে বইতে এত সব?

—বহুৎ খুব। দিন এটা কাঁধের ওপর দিয়ে গলিয়ে। ব্যস। চলুন—

ঘাম মুছে রাস্তায় বেরোতেই সুন্দরের সঙ্গে দেখা।

—বাকি পথটা পাওদলেই এলাম। কিন্তু ভাই, একটাও আধলা নেই। মোট বয়ে মোটে এই দুটো আনি পাওয়া গেল—ঢের। একটা কোথাও কাজ-টাজের সুবিধে হতে পারে, জানো?

—আরে! আমি যে লোকের খোঁজেই বেরিয়েছি। মাঠ সাফ করতে পারবে—গাছ-গাছাড়ি কেটে? বাবুরা টেনিস খেলবেন।

—নিশ্চয় পারব। পুকুর কাটতে বল, গাছ ফাড়তে বল—সব।

—লঙ্কা ডিঙোতে?

—তাও।

সন্ধ্যাসন্ধিতে টেনিস-কোর্ট তৈরি হয়ে গেল। অরুণই সব তদারক করলে।

মুক্তার সারা দেহে ফুর্তি যেন আর ধরে না, সাগরের মতো অতল, ডাগর চোখের কোণ বেয়ে উপচে-উপচে পড়ে। নতুন দেশের আবহাওয়ায় ওর গালে এত সকালেই লাল ফুটেছে।

ও যেন একটি গীতিকবিতা, ভাটার টানের ভাটিয়াল সুর। ও যেন মধ্যদিনের অলস তপ্ত শ্রান্তিকর দুপহরে ভ্রমরের চপল অস্ফুট গুনগুনানি।

আমি আর সুন্দর দুদিক থেকে বল কুড়োই।

মুক্তা পারে না, আর হাসে। বলে—তুমি খালি-খালি প্রত্যেকবার জিতবে, এ হবে না। 'নভিস'-এর সঙ্গে খেলে আমিও জিততে পারি।

অরুণ ইচ্ছে করে এদিকে-ওদিকে ভুল করে মারে তারপর।

একটা বল আচমকা এসে মুক্তার কপালের উপর লাগল। মুক্তা কপালে হাত চেপে উহু করে, আর খিল-খিল করে হাসে—লুটিয়ে-লুটিয়ে। তারপর হাঁপায়।

খেলা সাঙ্গ হয়। সুন্দর পর্দা আর নেট গুছোয়। ওরা পাশাপাশি র‍্যাকেট দুলিয়ে-দুলিয়ে বেড়ায় মাঠে-মাঠে। আমি ফিরে যাই, ইস্টিশানের কাছে কুলির বস্তিতে।

মুহূর্তের ঠেলায় কতদূরে এসে ঠেকেছি। ইচ্ছে হল, ফিরে যাব। নীল আকাশ খালি পঞ্চনদীর তীরেই নয়, যেখানে দাঁড়াই, সেখানেই, মাথার উপর। আঁঠা দিয়ে অসীমের অবগুণ্ঠন চারদিক থেকে আটকানো। তাকে তোলা যায় না, খোলা যায় না, ভোলাও যায় না যে—

এ কার বেগার খাটছি? ঘাড়ে ব্যথা ধরেছে। চাইছি আহ্লাদির সেই বালিশটা, কোনো মা'র সুকোমল একখানি কোল।

ভোঁতা ভুটিয়া কুলি-মেয়েটা বে-আক্কেল, ওর মধ্যে একটুও ভান নেই। তাই ভালো লাগে না।

সুন্দরের সঙ্গে দেখা করে যাব। ওর টালির ঘরে বসে তামাক টানছে।

—কি হে, টেনিস-কোর্টে যে আবার চোরকাঁটা গজিয়েছে। দেব নাকি সাফ করে?

—দরকার নেই। বাবুরা খেলে না আর।

—কেন?

—বাবু আজ দিন দশেক হল দিল্লি যাবার নাম করে যে বেরিয়েছেন, আর পাত্তা নেই। গিন্নীমা যে একলাটি আছেন, সেদিকে হুঁসই নেই যেন। খালি একটা খোট্টা-ঝি।

আমার হাতে হুঁকোটা চালান করে গলার স্বর নামিয়ে বললে তারপর—এমন পরীর মতো বৌ ছেড়ে ফুরফুরির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে কিনা—

—বাবু কি করে রে?

—কোথায় নাকি খনি পেয়েছে আভের, তাইতেই দেদার পয়সা। বেবাক ঢালল বলে—

—যা-তা কি বলছিস, সুন্দর ? যাক, আমি কালই চলে যাচ্ছি এখান থেকে।

—কেন ? কোথায় ?

হেসে বলি—দিল্লিতেই।

ও মুখ ভার করে বলে—আমারও টিকছে না মন। বিষম দায়।

—যাই, গিন্নীমা'র পায়ের ধূলো নিয়ে আসি।

সুন্দর অবাক হয়ে মুখের দিকে তাকায়। কিছু বলবার আগেই পা ফেলি ঘরের দিকে—

দূর থেকে মুক্তাকে দেখা যাচ্ছে, হেমন্তের ধূসর উদাস সন্ধ্যার মতো। জানলার কাছে বসে ফ্যাকাশে আলোয় বই পড়ছে। তাই ওকে বেশি নিঃসঙ্গ, বেশি বিষণ্ণ মনে হচ্ছে। আর কিছু নয়, দূরে একটা চেয়ারে বসব শুধু, তারপর সাহিত্য, দেশ, ধর্ম, রাজনীতি—এই নিয়ে তর্ক আর আলোচনা। ভিক্টর হিউগো, বায়রন, ডষ্টয়ভস্কি থেকে যতদূর খুশি—এ-ই ইয়েটস পর্যন্ত। প্রতিভার দীপ্তিতে দুজনের চক্ষু উজ্জ্বল, নতুন-নতুন অসাধারণ তথ্য আবিষ্কারে দুজনের বুক উৎফুল্ল। মন কি রকম জোয়ান হয়ে ওঠে! বিজ্ঞানের বিদ্রোহ, সঙ্গীতের সুর—যা ওর ভালো লাগে।

কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলাম। পায়ের শব্দ শুনে সচকিতে সতর্ক প্রশ্ন এল—কে ?

—আমি।

যেন কত পরমাত্মীয়! শুধু ঐটুকুতেই সবটুকু পরিচয়।

—কে তুমি ? কি চাও এখানে ?

—সুন্দরকে খুঁজতে এসেছিলাম।

—তার মানে ? সুন্দর কি দোতলায়—এই বাড়িতে থাকে নাকি ? কে তুমি ? যাও বেরিয়ে! এই সুন্দর!

চলে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ কি ভেবে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে পিছু থেকে ডাকলে—শোনো। তুমি—আপনি—আপনি কি অসিতার দাদা ? যে আমাদের সঙ্গে পড়ত ? কেমন চেনা-চেনা লাগছে। না, না, তুমি আমার সেই ছেলেবেলাকার মণ্টু দা, নয় কি ? হ্যাঁ, তুমি এখানে কি করে এলে, কবে ? বোস—তোমার কথা—

বাধা দিয়ে বলি—না, আমি কেউ নই।

ক্ষার ভুলমু ভাঙে। চেঁচিয়ে বলে—কে তবে তুমি ?

—আমি পিয়াদা, মুসাফির। বাঙালীই বটে। ভাগ্যের সঙ্গে কুস্তি করতে-করতে এখানে এসে ঠিকরে পড়েছি।

বইটা মুড়ে রেখে বলে—সুন্দরের কাছে কেন এসেছিলে?

—যদি একটা কাজ-টাজ যোগাড় করে দিতে পারে। বিরানা মানুষ।

—এতদিন কি করতে?

—পিঠ পেতে বস্তা বইতাম, না পেলে টহল করি, আর কি। নিজে তো উপোসীই, পকেট দুটোও হাঁ করে আছে। পয়সা না পাই তো হেঁটেই পাড়ি দেব বাঙলাদেশ।

—সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বুকটা ফুলিয়ে কথা কই।

মুক্তা ওর মোহে-মাখা দুটি চোখ কমনীয় করে বলে—সত্যি যদি মণ্টুদা হও তো বল। তোমাকে যে আমার ভারি চেনা লাগছে। ঘুড়ি ওড়াতে ছাত থেকে পড়ে গেছলে তুমি, সেই রাতটা কত কেঁদেছিলাম! এতদিন হয়ে গেল, তবু—

—না, না, কেউ নই আমি। আমি ইস্টিশানের কুলি একটা।

নেমে যাই সিঁড়ি বেয়ে। ও জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলে—আমাদের শিগগিরই একটা শাম্পানি আসবে, আর দুটো গরু। তুমি হাঁকাতে পারবে?

—হ্যাঁ।

—খানায় ফেলে দেবে না?

—না।

—তবে থেকে যাও। পায়ে হেঁটে বাঙলাদেশে গিয়ে কাজ নেই।

—আচ্ছা, নমস্কার।—হাত জোড় করে কপালে ঠেকালাম।

ও ওর তর্জনীটি হেলিয়ে বললে হেসে—তুমি মণ্টুদাই। নিশ্চয়।

শাম্পানি এল, দুটো বয়েলও এল, আমিই লাগাম লাগালুম।

ল্যাজ তুলে জাঁদরেল গরু দুটো বেতোয়াক্কা হয়ে ছোটে। মুক্তা আবার ওদের গলায় ঘণ্টা বেঁধে দিয়েছে, দেহাতি বালির রাস্তা ধুলোয়-ধুলোয় ধু-ধু করে।

কাঠুরিয়ারা কাঠ কাটে, কুয়ো থেকে গেঁয়ো মেয়েরা ঘড়ায় করে জল তুলে কাঁকালে করে বয়।

মুক্তা সেই অকারণ ভুলের ভেলা ফেলে দিয়েছে। আমাকে বইলম্যান বলেই চিনেছে, এর বেশি কিছু নয়।

ভোরবেলা শিশির না শুকোতেই গাড়ি জুততে বলে, ওর নিজের চোখের পাতায় তখনো ঘুমের শিশির ঢোলে, হয়তো বা অনিদ্রার কুয়াশা।

আকাশে ফিনফিনে পাতলা মেঘ পায়চারি করে বেড়ায়।

কোনো কথা কয় না। খালি গরুর গলার ঘণ্টা বাজে—ভোরের উদাস, বিভোর ভৈরবীর মতো। আমার মাঝে কি যেন আবিষ্কার করবার আশায় মাঝে-মাঝে অতল অপলক চোখে খানিক তাকায়। ঘনশ্যাম নিবিড় বনানীর চাহনি।

এক-একদিন বলে—তোমার দেশের গল্প বল, পদ্মার।

গল্পটা জোড়াতালি দিয়ে শেষ করি। সে কি বিপুল বন্যা, কি উত্তাল ফেনিল জলস্রোত, ভালোবাসার মতো। খেত-খামার, গোলা-আড়ত, সব ভেসে গেল ; চোখ মুখ বুক—জীবন মরণ ইহকাল পরকাল।

ওর চোখ দুটি একটু কাঁপে।

বলে—কেন দেশ ছাড়লে? কোন দুঃখে?

—আকাশকে আড়াল করবার জন্য যে-দুঃখে মানুষ ঘর বাঁধে, সেই সমান দুঃখেই পথ নিয়েছি!

গাড়িটা ফেরে। চঞ্চল পাখির অস্ফুট কূজনের সঙ্গে তাল রেখে মৃদু-মৃদু ঘণ্টা বাজে।

মুক্তা আবার প্রশ্ন করে—কে তোমার আছে?

—দুটো পা, আর পথ, পৃথিবী। আর হাত ধরে-ধরে চলেছে আমার সহোদর ভাই—মৃত্যু।

আবার ভুল করে। কাঁপা, কুণ্ঠিত গলায় বলে—তুমি কে?

মনে-মনে বলি, হয়তো তোমার ছেলেবেলাকার মণ্টুদাই। আমি নিজেকেই হয়তো ভুলে গেছি, চিনতে পারছি না।

সন্ধ্যাবেলায় অরুণ হাঁকে—গাড়ি হাঁকাও জলদি। পৌনে-আটটার মধ্যে পৌঁছে দিতে পারলে বকশিশ একটাকা।—বলে একটাকা ওয়েস্ট-কোটের পকেট থেকে বার করে ছুঁড়ে দিলে আমার দিকে। টাকাটা গড়িয়ে পড়ে গেল পথে। কুড়িয়ে নিতে কেয়ার করি না। যেন একটা মুসাফির ভিক্ষুক ঐ টাকাটা পায়—গরুর গলার ঘণ্টা যেন এই কথাই বলতে-বলতে চলে। সাহেবি ক্লাবের সমুখে গাড়ি দাঁড়ায়!

অরুণ নেমে বলে—বারোটার সময় নিয়ে এস গাড়ি।

বারোটার সময় গাড়ি নিয়ে যাই। কোনো-কোনো দিন ভোরবেলাতেই বাবুর বারোটা বাজে।

সুন্দরকে বললাম—আজ তোমার পালা, ভাই।

সুন্দর গাড়ির মধ্যে বিছানা পেতে পা ছড়িয়ে বসে গরুর ল্যাজ মলে দেয়। রুনুঝুনু ঘণ্টা বাজিয়ে টিমিয়ে-টিমিয়ে গাড়ি চলে ঘুম পাড়িয়ে-পাড়িয়ে!

কখন মুক্তার ঘরের আলো নিভে গেল, টের পাই। নিশুতি রাতের স্তিমিত অন্ধকারে খালি একটি মুখ মনে পড়ে—তার একটা চোখ কানা, ঐ ক্ষীণ পাংশু চাঁদের টুকরোটার মতো! তার মুখে সংখ্যাতীত বসন্তের দাগ—যেন নক্ষত্রখচিত কুৎসিত ঐ আকাশটা!

সুন্দরের কাঁধ জড়িয়ে টলতে-টলতে অরুণ এল—রাতে আঁধিয়ারা। সুন্দর ঘর পর্যন্ত পৌছে দিয়ে এল যা হোক।

এসে বললে—ভীষণ গিলেছে আজ। নাও, বিছানাটা পাত শিগগির। বাবা—বলেই চাদর মুড়ি দিয়ে পড়ল।

হঠাৎ একটা চিৎকারের চাকু অন্ধকারকে যেন চিরে গেল। এগোলাম। দরজাটা দু-ফাঁক। দুরন্ত দস্যুর মতো দখিন হাওয়া ঘরের মধ্যে লুটের লাট্টু ঘুরিয়ে দিয়েছে। ল্যাম্পটা চৌচির হয়ে মেঝের উপর ফাটা, কাদাটে চাঁদের আলোয় চিকমিক করছে। আবার প্রশ্ন এল—কে?

দেশলাই জ্বালালাম। খাটের উপর অরুণ শোয়া—গোঙাচ্ছে। আমাকে দেখে মুক্তা সোফা থেকে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে বললে—কি চাও?

বললাম—আপনার ভুরুর ওপর থেকে কেটে গিয়ে রক্ত গলছে, জায়গাটা বেঁধে ফেলুন।

ও একটা পাখা নিয়ে অরুণকে হাওয়া করতে-করতে বললে—তোমার তাতে কি?

—পাখা পরে করলেও চলবে, কিন্তু কোথায় আইডিন আছে বলুন, বেঁধে দিই।

ও পাখাটা দিয়ে দরজা দেখিয়ে বললে—কে তোমাকে মাথা ঘামাতে বলেছে? যাও এখান থেকে—বলে ফের পাখা চালাতে লাগল। অরুণের চুলে আঙুলও বুলোতে লাগল খানিক।

মদ খেলে দাদাবাবুকে দেখাত গরিব, দুঃখী—যেন বুকের ভিতরটা ফাঁকা, খাঁ-খাঁ করছে। আর একে দেখাচ্ছে—বীভৎস, বিকট। কিন্তু, কে জানে? হয়তো ওরও মনের মরুতে মেঘের মমতা মাখা নেই, হয়তো ও-ও একলা, পিয়াসী!

বললাম—তাই যদি হয়, তবে শুধু ঐ টুকুন পাখা-চালানোয় কি হবে? যে মদ খায়, তাকে আরো ভালোবাসুন, ভাসিয়ে নিয়ে যান। সব চেয়ে ভালোবাসার দরকার তারই যার কান্না শুকিয়ে গেছে—

ও পাখাটা আস্তে-আস্তে পাশে রেখে সোফাটার উপর বসে পড়ল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে—যেন বিষাদে ভরা, গোধূলিতে মন্থরচারী গরুর গলার ঘণ্টার মতো উদাস। যেন বলছে—ফুরিয়ে গেছে, মণ্টুদা।

ওর ঘা-টা আস্তে-আস্তে বেঁধে দিলাম।

বললাম—ওখানে মেঝের ওপর বিছানা পেতে দিই। এবার ঘুমোন।

ও শুধু বললে—দাও। পুবের জানালার ধারে, নিচেরটাও খুলে দিয়ো।

বিছানা পেতে দিলাম।

বললে—ঐ লাল-বইটা বালিশের তলায় রাখ, আর এই নীলটা পাশে। আর বাকিগুলো চারপাশে ছড়িয়ে দাও—এলোমেলো করে। তুমি—

দরজাটা ভেজিয়ে বেরিয়ে যাই। মাঠের মধ্যে গিয়ে দূর থেকে ম্লান জ্যোৎস্নালোকে দেখি, বিছানা শূন্য—এখনো শুতে আসেনি। কি করছে মুক্তা? হয়তো অরুণের পাশে বসে পাখাই চালাচ্ছে সারারাত।

অরুণ পেণ্টালুনের পকেট হাতড়ে একটা চাবি বার করে মুক্তাকে বললে—ক্যাশ-বাক্সের চাবিটা রাখ। ওর মধ্যে প্রায় সাড়ে-তিনশো টাকা রইল তোমার এ-কদিনের খরচের জন্য। এবার অনেকগুলি রুপোর চাকতি হাতড়ানো গেছে। এবার অন্তত একটা খোকা-মোটরকার কিনতেই হবে। মুক্তা শুধু বললে—এবার কি ফিরে আসতে খুব দেরি হবে?

—হয়তো হবে একটু। দরকার হলেই আমাকে তার করবে, আমি যেখানেই যাই তোমাকে জানাব। তুমি কলকাতায় বিজনকেও লিখতে পার, সে না-হয় ক্লাইভ স্ট্রিটে চাকরির জন্য কপাল কুটে-কুটে হয়রান না হয়ে এখানে দিন কতক বসে-বসে গিলে চেহারার ভোল ফিরিয়ে নিক। যদি ইচ্ছে হয়, ওর সঙ্গে কলকাতায় ফিরেও যেতে পার।—যা তোমার খুশি।

বলে ছুটে নেমে গাড়িটায় এসে বসল। গরু দুটোর ল্যাজ মলে দিলাম। মুক্তা নীল-বইটা হাতে নিয়ে একান্ত মনোযোগে পড়ছে। একবার তাকিয়েও দেখলে না। ও যেন একটা ফুরোনো ফোয়ারা—উজাড়-করা উদলা একটা ঘট।

যেতে-যেতে প্রশ্ন করলাম—কোথায় যাচ্ছেন?

—দিল্লি।

—উদ্দেশ্য?

— ব্যবসা। সেখান থেকে আগ্রায় যাব, তাজ দেখতে। এবার দেখব অমাবস্যায়—

গরুর গলার করুণ ঘণ্টার কাতর কাকুতি শুনে আপন মনেই বলে—অন্ধকারে পাষাণের পুঞ্জিত দীর্ঘশ্বাস শুনব। তারপর রাজপুতানার ওপর দিয়ে ছুটে যাব—লু-র মতো—

—কবে ফিরবেন?

—ফিরব? ড্যাম্‌। হ্যাঁ, ফিরতে হবে বৈকি। যখন ডানা বুজে আসবে, ঘুম পাবে যখন।

মরা, নিশুতি রাত, ঘুমন্ত মনের সঙ্গে আকাশের তারা কানে-কানে কথা কয়, স্বপ্নের সুরে। যেন কি অকূল চেনাচিনি, চোখের জলের সঙ্গে চাঁদের, ভালোবাসার সঙ্গে অন্ধকারের!

কথা কইতে না-পারার সঙ্গে এই ব্যর্থ বিস্তীর্ণ বিদীর্ণ শূন্যতার।

পা টিপে-টিপে শিয়রের কাছের চেয়ারটায় বসলাম।

আবার সেই সুগভীর অতল জিজ্ঞাসা—কে তুমি?

—আমি।

মুক্তার নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। থেমে বললে—তুমি পুরুষ?

চেয়ারের হাতলটা মুঠির মধ্যে সজোরে চেপে ধরে বললাম—হ্যাঁ।

—ও!—একটা নিশ্বাস ফেলে বললে—কুৎসিত, বিচ্ছিরি, ভেজাল। আর আমি কে, জানো?

—তুমি মুক্তা। তাই তো তোমাকে জানি না!

—আচ্ছা, তোমার সঙ্গে মণ্টুদার কোনোদিন দেখা হবে? তুমি তো পায়ে-পায়েই নাকি পাড়ি দেবে এ-পৃথিবী। যদি দেখা হয়—আমায় কিছু ভালো করে মনেও নেই। তেরো বছরের আগেকার একটি দশ বছরের দুষ্টু ছেলে, তার জামার ওপর খুদে কাপড়টি বাঁধা, তার লাল পাড়টা আমার কপালের সিঁদুরের মতোই ডগডগে —এখনো মনে পড়ে। আর মনে পড়ে সেই আমের শাখায় দোলনা, দোলায়-দোলায় বউল ঝরে পড়ত। তাকে তো ভুলেই ছিলাম, তার ভালো নামও মনে নেই। হঠাৎ—

—যেদিন তোমার ঘোমটা খুলে গেল, সেদিন। যেদিন আকাশের তারা মাটির বাতি হয়ে বাদলা-পোকার পাখা পোড়াতে লাগল। দেখা হলে কি বলব তাকে?

—কি-ই বা বলবে? বলো—

—তার চেয়ে কলকাতার বিজনকে তার করি। সে আসুক, তোমাকে নিয়ে যাক। তোমার স্বামী এখন কোথায়, জানো?

—নাইনিতাল।

—তাঁকেই তার করি।

—দরকার নেই। একা মরতে আমার কষ্ট হবে না। মরণও ভারি একা—

অরুণ একদিন একেবারে হুড়মুড় করে এসে পড়ল—রাজ্যসুদ্ধ যত ডাক্তার কবরেজ হাতুড়ে ওঝা নিয়ে—এক এলাহি ব্যাপার। এক রাতেই ওর যত বাক্স ছিল, সব হাঁ হয়ে গেল।

মুক্তা নিঃশ্বাস ফেলে বললে—মুক্তি!

সেই থেকেই মুক্তার মেয়ের নাম—মুক্তি।

অরুণের সেদিনকার উন্মত্ততা বিধাতার জানা আছে—যেদিন এ-কন্যা পৃথিবী জন্ম নিয়েছিল।

দুদিন বাদেই আবার তল্পিতল্পা বাঁধলে। আবার অনেকগুলি টাকা জিম্মা রাখলে, চাবি দিলে, আরো একটা ঝি বাহাল করলে, একটা নার্সও। খুব সাবধানে থাকতে বললে, বললে—এবার ইচ্ছা হলে বিজনকে চিঠি লিখো, তোমাকে যেন নিয়ে যায়।

বললাম—কোথায় যাচ্ছেন এবার?

—দক্ষিণে। এরপর জলের ওপর পাল তুলে দেব ভাবছি—লোনা জলের।

সেদিন মুক্তা আমাকে বলছিল—ওর নাম মুক্তি। ও আমাদের মুক্তি দিলে—ভালোবাসার ভার থেকে।

নার্সই মেয়েটাকে নাড়ে-চাড়ে, নাওয়ায়-খাওয়ায়, ঝাড়ে-পোঁছে। ও ওর সেই নীল-বইটা কোলের উপর চেপে চুপ করে চেয়ে থাকে। আর, কথার অতীত সুর শোনে। মেয়েটাকে ছুঁতেও যেন ওর ঘেন্না হয়—এমনি।

ভালোবাসার মতো রাত নেমে এসেছে—ভালোবাসার মতোই বৃষ্টি।

হাওয়ায় যেন কে শুধোল—তুমি জেগে আছ?

—হ্যাঁ, আছি বৈকি।

অবাক হয়ে তাকালাম—সামনে মুক্তা। বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে ভিজছে—চোখের পাতায়, ঠোঁটে, ললাটে বৃষ্টিবিন্দু, গলার স্বরও যেন বৃষ্টিতে ভেজা।

বললে—গাড়িটা ঠিক করো।

—কোথায় যাবে ? এত রাতে, বৃষ্টিতে ?

—যেখানে তোমার খুশি, নিয়ে চল।

ওকে ভারি একা, শীর্ণ, পাণ্ডুর দেখাচ্ছে।

বললাম—খুকি ?

—ও তো মুক্তি !

গাড়িটায় চাপল।

বললাম—তোমার গায়ে যে জড়াবার একটা চাদরও নেই।

—কোনো দরকার নেই। তুমি যে বাইরে বসে-বসে খালি ভিজবে।

—তাতে কি ? চারদিকের ঝাঁপগুলো বন্ধ করে দিই ?

দিলাম।

সমানতালে বৃষ্টি চলেছে, তার সঙ্গে গরুর গলার ঘণ্টা—করুণ কান্নায় ভরা।

চরাচরব্যাপী অন্ধকার—এও ভালোবাসারই মতো !

সামনে একটা নিচু মাঠ, জলে থৈ থৈ করছে।

বললাম—সামনে যে জল !

ভারি গলায় বললে—জলের ওপর দিয়েই চল।

বৃষ্টিতে স্নান করছি—ভালোবাসায়ই। জলের নূপুর বেজে চলেছে—

ও বললে—গাড়িটা থামল যে ?

—গরু চলতে চাইছে না। আর কতদূর যাবে ? এবার ফের।

—ফিরতে হলে তুমি ফের। লাগামটা আমার হাতে দাও !

নিজের গায়ের কম্বলটা চিপে কাজলার উপর চাপিয়ে দিলাম, খানিক বাদে আবার শ্যামলার উপর চাপাই।

অবলা গরু দুটো নিজের গলার ঘণ্টা শুনতে-শুনতে চলে, জিরিয়ে-জিরিয়ে।

মাঠ পেরিয়ে আবার পথ পেয়েছি। কিন্তু অচেনা। কোথায় চলেছি, কেউ জানি না।

আবার বলি—হয়তো খুকি জেগে উঠে তোমার জন্যে কাঁদছে। এবার গাড়িটা ফেরাই।

ও কিছু বলে না। বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে।

বৃষ্টির বিরাম নেই—একটু ধরে আবার দমকে-দমকে আসে—সমস্ত আকাশ যেন ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

গাড়িও চলে—এবড়ো পথ, থেমে-থেমে, ঘুমিয়ে। ঘন অন্ধকার, মাঠ বাট সব মুছে গেছে—

বলি—আর আমাকে কতদূর নিয়ে যাবে ?

কোনো জবাব নেই—চারদিকের ঝাঁপ বন্ধ। খুলতে হাত ওঠে না। লাগামটা ছেড়ে দিয়ে হাঁটুর উপর মুখ গুঁজে পড়ে থাকি—বৃষ্টির ঝাপটায় সমস্ত শরীর ক্লান্ত, অবশ হয়ে এসেছে।

হঠাৎ একটা উঁচু পাথরের ঢিবির সঙ্গে গাড়ির চাকার ধাক্কা লেগে গাড়িটা কাত হয়ে পড়ল।

চমকে লাফিয়ে পড়ে চেঁচিয়ে উঠলাম—মুক্তা !

ঝাঁপ খুলে দিলাম—মুক্তা গাড়ির মধ্যে নেই।

সামনে পিছনে চারপাশে ঘুটঘুট্টি অন্ধকার, আঠার মতো। গলা টিপে ধরছে। গরু দুটো মুখ থুবড়ে পড়ে শীতে কাঁপছে।

চেঁচিয়ে, অন্ধকার টুকরো-টুকরো করে চিরে ফেলে ডাকতে ইচ্ছে করছে—মুক্তা, মুক্তি ! কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুল না।

হয়তো ও গাড়ি থেকে কখন নেমে বাড়িই ফিরে গেছে। হয়তো ও ওর মেয়েরই ডাক শুনেছে—এই চপল বৃষ্টির উছল কলতান শুনে—গরুর গলার উদাস ঘণ্টারব শুনে—

বনজ্যোৎস্না

বেকার হয়ে পথে বেরিয়েছি, যেন কোথায় কবে কারবার করেছিলাম, ফতুর হয়ে গেছি।

একটা মেসে এসে দেখি—বিকাশ! একেবারে বদলে গেছে, কি রকম রুক্ষ চোয়াড়ে হয়ে গেছে, চোখে নিষ্ঠুর অবিশ্বাস। হাত দুটো ধরে বললে—খুব ঘুরতে বেরিয়েছিলি যা হোক, একটা খবর নেই। পায়ে কতগুলি কাঁটা ফুটল?

চাকরি করে। বিয়ে করেনি। বললাম—তোর মাইনেতে আপাতত কিছু ভাগ বসাব। যদ্দিন না একটা কিছু জোটে—

মেসে নানা রকমের জন্তু ভিড়েছে আগে থেকেই। তবে ভয় নেই।

বিনোদের আর যাই থাক, একখানা গলা ছিল। যেমন জোরালো তেমনি খোনা। তিন রকম আওয়াজ বেরুত—হেঁড়ে, হাপুরে, আর খনখনে।

কিন্তু খুব সকালবেলা, অন্ধকার তখনো ডুবে উবে যায় না, যখন বালিশের থেকে মুখ বার করে বলে ওঠে—সাত ভাই চম্পা জাগ রে—

আর যখন ঘুমন্ত কারুরই কোনো সাড়া না পেয়ে হঠাৎ গলার স্বরটা খাদে নামিয়ে ধীরে উচ্চারণ করে—কেন বোন পারুল ডাক রে—

মনে হয় অপরূপ, অপরিচিত সে-কণ্ঠস্বর।

শুনি, আর মনে হয়, যেন ভোরের তারা যাবার আগে ভোরের আলোর কানে-কানে কি কথা কয়ে যাচ্ছে।

রোজ।

খুব মনে পড়ে সেদিনটা। বিকাশের পিছু-পিছু যে-লোকটা মাথা খাড়া করে আসতে গিয়ে চিপা দরজার চৌকাঠে বিরাট একটা ঢুঁ খেয়ে টুঁ-টি না করে বেকুবের মতো ঘরে এসে ঢুকল—সেদিন তার অনেক কিছু দেখেই আশ্চর্য হওয়া যেত হয়তো—কিন্তু আমি দেখেছিলাম তার নাকের উপর ত্রিশূলের মতো কাটার দাগ একটা—আর তার দুপাশে দুই চোখের আর্দ্র ও অবসন্ন বিষণ্নতা!

অখিলবাবু গাড়ুতে সবে জল ভরছিলেন—সন্ন্যাসী দেখেই সেই জলে চোখ দুটো তাড়াতাড়ি কচলে নিয়ে ছুটে এসে বললেন—পেন্নাম, সন্নেসী ঠাকুর। কি মনে করে এই গরিবদের আস্তানায় ?

বিকাশ বললে—আস্তাবলে বলুন, অখিলদা!

অখিলবাবু যদ্দূর পারেন ঠোঁট দুটো প্রাণপণে টেনে দাঁত বত্রিশটা দেখিয়ে বললেন—হঠাৎ পায়ের ধূলো পড়ল ?—

বিকাশ বললে—আপনাদের আপিসে যদি একে একটা ভাঁওতা করে ঢুকিয়ে দিতে পারেন, তো বেচারার একটা হিল্লে হয়। একটা নাপিত ডাকি বিনোদ, দাড়িগুলি কামা।

অখিলবাবু কথায় কোনো কান না পেতেই যেতে-যেতে বললেন—আমি এখুনি আসছি, ঠাকুর। গরিবের হাতটা একবার দেখে দিতে হবে।

বললাম—কোথা পেলি বাবাজীকে ?

—এক মন্দ ফিকির করেনি ভাই—বিকাশ বললে—মাস দুয়েক কষ্ট সয়ে চুল আর দাড়িগুলি দিব্যি গজিয়ে ফেলেছে, ব্যবসা ফ্যালাও-এর দিব্যি ক্যাপিটাল। তুই তো পুরো ছটা মাস পা-টমটমে টো-টো করেও কোনো আপিসে একটা ঠোকর পর্যন্ত মারতে পারলি না। ও বেড়ে এক গোছা দাড়ি বাগিয়ে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে হঠাৎ একেবারে পাগলা ঘোড়ার মতো হাত-পা ছুঁড়ে চেঁচাতে শুরু করলে। ভিক্ষাও না, বক্তৃতাও না—একটা ইংরিজি কবিতার আবৃত্তি। নারকেলহীন নারকেলডাঙার গোবরগণেশরা এই নাগা সন্নেসীর অদ্ভুত প্যাঁচে একেবারে বে-কায়দা হয়ে পড়েছে দেখলাম। ভিড় সরিয়ে দেখি—আরে বিনদা না ?

—চিনতে পারলি ?

—ঐ আধখানা কানটা দেখেই চিনে ফেললাম। তুই তখনো আসিসনি। ইস্কুলে পড়াতে-পড়াতে রামহরি মাস্টারের মুখ দিয়ে নাল গড়াত। তাই দেখে আমি আর বিনদা জোট বেঁধে বেঞ্চির তলা দিয়ে বুড়ো আঙুল বাড়িয়ে চেঁচিয়েই বলে ফেলেছিলাম—ও বুড়ো, হুতুম-খুড়ো, লবেনচুস খাবি ? হাবলা বুড়ো তো চটে-মটে একাকার হয়ে সামনের ছমু মুদির দোকান থেকে দুটো তালপাতার বড়-বড় ঠোঙা নিয়ে এসে গাধার টুপি বানিয়ে আমাদের মাথায় চাপিয়ে দিলে। মাথা দুটো দোহাত্তা ঠুকে দিয়ে টুলে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে বললে—কান মল দুজনেরটা, জোরসে! পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে সে কি কানমলা ভাই—কাছি-টানাটানি।

বিনদার ছিল বেড়ালের মতো নোখ, রক্ত বার করে ছাড়লে। আমি একেবারে ক্ষেপে গিয়ে খপাস করে ওর কানে কামড় বসিয়ে দিলাম, আধখানা মুখের মধ্যে বেমালুম চলে এল। তাইতেই। এখন ঐ কাটা কানটা মনে হচ্ছে যেন নেংটি ইঁদুরের ছা।

বিনোদ খোনা গলায় বললে—খিদের খোরাকের জন্তেই এই ফিকির নয়, ভাই। যেমন গৌতম—

জিভ উলটে বিকাশ বললে—থাক! গৌতম নয়, গো-তম—গরুশ্রেষ্ঠ।

বললাম—ঐ অখিলবাবু এসে পড়ছেন—

বিকাশ বললে আস্তে-আস্তে—হাত পাতলেই এক নিশ্বাসে বলে যাবি বিনদা—তৃতীয় পক্ষ আপনার, আগে নাম ছিল গজেন্দ্রবালা, বদলে রেখেছেন গজমোতি—প্রথম পক্ষে সাতটি, দ্বিতীয় কোঠায় চারটি, আর তিন নম্বরে আধখানা।

—তার মানে?

—তার মানে যমজ হয়েছিল, একটা পটল তুলেছে। বলিস, আপনিই পাশ ফিরতে গিয়ে ভুঁড়ির তলায় ফেলে চেপটে দিয়েছিলেন।

—আর?

—বলিস, আপনি সাড়ে-চৌত্রিশ টাকায় পাটের গুদামে পাটের বস্তা গুণে দিন কাটান, খান থাকি সিগারেট, শোন গামছা পরে, দুমাস বাদে আপনার আট আনা মাইনে বাড়বে। ভুঁড়িটি ভোম্বল হলেও ভোগেন অম্বলে, সেদিন বিকাশের পাল্লায় বায়স্কোপে গিয়ে শেষ হবার জায়গায় সিটি মেরেছিলেন, রবিবার সকালবেলা ঘুঁষি মারলেও আপনার ঘুম ভাঙে না—কেরানীর ঘুম।

বলতে-বলতে বিনোদ বেফাঁস বলে ফেললে—আপনার তৃতীয় পক্ষটিও টিকলে হয়!

—বলেন কি মশাই?—অখিলবাবু বিষম খেয়ে আঁতকে উঠলেন যেন!

সামলে নিয়ে বিনোদ বললে—তবে চতুর্থ পক্ষ আপনার বাঁধা একেবারে। চেলি পরে জলজ্বল করছে।

স্বস্তির শ্বাস ফেলে বললেন অখিলবাবু—যাক, দমটা ফিরে পেলাম। কোনো বিঘ্ন হবে না তো বাবাজী?

—কিঞ্চিৎ। তা, টাক আপনার বেশ টনকো আছে।

বললাম—তাহলে এখন থেকেই জীইয়ে তোয়াজে রাখুন অখিলবাবু।

বিকাশ বললে—আমার জিম্মাতেও রাখতে পারেন—

বিনোদ গায়ের আলখাল্লাটা খুলে ফেললে। আমাদের পুরোনো হোঁচট-খাওয়া মুখ-থুবড়ে-পড়া মেসটা যেন হঠাৎ কথা কয়ে উঠল—যেন মিতা মিলেছে।

এতদিন কোথায় যেন একটা ফাঁক ছিল। একটা পা যেন ছিল না—যেন ঠেকো দিয়ে ছিল এতদিন—সহসা সব ভরাট হয়ে উঠেছে। কবিতার চমৎকার মিল একটা।

একটা জীর্ণ থুত্থুড়ো বুড়ো বাড়ির সঙ্গে যে একটা জ্যান্ত মানুষের এমন সামঞ্জস্য থাকতে পারে, ভাবিনি। যে ছেঁড়া আলখাল্লাটা ও ছেড়ে ছুঁড়ে ফেললে, তার রঙ এককালে গেরুয়া ছিল, এখন তা মরে-মরে মেটে কাদাটে হয়ে এসেছে—সেই আলখাল্লাটার সঙ্গে পর্যন্ত।

বুকের একটা দিক একেবারে চাপা, বসা, যেন একটা ফুসফুস কে চুষে নিয়েছে। নাকটা থেঁতলানো, কানের আধখানা খোয়া গেছে, গলাটা হাড়গিলের মতো, মাথায় বাবুইপাখি বাসা বেঁধেছে বুঝি।

কিন্তু এই কুৎসিত হতচ্ছাড়া দেহটার আবরণ উন্মোচন করার নির্লজ্জতার মধ্যে যেন সুদূর একটি ব্যথা আছে।

শ্যাওলা-পড়া দেয়াল ফুঁড়ে বটের চারা বেরিয়েছে—ওরা ওকে সম্ভাষণ জানায়। ফাটা ইটগুলি ওর ভাঙা পাঁজরার পানে চেয়ে থাকে।

দাঁত-বের-করা রাস্তা—পায়ে খোয়া শুধু ফোটে না, কামড়ায়। মনে হয় ওর মেজাজ যেন সব সময়েই খিটখিটে। রোগা পটকা গলি, কেশে-কেশে যেন ধুঁকছে, এমনি মনে হয়।—তালপাতার সেপাই।

পাশেই বুড়ো বাড়িটা জুজুবুড়ির মতো ঘুপটি মেরে বসে—যেন ফোকলা দাঁতে হাসছে।

বাড়ি আর রাস্তা—দুই ভাই বোন যেন। সমবয়সী। শীতের হাওয়ায় জবুথবু হয়ে বসে আপন মনে খোশগল্প করে।

নিচের তলায় এক খোপরিতে কিনু-উড়ে বাদামী তেলে ফুলুরি ভাজে, কপাল বেয়ে টসটস করে ঘাম ঝরে কড়ার উপর, আরেকটাতে রাখহরিরা আগুনে টিন তাতিয়ে হাতুড়ি দিয়ে পেটায় সারাদিন, তৃতীয়টায় এক বুড়ো কবরেজ—দিন প্রায় কাবার করে এনেছে—মাটির উপর ময়লা চাদর বিছিয়ে শুয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে থাকে, বার্ধক্য ওকে শুষে-শুষে একেবারে আমসি করে ফেলেছে। রাস্তার যে-লোক ভুল করে এই কাঁকড়ার মতো বুড়োর দিকে একবার তাকায়, তাকেই ও ডাকে। বলে—কেন শুধু-শুধু পিত্তশূলে ভুগছ সোনার চাঁদ, সাড়ে-চার-আনা পয়সা দিয়ে এক হপ্তার বড়ি নিয়ে যাও, অনুপান শুধু দুটো উচ্ছেপাতা।

এই বুড়োর মুখে যেন এই বোবা বন্দী ব্যাজার গলিটার কাতর কাকুতি !

পকেটে দশটা পয়সা। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখেছিলাম—ছেলে-পড়ানো থেকে বাজার-করা তক এমনি একজন বেকার চেয়েছে। আপিস-খাম আর টিকিট কিনতে হবে। আর, জামা কাপড়ের এমন ছিরি হয়েছে যে, একটা মেটে সাবান না হলেই নয়, জামার বোতামগুলো ছেঁড়া, কিছু আলপিন-এরও দরকার।—মনে মনে দশ পয়সার হিসেব কষি।

গ্যাসপোস্টে, এখানে-সেখানে তাকিয়ে-তাকিয়ে চলি, যদি একটা বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে। যদিও কালে-ভদ্রে দু-একটা পড়ে—তার আর ঠিকানা খুঁজে পাই না, কে আগেভাগেই লুফে নিয়েছে। লটপটে চটি দুটো টেনে-টেনে পথ ভাঙি। একটা বড় বাড়ির দরজার সামনে ভোরবেলাই অজস্র লোকের ভিড়। জিগগেস করি—ব্যাপার কি এখানে ?

একজন বলে—সকালের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে, জুতোর দোকানের এক বিক্রিদার চাই। চৌদ্দ ঘণ্টা ফাটক—চৌদ্দ টাকা মাইনে। ভিড় জুটেছে প্রায় চুয়াল্লিশ। বাবু এখনো নামেননি বলে দরোয়ান দরজা খুলছে না। দেখছেন কি রকম ঠেলাঠেলি পড়ে গেছে !

সবার পিছনে দাঁড়িয়ে লোকটি করুণ করে একটু হাসে—হাতের কাগজটা মোচড়ায় —অথচ ফিরে যায় না।

চলি। মোড়ের মুচিটা ছেড়া হাঁ-করা চটিজুতোর পানে লুব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে—মাছের উপর বেড়ালের দৃষ্টির মতো; গাড়ির আড্ডার গাড়োয়ান ডেকে জিগগেস করে—কোথায় যেতে হবে ? ডিসপেনসারিতে বসে নতুন লবডঙ্গ ডাক্তার আমার দিকে চেয়ে ভাবে—আমাকে দিয়েই বুঝি ওর বউনি হবে আজ, যদি নাড়ীটা দয়া করে ওকে দেখাই ! বেশ একটু সচেতন হয়ে ওঠে। ভিখিরী ভিক্ষা চায়, ভিক্ষা না-দিলেও আশীর্বাদ করে—মাগনা।

গঙ্গা বলে ডাকতে দুঃখ হয়—একটা বড় নর্দমা ! পাড়ে অতিকায় কারখানা একটা—যেন হিক্কা উঠেছে। ফুসফুসটা এই ফাটল বলে।—সপাসপ ঢুকে গেলাম, বললাম—সাহেবের ঘর কোনটা ?

শিরদাঁড়াটা খাড়া করে সাহেবের ঘরে ঢুকে সেলাম না-ঠুকেই বললাম—একটা চাকরি দাও।

গুণপনা কি, জিগগেস করায় বললাম যে, চৌকো একটা লেফাফায় চওড়া একটা কাগজ আর এই চওড়া বুকটা।

বি-এ পাশ-কে কলের কুলিগিরিতে বহাল করতে পারে না—সাহেব বললে। বললাম —ড্যাম। দেখ এই ড্যানাটা।

জামার হাতাটা টেনে ছিঁড়ে ফেলে মজবুত বাহুটা ওকে দেখাই।

কিছুই হয় না। সাহেব দরজা দেখিয়ে দেয়। এদিক-ওদিক ঘুরে-ঘুরে পেটুক কারখানাটা দেখি—বেশ লাগে। ওর কবিতায় নিজের হাতে হাতুড়ি ঠুকে-ঠুকে ছন্দ মেলাতে ইচ্ছে করে।

দুটো লোক করাত দিয়ে একটা লোহার 'বিম' কাটছে। বলি—কতক্ষণে ফুরোবে? —ঘণ্টা আষ্টেক তো বটেই—সেই কখন থেকে বসেছি। ড্যানা দুটো ছিঁড়বে এবার।

আবার গঙ্গার পাড় বেয়ে হাঁটি। ওর টুঁটি সহস্র মুঠিতে কারা টিপে ধরেছে—বাতাসের জন্যে হাঁপানি রোগীর মতো গলা বাড়িয়ে রয়েছে যেন। ঐ দুটো অসহায় মজুরের কথা ভাবি—আর কতক্ষণ করাত চালাবে ওরা?

ছবির নিচে নাম লেখা তিলোত্তমা, বাজানই বা না কেন ডুগি-তবলা, দেবী তো বটেন। অখিলবাবু তাই যত্ন করে মাথার পাশে টাঙিয়ে রেখেছেন। বিকাশের ঘর থেকে আধপোড়া সিগরেটের টুকরোগুলি কুড়িয়ে এনে পিন ফুটিয়ে-ফুটিয়ে খান, খুকি-বউয়ের জন্যে স্প্রিং-এর নাগরদোলা থেকে শুরু করে মৃগীরোগের ওষুধ কেনেন লুকিয়ে-লুকিয়ে। আগে-আগে গাড়োয়ানি ইয়ার্কিতে ভরা এক পয়সার চোথা কাগজ কিনে সপ্তাহ ভরে তাই দুইয়ে-দুইয়ে পড়তেন। এগুলো দিয়ে ঠোঙা হবে না, দাম এর আধলার আধপয়সা বেশি নয়—কাগজওলা এই কথা বলাতে আর কাগজ কেনেন না। এতদিন ধরে যা পুঁজি করে রেখেছিলেন, পুঁটলি বেঁধে বাড়ি নিয়ে গেলেন এক সময়, শেষ আধখানা বাচ্ছাটার দুধ গরম হবে।

এখন আপিস থেকে এসে ভেজা গামছা বুকের উপর ফেলে ছাতের ধারে বিনোদের মুখে দেশ-বিদেশের গল্প শোনেন।

তাই জানতাম।

সেদিন বিকাশ গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল—গল্প শুনে যা কাঞ্চন, বিনোদ-বাবাজীর আসনাইর কেচ্ছা।

এক পাশে শুয়ে পড়লাম। বিকাশ বললে—আপনার ভুঁড়িটি একটু এগিয়ে দিন

অখিলদা, তাকিয়া করি। তাকিয়ায় ঠেস না-দিয়ে কি প্রেমের গল্প শোনা যায়, না সহ্য হয়?

একদিকে বিকাশের হাসি, যেমন প্রচণ্ড, তেমনি নিষ্ঠুর, তবুও, অন্যদিকে বিনোদের সেই উদাসীন উচাটন কণ্ঠস্বর—হোক না হেঁড়ে, হোক না স্যাঁতসেঁতে, কিন্তু করুণ, মন্থর—যেন সমস্ত ঠাট্টাকেই উপেক্ষা করছে।

বিকাশ বলবে, অখিলদা ঝিমুচ্ছেন, কিন্তু এ তাঁর তন্ময়তা, যেমন তন্ময়তা এই ধ্বসে-পড়া অন্ধকার নিসাড় বাড়িটার।

বিনোদ একমনে নিজের দাড়ি হাতায়, আর কোনো কুণ্ঠা না করেই বলে চলো খোনা গলায় অথচ আস্তে—সে কি রোদ ভাই, চোখে কান্না জড়িয়ে আসে। বড় ইস্টিশান থেকে আট ক্রোশ দূরে আমার সেই পারুল-ফোটার গাঁ। চলি-চলি আর তার সজল সস্নেহ চোখ দুটি ভাবি—আর দুপুরের রোদ যেন জুড়িয়ে আসে। সমস্ত দেহ অবশ—অথচ ক্লান্তির মধ্যে এমন একটি শান্তি। সূর্য অস্ত যাচ্ছে, সন্ধ্যা ডানা মেলেছে—তখন পৌঁছুলাম।

বিকাশ বললে—তারপর তো ঘরে ঢোকা মাত্রই পারুলের বাপ ঠ্যাঙা উঁচিয়ে তেড়ে এসে তোকে তাড়িয়ে দিলেন, তুই উলটে একটা চড়ও মারতে পারলি না, না? কি করলি তখন?

—প্রকাণ্ড অশ্বত্থের তলায় পারুল আমারই জন্যে ছায়া মেলে রেখেছে। দেখা কি এত সহজেই মেলে? আমারই জন্যে পারুল পাঠিয়ে দিলে বাতাসের স্নেহস্পর্শ, আমারই জন্যে জ্বালিয়ে রাখল সন্ধ্যার প্রথম তারাটি!

বিকাশ বললে—তারপর গাছতলায় শুয়ে ভেউ-ভেউ করে খুব খানিকটা কাঁদলি—যেমন পরীক্ষায় ফেল করে কেঁদেছিলি বোকার মত? ট্যাঁকে যা পয়সা ছিল, তা দিয়ে আফিং বা কার্বলিক অ্যাসিড কেনবার মতো মুরোদ ছিল না বলেই বুঝি কতগুলো শুকনো চিঁড়ে আর নারকেলের মালায় করে খানিকটা ঝোলা গুড় কিনে এনে চিবোতে বসলি? যা খিদে পেয়েছিল! নয় কি? কি বলিস রে, কাঞ্চন?

অখিলবাবু রুখে বললেন—সব সময় ইয়াকি করো না, বিকাশ। আমার বেড়ে লাগছে শুনতে।

বিনোদ এবার যেন অখিলবাবুকেই লক্ষ্য করে-করে বলতে লাগল—সন্ধ্যায় যখন বিদায় নিয়ে যেতাম, পারুল বিষাদিতা গোধূলি-বেলাটিরই মতো ছাদে এসে দাঁড়াত।

বিকাশ বললে—শুকোতে দেওয়া কাপড়-জামাগুলি ঘরে নিয়ে যেতে। তোরই জন্যে নয় রে, হতভাগা।

—ওর চারধারে এমন একটি পবিত্র বৈরাগ্য!

—সেদিন নিশ্চয়ই ওর জ্বর-ভাব ছিল, কিছু খায়নি, মুখ শুকনো, গা শিথিল, পরনের কাপড় ময়লা—তাই সেটাকে বৈরাগ্য বলে ভুল করেছিলি। বোকা!

হঠাৎ বিকাশ প্রশ্ন করলে—যাক। বেচারীর নির্বিঘ্নে বিয়ে হয়ে গেছে তো? কটি ছেলেপুলে হল?

বিনোদ বললে—সে চিরকুমারী। আমারই জন্যে দুঃখের তপস্যা করছে।

—মৃগীরোগ আছে বুঝি? বাপ বুঝি বিয়ে দিচ্ছে না? তাই?

—আমাদের মিলন দেহকে ডিঙিয়ে—

—যেমন লঙ্কা ডিঙিয়েই অযোধ্যা। পথটুকু না পেরিয়েই পথের মোড়।

পরে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বিকাশ বললে—পৃথিবীতে তিনটে সুন্দর অশ্লীলতা আছে, ভাই—জন্ম, প্রেম আর ভগবান। আর সব চেয়ে ঘৃণা করি—বিবাহ আর মৃত্যু। এমন কুৎসিত জিনিস দুনিয়াতে বুঝি নেই।

অখিলবাবু অতিষ্ঠ হয়ে চেঁচিয়ে অতঃপর ঝিকে ডাকেন এক ছিলিম তামাক সেজে দিতে।

সাতাত্তর টাকা মাইনে পায়, সাতদিনও লাগে না ফুঁকে দিতে। তারপর বাকি তেইশ দিন বসে-বসে হাঁপায় আর বিনোদের আষাঢ়ের গল্প শোনে। আজগুবি কথা বলে সব—যে-মেয়ে কবিতা বোঝে বলে সে সব চেয়ে মিথ্যাবাদী।

নিজেকে পর্যন্ত ঠাট্টা করে। বলে—বিকাশ বোস, একটা মাগী-প্যাটার্নের চেহারা, হেলে-পড়া হাসনুহানার শাখাটি, বুকের ভিতর ধোঁয়া না-সেঁধোয় সেই ভয়ে ধীরে-ধীরে চুরুট ফোঁকেন, ডান দিকে সিঁথি কাটেন, গাল পর্যন্ত আমেরিকান জুলপি রাখেন—দেখতে পারি না। ঘেন্না লাগে। মেয়েমানুষের চুলের গন্ধ শুঁকে বমি আসার মতো। ছো!

বিনোদ আর আমি এক ঘরেই শুই, আর শোয় ঝুলে-ঝুলে জাল ঝুলিয়ে বেকার মাকড়সারা।

দেওয়ালের সঙ্গে বিনোদ কথা বলে। বলে—এমনি কতটুকুই বা তুমি? ঠুনকো কাঁচের পেয়ালার চেয়েও সস্তা। তোমাকে তোমার চেয়ে কত বড় করে দেখলাম—

সে শুধু আমারই কৃতিত্ব, আমার একার গর্ব সে। যেখানে তুমি বাস্তব, স্থূল, জাজ্বল্যমান, সেখানে তুমি কত কদর্য, কিন্তু তোমার চতুষ্পার্শ্বে আমার সাধনার কল্পনার জ্যোতির্মণ্ডল রচনা করেছি বলেই না আমি আজ অতসীর শাখা হয়ে দূর তারকার জন্য আঁকুপাঁকু করছি। তুমি তো শুধু একটা প্রতিমা নও, তুমি—

ঈশ্বরের নামটা মুখে আসতে দেরি লাগে। যেন ঐ দেরি করে উচ্চারণ করার মধ্যে কত অভিমান!

সেই বিনোদই সকালবেলায় বিকাশকে বললে—দুটো টাকা দে। কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিই চাকরি চেয়ে।

বিকাশ বললে—তার চেয়ে কিছু ন্যাংড়া আম আর পানতুয়া আনলে কাজ হত।

—তুই ভাবছিস, কিছু হবে না ওতে? আমি সোজা কথা স্পষ্ট করে জানাব যে, আমি খেতে পাচ্ছি না, বাড়িতে আমার বিধবা মা'র মরণাপন্ন অসুখ—গেল-বছরের ঝড়ে আমাদের ঘর একেবারে ন্যাংটো হয়ে গেছে—

বিকাশ বললে—দু'টাকায় অত কুলুলে হয়! একটু কম-সম করেই লিখে দিস, ভাই।

রাস্তার বাঁক নিতেই প্রবোধের সঙ্গে দেখা—নতুন উকিল। গোটা বাজারটাই যেন কাঁধে নিয়ে বাড়ি ফিরছে।

বললাম—এত ঘটা যে? নতুন ছেলের ভাত বুঝি? না, সাধ দেওয়া হবে ফের?

ও হেসে বললে—কাল একটা মোকদ্দমা জিতেছি, ভাই। তাতেই একটু—তুই চল না আমাদের বাড়ি। একেবারে খেয়ে যাবি খন।

তথাস্তু!

কান্নিক খেয়ে গলির পর গলি পেরিয়ে যে সুড়ঙটায় আমাকে ও নিয়ে এল, সেখানে মরণেরও পথ চিনে আসতে দস্তুরমতো বেগ পেতে হবে। বললাম—এ-গলিতে মক্কেল আসে? মোটা হলে তো ঢুকতেই পাবে না।

ও বললে—কেন, গলির মোড়ে একটা আঙুল-দেখানো সাইন-বোর্ড টাঙিয়েছি তো! সন্ধ্যা থেকে রাত পৌনে-এগারোটা পর্যন্ত বৈঠকখানার দরজার কাছে একটা লণ্ঠন ঝুলিয়ে রাখি।

বললাম—ঐ কেরোসিনটা খামোকা গরচা দিস। বৃথা।

রান্নাঘরের দোরে সমস্ত বাজারটা নামিয়ে ও আমাকে একেবারে ভিতরে নিয়ে এল, অবিশ্যি রান্নাঘরের দোর থেকে ভিতরটা দু'পা দু'ইঞ্চিও বেশি নয়। একটি মেয়ে টেবিলের কাছে বসে কি লিখছে।

প্রবোধ বললে—জ্যোৎস্না, ইনি আমার বন্ধু, ডন কুইকসট্। আর, তুই বুঝতেই তো পারছিস, ইনি—

—আমার বউদিদি।

কথা একটা বলা উচিত বলেই বললাম।

মেয়েটি লিখেই চলেছে। যেন ওর আচরণে একটি অবহেলা, জায়গাটা ছেড়ে উঠল না পর্যন্ত। কিন্তু কেন যে অসন্তুষ্ট হতে পারলাম না জানি না। ওকে একটুখানি দেখলাম, যেমন এক ফাঁকে ঝড়ের রাতে বিদ্যুল্লতা দেখি। শীর্ণমলিন চেহারা, ভোরের সূর্যমুখী যেন বিকেলের আলোয় নেতিয়ে পড়েছে, ঘাড়ের উপর চুলের ফাঁসটার কাছে ঘোমটাটা একটু শিথিল হয়ে খসেছে, ললাটে দুটি ঘামের বিন্দুর উপর রোদের চিকণ চিকিমিকি, ওর শাড়ির আঁচলটা এমন সুন্দর করে পায়ের কাছে লুটিয়ে না পড়লে সত্যিই যেন সব কিছু ভারি বেমানান হত।

প্রবোধ একটু বিরক্ত হয়েই বললে—কি লিখছ ওটা?

মেয়েটিও একটু চটেই উত্তর দিলে—গয়লার হিসেব মেলাতে হবে তো? তখন তো আবার বকবে। পরশু দিয়েছে মোটে দেড়-পো, লিখেছে—দেড় সের। বলেই বেরিয়ে গেল। আঁচলটা লুটোতে-লুটোতে যাচ্ছিল।

প্রবোধ তার মোকদ্দমা-জেতার গল্প শুরু করলে। কোন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম 'ল-পয়েণ্ট'-এর খোঁচা মেরে জজকে ঘায়েল করলে, ওর বক্তৃতায় বিপক্ষের উকিল কেমন ভেবড়ে গেল, জজ-সাহেব কেমন ওর সওয়াল-জবাবের তারিফ করলেন—তারই এক ঝুড়ি বক্তৃতা। আমি যে ওর বিপক্ষ দলের উকিল নই, আমাকে এমনি বসিয়ে নাস্তানাবুদ করে যে ওর কিছুমাত্র লাভ নেই, কে ওকে বোঝাবে? ভালো লাগছে না শুনতে, তবু ওর বলতে ভালো লাগছে বলেই শুনছি।

রাঁধুনে বামুন নেই, একটা ঠিকে-ঝি খালি। তেত্রিশ টাকা বাড়ি ভাড়া, লাইব্রেরির চাঁদা, ট্যাক্স, ল-জার্নালের খরচ—গাউনটা এমন ছিঁড়েছে যে আর সেলাই চলে না! এমনি অফুরন্ত বেদনার কথা—কিন্তু একবার যদি নাম ফাটে! বাড়ি, গাড়ি আর লাইব্রেরি—চাই কি একটা বাগানবাড়ি পর্যন্ত।

মুখ ম্লান করে বলে—দুটো ছেলে মারা গেল, ভাই। শেষেরটাও যাবে।

মেয়েটি ব্যস্ত হয়ে রাঁধাবাড়ার কাজ করে চলে অভ্যস্ত ক্ষিপ্রতায়, ঝিকে বকে, নিজেই বাসন দুটো মেজে নেয়, পিঁয়াজগুলো কেটে ফেলে, ঝাঁটা দিয়ে বারান্দার নোংরাগুলো সাফ করে, রোগা মরন্ত ছেলে আচমকা কেঁদে উঠলে এক ফাঁকে ওকে শান্ত করে আসে।

আবার চাবির রিং-এ শব্দ করে ছুটোছুটি করে, বাজার থেকে কাঁচা লঙ্কা তুলে আনেনি বলে রাগ করে আপন মনে কি বলে, বোঝা যায় না। খুন্তি নেড়ে মাছ ভাজে, ঠিক টের পাই, জমাদার এসেছে বলে ঝিকে আগে নর্দমায় জল ঢেলে দিতে বলে, মাছখেকো বেড়ালটাকে শাসায়।

বসে-বসে তাই শুনি—একটা হালকা কবিতা। অমিত্রাক্ষর নয়।

পরে এক ফাঁকে একটা ছোট বাটি করে খানিকটা তেল ও একখানা ফরসা চুল-পাড়-কাপড় এনে আমাকে বললে—কলে জল থাকতে-থাকতে স্নান করে নিন।

প্রবোধকে বললে—তোমারও তো কোর্টের বেলা হল। আমার এদিকে সব হয়ে গেছে।

দুটি হাতে একটি করে শুধু সোনার চুড়ি, কাপড়ের পাড়টায় কচু পাতার রঙ, ঘোমটাটি তেমনি আধেক-খসা।

খাওয়া সেরে প্রবোধ ঢিলে পেণ্টালুনটা পরলে। গায়ে দিলে জ্বলে-যাওয়া আলপাকার চাপকানটা, তিনটে বোতাম ছেঁড়া—মেয়েটি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বোতামগুলো লাগিয়ে দিলে। জুতোর পিছন থেকে ছেঁড়া-মোজার ফুটো দুটো উঁকি মারে—ওর জুতোর দিকে নিশ্চয়ই রাস্তার মুচি আজ লোলুপ চোখে চেয়ে থাকবে।

বললে—তুই বেরোবি নাকি, কাঞ্চন?

মেয়েটি একটু চড়া গলাতেই বললে—ওঁকে তো আর আক্কেল-দাঁতের মতো মক্কেলে পায়নি! উনি জিরিয়ে যাবেন একটু।

প্রবোধ পান চিবোতে-চিবোতে ছাতা মাথায় দিয়ে চলে যায় তারপর।

বললাম—আপনি এবার খেয়ে নিন।

—আমি? আমার সব পাট সেরে খেতে-খেতে প্রায় তিনটে।

—তিনটে?

—হ্যাঁ, ঠাকুরপোই আসেন একটার সময়—কনট্রাক্টারি করেন কিনা। ঝিকে বিদায় করে ওঁর ভাত আগলে বসে থাকি। উনি এসে পৌঁছুলে তবে নিশ্চিন্তি।

পাশে নিচু একটা তক্তাপোশের উপর একটি মাস দশেকের শিশু, ট্যাঁ-ট্যাঁ করছে—সেই লোহার কারখানাটা মনে পড়ে—তেমনি ক্লিষ্ট, তেমনি অস্থির।

আদর করে ওকে ছুঁতে যাচ্ছি একটু, মেয়েটি বললে—ওর ভারি অসুখ।

বললাম—কি অসুখ ওর?

—দেখুন না চেয়ে।

শিশুর দিকে তাকিয়ে যা না বুঝি তার চেয়ে ঢের বেশি বুঝি ওর দিকে চেয়ে—দুটি

চোখে বেদনার কি নির্মল আভা! তারপর আরেকবার শিশুর পানে তাকাই—একটা ঝড়ে-পড়া পালক-খসা শালিকের ছা—মাথার চুল উঠে যাচ্ছে, চোখের উপর একটা ব্যাণ্ডেজ—দাঁতের মাড়িতে ঘা—যে-শিশু আকাশের জ্যোৎস্না হয়ে হাসে, যে-শিশুর কামনা সুগন্ধের মতো নববধূর সমস্ত যৌবন ঢেকে মেখে রাখে—

বললাম—কি নাম এর ?

—মুসোলিনি। এর দুই দাদা ছিল—লেনিন আর ম্যাকস্থইনি। বিদায় নিয়েছে।

—লেনিন কিসে গেল ?

—তড়কায়। জন্মের মাস দুয়েক পরে হঠাৎ একদিন বিষের মতো নীল হয়ে।

—আর ম্যাকস্থইনি ?

—প্রায় প্রায়োপবেশনেই।

পরে একটু থেমে বললে—আর একটি যখন হবে, নাম রাখব আবদুল ক্রিম। এরা সব যাবে, শুধু ভাগ্যের লোহার দ্বারে কপাল ঠুকে—ওদের মাকে ঠাট্টা করে—আর, আমার নাম কি জানেন ?

—কি ?

—বনজ্যোৎস্না। প্রাকৃতে বলে—বনজ্যোষিনী।

তাই। আমি হলে কক্‌খনো ওকে জ্যোৎস্না বলে ডাকতাম না—বন বলে ডাকতাম। ওর মধ্যে যেন আমি অরণ্যের ব্যাকুল মর্মর শুনতে পাচ্ছি—অরণ্যের সেই ব্যাকুল ও বিস্তৃত স্তব্ধতা।

দরজায় কে কড়া নাড়লে। বন বললে—ঠাকুরপো এসেছেন। কড়া-নাড়া শুনেই চিনতে পারি।

চলে যায়—আঁচলটা তেমনি লুটোতে-লুটোতে চলে।

একটা নীল খাম নিয়ে বিনোদ লাফালাফি লাগিয়েছে—ওর বিজ্ঞাপনের জবাব এসেছে একটা। বিনোদ খামটা না-খুলেই খুশি, বলে—কোনো মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারিই হয়তো। কিম্বা কোনো সাহেব হয়তো বাংলা পড়ানোর জন্যে মাস্টার চায়। কেয়াবাৎ!

অখিলবাবু ঈর্ষায় ওর দিকে একটু তাকায়। বলে—বাংলার মাস্টারকে আর কত মাইনেই বা দেবে ? ত্রিশ টাকার বেশি ?

—তিনশোও হতে পারে। বিনোদ বলে।

বিকাশ বলে—দেখিস, তোর পারুলের শুভবিবাহের নিমন্ত্রণপত্র না হলে হয়।

বিনোদ একটু নেড়েচেড়ে অনেক দেরি করে খামটা খুলে ফেললে। পড়েই সারা মুখ যেন এতটুকু হয়ে গেল। সবাই উৎসুক হয়ে তাকালাম—ব্যাপার কি?

কিছুই না তেমন—আরেকটা ইংরিজি দৈনিক কাগজ বিনোদকে জানিয়েছে যে, তাদের কাগজে বিজ্ঞাপনের দর ঢের কম—এক ইঞ্চি মোটে দশ আনা, তিন ইঞ্চি দেড়টাকা—সেখানে বিজ্ঞাপন দিয়ে পরীক্ষা করে দেখলে পারে।

বিনোদ তারপর ঘরের মধ্যে খানিকক্ষণ অস্থির হয়ে হাঁটে, আর দাড়ি হাতায়। পরে ফের বিকাশের কাছে হাত পেতে বলে—আমাকে আর দুটো টাকা দে।

—কেন? এই নতুন কাগজটায় আরেকটা বিজ্ঞাপন ছাড়বি নাকি?

—না। ছিপ, সুতো আর বঁড়শি কিনব। ঐ ডোবার ধারে বসে-বসে মাছ ধরব এবার।

বিনোদ খেজুর গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে পচা ডোবার নীলচে জলে ছিপ ফেলে চুপ করে ঠায় বসে থাকে—আর চোখ বুজে-বুজে বুঝি পারুলের কথাই ভাবে—সেই জ্যৈষ্ঠের রোদে ষোলো মাইল পথ পায়ে হেঁটে পাড়ি দেবার কথা—পারুলের সঙ্গে একটি বার দেখাও হল না।

বিকাশ খেপায়। বলে—একটা পুঁটিমাছও আটকাতে পারলি না এতদিনে? তোর পারুলকে একটা প্রেমপত্র পাঠা না, গয়না বেচে কিছু টাকা পাঠিয়ে দিক।

বিনোদ ছিপ ছেড়ে দিলে। এবারে বসে-বসে টিনের তার দিয়ে নানান রকম আজগুবি জন্তু বানায়: টিয়া, আরশুলা, মোষ, পাখির খাঁচা বানায়, দালান, ইজিচেয়ার। বলে—এই খাঁচার থেকে পাখিটাকে বার করতে পারিস তো দাড়িগুলো কামিয়ে ফেলব এবার।

বহু কসরত করেও কেউ পারি না। ও কিন্তু হঠাৎ একটা কায়দা করে খাঁচার দরজা দুটো খুলে পাখিটাকে বার করে দিলে। মন্দ কৌশল তো নয়—খুব সহজ, কিন্তু কারুর মাথায় আসে না।

একদিন দেখলাম বিনোদকে—গায়ে সেই রঙ-চটা আলখাল্লাটা, মাথায় জটা বাঁধা, দাড়িগুলোতে উকুন পড়েছে—রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে সেই তারের খেলনাগুলো বিক্রি করছে। ইস্কুলের ছেলেরা চারদিক ছেঁকে ধরেছে—পয়সা দিয়ে কিনছেও, বাড়ি গিয়ে পড়শী বন্ধু ও বোনদের তাক লাগিয়ে দেবে।

সমস্ত রাস্তার বিপুল জনতার এক কোণে ও একটুও খাপ খায় না, ছন্দপতন হয়েছে,

কিন্তু রাত্রে ট্যাঁকে পয়সা আর গাঁজা নিয়ে যখন মেস-এ ফিরে আসে—তখন একটা কবিতা আপনা থেকেই দুলে ওঠে যেন।

তবু বিনোদ বলে, কিছুই হয় না নাকি ওতে। বলে—আবার সয়ে পড়ব। কপালে আছেই দুঃখ। দাড়িগুলিও আরো কতকটা বেড়েছে, ভালোই হল।

বিকাশ বলে—খা, খা, আরো খা খানিকটা প্রেমের কুইনিন। এবারে ঠেলা বোঝ।

বিনোদের বিষণ্ন অথচ সুকোমল মুখ দেখে মনে হয়—কি মনে হয় জানি না—শুধু ওর সজল চোখ দুটি দেখলে কি যেন মনে হয়—

প্রবোধের বাড়ির দরজায় লণ্ঠনটা যেন আমারই জন্য জ্বালানো—লণ্ঠনটার দিকে চেয়ে মনে হল। মনে হল, ওকে রাত্রে একবার দেখে আসি!

সব নিঝুম লাগছে—এরই মধ্যে ঘুমিয়ে গেছে নাকি সব? সদর দরজা খোলাই ছিল—ঝি এখনো যায়নি। রান্নাঘর ধোয়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছি। যাবার সময় লণ্ঠনটা নিবিয়ে দিয়ে যাবে।

বৈঠকখানা ঘরে আলো দেখা যাচ্ছে। প্রবোধের মুখেই 'ল-পয়েন্ট' সম্বন্ধে খানিকক্ষণ বক্তৃতা শুনে আসা যাক। ঢুকে পড়লাম।

প্রবোধ নয়, বনজ্যোৎস্না। লণ্ঠনের আলোয় টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে কি লিখছে। ওর চারদিকে তেমনি একটি নিস্তব্ধ উপেক্ষা—মধুর ঔদাসীন্য। লেখাটা হাত দিয়ে ঢেকে শুধু একটু হাসল। কিন্তু আমি তো ওর লেখা দেখতে আসিনি।

বললাম—কি লিখছেন?

—শুনলে হাসবেন, আমাকে বোকা ভাববেন।

—না, না।

—হ্যামলেটকে একটা চিঠি লিখছি।

—হ্যামলেটকে?

—হাঁ, ঐ তো ভীষণ আশ্চর্য হয়ে গেলেন। কাল কীটসের ফ্যানিকে একটা চিঠি লিখেছি—পারি তো ডন জুয়ানকেও লিখতে হবে একটা!

ওর মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকাই—বিকাশ হলে হয়তো বলত ন্যাকামি—কিন্তু ওর ঐ অমন করে বসা থেকে শুরু করে অমন করে কথা কওয়াটি পর্যন্ত মেঘদূতের মতো করুণ লাগে! মনে হয়, বিনোদের মুখের সঙ্গে এর মুখের কোথায় যেন একটা মিল আছে।

বললে—এই দেখুন কালি-কলম দিয়ে হ্যামলেটের একটা ছবি এঁকেছি।

কিছুই না—ইজি-চেয়ারে শুয়ে একটি লোক সিগারেট টানছে।

তারপর হঠাৎ উঠে ঘরের মধ্যে চলে যায়। বলে—বসুন, খোকাটা উঠেছে, আর ওঁর মশারিটা ফেলে দিয়ে আসি।

খানিক বাদে আবার আসে—এবার আর আঁচলটা লুটোয় না। বললে—লেনিন যখন মরেছিল তখন খুব কেঁদেছিলাম, ম্যাকস্থইনি যখন মরে তখনো খুব কষ্ট হয়েছিল—বেচারার কি যে হল আটাশ দিন ধরে কিছুই মুখে নিলে না, বুকের দুধ পর্যন্ত না—যেন কি অভিমান! আর এ যখন মরবে, মনে হচ্ছে, একটুও কাঁদতে পারব না। কাঁদতে ভুলে গেছি।

আবার চলে যায়, ঠাকুরপোর জন্যে ভাত-চাপা দিয়ে রেখে আসে। নেবু, জল, মিছরি বিছানার কাছে টুলের উপর রাখে, বিছানাটা পাতে—চটি-জুতো পর্যন্ত এগিয়ে রেখে দেয়, পা ধুয়ে এসে পরবে।

আবার এসে বসে, বলে—যে-ঘট ভরলও না, ভাঙলও না, তাকে নিয়ে কি করব? ভাসিয়ে দিয়েছি।

জিগগেস করলে—এত রাতে এখনো বাড়ি ফেরেননি?

—বাড়ি নেই বলে।

ও হঠাৎ ম্লান স্বরে বললে—দেখুন, আমার খালি জানতে ইচ্ছে করে—কত কথা। কিন্তু যত জানব, ততই তো দুঃখ। যাই, কালকের তরকারিগুলি কুটে রাখি গে।

ঝি চলে গেছে। বাইরের লণ্ঠনটা নেবানো। ও আবার এসে বসে। দু-জনেই চুপ করে থাকি। পাশের ঘর থেকে প্রবোধের জোরে নিশ্বাস ফেলার শব্দ শুনি। তারপর কোনো কথা না বলেই আস্তে-আস্তে বেরিয়ে যাই। ও আস্তে-আস্তে এসে দরজাটা বন্ধ করে দেয়। আবার ওর ঠাকুরপো যখন আসবে, উঠে খুলে দেবে।

তাশ খেলা হচ্ছে।

বিকাশ বললে—ইস্কাবনের বিবিটা এবারে অখিলদার কাঁধেই চাপিয়ে দিতে হবে।

অখিলবাবু বললেন—চারটেই দাও না কেন, নারাজ নই।

রাতের খাওয়া-দাওয়া চুকে গেছে—মেসের ও-পাড়া নাক ডাকাচ্ছে—নিঃসাড়। বারান্দায় কার পায়ের হালকা আওয়াজ পাওয়া গেল। বললাম—ঝি এখনো বাড়ি যায়নি?

দরজার কাছে কে এসে বললে—বিকাশবাবু আছেন?

সুদূর থেকে যেন কথা এল—ঘুমে-পাওয়া হাওয়ার ককানির মতো।

দেহ তো নয় দীপশিখা! জ্বলছে অথচ বাতাসে কাঁপছে। এখুনি যেন নিবে যাবে।

বিকাশের গলা দিয়ে বেরুল—কে, বেণু? এস, বোসো এসে।

যেন এতে এতটুকু বিস্মিত হবার নেই। বেণু আসবে এ-যেন ওর জানা কথা। যেমন জানা কথা সকালবেলা গয়লা আসবে, বিকেলে আপিস-ফেরত অখিলবাবু আসবেন।

আশ্চর্য!

আমরা সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলাম।

মেয়েটি মাথা হেঁট করে রেখে বললে—যদি দয়া করে একটা কথা শোনো—ভারি বিপদে পড়ে এসেছি।

বিকাশ রূঢ় গলায় বললে—এখানেই বল, এরা শুনলে কিছু ক্ষতি হবে না।

বললাম—আমরা চললাম অখিলদার ঘরে।

বিকাশ বললে—না।—বল, কি চাই?

মেয়েটি সংকোচ করে যেন কথা কইতে পারছে না, ওর চোখে জল এসে পড়েছে, গলাটা বুজে আসছে। থেমে-থেমে বললে—ওঁর খুব অসুখ, অবস্থা ভালো নয়—তুমি যদি একটিবার আমার সঙ্গে আসো।

মনে হচ্ছে আমরা যদি এখানে না থাকতাম, ও নিশ্চয়ই বিকাশের পা দুটো জড়িয়ে ধরত। যেন ঐ পায়ে কত অপরাধ করেছে—

বিকাশ নির্দয়ের মতো বললে—কার? তোমার স্বামীর? কেন, ছশো টাকা যার মাইনে—মোটরকার, তেতলা বাড়ি—তার কি আর ডাক্তারের অভাব হয়? আমি তো ডাক্তার নই।

—কিন্তু তুমি সেবার আমার অসুখের সময় কি প্রাণপণ সেবা করে আমাকে বাঁচিয়ে তুলেছিলে। তেমনি করে যদি ওঁকে বাঁচাও—

যেন ভিক্ষা চাইছে। বিকাশ যেন বিধাতা।

বিকাশ ব্যঙ্গ করে বললে—তোমার স্বামীকে বাঁচিয়ে আমার লাভ?

কি নিষ্ঠুর এই বিকাশটা! ওর বুকটা যেন আগাগোড়া ইস্পাত দিয়ে তৈরি। বেণু এবার সত্যিই কেঁদে ফেললে। মনে হল, এখুনিই যেন বিকাশের পায়ের তলায় মাথা লুটিয়ে দিয়ে কপাল কুটে মরবে। কাঁদতে-কাঁদতে অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে একলা নেমে চলে গেল।

বিকাশ বারান্দায় উঠে এল। রেলিঙটায় ভর দিয়ে দাঁড়াল একটু। বললাম—একি করলি বিকাশ? শিগগির চল তুই—

বিকাশ বললে—কেন, আমি ভাড়াটে নার্স নাকি যে যার-তার অসুখ হলেই ছুটে যেতে হবে—রাত জেগে?

—যার-তার অসুখে নাই বা গেলি। এ যে বেণুর স্বামীর—

—ককৃখনো না।—এমন ভাবে হাত ঘুরাল যে লেগে কাঠের রেলিঙটা ঝেঁকে উঠল।

—তবে শিগগির আমাকে ঠিকানা দে—আমি যাচ্ছি। একলা পথে—

—নম্বর জানি না, তবে বাড়িটা চিনি। নাম 'বেণুকুঞ্জ'।

পথ চিনে-চিনে যখন এলাম, রাস্তায় মোটরের ভিড় লেগে গেছে। ভিতর থেকে কান্নার তুমুল রোল উঠেছে। বুঝলাম—নেই; হয়ে গেছে। ভিতরে ঢুকে গেলাম। মৃতের মন্দিরে কারুরই জন্যে নিষেধ নেই। সবাই ভাবলে—আমি বেণুর স্বামীর বন্ধু, হয়তো বা বেণুরই।

বেণুর সে কি কান্না! অনেকদিন এমন কান্না শুনিনি। শুধু শুনেছিলাম পদ্মার সেই অকূল বন্যাস্রোত—শুনেছিলাম উন্মুক্ত প্রান্তরের পারে সেই উদ্দাম বৃষ্টিজলধারা। বুকটা জুড়োয়।

সমস্ত সান্ত্বনা, সহানুভূতি, উপদেশ—গীতা, উপনিষৎ—সব ভাসিয়ে ছারখার করে দিচ্ছে। প্রলয়ের কালে সাগর যেমন কাঁদে। মা'র গলা জড়িয়ে একটি ছোট কৃশ সুশ্রী ছেলে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদে—মা কাঁদছে বলে।

সবাইর সঙ্গে শ্মশানে গেলাম। ফিরে এসে বাকি রাতটা সে-বাড়িতেই কাটালাম। আর জেগে খালি বেণুর কান্না শুনলাম।

শুধু প্রচুর নয়, অবিশ্রান্ত!

সকালবেলা পা যেন আর চলছে না—বিকাশকে খবর দিতে হবে। হয়তো নিষ্ঠুরের মতো বলবে—ভাবনা কি? স্বামীর লাইফ ইন্‌সিওরেন্সে দেদার টাকা আছে—প্রকাণ্ড বাড়ি। দেখিস, ঠিক মোটা হয়ে যাবে এবার নিরামিষ খেয়ে-খেয়ে। তারপর কাশী যাবে।

রাস্তায়-রাস্তায় করতাল বাজিয়ে কে এক বুড়ো হরিনাম করে ভিক্ষা করছে—কাঁধে একটা ঝুলি।

চমকে উঠি—আরে কবরেজমশাই যে! যিনি আমাদের মেস-এর নিচের তলায় পিত্তশূলের বড়ি বেচেন।

ফোকলা মাড়ি দুটো বার করে কবরেজমশাই বললেন—আর কটা দিনই বা আছি বাবা, হরির নাম করে যাই।

ট্রাম কণ্ডাক্টারের সঙ্গে চেনা ছিল—ডাকলে। উঠে বসলাম।

কতদূর এগিয়েছি, পিছন থেকে কে বললে—যদি কিছু দেন। চেয়ে দেখি—লোকটার হাতে একটা জাপানী-বাক্স—চারদিক আটকানো পেরেক দিয়ে, মাঝখানে পয়সা ফেলবার ফুটো। ধারে আঠা দিয়ে একটা কাগজ মারা—তাতে ইংরিজিতে লেখা : 'গরিব ছাত্রদের ফণ্ড।'

মাথার চুলগুলি সব কেটে ফেলেছে—দাড়ি-গোঁফ কামানো, তেমনি খালি পা, পরনে ও গায়ে ছেঁড়া কাপড় জামা—কোত্থেকে যোগাড় করেছে কে জানে—বিনোদ এ আরেকটা মন্দ ফিকির করেনি। পকেটে যা কয়েকটা পয়সা ছিল বাক্সে ফেলে দিলাম। আরও অনেকে দিলে।

এর পর বিনোদের বেজায় অসুখ করে বসল—ভেদ বমি, জ্বর, সব কিছু। দুদিনেই যাবার দশা।

বললাম—তোমার পারুলকে একটা খবর পাঠাই। ও আসুক।

ও আমার হাতটা কপালের উপর রেখে বললে—বাড়িতে একটা তার আর কিছু টাকা পাঠিয়ে দিতে বল বিকাশকে।—আমার মা আর বউ চলে আসুক।

—বউ ?

—হ্যাঁ। নাম নগবালা।

ওর মা আর বউ এল দুদিন বাদেই। অবস্থা বেশ সঙিন হয়ে আসছে। খাওয়া নেই, ঘুম নেই, আপিস নেই—অখিলবাবুরও না।

ওর মা খালি কাঁদে, কিন্তু ওর বউ একটা টুঁ শব্দ পর্যন্ত করে না। খালি চুপ করে বসে থাকে।

বিকাশ বলে—আমার হাত থেকে কোনো রুগীকেই যম ছিনিয়ে নিতে পারেনি। এবার বোধ হয় প্রথম নেবে। বোধ হয় বেণুর অভিশাপ লেগেছে।

সকালবেলা আশ্চর্য রকম অবস্থার পরিবর্তন দেখা গেল। বিনোদ জ্ঞান পেয়ে ওর মা আর বউকে চিনতে পারলে।

একলা পেয়ে বিকাশকে বললাম—এ কেমনতর বউ, ভাই ? মরতে চলেছে দেখে একটুও কাঁদলে না, ভালোর দিকে দেখে একটু খুশিও হল না। একটি কথা কইল না পর্যন্ত !

বিকাশ বললে—ও যে বোবা।

—বোবা? বলিস কি?

—হ্যাঁ।

—তবে পারুল?

—দূর বোকা। তাও বুঝি বুঝতে পারিসনি?

পারুল বলে কেউ নেই। তাকে ও মনে-মনে রচনা করেছে। তাই তো পারুল বিয়ে করেনি। তাই তো ওর সঙ্গে মিলনের জন্যে দুঃখের তপস্যা করছে।

প্রবোধের বাড়ির লণ্ঠনটা—আবার।

বৈঠকখানায় ঢুকলাম, বনজ্যোৎস্না টেবিলের কাছে চুপচাপ বসে আছে। কি লিখবে তাই ভাবছে যেন। আঁচলটা তেমনি পায়ের কাছে লুটোনো।

বললাম—মুসোলিনি কেমন আছে?

বনজ্যোৎস্না লেখার থেকে চোখ না তুলেই বললে—এইমাত্র ওঁরা ওকে শ্মশানে নিয়ে গেলেন। ভালোই আছে।

মৈত্রেয়ী

তারপর ইউনিভার্সিটিতে এসে গেলাম। ঠিক পড়তে কি ?—না কোনো কাজ ছিল না বলে ?

মনে হয়, ওর সঙ্গে দেখা হবার যেন দারুণ দরকার ছিল। নিরালা কোণে লাস্ট বেঞ্চিতে দেখা। যে মোটা বইটা নিবিষ্টমনে পড়ছে সেটা সাহিত্যিক জমাদারদের মতে নোংরা। আমার হাতের উপর ওর শির-ওঠা শীর্ণ হাতখানি তুলে দিয়ে বললে

—কত জ্বর আছে বলতে পারেন ?

—ঐ বিতিকিচ্ছি বইটা পড়ার দরুন হয়তো। চলুন বাইরে—

ওঁচা প্রোফেসার তার ওঁচানো গোঁফ ফুলিয়ে তাকায় একবার। মৈত্রেয়ীও তাকায় হয়তো। ঠিক তাকানো নয়, একটু যেন সজাগ হয়ে ওঠা। লাস্ট বেঞ্চিটা গরিব, কানা হয়ে গেছে।

আমরা বেরিয়ে যাই।

বলি—আপনাকে আমি দেখেছি আগে, ঠিক ভালো জায়গায় নয়।

সৌম্য একটু হাসে, বলে—অভিযোগ করছেন না নিশ্চয়ই। কেননা—

—কেননা আমিও সেই পাড়ারই বাসিন্দা। এত সস্তায় আর কোথাও ঘর পেলাম না বলে।

—কি করে চালান ?

—আগে এক জায়গায় টিউশনি করতাম, সংস্কৃত। ইস্কুলের ছেলে। তিন মাস যায়, মাইনে দেবার নাম নেই—বলে, পুজোটা এসে গেলেই পুরোদমে তিন মাসেরটাই পাওয়া যাবে। তাও যখন পেরিয়ে যাচ্ছে, তখন কোমরে কাপড় কেছে বসে গেলাম ভুল শেখাতে। এতদিন ধরে যা সব শিখিয়েছিলাম, সব বেমালুম বাতিল করে আঠারো দিনে এইসা ভুল শিখিয়ে দিয়ে এসেছি ভাই, যে বেচারা ছেলে ছমাসেও তা ভুলতে পারবে না। এখন একটা পানের দোকান খুলেছি। চলুন না আমার দোকানে। পান খান ?

—প্রচুর। শুধু খাই না, করিও।

পরে বলি, আজ্ঞে—আগে মাঝি ছিলাম। একটা ডিঙি ছিল—স্রোতের শ্যাওলা। ফুরফুরে ফড়িং।

সৌম্য হঠাৎ কৌতূহলী হয়ে বললে—তার আগে?

—রাস্তা খুঁড়েছি, বস্তা টেনেছি, মোটরে-মোটরে টক্কর লাগিয়েছি, চাকরির উমেদার হয়ে পথে জিরিয়ে-জিরিয়ে পায়চারি করেছি। একবার লাঙলও ধরেছিলাম বাগিয়ে।

—তবু পেলেন না তো তাকে?

—কাকে?

—নোফালিস্-এর নীলফুল, বোয়ার্-এর শ্বেতহংস। চলুন, পকেটে সাড়ে-তিনটে টাকা আছে—একটা বই কিনি গে। টাকা তিনের মধ্যে—রাতের খাওয়ার জন্যে গণ্ডা আষ্টেক না রাখলেই নয়। সমস্ত দিনটা কিছু যায়নি পেটে। কেমনতর যেন। সোজা চলতে গিয়ে ডান পাশে হেলে, পায়ের চটিটা পিছনে ফেলে এসেছে, সামনে অনেকদূর হেঁটে এসে তবে টের পায়, সোজা রাস্তায় না গিয়ে ঘুর-পথে বেঁকে-বেঁকে চলে—কোথাও যেন যাবার নেই—বুকের উপর জামার সমস্তগুলি বোতাম খুলে রাখে।

চেনা দোকানদার। মুখ খুশি করে বলে ওঠে—আজকের ডাকে এই বইটা এল। আপনার জন্য রেখে দিয়েছি—

প্রিয়ার লতানো পেলব হাতখানি যেমন করে ছোঁয়, নামিয়ে রেখে দিতে ইচ্ছে করে না। দুঃখী যেমন মদের বোতলটা বুকের কাছে টেনে নেয়।—সৌম্যর দুই চোখ সুখে ফুলে উঠল।

পকেটটা উজাড় করে ঢেলে দিয়ে বললে—বাকি দামটা দু-একদিনেই দিয়ে দেবার চেষ্টা করব। আজ আর নেই।

দোকানদার হয়তো একটু আপত্তি করে। আমি দিয়ে দিই বাকিটা।

সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার থেকে কোন পুরোনো চেনা বন্ধু যেন ওকে একটি চিঠি লিখে পাঠিয়েছে। তেপান্তরের মাঠের পারের কার যেন স্নেহস্পর্শ—বহুদূরের কোন তুষারাবৃত আকাশের সুস্নিগ্ধ অভিবাদন! কার যেন করুণ একটি দীর্ঘশ্বাস—ওর কাছে সহানুভূতি চায়—অতি দূর থেকে কে যেন ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকে।

পথে নেমে বলি—রাত্রে কি খাবেন তাহলে?

ও বলে—আজ রাত্রে বিধাতা যেমন অন্ধকারে তাঁর হৃদয় মেলে দেবেন তারার অক্ষরে, তেমনি আমার এই বন্ধু তার হৃদয় মেলে ধরবে আমার আতুর চোখের সামনে। হয়তো বা আলো নিবিয়ে দেব। হয়তো বা আর পড়তে পারব না। কিন্তু

সমস্ত প্রাণে কি প্রগাঢ় উত্তাপ, কি অকূল পরিচয়, কি সুদূর ভালোবাসা! কত রাত আমার এমনি কেটে গেছে।

আবার সেই চলা, এঁকেবেঁকে, তেরছা টিকটিকির মতো, পথের কুকুরকে অকারণে একটা লাথি মারে, ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে কোনো দিকে লক্ষ্য না করে ছুঁড়ে মারে, ইচ্ছে করে জামাটা টেনে একটু ছিঁড়ে দেয়। আমাকে হঠাৎ বলে—তুমি ভারি দরাজ, দিলদার। তুমি আমার এই খুশখতের পিওন। বলে, আমার কাঁধে ওর লিকলিকে বাহুটি তুলে দেয়।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। এ যেন ওর বিবাহ-গোধূলি! ওর হাতের সবুজ রঙের বইটি যেন ঐ সন্ধ্যাতারার মতোই আপন, অপরূপ। এ ওর বই নয়; যেন বউ! সোনা বউ!

আমার পানের দোকানে ওকে নিয়ে এলাম।

পুতলিকে বললাম—এক নতুন বাবু ধরে এনেছি, দেখ, এবার পছন্দ হচ্ছে? সেই পুতলি—একটা চোখ কানা, আরেকটায় সেই আগেকার তন্দ্রালুতা। সেই চোখে অস্ফুট ভর্ৎসনা পুরে বললে—কলেজ তো কখন কাবার হয়ে গেছে, এত দেরি হল যে? আমি কখন থেকে খাবার গুছিয়ে বসে আছি।

বললাম—মাতব্বরের মতো বকিসনি আর। দুটো থালায় দিস।

ছোট্ট পানের দোকান—কলেজের সামনেই। কলেজ থেকে পাড়াটা অনেক দূর, তাই পুতলি দুপুরে খাবার তৈরি করে এনে দোকানে রেখে দেয়। গিলে নিয়ে ঢিলে মেজাজটা বেশ শরিফ করে সফর শুরু করি—এই বরাদ্দ।

ভুল করে আমাদের গোঁফওলা প্রোফেসারটি—তাঁর ও-পাড়ায় নিয়মিতই গতিবিধি আছে—পুতলির দোরে টোকা মেরেছিল একদিন। ধুসো গোঁফ দেখে পুতলি ওর খসা খ্যাংরাটা নিয়েই তেড়ে এসেছিল।

প্রোফেসারকে একটা নমস্কার ঠুকে দিয়েছিলাম।

মাচার উপর পুতলি আমাদের জন্যে একটু জায়গা করে দেয়। পা ঝুলিয়ে বসি দুজনে। বললাম—সিংহাসনে বসে বেড়ে কারবার করছিস! বেশ! কজনের মুখ পুড়লি?

থালাটা থেকে তুলে সৌম্য একটু খায় কি না-খায়, নিবন্ত দিনের আলোয় বইটার উপর বুক দিয়ে রয়েছে—মাঝখানটা খোলা, যেন বইয়ের হৃৎপিণ্ডের উপর কান পেতে আছে।

বলি—তখন আমি রাজমিস্ত্রির কাজ করি, সৌম্য। বড়লোকের ছেলে নতুন বিয়ে করেছে—তাই তার প্রেমগুঞ্জনের জন্যে দোতলার ছাদে চিলে-কোঠা উঠবে। আমরা বাঁশ বেঁধে কাঁধে বালি-সুরকির ঝুড়ি নিয়ে প্রায় একুশজন লেগে গেছি। যে-দরজা দিয়ে দক্ষিণ থেকে হাওয়া এসে নববধূর খোঁপা এলো করে দেবে—সে দরজা আমরাই বানালাম। পুবের জানলাটা এমনি করে বসালাম, যাতে শুয়ে-শুয়েই বর-বধূ ভোরের ডুবন্ত শুকতারাটি দেখতে পায়, ছোট্ট একটা ঘুলঘুলি করে দিলাম উত্তরের দেয়ালে। ভীতু দুটি চোখ রেখে লাজুক বউ ওর স্বামীকে দেখবে, কখন ঘরে ফিরে আসে—বুকের ঘাম ঢেলে-ঢেলে শ্বেত পাথরের মেঝে শীতলপাটির মতো শীতল করে দিলাম।—তোর লখিয়াকে মনে আছে, পুতলি?

পানের উপর চুনের কাঠিটা বুলোতে-বুলোতে পুতলি বলে—তা নেই আবার!

—লখিয়ার তখন সবে বিয়ে হয়েছে, তাই ওর প্রাণ সবচেয়ে টাটকা। মেঝের ওপর এনে ইঁট গাদা করে, আর ফিসফিসিয়ে সখী সুখীকে বলে—টমরুর চুমুর মতো মিষ্টি কি ওদেরও? পরে লখিয়ার কি হয়েছিল, জানো সৌম্য? একটা আধ-মনি ইঁটের পাঁজা তুলে আনতে গিয়ে ঘামে ভেজা বাঁশ পিছলে সটান মাটিতে পড়ে গেল—আর উঠল না। টমরুর চোখের জলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ওর মাথা ফেটে রক্ত ছুটল - ওর সিঁথির সিঁদুরের মতোই ডগডগে।—সেই, কাজে ইস্তফা দিয়ে এলাম। ইচ্ছে হচ্ছিল খানিকটা সদ্য রক্ত মেঝেটার ওপর মেখে দিয়ে আসি। ও তো নববধূটির এক হিসেবে সখী, ও-ও নববধূ। বড়লোকের ঘরের নতুন বউটি যেন এই ছোট-লোকের ঘরের মজুর-বউটির জন্যে একটু অন্তত চোখের জল ফেলে। গামছা দিয়ে গায়ের বালি মুছে ফেলে রাস্তায় নেমেই পুতলির সঙ্গে দেখা। কানা পুতলি। আমার হাতটা ধরে হিড়হিড় করে টানতে-টানতে বললে—এতদিন কোথায় ছিলি? আমি তোর জন্যে এ দুবছর ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরেছি—কলকাতার কোনো গলি, কোনো কারখানা বাকি রাখিনি।—এমন কথা কোনোদিন শুনেছ, সৌম্য? টমরুর ঐ বুক-ফাটা আর্তনাদের মতোই কি বিস্ময়কর নয়?

সৌম্যর এসব ব্যাপারে বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই, কৌতূহল নেই। কোলের কাছে যেটুকুন গ্যাসের আলো পড়েছে তাইতেই ও দূর নরওয়ের সুনীল ফেনিল জলতরঙ্গের স্বপ্ন দেখছে—আফ্রিকার সেই গৈরিক তাপসী বন্ধ্যা মাটির স্বপ্ন—সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত নির্যাতিত বন্দী-বীরের—

পুতলি বললে - তা নয় তো কি? মনে প্রাণে তোমাকে চেয়েছিলাম বলেই তো একদিন হঠাৎ দেখা পেয়ে গেলাম। সেদিন টমরুর কান্না আমার কানেও সেঁধোয়নি।

সেবার বারো বচ্ছর পর গাঁয়ে গিয়ে দেখি পলাশ-পুকুরের পাড়ে এক পিটুলি গাছ দাঁড়িয়েছে—সবাই গোড়ায় তেল সিঁদুর মাখে, ডাব নারকেল দেয়—বলে কিনা, যা-কিছু মনে করেই ওর ডালে সুতো বেঁধে দেবে, তা যাবে অব্যর্থ ফলে। কাপড়ের সুতো ছিঁড়ে তক্ষুনি বেঁধে দিলাম, চট করে মনে পড়ে গেল, হে দেবতা, সেই বাবুটির যেন আবার দেখা পাই—যে আমাকে গোলাপী জামা কিনে দিয়েছিল। সেই জামা আজও আমার বাক্সে আছে—ধুইনি।

হাসতে পারি না, ঠাট্টা করতেও মন ওঠে না। ও-ই আমার পড়া চালায়, তারই জন্য বোধ হয়।

বলে—এবার আর পায়ের জুতো হয়ে নয় যে, ইচ্ছে করে ফিতে খুলে পালাবে। পায়ের ধুলো হয়ে লেগে থাকব।

ধুলো ধুয়ে ফেলতে কতক্ষণ ? কিন্তু বলি না।

বললাম—ঘরে যাবে না, সৌম্য ?

ও চমকে উঠল।—রাত হয়ে গেল ঢের। একটা মোমবাতি কিনে দাও ভাই। তিনটে, ঘুম তো শিগগির আসবে না। চল আমার ঘরে।

ঘর তো নয়, ছোটখাটো পৃথিবী ! তেমনি এঁদো, তেমনি ভ্যাপসা।

হতচ্ছাড়া ঘরটা—দেয়ালে নোনা ধরেছে, চারদিকে অতিকায় কতগুলি আলমারি —কাঁচগুলি প্রায়ই সব ভাঙা, সারি-সারি রাশি-রাশি বই সাজানো এলোমেলো করে —মেঝের উপর এক গাদা বই টাল করে ফেলা—হিজি-বিজি। কোণে ক্যানভাসের একটা ইজি-চেয়ার, চটটা ছিঁড়ে গেছে, তারই উপর মোটা একটা নীল পেন্সিল।

মোমবাতি জ্বালাই।

ও বললে—রুশিয়ার সঙ্গে ইংলণ্ডের কোলাকুলি দেখ, ফ্রান্সের সঙ্গে ইটালির—আর ভারতবর্ষের সঙ্গে জাপানের, নরওয়ের সঙ্গে স্পেনের কি অপার বন্ধুতা ! অদ্ভুত ! চোখ ফেরানো যায় না—ওর ভাঙা ঘরে অলকানন্দা যেন মুখর, উদ্বেল হয়ে উঠেছে —কান পেতে শুনতে হয়, প্রাণ পেতে।

তাকের বইগুলি অন্তরঙ্গ আত্মীয়ের করতলের মতো সস্নেহে স্পর্শ করে ও বলে বিভোরের মতো—বাঙলার কোণে বসে বিপুল জগতের সঙ্গে কথা কই, টলস্টয় মেঝের ওপর পা ছড়িয়ে বসে-ডষ্টয়ভস্কি কাঁধের ওপর হাত রেখে দাঁড়িয়ে মধুর করে হাসে, রাতের খাবারটুকু গোর্কির সঙ্গে একত্র খাই ; হামসুন্ হাঁটুতে হাঁটু ঠেকিয়ে বসে বন্ধুর মতো গল্প করে যায়—জরো কপালে বোয়ার তার কোমল

হাতখানি বুলিয়ে দেয়—নীল সাগরের কল্লোলিত মায়া তার চোখে, ক্রাঁন্স কতদিন আমার এই ঘরে বসে জিরিয়ে গেছে। সেদিন তো কালো ঝড়ো মেঘের মতো ব্রাউনিঙ এসেছিল—সঙ্গে ব্যারেট, রুখু মাথা, রোগা চোখে অপূর্ব বিষণ্ণতা! ঘরে ঢুকেই বললে—আমাদের একটু জায়গা দিতে পার এখানে? কত দূর থেকে পালিয়ে এসেছি। তিনজনে মেঝের ওপর বসে কত গল্প করলাম—আমার ঘর যেন ইটালি! সব স্বপ্ন!

পরে চেয়ারের উপর গা এলিয়ে দিয়ে বলে—জ্বরটা জোরেই এল কিন্তু। মেঝের ওপর কোনো রকমে শোবার ব্যবস্থা করে দেবে ভাই? আলোটা শিয়রেই জ্বলুক।

বলি—কাদের বাড়ি এ? কি করে চলে তোমার?

কতগুলি বইয়ের উপর মাথাটা রেখে বলে—বাড়ি অন্যের, ভাড়া নিয়েছি এ ঘরটা, হোটেলে পয়সা দিয়ে খাই। চলে কি করে? দিদি মাসে ত্রিশ টাকা পাঠান—তাইতেই—উনত্রিশ টাকার বই কিনি, ধার করি, ফের বই বেচে ধার শুধি।

গোঙাতে-গোঙাতে বলে—বাড়িতে মা আর ছোট বোন, আট পহর মৃত্যুর মুখের দিকে চেয়ে আছে। ঝড়ে আটচালাখানা লোপাট হয়ে গেছে, নিজের জন্যে দুটো ফুটিয়ে নিতে গিয়ে মা দুহাত আর পা পুড়িয়ে ফেলেছে—ছোট বোনটা আজ চিঠি লিখেছে।

থেমে বলে—ফুঁ দিয়ে সব পুঁজিপাটা উড়িয়ে দিয়ে বাবা চলে গেলেন—রেখে তাঁর রক্ষিতা, রোগ আর লালসা। রোগ গচ্ছিত রেখে গেলেন আমার বুকে, আর লালসা দিদির। ছিঃ, তাকে কি সত্যিই লালসা বলে?

—জ্বরটা যদি এসেই গেল, তবে আলোটা নিবিয়ে দিই, এবার ঘুমোও।

—পুড়ে-পুড়ে আপনিই নিবে যাবে। এখনো মাথা তেমন ধরেনি, খানিকক্ষণ পড়া যাবে। এই জানলা দিয়েই হয়তো কোনো ব্যথিত সমুদ্রের নিশ্বাস ভেসে আসবে—কোনো একটি মেঠো মেয়ে তার মিঠে দুই চোখে আমার দিকে চাইবে—অনেকক্ষণ, যতক্ষণ না বাতিটা নেবে। তারপর—

হঠাৎ বললে—ফ্রেঞ্চ শিখছিলাম ভাই। ইচ্ছে করে রাশিয়ান শিখি। এদেশে পাওয়া যায় না মাস্টার?—আমি রাশিয়ায় যাব, বরফের ওপর দিয়ে পায়ে হেঁটে যাব মাইলের পর মাইল, তারপর আমাকে কেউ বাঁচাবে।

যেন ক্ষেপে ওঠে। ক্ষুধার্ত জানোয়ারের মতো চক্ষু ধারাল বিষাক্ত হয়ে ওঠে।

মনে হয়, ও যেন বন্দী প্রমিথিউস।

পচা পাড়া, বেজাত—সামনেই অভিজাত রাস্তা। একই মায়ের পেটের দুই ছেলে-মেয়ের কি অসম্ভব অপরিচয়—যেন কত কালের আখোটি!

এ একেবারে আলাদা রকমের জগৎ। নতুন আইন-কানুন সব—নতুন ধরনের নীতিজ্ঞান, নতুন নমুনার কুসংস্কার। সব কিছুর পরেই উদাসীন, নির্লিপ্ত—বৈরাগী, নিঃসম্বল!

বড় রাস্তা তার সদর দরজা দিয়েই জঞ্জাল ঝেঁটিয়ে জড়ো করে এই চিপা গলিতে জাঁকজমক করে ভর-দুপুরে—আবার এই গলিটা থেকেই জঞ্জাল কুড়িয়ে নিয়ে যায় মাঝরাতে, লুকিয়ে—খিড়কির দোর দিয়ে।

কিন্তু সৌম্য এখানে কেন? ও-ও কি সদাগর, অন্তত ও কি রাজপুত্র নয়? ঐ যে শোভনাঙ্গী মেয়েটি রাত দুটো পর্যন্ত গ্যাসের তলায় বসে থাকে উদাসিনীর মতো—ওকে এসে ও কি জিগগেস করে? হয়তো শুধোয়—তুমি কেমন আছ? দোর পেরিয়ে পর্যন্ত ঘরে ঢোকেনি।

মেয়েটি সারা রাত জেগেই বসে থাকে কোনোদিন। যেন দেয়াশিনী ও।

রাত প্রায় দশটায় ঝাঁপ বুজিয়ে পুতলি আসে। আঁচল দিয়ে বাতাস করতে করতে বলে—ভাত তো গামলার নিচেই ছিল, খেয়ে নিলে পারতে।

—তোর জন্যে বসে ছিলাম।

—বেশ লোক। যা হোক, তুমি খেলে পরে তো আমার খাওয়া। এই নাও আজকের বিক্রি নিয়ে একুশ টাকা হয়েছে। পড়ার যা কিছু দরকারি, এবারে কিনে নাও কতক। হ্যাঁ গো, আজও সেই মুখপোড়া মাস্টারটা এক পয়সার পান কিনবার অজুহাতে ঘেঁষেছিল—বেহায়ার বেহদ্দ। ইচ্ছে হচ্ছিল দিই চুনকাঠিটা গালে বুলিয়ে।

মাচার উপর শুলে পুতলি পায়ের তলায় হাত বুলিয়ে দেয়, কখনো-কখনো লম্বা চুলে, ঘুমিয়ে গেলে ভেজা মুখটায়ও হয়তো।

বলি—এ-রকম ভাবে আর কতদিন, পুতুল?

—তোমার ফুটফুটে জ্যোৎস্নার মতো একটি বউ হবে, আমি তার দাসী হব, সেইদিন।

মাটিতে আঁচল পেতে ঘুমোয় মাদুর বিছিয়ে। বলে—কোনো গয়নাপত্র চাই না—না কোঠাবাড়ি, না-বা নাকের একটা নথ—শুধু তোমার বাঁ পাশে সর্ষে ফুলের মতো টাটকা, টুকটুকে একটি বউ হোক!—পরে আমি না হয় বউ-কথা-কও পাখি হব।

এ যেন খেলো পানওয়ালির কথা নয়।

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠি—ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কে কাঁদে রে, পুতুল?

—ঐ বামুন-দিদি। তিন রাত ঠায় বসে আছে দোর গোড়ায়।
—কে? যার দাওয়ায় সৌম্য একদিন উঠে এসেছিল ভুল করে? কেন?

মৈত্রেয়ীর সঙ্গেও কি দেখা হবার দরকার ছিল? হয়তো নয়! কিন্তু আজকের এই আনমিত হঠাৎ-ঝাপসা-করে-আসা আকাশ দেখে কেন ও মেঘ-রঙের শাড়ি পরে এসেছে?

ও যেন বাঙলার মাটি—শ্যামল, সুশীতল!

নমস্কার করে বসলাম। একেবারে ঘাবড়ে গেল। পাশের দেয়ালের সঙ্গে এমন ভাবে মিশে যেতে লাগল—যেন আমি প্রকৃতিস্থ নই।

ভাগ্যিস জিভের ডগায় কথা জুয়ালো। ঢোক গিলে বললাম—আপনি বনজ্যোৎস্নাকে চেনেন?

ওর চোখ দুটির দিকে যত তাকাই, ততই ওর দৃষ্টি শ্লথ, শীতল হয়ে আসে। বললে —কে বনজ্যোৎস্না? বনজ্যোৎস্না মিত্র?

—হ্যাঁ, মিত্র। আমারও।

—চিনি। কবে দেখা হয়েছিল তার সঙ্গে?—কোথায়?

—পদ্মার ওপরে—নৌকোতে।

আরও বললাম—আপনি ওর ডুমুরের ফুল ছিলেন—ঈদের চাঁদ। বোর্ডিঙে যখন একসঙ্গে থাকতেন তখনকার অনেক গল্পও শুনেছি আপনাদের।

—কেমন আছে ও? এখনো ঐ পদ্মার পারেই আছে? ওর সঙ্গে কিন্তু আমার ভারি দেখা করতে ইচ্ছে করে—যাওয়া যায় না ওখানে? ওর স্বামী নিশ্চয়ই তাড়িয়ে দেবেন না। আমার নৌকোয় বেড়াতে খুব ইচ্ছে করে—মাঝ-নদীতে।

অনেকগুলি কথা বলে ফেলে একটু হাঁপায়, জামার তলা থেকে সোনার সরু সুৎলিটি বার করে অনামিকায় জড়ায়—হাতের তালুটি ভেজা—দুটি চোখে সমস্তটি হৃদয় যেন টলটল করে।

হঠাৎ বললে—আপনি রোজ-রোজ ক্লাশ থেকে পালিয়ে যান কেন? একটুও স্থির হয়ে বসতে পারেন না?

শ্যামল ঘনপল্লব অরণ্যের মধ্যে ঘনবল্লীর মতো ওর তনুলতা, পরনে মেঘ-ডম্বুর শাড়ি, দুটি চোখ দুরবগাহ!

—কেন, খুব নিঃশব্দেই তো যাই—টের পাওয়া উচিত নয় কারুর।

—প্রোফেসার পান না বটে, কিন্তু আমি বুঝি। লাইব্রেরিতে পড়েন বুঝি গিয়ে?

—লাইব্রেরি ? কোন তলায় তাও জানি না—এমনি ঘুরে আসি একটু।

ও একটু হাসে, সে তো হাসি নয়, সম্বোধন! আকাশের মেঘ যেমন মাটির দুর্বল দূর্বার পানে চেয়ে হাসে। আজকে এ-রকম মেঘ করে না এলে কখনও ওর স্ফুরিত ঠোঁটের কোণে হাসি ভেসে উঠত না, তার অর্থও থাকত না কোনো।

ওর দুটি চোখ যেন সাগরের দু-চামচে নীল জল!

একটি ভদ্রলোক—গায়ে মুসলমানি ছিটের পাঞ্জাবি, একচল্লিশ ইঞ্চি ঝুল,—পরনের কাপড় কিন্তু প্রায় আট-হাতি—ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে আছে। চোখের দৃষ্টি লোলুপ নয়—কাতর, ভারি অসহায়! ঐ ঘুমন্ত মেঘের সঙ্গে ওরও চোখের আদল আছে। দরিদ্রতায় ভরা।

করিডোর দিয়ে যে-ই হেঁটে যায়, সে-ই উৎসুক হয়ে আমাদের দেখতে থাকে, কেউই নির্বিকার নয়—সামনে দিয়ে দু-তিনবার করে টহল দিয়ে যায়।

মৈত্রেয়ী একা ওদের যত না চঞ্চল করেছে—ওর পাশে আমাকে দেখে সবাই একেবারে উদ্‌ভ্রান্ত, অস্থির হয়ে উঠেছে। গোবিন্দ পর্যন্ত ভাবছে—ঐ আট-হাতি খদ্দরের থান পরে ওরই দাঁড়াবার কথা মৈত্রেয়ীর পাশে—ক্লাশে প্রোফেসারের সঙ্গে অকারণ তর্ক করে বিদ্যে ফলিয়ে ও তো নিজের বিজ্ঞাপন আর কম দেয়নি। ডান হাতের আঙুল দিয়ে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি খোঁটে, চোখের পাতা পিটপিট করে, এমন ভাবে তাকায়—আমি যেন রোডস্-এর পিত্তলমূর্তি : কলোসাস্।

প্রোফেসার-ও একটু ঘেঁষে। মৈত্রেয়ীকে বলে যায়—শনিবারে আমার কাছে আপনার টিউটোরিয়্যাল। এই নিন নোটটা—হাতছাড়া করবেন না। খুব স্কেয়ার্স।

চলে গেলে বললাম—টিউটোরিয়্যাল-এ আপনি একাই পড়বেন বুঝি ওঁর কাছে। একা হলে খুব যত্ন নিয়েই পড়াবেন নিশ্চয়।

ও ফট করে বললে—আপনিও আসুন না ওর ক্লাশে। হ্যাঁ, খুব নেবেন! কেন নেবেন না ? না, আপনাদের দরকার হয় না ও-সব কিছু।

সত্যিই, সেদিন মৈত্রেয়ী ক্লাশে আসেনি। প্রোফেসারের পড়া ভালো মতো জমলই না, সব ছেলেই কেমন উসখুস, কোথায় যেন তাল কেটে গেছে—সব মিউনো, ম্যাজমেজে। তাই, যতক্ষণ না মৈত্রেয়ীকে বারান্দায় পা ফেলতে দেখে, লঘু দুটি পা—ততক্ষণ প্রোফেসার পায়চারি করে বেড়ায়। ক্লাশে ঢুকলেই ছেলেদের গোমড়া মুখ এক মুহূর্তে কোমল হয়ে আসে। ভাব ভাষা পায়—কবিতার প্রথম লাইনটা খাপছাড়ার মতো খানিকটা শূন্যে ঝুলে দ্বিতীয় লাইনে ছন্দের সঙ্গতি পায়, সম্পূর্ণতা পায়।

সে-সব বিদ্যের বাহাদুরি দেখাবে বলে গোবিন্দ বাড়ি থেকে তৈরি হয়ে আসে, সেগুলো খইয়ের মতো ফুটিয়ে-ফুটিয়ে ছুঁড়ে মারে, মাস্টারও বিদ্যে ফলাবার সুবিধে পায়। ওরা যেন আগে থেকে সল্লা করে এসেছে।

মৈত্রেয়ী তাই অবাক হয়ে শোনে—খাতায় কিছু-কিছু টুকেও নেয় হয়তো।

ছুটি হয়ে গেল, গোবিন্দ এখনও বাড়ি যাচ্ছে না কি রকম! ওর কি পড়ার আর জায়গা নেই যে একেবারে করিডোরের রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েই নিজেকে জাহির করতে হবে? মনে হয়, মৈত্রেয়ীর সঙ্গে কি যেন একটি কথা কইতে চায়।

কিন্তু কি কথা কইবে? বলবে কি, মিকাল-এঞ্জেলোর 'মালা ও মেখলা' কবিতাটি ভারি সুন্দর, ল্যাম্ ভারি দুঃখী ছিল—আপনিই শেলির 'উইচ অফ অ্যাটলাস'! কি কথা কইবে?

বললাম—আপনি তো এবার বাড়ি যাবেন। ট্রামে?

—হ্যাঁ। আপনি? পায়ে হেঁটেই নিশ্চয়।

ওকে রাস্তায় এগিয়ে দিই। হাত দেখিয়ে ট্রাম থামাই, ও ওঠে।

বলি—বনজ্যোৎস্নাকে ভুলবেন না।

ও শুনতে পায় না, চেয়ে থাকে। এবার আর নমস্কার করি না।

পানের দোকানের আয়নাটার দিকে চেয়ে থাকি একদৃষ্টে।

পুতলি কৌতূহলী হয়ে শুধোয়—কি দেখছ?

—নিজেকে। এই তেজী দেহটাকে। আর কিছুই চাই না পুতলি, চলতে পাই যেন—নিজেকে যেন টেনে নিয়ে যেতে পারি। নাই বা হলাম বেনে, নাই বা আড়তদার।

সৌম্যের বিষণ্ণ বিবর্ণ মুখ চোখে ভাসে—ও যেন ভাগ্যের বাজে রসিকতা। ও যেন অকারণ।

বলি—আর যেন এমনি প্রাণ থাকে—লেলিহান। আমি সমস্ত রুদ্ধদ্বারের শক্তি পরীক্ষা করব, সমস্ত অবগুণ্ঠনের শুচিতা—পা ফেলে যাব সকলের বুকে করাঘাত করে, করস্পর্শ করে।

ভুলে যাই যে পান বেচছে, সে মৈত্রেয়ী নয়।

মাঝে কিসের লম্বা ছুটি।

গতানুগতিক ভাবে একটা চিঠি এল। মৈত্রেয়ী চসার-এর নোট চেয়ে পাঠিয়েছে

আমার কাছে! ঐটুকুই আব্রু, ঐটুকুই কৃত্রিমতা। পরে লিখেছে—বনজ্যোৎস্নার কথা সেদিন সমস্ত শোনা হয়নি। দয়া করে আসবেন একদিন। কালই আসুন না। না এলে কিন্তু ভারি দুঃখিত হব।

না এলে কিন্তু—এর পরে কি লিখে যেন কেটেছে কালি দিয়ে। আলোয় ধরে দেখি, লিখেছে—না এলে কিন্তু ভারি রাগ করব।

বেলা যেন ভাদুরে কুঁড়ে, কাটতে চায় না। কিন্তু সন্ধ্যা কাবার করেই গেলাম। চসার-এর নোট কোথায় পাব—গোবিন্দের কাছে চেয়েও লাভ নেই—সমস্ত হৃদয় বনজ্যোৎস্নায় ভরে নিলাম।

শাদাসিধে দোতলা বাড়ি, দোরের গোড়ায় আর সন্ধ্যাদীপ নয়—মৈত্রেয়ী নিজে। মৈত্রেয়ী খুশি হয়ে বললে—সেই কখন থেকে আশা করে আছি। তবু এসেছেন যা হোক। ভাবলাম, চিঠিই পাননি হয়তো। আসুন ভিতরে।

নোটের কথা জিজ্ঞাসাও করে না।

আজকে ওর খালি দুটি পা—আটপৌরে একখানা শাড়ি, গরীবের ঘরের মেয়ের মতোই নম্র, সলজ্জ। মাথার কাপড়টা শিথিল, চুলের সঙ্গে সেফটিপিন দিয়ে আঁটা নয়—গায়ে শাদা সেমিজ, মনিবন্ধ পর্যন্ত নামিয়ে-দেওয়া ফুলহাতা ব্লাউজ নয়—ওর হাত দুটি দেখি, হাত দিয়ে নয়, চোখ দিয়ে ছুঁয়ে শীতল হই।

ওর পড়ার ঘরে আসি, ফিটফাট—ওরই মতো লক্ষ্মী ঘরখানা। বসতে দেয়। মা আসেন। বলে দিতে হয় না, উঠে প্রণাম করি। গল্প চলে। ছোট বোন খাবার নিয়ে আসে—গন্ধমাদন পর্বতের মতোই ভারি।

বলি—কে কোথায় আছে ডাকুন সবাইকে, সারারাত বসে খাওয়া যাবে। মৈত্রেয়ীও আমার সঙ্গে মুখ নেড়ে-নেড়ে খায়।

কত কথা চলে—গ্রীক ট্র্যাজেডি, জোকাস্টা—পরে ওফিলিয়া, আরও পরে গ্রেচেন্।

মা মৈত্রেয়ীর কথা উল্লেখ করে বলেন—ও একেবারে একা পড়ে গেছে। ওকে তোমরা একটু সাহায্য করো কি পড়তে হবে না-হবে।

মৈত্রেয়ীর বাবা বুড়ো মানুষ—দরাজ হাসি, এমন চমৎকার মিশতে জানেন্। আমি যেন কোথাও পেরেক হয়ে ফুটে রইনি, জলস্রোতের মতো মিশে গেছি।

উনি ঘাড় চাপড়ে বললেন—এই তো চাই, কলম যদি না বাগাতে পার হাতে হাতুড়ি তুলে নিও—লাঙল, লাগাম, লাঠি—যা হাত চায়। আমি তাই মনে করেই আমেরিকায় পালিয়েছিলাম।

বললাম—কিন্তু আপনি তো হাত ভরে টাকার থলি নিয়ে এসেছিলেন।

কি তাঁর হাসি, জোয়ারের জলধ্বনির মতো—যেন তাঁর টাকার থলেটা মেঝের উপর উজাড় করে ঢেলে দিলেন।

মৈত্রেয়ী বললে—চলুন, ছাদে যাই। এ-ঘরে বনজ্যোৎস্না কক্‌খনো আসবে না।

ওর বাবা বৈঠকখানায় যেতে-যেতে শুধু বললেন—রাতে ওঁকে ভাত খাইয়ে তবে ছেড়ো। পড়া-পত্রের সব খোঁজখবর নিয়ে রেখো, মা। হ্যাঁ, কাঞ্চন, বিশেষ কোনো কাজ না থাকলে এখানে তো থেকেও যেতে পার আজ। তোমার সঙ্গে ওয়ালটার পেটার সম্বন্ধে কিছুক্ষণ না হয় বিতণ্ডা করা যেত এর পরে। তুমি যে-রকম ভক্ত পেটারের!

মৈত্রেয়ী আমাকে ছাদে নিয়ে আসে, চেয়ার না এনে একটা পাটি বিছিয়ে দেয় শুধু। আলিসায় একটি সলজ্জা রজনীগন্ধা মৃদু কটাক্ষ করে, তারারা পরস্পরের কানে ফিসফিস করে কি কথা কয়, সবাই কৌতুহলী হয়ে ঝুঁকে পড়ে আমাদের দেখে। মৈত্রেয়ী একটু দূরে বসে, ওর সোনার দুটি চুড়ি হাত নড়ার সঙ্গে একটু-একটু বাজে, তাই শুনে বাতাস একটু সচকিত হয়। হঠাৎ ছাদে এসে রজনীগন্ধার কানে কি ইঙ্গিত করে যায়।

মৈত্রেয়ী বলে—বলুন।

—আমি তখন মাঝি ছিলাম—

—মাঝি ছিলেন? তার মানে?

—তার মানে একটা ডিঙি ছিল, আমি বৈঠা টেনে-টেনে পদ্মা ধলেশ্বরী মেঘনা শীতললক্ষ্যা পাড়ি দিতাম।

—খুব চমৎকার তো? ভয় করত না?

—করত না আবার! ভয় করত বলেই তো ভালো লাগত।

—কেন মাঝি ছিলেন? কেন? বলুন না।—যেন কান্নার স্বর!

বলে চলি—নদীর ওপরেই থাকতাম, নৌকোয়। নিজেই রাঁধতাম, নৌকো জলে ভাসিয়ে দিয়ে হুঁকো নিয়ে বসে থাকতাম। সেবার পুরো তিনদিন নৌকো নিয়ে টো-টো করেছি, একটাও জুৎসই কিরায়া পাইনি। সাহানার সুরের মতো আমার না' ভেসে চলেছে। ঝড় উঠবে বলে বন্দরে এত্তেলা দিয়েছিল, তাই ভীতু বৌটির মতো নৌকোকে পাড় ঘেঁষিয়ে নিয়ে চলছি। বৈঠা টানি আর চারদিকের অপূর্ব তরঙ্গোচ্ছ্বাস দেখে মনে-মনে মেতে উঠি। গ্রহ তারা আকাশ অন্ধকার তরু লতা সবাইকে সম্বোধন করে ধন্যবাদ জানাই, এই স্বাস্থ্য এই পরমায়ু পেলাম বলে।

নদীস্রোতকে নমস্কার করি, প্রাণে এই চলার বেগ এসেছে বলে। শঙ্খচিল ঝাঁক বেঁধে উড়ে যায়—তাই দেখি।

অনেক দূর চলে এসেছি নিশ্চয়ই—পুব কোণে কালো মেঘ তাল পাকাচ্ছে—ঘুমন্ত করুণ গ্রামখানি, অবগুণ্ঠিতা বধূটির মতো, বিরহরাতের নেবানো বাতিটির মতো! পাড় থেকে কারা আমাকে ডাকলে—সারা রাত তাদের আজ বয়ে নিয়ে বেড়াতে হবে—এদিকে ওদিকে, জল যেদিকে ঠেলে, জল যেদিকে ডাকে।

বললাম—ঝড় উঠবে যে, ইস্টিশানে লাল বাতি জ্বালিয়ে দিয়েছে।

মেয়েটির আবাঁধা চুলের সঙ্গে শাড়ি ওড়ে, বলে—উঠুক ঝড়। ঝড়কে কি ডরাই? না, ও যেন ঝড়কে ভালোবাসে—সেই ভরসাতেই নৌকোয় উঠল। কিন্তু ঝড় এল না। পুঞ্জিত নিঃশব্দ প্রশান্ত দুঃখের মতো সান্দ্র সুনিবিড় অন্ধকার।

মৈত্রেয়ী বললে—বেশ আস্তে-আস্তে বলুন, এখানেই থেকে যাবেন না হয়।

বলি—কলকাতায় ভালো প্র্যাকটিস জমল না প্রবোধের। গাঁয়ের একটা হেডমাস্টারি নিয়ে চলে এসেছে। সঙ্গে ওর খুড়তুতো ভাইটি—যিনি আগে এই শহরেরই একজন কণ্ট্রাক্টার ছিলেন—হঠাৎ সেই গাঁয়েই এক কবিরাজি ডিসপেন্সারি খুলে বসল। প্রবোধের আরও দুটি ছেলে হয়েছিল—ক্রিম আর সানইয়াৎ—বনজ্যোৎস্নাই নাম দিয়েছে। ওরাও মারা গেছে।

—মারা গেছে? কিসে?

মৈত্রেয়ীর বুকে মাতৃব্যথা উদ্বেল হয়ে ওঠে যেন।

—সেই একই ব্যারামে। তেমনি—চোখে ঘা হয়ে, পচে নীল হয়ে। সেদিনকার অন্ধকার নিরালা রাতে নৌকো থেকে উবু হয়ে ঝুঁকে পড়ে বনজ্যোৎস্না অস্ফুটস্বরে পদ্মার কাছে হয়তো একটি সুস্থ নিষ্কলঙ্ক সন্তান কামনা করছিল।

বললাম—কি দেখছেন নিচু হয়ে? ও শুধু বললে—নিজের মুখ!

মৈত্রেয়ী অস্থির হয়ে বললে—প্রবোধবাবুরও খুব অসুখ বুঝি? তাই ওঁকে নিয়ে রাত্রে নৌকো করে হাওয়া খেতে এসেছিল?

—যাকে নিয়ে এসেছিল সে অসুস্থ বটে, কিন্তু সে প্রবোধ নয়। প্রবোধ তো ওকে জ্যোৎস্না বলে ডাকে, কিন্তু এ ওকে বন বলেই ডাকছিল। এ ওর ঠাকুরপো—সেই কণ্ট্রাক্টার।

মৈত্রেয়ী একেবারে অবাক হয়ে যায়, চেঁচিয়ে ওঠে—বলেন কি?

—আমি তো বলছি, কিন্তু ওরা সারা রাত একটি কথাও বলতে পারল না। কত বাজে গল্প করল। অন্ধকার ঘুমন্ত গ্রামগুলিকে কি অপূর্বভাবে অপরিচিত লাগছে,

কয়টি তারা একসঙ্গে গোনা যায়, এখানে ডুবলে কোথায় কতদূরে মৃতদেহটা গিয়ে ভেসে ওঠে, ঝড় উঠবে না অথচ এমনি লাল বাতি জ্বেলে ভয় দেখাবার কি মানে —এই সব নিয়েই যত কথা। কিন্তু এই অন্ধকারে নদীতরঙ্গের ওপর ওরা তো এই সব কথাই বলতে আসেনি। বনজ্যোৎস্না একবার জলের মধ্যে দুখানি পা ডুবিয়ে বসেছিল, ছেলেটি বললে—অসুখ করবে, পা তোল। বনজ্যোৎস্না বললে—করুক। কিন্তু ঐ কথাটিই ওরা অন্য কি ভাষায় যেন ব্যক্ত করতে চায়, বলা যায় না। বনজ্যোৎস্না বলে—তোমার এবার ঘুমোনো উচিত, ঘুমোও। তার উত্তরে ছেলেটি বলে—অন্ধকারে নদীকে কি আশ্চর্য দেখায়! এই কি ঐ কথার উত্তর? নৌকোর দোলায় ছেলেটি ঘুমিয়েই পড়ে—পাটাতনের ওপর, বনজ্যোৎস্না বাইরে চেয়ে থাকে। একটু ছোঁয় পর্যন্ত না। আমাকে বলে—ভোর না হতেই কিন্তু ফিরিয়ে নিয়ে যেয়ো, যেখান থেকে তুলে এনেছিলে আমাদের।

মৈত্রেয়ীর হাতের সঙ্গে আমার হাতের কখন যে চেনা হয়ে গেছে, জানি না।

বললে—তারপর?

—তারপর বনজ্যোৎস্নাকে ওর বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এলাম, আর ছেলেটি ওর খড়ের ঘরের ডিসপেন্সারিতে গিয়ে উঠল।

—তারপর?

—তারপর? এবার বাড়ি যাব।

—না, এখানেই থেকে যান, এত রাত্রে কোথায় যাবেন? শেষ করে যান গল্পটা—বনজ্যোৎস্না কেমন আছে?

—না, যেতেই হবে আমাকে।—মানুষ আবার কেমন থাকে? এই একরকম।

•

করিডোর-এ আলাপ করার সুবিধে হয় না সব সময়, তাই লিফটম্যানের সঙ্গে ঠিক করা গেছে। ক্লাশ-ঘণ্টার মধ্যে দুজনে লিফটের সোফাটার ওপর বসে কথা কই। লিফটম্যান তিন-তলা আর চার-তলার ফাঁকে লিফট বন্ধ করে আমাদের লুকিয়ে রাখে একটু। কেউ ঘণ্টা দিলে এমন বেমালুম ভাবে উঠে আসি বা নামি যেন হঠাৎ আমাদের দেখা হয়ে গেছে। মৈত্রেয়ীর সঙ্গে এতটা বোঝাপড়া—এতটা জানাশোনা।

সেদিন বারান্দায় দাঁড়িয়েই কথা হচ্ছিল ছুটির পর।

মৈত্রেয়ী বললে—ঐ ভদ্রলোকটিকে চেনেন, ঐ নীল র‍্যাপার গায়ে।

—কেন ?

—লোকটি ভালো নন।

—তার মানে? ভালো নন, কি করে বুঝলেন? খুব মনীষা আছে তো আপনার ?

ও বললে—আলাপ-সালাপ কিছু নেই, চিনি না শুনি না—আমি এখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম চুপ করে, হঠাৎ কাছে এসে বললে—কাঞ্চনবাবুকে ডেকে দেব ? কি অন্যায় বলুন তো ?

—কেন, কিসের জন্য অন্যায় ? ও আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চায়, ওর তো কোনো রকমেরই ইনট্রোডাকশান নেই—ও তো আমার মতো সৌভাগ্যক্রমে বনজ্যোৎস্নার সঙ্গে পরিচিত নয়। ও যদি আপনার সঙ্গে কথা কইতে চায়—তার যদি কোনো সুন্দর ও সহজ সুযোগ না মেলে—তবে কি করে আপনার কাছে এসে দাঁড়াবে শুনি ?

—কথা কইবার কিই বা দরকার ?

—আপনার হয়তো নেই, কিন্তু ওর দরকার আছে নিশ্চয়ই। আমি ওর সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দেব।

মৈত্রেয়ী অস্ফুটস্বরে বললে—না, না। কি নাম ওঁর ?

—গোবিন্দ।

মৈত্রেয়ী হেসে উঠল, নামটা ওর পছন্দ হয়নি।

—নিশ্চয়ই আলাপ করিয়ে দেব। শুধু নাম শুনেই এত বিতৃষ্ণা, গল্পের এক লাইন পড়েই ভালো হয়নি ? তবে যাদের নাম সজনীকান্ত, হেরম্বচন্দ্র, রমণীমোহন—তাদের সঙ্গে আপনাদের মতো কোনো শিক্ষিতা আলোকপ্রাপ্তা মেয়ে কথাই কইবে না ? অন্যায় যত, সব বুঝি ওরই—আপনার আর কিছু নয়। ডাকি গোবিন্দকে।

গোবিন্দ এসে দাঁড়াল—দুই চোখে অভূতপূর্ব বিস্ময়, অথচ নম্রতা—সহসা ও যেন অত্যন্ত সুন্দর হয়ে গেল। ওর অদ্ভুত বেশভূষা, অদ্ভুত মুদ্রাদোষ—সমস্ত কিছুকে ছাপিয়ে ওর মুখে হঠাৎ অনিন্দ্য কান্তি এসে গেছে। সমস্ত মুখে আর কোনো কাঠিন্য নেই, হাসি। গোবিন্দ যে হাসতে জানে, জানতাম না।

বললাম—এঁকে তোমার নোটগুলো দিতে পারবে, গোবিন্দ ?

গোবিন্দ খুশি হয়ে বললে—কেন পারব না ? বা রে, খুব পারব। আজ সমস্ত দিন দান্তের সম্বন্ধে একটা খুব ভালো নোট টুকেছি—নিন, পড়তে পারবেন তো হাতের লেখা ?

মৈত্রেয়ী খাতাটা নেয়, তুচারখানি পাতা উল্টোয়, বলে—কেমন সুন্দর হাতের লেখা আপনার—আপনি খুব পড়েন। দান্তে তো এখনো শুরু হয়নি ক্লাশে।

মৈত্রেয়ীর চোখের ছোঁয়াচ লেগে গোবিন্দের চোখও অগাধ রহস্যে ভরে উঠেছে। বললে—না, কি আর পড়ি, বারো ঘণ্টাও হয় না। রোমান্টিক কবিদের সম্বন্ধে একটা নতুন বই এসেছে লাইব্রেরিতে—দেখবেন পড়ে, অদ্ভুত রকমের লেখবার কায়দা।

এমন সুন্দর করে গোবিন্দ কথা কইতে পারে, কে জানত আগে? কপালের থেকে চুলগুলি মাথার উপর তুলে দেয়, তাও অতি সুন্দর করে। ওর দাঁড়াবার ভঙ্গীটিও আজ হঠাৎ সুন্দর হয়ে গেছে। ওর মুখ লাবণ্যময় হয়ে উঠেছে—তুই চোখে তৃপ্তির অগাধ সুখ যেন।

পড়া-শোনার বিষয়ে আরও অনেক কথা হয়।

ট্রামে করে মৈত্রেয়ীর সঙ্গে বাড়ি যাচ্ছি, দেখি, ফুটপাথে গোবিন্দ। বলি—এস, এস, গোবিন্দ।

গোবিন্দ ছুটল চলন্ত ট্রাম ধরতে, কিন্তু খানিকদূর ছুটে নাগাল না পেয়ে থেমে গেল। তাই দেখে মৈত্রেয়ীর মুচকে-মুচকে হাসি।

ট্রাম থেকে নেমে গেলাম।

উবু হয়ে পড়েছে এমনি বাড়ি—রোয়াকের উপর দাঁড়িয়ে ডাকি—গোবিন্দ। হাঁটুর উপর কাপড় তোলা, সারা গায়ে ঘাম, হাতে একটা ঝাঁটা—গোবিন্দ বেরিয়ে আসে। বলে—কে, কাঞ্চন? এস, ঘরটা সাফ করছি।

ঘরে ঢুকে একটা দারুণ তুর্গন্ধ পাই—তক্তাপোশের তলায় ইঁতুর মরেছে, সমস্ত দেয়ালে থুতু সিকনি ছিটানো—কোণে-কোণে আবর্জনার স্তূপ। যাচ্ছেতাই নোংরা ঘর।

সেই ঘরের কথা হঠাৎ আজ ওর মনে পড়ে গেছে। একে ধুয়ে মুছে একেবারে পরিষ্কার করে ফেলতে না পারলে ওর যেন স্বস্তি নেই।

আমিও ওর সঙ্গে ঘর পরিষ্কার করতে লেগে যাই। বলি—এই ঘরেই বারো ঘণ্টা করে পড়? এই ঘরে শোও—ঘুম আসে? গায়ের ওপর দিয়ে ইঁতুররা হার্ডল-রেস করে না? টেবিলটা এই কোণে রাখ—একটা পায়া নেই আবার, তুটো পেরেক এনে দাও। দেয়ালের এ-জায়গায় একটা সুন্দর ছবি টাঙালে ভারি মানাবে।

গোবিন্দের প্রাণে যেন চৈত্র-রাত্রির চাঞ্চল্য এসেছে—অরণ্যের আনন্দ মর্মরিত

হচ্ছে, শুনতে চাইলেই শোনা যায়। বলে—একটা খুব জোরালো নোট টুকছি—বায়রনের। সেটাও মৈত্রেয়ীকে দিয়ে এস।

—তুমিই দিয়ে এস। ও তোমার কথা বলছিল সেদিন।

—সত্যিই ভাই, আমি তেমন পড়ি না, আরও ভালো করে পড়তে হবে।

নোংরা ঘর উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। গোবিন্দের মনের আনন্দ যেন ওর কদর্য দেহের উপর মূর্চ্ছিত, বিচ্ছুরিত হয়।

নোট নিয়ে গোবিন্দ নিজেই গেল। আমি বাইরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইলাম। ও খানিকক্ষণ একলা কথা বলুক।

অনেক পরে ও আসে, ততক্ষণ ফুটপাতেই পায়চারি করি। ও এসে একেবারে ঘাড়টা জড়িয়ে ধরে বললে—কি চমৎকার লোক ওরা সব! সুইনবার্ন-এর একটা খুব ভালো সমালোচনা বেরিয়েছিল, সেটা ও চেয়েছে। সব টুকতে হবে—দুবার করেই। এই যাঃ, তুমি যে এসেছ এ-কথা বলতে ভুলেই গেলাম। চল, ফিরে যাই।

বলি—পরে। এখন যদি কোনো কথা মনে হয়ে থাকে তোমার, তবে তুমি একলাই ফিরে যাও—আমার যাবার দরকার নেই।

সারা রাস্তা ও মুখর করে চলেছে, কত গল্প যে করছে তার অন্ত নেই। মৈত্রেয়ীর মুখ দা ভিঞ্চির আঁকবার মতো, ট্রাম ভারি আস্তে চলে, আজকে বৃষ্টি নামলে ও নিশ্চয়ই ভিজবে—এমনি যত আজগুবি কথা। ক্লাশে যখন ও তর্ক করে, তখন কথার মধ্যে কি কর্কশতা ছিল, সে তর্ক ছিল পুঁথি নিয়ে—আর এখনকার কথাগুলি কি করুণ, অথচ কি উচ্ছ্বসিত!

সব চেয়ে আশ্চর্য—ও সুন্দর করে বসে, সব চেয়ে আশ্চর্য—ও আর দাড়ি খোঁটে না।

—এখনো আলো জ্বালিসনি, সৌম্য?

—মদ খাচ্ছি।

ভিতর থেকে কথা আসে। চাপা, চুপসো।

আবার আসে—দোরটা শুধু ভেজানো আছে, ঠেলা দে।

ঘরে ঢুকে দেশলাই বার করে জ্বালাতে যাই, সৌম্য বাধা দিয়ে বলে—না, থাক।

পরে কোণের দিক লক্ষ্য করে বলে, বেশ। তুমি এবার যেতে পার।

অন্ধকার কোণ থেকে কে যেন উঠে দাঁড়ায়। মাথায় ঘোমটা। ঘোমটাটা অকারণে

একটু টানে। মুখ দেখা যায় না। খোলা দরজা দিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে যায়।
বলি—কে ও?
—আমার দিদি।
—কোন দিদি? যিনি টাকা পাঠান?
—হ্যাঁ। ওর মুখের দিকে তাকাতে পারি না, তাই আলোটা নিবিয়ে দিয়েছি। দেরাজের থেকে বোতলটা টেনে আন তো, আর একটু ঢালি।
বলি—দিদির সামনেই?
—দিদি জানে, মদ না হলে আমার চলে না। যেমন আমি জানি—
থেমে যায়। ফের বলে—দিদি আর ভাই।
বলি—কেমন আছিস? জ্বর কত?
—জ্বর একটু আছে। আজও ওষুধ কেনা হল না, কাঞ্চন। তুই কেন তখন খবরের কাগজটা রেখে গেলি? একটা নতুন বইয়ের বিজ্ঞাপন দেখে লোভ সামলাতে পারলাম না। সাড়ে-সাতটাকা।
আলোটা জ্বালাই। ওর কোলের উপর টকটকে লাল রঙের মোটা বই একটা। ও বলে—আগাগোড়া রক্ত দিয়ে মাখা।
বলি—আর ওগুলো গিলিস না। এমন করলে আর কদিন বাঁচবি?
—আমিও তাই এতক্ষণ ভাবছিলাম। স্বস্তিতে শুধু দুটো নিশ্বাস ফেলবার জন্যে সবাই সমস্ত দুঃখকে উপেক্ষা করছে—খালি প্রাণটুকু ধরে রাখবার চেষ্টায়। মোড়ের ঐ দুটো-পা-খসা ঠুঁটো ভিখিরীটা পর্যন্ত। আমার দিদি পর্যন্ত! কেউই মরতে চায় না, কেন বাঁচবে, তাও পর্যন্ত প্রশ্ন করবার সময় নেই। বাঁচাটা যেন বহুযুগের সংস্কার।
—বাকি মদটা কোণের ঐ মেঝের ওপর ঢেলে দে, ওখানে বসে দিদি অনেকক্ষণ কেঁদে গেছে। মদ দিয়ে চোখের জল ধুই।
—কি খাবি রাত্রে?
—সবাইকে বিয়ে করতে হবে এ যেমন সত্য নয়, সবাইকে বাঁচতে হবে—এও ততখানি মিথ্যা। কারু-কারু পক্ষে তাড়াতাড়ি মরাটা সত্যিসত্যিই উচিত। কেন এসেছি—এ-কথা কেউই প্রশ্ন করে না, কিন্তু যদি কেউ করত তো উত্তর পেত—মরতে এসেছি। আমিও তাই মরতে চাই—মৃত্যুকে আবিষ্কার করবার জন্য আমার মন অস্থির হয়ে উঠেছে, মৃত্যু কতখানি কদর্য, কতখানি নিষ্ঠুর, একবার দেখে নিই! আজ সমস্ত দিন ভরে কি স্বপ্ন দেখেছি, জানিস? হঠাৎ সৌরজগৎ থেকে বাতাস যেন লুপ্ত হয়ে গেছে, পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী—মানুষ জীব জন্তু পোকা পতঙ্গ গাছ

লতা সব অসহ্য যন্ত্রণায় নিঃশব্দে ধুঁকছে, বাতাসের জন্য কাড়াকাড়ি, কামড়াকামড়ি লাগিয়েছে, দাঁত নখ দিয়ে চিরে-চিরে আকাশকে রক্তাক্ত করে ফেলছে—উঃ, তুই তা ভাবতেও পারবি না। নিশ্বাস, নিশ্বাস, সবাই শুধু নিশ্বাসটুকু নিতে চায়।

পরে বললে—ঐ দিকের তাকটা প্রায় ফাঁক করে ফেলেছি, সব বইগুলি পুরোনো বইয়ের দোকানে কাল বেচে টাকাটা দিদিকে দিয়ে আসতে হবে, কাঞ্চন। ও কাল কোথায় যেন যাবে। পারবি তো ভাই ?

—কোথায় যাবেন ?

—যার জন্যে বেরিয়ে এসেছিল সে ছ'বছর জেল ভুগে বেরিয়ে এসে ওকে চিঠি দিয়েছে, বেচারার নাকি সাংঘাতিক অসুখ। তার কাছেই যাবে, টাকা চাইতে এসেছিল।

—কি ব্যাপার ?

—সে একটা খুব পচা পুরোনো গল্প, নাই শুনলি। বিয়ে হবার পর দিদিকে ওর স্বামী আর শাশুড়ী ঘরে ঝুলিয়ে রেখে লোহা পুড়িয়ে গায়ে ছ্যাকা দিত। স্বামী একটু আধুনিক ছিল, হান্টারের বাড়ি মারত। শাশুড়ী ছিল সাবেকি, দিদির হাতটা মেঝের ওপর রেখে নোড়া দিয়ে ছেঁচত, ইত্যাদি। তোর মুখ এত বিমর্ষ হচ্ছে কেন ? এ-সব কিসের শাস্তি, জানিস ?—ভালোবাসার। আমার তো এ-কথা ভাবতে আজও হাসি পায়। লোকে কেন ভালোবাসে ? খুব মজার ব্যাপার আগাগোড়া।

—তারপর ?

—তারপর দিদি পাগল হয়ে যায়, বেরিয়ে আসে। পাগলা গারদে বছর তিনেক থেকে ভেসে পড়ে। বছর খানেক আগে আমার সঙ্গে দেখা হল, সে ভারি করুণ, আমি তা ভাবতেও পারি না, কাঞ্চন। দিদি তার পিঠের ঘায়ের বীভৎস চিহ্নগুলি রাজপথে সবাইর চোখের সামনে উন্মুক্ত করে ভিক্ষা করছে। তাতে জীবনধারণ করবার পক্ষে যথেষ্ট রোজগার হত না নিশ্চয়ই। তাই—

—আর ছেলেটি ?

—দিদির স্বামী খুন হয়। সেই সন্দেহে ছেলেটিকে জেলে ঠেলে। ওর মরণাপন্ন অবস্থা নাকি—ও যেন সেরে ওঠে, দিদি যেন ওকে গিয়ে দেখতে পায়—মনে-মনে এই কামনা করি। বিধাতার কাছে আমরা খুব বেশি প্রার্থনা তো করি না, কাঞ্চন। তুই কালই যাস কিন্তু সকালে, বইগুলি বেচে আনা চাই। যদি কিছু বেশি থাকে, দুএকটা নতুন বই আনিস।

সারা রাত সৌম্যর শিয়রে বসেই কাটাতে হয়। ওর অবস্থা ভালো নয়।

সকালবেলা বইগুলি ধামায় করে নিয়ে যাই দোকানে। বেশি দাম দেয় না। নিজের থেকে কিছু দিয়ে টাকার সংখ্যাটা যথেষ্ট রকম ভদ্র করে যাই দিদির সন্ধানে।

দিদি নেই। কাল রাতেই চলে গেছে। এক কাপড়ে। হতভাগ্য শিশুর মতো ঘরটা কাঁদছে। ওর একটুও তর সয়নি, রাতের অন্ধকার ওকে ডাক দিয়েছে। ছ'বছর পরে ওদের এবার প্রথম মিলন হবে, যা ওরা এত কালের জীবন ধরে চেয়ে এসেছে, নিজেদের সমস্ত লাঞ্ছনার বদলে বিধাতার কাছে বর চেয়েছে—কিন্তু এতদিনের তপস্যার পর মিলনের এ কি বেশ! এর জন্য এত প্রতীক্ষা!

ছেলেটি যেন বেঁচে ওঠে, দিদি যেন ওকে গিয়ে দেখতে পায়—মনে-মনে বললাম। আকাশের তারা সেই কথা শুনল।

কিন্তু মাঝরাতে দোরের গোড়ায় তেমনি কান্না শুনি কেন? পুতলিকে শুধোই—পুতলি, দিদি কি ফিরে এল? ছেলেটির দেখা কি পেল না? ও কি নেই? না, আবার ওকে তাড়িয়ে দিলে ওরা?

দুজনে লণ্ঠন নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসি। কিন্তু কই, কেউ নেই তো! মনে হয়, এ যেন এই বিরহী পাড়াটার কান্না! যাবার সময় এখানকার আকাশে দিদি তার কান্নাটি রেখে গেছে।

ছেলেটি যেন বেঁচে ওঠে, দিদি যেন ওকে গিয়ে দেখতে পায়—আবার প্রার্থনা করি।

পুতলিকে বলি—এক্‌জামিন খুব কাছে এসে পড়ছে। আমি মেসে যাচ্ছি, এবারে অনেকগুলি টাকা দরকার। কি বল্‌, দিয়ে ফেলি এক্‌জামিনটা?

ও বলে—নিশ্চয়ই! টাকার জন্য ভেবো না, সে হয়ে যাবেখন। মেসে যাও, কিন্তু জলখাবারটা দোকানে এসেই খেয়ে যেও। আমি না হয় কোনো বাড়িতে বাড়তি সময় ঝি-গিরি করব।

মৈত্রেয়ীদের বাড়ি যাই। মৈত্রেয়ী পা দুলিয়ে-দুলিয়ে গুনগুন করে পড়ছে।

আমাকে দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে উৎফুল্ল হয়ে বললে—এসেছ? কি ঘেমে এসেছ একেবারে, মুখ একেবারে মাটির মতো হয়ে গেছে। এখন জল চাও এক গ্লাশ!—বাস্তবিক, তোমাকে এবার থেকে দস্তুরমতো শাসন করতে হবে। কি শাসন? পিঠে চড় মারব, কথা কইব না, বেরিয়ে যাবার সময় দরজার দুধারে দুহাত মেলে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকব।

বলে, আর ওর শাড়ির আঁচল দিয়ে আমার মুখের ঘাম মোছে।

আমার হাত ধরে ওর চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বলে—এবার লক্ষ্মী হাবা ছেলেটির মতো জিরোও খানিক—বাস্তবিক, তোমাকে নিয়ে আর পারি না—আমি হাওয়া করছি। তারপর স্নান করে খেয়ে-দেয়ে পাটি বিছিয়ে মেঝের ওপর দুজনে মিলে পড়া যাবে, দান্তেটা আজই তৈরি করে ফেলব।

বলি—আমি কি খেয়ে-দেয়ে তোমার সঙ্গে পড়তে এসেছি নাকি?

—আচ্ছা, না হয় গল্পই করা যাবে সমস্তক্ষণ। যদি ঘুম পায়! বেশ, ঘুমিয়ে পড়ব —পাটি তো পাতাই থাকবে। আমার ঘুম পেতে দেখে তোমারও তখুনি ঘুম পাবে না আশা করি। তুমি গল্পই বলে চল—আমি ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে গল্প শুনব।

বলি—এইমাত্র গোবিন্দের কাছ থেকে আসছি। ওর পড়া শুনে এলাম।

ও আমার চুলে আঙুল বুলোতে-বুলোতে বলে—হ্যাঁ, উনি প্রায় রোজ সন্ধ্যাবেলাই এখানে আসেন—প্রায় দু'হাজার পাতা নোট টুকেছেন—আমি ওঁর থেকে চারশো পাতা টুকে নিয়েছি। কি আসাধারণ মুখস্থ করতে পারেন, আর কি সুন্দর হাতের লেখা! অনেক প্রোফেসারের থেকে ওঁর পাণ্ডিত্য বেশি—এ-কথা আমি জোর করেই বলতে পারি। তারিখগুলি পর্যন্ত সব মুখস্থ! কবে, কে, কোথায়, কি, কেন —কিছুই যেন ওঁর অজানা নেই। সত্যি, তুমি আমাকে মাপ করো, আমি ওঁকে ভুল বুঝেছিলাম প্রথমে। কিন্তু তোমাকে দেখেই চিনে ফেলেছিলাম সব, প্রথম দিনেই তুমি পালিয়ে গেলে। তুমি পালিয়ে যাবারই ওস্তাদ।

মুখে বলে বটে, কিন্তু যেন বিশ্বাস করে না—এমনি ভাবে গলার কাছে হাত রাখে। ওর হাতখানা গালের কাছে টেনে আনি।

বলি—গোবিন্দের পড়া শুনে এলাম—সে কি পড়া! চেঁচিয়ে পাড়া মাত করে ফেলেছে, ও যেন কণ্ঠস্বর নিয়েই দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছে, কানে আঙুল দিলে পর্যন্ত সেঁধোয়। আর, কি খাটতেই যে পারে—বিকেলে বেড়াতে যাবে, তাও হাতে বই নিয়ে, ওর চোখ দুটো আর নেই। আমি শুধু-শুধু পড়তে এসেছিলাম—কিছু হল না।

—আমারও না। আমার ভারি ভয় করে।

—তোমার আবার কি ভয়? কোনো রকমে আটটা দিন অন্তত লিখে এসে প্রোফেসারদের বাড়িতে গিয়ে-গিয়ে তাঁদের চেয়ারে দিন কতক দয়া করে বসে এলেই হল—ফার্স্ট ক্লাশ। তোমার আবার কি ভয়! সেদিন তো বোস বলছিলেন যে, তাঁর এত বৎসরের টিউটোরিয়্যাল-এ তোমার মতো এমন চোস্ত কাগজ দেখেননি। তোমার টিউটোরিয়্যাল নেবার দিন থেকেই উনি গোঁফ কামিয়েছেন। তোমার

কিসের ভাবনা?—হ্যাঁ, ভালো কথা, তুমি গোবিন্দকে তোমার কনভোকেশান-এর ফোটোটা দিয়েছ?

—হ্যাঁ, এত করে চাইছিলেন।

—বেশ করেছ। ও সেই ফোটোটা ওর টেবিলের সামনে দেয়ালে টাঙিয়ে রেখেছে। ও একটা ডুবো গাধাবোট ছিল, তুমি এসে তাতে পাল লাগিয়ে দিলে; ও একটা ঝুনো বাঁশ ছিল, তুমি ওকে বাঁশি বানালে!

—কি যে বল যা-তা, কক্‌খনো কথা কইব না। তুমি ভারি···একি, উঠছ যে?

—সত্যি। ও যেন কি একটা অসাধ্য সাধন করবে, তুমি কোনো দিন আগ্নেয়গিরি দেখনি, না? ও তাই। আমি এবার যাই, তুমি লক্ষ্মীমেয়ের মতো পা দুলিয়ে-দুলিয়ে আরও খানিকক্ষণ পড়।

—না-না-না, যেও না কিন্তু, তাহলে ভারি রাগ করব। কেন যাবে শুনি এই রোদ্দুরে? শরীরটাকে মাটি করলেই হল? যেও না বলছি, আমি সব নোট ছিঁড়ে ফেলব তাহলে।

—নোট ছিঁড়ে ফেলবে মানে? গোবিন্দ তোমার জন্যে যা স্বার্থত্যাগ ও কষ্টস্বীকার করছে, তার জন্যে ওর কাছে তোমার চিরকৃতজ্ঞ থাকা উচিত। উচিত ঐ নোটগুলো পুজো করা। বোকা মেয়ে। বোসো, পড়ো গুনগুন করে।

বেরিয়ে যাই, ও রাগ করে দরজাটা ঝনাৎ করে বন্ধ করে দেয়।

পরের দিন ফের কেঁদে-কেটে এক চিঠি লেখে। লেখে—নোট পুজো করছি বটে, কিন্তু তুমি এস।

বিরাট গৃহতল—চারশো ছেলে ডেস্ক-এর উপর মুখ গুঁজে পরীক্ষা দিচ্ছে—বিস্তীর্ণ প্রগাঢ় নিস্তব্ধতা। এ যেন সৌম্যর সেই গুদাম-ঘরটা—সবগুলি মস্তিষ্ক টগবগ করে ফুটছে, এ যেন প্রকাণ্ড একটা কারখানা, এ যেন ভাষার মঞ্জরীতে বিকশিত হবার জন্য কোটি-কোটি ভাব-ভ্রূণের অসহ্য নিদারুণ সংগ্রাম!

কি লিখব, ভেবে কিছুই কিনারা পাই না—চেয়ে-চেয়ে দেখি—একটা ঘুমন্ত পুরীতে এতগুলি ছেলে মশাল হাতে কি যেন অনুসন্ধান করছে, পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে, কি চায়, কেই বা জানে। হয়তো একটি সহজ স্বচ্ছন্দ জীবন—পুত্র-পরিবার, শোক, দুঃখ, রোগ, মৃত্যু!

গোবিন্দ একটা দেখবার জিনিস, ও একটা বয়লার, ভূমিকম্পের সময়কার পৃথিবী,

তারা ফোটবার আগেকার আকাশ। পাতার পর পাতা মুহূর্তে লিখে ফেলছে, ওর কলম পক্ষীরাজ ঘোড়ার মতো টগবগিয়ে ছুটেছে—বেদুইনের ঘোড়া!

ওর টেবিলের সামনে মৈত্রেয়ীর যে ফোটো টাঙানো আছে, সে-কথাও হয়তো এখন আর ওর মনে পড়ছে না—কে জানে, হয়তো বা বেশি করেই পড়ছে।

আরেকজনের কথা মনে পড়ে—ভাঙা ক্যানভাসের ইজিচেয়ারটায় শুয়ে মৃত্যুকে ডাকছে।

মৈত্রেয়ী ঐ দূরে বসে আছে, চাদরটা পিঠের উপর দিয়ে এমনভাবে জড়িয়ে নিয়েছে যেন ভয় পেয়ে গেছে।

ফাঁকা খাতাটা সাবমিট্ করে মৈত্রেয়ীর পাশ দিয়ে বোঁ করে বেরিয়ে গেলাম বাইরে। বারান্দায় আমার পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে কে বললে—একটা ট্যাক্সি ডাক।

ট্যাক্সি ডাকলাম। মৈত্রেয়ী আমার গা ঘেঁষে বসে বললে—ছাই একজামিন। কি হবে আমাদের পাশ করে? বাবাঃ, পড়ে-পড়ে বুড়ো হয়ে গেলেও আমার সাধ্যি নয়, তোমারও নয় হয়তো। আমাদের ওরা সব কি রকম দেখছিল—যেন আমরা—কথা শেষ করবার আগেই হেসে ওঠে। গায়ের থেকে চাদরটা সরিয়ে নেয়। বলে—আজ পাঁচটা পর্যন্ত ট্যাক্সিতে ঘুরে আমাকে নিয়ে তোমার বাড়ি যেতে হবে। আজ রাত্রেই বাবাকে বলতে হবে কিন্তু।

—কি বলতে হবে? বিয়ের কথা?

আমার কাঁধের উপর মুখ রেখে বললে—আরও। দান্তের যেমন বিয়াত্রিচে, পেত্রার্কের যেমন লরা, কাতুল্লুসের যেমন লেসবিয়া, মিকাল এঞ্জেলোর যেমন ভিটোরিয়া কলোনা—তেমনি আমি তোমার। তোমার।

অবগাঢ় দুটি চোখ, দ্রাক্ষালতার মতো দেহ, কথায় কি করুণা!

ওই যেন আমার নীল ফুল, নীল পাখি, নীল নভতল!

সামনে যে ফাঁকা পথ দেখে, সেই পথেই ট্যাক্সি ছোটে, ও ওর দুটি ব্রততীপেলব বাহু আমার গলায় জড়িয়ে দিয়ে ওর বুকের কাছে আকর্ষণ করে বলে—সত্যি বল, বলবে আজ? তার জন্যেই তো তোমাকে দেখে হল্ থেকে পালিয়ে এলাম। আমার পাশ করে কোনো কাজ হবে না। তুমি মুখ ও-রকম করে রয়েছ কেন? আজ হাসতে বুঝি ভুলে গেলে একেবারে—তোমার এত কাছে আমি—

বলি—তুমি কি হঠাৎ ক্ষেপে গেলে মৈত্রেয়ী? একজামিন দিতে এসে তোমার মাথার ঠিক নেই।

—ঠিক নেই? মাথার ঠিক না থাকলে তোমার বুকের ওপর কক্খনো এমনি করে

মাথা রাখতাম না। তোমার হুটি পায়ে পড়ি—তোমার হুটি পা আমাকে দাও। তুমি কি বিশ্ববিত্যালয়ের প্রশ্নমালার মতোই নিষ্ঠুর, নিরুত্তর ?

—কিন্তু মৈত্রেয়ী, বিয়াত্রিচেকে কি দান্তে বিয়ে করেছিল ?

—নাই বা করুক, কিন্তু আমি তোমার ব্যারেট, তোমার মেরি, তোমার ডার্ক-লেডি।

—এ অসম্ভব প্রলাপ বোকো না, মৈত্রেয়ী। কি চাও তুমি আমার কাছে ?

—কিই বা না চাই ? তোমার কাছে চাই প্রেম, সন্তান, সংসারজীবন—তোমার পায়ের ওপর মাথা রেখে উদার মৃত্যু। আরও চাই, আরও চাই—কি চাই, সত্যিই বলতে পারছি না।

—গ্রেচেনের বুকে বুক রেখে ফাউস্টের ক্ষুধা মেটেনি, মৈত্রেয়ী, তা তো তুমি জানো। আমাকে ও-রকম ভাবে সত্যি ডেকো না। আমার কত কাজ, আমার বিশ্রাম করবার সময় নেই এতটুকুও।

মৈত্রেয়ী মুখ বিবর্ণ করে বলে—কি কাজ শুনি ?

—ধর, এই দেশের কাজ—

—কেন, আমি তোমাকে সাহায্য করব, তুমি যদি বেদে হও আমি বেদেনী, তুমি যদি দাঁড় টানো আমি হাল ধরে থাকব, তুমি লাঙল চালাও আমি মাটি নিড়োব, তুমি যদি কামার হয়ে লোহা পেট, আমি আঁচল ভিজিয়ে তোমার পিঠের ঘাম মুছে দেব—

—লাভের মধ্যে তাহলে কোনো কাজই এগোবে না। এবার বাড়ি ফিরে চল, মৈত্রেয়ী। তুমি বৃথা দুঃখিত হয়ো না। আজ রাতটা ভালো করে ঘুমিয়ে কাল সকালে উঠেই তোমার বোকামি বুঝতে পেরে তুমি হাসবে। আমি একটা কি ? চালচুলো নেই, মাথা গোঁজবার ঠাঁই নেই, আমার মধ্যে স্থিরতা নেই, সামঞ্জস্য নেই। আমি কাউকে এত ভালোবাসতে শিখিনি মৈত্রেয়ী, যে, সারাজীবন তাকেই ভালোবাসব।

মৈত্রেয়ী আর কোনো কথা কয় না, চাদরটা তেমনি গায়ে এঁটে দেয়, হাঁটুর ফাঁকে মুখ ঢেকে নিঃশব্দে কাঁদে।

ট্যাক্সি ফিরে চলে।

বাবা বলেন—একজামিন দিতে পারিসনি, তাতেই এত কান্না ? তুই হলি কি মা ? ভালোই তো হল, আরও মাস ছয়েক নিশ্চিন্ত থাকতে পারবি,—খুব কদিন এখন ফুর্তি করে নে না।

মৈত্রেয়ী বিছানায় লুটিয়ে পড়ে কাঁদে। ও চায় প্রেম, ও চায় সন্তান, ও চায় সংসারজীবন।

তারপরে একদিন রেজাল্ট বেরোয়। গোবিন্দ একেবারে ডগায় এসে উঠেছে—ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট। সবাই একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেছে—একটা পুঁচকে, খোট্টা-মাফিক ছেলে, বই মুখস্থ-করা পড়ুয়া—সে কিনা সবাইকে ডিঙিয়ে সমুদ্র পেরিয়ে গেল! অদ্ভুত না?

গোবিন্দর সঙ্গে দেখা। বললে—মৈত্রেয়ী নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছে। পাশ করতে না করতেই ব্যাঙ্কে চাকরি পেয়ে গেলাম, ভাই। খুব ভালো স্টার্ট, কয়েক বছরেই হাজারে দাঁড়িয়ে যাবে—একের পিঠে তিন শূন্য।

উৎফুল্ল হয়ে বলি—বেশ। খুব খুশি হলাম, গোবিন্দ। বিয়ে-থা করছ তো?

ও বলে—এই মাসেই জয়েন করতে হবে, পাটনায় ঠেলেছে প্রথম। সব গোছগাছ করে নিতে হবে এরই মধ্যে। কিছু টাকা জমাতে পারলেই ভবানীপুরের দিকে ছোটখাটো একটা বাড়ি করে ফেলব—তোমার তো খুব ভালো আইডিয়া আছে এ-সম্বন্ধে—মৈত্রেয়ী বলেছে একতলার ওপর ছোট্ট একটি ঘর তৈরি করতে—এমনি বলেছে। চাকরিটা পেলাম বলে ছোট ভাইটাকে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে দিতে পারব। ওর কথাগুলি যেন ফুলঝুরি। ও যেন দৌড়ে চলে—ওকে সত্যিই কত সুন্দর, সাবলীল, সমৃদ্ধ দেখাচ্ছে। গায়ে তসরের পাঞ্জাবি—তাঁতের কাপড়—হাতে একটা স্টিক পর্যন্ত। ও যেন রূপকথার রাজপুত্র। রাক্ষসপুরী থেকে বেরিয়ে এসেছে। চমৎকার ওর চলা।

সকালবেলাও সৌম্য বলছিল—ঐ নতুন বইটা থেকে কয়েক পাতা পড়ে শোনা, কাঞ্চন। বড্ড অস্থির লাগছে।

ডাক্তার এসে আশা নেই বলে গেছে। যেটুকু ওরা বলতে পারে।

দুপুর বারোটা থেকে প্রলাপ শুরু হয়েছে। সমস্ত বাড়িটাতে কেউ নেই যে আমাকে সাহায্য করে, কেউ আপিস কেউ দালালি করতে বেরিয়েছে। শুধু চুপ করে চেয়ে থাকার চেয়ে বেশি কি আর করা যাবে? কিছু একটা না করলে স্বস্তি পাই না বলে মাঝে-মাঝে চামচে করে একটু-একটু ওষুধ, গরম দুধ ওর দাঁতের ফাঁক দিয়ে ঢেলে দিই, গিলতে পারে না। হাতে পায়ে গরম জলের ফোমেণ্ট করি—একেবারে একা। নিচে মেঝের উপর অনেকক্ষণ বিছানা করে রেখেছি, কিন্তু শোয়াবার উপায় নেই।

ও ওর অনেক দিনকার পুরোনো ভাঙা চট-ছেঁড়া ইজি-চেয়ারটায় শুয়েই মরণকে আলিঙ্গন করবে।

ও হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে—আমাকে ওরা সবাই নিতে এসেছে, কাঞ্চন। পাজিটা, চুপ করে আছিস কেন, সবাইকে ডাক, শাঁখ বাজাক, ওদের বসবার জায়গা করে দে, হতভাগা। কত যুগের কত কবি, কত লেখক, কত উপোসী—মিছিল করে এসেছে। অনেকের মুখ চিনি না, কিন্তু সবাই আমাকে বলছে আত্মীয়, বন্ধু, ভাই। আমার হাত ধরে একটুখানি এগিয়ে নিয়ে যা, ওদের হাতের সঙ্গে হাত মেলাতে দে—

খানিক বাদে আবার বলে—মা গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে স্বপ্ন দেখি। ঐ যাঃ, ছোট বোনটা জলে পড়ে গেল, লাফিয়ে পড়, কাঞ্চন। আমার একটি মাত্র নিষ্পাপ বোন—ওর পিঠেও ওরা চাবুক মারছে? সত্যি করে বল, কাঞ্চন, সেই ছেলেটি সেরে উঠেছে তো? দিদি ওর দেখা পেয়েছে?

—পেয়েছে বৈকি। তুই দেখতে পাচ্ছিস না?

- না। আমার সব অন্ধকার হয়ে আসছে, আমি কোথায় যেন চলেছি, কত দূরে। সেখানে একটি তারার কণিকাও নেই। আমাকে জোরে টেনে ধর, কাঞ্চন, যেতে দিস না।

ওকে আর রাখা যাবে না। গা-হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে।

কোলাহল ও আর্তনাদ শুনে দোতলার নববধূটি দোর গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে—সলজ্জ প্রতিমার মতো। মৃত্যুর মতো।

সৌম্য শেষবার বলে উঠল—চিতায় শোয়াবার সময় আমার মাথার তলায় এই লাল বইটা দিস, কাঞ্চন। আর এই লাইব্রেরিটা—তুই তো একে ঘাড়ে করে বেড়াতে পারবি না, কাউকে দিয়ে দিস আমার নাম করে—

চেঁচিয়ে উঠি—সৌম্য, সৌম্য!

সৌম্যর জবাব কানে এসে পৌছয় না। শুধু খোলা জানালা দিয়ে সন্ধ্যাতারা মাটির বুকে ওর ক্ষীণ সান্ত্বনাটি পাঠিয়ে দেয়। বিকেলের হাওয়া ব্যাকুল হয়ে ফেরে।

সৌম্যর কথা রাখলাম।

গোবিন্দ ও মৈত্রেয়ীর বিয়েতে ওর লাইব্রেরিটা গোবিন্দকে দিয়ে এসেছি।

('বেদে' সমাপ্ত)

কাকজ্যোৎস্না

রাত্রি যেন হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল। খানিক আগে একটা বাতাস উঠিয়াছিল, সেটা স্তব্ধ হইয়া গেল। দেয়াল-ঘড়িটাও আর শব্দ করিতেছে না। বন্ধ হইয়া গেল কিনা কে জানে।

দুইটা কুড়িতে কলিকাতার ট্রেন। সেইটা পথে কোথায় আটকাইয়া পড়িল, কে তাহার খবর করিবে।

মহাকালের ট্রেন-চলাচলের টাইম-টেবিল পড়ে কাহার সাধ্য ?

অরুণা স্বামীর মুখের দিকে তাকাইয়া কহিলেন—"স্টেশনে গাড়ি থাকবে ত' ?"

স্বামী ঘরের মধ্যে অস্থির ভাবে পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছিলেন, তার কথায় একটু থামিয়া একটা শোকাতুর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া শুধু চাইলেন—"আর গাড়ি!"

সেই স্তব্ধ-স্তম্ভিত ঘরে কথার অর্থটা স্পষ্ট হইয়া উঠিল। বারোটা বাজিয়া ঘড়ির ছোট কাঁটাটা যেন আটকাইয়া গেছে—সুধী-র জীবনে দুইটা-কুড়ি বুঝি আর বাজিল না! প্রদীপের ফিরিয়া আসিবার আগেই প্রদীপ নিবিবে।

আকাশ ভরিয়া তারা জাগিয়াছে—কোটি কোটি জগৎ, কোটি কোটি জীবন! সমস্ত আকাশ ব্যাপিয়া কি বিস্তীর্ণ পথ, কি অপরিমেয় ভবিষ্যৎ! অবনীবাবু জানালা দিয়া বাহিরে চাহিলেন; রাস্তায় দূরে বাতি-থামের উপর একটা লণ্ঠন জ্বলিতেছে শুধু। সুষুপ্ত, প্রশান্ত রাত্রি।

ঘর ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য সুধী-র শিয়রের কাছাকাছি পিলসুজের উপর মাটির বাতি জ্বালানো। সুধী বুঝি একটু চোখ-চাহিল। অরুণা তাড়াতাড়ি ছেলের আরও নিকটে ঘেঁষিয়া আসিতে আসিতে স্বামীকে কহিলেন—"সলতেটা একটু বাড়িয়ে দাও শিগ্‌গির। সুধী কি যেন চাইছে।"

তারপর ছেলের আর্ত মলিন মুখের কাছে মুখ আনিয়া কোমলতর কণ্ঠে ডাকিলেন—"সুধী, বাবা, কিছু বলবে ?"

সুধী নিঃশব্দতার অপার সমুদ্রে ডুবিতেছে: জিহ্বায় ভাষা আসিল না—দুর্বল ডান-হাতখানা মা'র কোলের কাছে একটু প্রসারিত করিয়া দিয়া কি যেন ধরিতে চাহিল।

অরুণা কহিলেন—"এ পাশে একটু সরে এস বৌমা, সুধী বুঝি তোমায় খুঁজছে।"

নমিতা স্বামীর পায়ের কাছে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল—গভীর রাত্রির যে একটি প্রশান্তিপূর্ণ অনুচ্চারিত বাণী আছে, নমিতা তাহারই আকারময়ী। শাশুড়ির কথা শুনিয়া নমিতা নতনেত্রে কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই অরুণা কহিলেন—"এ-সময়ে আর লোকলজ্জা নয় মা, তোমার ঘোমটা ফেলে দাও! সুধী! মিতা, তোর মিতা—এই ত্যাখ, কিছু বলবি তাকে?"

সুধী বোধ হয় একটু চেষ্টা করিল, কিন্তু চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে পারিল না।

ঘরভরা লোকজনের মধ্যেই নমিতা অবগুণ্ঠন অপসৃত করিয়া সজল চোখে স্বামীর বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—কেহ না থাকিলে হয়ত সকল লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া অনেক কথা কহিত, হয়ত একবার বলিত: "আমাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইতেছ, কতদূরে? সেখানে কাহাকে সঙ্গী পাইবে? তুমি আমাকে ভুলিয়া থাকিয়ো, কিন্তু আমি তোমাকে ভুলিয়া থাকিব কি করিয়া?"

অরুণা নমিতাকে সুধী-র পাশে বসাইয়া দিয়া তাহার ব্রীড়াকুণ্ঠিত করতলে মুমূর্ষু সন্তানের শিথিল হাতখানি অর্পণ করিলেন। নমিতা দেখিল হাতখানি ঠাণ্ডা, যেন অব্যক্ত স্নেহে সিক্ত হইয়া আছে! মনে পড়িল, মাত্র সাত মাস আগে এই হাত-খানিরই কুলায়ে ভীরু পক্ষীশিশুর মত তাহার দুর্বল কমনীয় হাতখানি রাখিয়া, এক উজ্জ্বল দীপালোকিত সহস্রকলহাস্যমুখর উৎসব-সভায় সে সর্বাঙ্গে প্রথম পুলকসঞ্চার অনুভব করিয়াছিল। আজো বুঝি তাহাদের নূতন করিয়া বিবাহ হইতেছে! নমিতার আজ নববধূর বেশ। সে আকাশচারী মৃত্যু-প্রতীক্ষামগ্ন দুই চক্ষু মেলিয়া স্বামীর শয্যাপার্শ্বে আসিয়া বসিয়াছে। তোমরা উলু দিতেছ না কেন? আলো নিবাইয়া দাও, রাত্রির এই প্রগাঢ়-প্রচুর অন্ধকারকে অবিনশ্বর করিয়া রাখ!

মৃত্যু আসিতেছে, ধীরে, অতি নিঃশব্দপদে—নিস্তরঙ্গ নদীর উপরে প্রশান্ত গোধূলির মত। কেহ কথা কহিয়ো না, মৃত্যুর মৃদুপদপাত শুনিবার আশায় নিশ্বাস রোধ করিয়া থাক!

অবনীনাথ চেঁচাইয়া উঠিলেন, "জানলাটা খুলে দাও শিয়রের, পথ আটকে রেখ না।

কে একজন শিয়রের জানালা খুলিয়া দিল।

আরেকজন কহিল—"আপনি অত অস্থির হবেন না মেসোমশাই।"

অবনীনাথ চলিতে-চলিতে হঠাৎ থামিলেন, "পাগল! অস্থির আর হ'তে পারি কই, সত্য! আমাদের শরীর এমন সব স্নায়ু দিয়ে তৈরি যে অস্থির সে হ'তেই শেখেনি। আমরা ত' আর আগ্নেয়গিরি নই!" দুই-পা হাঁটিয়া আবার দাঁড়াইলেন, "শুনেছি

ভগবান যোগে বসে আছেন সমাহিত হ'য়ে, আর প্রকৃতি রাজ্য চালাচ্ছেন। বিধাতাকে আমি দুষবো না। আমি স্থির, হয়ত ভগবানেরই মত। আমি ভাবছি ছেলে মরেছে বলে আমি বড় জোর একদিন কোর্ট কামাই করতে পাব—আমাকে একটা সাত-লাখ টাকার মোকর্দমার রায় লিখতে হবে। আমি ভাবছি, পরশু আমার লাইফ ইন্‌সিয়োরেন্স-এর প্রিমিয়াম পাঠাবার শেষ তারিখ। আমার কি অস্থির হওয়া চলে ?”

মধ্যরাত্রির মুহূর্তগুলি মন্থর হইয়া আসিয়াছে—এত নিঃশব্দতা বুঝি সহিবে না। আত্মীয়-পরিজনের অন্ত নাই, সবাই প্রশস্ত ঘরে রোগীর পরিচর্যায় নিযুক্ত। এখন সবাই সেবাশুশ্রূষা পরিত্যাগ করিয়া রোগীকে ঘিরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে—শেষ-নিশ্বাস-পতনের প্রতীক্ষায়। পরিবারের শিশুগুলি অন্যঘরে দাসীর তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে,—কেহ ঘুমাইয়া পড়িয়া গত রাত্রে শোনা পথিক-রাজপুত্রের স্বপ্ন দেখিতেছে, কেহ বা বসিয়া আপন আপন মা'র কথামত অর্থহীন অসম্পূর্ণ ভাষায় অচেনা ভগবানের কাছে অসম্ভব প্রার্থনা করিতেছে। সমস্ত ঘরে সুগভীর শান্তি বিরাজমান। অবনীবাবুর লঘু পদশব্দ ছাড়া কোথা হইতেও একটি অস্ফুট কোলাহল হইতেছে না। সৃষ্টি যেন গতিবেগ রুদ্ধ করিয়া একটু দাঁড়াইয়াছে !

এইটি সুধী-র পড়িবার বসিবার শুইবার ঘর। এই ঘরেই একদিন পড়িতে পড়িতে সুধী পিছন হইতে বাবার স্নিগ্ধ কণ্ঠস্বর শুনিয়াছিল : “রংপুরে একটি মেয়ে দেখে এলাম—প্রতিমার চেয়েও সুন্দর। সামনে ফাল্গুন মাস, কবিরা বলেন কাব্যের পক্ষে প্রশস্ত—তোমাকে একটি কাব্যলক্ষ্মীর সন্ধান দিচ্ছি।” সুধী একটু হাসিয়া পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে কহিল—“কার্ল মার্কস্-এর কোন জায়গায় এমন কথা লেখা নেই, বাবা।” অবনীনাথ বলিয়াছিলেন—“তা না থাক্, নমিতা এখন নমিন্যালি আসছে, তার জন্যে তোমার এক্‌জামিনের মার্কস্ কমবে না।” শেষ পর্যন্ত অবশ্য আপত্তি টিঁকে নাই, নমিতাকে বিস্তৃত শয্যার একটা সঙ্কীর্ণ অংশ ছাড়িয়া দিতে হইল। এই ঘরেই সুধী বোকার মত (প্রত্যেক স্বামীই বিবাহের প্রথম রাত্রির প্রথম সম্ভাষণে একটু বোকা হয়)। নমিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল : “আমাকে তোমার ভাল লাগবে ?” নমিতা নিঃশব্দে কতকগুলি ঢোঁক গিলিয়া বলিয়াছিল : “একবার যখন বিয়ে হ'য়েই গেছে তখন আর ভাল লাগালাগির কথাই নেই। আমাকে আরেকটু বড়ো হ'তে দিয়ে বিয়ের আগে দেখা করে মতটা জিজ্ঞেসা করলেই পারতে !” মেয়েটি বেশ সপ্রতিভ, সুধী-র এত ভাল লাগিয়া গেল যে ফের বোকার মত বলিয়া বসিল—“দেখো, আমাকে তোমার খুব ভালো লাগবে।”

একুশ বছর ধরিয়া সুধী এই ঘরে বসিয়া কত স্বপ্ন দেখিয়াছে। ইস্কুলে পড়িতে-পড়িতে তাহার মনে হইয়াছিল পণ্ডিতমশাই হইয়া ছেলেদের বেঞ্চের উপর দাঁড় করাইয়া দিবার মত সুখ বুঝি আর কোথাও নাই; থার্ড ক্লাশে উঠিয়া সে ভাবিয়াছিল যে, সে মোক্তার হইয়া শাম্‌লা আঁটিবে ও খোঁচা খোঁচা দাড়ি রাখিয়া পেসকারকে ভয় দেখাইবে। ষোল বছর বয়সে সুধী কীটসের *Endymion* পড়িয়া একটি অপরিচিত ভাববিলাসী ব্যর্থ-প্রেমিকের বেদনার স্বপ্নে তাহার স্বল্প-প্রসার ভুবনকে অনুরঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছিল; বি-এ পাশ করিয়া কঠিন রুক্ষ মাটিতে পা রাখিয়া সীমাশূন্য আকাশের নীচে দাঁড়াইয়া দুই ফুসফুস ভরিয়া প্রচুর বাতাস নিতে-নিতে সে স্বপ্ন দেখিয়াছিল স্বাধীন গর্বিত ভারতের—উপরে উদার উজ্জ্বল আকাশ, পদনিম্নে উত্তরঙ্গ উদ্বেল সমুদ্র! এই ঘরে বসিয়াই।

পুত্রের মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে অরুণাকে দেখিবে এস। মা চিত্রার্পিতের মত বসিয়া আছেন। যে হাতখানা দিয়া নমিতা স্বামীর হাত ধরিয়া আছে, সেই হাতখানি অরুণা নিজের কোলের উপর টানিয়া লইলেন। কতদিন ধরিয়া যে ঘুমান নাই তাহা তাঁহার হতাশ স্থির দুই চক্ষুতারকা দেখিয়া নির্ণয় করা অসম্ভব—সব শ্রান্তি ও প্রতীক্ষার আজ চরম অবসান হইবে। অরুণার মন বাইশ বছর পূর্বের অতীততীরে উড়িয়া গিয়াছে। বাইশ বছর পূর্বে অরুণা এই সংসারে পদার্পণ করিয়াছিল—একটি বৎসর ফুরাইতে-না-ফুরাইতেই যখন অরুণার প্রথম সন্তান সম্ভাবনা হইল, তখনকার সেই সুখরোমাঞ্চময় অনুভূতিতে বিস্ময়ে সে বাণীহীন হইয়া গিয়াছিল। তাহার যেন সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে ভয় হইতেছিল। নভচারী কোন্ নক্ষত্র হইতে একটি জ্যোতি-স্ফুলিঙ্গ মর্ত্যতলে প্রাণ পাইবার আশায় তাহার শরীরকে আশ্রয় করিয়াছে—যেন কোন অতিথি-আত্মা—আত্মপ্রকাশের বিপুল ব্যাকুলতায় অরুণাকে মিনতি করিতেছে। সে-দিন মনে আছে অরুণা গভীর রাত্রে ছাতে উঠিয়া নক্ষত্রমণ্ডিত অবারিত আকাশের দিকে তাকাইয়া প্রার্থনা করিবার উপযুক্ত ভাষা খুঁজিয়া পায় নাই, স্বামী ডাকিতে আসিলে তাহার মনে হইয়াছিল, যে ক্ষুদ্র মাংসপিণ্ডটা তাহার জঠরে আকারহীন অবস্থায় সঙ্কুচিত হইয়া আছে, তাহা একদিন দৈর্ঘ্যে, আয়তনে ও বলশালিতায় ঐশ্বর্যময় হইয়া উঠিবে—সৃষ্টির এই গৌরবপূর্ণ অভিজ্ঞতায় অরুণার মন সুখাবেশে অবশ হইয়া পড়িল! এই ভ্রূণ একদিন কর্মে, সাহসে, তেজে, দীপ্তিতে, অগ্রগণ্য হইবে, হয়ত বা ভালোবাসিয়া একটি নিখিলব্যাপ্ত বিরহবেদনার কবি হইবে, কে বলিতে পারে! কিন্তু সে যে আবার একদিন ক্ষণস্বপ্নের মতই কয়েকটি বর্ণের বুদ্‌বুদ তুলিয়া অদৃশ্য হইয়া যাইবে, তাহা কে কবে ভাবিয়াছিল! আর দু'টি মাত্র

মুহূর্তের পর অরুণা কি বলিয়া ও কতখানি জোর দিয়া চীৎকার করিয়া উঠিবে, তাহা ভাবিয়া পাইতেছিল না। এতগুলি বৎসর ধরিয়া সে যত আকাঙ্ক্ষা করিয়াছে, যত স্নেহ বর্ষণ করিয়াছে, তাহার এই ভয়ঙ্কর অকৃতার্থতা সে সহিবে কি করিয়া? ভালোবাসা এত ভঙ্গুর কেন, আশা কেন এত অসহায়?

বসিয়া থাকিতে থাকিতে অরুণার এক সময় মনে হইল আজিকার রাত্রিটা তাহার জীবনের সাধারণ রাত্রিগুলির মতই একটা। পরীক্ষার সময় মাঝ-রাতে উঠিয়া ঘুমন্ত সুধীকে পড়িবার জন্য জাগাইয়া দিতে হইত—গায়ে ঠেলা দিলেই বুঝি সুধী এখনি হাত-পা মেলিয়া তেমনি জাগিয়া উঠিবে। টেবিলে আলো জ্বালিয়া সুধী পড়িতে বসিলে, অরুণা ছাতে উঠিয়া আকাশের কাছে সন্তানের কুশল প্রার্থনা করিবে, অন্ধকার স্বচ্ছতর হইয়া আসিতে থাকিলে, মাঠে নামিয়া ফুল কুড়াইয়া ছেলেকে গিয়া উপহার দিবে। অরুণার মনে হইতেছিল খানিকক্ষণ চোখ বুজিয়া থাকিয়া পরে চাহিয়া দেখিলেই দেখিবে যে, এই রাত্রির চেহারাটা সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছে। তিনি জাগিয়া-জাগিয়া এতক্ষণ একটা দুঃসহ দুঃস্বপ্ন দেখিতেছেন মাত্র। এই ভাবিয়াই তিনি চক্ষু বুজিলেন, হঠাৎ একটা অসংলগ্ন চীৎকারে মাথা তুলিয়া চাহিয়া দেখিলেন, অবনীনাথ দুই হাতে মাথার চুল ছিঁড়িতেছেন।

ব্যাপারটা আবার আয়ত্ত হইল। কিন্তু গাঢ় নিদ্রায় অরুণার চক্ষুপল্লব ভারাক্রান্ত হইয়া আসিতেছে। নিদ্রা যে শোকমাধুর্যপূর্ণ বিস্মৃতি আনিয়া দেয়, তাহারই নদীতে তিনি এইবার স্নান করিবেন। এই ঘর-দুয়ার স্বামী-পুত্র—সব অপরিচিত আত্মীয়; এত দিনের কঠিন কদর্য ক্লান্তির পর আজ তাঁহার ঘুম আসিবে। অরুণা ছেলের পাশে শুইয়া পড়িলেন।

ইহার পর আর দুই মিনিটও বুঝি কাটিল না। রাস্তায় কিসের একটা শব্দ হইতেই, সবাই অসঙ্গত প্রত্যাশায়, সচকিত হইয়া উঠিল; প্রদীপ ফিরিয়া আসিল বুঝি। সমস্ত আত্মীয়বন্ধু সুধী-র আরো কাছে ঘেঁষিয়া আসিয়া সমস্বরে চেঁচাইয়া উঠিল; একটা-বিয়াল্লিশ মিনিটের সময় সুধী যে নিশ্বাস ত্যাগ করিল, তাহা আর ফিরিয়া গ্রহণ করিতে পারিল না। তাহার জন্য বাতাস ফুরাইয়া গেছে।

আশ্চর্য, অরুণার ঘুম ভাঙিল না। অবনীনাথ হঠাৎ ছুটিয়া আসিয়া ফুঁ দিয়া বাতিটা নিবাইয়া দিলেন; চীৎকার করিয়া কহিলেন—"খবরদার, কেউ কাঁদতে পাবে না—সবাই চুপ করে থাক, কারু মুখ থেকে যেন একটাও শব্দ না বেরোয়, ওকে চলে যেতে দাও।"

খোলা জানলাগুলি দিয়া বন্যার মত অজস্র অন্ধকার ঘরে ঢুকিয়া পুঞ্জীভূত হইয়া

উঠিতে লাগিল—মৃত্যুর নিঃশব্দ তরঙ্গ! চাঁদ কখন অস্ত গিয়াছে—আকাশে হঠাৎ মেঘ করিল নাকি—রাত্রি বোধ হয় আত্মঘাতিনী হইল! ঘরে যতগুলি লোক ছিল অবনীনাথের আকস্মিক আর্তনাদে একেবারে হতবাক হইয়া গেছে; নিস্পন্দ, নিরালম্ব—কাহারো মুখে কথা ফুটিতেছে না। অবনীনাথ ঘরের মধ্যখানে একটা স্তম্ভের মত অটল হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, আর নমিতা কি করিবে কিছু বুঝিতে না পারিয়া, ভয়ে স্বামীর হিম, শক্ত বাহুটা দুই হাতে মুঠি করিয়া আঁকড়াইয়া রহিয়াছে।

দুইটা-কুড়ির গাড়িতে প্রদীপ যখন কলিকাতা হইতে ডাক্তার লইয়া ফিরিল, তখনো সে ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই যে সুধী মরিয়া গিয়াছে। ডাক্তার আনিয়া সে ভালই করিয়াছিল, নতুবা অরুণাকেও আর ফিরানো যাইত না।

স্টেশনে সোফার গাড়ি নিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। প্রদীপ ডাক্তারকে সঙ্গে করিয়া প্লাটফর্মের বাহির হইতেই ড্রাইভার ডাকিল—"এই যে!"

প্রদীপ ডাক্তারের ব্যাগটা মোটরে তুলিয়া দিবার আগেই ভয়-ব্যাকুল স্বরে প্রশ্ন করিল—"কেমন আছে এখন?"

মোটরে স্টার্ট দিয়া সোফার কহিল—"তেমনি।"

কপালের উপর চুলগুলি ঝুলিয়া পড়িতেছিল, বাঁ-হাত দিয়া কানের পিঠের কাছে তুলিয়া দিতে-দিতে প্রদীপ কহিল—"খুব হাঁকিয়ে চল, হরেন। দশ মিনিটের মধ্যেই পৌঁছনো চাই।"

হরেন গাড়ি ছাড়িল। ডাক্তার যেন একটু ভয় পাইয়া বলিলেন—"পথে য়্যাক্সিডেন্ট করে রোগীর সংখ্যা বাড়ালে বিশেষ সুবিধে হ'বে না। যে পথ-ঘাট—আস্তেই চল হে।"

সরু, আঁকা-বাঁকা পথ—নির্জন, নিস্তব্ধ, যেন একেবারে মরিয়া রহিয়াছে। দুই ধারে বড় বড় গাছ যেন নিশ্বাসরোধ করিয়া অন্ধকার আকাশে অনুচ্চারিত রোদন শুনিতেছে—একটিও পাতা নড়িতেছে না। প্রদীপ অনেকদিন ঘরের বাতি নিবাইয়া সুধী-র সঙ্গে সাহিত্যালোচনার অবকাশে গভীর রাত্রে মাঠে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—সে-রাত্রির স্তব্ধতা যেন একটি অনাস্বাদিতপূর্ব বেদনার লাবণ্যে মণ্ডিত ছিল, কিন্তু আজিকার এই নির্মম নিঃশব্দতা প্রদীপ সহ্য করিতে পারিতেছে না। ডাক্তারের দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল—"একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবেন। ছোট কচি-বৌ—সামনে ওর বিশাল ভবিষ্যৎ! চমৎকার ছেলে, কী দারুণ স্বাস্থ্য ছিল!"

ডাক্তার কহিলেন—"ছোট একটু হৃৎস্পন্দন নিয়েই মানুষের এই সুদৃঢ় দেহ, সুদীর্ঘ জীবন! এই স্পন্দনটুকু বন্ধ হ'লে বিজ্ঞানও বোবা হয়ে গেল। আমাদের সাধ্য আর কতটুকু, ভগবান ভরসা। বাড়ি আর কতদূর হে? তোমাদের হরেন যে এরোপ্লেন চালিয়েছে! দেখো।"

ডাক্তারের মুখে ভগবানের নাম শুনিয়া প্রদীপ সুখী হইল না বটে, কিন্তু একবার অসহায় অন্ধ-বিশ্বাসে ভগবানের কাছে মনে-মনে প্রার্থনা করিয়া লইতে পারিলে যেন গভীর স্বস্তিলাভ করিত। এই প্রগাঢ় প্রসুপ্তির মধ্যে মনে-মনে ঐ প্রকার একটা স্বীকারোক্তি যেন অসঙ্গত হইত না। যে-অবিশ্বাসী সমস্ত জীবন নাস্তিকতা প্রচার করিয়া মৃত্যুশয্যায় অনুমিত ভগবানের কাছে অনুতপ্ত কণ্ঠে ক্ষমা চাহিয়াছিল, তাহাকে মনে-মনে ধিক্কার দিয়া প্রদীপ সহসা বলিয়া উঠিল, "এই এসে পড়েছি, ডাক্তারবাবু। আপনি ঘুমুচ্ছেন নাকি? আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম।"

এই মাঠটুকু পার হইলেই বাড়ির দরজায় গাড়ি থামিবে। ডাক্তারবাবু এই সামান্য সময়টুকুর মধ্যেই ঝিমোনো শুরু করিয়াছেন দেখিয়া প্রদীপের এত রাগ হইল যে, উপকার পাইবার আশা না থাকিলে হয়ত মুখের উপর দুইটা ঘুসি মারিয়া বসিত। কোন নামজাদা বড় ডাক্তারই এত রাতে এই অসময়ে দূরে আসিতে রাজি হয় নাই, তাই এই চার-টাকার ডাক্তারকে সে ধরিয়া আনিয়াছে; তাও কত সাধ্যসাধনা করিয়া। রোগীর আত্মীয়বর্গকে আশ্বাস দিবার মিথ্যা কলাকৌশলটা ভাল করিয়া আয়ত্ত করিয়াছিলেন বলিয়াই ডাক্তারবাবু এই যাত্রা সারিয়া গেলেন।

গাড়ি আসিয়া দরজায় দাঁড়াইল। হরেন হর্ণ বাজাইতে যাইতেছিল, প্রদীপ বাধা দিল। বাড়িতে কোনো ঘরে একটাও আলো জ্বলিতেছে না—সুধী-র ঘরেও না। ব্যাপার কি? সুধী বুঝি একটু ঘুমাইয়াছে। আঃ, প্রদীপ সুখে নিশ্বাস ফেলিল। সকাল বেলা যখন ডাক্তার আনিতে কলিকাতা যায়, তখনো সুধী যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট, বিবর্ণ হইয়া ছট্‌ফট্ করিতেছিল—এখন যদি তাহার চোখে তরল একটি তন্দ্রা নামিয়া থাকে, তাহা হর্ণের শব্দে ভাঙিয়া যাইতে পারে। প্রদীপ ডাক্তারকে লইয়া নিঃশব্দে নামিয়া যাইবে। পার্শ্ববর্তী কোন-এক গ্রামের কে-এক সন্ন্যাসী কি একটা শিকড় বাটিয়া খাওয়াইয়া সুধী-কে নিরাময় করিয়া তুলিবে—এমন একটা কথা প্রদীপ শুনিয়া গিয়াছিল। হয়ত সেই সন্ন্যাসীর ওষুধ খাইয়া, সুধী শরীরের সকল ক্লেশ ভুলিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। হয়ত এই ডাক্তারকে আর দরকারেই লাগিবে না; টাকাগুলি গুণিয়া-গুণিয়া ডাক্তারের হাতে গুঁজিয়া দিয়া, উহাকে বিদায় দিতে তাহার যে কী ভাল লাগিবে বলা যায় না। ডাক্তারকে বরখাস্ত করিয়া একটা সন্ন্যাসীর

অলৌকিক ওষুধের অসম্ভবপর সাফল্যে সে হঠাৎ বিশ্বাস করিতেছে ভাবিয়া তাহার হাসি পাইল না। সে যাহাকে প্রত্যক্ষরূপে লাভ করে নাই বলিয়া অস্বীকার করে, পৃথিবীতে তাহার অস্তিত্বই থাকিবে না এমন যুক্তি সে আজ গ্রহণ না-ই বা করিল। প্রদীপ কান খাড়া করিয়া রহিল। একটিও শব্দ আসিতেছে না—সমস্ত নীরবতা যেন গভীর তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিয়াছে। সুধী-কে ঘুমাইতে দেখিয়া সবাই হয়ত সাময়িক অনুদ্বেগে একটু বিশ্রাম করিতেছে; নিভৃত ঘরে খালি নমিতা-ই হয়ত জাগিয়া শিয়রে বসিয়া আছে নির্নিমেষ চোখে; হয়ত লজ্জিত ভীরু করতলখানি স্বামীর কপালের উপর রাখিয়া ভগবানকে সুধী ভাবিয়া-ই মনে মনে তাহার কাছে অসংখ্য আবদার করিতেছে। তাহা হইলে প্রদীপও আজ আঠারো রাত্রির বিনিদ্রতার শোধ লইবে, কিম্বা, নমিতা যদি তাহার উপস্থিতিতে কুণ্ঠিত না হয়, তবে সেই ঘরে বসিয়াই ম্লান দীপালোকে তাহার ও সুধী-র অসমাপ্ত উপন্যাসখানির কিয়দংশ লিখিতে আবার চেষ্টা করিবে। উপন্যাসের নায়ককে মারিয়া ফেলিয়া তাহারা সমস্যার সমাধান করিতে চাহিয়াছিল; তাহা হইলে, উপন্যাসকে অত সহজ করিয়া, সমস্যাকে অযথা খর্ব করিয়া তুলিবে না।

কে যেন বাড়ির সদর দরজা ঠেলিয়া বাহিরে আসিতেছে। প্রদীপ চাহিয়া দেখিল—এ কে, সুধী! প্রদীপ চমকিয়া উঠিল—সুধী যে দিব্যি হাঁটিতে পারিতেছে! সন্ন্যাসীদের এবার হইতে দেখা পাইলেই প্রদীপ পায়ের ধূলা মাথায় ঠেকাইবে; চোদ্দ ঘণ্টার মধ্যে একটা কঙ্কালের কাহিল চেহারা এমন বলশালী হইয়া উঠিল! সুধী দরজাটা বাহির হইতে ভেজাইয়া দিয়া সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া রিস্ট-ওয়াচে সময় দেখিয়া লইল, যেন তাহাকে এখুনি ট্রেন ধরিতে হইবে। হঠাৎ প্রদীপের সঙ্গে চোখোচোখি হইতেই সুধী অল্প-একটু হাসিল—সেই পরিচিত নির্মল হাসি, কতদিন এই হাসি সে দেখে নাই—তারপর ডান-হাতটা একটু তুলিয়া স্পষ্ট কহিল —"চললাম, কথা বলবার এখন আর সময় নেই। নমিতাকে দেখিস।" বলিয়া সিঁড়ি হইতে নামিবার জন্য পা বাড়াইল। প্রদীপ বলিতে চাহিল: এই রাত করে কোথায় যাচ্ছিস, ঠাণ্ডা লাগবে যে! কিন্তু সুধীকে আর দেখা গেল না—ঐ রাস্তা ধরিয়া চলিয়াছে।

প্রদীপ চোখ কচলাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "বাড়ির ভেতর থেকে কে বেরুল রে হরেন? দেখলি নে? মোটর নিয়ে ফের স্টেশনে চল্। ও কি হেঁটেই যাবে নাকি?" হরেন একটা লণ্ঠন জ্বালাইতে জ্বালাইতে কহিল—"কে আবার গেল? পথের একটা কুকুর।"

ডাক্তারবাবু সিট্-এ ঠেসান দিয়া তখনো ঝিমাইতেছেন। প্রদীপ তাঁহার হাত ধরিয়া এক ঝাঁকুনি দিয়া বলিয়া উঠিল, "আপনার ঘুমুবার জন্য খাট পেতে রেখেছি, উঠে আসুন দিকি।"

কথাটা ডাক্তারের কানে গেল না, কিন্তু ঝাঁকুনি খাইয়া উঠিয়া বসিলেন, এবং "এত রাতে জেগে থাকার অভ্যেস নেই" বলিয়া তাড়াতাড়ি গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িলেন।

অতি নিঃশব্দপদে উঠান পার হইয়া প্রদীপ বারান্দাতে উঠিল। বারান্দার কিনারায় দুইটি অপরিচিত লোক চুপ করিয়া বসিয়াছিল, প্রদীপকে দেখিয়া তাহারা চঞ্চল হইল না পর্যন্ত। প্রদীপও তাহাদের কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিল না, জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজনও বোধ করিল না। এই গহন নীরবতা তাহার সকল উদ্বেগের উপশম করিয়াছে; সুধী এখন একটু ঘুমাইয়াছে বলিয়াই কেহ একটিও শব্দ করিতেছে না; বাতি নিভাইয়া সবাই তাহার ক্লান্তিমুক্ত নব-জাগরণের প্রতীক্ষা করিতেছে। প্রদীপ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া ডাক্তারকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"এই বাঁয়ে আসুন। আলোটা একটু এদিকে, হরেন।"

চৌকাঠ ছাড়াইয়া ঘরে পা দিতেই প্রদীপ একেবারে বসিয়া পড়িল। যে-শোক প্রথম অভাবিত বিস্ময়ের আবেগে স্তব্ধ হইয়া ছিল তাহা আর সম্বরণ করা গেল না। প্রদীপ যেন মূর্তিমান ব্যর্থতার মত আসিয়া দেখা দিয়াছে—নিরুদ্ধ শোক দিকে-দিকে অবারিত ও অজস্র হইয়া উঠিল!

হরেন লণ্ঠনটা নামাইয়া রাখিয়া ছোট ছেলের মত কাঁদিয়া ফেলিল—আর প্রদীপ অশ্রুলেশহীন শুষ্ক কঠোর চোখে সুধী-র মৃত্যুকলঙ্কিত মুখের দিকে চাহিয়া চোখের পলক আর ফেলিতে পারিল না।

ইঁদুরের মত নিঃশব্দে ডাক্তার সরিয়া পড়িতেছিলেন, অবনীবাবু স্বাভাবিক সংযতকণ্ঠে কহিলেন—"অমন বোকার মতো কাঁদে না, হরেন। যা, ডাক্তারবাবুকে স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আয় গে—চারটা-চুয়াল্লতে একটি গাড়ি আছে। ভদ্রলোকের এতটা কষ্ট হ'ল। অমন হাঁ-করে দাঁড়িয়ে থেকো না, প্রদীপ। ওঁর ভিজিটের টাকা দিয়ে দাও, এই নাও দেরাজের চাবি।"

ডাক্তারবাবু বারান্দায় আসিয়া কাহাকে বলিতেছিলেন—"মফঃস্বলে আমরা সচরাচর বত্রিশ টাকা নিয়ে থাকি। কর্তাকে বলবেন, ফেরবার ভাড়াটা যেন সেকেণ্ড ক্লাশের হয়।"

অবনীবাবু প্রদীপের হাতে তাঁহার দেরাজের চাবিটা গুঁজিয়া দিলেন বটে, কিন্তু

প্রদীপ নড়িতে পারিতেছিল না। সে ব্যথিত হইবে না বিস্মিত হইবে, কাঁদিবে না সান্ত্বনা দিবে, কিছুই বুঝিতে না পারিয়া হতচেতন হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এই পৃথিবী, যাহার বিপুলতা মানুষের নির্ধারণের নহে, সেই পৃথিবীর কোথাও সুধী-র চিহ্ন রহিল না—এই প্রকাণ্ড আকাশ হইতে সুধী-র দিবাস্বপ্নগুলি বিলুপ্ত হইয়া গেল —একাকী সুধী কত দূরপথে যাত্রা করিয়াছে, তিমিরগহন রুক্ষ-পথে অনির্ণীতের সন্ধানে—ভাবিতে-ভাবিতে কি করিবে কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া, পকেট হইতে বাক্স বাহির করিয়া সিগারেট ধরাইল।

মানুষের শরীর বলিয়া যে-বস্তুটি আছে, তাহার আবদার না রাখিলেই নয়। অতএব, অরুণাকেও একদিন চোখের জল মুছিয়া উঠিয়া বসিতে হইল। শুধু তাই নয়, মাসে হিসাবের অতিরিক্ত তেল খরচ হইয়াছে বলিয়া রাঁধুনে বামুনকেও তিরস্কার করিতে ছাড়িলেন না।

গলায় ভার না বাঁধিয়া জলে ডুবিয়া মানুষ আত্মহত্যা করিতে পারে না; প্রতিবন্ধক না থাকিলে জলের তলা হইতে শরীরটা আপনিই চাড়া দিয়া উঠিবে।

অরুণা হিসাব লিখিয়া চাকরকে বাজারে পাঠাইতেছিলেন, প্রদীপ কাছে আসিয়া বলিল—"সন্ধ্যার ট্রেনেই কলকাতায় ফিরে যাব ভাবছি। আপনার অনুমতি চাই।"

প্রদীপ জানিত যে অরুণার চোখে জল আসিবে, তাই শোকাশ্রুকে অযথা আর প্রশ্রয় না দিয়া কহিল—"কলকাতায় গিয়ে ত চাকরির জন্য ফের পথে-পথে টো-টো করতে হবে, দু-মুঠো জুটোতে হবেত! অনেক দিন থেকে গেলাম, চমৎকার থেকে গেলাম—একেবারে নিখুঁত।"

প্রদীপের দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল।

আঁচলে চোখের জল মুছিয়া অরুণা বলিলেন—"আমাদের ভুলে যেয়ো না প্রদীপ!"

প্রদীপ তক্তপোষের একপ্রান্তে বসিয়া পড়িয়া কহিল—"আপনারা আমাকে ভুলে গেছেন কি-না তা দেখবার জন্যে আমাকেও মাঝে-মাঝে এখানে আসতে হবে। আশা করি, সুধী দরজা বন্ধ করে দিয়ে যায় নি।"

অরুণার দুই চক্ষু পরিপূর্ণ করিয়া আবার অশ্রু আসিল, এবার আর মুছিলেন না। প্রদীপের পিঠের উপর বাঁ-হাতখানি রাখিয়া অনুরোধ করিয়া কহিলেন—"আরো দু'টো দিন থেকে যেতে পার না? তুমি চলে গেলে এ-ফাঁকা কি করে সইব?"

প্রদীপ কহিল—"আমার আর থাকা চলবে না, মা। এই অপ্রত্যাশিত মৃত্যু

দেখে, এই অসহায় কাকুতি শুনে আমি ভারি দুর্বল হ'য়ে পড়েছি, মনে আমার অবসাদ এসেছে। এই বৈরাগ্য আমার জীবনের পক্ষে উপকারী হবে না। এর থেকে আমি ছাড়া পেতে চাই।" বলিয়া প্রদীপ অরুণার লাবণ্যমণ্ডিত মুখের পানে চাহিল।

"এখন কোথায় যাবে, কলকাতায়? কলকাতায় তোমার কে আছে? য্যাদ্দিন থেকে গেলে অথচ তোমার কোনো খোঁজই নেওয়া হ'ল না।"

প্রদীপ কহিল—"খোঁজ নেওয়ায় বিপদ আছে, মা। খোঁজ যদি পেলে, তবেই ত বেঁধে রাখবার জন্যে হাত বাড়াবে; এই অবাধ্য বুনো ছেলেটাকে কেউ বাঁধতে পারেনি। বাঁধতে যাবে, অথচ হারাবে, সেই দুঃখ আর সেধে নিতে চেয়ো না, মা। আমি আবার আসবো।"

এই ছেলেটির প্রতি অরুণার মাতৃস্নেহ উথলিয়া উঠিল, সুধী যেন প্রদীপকে প্রতিনিধি রাখিয়া গিয়াছে। অরুণা কহিলেন—"এমন কথা কেন বলছো প্রদীপ, স্নেহের বাঁধন কি এত সহজেই ছেঁড়া যায়? তুমি কি ভাবছো তোমাকে আমরা ভুলে যাবো?"

প্রদীপ কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় উমা আসিয়া হাজির। উমা সুধী-র ছোট বোন, ম্লান ললিততনু মেয়েটি, মৃদু মৃগস্বভাব; এই ষোলয় পা দিয়াছে। উমাকে দেখিয়াই অরুণা কহিলেন—"তোর প্রদীপদা চলে যাচ্চেন।"

উমা কহিল—"আজই?"

প্রদীপ উত্তর দিল—"আজই, উমা। কত কাজ কলকাতায়। আমাকে য্যাদ্দিন না দেখে ট্রাম বাস নিশ্চয়ই স্ট্রাইক করে বসে আছে, রাস্তায় আলো জ্বলছে না।"

উমা হাসিয়া কহিল—"রাস্তায় আলো জ্বালাবার চাকরিটা আপনার জন্যে পড়ে আছে! যাচ্ছিলেন ত কাশ্মীর, য্যাদ্দিনে কি তার মেয়াদ ফুরিয়ে যেত?"

"কাশ্মীর-ই বল বা কাশী-ই বল, কলকাতার ডাক দু' সপ্তাহের বেশি উপেক্ষা করা যায় না। সুধী-র সঙ্গে সেই চুক্তি ক'রেই বেরুচ্ছিলাম, কিন্তু মৃত্যুর পরে যদি কোনো আদালত থাকে মা, সুধী-র বিরুদ্ধে সেই চুক্তিভঙ্গের মামলা আমাকে আনতেই হবে। এ-কালে সৌন্দর্য যদি কোথাও থাকে উমা, তাহলে কলকাতাতেই আছে।"

বুদ্ধিদীপ্ত চক্ষু মেলিয়া উমা কহিল—"কলহেও।"

প্রদীপ বলিয়া চলিল—"তাই ত কলকাতা এমন করে আমার মন ভুলিয়েছে। আকাশের রোদন শুনে বেদ রচিত হয়েছিল পুরাকালে, এ-কালে আমরা যন্ত্রের যন্ত্রণা

শুনে আবার মহাকাব্যের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি। মাঠের চেয়ে শহর সুন্দর, মঠের চেয়ে ফ্যাক্টরি—প্রান্তরের চেয়ে প্রাচীর। প্রকৃতিকে কলকাতা যে বিকৃত করে তুলেছে, আমার তা'তে ভারি ভালো লাগে।"

উমা বিস্মিত হইয়া কহিল—"বলেন কি? প্রকৃতিকে আপনার ভালো লাগে না?"

প্রদীপের স্বর কিঞ্চিৎ দীপ্ত হইয়া উঠিল, "একটুও না। তুমি কলকাতায় গিয়ে মধ্যরাত্রে একবার ড্যালহৌসি স্কোয়ারের পারে দাঁড়িয়ো। সব ট্র্যাফিক বন্ধ, ঘন কালো রাত্রি নেমে এসেছে, চারপাশে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দালান—স্থির, নিরুত্তর, অভ্রভেদী—ওপরে তারকা-দীপ্ত বিস্তীর্ণ আকাশ। ভাব দেখি, কী কৃত্রিম, এবং কী করুণ!"

সমস্ত ছবিটি যেন উমার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল। সুধী-র কাছে উমা অনেক-কিছু পড়াশুনা করিয়াছে; তাই ইহার পর বলিতে পারিল, "এই প্রকৃতির পূজা করেই কত কবি চিরকালের জন্য নাম করেছেন। ধরুন ওয়ার্ডসোয়ার্থ।"

প্রদীপ একটুখানি হাসিল, কহিল—"যদিও তাঁর words-এর কোনো worth নেই। ভাগ্যিস্ জন্মেছিলেন কাম্বারল্যাণ্ড-এ, ছবির মতো সবুজ গাঁয়ে—তাই প্রকৃতিকে নিয়ে এমন কেলেঙ্কারিটা তিনি করলেন। জন্মাতেন এসে সাহারায়, কিম্বা গ্রীষ্মকালের মধ্যভারতে, লু-তে লুণ্ঠিত হ'তেন, তবে বুঝতেন মজা। ঝড়ে যার নৌকাডুবি হয় উমা, সে বর্ষা নিয়ে আর কবিতা লেখে না।"

উমা বলিল—"আপনি এবার কলকাতায় গিয়ে বেথুন-বোর্ডিঙে আমার জন্যে একটা সিট রাখবার চেষ্টা করবেন, বুঝলেন?"

অরুণা হাসিয়া কহিলেন—"এই হয়েছে। ওর মাথা এবার বিগড়ালো।"

উমা চটিয়া কহিল—"মাথা বিগড়ালো কি? দাদার সঙ্গে-সঙ্গে আমার পড়াশুনোও চুলোয় যাক, না? কলকাতায় ত এবার লোক্যাল গার্ডিয়ান পেলাম, গিয়ে-গিয়ে দেখা করবেন ত?"

প্রদীপ কহিল—"সময় হয়ত করে নিতে পারবো, কিন্তু কলকাতা গিয়ে তোমারই সময়টা বৃথা অপচয় হবে! তার চেয়ে আর একটা বছর এখেনে এই শালবনের তীরে বসেই বইগুলোর সঙ্গে শুভদৃষ্টি করতে থাক—ম্যাট্রিকটা তুমি তাতেই উৎরে যাবে। তারপর না-হয় কলেজে গিয়ে কলি ফিরিয়ো।"

উমা কহিল—"আমার বেলায় বুঝি শালবনের টনিক প্রেসক্রাইবড হ'ল! লক্ষটা শাল গজাক, কিন্তু এখানে একা বসে থাকলে লক্ষ বছরেও আমার ম্যাট্রিক পাশ হবে না।"

প্রদীপ হাসিয়া বলিল—"তাতে বরং ভালোই হবে—মাঝখান থেকে তোমার লক্ষ বছর বাঁচা হ'য়ে যাবে।"

অরুণা চিন্তিত হইয়া বলিলেন—"একবার যখন গোঁ ধরেছে, সহজে ছাড়বে ভেবেছ?"

"আমি এক্ষুণি বাবার মত নিয়ে আসছি!" বলিয়া উমা ছুটিয়া বাহির হইতেই প্রদীপ তাহাকে ডাকিয়া বাধা দিল; কহিল—"কলকাতায় মেয়ে-ইস্কুলের বোর্ডিং গুলোর কথা ত আর জান না, তাই অমন ক্ষেপে উঠেছ। ওখানে মেয়েদের খেতে দেয় না, তা জান? বিকেল পাঁচটার সময় ভাত খাইয়ে সমস্ত রাত উপোস করিয়ে রাখে, ঝি-দের সুবিধে করতে গিয়ে ঝিয়ারিদের শুকিয়ে মারে। ও জুজু-মাসির বাড়ি যেতে নেই, উমা। খালি দেয়াল আর কাঠ—একঘেয়ে কাঠিন্য, জুলুম। হাওয়া নেই, এই শালতরুমর্মর সেখানে নিস্তব্ধ হ'য়ে গেছে, আকাশের অর্থ সেখানে মহাশূন্য!"

উমা প্রতিবাদ করিয়া উঠিল, "এই ত এতক্ষণ কলকাতার কালি আর কলের গুণকীর্তন হচ্ছিল। সেখানে আকাশ নেই বলে ত আপশোষ করবার আপনার কারণ ঘটেনি। আপনার মতো আমিও না-হয় হাওয়ার বদলে ধোঁয়া খাবো।"

প্রদীপ কহিল—"ধোঁয়া আমার সয়, কিন্তু বিকেল পাঁচটার সময় পেট পুরে ভাত আর কপির ডাঁটা খেতে হ'লে সারারাত তোমার চোঁয়া ঢেঁকুর উঠবে। ছেলেদের যা সয়, মেয়েদেরও কি তাই সইবে ভেবেছো?"

উমা এইবার রীতিমত চটিয়া উঠিল, "না, সয় না! ছেলেরা সব হনুমান কি-না। সব থার্ড ডিভিশানে পাশ করে।"

"আর মেয়েরা করে ফেল্!"

"ইস্, নিয়ে আসুন ত ক্যালেণ্ডার।"

"ক্যালেণ্ডারে বুঝি ফেল-এর সংখ্যা থাকে? তুমি ছেলেদের হনুমান বললে বটে, কিন্তু রামায়ণে হনুমানের মতো বীর আর কে আছে! সেতু বেঁধে দিলে কে?"

"তা আর জানি না? নিজের ল্যাজে আগুন ধরিয়ে সমস্ত লঙ্কা পুড়িয়ে দিলে কে? হনুমানের কথা আর বলবেন না। ও একটা প্রথম নম্বরের ইডিয়ট। বিশল্যকরণী আনতে গিয়ে গোটা গন্ধমাদন পর্বতটাই নিয়ে এল।"

"ইডিয়ট, কিন্তু কি প্রকাণ্ড বীর ভেবে দেখ। কোনো বানরনন্দিনীকে পাঠালে তিনি সমস্ত জীবন ধরে ঐ বিশল্যকরণীই খুঁজে বেড়াতেন, লক্ষ্মণ আর বাঁচতো না।"

উমা আরো উদ্দীপ্ত হইয়া কহিল—"নাই-বা বাঁচতো! ঐ দ্বিতীয় ইডিয়ট লক্ষ্মণ—

রাম ফল এনে ওর হাতে দিয়ে বলতেন—ধর, আর ও এমন গর্দভ যে সে ফল ধরেই থাকত, খেত না। এমনি করে চৌদ্দ বছর লোকটা না খেয়ে বেঁচে রইল। যদি রাম বলতেন—মুখে তোল, ও মুখে তুলত বটে, কিন্তু নিশ্চয় চিবোত না; যদি বলতেন—চিবোও, ও কখনো গিলত না দেখো।"

প্রদীপ আর অরুণা দু'জনেই হাসিয়া উঠিলেন। উমা বলিয়া চলিল—"আর ইডিয়ট-শ্রেষ্ঠ রাম সামান্য ধোপা-নাপিত বন্ধ হবে ভেবে সোনার সীতাকে বনে পাঠালেন—সেই সীতা, যে তাঁর জন্যে সারাজীবন সন্ন্যাসিনী হ'য়ে ছিল। আর যেমনি ধোপারা কাপড় কাচতে ও নাপিতরা দাড়ি চাঁছতে রাজি হ'ল, অমনি আবার উনি সীতার জন্য মাতামাতি শুরু করে দিলেন। ধন্যি মেয়ে সীতা—ঐ মাতালটাকে ছেড়ে পাতালে গিয়ে মুখ ঢাকলে।"

প্রদীপ আমোদ অনুভব করিয়া কহিল—"তোমার এই সার্টিফিকেট নিয়ে বেচারা বাল্মীকি বাজারে আর তাঁর রামায়ণ কাটাতে পারবেন না।"

"ছেলেদের কথা আর বলবেন না, সব টুকে পাশ করে।"

"টোকবার মতো ট্যাক্‌ট মেয়েদের নেই বলে। একটা কথাতেই তফাৎ ধরা যাচ্ছে, উমা। তুমি ছেলে হলে এই একা-একা পরীক্ষা-সমুদ্র উত্তীর্ণ হবার ভয়ে এত ভড়কাতে না।"

"কাজ নেই আমার হনুমান হয়ে।" বলিয়া উমা হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গেল; কণ্ঠস্বর আর্দ্র হইয়া উঠিয়াছে। কহিল—"দাদা নেই, সমস্ত বাড়ি খাঁ-খাঁ করছে, বৌদি কাঁদতে গিয়ে বোবা হয়ে গেছে, মা দিবারাত্রি চোখের জল ফেলেন, বাবা পাগলের মতো পায়চারি করে বেড়ান—আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। কলকাতায় আমাদের কেউ আত্মীয় থাকলে আপনার সঙ্গেই চলে যেতাম এবার। আমি যাবোই পড়তে।"

উমা ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছিল, অরুণা ডাকিলেন। উমা ফিরিল। অরুণা কহিলেন—"বৌমা কোথায়?"

"স্নান করতে গেছে।"

"তোর প্রদীপদা আজ চলে যাচ্ছেন, ঠাকুরকে বল কিছু ভালো করে রেঁধে দিতে। বৌমার ঘরে উনুন ধরিয়েছিস?"

"এই যাই।" বলিয়া উমা দ্রুতপদে অদৃশ্য হইয়া গেল।

ক্ষণকালের জন্য আবহাওয়াটা স্বচ্ছ হইয়া আসিয়াছিল, সহসা আবার গাঢ় মেঘ করিয়া আসিল। সেই মেঘান্ধকার নমিতার দুই নিঃসহায় চক্ষু হইতেই ঝরিয়া

পড়িতেছে। এই দৃশ্যে নমিতার আবির্ভাব হইল না বটে, কিন্তু প্রদীপের মনোমুকুরে যাহার ছায়া পড়িল সে হয়ত ঠিক নমিতা নয়, একটি কল্পনাভরণা দুঃখৈশ্বর্যময়ীর ছবি, কবির কল্পনা উন্নত হইতে হইতে ইন্দ্রিয়াতীত হইয়া যে মহিমাময়ী নারীমূর্তি পরিগ্রহ করে, ঠিক সেই মূর্তি! তাহাকে নমিতা বল, কিছু ক্ষতি হইবে না।

মেস্-এর ম্যানেজারের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া প্রদীপ উপরে আসিয়া দেখিল, তাহার নামে এক চিঠি আসিয়াছে। ঠিকানায় হাতের লেখা দেখিয়াই পত্র-লেখককে চিনিল এবং সেই জন্যই তৎক্ষণাৎ চিঠিটা খুলিল না। আয়নার কাছে দাঁড়াইয়া শক্ত চিরুনি দিয়া নিজের রুক্ষ চুলগুলি ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে ম্যানেজারেরর উপর রাগটা প্রশমিত করিতে লাগিল।

এই যুগে ভীষ্মকে হয়ত প্রদীপ ক্ষমা করিত না, কিন্তু তাই বলিয়া পৈতৃকসম্পত্তি অটুট রাখিবার জন্য সুধী-র এই পিতৃভক্তিকেও স্বর্গারোহণের সোপান বলিয়া সে স্বীকার করিতে পারে নাই। তাই সুধী-র বিবাহে সে ত যায়ই নাই, বরং তাহাদের দুইজনে যে উপন্যাসখানি লিখিতে শুরু করিয়াছিল, তাহা ফিরাইয়া দিয়া সুধীকে লিখিয়াছিল: তোমার বর্তমান মনোভাব নিয়ে তুমি উপন্যাসের চরিত্রগুলির প্রতি সুবিচার করতে পারবে না। অতএব এই খাতাগুলি তুমি ফিরিয়ে নাও। যে-টুকুন লেখা হয়েছে তাই একদিন তোমাদের অভ্যস্ত বিরস জীবন-যাপনের ফাঁকে তোমার ভার্যাকে পড়িয়ে শুনিয়ো ও যথাসময়ে তোমাদের প্রথম শাবকের আবির্ভাবের পর কালক্রমে যখন তার জন্যে মাতৃস্তন্য অকুলান হ'য়ে উঠবে, তখন গো-দুগ্ধ তপ্ত করবার জন্যে এই খাতাগুলো ব্যবহার করো। ইতি।

তাহারই উত্তরে এই বুঝি সুধী-র চিঠি আসিল—সাত মাস বাদে! আশ্চর্য হইবার কারণ আছে বৈ-কি। এবং আশ্চর্য হইবার কারণ ঘটিলে কৌতূহল চাপিয়া রাখিতে বেশিক্ষণ চিরুনি চালানো অসম্ভব হইয়া উঠে। অতএব ম্যানেজারের পিতৃকুলকে নরকে পাঠাইয়া প্রদীপ চিঠি খুলিয়া ফেলিল।

সুধী বেশি কিছু লিখে নাই; শুধু দু'টি কথা: যত শিগ্‌গির পার চলে এস। তোমাকে আমার ভীষণ দরকার।

সাত মাসে নদী শুকাইয়া যে চর জাগিতেছিল, তাহাকে কখন এবং কি করিয়া যে অজস্র জোয়ার আসিয়া ভাসাইয়া দিয়া গেল, তাহা সত্যই বুঝা গেল না। প্রদীপ

তখুনি তাহার ছেঁড়া স্যুটকেসটা নিয়া ম্যানেজারের ভাতের থালায় লাথি মারিয়া স্টেশনের মুখে বাহির হইয়া গেল।

সুধী-দের বাড়িতে যখন আসিয়া পৌঁছিল, তখনো বিকালের আলোটুকু আকাশের গায়ে লাগিয়া রহিয়াছে। দুয়ারের কাছেই উমার সঙ্গে প্রথম দেখা। প্রদীপ সরাসরি জিজ্ঞাসা করিল—"সুধী কোথায়?" উমা ভড়কাইয়া গিয়া কি বলিবে কিছু ভাবিতে না ভাবিতেই, প্রদীপ প্রায় উমার গা ঘেঁষিয়া তাড়াতাড়ি যে-ঘরটাতে আসিয়া প্রবেশ করিল, তাহারই এক কোণে দরজার দিকে পিছন করিয়া সুধী তখনো টেবিলের উপর মুখ গুঁজিয়া তন্ময় হইয়া বই পড়িতেছে। হঠাৎ প্রদীপ তাহার দ্রুত পদবিক্ষেপগুলিকে সংযত করিয়া লইল। অতি ধীরে নিঃশব্দপদে সুধী-র পিছনে আসিয়া দুই হাত দিয়া তাহার চোখ টিপিয়া ধরিল। অল্প একটু মুখ তুলিয়া সুধী কহিল—"এই উঠছি! নমিতা, এখনো ঢের আলো আছে। বেশ অন্ধকার করে না এলে শালমর্মরের সঙ্গে মানুষের প্রেমগুঞ্জনের সঙ্গতি হয় না। ছাড়, দেখি কেমন সেজে এলে।"

চক্ষু হইতে হাত দুইটা সরাইয়া সুধী-র কর্ণমূলে স্থাপন করিয়া প্রদীপ কহিল—"এই তুই পাণিগ্রহণ করেছিস! মূর্খ! এখনো হাত চিনিস নি?"

সুধী চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিল। আনন্দদীপ্ত কণ্ঠে কহিল—"তুই এই অসময়ে এসে পড়লি? কখন চিঠি পেয়েছিস?"

"অসময়ে এসে পড়ছি বলে এই গণ্ডারের চামড়ার হাতকে তুই এমন অসম্মান করবি? বিয়ে করে তুই কাণা হ'য়ে গেলি নাকি?"

"দাঁড়া।" বলিয়া সুধী ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল এবং মুহূর্তমধ্যে যাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিল, তাহাকে দেখিয়া প্রদীপ এতটা অভিভূত হইল যে, মানুষের ভাষায় তাহার ব্যাখ্যা হয় না। সৃষ্টির প্রারম্ভে একাকী আকাশের তলায় দাঁড়াইয়া নিঃসঙ্গ প্রদীপ এমনি করিয়াই অভিভূত হইত হয়ত। একদিন পুরী-স্টেশন হইতে গরুর গাড়ি করিয়া বাহির হইয়া সমুদ্রের খোঁজে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, গাছ আর বৃক্ষান্তরালে আকাশের টুকরো; সহসা এক সময়ে দেখিল সমস্ত গাছ সরিয়া গেছে, দৃষ্টিকে অপরিসীম মুক্তি দিবার জন্য আকাশ শূন্যে বিলীন হইয়া গেছে—সম্মুখে ফেনফণাময় মহাসমুদ্র। সেদিনো প্রদীপ এমনিই অভিভূত হইয়াছিল। বিকালবেলা স্বামীর সঙ্গে শালবীথিতলে কয়েকটি নিভৃত মুহূর্ত যাপন করিবার জন্য নমিতা সাজিয়া আসিয়াছে—সেই দেহসজ্জায় কীই-বা ছিল আর! প্রদীপ রূপ দেখিল না, দেখিল বিভা—প্রতিভামণ্ডিত ললাটে ব্রীড়ার স্নিগ্ধতা, বুদ্ধিবিকশিত চোখে কুণ্ঠার মাধুর্য!

নমিতা যেন শরীরী আত্মা, যেন শেলির মূর্তিমতী কবিস্বপ্ন! প্রদীপ এমন পাগল যে, হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া তৃপ্ত হইবে না বলিয়া নীচু হইয়া নমিতার পা স্পর্শ করিয়া বসিল।

সুধী বলিল—"তুই যে দেবর লক্ষ্মণের মতো মুখ ছেড়ে পা-কেই বেশি মর্যাদা দিচ্ছিস?"

নমিতা লজ্জায় চক্ষু নামাইয়া, স্তব্ধ হইয়া রহিল, আর এমন একটা মুহূর্তে কেহ এমন একটা বাজে রসিকতা করিতে পারে ভাবিয়া প্রদীপের আর কথা বলিতে ইচ্ছা হইল না।

সুধী নমিতাকে কহিল—"তুমি নিশ্চয়ই এ কে বুঝতে পেরেছ। আমাদের উপন্যাসের নায়কের মাথাটাকে যে ভাগ্যের পায়ের ফুটবল বানিয়েছে। ভালো করে চেয়ে দেখ। ঘরে অতিথি এসেছেন, আর্য-পুত্রের কুশল প্রশ্ন কর। তুমি সীতা-সাবিত্রীর মাসতুতো বোন হ'য়ে অমন ঘাবড়ে গিয়ে ঘাড় গুঁজে থাকলে চলবে কেন?"

প্রদীপ কহিল—"একলা তোমার সম্বর্দ্ধনাই যথেষ্ট হয়েছে। বৌদির নীরব সহানুভূতিটির মূল্য তার চেয়ে কম নয়।"

সুধী। (নমিতার প্রতি) মুখে ও তা বলছে বটে, কিন্তু অমন শ্রীমুখের কথা না শুনে ওর পেট নিশ্চয়ই ভরবে না। তুমি যদি আজ আকাশের তারাগুলোর যোগাযোগে প্রদীপের দীপধারিণী হ'তে, তাহলে আমি তোমার ঐ বোবা মুখের ওপর অত্যাচার করে কথা ফোটাতাম।

নমিতা সুধী-র কনুইয়ে চিমটি কাটিয়া দিল।

সুধী। এ চিমটি তুমি প্রদীপকেও উপহার দিলে বেমানান হ'ত না। কেননা সাত মাস আগে তোমার উপর ওর দাবি আমারই. সমান ছিল। তোমার গায়ের গয়না যথেষ্ট নয় দেখে, আমি যদি বিয়ে-সভা থেকে সরোষে গাত্রোত্থান করতাম, আর প্রদীপ যদি সেই পরিত্যক্ত পিঁড়িতে এসে বসত, তাহলে তোমার আজকের এই রমণীয় কুণ্ঠাটি আমারই একান্ত উপভোগ্য হ'ত। ও তোমাকে প্রণাম করল, আর তুমি ওকে সামান্য একটু চিমটি কাটবে না?

নমিতার পক্ষে ইহা দাঁড়াইয়া সহ্য করা অস্বাভাবিকরূপে কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। স্বল্প একটু 'যাও' বলিয়া নমিতা অন্তর্হিত হইলে প্রদীপ বলিল—"এ তোমার বাড়াবাড়ি সুধী!"

সুধী। বাড়াবাড়ি মানে? নমিতাকে পাবার জন্যে কী মূল্য দিয়েছি? সমাজকে মেনে নিয়ে ওর দেহের ওপর একচ্ছত্র রাজত্ব করছি বটে, কিন্তু ওর মনকে আমারই

মধ্যে চেপে ধরে মলিন করে দেব, আমি সে-বর্বরতা সহ্য করতে পারবো না। ওর লজ্জা তোমাকে জোর করে ভেঙে দিতে হবে।

প্রদীপ। ওর লজ্জা ভাঙতে গিয়ে তোমারো মন যদি ভেঙে যায়?

সুধী। (দৃপ্ত-স্বরে) ভাঙুক! এই ঠুনকো মন নিয়ে আমি বাঁচতে চাই নে।

প্রদীপ। তোকে পাগলা কুকুরে কামড়ালো কবে?

সুধী। ঠাট্টা নয়। নমিতাকে আমার ভালো লাগে নি, লাগবেও না।

প্রদীপ। বলিস কি? এমন সুন্দর মেয়েটি—(থামিয়া গেল)।

সুধী। হ্যাঁ জানি, কিন্তু পরখ করে দেখলাম, নারী-মাংস আমার রুচবে না। গার্হস্থ-ধর্ম পালন করবার মত আমার মনের সেই প্রশান্তি বা প্রশস্ততা কিছুই নেই। আমি জীবনে যে ভুল করে বসেছি, তার থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে তোর সাহায্যের দরকার হয়েছে।

প্রদীপ। যথা?

সুধী। নমিতাকে জাগিয়ে দিতে হবে। ও আমাকে ভয় বা ভক্তি করতে পারবে বটে, কিন্তু ভালোবাসতে পারবে না; কারণ আমাকে কোনো দিন হারাবে বলে ওর মনে না থাকবে সন্দেহ না-বা আশঙ্কা। ও জল হ'য়ে চিরকাল আমার গ্লাশের রঙ ধরে থাকবে। ওর মধ্যে স্থিরতা থাকতে পারে, কিন্তু প্রাণ নেই। যার প্রাণ নেই সে কুৎসিত।

প্রদীপ। অন্ধকারে ঘরে বসে থেকে সব ঝাপ্সা দেখছিস। চল বেরোই।

সুধী। বাইরেও অন্ধকার বটে, কিন্তু মুক্তি আছে, বিস্তৃতি আছে। নমিতাকে তোর মানুষ করে দিতে হবে; ওর আত্মার অবগুণ্ঠন যদি ছিঁড়ে ফেলতে পারিস ভাই, তবেই হবে ওর পুনর্জীবন!

প্রদীপ। তুই তাহ'লে কি করতে আছিস, গর্দভ?

সুধী। ওর শরীরের ওপর পাহারা দেওয়া ছাড়া আমার আর কিছুই করবার নেই। তোর সঙ্গে নমিতার সম্পর্কে-ই একটা বন্ধনহীন ক্ষেত্র আছে, তোর কাছে ও নবীন, মধুররূপে অনাত্মীয়—সেইখানেই তোদের পরিচয় ঘটুক। তোর মাঝে নমিতাকে আমি পুনরাবিষ্কার করতে চাই।

প্রদীপ। এই সাত মাসেই এত সব সিদ্ধান্ত হ'য়ে গেল?

সুধী। রমণীর মন লক্ষ বর্ষ ধরেও আয়ত্ত করা যায় না, ঊনবিংশ শতাব্দীর এই সেন্টিমেন্টাল উক্তি আমি বিশ্বাস করি না। তাতে শুধু আয়ুরই বৃথা অপচয় ঘটে। আমার হাতে অত সময় নেই।

প্রদীপ। (হাসিয়া) আর আমারই আছে? এর জন্যে তুই আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিস? ভেবেছিলাম কারু অসুখ হ'ল বুঝি। আমাকে তোর ভীষণ দরকারের এই যদি নমুনা হয়, দে, সুটকেশটা এগিয়ে দে, চললাম ফিরে। ফরমাসে কবিতা এলেও বন্ধুতা আসে না।

এই সময় বেড়াইতে যাইবার পোষাকে অবনীনাথ সেই ঘরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ঘরে অপরিচিত লোক দেখিয়া কিছু জিজ্ঞাসা করিবার জন্য তিনি একটু ইতস্তত করিতেছেন, সুধী আগাইয়া আসিয়া কহিল—"এ আমার বন্ধু, প্রদীপেন্দ্র বসু—ভারতের ভাবী 'ডেলিভারার'।"

অবনীনাথ বিস্মিত হইবার আগেই প্রদীপ বলিল—"তার মানে?"

সুধী। (অবনীনাথের প্রতি) ইনি এক চড় মেরে এক গুণ্ডাকে শুইয়ে দিয়েছিলেন!

অবনীনাথ। তাই নাকি? দেখি, আমার সঙ্গে পাঞ্জা ধর ত! (শিশুর মত সরল বিশ্বাসে হাত প্রসারিত করিয়া দিলেন)।

প্রদীপ। (সঙ্কুচিত হইয়া) গুণ্ডা ঠেঙিয়ে আমি যদি ভারতের কনিষ্ঠ ডেলিভারার হই তাহলে দু' পাতা গল্প লিখে সুধী নিশ্চয়ই ভল্‌টেয়ার হয়েছে।

প্রসন্নহাস্যে মুখ উদ্ভাসিত করিয়া অবনীনাথ কহিলেন—"কয়েক দিন আছ ত?"

প্রদীপের মুখ হইতে কথা কাড়িয়া নিয়া সুধী বলিল—"নিশ্চয়ই।"

তাহার পর বন্ধুকে লইয়া সুধী একেবারে রান্নাঘরে আসিয়া হাজির,—সেখানে তাহার মা বঁটি পাতিয়া তরকারি কুটিতেছিলেন। সুধী হাঁকিল—"তোমার জন্যে আরেকটি ছেলে কুড়িয়ে আনলাম, মা! আরেকটি বাতি জ্বললো।"

প্রদীপ প্রণাম করিতেই অরুণা কহিলেন—"তোমার কথা অনেক শুনেছি আগে—সুধী-র সঙ্গে তোমার অনেক দিনের চেনা, অথচ আগে দেখিনি। ওর বিয়ের সময় ত রাগ করেই এলে না।"

প্রদীপ অল্প একটু হাসিল, কহিল—"সুধী-ও বিয়ে করে বয়ে যাবে এ-আঘাতের জন্যে তৈরি ছিলাম না। নিয়তিকে আমরা খণ্ডিত করব এই ছিল আমাদের পণ। দেখলাম পণের টাকা মিললে নিয়তি যথারীতি কাঁধে চড়াও হয়।"

সুধী নমিতার খোঁজে তাহার শুইবার ঘরে আসিয়া উঠিল। দেখিল, নমিতা তাহার বেড়াইবার দামী কাপড়-চোপড়গুলি ছাড়িয়া সাদাসিধা একখানি আটপৌরে শাড়ি পরিয়াছে। সুধী কহিল—"হঠাৎ এ বেশ? আমার বন্ধুকে দেখে এক নিমেষেই তপস্বিনী সেজে গেলে নাকি?"

নমিতা। বন্ধু এসেছেন, এখন বেড়াতে যাবে কি? যাও!

সুধী। বাঃ, বন্ধু এসেছেন বলেই মাঠে যাওয়া বন্ধ করে আমাকে এমন সন্ধ্যাটা মাঠে মারতে হবে নাকি? দাঁড়াও, ডাকি প্রদীপকে।

নমিতা। (বাঁধা দিয়া) দরকার নেই আজ গিয়ে। আমি যাবো না কক্খনো।

সুধী। কেন? আমার বন্ধুকে তোমার কিসের ভয়? তোমাকে ভয় দেখাতে ও বন্দুক নিয়ে আসেনি, যদিও তোমাকে জয় করতে দুই চক্ষুর দৃষ্টিই ওর যথেষ্ট।

নমিতা মনে মনে স্বামীর উপর নিদারুণ চটিতেছে, এমন সময় সুধী-র ডাকাডাকিতে প্রদীপ সেই ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সুধী। (নমিতাকে দেখাইয়া) দেখলে?

প্রদীপ। বেশ ত, নিরাভরণেই শ্রী! তারা ফোটবার আগেকার স্নিগ্ধ গোধূলি-আকাশটুকুর মতই তোমাকে দেখাচ্ছে, বৌদি।

সুধী। এই যাঃ, মাটি করে দিলে!

প্রদীপ। তার মানে?

সুধী। ঐ 'বৌদি'-কথাটা এসে এমন সুন্দর উপমাটাকে একেবারে বধ করলো। কর্ণ, বধির হও! (নমিতাকে) তুমিও যদি এবার কৃপা করে ওকে ঠাকুরপো বলে ডাক, তবেই কলির পাপ চারপোয়া পূর্ণ হ'য়ে ওঠে।

হাসিয়া নামিতা অন্তর্হিত হইল বটে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে দ্বারান্তরালে তাহার যখন পুনরাবির্ভাব হইল, দেখা গেল, উমার ঘর হইতে সে আরেকখানা শাড়ি পরিয়া আসিয়াছে। না সাজিলে তাহার লজ্জা যেন ঘুচিবে না। আড়ষ্ট হইতে না পারিলে তাহার এই অপরিচয়ের দৈন্য তাহাকে কেবলই পীড়া দিতে থাকিবে। ভাবের অভাব ঘটিলেই ভাষায় বর্ণবাহুল্যের প্রয়োজন ঘটে—নমিতা সেই ভাববিরহিত অলঙ্কৃত ভাষা—মূক, নিরর্থক!

উঠানটুকু পার হইবার সময় অরুণা বলিলেন—"ওকে এক্ষুণি বেড়াতে নিয়ে যাবি কি? এসে একটুও বিশ্রাম করল না।"

সুধী। শালের বনে বসেই বিশ্রাম করা হবে খন।

অরুণা। বাঃ, একটু জলখাবার খেয়ে যাক।

সুধী। তুমি ততক্ষণ তৈরি করতে থাক—তার চেয়ে হাওয়ায়ই বেশি উপকার হবে। তুমি বরং উমাকে ডেকে নাও, বৌ-র সাহায্য আজ পাচ্ছ না! বলিয়া সুধী হাঁক ছাড়িল—"উমি! উমি!"

উমা তবুও লুকাইয়া রহিল।

বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রীর অবারিত অনুরাগের মাঝে একটি স্বচ্ছ অন্তরাল রচনা করিয়া তাহাকে মধুরতর করিয়া তুলিবার জন্য যে তৃতীয় ব্যক্তিটির আবির্ভাব শুধু বাঞ্ছনীয় নয়, প্রয়োজনীয়, সেই তৃতীয় ব্যক্তিটিকে ত্যাগ করিয়া সহসা স্বামী যদি অন্তর্হিত হয়, তবে ব্যাপারটা সত্যই বিসদৃশ হইয়া উঠে। সুধী-কে পাশে না দেখিয়া প্রদীপের স্নায়বিক দৌর্বল্য উপস্থিত হইল। কিছু একটা কথা অনায়াসে বলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু শালবীথিকে বেষ্টন করিয়া প্রশান্ত ধ্যান-গাম্ভীর্যের মত যে-সন্ধ্যা ঘনাইয়া উঠিতেছে, একটা সামান্য ও সাধারণ কথা বলিয়া তাহার তপোভঙ্গ করিবার দুঃসাহস প্রদীপের হইল না। যেমন বসিয়া ছিল তেমনই বসিয়া রহিল। অদূরে নমিতা সঙ্কোচে, ভীরুতায় একেবারে এতটুকু হইয়া গেছে। নিজের বসিবার ভঙ্গীটি হইতে শুরু করিয়া এই অর্থহীন নিস্তব্ধতা পর্যন্ত তাহার কাছে অত্যন্ত বিশ্রী হইয়া উঠিল।

এমন মুশকিলে কে কবে পড়িয়াছে! এত নিকটবর্তী হইয়া ও এমন অনুচ্চারিত পরিচয় লইয়া কাহারা মুহূর্ত গুণিয়াছে! শালের বনে সুস্নিগ্ধ সন্ধ্যায় হৃদয়ের ভাষায় আলাপ করিবার জন্য মানুষের মুখের ভাষা যথেষ্ট সূক্ষ্ম হয় নাই কেন? ইহার চেয়ে যদি প্রদীপদের মেসের কাছে গ্যাস্‌পোস্‌টের সঙ্গে ধাক্কা খাইয়া একটা ছ্যাকড়া গাড়ি উল্টাইয়া পড়িত, তাহা হইলে গাড়ির মধ্য হইতে আহত সুধী ও নমিতাকে নামাইয়া তাহার ঘরের স্টোভে দুধ গরম করিয়া খাওয়াইয়া আলাপ জমাইতে বেগ পাইতে হইত না। কিম্বা, কল্পনা করা যাক, সুধী ও নমিতা বোটানিক্যাল গার্ডেনে হাওয়া খাইতে গিয়া একটা বেঞ্চিতে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছে, এমন সময় ছোরা-হস্তে এক গুণ্ডার আবির্ভাব হইল, অমনি পেছন হইতে যুযুৎসুর এক প্যাঁচ কষিয়া নিমেষে প্রদীপ ব্যাপারটাকে ইন্দ্রজালের চেয়েও রোমাঞ্চময় করিয়া তুলিল—এমন সাহসিক কীর্তি যে সে দুই একটা করে নাই তাহা নয়। তাহা হইলে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আলাপ করিবার ভার পড়িত নমিতারই উপর। (ধরা যাক্ সুধী উপস্থিত ছিল না), প্রদীপকে তাহা হইলে এমন ঘামিতে হইত না। কোনো একটা দুর্ঘটনা ঘটিলে আলাপটা কথা না কওয়ার মতই সহজ হইয়া উঠিত। এই সময় শুকনো পাতার ভিড় সরাইয়া একটা সাপ আসিয়া দেখা দিলেও অসঙ্গত হইত না—হিংস্র সাপ অনায়াসে কবিতার বিষয়ীভূত হইতে পারিত। কথা কহিতে পারিবে না, অথচ এই অতলস্পর্শ স্তব্ধতায় আত্মার গভীরতম পরিচয় গ্রহণ করিতে হইবে, মানুষের ভাষাকে বিধাতা এত অসম্পূর্ণ ও নিস্তেজ করিয়াছেন কেন? যাহা প্রত্যক্ষ তাহাই ত জ্ঞানের একমাত্র মূল নয়; কিন্তু যাহা প্রকাশের অতীত হইয়াও অনুভবের অগোচর নয়, সেই

চেতনাকে নমিতার প্রাণে সঞ্চারিত করিয়া দিবার উপায় কোথায়? এই নীরব আকাশকে ব্যঙ্গ না করিয়া সন্ধ্যার সঙ্গে অকৃত্রিম সঙ্গতি রাখিয়া এই হৃদয়চাঞ্চল্যটিকে প্রকাশিত করিবার অমিতশক্তি বাঙলা-ভাষা কবে লাভ করিবে?

সুখনিদ্রার মত অন্ধকার গাঢ় হইয়া উঠিতেছে, অথচ সুধী-র ফিরিবার নাম নাই। অবশেষে প্রদীপের মুখে অজ্ঞাতসারে ভাষা আসিল, "আর বসে কাজ নেই, চল।" এবং এই একটি মাত্র আহ্বানে নমিতা উঠিয়া পড়িল দেখিয়া, প্রদীপের খেয়াল হইল যে সে কথা বলিতে পারিয়াছে। এবং একবার যখন ব্যূহদ্বারের বিপুল বাধা পরাভূত হইয়াছে তখন প্রদীপকে আর পায় কে? মাঠটুকু পার হইয়া রাস্তায় নামিয়াই প্রদীপের রসনায় ভাষা অনর্গল হইয়া উঠিল, "দেখ, আমাদের দেশে মেয়ে-পুরুষে সহজে পরিচয়ের বাধা বিস্তর, কিছুতেই আমরা সামঞ্জস্য করে রাখতে পারি না! তোমরা আমাদের কর সন্দেহ, আমরা তোমাদের করি অশ্রদ্ধা। তাই আমরা মধুর সখ্যের আস্বাদ থেকে বঞ্চিত হ'য়ে আত্মাকে খর্ব ও কর্মশক্তিকে পঙ্গু করে রেখেছি। আমরা কিছুতেই সহজ হ'তে পারি না—সে আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য সাধনা। জড়িমার আবরণ রচনা করে আমরা আত্মরক্ষা করি—তোমরা হও সতী, আমরা হই সাধু। কিন্তু তা যে কত অসার তার মূল্য যে কত অল্প, তা আমরা বুঝি। এখনই একে-অন্যের বন্ধুতা করে আবার আমরা আবিষ্কৃত হই, যখন আমাদের জীবন প্রসারিত আয়তন লাভ করে।—দেখো, হোঁচট্ খেয়ো না—"

এই সব কথার উত্তর দিতে হইলে বড়ো-বড়ো কথা না কহিলে বেমানান হইবে, তাহার জন্য নমিতা এখনো প্রস্তুত হয় নাই; তাই হোঁচট খাইবার কথায় সামান্য একটু হাসিয়া নমিতা চুপ করিয়া রহিল। প্রদীপ জিজ্ঞাসা করিল—"সুধী হঠাৎ আমাকে ডেকেছে কেন বলতে পারো?"

নমিতা কহিল—কাশ্মীরে বেড়াতে যাবেন, আপনি সঙ্গী হবেন তাঁর।"

প্রদীপ। কাশ্মীরে? হঠাৎ? পৃথিবীতে এত লোক থাকতে কাশ্মীরের শীত সইতে আমি তাঁর সঙ্গী হব, আমার অপরাধ?

নমিতা। জানি না, কিন্তু তাঁর অপরাধ আরো গুরুতর। আমাকে সঙ্গে নেবেন না। বলুন ত এটা তাঁর অত্যাচার নয়?

প্রদীপ। তোমাকে সঙ্গে নেবে না কেন?

নমিতা। সে প্রশ্ন আমি তাঁকে করেছিলাম। তিনি বল্লেন, 'আমি বিশ্রাম করতে যাচ্ছি, সম্ভব হয়ত প্রদীপের সঙ্গে উপন্যাসটা শেষ করে ফেলব।'

প্রদীপ। তুমি গেলে তার বিশ্রামের ব্যাঘাত হবে কেন?

নমিতা। প্রথমত, আমি গেলে অনৈক্য ঘটবে, দ্বিতীয়ত, তাঁর সাহিত্য-সাধনা সিদ্ধ হবে না।

কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই নমিতা বুঝিল, তাহাদের গোপন মনোমালিন্যের এই ইতিহাসটুকু ব্যক্ত না করিলেই ভাল হইত। কিন্তু তাহার উত্তরে প্রদীপ যাহা বলিয়া বসিল, তাহাতেও তাহার লজ্জা কম হইল না। প্রদীপ কহিল—"তোমাকে একা ফেলে রেখে আমি ওর সঙ্গী হব আমাকে ও এত বোকা ভাবলে কিসে? তোমার সান্নিধ্যে ও যদি শ্রান্ত হ'য়ে থাকে, তাহলে ওর নৈকট্যে আমাকে সন্ন্যাসী হ'তে হবে নিশ্চয়।" বলিয়া কথাটাকে লঘু করিবার চেষ্টায় সে হাসিয়া ফেলিল। কিন্তু নমিতা আর কোন কথাই কহিতে পারিল না, ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। মনে হইল তাহাদের দুর্লক্ষ্য গোপন বেদনাটা প্রদীপের চোখে ধরা পড়িয়াছে। ধরা পড়িয়াছে বলিয়াই তাহার কথায় এমন স্পষ্টতা আসিয়াছে। ইহা নমিতার অভিপ্রেত ছিল না। স্বামীর কাছে কবে ও কেমন করিয়া সে যে তাহার রহস্য-মাধুর্য হারাইয়াছে, এমন নিবিড় মিলনে কবে যে অবসান ঘটিয়া অবসাদ আসিল, তাহা নির্ধারণ করিবার মত জ্যোতির্বিদ্যা নমিতার জানা ছিল না। নমিতাকে সুধী যে-পরিমাণ স্নেহ করে তাহার বিশেষণ দিতে গেলে অপর্যাপ্ত বলিতে হয়, অথচ নমিতাকে তাহার ভাল লাগে না—এই মনস্তত্ত্ব বুঝিবার মন তাহার নাই। এই বেদনাটি মনে-মনে লালন করিবার অবকাশে নমিতার মনে এই বিশ্বাস ছিল যে, একদিন স্বামীর চক্ষে সে এত মহিমা ও মর্যাদা লইয়া উদ্ভাসিত হইবে, যাহার তুলনায় তাঁহার কল্পনাকায়া সাহিত্য-লক্ষ্মী, নিষ্প্রভ, নিরাভরণ। তাহারই জন্য সে স্বামীর কাছে মনে-মনে একটি শিশু কামনা করিয়াছে। এবং এই কামনার ভুল ব্যাখ্যা করিয়া স্বামী তাহাকে ভাবিয়াছেন গ্রাম্য, স্থূল। স্বামী তাহাকে বলিতেন—"তুমি যে আমার স্ত্রী এই কথা সব সময়েই মনে রাখতে হয় বলে আমার ভাল লাগে না।" অথচ, এই প্রকার কৃত্রিম বিবাহজাত মিলনকে মাধুর্যপূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্য যে বিবাহের পরেও দীর্ঘকালস্থায়ী প্রণয়োপাসনার প্রয়োজন আছে, তাহা প্রথমে স্বামীই বিস্মৃত হইয়াছিলেন। প্রেমকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য যে-অনন্যপরায়ণ প্রতীক্ষা দরকার, তাহার ধৈর্য হারাইতে স্বামীই দ্বিধা করেন নাই। আজ সহসা নমিতা তাঁহার কাছে আবিষ্কৃত হইয়া গেছে!

বাড়ি আসিবার পথটুকু শীঘ্রই ফুরাইয়া গেল। সুধী তখনো ফিরিয়া আসে নাই। নমিতা আসিয়া শুধাইল—"মা বল্লেন, আপনার চা এখন নিয়ে আসবো?"

প্রদীপ কহিল—"মাকে বোলো, এখন চা খেলে আমার ক্ষুধার অকালমৃত্যু ঘটবে।"

নমিতা হাসিয়া বলিল—"রাতের খাওয়া হ'তে আমাদের বাড়িতে বেশ দেরি হয়, অতএব চা খেলে আপনার ক্ষুধা মরে গিয়েও ফের নবজীবন লাভ করবার সময় পাবে।"

প্রদীপ কহিল—"যদিও ক্ষুধাকে বাঁচিয়ে রাখবার ধৈর্য আমার আছে, তবু যখন বলছো, নিয়ে এস। দেখো, অতিমাত্রায় অতিথিপরায়ণ হ'য়ো না। অসুখ করিয়ে শেষে সেবার বেলায় ছুটি নেবে, সেটা আতিথ্যের বড়ো নিদর্শন নয়।"

রাত্রের খাওয়ায় দেরি হয় বটে, কিন্তু সকলে একসঙ্গে বসিয়া খায়—একই চতুষ্কোণ টেবিলের চারধারে চেয়ার পাতিয়া। দৃশ্যটা দেখিয়া প্রদীপ মুগ্ধ হইয়া গেল। পারিবারিক প্রীতির এই দৃষ্টান্তটির মধ্যে সে নরনারীর সমানাধিকারের সঙ্কেত পাইল। এত আনন্দ করিয়া, এত পরিতৃপ্তির সঙ্গে সে কোনোদিন আহার করিয়াছে বলিয়া তাহার মনে হইল না। আহার্য বস্তুগুলি অরুণাই বাঁটিয়া দিতেছিলেন, স্বাভাবিক সঙ্কোচের বাধা সরাইয়া বধূ নমিতাও অভিভাবকদের সম্মুখে সামান্য প্রগলভা হইয়া উঠিয়াছে। কথোপকথনের ফাঁকে-ফাঁকে উমার কলহাস্য বিরাম মানিতেছে না। নানা বিষয় নিয়া কথা হইতেছে—ভারতবর্ষের পরাধীনতা হইতে শুরু করিয়া গো-মাংসের উপকারিতা পর্যন্ত; সবাই সাধ্যমত টিপ্পনি কাটিতেছে, এবং অবনীবাবু তাঁহার স্বাভাবিক গাম্ভীর্যের মুখোস খুলিয়া যেই একটু রসিকতা করিতেছেন, অমনি সবাই সমস্বরে উচ্চহাস্য করিয়া নিজের-নিজের পরিপাক-শক্তিকে সাহায্য করিতেছে। প্রদীপ যে এই বাড়িতে একজন আগন্তুক অতিথিমাত্র, তাহা তাহাকে কে মনে করাইয়া দিবে? সামান্য খাইবার মধ্যে যে এত সুখ ছিল, মানুষের হাসি যে সত্যই আনন্দজনক—এই সব স্বতঃসিদ্ধ তথ্যগুলি সম্বন্ধে সে হঠাৎ সচেতন হইয়া উঠিল।

অরুণা প্রদীপকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—"সব আমার নিজের হাতের রাঁধা, তোমার মুখে রুচছে ত?"

দাঁতের ফাঁক হইতে মাছের কাঁটা খসাইতে-খসাইতে অবনীবাবু কহিলেন, "তুমি কি আশা কর তোমার এই প্রশ্নের উত্তরে প্রদীপ বলবে যে রুচছে না, ন্যাকার করছে? প্রদীপের সত্যবাদিতায় নিশ্চয় তুমি সুখী হবে না। ভদ্র হবার জন্যে কেন যে এ-সব মামুলি কথা বল তোমরা, ভেবে পাই নে।"

উমা টিপ্পনি কাটিল—"আর প্রদীপবাবু যদি ভদ্রতর হবার জন্যে বলেন যে স্বর্গসভায়

সুধা খাচ্ছি, তাহলে তাঁর অতিশয়োক্তিকে তুমি সন্দেহ করবে; তাতেও তুমি সুখী হবে না।"

প্রদীপ কহিল—"অতএব কোনো বাক্-বিস্তার না করে নিঃশব্দে খেয়ে চলাই আমার পক্ষে ভদ্রতম হবে!"

খাওয়ার পরে শুইবার ঘরে আসিয়া সুধী নমিতাকে কহিল—"তুমি মা'র কাছে আজ শোও গে; প্রদীপের সঙ্গে রাত্রে আমার ঢের পরামর্শ আছে।"

প্রদীপ প্রতিবাদ করিয়া উঠিল: "না বৌদি, অত আড়ম্বরে কাজ নেই। খেয়ে দেয়ে পরামর্শ করবার মতো ধৈর্য ও অনিদ্রা বিধাতা আমাকে দেন নি। বুঝলে সুধী, স্ত্রীকে ত্যাগ করে বন্ধুকে শয্যার পার্শ্বে দেওয়ার আতিথ্য এ-যুগে অচল হয়ে গেছে। তোমাদের ঘরের পাশেই যে ছোট বারান্দাটুকু আছে, তাতেই একটা মাদুর বিছিয়ে দাও—আমি এত প্রচুর পরিমাণে নাক ডাকাবো যে, জানালাটা খুলে রাখলেও তোমাদের প্রেমগুঞ্জন শুনতে পাবো না। ভয় পাবার কিছুই নেই সুধী। তা ছাড়া না-ঘুমিয়ে বসে-বসে কলম কামড়াবো, আজো তত বড়ো সাহিত্যিক হই নি।"

মাথা নাড়িয়া সুধী কহিল—"না, এ-ঘরে আজ নমিতার শোওয়া হবে না, তোমার সঙ্গে অনেক গোপন কথা আছে।"

প্রদীপ। কী গোপন কথা আছে? কাশ্মীরে যাওয়ার কথা ত? তোকে সোজা-সুজি বলে রাখছি সুধী, বৌদি না গেলে আমি যাব না কক্‌খনো।

সুধী। অত দূরে যাবার নমিতার কোনো দরকার নেই।

প্রদীপ। আর, আমারই জন্যে যেন কাশ্মীরের সিংহাসন খালি পড়ে আছে! বৌদির সান্নিধ্যে সাত মাস থেকে তোর যদি হাঁপানি উঠে থাকে, তবে তোর সঙ্গে একদিন থেকে আমার হবে প্লুরিসি।

নমিতাকে ঘর হইতে হঠাৎ চলিয়া যাইতে দেখিয়া, সুধী গম্ভীর হইয়া কহিল—"সত্যি প্রদীপ, বিয়ের পর এই একঘেয়েমি আমাকে ক্লান্ত করে ফেলেছে। আমি দিন কয়েকের জন্যে বিশ্রাম চাই, চাই বৈচিত্র্য!"

প্রদীপ জোর দিয়া কহিল—"এ তোর অত্যন্ত বাড়াবাড়ি, সুধী। বিয়ে এত ক্লান্তিকর হয়ে উঠবে এই যদি তোর ধারণা ছিল, তবে বিয়ে করা তোর নিদারুণ পাপ হয়েছে!"

সুধী। ধারণা আমার আগে ছিল না। তাই বলে ভুলকে সংশোধন করবে না—আমি তত ভীরু নই। নমিতা আমাকে তৃপ্ত করতে পারে নি।

প্রদীপ। কিন্তু বিয়ের আগে এই নমিতার রূপ ও তার বাপের টাকা তোর

নয়নতৃপ্তিকর হয়ে উঠেছিল—তুই লোভী! বিয়ে করে ফেলে নমিতার ওপর বীতরাগ হওয়া নীতিতে ত বটেই, আইনেও দণ্ডনীয় হওয়া উচিত।

সুধী। তা আমি বুঝি। তাই প্রকাশ্যে আমি আমার এই ঔদাসীন্যের পরিচয় দিতে সব সময়েই ক্লেশ বোধ করেছি। আমি নমিতাকে ভালোবাসি না এমন নয়, কিন্তু ভালো লাগে না। আমার রুচির সঙ্গে ওর মিল নেই।

প্রদীপ। সে-জন্যে নমিতাকে দায়ী করলে অন্যায় হবে। তোর ব্যক্তিত্বের মধ্যে ওর ব্যক্তিত্বকে সঙ্কুচিত করে রাখার চেয়ে তাকে একটা স্পষ্ট ও উজ্জ্বল মূর্তি দেওয়ার চেষ্টা করাই উচিত মনে করি। মোট কথা জানিস কি সুধী, এই সব জায়গায় স্বামীকে তার অহঙ্কারের চূড়া থেকে নেমে আসতে হয় স্ত্রীর সঙ্গে এক সমতল ভূমিতে—নইলে সঙ্গতির আর আশা নেই। তুই যেমন আপশোষ করছিস, নমিতাও তেমনি হয়ত তার ভাগ্যকে ভৎর্সনা করছে। ভাবছে, কেন সাহিত্যিককে বিয়ে করলাম—এর চেয়ে একটি গৃহস্থ-কেরানী শতগুণে লোভনীয় ছিল। বিয়ের অপর নামই হচ্ছে স্ত্রী-পুরুষের শারীরিক একটা রফা। সন্ধির সর্ত ভাঙতে গেলেই আসে সামাজিক অশান্তি; আমরা সভ্য লোক, ওটাকে এই জন্যেই এড়িয়ে যেতে চাই যে, অশান্তিটা কালক্রমে মনেও সংক্রামিত হয়। ভুল সংশোধন করার অর্থ আরেকটা ভুল করে বসা নয়। বিয়েটা দুটো জীবনের সঙ্গে সমাজকে এমন ভাবে জড়িয়ে আছে যে, তাকে ভাঙার চাইতে জোড়া-তালি দিতে গেলে অগৌরব হয় না। ডিভোর্সের আমি পক্ষপাতী—কিন্তু 'ভালো লাগে না' এই ওজুহাতই যদি বিবাহচ্ছেদের প্রধান কারণ বলে স্বীকার করা যায়—তাহলে পৃথিবীতে আত্ম-হত্যাও অত্যন্ত সুলভ হয়ে উঠবে। নমিতা তেমন লেখা-পড়া শেখে নি, রাজধানীর আবহাওয়ায় তার অঙ্গসজ্জা রাজসংস্করণ লাভ করে নি বা সে স্নায়ুহীন কবি-প্রিয়া না হয়ে সংসারকর্ম্মক্ষমা গৃহিণী হতে চায়—এই যদি তার ত্রুটির নমুনা হয়, তবে বিয়ের আগে তোরই সাবধান হওয়া উচিত ছিলো, এখন তোর কাজ হচ্ছে নমিতাকে তোর উপযুক্ত করে তোলা।

সুধী। যে-কাজে আনন্দ নেই, সে কাজে আমার মন ওঠে না। আচ্ছা এক কাজ করা যায় না? বাঙলা-সমাজ আঁৎকে উঠবে হয়ত।

প্রদীপ। কি?

সুধী। ধর, আমি যদি আজ নমিতাকে ত্যাগ করি—হ্যাঁ, অন্য কোনো কারণে নয়, খালি তাকে আমার ভালো লাগে না বলে—এবং তার বিস্ময়ের ভাবটুকু কাটতে না কাটতেই, যদি তুই ওকে লুফে নিস—ব্যাপারটা কেমন হয়?

এমন একটা গুরুতর কথার উত্তরে কেহ যে এত জোরে হাসিয়া উঠিয়া প্রশ্নটাকে ব্যঙ্গ করিবার সাহস দেখাইতে পারে, তাহা সুধী-র জানা ছিল না। তাহার মনে হইল, কথাটা বলিয়া ফেলিয়া সে যেন কি-একটা অপরাধ করিয়াছে। নমিতা কি-একটা কাজে বারান্দা দিয়া যাইতেছিল, প্রদীপ ডাকিয়া উঠিল : "সঙ্গে তুমি কি-কি জিনিস নেবে, তার একটা ফর্দ আজ এক্ষুণি করে ফেলতে হবে। লেপ দু'খানা হ'লেই চলবে—লেপ গায়ে দিয়ে ট্রেনে ট্রাভেল্ করার মত সুখ আর নেই। শুনে যাও, বৌদি।"

"আসচি।" বলিয়া নমিতা অন্তর্হিত হইতেই প্রদীপ কহিল—"কাশ্মীর ছেড়ে কাঁকে গেলেই ভালো করতিস সুধী।"

অল্পক্ষণ পরেই নমিতা আসিল, তাহার সংসারের সব কাজ সমাধা হইয়াছে। প্রদীপ কহিল—"যাবে ত, কিন্তু তোমার অনেক কাজ করতে হবে মনে থাকে যেন। চা করে দেবে, গাড়ি ধরবার সময় প্ল্যাটফর্মে তাড়াতাড়ি হাঁটতে হবে, ভুলে লাগেজের গাড়িতে উঠে পড়বে না, গাড়ির ঝাঁকুনির টাল সামলাতে গিয়ে শেকল টেনে দেবে না, কলিশান্ হ'লে বাড়ির জন্যে মন-কেমন করলে জরিমানা দেবে।"

নমিতা হাসিয়া উঠিল। ভারতের ভূস্বর্গে সশরীরে আরোহণ করিতে পারিবে ভাবিয়া আরেকটু হইলে সে ছোট খুকির মত হাততালি দিয়া উঠিত। স্বামীকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিল—"কবে যাচ্ছি?"

সুধী-র উৎসাহ যেন উবিয়া গেছে। বিরসকণ্ঠে কহিল—"যেদিন সুবিধে হবে।" পরে প্রদীপকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"তোমার সঙ্গে কাশ্মীর যাওয়ার আমার উদ্দেশ্যই ছিল আমার মনের এই সমস্যাকে পরিষ্কার করে তুলতে। যখন এ সম্বন্ধে তোমার কোনো সহানুভূতি নেই, তখন কাশ্মীরে যাওয়া বন্ধ রইলো। বাকি জীবনটা এখানেই যা হোক করে কাটিয়ে দেব'খন।

"জীবন-সম্বন্ধে তোমার এই দিব্যজ্ঞান দেখে বাধিত হলাম।" কিন্তু চাহিয়া দেখিল নমিতার মুখ চূণ হইয়া গেছে। আবহাওয়াটাকে হালকা করিবার জন্য মুখে হাসি আনিয়া প্রদীপ কহিল—"সুবিধে আমার কালই হচ্ছে। কালকেই আমি সকালের ট্রেনে কলকাতা গিয়ে গাড়ি-টাড়ি সব রিজার্ভ করে আসছি। কাগজ-পেন্সিল নিয়ে এস বৌদি, কি-কি জিনিস কিনে নিতে হবে, তার একটা হিসেব করে নেওয়া দরকার। আমরা তীর্থ করতে যাচ্ছি না যে, পথের কষ্টভোগকে আমরা স্বর্গারোহণের দাম বলে মেনে নেব। আমরা যাচ্ছি বেড়াতে—পান থেকে চূণ খসলেই আমাদের মুশকিল। রেলের কামরাটাকে আমরা একটা অতি-আধুনিক ড্রয়িং-রুম করে ছাড়বো।

নমিতার মুখ তবুও প্রসন্ন হইল না। একান্তে প্রদীপকে বলিবার জন্যই সে একটু নিম্নস্বরেই কহিল—"মুখ থেকে কথা যখন একবার বেরিয়েছে তখন আর তার নড়চড় হবে না, দেখবেন।"

প্রদীপ জোর দিয়া বলিয়া উঠিল—"বেশ ত, নাই-বা গেল সুধী—তুমি আর আমি যাবো। তুমি তার জন্যে ভেবো না, কাশ্মীর না হোক, লিলুয়া পর্যন্ত আমরা যাবোই—আমি আর তুমি।"

দেখিতে দেখিতে তাহাদের দুই জনের আলাপ এত জমিয়া উঠিল যে তাহারা এক সময়ে টাইম-টেবিল খুলিয়া বম্বে মেইল ও লাহোর এক্সপ্রেসের স্পিড-এর তারতম্য বাহির করিতে অঙ্ক কষিতে বসিল। সুধী কখন চেয়ার ছাড়িয়া বিছানায় গিয়া শুইয়াছে, তাহা নমিতা লক্ষ্য করিলেও প্রদীপের খেয়াল ছিল না; সে গল্প নিয়া এমন মাতিয়া উঠিয়াছে! নমিতা তন্ময় হইয়া কথা শুনিতেছিল, শ্রোত্রী হিসাবে তাহাকে কেহ কোন দিন এত প্রাধান্য দেয় নাই—এই ক্ষণ-বন্ধুতাটি তাহার কাছে এত রমণীয় লাগিতেছিল যে, স্বাভাবিক সঙ্কোচ বিসর্জন দিয়া নিজের কথা কিছু বলিতে পারিলে তাহার তৃপ্তির শেষ থাকিত না।

সেই সুযোগ আসিল। প্রদীপ হঠাৎ সচেতন হইয়া কহিল—"নিজের কথাই পাঁচ কাহন বলে যাচ্ছি—আমার জীবন-ইতিহাসের আদ্যোপান্ত নেই, বৌদি? আমি একটা চলমান গ্রহ—কখনো-কখনো বা কারো অচল উপগ্রহ হয়ে থাকি। তোমার বাপের বাড়ির কোনো বৃত্তান্তই জানা হ'ল না। বর্তমানের বন্ধুতাকে অতীত কালেও বিস্তৃত করে দিতে হয়; এই কথা মনে রাখা চাই বৌদি, যে বহু আগেই আমাদের দেখা হবার কথা ছিল—হয় নি, সে একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা মাত্র।"

কি বলিবে নমিতা কিছু ভাবিয়া পাইল না। তবু কথা কহিবার অদম্য-উচ্ছ্বাসে অসংলগ্ন ভাষায় সে যাহা বলিয়া চলিল, তাহা গুছাইয়া সংক্ষেপে এই: নমিতার বাবা রঙ্পুরে ওকালতি করিতেন। তাহার এক দাদা ছিল, বছর দুই আগে স্বদেশী করিতে গিয়া পুলিসের হাতে যে মার খাইয়াছিলেন, তাহাতেই মারা গিয়াছেন। সেই শোকেই বাবা ভাঙিয়া পড়িলেন, সমস্ত সংসার ছত্রখান হইয়া গেল। বাবা ওকালতি করিয়া ঢের পয়সা জমাইয়াছিলেন, খুড়ো-মহাশয় চালাকি করিয়া তাহাতে হাত দিলেন। মা ও তাহার ছোট বোনটি এখন তাহার কাকারই আশ্রিত। কাকা কলিকাতায় দালালি করেন, অবস্থা মোটেই স্বচ্ছল নয়—তবে বাবার জমানো পয়সা হাতড়াইয়া এখন একটু সুরাহা করিতে পারিয়াছেন। কাকার স্বভাব অত্যন্ত রুক্ষ, কাকিমা তাঁহারই সহধর্মিণী। সম্পর্কের দাবিতে গুরুজন হইলে

াক হইবে, কাকার প্রতি নমিতার মন মোটেই প্রসন্ন নয়। মা'র প্রতি তাঁহাদের ব্যবহার ঠিক গুরুভক্তির পরিচায়ক হইয়া উঠে নাই। মা বিষয়বুদ্ধিহীন—এমন কেহ •াই যে, তাহাদের এই সম্পত্তি-সঙ্কটের সময় সাহায্য করে; মা যে কাকার আশ্রয় ছাড়িয়া অন্যত্র বাসা করিবেন, তদারক করিবার জন্য তেমন আত্মীয় অভিভাবকও তাহাদের নাই। নমিতাকে ভালো ঘরে বিবাহ দিবার জন্য তাহার বাবার একান্ত অভিলাষ ছিল, সেই জন্য যথেষ্ট টাকাও রাখিয়া গিয়াছেন। সৌভাগ্যক্রমে তাহার ভালো ঘরে বিবাহ হইয়াছে বটে, (এখানে নমিতা একটু হাসিল) কিন্তু পণের টাকা দিয়া বিবাহের যাবতীয় খরচেই নাকি বাবার বিত্ত প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। কাকা যে মা ও তাঁহার ছোট মেয়েকে এতদিন ভরণ-পোষণ করিতেছেন, তাহার টাকা নিশ্চয়ই ছাত ফুঁড়িয়া পড়িতেছে না। নমিতা মেয়ে হইয়া জন্মিয়া মা ও ছোট বোনটির কাছে অপরাধী হইয়া আছে। এমন সুযোগ্য জামাই পাইয়া মা যে আত্মীয়-গৌরবে উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার সামান্য দিবাস্বপ্ন মাত্র।

হঠাৎ চেয়ার হইতে উঠিয়া নমিতা বলিল—"যান, এক্ষুণি শুয়ে পড়ুন গে। আমি মা'র ঘরে যাচ্ছি। মা আবার এত রাত পর্যন্ত গল্প করেছি টের পেলে বকবেন হয়ত।" বলিয়া নমিতা বারান্দার দরজা দিয়া চলিয়া যাইতেছিল, প্রদীপ তাহাকে বাধা দিল; কহিল—"তুমি কি পাগল হয়েছ নাকি? মা'র বকুনি খাবার লোভে তুমি তোমার এই উত্তপ্ত সুখশয্যা অতিথিকে ছেড়ে দিয়ে যাবে, এতে সতী-ধর্মের অবমাননা হবে, বৌদি। বারান্দায় একটা ডেক্-চেয়ার দেখা যাচ্ছে, না? দাঁড়াও।" নমিতাকে এক পা-ও নড়িবার অবকাশ না দিয়া প্রদীপ তাড়াতাড়িতে তাহাকে ঈষৎ স্পর্শ করিয়া বারান্দায় চলিয়া আসিল এবং দ্বিরুক্তি না করিয়া পেছন হইতে দরজাটা টানিয়া শিকল তুলিয়া দিল।

ডেক্-চেয়ারটায় বসিল বটে, কিন্তু ঘুম আসিবার নাম নাই। তাই বলিয়া অন্ধকার আকাশে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া, অস্তমান চাঁদের দিকে চাহিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিবার মত দৌর্বল্য প্রদীপের ছিল না। চক্ষুর পাতা দুইটাকে জোরে চাপিয়াও নিদ্রাকে বন্দী করা যাইতেছে না—নানা পারম্পর্যহীন ছবি অন্তর-চক্ষুর সামনে ভাসিয়া উঠিয়া তাহাকে উদ্‌ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। নমিতাদের ঘরের আলো কখন নিবিয়া গেল, তাহা টের পাওয়া মাত্রই প্রদীপের কেমন একটা বিশ্বাস হইল যে, নমিতারো দুই চোখে শুষ্ক, বেদনাহীন বিনিদ্রতা বিরাজ করিতেছে। প্রাচীরের ব্যবধানের অন্তরাল হইতে প্রদীপের আত্মা যেন নমিতার আত্মার স্পর্শ পাইল, সেই স্পর্শরসে স্নান করিতে-করিতে অতলস্পর্শ নিদ্রার সমুদ্রে সে ডুবিয়া গেল।

সকালে চায়ের টেবিলে সুধী বলিল—"কাল রাতে একটু জ্বরভাব হয়েছে; গাড়ি ইত্যাদি ঠিক করতে আজকেই তোমার কলকাতা গিয়ে কাজ নেই, প্রদীপ। চায়ের সঙ্গে এই দুটো ইনফ্লুয়েঞ্জা ট্যাব্‌লেট খাচ্ছি, বিকেলেই মাথাটা ছাড়বে হয়ত। রাত্রের ট্রেনে যেয়ো।"

সেই জ্বরই সতেরো দিন পরে যখন ছাড়িল, তখন সুধী কাশ্মীর উত্তীর্ণ হইয়া যে-পথে পাড়ি জমাইয়াছে সে-পথ ঘুরিয়া-ফিরিয়া পুনরায় পৃথিবীতে আসিয়া সমাপ্ত হয় নাই। আবার এই ধূলার ধরণীতেই প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে—এমন একটা বৈচিত্র্যহীন পৌনঃপুনতে অভিসারিকা আত্মা অমর্যাদা বোধ করে। সুধী আর এই মৃত্তিকায় ফিরিয়া আসিবে না, আকাশের অগণন তারার মধ্য হইতে সে একটিকে বাছিয়া লইয়া সেইস্থানে অবতীর্ণ হইবে; সেখানে নবজন্মের নবতর আস্বাদ পাইবে, নরদেহ লইয়া তাহা কল্পনা করিবারও তাহার সাধ্য ছিল না।

সুধী-র তিরোধানে সমস্ত সংসার ওলোটপালট হইয়া গেল। না আছে শৃঙ্খলা, না আছে শ্রী। সব চেয়ে আশ্চর্য এই, মানুষগুলিও তাহাদের মুখের চেহারার সঙ্গে সঙ্গে মনের চেহারাও বদলাইয়া ফেলিয়াছে। বাঁচিয়া থাকিয়া সংসারের এই অবস্থা দেখিলে, সুধী নিশ্চয়ই বনবাসী হইত।

নমিতা এখন এই সংসারে কায়াহীন ছায়ামাত্র—এখানে তাহার আর প্রয়োজন নাই, সে যেন তাহার জীবনের সার্থকতা হারাইয়া বসিয়াছে। নমিতা যেন একটা নির্বাপিত প্রদীপ—অন্ধকারে তাহার নির্বাসন। বিকাল-বেলা নমিতা বারান্দায় চুপ করিয়া বসিয়াছিল, পিঠের উপর ঘন চুল নামিয়া আসিয়াছে, বসিবার ভঙ্গীটিতে একটি অসহায় ক্লান্তি। এইবার নমিতা কি করিবে, কোথায় যাইবে, কিছুই ভাবিয়া কিনারা করিতে পারিতেছে না। এই সংসারে উপবাসী ভিক্ষুকের মত কৃপাপ্রার্থিনী হইয়া তাহাকে কাল কাটাইতে হইবে ভাবিয়া তাহার অসহায় মন সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। অথচ এই বিস্তীর্ণ পৃথিবীতে এই সামান্য ক্ষুদ্র গৃহকোণটি ছাড়া তাহার পা ফেলিবার স্থানই বা কোথায়? স্বামীর কাছে অপ্রতিবাদ আত্মদানের ফাঁকে সে স্বামীকে ভালবাসিতে চেষ্টা করিয়াছিল বটে, কিন্তু সেই প্রেম সন্তান-স্নেহ দ্বারা রঞ্জিত হয় নাই। তাই সুধী-র মৃত্যুতে অরুণা শোক করিয়াছেন সুধী-রই জন্য, নমিতা শোক করিয়াছে তাহার নিজের জন্য, তাহার এই অবাঞ্ছিত নিরুপায় বৈধব্যের ক্লেশ ভাবিয়া। এই বৈধব্য-পালনে সে না পাইবে আনন্দ, না-বা তৃপ্তি।

কিন্তু ইহাকে লঙ্ঘন করিবার মত বিদ্রোহাচরণের উদ্দাম শক্তিও তাহার নাই। মাথা পাতিয়া এই কৃত্রিম অনুশাসনের অত্যাচার তাহাকে সহিতে হইবে।

প্রদীপ কখন যে নিঃশব্দে পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা নমিতা টের পাইলে নিশ্চয়ই মাথার উপর ঘোমটা টানিয়া দিত। সে দুই হাতে জানালার শিক ধরিয়া তেমনি বসিয়া রহিল। যেন দুই হাতে দুইটা দুর্লঙ্ঘ্য বাধা ঠেলিয়া ফেলিবার জন্য সে সংগ্রাম করিতেছে। নমিতার মূর্তিতে এই প্রতিকারহীন বেদনার আভাস দেখিয়া, প্রদীপের মন ম্লান হইয়া উঠিল। কণ্ঠস্বর আর্দ্র করিয়া সে কহিল—"নমিতা, আমি চল্লাম।"

নমিতা চমকিয়া উঠিল। বেশবাস তাড়াতাড়ি পরিপাটি করিয়া প্রদীপের মুখে তাহার নামোচ্চারণ শুনিয়া, সে একটি ক্ষীণ রোমাঞ্চ অনুভব করিতে-করিতে স্তব্ধ হইয়া রহিল। আজ সুধী-র অবর্তমানে নমিতার পরিচয়—সে একমাত্র নমিতা-ই; প্রদীপ তাহাকে সম্বোধন করিবার আর কোনো সংজ্ঞা খুঁজিয়া পাইল না। নমিতার ইচ্ছা হইল, অনেক কিছু বলিয়া নিজেকে একেবারে হালকা করিয়া ফেলে—এই অপরিমেয় স্তব্ধতার সমুদ্রে পড়িয়া সে একা-একা আর সাঁতার কাটিতে পারিতেছে না। প্রদীপ ও তাহার মধ্যে যে-পরিচয় নিবিড় হইয়া উঠিয়াছিল, মৃত্যু আসিয়া তাহার মধ্যে অনতিক্রম্য বাধা বিস্তার করিয়া দিয়াছে। তাই নমিতা কোনো কথাই বলিতে পারিল না—স্বামীর অবর্তমানে প্রদীপের কাছে নমিতার পরিচয়—আর বন্ধু নয়, মৃত বন্ধুর বিধবা-বধূ মাত্র—দেহের সঙ্গে-সঙ্গে আত্মাকেও তাহার আজ নিমীলিত অবগুণ্ঠিত করিয়া রাখিতে হইবে। জগতে তাহার সত্তাহীনতাই এখন প্রধান সত্য।

নমিতাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া প্রদীপ কহিল—"পারিবারিক সম্পর্কে তোমার নিকটে না থাকলেও আমি তোমার আত্মীয়, নমিতা। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের সংসার আজকাল পরিবারকে ছাড়িয়ে উঠেছে, সেখানে তোমার সঙ্গে আমার পরিচয়ের বাধা নেই। অতএব প্রয়োজন বোধ করলে আমাকে কাজে লাগাতে কুণ্ঠা কোরো না। আমি আপাতত তোমাদের ছেড়ে চল্লাম বটে, কিন্তু হয়ত আবার আমাকে ফিরে আসতে হবে। ট্রেনের সময় বেশি নেই; আচ্ছা, আসি। নমস্কার!" বলিয়া প্রদীপ দুই হাত জোড় করিয়া নমস্কার করিল।

এইরূপ অনড় জড়পদার্থের মত বসিয়া থাকাটা অস্বস্তিকর মনে হওয়াতে নমিতা উঠিয়া দাঁড়াইল; কিন্তু যে-নমিতা একরাত্রে হৃদ্যতার আবেগে অত্যন্ত প্রগল্‌ভা হইয়া উঠিয়াছিল, সে আজ নীরবে সামান্য নমস্কারটুকু পর্যন্ত ফিরাইয়া দিতে পারিল না।

সুধী যেন তাহার ব্যক্তিত্বকে লুণ্ঠন করিয়া নিয়াছে, ভাঙা চশমার খাপের মতই সে আজ অপ্রয়োজনীয়, নিরর্থক।

নমিতাকে দাঁড়াইতে দেখিয়া প্রদীপ ফিরিল। নিভৃতে বলিবার জন্যই সে নমিতার কাছাকাছি রেলিঙ ধরিয়া দাঁড়াইল; কহিল—"সংসারের খরচের খাতায় তুমি নাম লেখাবে—এই আত্ম-অপমান থেকে তুমি নিজেকে রক্ষা কোরো। তোমার মূল্য খালি সুধী-র স্বামীত্বই নির্ধারণ করে নি। স্ত্রী হওয়া ছাড়াও তোমার বড়ো পরিচয় আছে—তুমি নারী, তুমি স্বপ্রধান। একজনের মৃত্যুর শাস্তি তোমাকেই সারা জীবন সয়ে বিড়ম্বিত হতে হবে—তা নয়, নমিতা। মৃত্যু যদি সুধী-র পক্ষে রোগ-মুক্তি হয়, তোমার পক্ষে দায়িত্বমুক্তি। সে-কথা তুললে তোমার পাপ হবে।" বলিয়া ভাবাবেগের আতিশয্যে প্রদীপ হঠাৎ রেলিঙের উপর নমিতার একখানি হাত চাপিয়া ধরিল।

সেই দৃশ্যটি দূর হইতে অবনীবাবু দেখিলেন। তিনি নীচে নামিতেছিলেন, থমকিয়া দাঁড়াইলেন। দৃশ্যটা তাঁহার চোখে মোটেই ভাল লাগিল না; ভাল লাগিল না নয়, তাঁহার মন মুহূর্তের মধ্যে প্রদীপের প্রতি বিমুখ হইয়া উঠিল। অবনীবাবু জানিতেন, স্ত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হইবার পথে সুধী প্রদীপের জন্য কোনো বাধাই রাখে নাই। এই পরিবারে প্রদীপ অবারিত অভ্যর্থনাই লাভ করিয়াছে। সুধী বাঁচিয়া থাকিলে নমিতার সঙ্গে প্রদীপের এই সান্নিধ্য হয়ত অবনীবাবুর চোখে বিসদৃশ বা অসঙ্গত ঠেকিত না, কিন্তু সুধী-র অবর্তমানে প্রদীপের এই সৌহার্দ্য তাঁহার কাছে শুধু অন্যায় নয়, অনধিকারজনিত অপরাধ বলিয়া মনে হইল। নিমেষে পূর্বার্জিত সমস্ত উদারতা বিসর্জন দিয়া অবনীবাবুর মন ঘৃণায় সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল।

প্রদীপ বিদায় লইয়া চলিয়া যাইতেই নমিতা আবার তেমনি রেলিঙ ধরিয়া বসিয়াছে। আন্দোলিত মনকে শান্ত করিবার চেষ্টায় সে তাহার মা'র মুখ স্মরণ করিতেছিল, এমন সময় পেছন হইতে অবনীবাবু ডাকিলেন: "বৌমা!"

সহসা ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পে বাড়ি-ঘর-দোর দুলিয়া উঠিলেও নমিতা এত চমকাইত না। শ্বশুরের মুখে এমন কর্কশ ডাক শুনিতে সে অভ্যস্ত ছিল না। সংশয়ে তাহার মন ছোট হইয়া গেল। দুই চোখে নীরব কাকুতি নিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। অবনীবাবু কণ্ঠস্বর একটুও স্নিগ্ধ করিলেন না; কহিলেন—"প্রদীপ চলে গেল বুঝি? তোমার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে অত ঘটা করে থিয়েটারী ঢঙে কী বলছিল ও?"

নমিতার মন শত রসনায় ছি ছি করিয়া উঠিল। তাহার দেবতুল্য শ্বশুর এত সন্দিগ্ধ ও সঙ্কীর্ণচিত্ত হইয়া উঠিয়াছেন ভাবিয়া নিদারুণ অপমানে নমিতার আত্মা

ক্ষত-বিক্ষত হইতে লাগিল। কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু প্রতিবাদ করিবার সাহস হইল না। এ-যুগে মাতা বসুন্ধরার কাছে আশ্রয় চাহিলে প্রার্থনা পূর্ণ হয় না, তাই নমিতা তেমনি অচল নিষ্প্রাণ প্রতিমার মত দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঘামিতে লাগিল। কিন্তু কিছু একটা তাহার বলা দরকার—শ্বশুর-ঠাকুরের মুখ সন্দেহে ও ঘৃণায় কুটিল হইয়া উঠিয়াছে। ভয়ে ও দুঃখে তাহার কণ্ঠস্বর ফুটিতে চাহিল না, তবুও প্রাণপণ চেষ্টায় ভয়কে দমন করিয়া সে কহিল—"আমাদের খোঁজ নিতে আবার আসবেন বলে গেলেন।"

—"আবার আসবে?" অবনীবাবু এত চেঁচাইয়া উঠিলেন যে, পাশের ঘর হইতে অরুণাও আসিয়া দাঁড়াইলেন: "এবার এলে রীতিমত তাকে অপমানিত হতে হবে। পরস্ত্রীর সঙ্গে কি ভাবে আলাপ করতে হয় সে-সৌজন্য পর্যন্ত শেখে নি, ছোটলোক অভদ্র কোথাকার! আবার আসবে! কিসের জন্যে আবার আসা হবে শুনি? তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, বৌমা—"

মুখ পাংশু করিয়া অরুণা বলিয়া উঠিলেন—"কি, কি হয়েছে?"

কথাটার সোজা উত্তর না দিয়া অবনীবাবু কহিলেন—"মুখ দেখে লোক চেনা যায় না, যত সব মুখোস-পরা জানোয়ার। বিশ্বাসের সম্মান যে রাখতে না পারে, তার মত হীনচরিত্র আর কেউ নেই। আবার আসবে সে! আসুক না।" বলিয়া রাগে ফুলিতে-ফুলিতে অবনীবাবু ফিরিলেন; ব্যাপারটা খোলসা করিয়া বুঝিতে অরুণাও তাঁহাকে অনুসরণ করিতে দেরি করিলেন না।

কোথা দিয়া যে কি হইয়া গেল, নমিতা কিছুই আয়ত্ত করিতে পারিল না। বজ্রাহত লোক যেমন স্তম্ভিত হইয়া থাকে, তাহার বুদ্ধিবৃত্তি তেমনি আড়ষ্ট হইয়া রহিল। লক্ষ্য করিল তাহার পা কাঁপিতেছে; সে রেলিঙ ধরিয়া আবার বসিয়া পড়িল। তাহার মন কাঁচের বাসনের মত ভাগ্যের এই নিষ্ঠুর মুষ্টাঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেছে; শরীরের এই অমানুষিক ক্লেশভোগের সঙ্গে মনেরও এই জঘন্য লাঞ্ছনা তাহাকে সহিতে হইবে, ইহা সে তাহার নিরানন্দ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করিতে গিয়াও কোনদিন কল্পনা করে নাই।

অথচ, পরস্ত্রীর প্রতি প্রদীপের এই অসৌজন্যকে সে মনে-মনে তিরস্কার করিতে বিবেকের সায় পাইল না। প্রদীপ যদি তাহার হাতে অনাবিল বন্ধুতা-রস উৎসারিত করিয়া দিতে চায়, হাত পাতিয়া সে তাহা গ্রহণ করিবে না—নমিতার মন এত কঠিন বা অনুদার নয়। ইহা ভাবিতেই তাহার বিস্ময়ের আর অবধি ছিল না যে, যে-প্রদীপ এত দিন তাহার বন্ধুর রোগশয্যার পার্শ্বে না-ঘুমাইয়া, অক্লান্ত সেবা

করিয়া সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিল, সে সহসা এক মুহূর্তের আচরণে এমন কলুষিত হইয়া দেখা দিল! অথচ সেই আচরণটিতে নমিতা কোনো অন্যায় স্বীকার করিতে পারিল না। মানুষের যখন দৃষ্টিভ্রম হয়, তখন সে দড়িকেও সাপ ভাবে, এবং দড়ি হইতে আত্মরক্ষা করিতে গিয়া সাপের গর্তেই পা ফেলে। আজ নমিতার হৃদয়ের সকল স্তব্ধতা ঠেলিয়া শোকাশ্রুধারা নামিয়া আসিল। সেই অশ্রু তাহার মৃত স্বামীর উদ্দেশে নয়, নিজের দুরপনেয় দুর্ভাগ্যের জন্য নয়—একটি অপমানিত অনুপস্থিত বন্ধুর প্রতি।

নমিতা তাহার কাকার কাছে কলিকাতায় চলিয়া আসিল।

নবীন কুণ্ডু লেনে ছোট একখানা দোতলা বাড়িতে নমিতার কাকা গিরিশবাবু তখন প্রকাণ্ড একটা সংসারের ভার কাঁধে লইয়া হাঁপাইয়া উঠিয়াছেন। নিজের কাচ্চাবাচ্চা লইয়াই তিনি এই ছোট বাড়িতে কুলাইতে পারিতেছিলেন না, হঠাৎ বৌঠান ও তাঁহার ছোট মেয়েটি নিরাশ্রয় অবস্থায় ভাসিয়া আসিল। গিরিশবাবুর এক শ্যালক অজয়, পাটনা হইতে বি-এ পাশ করিয়া কলিকাতায় ল' পড়িতে আসিয়াছে; পাটনা তাহার ভাল লাগে না বলিয়া আইন-পাঠে বেশি এক বৎসর অযথা নষ্ট করিলেও তাহার কিছু আসিয়া যাইবে না। অজয় প্রথমে একটা মেসে গিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু একদিন ডালের বাটিতে আরশুলা মরিয়া আছে দেখিতে পাইয়া, বিদ্যাসাগরের দৃষ্টান্ত অনুসরণ না করিয়াই সেই যে দিদির বাড়িতে চড়াও হইয়াছে, আর তাহার গাত্রোত্থান করিবার নাম নাই। নীচের একটা অপরিসর অপরিচ্ছন্ন ঘরে একটা তক্তপোষ টানিয়া আনিয়া চুপ করিয়া অবরুদ্ধ বন্দী গলিটার দিকে চাহিয়া থাকে, আর আইন পাঠের নাম করিয়া যে-সব বই অধ্যয়ন করে, তাহারা আইনের চোখে মার্জনীয় কি না কে বলিবে।

এমন সময় সিঁথির সিঁদুর মুছিয়া আবার নমিতা আসিল। এইবার গিরিশবাবু চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন। অবশ্য তাঁহার দাদা মৃত হরিশবাবু যত টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার স্ত্রী ও নাবালিকা কন্যাটির সুখে-স্বচ্ছন্দেই দিন যাইতে পারিত, কিন্তু তাহাতে নমিতার জীবিকানির্বাহের খরচটা ধরা ছিল না। নাবালিকা কন্যাটিকে অবাঞ্ছিত মার্জার-শিশুর মত অন্যত্র পার করিয়া দিবার জন্য গিরিশবাবু তোড়জোড় করিতেছিলেন ও শোকবিধুরা ভ্রাতৃজায়া হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া অদূর ভবিষ্যতে মহাপ্রয়াণ করিয়া বাকি টাকাগুলি দেবরের হস্তেই সমর্পণ করিবেন বলিয়া তাঁহাকে নীরবে আশ্বাস দিতেছিলেন, এমন সময়ে অপ্রার্থিত অশুভ আশঙ্কা লইয়া

নমিতার আবির্ভাব হইল। গিরিশবাবু দাঁতে দাঁত চাপিয়া একটা অব্যক্ত অভিশাপ আওড়াইলেন; তাঁহার স্ত্রী কমলমণি মুখখানাকে হাঁড়ি করিয়া রহিল।

চারিপাশে এতগুলি বান্ধব লইয়াও নমিতার একাকীত্ব তবু ঘুচিতে চায় না। সূর্যোদয়ের আগে উঠিয়া সে মধ্য রাত্রি পর্যন্ত ক্লান্তিহীন পরিশ্রম করিয়া চলে—তবু তৃপ্তি পায় না। এত কর্মবাহুল্যের মধ্যেও সে তাহার অন্তরের নির্জনতাকে ভরিয়া তুলিতে পারিল না, তাই রাত্রে সকলে ঘুমাইয়া পড়িলে সে ধীরে ধীরে গলির ধারের সরু বারান্দাটিতে আসিয়া বসে। কি যে ভাবে, বা কি যে সে ভাবিতে পারিলে শান্তি পাইত তাহা খুঁজিতে গিয়া সে বারে বারে হাঁপাইয়া উঠে, তবু রাত্রির সেই নিস্তব্ধ গভীর স্পর্শ হইতে নিজেকে সরাইয়া নিতে তাহার ইচ্ছা হয় না, চুপ করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া থাকে, কখনো সেইখানেই মেঝের উপর ঘুমাইয়া পড়ে। মা টের পাইয়া তিরস্কার করিলেই নমিতা ধীরে ধীরে বিছানায় আসিয়া শোয়, কিন্তু চোখ ভরিয়া ঘুমাইতে পারে না। উহার হাতের সমস্ত কাজ যেন এক নিশ্বাসে ফুরাইয়া গেছে। হয়ত উহাকে অনেক দিন বাঁচিতে হইবে, কিন্তু এমনি করিয়াই চিরকাল পরপ্রত্যাশিনী হইয়া নতনেত্রে লাঞ্ছনা সহিয়া-সহিয়া জীবনধারণের লজ্জা বহন করিবে ভাবিতে তাহার ভয় করিতে থাকে। কিন্তু ইহা ছাড়া আর পথই বা কোথায়? একজনের মৃত্যুতে আরেকজনকে অযথা এমনি জীবন্মৃত থাকিতে হইবে, এমন একটা রীতির মাঝে কোথায় কল্যাণ আছে, তাহা নমিতা তাহার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে ধরিতে পারিল না। কিন্তু এই পঙ্গুতা বা বন্ধ্যাত্ব হইতে উদ্ধার পাইবারও যে কোনো উপায় নাই, সে সম্বন্ধেও সে স্থিরনিশ্চয় ছিল। তাহার এই বেদনাময় ঔদাসীন্য বা বৈরাগ্যভাবটি যে তাহার স্বামী-বিরহেরই একটা উজ্জ্বল অভিব্যক্তি, এই বিশ্বাস এই সংসারের সকলের মনে বদ্ধমূল আছে বলিয়া নমিতা স্বস্তি পাইত বটে, কিন্তু তাহার এই অপরিমেয় দুঃখ যেন উপযুক্ত মর্যাদা লাভ করিত না। কোনো ব্যক্তি বিশেষ হইতে সম্পর্কচ্যুত হইয়াছে বলিয়াই যদি সে তপশ্চারিণী হইতে পারিত, তাহা হইলে তাহার তৃপ্তির অবধি থাকিত না, কিন্তু এই নামহীন অকারণ দুঃখ তাহাকে কেন যে বহন করিতে হইবে, মনে-মনে তাহার একটা বোধগম্য মীমাংসা করিতে গিয়াই সে আর কূল পায় না।

সেদিন রবিবার, দুপুর বেলা; তাহার ছোট বোন সুমিতা একখানা বই তাহার কোলে ফেলিয়া হঠাৎ ছুটিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল—বইখানি তুলিয়া দেখিল, আয়র্ল্যাণ্ড কত দীর্ঘ বৎসর ধরিয়া সংগ্রাম করিয়া স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে, তাহারই বাঙলা ইতিহাস। এই বই সুমিতা কোথা থেকে পাইল মনে-মনে তাহারই একটা দিশা

খুঁজিতেছে, হঠাৎ সেইখানে গিরিশবাবু আসিয়া হাজির হইলেন এবং নমিতাকে বই পড়িতে দেখিয়া কাছে আসিয়া ঝুঁকিয়া কহিলেন—"কি পড়ছিস ওটা ?"

নমিতা সঙ্কুচিত হইয়া বইটা কাকাবাবুর হাতে তুলিয়া দিল।

গিরিশবাবু বইটার নাম দেখিয়া অর্থ হয়ত সম্যক্ উপলব্ধি করিতে চাহিলেন না, রাগিয়া কহিলেন—"বাঙলা উপন্যাস পড়া হচ্চে কেন ?"

বইটা বাঙলা না হইয়া ইংরাজি হইলেই হয়ত তাহার জাত যাইত না ; কিন্তু ইংরাজি নমিতা তেমন ভাল করিয়া জানে না, এ-জন্মে শিখিবার সাধ তাহার খুব ভাল করিয়াই মিটিয়াছে। নমিতা গিরিশবাবুর কথার কোনো উত্তর দিল না, বইটা যে উপন্যাস নয়, সেটুকু মুখ ফুটিয়া বলা পর্যন্ত তাহার কাছে অবিনয় মনে হইল, নিতান্ত অপরাধীর মত হেঁট হইয়া সে বসিয়া রহিল।

গিরিশবাবু পুনরায় কহিলেন—"এ-সব বাজে বই না পড়ে গীতা মুখস্থ করবি, বুঝলি ?"

নমিতা সুশীলা ছাত্রীর মত ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল, একবার মুখ ফুটিয়া বলিতে পর্যন্ত সাহস হইল না যে, গীতার বাংলা অনুবাদ পর্যন্ত সে বুঝিবে না। যে-হেতু সে বিধবা তাহাকে গীতা পড়িতে হইবে, কবিতা বা উপন্যাস পড়িলে তাহার ব্রহ্মচর্য আর রক্ষা পাইবে না। কিন্তু বিরোধ করিয়া কিছু বলা বা করা নমিতা ভাবিতেও পারে না, পাছে কাকাবাবু অসন্তুষ্ট হন ও পারিবারিক শান্তি একটুও আহত হয়, এই ভয়ে নমিতাও সেই বইখানির একটি পৃষ্ঠাও আর ওলটায় নাই, বরং এমন একটা লোভ যে দমন করিতে পারিয়াছে, সেই গর্বে সে একটি পরম আত্মতৃপ্তি অনুভব করিতে লাগিল।

তাহার ব্যবহারে একটু ব্যতিক্রম বা কর্মে একটু শৈথিল্য দেখিলে মা অপ্রসন্ন হন, কারণ পরের সংসারে তাঁহারা পরগাছা বই আর কিছুই নয়, অতএব যতই কেন না নিরানন্দ ও রুক্ষ হোক, এই কর্তব্যসাধনে পরাঙ্মুখ হইলে তাঁহাদের চলিবে না। নমিতার আসার পর হইতে ছোট চাকরটাকে বিদায় দেওয়া হইয়াছে, দোতলার তিনটা ঘরের সমস্ত খুঁটিনাটি কাজ তাহাকে সম্পন্ন করিতে হয়—বিছানা পাতা থেকে শুরু করিয়া ঝাঁট দেওয়া, কাকাবাবুর তামাক সাজা পর্যন্ত। সপ্তাহে দুইবার করিয়া কাকাবাবুর জুতায় কালি লাগাইতে হয়, পূর্ণিমা অমাবস্যায় ক্রমান্বয়ে কাকিমার দুই হাঁটুতে বাতের ব্যথা হইলে কাকিমা না ঘুমাইয়া পড়া পর্যন্ত তাঁহার পরিচর্যায় ক্ষান্ত হওয়ার নাম করা যাইত না ; তাহার পর কখনো কখনো কাকিমার কোলের মেয়েটা মাঝ-রাতে হঠাৎ চেঁচাইতে আরম্ভ করিলে, নমিতাকেই আসিয়া ধরিতে হয়,

অবাধ্য মেয়েটাকে শান্ত করিবার জন্য বুকে ফেলিয়া বারান্দায় সে সেই থেকে পায়চারি করিতে থাকে। এত বড় পৃথিবীতে এই স্বল্পায়তন বারান্দাটিই নমিতার তীর্থস্থান, গভীর রাত্রে এখানে আসিয়াই সে মহামৌনী আকাশের সঙ্গে একটি অনির্বচনীয় আত্মীয়তা লাভ করে। তাহার চিন্তাগুলি বুদ্ধি দ্বারা উজ্জীবিত নয়, ভারি অস্পষ্ট ও প্রচ্ছন্ন—তবু নমিতা তাহার জীবনের চতুর্দিকে একটা প্রকাশহীন প্রকাণ্ড অসীমতা অনুভব করে, তাহা তাহার এই নিঃসঙ্গতার মতই প্রগাঢ়। রাত্রির আকাশের দিকে চাহিয়া সে তাহারই মত বাক্যহারা হইয়া বসিয়া থাকে। সব চেয়ে আশ্চর্য, সে এক ফোঁটা চোখের জল পর্যন্ত ফেলিতে পারে না। মাঝে-মাঝে তাহার সরমার কথা মনে পড়ে। সে নমিতার চেয়ে বয়সে কিছু বড়, একটি ছেলে লইয়া বিধবা হইয়াছে। বিধবা হইয়াও সে আর-সবায়ের মত হাসিয়া খেলিয়া দিন কাটায়, কোনো কিছু একটা আয়ত্তাতীত অথচ অভিলষিতের অভাববোধ তাহাকে অধীর উদ্ব্যস্ত করিয়া তোলে নাই। একটি সন্তান পাইলে নমিতার অন্তরের সমস্ত নিঃশব্দতা হয়ত মুখর হইয়া উঠিত—এমন করিয়া দুরপনেয় ব্যর্থতার সঙ্গে তাহার দিনরাত্রি মিথ্যা বন্ধুতা পাতাইতে হইত না। একটি সন্তান পাইলে নমিতা তাহাকে মনের মত করিয়া মানুষ করিত, তাহা সীমাবদ্ধ জ্ঞানের পরিধিতে যতগুলি মহামানবের পদচিহ্ন পড়িয়াছে, তাহাদের সকলের চেয়ে মহীয়ান, সকলের চেয়ে বরেণ্য—তাহা হইলে এত কাজের মধ্যেও সব কিছু তাহার এমন শূন্য ও অসার্থকতা মনে হইত না। সঙ্গোপনে একটি স্বল্পায়ু স্বপ্ন লালন করিবে, নমিতার সেই আশাটুকুও অস্তমিত হইয়াছে। স্বামীর প্রতি তাহার প্রেম এত গভীর ও সত্য হইয়া উঠে নাই যে, এই ক্লেশকর কৃচ্ছ্রসাধনার মধ্যে সে আনন্দ উপভোগ করিবে। কিন্তু স্বামী যদি তাহাকে একটি সন্তান উপহার দিতে এমন আমানুষিক কৃপণতা না করিতেন, তাহা হইলে হয়ত সেই অনাগত শিশুর মুখ চাহিয়া সে স্বামীর পূজা করিতে পারিত। বারান্দায় বসিয়া বা কখনো-কখনো কাকিমার ছোট মেয়েটিকে কোলে লইয়া ঘুম পাড়াইবার অবকাশে সে এই চিন্তাগুলিই নির্ভয়ে মনে-মনে নাড়াচাড়া করে, নিজের এই অকৃতার্থতার অতিরিক্ত আর কোন চিন্তার অস্তিত্ব সে কল্পনাই করিতে পারে না।

নমিতার আসার পর হইতেই এ সংসারে যে কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছে ইহা অজয় লক্ষ্য করিয়াছিল। ছোট চাকরটাকে বিড়ি খাইতে কালে-ভদ্রে দুয়েকটা পয়সা দিলেই, সে পরম আপ্যায়িত হইয়া কুঁজোয় জল ভরিয়া, টেবিল সাফ করিয়া, বিছানাটা তক্‌তকে করিয়া তুলিত। ইদানিং টের পাইল, চাকরটা অন্তর্হিত হইয়াছে; এবং দিদি হুকুম দিয়াছেন যে এ-সব কাজ অজয়কে নিজ হাতেই সম্পন্ন করিতে হইবে।

গূঢ় কারণটার মর্মার্থ সুমি-ই এক সময়ে অজয়কে জানাইয়া দিয়া গেল। অজয় বুঝিল, তাহার পরিচর্যা করিবার জন্যই চাকরটাকে রাখা হয় নাই এবং উপরের ঘরকরনা করিবার জন্য যখন নমিতার শুভাগমন হইয়াছে, তখন চাকরটার জন্য বাহুল্য খরচ করা সমীচীন হইবে না। নমিতার যে নীচে নামা বারণ, তাহাও সুমি অনুচ্চকণ্ঠে অজয়ের কানে বলিয়া ফেলিল; তাই তাহার ঘর-দোরের শ্রী ফিরিবার আর কোনই আশা রহিল না। তবু ছেলেটা এমন অকেজো ও অলস যে, নিজের বিছানাটা গুছাইয়া লইবে তাহাতে পর্যন্ত তাহার হাত উঠিল না; স্তূপীকৃত অপরিচ্ছন্নতার মাঝে সে দিন কাটাইতে লাগিল। নমিতাকে সে চোখে এখনও দেখে নাই, তবু সংসারের আবহাওয়ায় যে একটা মাধুর্য সঞ্চারিত হইতেছে, তাহা সে প্রতিনিয়ত অনুভব করে। নমিতার কাজে হাজার রকম ত্রুটির উল্লেখ করিয়া তাহার দিদি সর্বদাই কর্কশ কথা বলিয়া চলিয়াছেন, আত্মীয়তার ক্ষেত্রেও যে শিষ্টাচার মানুষে প্রত্যাশা করে কখনো কখনো তাঁহার কথাগুলি সেই ভব্যতার সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে—অজয় মনে-মনে একটু পীড়িত হয় বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া দিদির অশিক্ষাজনিত এই অসৌজন্যকে ক্ষমা করিতে চেষ্টা করে। সব চেয়ে আশ্চর্য এই, সব নিষ্ঠুর গালিগালাজের প্রতিবাদে নমিতা আত্মরক্ষা করিতে একটিও কথা কহে না, তাহার এই নীরব উপেক্ষাটি অজয়ের বড় ভালো লাগে। অজয়ের উপরে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল না, কিন্তু পাছে তাহার অযাচিত সান্নিধ্যে একটি নিঃশব্দচারিণী নির্বাক-কুণ্ঠিতা মেয়ে অকারণে সঙ্কুচিত ও পীড়িত হয়, সেই ভয়েই সে তাহার ছোট ঘরটিতেই রহিয়া গেছে—নমিতাকে উঁকি মারিয়া দেখিবার অন্যায় কৌতূহল তাহার নাই।

সেদিন রাত্রে কিছুতেই অজয়ের ঘুম আসিতেছিল না, পাশের নর্দমা হইতে মশারা দলবদ্ধ হইয়া তাহাকে আক্রমণ করিয়াছে। আত্মরক্ষা করিবার জন্য সে আলমারির মাথা হইতে বহুদিনের অব্যবহৃত মশারিটা নামাইল, কিন্তু প্রসারিত করিয়া দেখিল, সেটার সাহায্যে বংশানুক্রমে ইঁদুরগুলির ভূরিভোজন চলিয়া আসিতেছে। অগত্যা নিদ্রাদেবীকে তালাক দিয়া সে রাস্তায় নামিয়া আসিল। গলিটুকু পার হইয়া হ্যারিসন রোড়ে পড়িবে, বাঁক নিবার সময় সে স্পষ্ট দেখিতে পাইল, তাহাদের দোতলায় বারান্দায় একটি মেয়ে রেলিঙে ভর দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। অজয় থামিল; বুঝিল, ইনিই নমিতা, নিদ্রাহীনা। স্তম্ভিত হইয়া কতক্ষণ সে দাঁড়াইয়া রহিল খেয়াল নাই, সে যেন তাহার চোখের সম্মুখে একটা নৈর্ব্যক্তিক

আবির্ভাব দেখিতেছে। রাত্রির এই গাঢ় স্তব্ধতা যদি কোনো কবির কল্পনাস্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়া আকার নিতে পারিত, তবে এই পবিত্র সমাহিত সুগম্ভীর নারী-মূর্তিই সে গ্রহণ করিত হয়ত। মুহূর্তে অজয়ের হৃদয়ে বেদনার বাষ্প পুঞ্জিত হইয়া উঠিল। এত বড় সৃষ্টি হইতে সম্পর্কহীন এমন একটি একাকিনী মূর্তি দেখিয়া বিস্ময়ের প্রাবল্যে যেন চলিবার শক্তিটুকুও সে হারাইয়া বসিয়াছে। চরিতার্থতা-হীনতার এমন একটা সুস্পষ্ট ছবি সে ইহার আগে কোন দিন কল্পনাও করিতে পারিত না।

পরের দিন রাত্রেও আবার সে বাহির হইয়া আসিয়া দেখিল, নমিতা তেমনি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া যেন এই বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে বিলীন হইয়া গেছে। আজ হঠাৎ কেন জানি না নমিতাকে দেখিয়া তাহার মনে নতুন আশা-সঞ্চার হইল, নমিতা যেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার একটি সুস্পষ্ট সহজ সঙ্কেত। এই নমিতাকে তাহাদের দলে লইতে হইবে। কৃত্রিম সংসারের গণ্ডীতে জন্মান্ধ কূপমণ্ডুকের মত সঙ্কীর্ণ স্বার্থ লইয়া দিন যাপন করিলে তাহার চলিবে না; কর্মে, শিক্ষায়, চরিত্রমাধুর্যে তাহাকে বলশালিনী হইতে হইবে। সেই সুষুপ্ত মধ্যরাত্রিতে অবারিত আকাশের নীচে নমিতার প্রতি অজয় এমন একটি সুদূরবিস্তৃত সহানুভূতি অনুভব করিল যে, যদি তাহার শক্তিতে কুলাইত, তখনি তাহাকে ঐ অবরোধের শাসন হইতে মুক্ত করিয়া দৃপ্ত বিদ্রোহিণীর বেশে পথের প্রান্তে নামাইয়া আনিত।

ছোট মেয়েটা যথারীতি চেঁচাইতে শুরু করিয়াছে। নমিতা ছুটিয়া গিয়া যথাপূর্ব মেয়েটাকে কোলে নিয়া প্রবোধ-চেষ্টায় পাইচারি আরম্ভ করিল। নমিতা যে সামান্য সংসার কর্তব্যসাধিকা এই সত্যটি অজয়ের চোখে এমন সহসা উদ্ঘাটিত হইল দেখিয়া তাহার চমক ভাঙিল। তুচ্ছ সন্তানপালন কি তাহাকে মানায়? বাঙলাদেশে তাহার জন্য ঝাঁকে ঝাঁকে মেয়ে আছে। নমিতা সর্ববন্ধনমুক্তা সর্বদায়িত্বহীনা বিজয়িনী!

তাহার পরদিন অজয় সুমিতাকে নিয়া পড়িল। নমিতা কিছু পড়াশুনা করে কি না, এইটুকু জানিতেই তাহার প্রবল ঔৎসুক্য হইয়াছে—সুমি ইহার উত্তরে যাহা বলিল তাহা স্বীকার করিতে গেলে তাহার দিদিকে কালিদাসের চেয়েও বড় পণ্ডিত বলিতে হয়, কিন্তু দিদির প্রতি সুমির এই প্রশংসমান পক্ষপাতিত্বে অজয় বিশ্বাস করিল না। আলমারি হইতে একখানা বই বাহির করিয়া বলিল—"এ বইখানা তোমার দিদিকে পড়তে দিয়ে এসো, কেমন?"

সুমি ঘাড় নাড়িয়া কহিল—"দিদি আমার মতো বানান করে পড়ে না, এক-নাগাড়ে পড়তে পারে। আমি যাচ্ছি এখুনি।"

অজয় স্থমিকে ডাক দিয়া ফিরাইল, প্রায় কানে-কানে কহিবার মত করিয়া বলিল—
"বইটা কে দিয়েছে ব'লো না যেন, বুঝলে ?"

স্থমির সঙ্গে অজয় লুকোচুরি খেলিতেছিল। আত্মরক্ষা করিতে সে এক এক লাফে তিনটা করিয়া সিঁড়ি ডিঙাইয়া উপরে উঠিতেছে, মাঝপথে হঠাৎ নমিতাকে নামিতে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি বলিয়া বসিল—"আমি এই দরজার আড়ালে গিয়ে লুকোচ্ছি, স্থমি খুঁজতে এলে ভুল পথ দেখিয়ে দিয়ো।" বলিয়া অজয় দরজার পিছনে আত্মগোপন করিল। দুইটা দুয়ার যেখানে আসিয়া মিশিয়াছে তাহারই সামান্য ফাঁক দিয়া সে দেখিতে পাইল, নমিতা নিচে না নামিয়া স্থমিকে ভুল সংবাদ দিবার জন্য সেইখানে নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। প্রায় মিনিট দুই কাটিল, নমিতার নড়িবার নাম নাই।

স্থমি হঠাৎ চীনে-বাদাম-ওলার ডাক শুনিয়া যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া রোয়াকে দাঁড়াইয়া ততক্ষণ বাদাম চিবাইতেছে—সে-খবর ইহাদের কানে পৌছাইবার সম্ভাবনা ছিল না। জয়দা যে তাহার আক্রমণের ভয়ে এমন সন্ত্রস্ত হইয়াছেন ও তাঁহার দুর্গ-দুয়ারে প্রহরী মোতায়েন রাখিয়াছেন, তাহা জানিলে স্থমি নিশ্চয়ই এত অনায়াসে রণে ভঙ্গ দিত না।

আরো কিছুক্ষণ কাটিলে অজয় বাহির হইয়া আসিল। দেখিল, নমিতা তখনো কুন্ঠিতকায়ায় সেইখানে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এমন একটা নিভৃত মুহূর্তে কিছু না বলিয়া ধীরে-ধীরে পাশ কাটাইয়া অন্তর্হিত হইলেই সৌজন্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ দেখানো হয় কি না, সেই বিষয় মনে-মনে কোনো প্রশ্ন না তুলিয়াই অজয় আবার কহিল—"স্থমি বোধ হয় কয়লার ঘরে আমাকে খুঁজতে গেছে। সত্যি, সেখানে গিয়ে লুকুলে আমাকে ওর, আর এ-জন্মে বা'র করা চলত না।"

এটা অবশ্য অত্যুক্তি, কেননা বর্ণসম্পদে অজয় এতটা হেয় নয় যে, একেবারে কয়লার উপমেয় হইয়া উঠিবে। তবু, অতিশয়োক্তিটার দরুণ একটা প্রত্যুত্তর পাইবার আশা আছে মনে করিয়া, অজয় নিজের গায়ের রঙ সম্বন্ধে এমন একটা বিনয় করিয়া বসিল। নমিতা স্বল্প একটু হাসিল, ঘোমটা টানিয়া একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং সরিয়া যাওয়া সমীচীন হইবে মনে করিয়া এক পা বাড়াইয়া আর যাইতে পারিল না।

কয়েক ধাপ নীচে নামিয়া অজয় নমিতার প্রায় নিকটে আসিয়া কহিল—"বাড়িটা ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকছে। দিদি, ওঁরা কোথায় গেলেন ?"

এ-প্রশ্নটা এমন নয় যে ইহার উত্তরে বাক্যস্ফুরণ করিলে নমিতার অঙ্গহানি হইবে, যদিও কড়া শাসনের অত্যাচারে তাহার আত্মকর্তৃত্বহীনা, অবাঙ্‌মুখী হইয়া থাকিবারই কথা ছিল। কিন্তু উত্তরটা এত সহজ ও সময়টি এত নিভৃত যে, নমিতা চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। স্পষ্ট করিয়াই কহিল—"কাকিমারা সবাই ম্যাটিনিতে থিয়েটার দেখতে গেছেন।"

—"ছেলেপিলেরাও গেছে ?"

—"হ্যাঁ।"

—"তুমি গেল না কেন ?"

একটু থামিয়া নমিতা বলিল—"মা যেতে দিলেন না।"

এই থামিবার অর্থটুকু অজয় বুঝিল। সাহস করিয়া কহিল—"কিন্তু তুমিও বাড়িতে রইলে যে। গেলেই ত পারতে।"

দৃঢ়নিবদ্ধ ঠোঁট দুইটি ঈষৎ প্রসারিত করিয়া নমিতা আবার একটু হাসিল। কিছু বলিবার আর প্রয়োজন ছিল না। এই হাসিটিতে বিষাদের স্বাদ পাইয়া অজয় বলিল —"তোমার বুঝি আনন্দ করবার অধিকার নেই ?"

নমিতার মুখ সহসা গম্ভীর হইয়া উঠিল, অজয় সিঁড়ির যেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, নামিতে হইলে তাহার স্পর্শ হইতে আত্মরক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠে ; তাই সচকিত হইয়া নমিতা কহিল—"সরুন।"

—"নীচে কেন যাচ্ছ ?"

—"মা-র আহ্নিকের জন্যে গঙ্গাজল আনতে।"

—"তুমি আহ্নিক কর না ?"

অজয় ভাবিয়াছিল ইহার উত্তরে নমিতার মুখে আবার হাসি ফুটিবে। কিন্তু নমিতা সত্যভাষণের উপযুক্ত সহজ ও স্পষ্টস্বরে বলিল—"পূজোর পরে আমাদের গুরুদেব আসবেন—তাঁর কাছ থেকে আমার মন্ত্র নেবার কথা আছে।"

কথাটা শুনিয়া অজয়ের সমস্ত গা যেন জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু চিত্তের অসন্তোষ দমন করিয়া সংযত শান্তকণ্ঠে কহিল—"এই অল্প বয়সেই স্বর্গের জন্যে তোমার এত লোভ ?"

উদাসীনকণ্ঠে নমিতা উত্তর দিল—"এ-ছাড়া আমার আর কী-ই বা করবার আছে ?" বলিয়া সিঁড়ি দিয়া একটু তাড়াতাড়িই নীচে নামিয়া গেল।

ঘটে করিয়া গঙ্গাজল লইয়া উপরে উঠিবার সময় নমিতা দেখিতে পাইল অজয় তেমনি সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া আছে—যেন তাহারই প্রতীক্ষায়। সঙ্কুচিত হইয়া

স্পর্শ বাঁচাইয়া আবার সে উঠিয়া যাইতেছে, অজয় বলিল—"তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে—অনেক কথা। তোমার সঙ্গে এতদিন এক বাড়িতে বাস ক'রেও যে আলাপ হয় নি, তার কারণ আমার সৌজন্যের আতিশয্য আর তোমার ভীরুতা। কিম্বা সত্য কথা বলতে গেলে আমাদের সমাজের অনুশাসন। আজ যখন দৈবক্রমে তোমার সঙ্গে আলাপ হ'লই, তখন একটু সবিস্তারে তোমার সঙ্গে কথা বলবার অনুমতি আমাকে দেবে না?"

কি বলিবে নমিতা কিছু ভাবিয়া পাইল না; যেন তাহার গ্রীবা সম্মতিসূচক সঙ্কেত করিয়া বসিল।

উপরে উঠিবার পথ ছাড়িয়া দিয়া অজয় আবার কহিল—"অনুমতি ত তুমি দেবে, কিন্তু তোমার অভিভাবকরা যে তাতে আহ্লাদে আটখানা হবেন তার কোনোই সম্ভাবনা নেই। এতদিন একসঙ্গে থেকে আমি এটুকু যে একেবারেই বুঝি নি তা তুমি মনে কোরো না। আচ্ছা, সে-কথা পরে হবে—মাকে গঙ্গাজল দিয়ে এস। আজকে বিকেলে অন্তত অভিভাবকদের শুভেচ্ছা তোমাকে স্পর্শ করবে না।"

বলিয়া অজয় চলিয়া যাইতেছিল, নমিতা সোৎসাহে প্রশ্ন করিল—"কোথায় যাচ্ছেন?"

—"এই আসছি—আমার ঘরের জানলাগুলো খোলা আছে, কী রকম মেঘ করেছে দেখেচ? একবার বৃষ্টি নামলে আর রক্ষে নেই—বিছানা-বালিশ সব কাদা! অভিজ্ঞতাটা অবশ্যি নতুন হতো না কিন্তু কাল থেকে জ্বর-ভাব হয়েছে বলে একটু সাবধান হচ্ছি। আমি যাচ্ছি ওপরে—বারান্দায়। দু' মিনিট।"

বারান্দা বলিতে ঐ দক্ষিণের বারান্দাটিই বুঝায়—মাকে আহ্নিকে বসাইয়া, দুয়েকটি গৃহকর্ম সারিয়া নমিতা ধীরে বারান্দায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার আগেই অজয় রেলিঙ ধরিয়া দাঁড়াইয়া রাস্তার দিকে চাহিয়া আছে। প্রথম অজয় নমিতার আবির্ভাবটিকে লক্ষ্য করিল না বলিয়া, আর দুয়েক পা অগ্রসর হইয়া আরো একটু কাছে আসিতে নমিতার ভারি লজ্জা করিতেছিল, কিন্তু আরো একটু কাছে না আসিলে আলাপ অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিতে পারে না। নমিতা কি করিবে কিছু ভাবিয়া না পাইয়া তেমনি রেলিঙ ধরিয়া দূরে কালো আকাশের পানে তাকাইয়া রহিল।

অজয়ই হঠাৎ সজাগ হইয়া কাছে সরিয়া আসিল। কোনো রকম ভূমিকার সূচনা না করিয়া সোজাসুজি প্রশ্ন করিল—"পূজো-আহ্নিক করা ছাড়া তোমার আর কোনো বড়ো কাজ করবার সত্যিই কি কিছু নেই?"

নমিতা কথা বলিতে জোর পাইল না বটে, কিন্তু তবু কহিল—"ওঁদের মতে পূজো-

আহ্নিক করে বাকি জীবনটা কোনো রকমে কাটিয়ে দেওয়াই আমার লক্ষ্য হওয়া উচিত।"

—"বাকি জীবন ?" অজয় যেন আকাশ হইতে পড়িল : "বাকি জীবন সম্বন্ধে তুমি কিছু স্পষ্ট ধারণা করতে পারো ? তুমি এইখানে দাঁড়িয়ে এই ছোট সঙ্কীর্ণ আকাশটুকু দেখে সমস্ত পৃথিবীর ছবিটা মনে এঁকে নিতে পারো ? বাকি জীবন ! অসৌজন্য মাপ করো, তোমার বয়েস কত ?"

নমিতা লজ্জায় মুখ নামাইল। অজয় আবার কহিল—"তোমার মতো বয়সে ফ্রান্সে জোয়ান অব আর্ক দেশ স্বাধীন করতে যুদ্ধ করেছিলো, বাকি জীবনটাকে খরচের ঘরে ফেলে দেউলে হয় নি। সে-সব খবর তুমি নিশ্চয়ই রাখো না, তাই এমন স্বচ্ছন্দে নিজের সম্বন্ধে একটা উদাসীন হতে পেরেছ। তোমাকে তিরস্কার করছি না, কিন্তু এটা মনুষ্যত্ব নয়।"

নমিতার স্বর ফুটিতেছিল না, তবু প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া কহিল—"কিন্তু বিধবার আর অপর কর্তব্য নেই। ভগবৎ-ভক্তিই তার একমাত্র ভরসা।"

অজয় হাসিয়া উঠিল, কহিল—"তোমাকে এ-সব কথা কে শেখালে ? বিধবা তুমি কি ইচ্ছে করে হয়েছে ? তুমি কি সাধ করে স্বেচ্ছায় এই বৈরাগ্যর বেশ নিয়েছ ? নিয়তির বিধানের চেয়েও সমাজের শাসন যখন প্রবল হ'য়ে ওঠে, তখন অন্ধের মতো তার কাছে বশ্যতা স্বীকার করা মানে নিজেকে অপমান করা। তোমার ভগবান তোমাকে ঘরে বসে নুড়ি নিয়ে ছেলেখেলা করতে উপদেশ দিয়েছেন ? এই যে দলে দলে লোক যুদ্ধে প্রাণ দিচ্ছে, দেশ স্বাধীন করতে কারাগারকে তীর্থ করে তুলছে, তারা সব ভগবানের বিরুদ্ধাচারী ?"

নমিতা ঘাড় নীচু করিয়া অস্ফুটকণ্ঠে কহিল—"কিন্তু সংসারের শান্তি রাখতে হ'লে প্রতি পদে আমাকে তার মুখ চেয়ে চলতে হবে। সংসার চায় আমি বসে বসে নুড়ি নিয়ে ছেলেখেলা করি।"

অজয় উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে : "কাদের নিয়ে সংসার ? জান, সমাজ আমরা সৃষ্টি করেছি, আমরাই তাকে ভাঙবো। আমাদের ভাঙবার অধিকার না থাকলে আমরা তাকে মানবো কেন ? যা তোমাকে তৃপ্তি দেয় না বরং সমস্ত জীবনকে সঙ্কুচিত খর্ব করে রাখে, সেই আচার তোমাকে পাড়ার পাঁচজনকে খুশি করতে আম্লানবদনে পালন করতে হবে, সেটা খুব উচ্চাঙ্গের সতীধর্ম নয়। তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মনের উপর প্রভুত্ব খাটাতে পারে এমন একটা কৃত্রিম শক্তিকে যদি তুমি মানো, তবে সেই হ'বে তোমার সত্যিকারের মৃত্যু ! আমরা এমন মরবার জন্যে জন্মাই নি।"

ঝর-ঝর করিয়া শরৎকালের বৃষ্টি নামিয়া আসিল। নমিতা কণ্ঠস্বর আর্দ্র করিয়া কহিল—"কিন্তু সংসার বা সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার শক্তি বা যোগ্যতা আমার কিছুই নেই। যার দেহ মরবার আগে আত্মা মরে থাকে, আমি তাদেরই একজন। আমাকে দিয়ে আমার নিজেরো কোনো আশা নেই।"

কথা শুনিয়া অজয় মুগ্ধ হইয়া গেল—বৃষ্টির সঙ্গে এই কথা কয়টি মিলিয়া আকাশে ও মনে এমন একটি মাধুর্য বিস্তার করিল যে, ক্ষণকালের জন্য সে অভিভূত হইয়া রহিল।

পরমুহূর্তেই উদ্দীপ্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—"ভারতবর্ষ বহু বৎসর ধরে স্বাধীনতার সাধনা করছে, সে খবর তুমি রাখ?"

একটু হাসিয়া নমিতা বলিল—"রাখি বৈ কি।"

—"কিন্তু কেন সফল হচ্ছে না জান?"

—"কেন?"

—"আমরা এত সব ছোটখাটো শাসন ও সংস্কারের দাসত্ব করছি যে বড়ো একটা মুক্তির পথে আমাদের পদে-পদে বাধা ঘটছে। আমরা যে মন্দির-বেদী গড়তে চাই তার থেকে অস্পৃশ্য বলে অনেক কাউকে সরিয়ে রাখি। নিজের কাছে মুক্ত, স্বতন্ত্র না হ'তে পারলে বাইরের মুক্তি আমরা কি করে পেতে পারি বলো? প্রকৃতির রাজ্যে সব কিছুই নিয়মাধীন—আমাদের বেলায়ই তার ব্যতিক্রম ঘটবে সেটা আমাদের প্রকাণ্ড দুরাশা। আমরা সমাজে ছ'শো ছত্রিশটা দেওয়াল গেঁথে একে অন্যের থেকে পৃথক হ'য়ে কোটি কোটি স্বার্থপরতার সঙ্ঘর্ষ বাধাবো, সমাজগঠনে সুবিধা না দিয়ে নারীকে রাখবো পদদলিত, চাষা-মজুরকে রাখবো পায়ের ক্রীতদাস আর হাতের ক্রীড়নক—আমরা কি করে বৃহত্তর স্বাধীনতার দাবি করতে পারি? তার মানে, সাফল্য আমাদের সেইদিনই অনিবার্য নমিতা, যেদিন আমরা প্রত্যেকে বর্তমানের এই শূন্য না থেকে এক হ'য়ে উঠেছি। আমরা প্রত্যেকে যদি এক হই, তবে কেউ আর একাকী থাকবো না। তেত্রিশ কোটি শূন্য যোগ দিলে সেই শূন্যই থেকে যাবে—শত যোগবলেও সেই যোগফল তুমি বদলাতে পারবে না কখনো।"

খানিক থামিয়া অজয় আবার কহিল—"হ্যাঁ, বিদ্রোহ করবার যোগ্যতা তোমার নেই —নিজের অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে তোমার এই জ্ঞানটুকু আছে বলে' তোমার ওপর শ্রদ্ধা আমার বেড়ে গেলো। কিন্তু সেই যোগ্যতা তোমাকে অর্জন করতে হ'বে। তুমি চমকে উঠো না। যোগ্য না হ'য়ে আজ যদি তুমি সংসারের বিরুদ্ধাচরণ কর, সেটা তোমাকে শোভা পাবে না বলে'ই লোকের চোখে লাগবে প্রখর দৃষ্টিকটু, এবং স্বয়ং

আমি পর্যন্ত বলবো অন্যায়—তোমাকে ধিক্কার দেবো। কিন্তু যেদিন তুমি আত্মার শৌর্যে ঐশ্বর্যশালিনী হ'য়ে উঠে এই সব তুচ্ছ সংস্কার ও মিথ্যাচারকে ছুঁড়ে ফেলে বাইরে বেরিয়ে আসবে—সেদিন সব্বারই আগে যার প্রণাম পাবে সে আমার।"

নমিতার হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠিতেছিল; ধীর সংযতকণ্ঠে সে কহিল—"কিন্তু সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাচরণটাই কি বড়ো কীর্তি হবে?"

"—যাকে তোমার এখন মাত্র বিদ্রোহাচরণ মনে হচ্ছে তখন দেখবে সেই তোমার জীবন। তখন যেটা তোমার কাছে একান্ত সহজ, ন্যায্য ও স্বাভাবিক মনে হবে—সেটাই অন্যের মতে হ'বে অন্যায়, কেউ-কেউ বা তার সংজ্ঞা দেবে পাপ। পরের পায়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে চল্‌বার জন্যে আমরা হাঁটতে শিখিনি। অনবরত সীমারেখা টেনে-টেনে জীবনকে আমরা কুণ্ঠিত ও সঙ্কীর্ণ করে রেখেছি বলেই আমরা অহর্নিশ প্রতিবেশীদের সঙ্গে সাদৃশ্য বাঁচিয়ে চলতে চাই। কিন্তু জীবনের পরিধিকে বিস্তৃত করে দিতে থাক, ব্যক্তিত্বের সাধনায় তুমি ক্রমোন্নতি লাভ কর, দেখবে তুমি অদ্বিতীয় হয়ে উঠেছ। তাকে যদি বিদ্রোহ বল, আমরা সেই বিদ্রোহ নিশ্চয়ই করব। তখন বিদ্রোহ না করাটাই হবে আত্মহত্যা।"

শরৎকালের বৃষ্টি স্বল্পায়ু—অনেকটা নারীর ভালোবাসার মত। বৃষ্টির পরে আকাশ আবার স্নিগ্ধ ও বেদনাতুর চোখের মত ভাবগম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে। আবার কথা শুরু করিতে দেরী হইতেছিল। চুপ করিয়া কতক্ষণ কাটিল কাহারো কিছু খেয়াল ছিল না। হঠাৎ অজয় প্রশ্ন করিল—"সমস্ত দিন তুমি কি করে কাটাও?"

নিমেষে নমিতার ঘোর কাটিল বুঝি—আবার সে তাহার নিরানন্দ পৃথিবীর মুখোমুখি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কহিল—"কি করে আর কাটাই? কাজ কর্ম করি আর ঘুমুই।"

—"এ রকম করে ক'দিন কাটাবে? তোমার মুখের সেই অসার উত্তরটা আমি শুনতে চাই না। বলতে চাই, এমনি করে অমূল্য সময় অপব্যয় করে তোমার কোন্ পরমার্থ লাভ হচ্ছে?"

—"কিন্তু এ ছাড়া আমার আর কী-ই বা করবার আছে?"

—"তুমি পড় না কেন? সুমিকে দিয়ে তোমাকে যে একটা বই পাঠিয়েছিলুম তা পড়েছিলে?"

নমিতার মুখে অল্প একটু হাসি দেখা দিল, কহিল—"তা পড়া বারণ হয়ে গেছে।"

—"বারণ হয়ে গেছে? কারণ?"

—"কারণ, কাকা ও-সব উপন্যাস-পড়া নিষেধ করেছেন।"

অজয় অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল : "উপন্যাস ? ও ত একটা ইতিহাস মাত্র—শাদা সত্য ঘটনা। আর, মাছ মাংস মুসুর ডালের মত উপন্যাসও তোমাদের নিষিদ্ধ নাকি ? মনুর কোন্ অধ্যায়ে তা লেখা আছে ?"

নমিতার কণ্ঠস্বরে ব্যঙ্গের আভাস স্পষ্ট হইয়া উঠিল : "আমাকে গীতা পড়তে বলে-ছিলেন। সংস্কৃত শব্দরূপই জানি না, তার মাথামুণ্ডু আমি কি বুঝবো ছাই ? ওটা আমার চমৎকার ঘুমুবার ওষুধ হয়েছে।"

আরো একটু কাছে সরিয়া আসিয়া অজয় কহিল—"এটা তোমার কাছে জুলুম মনে হয় না ?"

—"জুলুম কিসে ?"

—"মানুষকে ভালো করার মধ্যেও একটা পরিমাণ-জ্ঞান থাকা উচিত। জামাইবাবুকে একখানা ট্রিগোনোমেট্রির বই দিয়ে আঁক কষতে বল না।"

—"কিন্তু ধর্মগ্রন্থ ছাড়া আর আমাদের পাঠ্য কী হতে পারে ?"

—"আমাদের আমাদের করে তুমি নিজেকে একটা গণ্ডীর মধ্যে টেনে এনে ছোট করে তুলছ কেন ? তুমি কি মানুষ নও ? তোমার কপালে সিঁদুর নেই বলেই যে তোমার জীবনধারণে কোনো সুখ থাকবে না—এ যারা তোমাকে বোঝাতে চায় তারা তোমার আত্মার অত্যাচারী। তাদের তুমি মেনো না। আমি আছি তোমার বন্ধু। কী করে সময় কাটাবে ? খুব করে পড়ো ! প্রথমত তাই পড়ো যা বুঝতে ব্যাকরণ লাগে না, লাগে শুধু অনুভূতি। যেমন ধরো কবিতা। তোমাকে প্রস্তুত হতে হবে।"

নমিতা একটু ভীত হইয়া বলিল—"কিসের জন্যে ?"

—"নিজেকে আবিষ্কার করবার জন্যে।"

—"ও-সব কথার মানে আমি বুঝি না।"

—"সে বোঝবার সময়টুকু পর্যন্ত তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে। আমি আনছি বই। জীবনকে দেখবার জন্যে বই হচ্ছে বাতায়ন, সে-বাতায়ন দিকে দিকে উন্মুক্ত করে দিতে হবে।" বলিয়া দ্রুতপদে অজয় অদৃশ্য হইয়া গেল।

মধ্যরাত্রে নমিতা আবার ঘুম হইতে উঠিয়া বারান্দার ধারটিতে আসিয়াছে। কয়েকবার বৃষ্টি হইয়া যাইবার পরেও আকাশের স্তম্ভিত ভাবটা এখনো কাটিয়া যায় নাই—সেই নিরানন্দ বিবর্ণ আকাশের তলে সমস্ত শরীরটা যেন অবসন্ন হইয়া ঝিমাইতেছে—পৃথিবী আর চলিতে পারিতেছে না। বিকাল হইতে নমিতার মন-ও রাতের আকাশের মত ঘোলাটে হইয়া রহিয়াছে—নানা সমস্যা ও সংস্কারের আবর্তে

পড়িয়া সে হাঁপাইয়া উঠিতেছিল। তাহার জীবনের ভবিষ্যৎ মুহূর্তগুলি যেন তাহাকে আর নিশ্চিন্ত থাকিতে দিবে না—প্রত্যেকটি মুহূর্ত ফলবান হইবার জন্য তাহাকে উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। এই আত্মবিস্মৃতিময় আরাম তাহাকে আর পোষাইবে না। কিন্তু দুঃখের আরামকে শতধা বিদীর্ণ করিয়া নবজীবনের ঝড় আসিবে কেন? হঠাৎ তাহার খেয়াল হইল রাস্তায় কে একজন পাইচারি করিতেছে। আজ তাহার চোখ কৌতূহলী হইয়া উঠিয়াছে, ভালো করিয়া ঠাহর করিয়া দেখিল, অজয়! রোজই ত এই সময় এমনি একটি লোক রাস্তায় ঘোরাঘুরি করে, এমন করিয়া কোন দিনই সে লক্ষ্য করে নাই। এত দিনের সেই লোকটিই যে অজয় ইহার সম্বন্ধে লেশমাত্র সন্দেহও তাহার মনে রহিল না এবং বিশ্বাসটুকুকেই অন্তরে লালন করিতে গিয়া নিমেষে নমিতা রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। আজ দূর হইতে অজয়কে স্পষ্ট করিয়া দেখিবার জন্য তাহার দৃষ্টি একাগ্র হইয়া উঠিল এবং এমন আগ্রহ সহকারে চাহিয়া থাকাটার মধ্যে কোথাও যে এতটুকু অসৌজন্য থাকিতে পারে, তাহা তাহার ঘুণাক্ষরেও মনে হইল না। লোকটিকে অজয় জানিয়া চোখ ফিরাইয়া লইলে এই রাত্রি বোধ করি আর কাটিত না। চলিতে চলিতে অজয় যখন মোড়ের গ্যাস্-পোস্টের কাছে আসিতেছে, তখন অনতিস্পষ্ট আলোতে তাহাকে একটু দেখিয়া লইতে না লইতেই অন্ধকার আসিয়া সব কালো করিয়া দিতেছে। তবু যেটুকু সে দেখিতে পাইতেছে না, সেইটুকুর জন্যই তাহার মন উচাটন হইয়া উঠিল।

কাকিমার ছোট খুকিটা অভ্যাসমত চেঁচাইয়া উঠিয়াছে। একটা হাত-পাখা দিয়া কাকিমা তাহাকে খুব পিটাইতেছেন: "মর্ মর্ শুকনি। সারা থিয়েটার জ্বালিয়ে এসে হারামজাদির এখনো কান্না থামে না। কোনো দেবীর কৃপা হলেও ত বেঁচে যাই।"

পাশের খাট হইতে কাকা হাঁকিলেন: "নমি উঠে আসে না কেন?"

কাকিমার উত্তর শোনা গেল: "ধুম্সো হয়ে গিলতেই পারে সব। নমি আসবেন! মায়ে-ঝিয়ে দিব্বি নাকে তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছে। পরের পয়সায় খেলে ডোম্নিও নবাবের বেটি হয়ে ওঠে।"

এইবার সামনের ঘর হইতে মা'র ডাক আসিল: "নমিতা!"

অজগর সাপের মত কুণ্ডলী পাকাইয়া বিপুল রাজপথ ঘুমাইয়া রহিয়াছে: আকাশ নির্বাক, অন্ধের চক্ষুর মত সঙ্কেতহীন, গভীর। অজয় আরেকবার মোড় ফিরিয়া গ্যাস্-পোস্টের তলা দিয়া ঘুরিয়া আসিল, আবার চলিয়াছে। দেয়ালের প্রান্তটুকু ঘেঁষিয়া বসিয়াও তাহাকে আর দেখা গেল না, ফিরিতে আবার এক মিনিট

লাগিবে। না, খুকিকে কাঁধে ফেলিয়া হাঁটিয়া-হাঁটিয়া ঘুম পাড়াইতে হইবে। অজয়ের চোখে কি ঘুম নাই? না, নমিতাকে উঠিতে হইল।

অজয়কে বুঝিয়া উঠা ভার। সেই যে সেদিন দুই হাতে করিয়া কতকগুলি বই পায়ের কাছে নামাইয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহার পর আর দেখা হয় নাই। অথচ এমন কতকগুলি মুহূর্ত খুঁজিয়া পাওয়া কখনই মুশকিল হইত না যখন উদ্যত শাসনের উপদ্রব একটু শিথিল ছিল। একদিন এমন করিয়া সমস্ত হৃদয়ে সংশয়ের ঝড় তুলিয়া সহসা নির্লিপ্ত হইয়া যাইবার কারণ কি, নমিতা কিছুই বুঝিতে পারিল না। নিজে গিয়া যে অজয়কে কিছু জিজ্ঞাসা করিবে, তাহা ভাবিতেও তাহার ভয় করে—সমস্ত সংসারের চোখে সেটা একটা বীভৎস অবিনয় মনে করিয়া সে নিবৃত্ত হয়, দ্বিগুণ মনোযোগ দিয়া বইগুলিকে আঁকড়াইয়া ধরে। সুমিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তোর জয়দা কি করছ রে?"
সুমি বলিল—"কাল রাতে বাড়ি ফেরে নি। দু'দিন আমার সঙ্গে দেখা নেই।"
অজয়ের জন্য নমিতার মনে উদ্বেগ ও সহানুভূতি পুঞ্জিত হইয়া উঠিল। সংসারের দৈনন্দিন চলাফেরার সঙ্গে তাহার একটুও মিল নাই, দূর হইতে অজয়ের ব্যবহারের এই প্রকাণ্ড অসঙ্গতিটা নমিতা লক্ষ্য করিয়াছে। কখন যে অজয় বাড়ি আসে তাহার ঠিক নাই, দুই দিন হয় ত আসিলই না, স্নান না করিয়াই হয় ত ভাতের থালা লইয়া গিলিতে বসে, মধ্যরাতে কল হইতে জল পড়িতেছে শুনিয়া কাকিমার আদেশে কল বন্ধ করিতে আসিয়া দেখিয়াছে, অজয় স্নান করিতেছে—আর অগ্রসর হয় নাই। এই সব নিয়মবহির্ভূত আচরণে দিদির মুখে তিরস্কারেরও আর বিরাম ছিল না, তবু এই ছেলেটি সমস্ত অভিযোগ আলোচনায় কান না পাতিয়া দিব্যি আত্ম-সম্মান লইয়া এই বাড়িতেই কালাতিপাতি করিতেছে। অজয়কে নমিতার মনে হয় অসাধারণ—কোনো অভ্যাস বা নিয়মের সঙ্গেই সে নিজেকে খাপ খাওয়াইতে পারিবে না। তাহাকে দেখিয়া মনে হয় সে যেন কি-এক কঠোর সাধনায় লিপ্ত, একা-একা সংগ্রাম করিতে তাহার নিজের শক্তি যেন আর কুলাইতেছে না—তাহার ললাটে প্রতিজ্ঞার তীব্র দীপ্তি থাকিলেও দুই চোখে একটি ঔদাস্যময় ক্লান্তির ভাব আছে। ক্ষণেকের জন্যও সংসারের কাজকর্মের ফাঁকে অজয়কে দেখিতে পাইলে নমিতা যেন তাহার অন্তরের এই অন্তহীন ক্লান্তিকর সংগ্রামের ইতিহাস এক মুহূর্তেই পড়িয়া নেয়। মনে হয় অজয়কে কোনো কাজে সাহায্য করিতে পারিলে সে ধন্য হইয়া যাইত। কিন্তু যে দুই হাতে সবেগে নাড়া দিয়া তাহাকে এমন করিয়া

জাগাইয়া দিল, সে সহসা আবার অপরিচয়ের অন্ধকারে ধীরে-ধীরে অপসৃত হইয়া যাইবে, ইহা ভাবিতে নমিতা চোখে যেন অন্ধকার দেখিতে লাগিল।

সেদিন দুপুরের খাওয়া-দাওয়া চুকিয়া গেলে প্রায় একটার সময় এক মাথা রুক্ষ চুল লইয়া অজয় আসিয়া নীচের উঠানটুকুতে দাঁড়াইয়া হাঁক দিল—"দিদি হাঁড়িতে ভাত আছে?"

দিদি তখন দিবানিদ্রা ভোগ করিতেছিলেন, তাই এক ডাক যথেষ্ট নয়। অজয় আবার ডাক দিল। পাশের ঘরে নমিতা দেয়ালে পিঠ রাখিয়া অভিধানের সাহায্যে একটা রুষীয় উপন্যাসের মর্মোদ্ঘাটন করিবার চেষ্টা করিতেছিল, ক্ষুধিত অজয়ের ডাক শুনিয়া সে ধড়মড় করিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি গিয়া ঘুমন্ত কাকিমার পায়ে নাড়া দিয়া তাঁহাকে জাগাইয়া তুলিল। এই ব্যবহারটাও যে তাহার নীতিশাস্ত্রের ঠিক অনুযায়ী হয় নাই তাহা সে জানিত, কিন্তু ক্ষুধার সময় অজয় দুইটা ভাত চাহিতে আসিয়াছে, এই খবর পাইয়া সে কিছুতেই নিশ্চেষ্ট উদাসীন হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না।

কাকিমা উঠিয়া জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"এই অসময়ে কে তোর জন্যে ভাতের থালা নিয়ে বসে থাকবে শুনি? রাতে কোথায় পড়ে ছিলি? তুই তোর খুশি-মত যা-তা করবি, কখন খাবি কখন খাবি নে—বসে বসে কে তার হিসেব রাখবে? আমি বাড়িতে বাবাকে লিখে দিচ্ছি—এরকম হ'লে তোমার এখানে আর পোষাবে না। সংসারের সুবিধে না দেখে নিজের খেয়াল-মাফিক চলা ফেরা করতে চাও, হোটেল আছে।"

এত কথায়ও অজয়ের স্থৈর্য একটুও টলিল না—এ-সব কথা যেন তাহার একেবারেই গ্রাহ্য করিবার নয়। সে পরিষ্কার সহজ গলায় কহিল—"বেশ ত নাই পেলুম ভাত—চৌবাচ্ছায় জল আছে ত? স্নান করতে পারলেই আমার অর্ধেক খিদে যাবে। যাঃ, জলও নেই। আমি তবে এখন আবার বেরুচ্ছি দিদি। সন্ধ্যের সময় আসতে পারি, তখন দু'মুঠো ভাত পেলেই আমার চলবে।" বলিয়া অজয় সেই অভুক্ত অবস্থায়ই বাহির হইয়া গেল।

বিড়বিড় করিতে করিতে কাকিমা জানালা হইতে ফিরিয়া আসিয়া আবার শয্যা লইলেন, কিন্তু নমিতার মনে কোথায় বা কেন যে ব্যথা করিয়া উঠিল, তাহা সে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল না। কাকিমার এই ব্যবহারে তাহার নিজেরই আর লজ্জার শেষ ছিল না—এ-সব ক্ষেত্রে প্রতিবাদ বা প্রতিবিধান করিবার তাহার কোনোই

অধিকার নাই। তবু যতদূর সম্ভব কণ্ঠস্বর কোমল করিয়া সে কহিল—"না খেয়ে বাড়ি থেকে চলে গেলেন। সামান্য দু'টো ফুটিয়ে দিলে হ'ত না?"

একে নমিতাই অকারণে তাঁহার সুখনিদ্রার ব্যাঘাত হইয়াছে, তাহার উপর তাঁহার মুখের উপর অজয়ের হইয়া সে ওকালতি করিতে চায়—কাকিমা জ্বলিয়া উঠিলেন: "তোর আবার আদর উথ্‌লে উঠলো কেন? তুই যে দিন-কে-দিন বড্ড বেহায়া হচ্ছিস্।"

নিজের উপর সমস্ত তিরস্কার ও লাঞ্ছনা নমিতা নীরবে সহ্য করিয়াছে, কিন্তু অজয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করিয়া এই হীন বাক্যযন্ত্রণা সে সহিতে পারিল না। তবু স্বভাবসুলভ বিনয় করিয়াই কহিল—"না খেয়ে বাড়ি থেকে কেউ চলে গেলে বাড়ির মঙ্গল হয় না শুনেছি—সংসারে শ্রী থাকে না।"

কথার তাৎপর্যে যতটা না হোক্, নমিতা যে আবার তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিল, এই অশ্রদ্ধা দেখিয়া কাকিমা রাগে একেবারে বিছানার উপর উঠিয়া বসিলেন; সুর চড়াইয়া দিতে হইল: "বাড়ির মঙ্গল হবে না মানে? তুই আমার সমস্ত বাড়িকে শাপ দিচ্ছিস নাকি? নিজে স্বামী খেয়ে শাকচুন্নি সেজে পরের মঙ্গলে তোমার হিংসে হচ্ছে!"

ধীর-কণ্ঠে নমিতা কহিল—"অমন যা-তা বোলো না কাকিমা।"

—"কেন বলবো না শুনি? সংসারে শ্রী থাকবে না? শ্রী আছে তোমার কপালে!"

গোলমাল শুনিয়া নমিতার মা উঠিয়া আসিলেন। তাঁহাকে শুনাইবার জন্য কাকিমা গলায় আরো শান দিতে লাগিলেন: "আমার ভায়ের জন্য এতই যদি তোর মন পুড়ছিল হতভাগী, নিজে গিয়ে মাছ মাংস রেঁধে দিলি নে কেন? ক্ষীরের পুলি তৈরি করে দিতিস বসে বসে।"

নমিতা নিঃশব্দে নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিল। শুনিতে পাইল মা-ও কাকিমার পক্ষ লইয়া তাহাকেই মন্দ বলিতেছেন। মা'র এই অসহায় অবস্থায় কাকিমার বিরোধিতা করিবার উপায় ছিল না, তাই তাঁহাকে বাধ্য হইয়া কাকিমার এই কটুবাক্যে সায় দিতে হইতেছে। আর-আর দিন তিরস্কৃত হইয়া নমিতা নিজেকে একান্ত ব্যর্থ মনে করিয়া চোখের জল ফেলিত, আজ সে বুঝিল, এইভাবে এই অন্যায় বরদাস্ত করা তাহার আত্মসম্মানের অনুকূল হইবে না। নারী এবং পরাবলম্বী হইয়াছে বলিয়াই যে তাহাকে মাথা পাতিয়া চিরকাল এই ঘৃণ্য নির্যাতন সহিতে হইবে এবং আত্ম-সম্মানে জলাঞ্জলি দিয়া একটা প্রতিবাদ করিবার জন্য ভাষা পর্যন্ত পাইবে না, তাহা ভাবিতে তাহার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জ্বলিতে লাগিল। কিন্তু সম্প্রতি তাহার কোনো

প্রতিকার নাই—তবু মনে-মনে এই একটা বিদ্রোহভাব পোষণ করিয়া তাহার তৃপ্তির আর অবধি রহিল না।

মা নমিতার সঙ্গে কোনো কথা না কহিয়া বালিশে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতে লাগিলেন; নমিতাও নিঃশব্দে বইয়ের উপর মুখ গুঁজিয়া রহিল। এই অবরোধ হইতে তাহারা কবে মুক্তি পাইবে? প্রদীপ সেই যে একটু বন্ধুতার আশ্বাস দিয়া পলাইয়াছে, আর তাহার দেখা নাই। পরের কাছ হইতে আশ্রয় বা সাহায্য নিতে গেলে কত বিপদ, কত ভয়—নমিতাকে নিজের পায়ে দাঁড়াইতে হইবে। কত নিন্দা, কত গ্লানি, কত অখ্যাতি—নমিতা শিহরিয়া উঠিল। সংসারে বন্ধুরূপে কাহাকেও স্বীকার বা গ্রহণ করাও বাঙালি মেয়ের নিষিদ্ধ—স্বামী যদি মরিল, তবেই তুমি অব্যবহৃত ছিন্ন জুতার সামিল হইয়া উঠিলে। এক বেলা আলোচাল খাইয়া তোমাকে ইহজীবন সার্থক করিতে হইবে। কোথায় একটা লোক মরিল, আর অমনি তোমার দেহ ও আত্মা এক সঙ্গে পক্ষাঘাতে অসাড় হইয়া উঠিবে: এই বিধান মাথা পাতিয়া নিতে তাহার আর ইচ্ছা হইল না, অথচ প্রদীপ একটু স্নেহাতিশয্যে তাহার হাত ধরিয়া ফেলিয়াছিল বলিয়া, শ্বশুর-মহাশয় তাহাকে কেবল মারিতে বাকি রাখিয়াছিলেন। এমন কি, সেখানে তাহার চিত্তবিভ্রম ঘটিবার সুযোগ আছে বলিয়া, তাহাকে কাকার বাড়িতে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সমস্ত বাড়ি নিঝুম হইয়া গিয়াছে। নমিতা বই মুড়িয়া রাখিয়া চুলের খোঁপাটা বাঁধিয়া লইয়া নীচে নামিতে লাগিল। এই তাহার প্রথম বিদ্রোহ। ভয় যে করিতেছিল না তাহা নয়, তবু যে-লোক সামান্য দুইটি ভাত চাহিয়া না পাইয়া ফিরিয়া গিয়াছে, তাহার প্রতি সে কেন যে একটি মধুর সমবেদনা অনুভব করিতেছে বুঝা কঠিন। সুমি কাকিমার ছেলেপিলেদের সহিত তাস দিয়া ঘর-বানানোর খেলাতে মত্ত ছিল, দিদিকে লক্ষ্য করিল না। নমিতা সোজা অজয়ের ঘরের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

দরজা দু'ফাঁক হইয়া রহিয়াছে, বেশ দেখা গেল ঘরে কেহ নাই। ঘরে কেহ নাই ভাবিয়াই নমিতা আসিতে পারিয়াছে, নচেৎ তক্তপোষের উপর অজয়কে শুইয়া থাকিতে দেখিলে বিদ্রোহিনী নমিতা লজ্জায় জিভ কাটিয়া ধীরে ধীরে প্রত্যাবর্তন করিত হয়ত।

ঘরের চেহারা দেখিয়া নমিতা ছি ছি করিয়া উঠিল—এই ঘরে মানুষে থাকে! তক্তপোষের উপর ছেঁড়া একটা মাদুর পাতা—তাহার উপর একটা তোষক আছে বটে, কিন্তু সেটাকে একটা কাঁথা বলিলেও অত্যুক্তি করা হয়। মশারির তিনটা কোণ

ছিঁড়িয়া গিয়া বিছানার উপরই বিস্তৃত হইয়া আছে, ছেঁড়া বালিশের তুলোগুলি মেঝেয় ও বিছানায় এলোমেলো হইয়া হাওয়ায় উড়িতেছে। সদ্য-কাচানো কয়েকটা ধুতি মেঝেয় ধূলার উপরই পড়িয়া আছে—ঘরে কতদিন যে ঝাঁট পড়ে নাই, তাহার চেয়ে আকাশে কয়টা তারা আছে বলা সহজ। টেবিলটার উপর স্তূপীকৃত বই, খাতা, ওষুধের শিশি, দাড়ি কামাইবার সরঞ্জাম—যেন একটা প্রকাণ্ড বাজার বসিয়াছে। নমিতা যেন হঠাৎ একটা কাজ পাইয়া গেল। এই বিশৃঙ্খল ঘরে যে-লোকটি বাস করে, সে কোন নিয়মের অনুগত নয় বলিয়া তাহার মনে ক্ষোভের সঙ্গে সঙ্গে স্বচ্ছ একটি স্নেহ জমিয়া উঠিতে লাগিল।

অতি যত্নে নমিতা এই নোংরা ঘরকে মার্জনা করিতে বসিল। ঝাঁটা কুড়াইয়া আনিয়া ধূলা ঝাড়িল, টেবিলটা ভদ্রলোকের ব্যবহারের উপযুক্ত করিয়া তুলিল এবং টেবিলের কাছে যে চেয়ার আছে, নিজের অলক্ষিতে তাহারই উপর বসিয়া সামনের আয়নায় নিজের মুখ হঠাৎ দেখিতে পাইয়া লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া বিছানাটার সংস্কার করিতেছে, বলা-কহা নাই, হঠাৎ খোলা দরজা দিয়া সেই এক মাথা রুক্ষ চুল নিয়া অজয় আসিয়া হাজির!

বিস্ময়ের প্রথম ঘোরটা কাটিতেই অজয় চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া শ্রান্ত-কণ্ঠে কহিল—"যতই কেন না নাস্তিকতা করি, ভগবান বারে-বারে প্রমাণ করে দিচ্ছেন যে, তিনি আছেনই আছেন। এখান থেকে ভাত না পেয়ে একবার ভাবছিলুম বেলেঘাটায় যাব, বাসএও উঠেছিলুম, কিন্তু হঠাৎ জ্বর এসে গেল। ভীষণ জ্বর!" বলিয়া নিজেই নিজের কপালে হাত রাখিল। কহিল—"ভাবছিলুম ঘরে ত ফিরে যাব, কিন্তু বিছানা-পত্র যে রকম নোংরা হয়ে আছে, শোব কি করে? বিছানা গুছোবার প্রবৃত্তি আমার কোনো কালেই ত নেই।"

মশারির একটা কোণ হাতে ধরিয়া নমিতা চিত্রার্পিতের মত দাঁড়াইয়া আছে। বিস্ময়ের সঙ্গে বেদনা মিশাইয়া কহিল—"জ্বর হ'ল?"

—"কত অত্যাচার আর সইবে বল? তখন যে ক্ষুধার সময় ভাত পেলুম না, স্নানও যে করতে পারলুম না—ভালোই হয়েছে। অসুখটা তাহলে আরো বাড়ত—আমার অসুখ বাড়তে দিলে চলবে কেন? আমার যে কতো কাজ—কী প্রকাণ্ড দায়িত্ব আমার হাতে!" একটু থামিয়া আবার সে প্রশ্ন করিল—"কিন্তু তুমি হঠাৎ এ-ঘরে কেন নমিতা?"

বিছানাটা ক্ষিপ্রহাতে যথাসম্ভব গুছাইয়া নিতে-নিতে নমিতা কহিল—"আপনিই ত তার উত্তর দিয়েছেন। আপনাকে নাস্তিকতা থেকে রক্ষা করতে।"

একটা নিশ্বাস ছাড়িয়া অজয় বলিল—"হবে।"

বিছানাটাকে শুইবার মত উপযুক্ত করিয়া নমিতা কহিল—"আপনি কাঁপছেন, শিগ্‌গির শুয়ে পড়ুন।"

অজয় এক লাফে বিছানায় আসিয়া আশ্রয় নিল।

নমিতা একটু কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল—"খুব কষ্ট হচ্ছে?"

অজয় কহিল—"আমাকে এক গ্লাস জল দিতে পার? খাব।"

—"আনছি।" নমিতা তাড়াতাড়ি রান্নাঘর হইতে জল নিয়া আসিল।

জল খাইয়া সামান্য একটু সুস্থ হইয়া অজয় বলিল—"এ ক'দিন রোদ্দুরে তো আর কম ঘুরি নি। মাথাটা যেন ফেটে পড়ছে। একটু হাওয়া করবে নমিতা? দেখ, পাখাটা বোধ হয় তক্তপোষের তলায় ঘুমুচ্ছে।"

তক্তপোষের তলা হইতে পাখাটা টানিয়া আনিয়া নমিতা শিয়রে দাঁড়াইয়া ক্ষিপ্রহাতে বাতাস করিতে লাগিল। কহিল—"কাকিমাকে ডেকে আনি, কেমন?"

অজয় অস্থির হইয়া কহিল—"না না না, আর কাউকে ডাকতে হ'বে না। চেয়ারটা টেনে এনে এখেনে বসে তুমিই হাওয়া কর একটু।"

নমিতা না বলিতে পারিল না: "কিন্তু কেউ দেখতে পেলে কি বলবেন ভাবুন দিকি।"

নমিতার মুখের উপর স্থির দুইটি চক্ষু তুলিয়া অজয় বলিল—"তোমাকে মন্দ বলবেন? কিন্তু মন্দ তুমি ত কিছু করছ না! করছ? রোগীর প্রতি যদি একটু পক্ষপাতিত্ব দেখাও, তার ত একটা বড়ো রকম প্রশংসাও আছে।"

—"কিন্তু যাঁরা নিন্দা করবেন তাঁরা ত আমার সেই সেবাটুকুকেই দেখবেন না, দেখবেন অন্য কিছু।"

—"লোকে যদি ভুল দেখে তার জন্যে তুমি শাস্তি নেবে কেন? তুমি নিজে যদি অন্যায় বা অসঙ্গত বা অশিষ্টাচার মনে কর, দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে চলে যাও—কিন্তু লোকের তুচ্ছ মিথ্যাকে ভয় করে যদি পালাও তাহলে আমার দুঃখ থেকে যাবে। আমাকে একটু হাওয়া করা কি তোমার অন্যায় মনে হচ্ছে?"

তাড়াতাড়ি চেয়ারটা টানিয়া শিয়রের কাছে বসিয়া নমিতা কহিল—"এখন আপনি চুপ করে একটু শুয়ে থাকুন ত বিকেলে হয়তো জ্বরটা নেবে যাবে।"

একান্ত বাধ্য ছেলেটির মত অজয় চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল। কয়েক মিনিট পাখা চালাইবার পর অজয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে ভাবিয়া, নমিতা চারিদিকে একবার ভাল করিয়া চাহিয়া নিল। তারপর চোরের মত অতি সন্তর্পণে তাহার ডান

হাতখানি অজয়ের কপালের উপর রাখিয়া, তাড়াতাড়ি তখুনি আর সরাইতে পারিল না।

বাস্‌এ উঠিয়া প্রদীপের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না : সামনের জায়গাটাতে পিছন ফিরিয়া উমা বসিয়া আছে। নিশ্চয়ই উমা। তাই বলিয়া এক-বাস্ লোকের সামনে হঠাৎ তাহাকে সম্ভাষণ করিলে সেটা বাঙলা-সমাজের রুচিতে হয়তো বাধিবে। উমা কোথায় নামে সেইটুকু লক্ষ্য করিবার জন্য প্রদীপ তাহার গন্তব্য স্থানের সীমাটুকু পার হইয়া চলিল। কেন না উমাকেও হঠাৎ চমকাইয়া দিতে হইবে।

বাস্ একটা গলির মোড়ে আসিয়া থামিল। উমা এত উদাসীন যে নামিবার সময়ও প্রদীপকে একবার লক্ষ্য করিল না, কিন্তু রাস্তায় পা দিতেই টের পাইল, পেছন হইতে কে তাহার আঁচল টানিয়া ধরিয়াছে। ভয়ে চোখ মুখ পাংশু হইয়া উঠিতে না উঠিতেই সে আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

—"আপনি এখানে? বা রে! আর আমি আপনাকে সারা শহর খুঁজে বেড়াচ্ছি।"

প্রদীপ ততক্ষণে নিশ্চয়ই তাহার আঁচল ছাড়িয়া দিয়াছে। ফুটপাতের উপর উঠিয়া আসিয়া কহিল—"সারা শহর খুঁজে বেড়াচ্ছ কি রকম? গুপ্তচর নাকি? এখানে এলে কি করে?"

উমা কহিল—"বাঃ, এখানে এসেছি আজ ঠিক সাত দিন হ'ল। বাবা-মাও এসেছে। বাবা দু'মাসের ছুটি নিয়েছেন যে। আমি যে বেথুন-ইস্কুলে ভর্তি হ'য়ে গেলাম।"

প্রদীপ উমারই বিস্ময়ের প্রতিধ্বনি করিল: "বাঃ, এত খবর—আমি ত কিছুই জানতে পাই নি!"

—"কি করে পাবেন? আমাদের খবর পাবার জন্যে ত আপনার আর মাথা ধরে নি! ল্যাঙ্কাশায়ারে ক'টা কাপড়ের মিল বন্ধ হল এ-সব বড়-বড় খবর রাখতেই আপনাদের সময় যায় ফুরিয়ে, না? আমরা বাঁচলাম কি মরলাম—তাতে আপনার বয়ে গেল!"

উমার কথার সুরে স্নিগ্ধ অভিমান ঝরিয়া পড়িল। সে যে মনে-মনে কখন এমন অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে, প্রদীপ তাহা ভাবিয়া পাইল না। কণ্ঠস্বর কোমলতর করিয়া কহিল—"আমি যে এখানে ছিলাম না বহুদিন। গিয়েছিলাম বহুদূরে, পাঞ্জাবে। জরুরি কাজ ছিল।"

একটি অস্ফুট ভ্রূভঙ্গি করিয়া উমা কহিল—"সবই ত আপনার জরুরি কাজ। কিন্তু যাবার আগে আমাদের আপনার ঠিকানাটা লিখে পাঠালে নিশ্চয়ই পাঞ্জাবের ট্রেন

মিস করতেন না। তা, আমাদের সঙ্গে আপনার আর সম্পর্ক কি বলুন। দাদার সঙ্গে সব ছাই হ'য়ে গেছে।"

রাস্তায় দাঁড়াইয়া এই সব কথার কি উত্তর দিবে প্রদীপের ভাষায় কিছুতেই কুলাইয়া উঠিল না। এই মেয়েটির কথায় তাহার চিত্ত যেন ভরিয়া উঠিল। এই পৃথিবীর পারে কেহ তাহার জন্য একটি সশঙ্ক স্নেহ নিভৃতে লালন করিতেছে ভাবিতে তাহার মন ভিজিয়া গেল। বলিল—"আমার ঠিকানার হঠাৎ এত দরকার হ'ল ?"

—"না, দরকার আর কি! অজানা মানুষ, কলকাতায় এলাম—তেমন কোনো, বন্ধু-আত্মীয়ও আর নেই যে, দু-চারটে উপদেশ দেবে। দাদা থাকলে বরং—"

কথাটা অসমাপ্ত রাখিয়াই উমা প্রদীপের মুখের দিকে তাকাইল এবং চোখাচোখি হইতেই সে ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল। সেই স্বল্প সঙ্কেতময় হাসিটিতে প্রদীপের মর্মবেদনা নিমেষে মুছিয়া দিয়া উমা কহিল—"দাদার পুরোনো ডায়রিতে আপনার মেসএর একটা ঠিকানা পেয়েছিলাম। সেখানে বার-তিনেক লোক পাঠিয়েছি; প্রথম বার বল্লে, বাবু ঘুমুচ্ছেন; দ্বিতীয় বার বল্লে, বাবু বাড়ি নেই; তৃতীয় বার বল্লে, ও বাড়ির কেউ বাবুকে চেনেই না।" বলিয়া উমা একটু নুইয়া পড়িয়া খিল্ খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

প্রদীপ কহিল—"চতুর্থ বার লোক পাঠালে খবর পেতে, বাবু মাথা ন্যাড়া করে বেলতলায় গেছেন হাওয়া খেতে। কিন্তু তোমাদের বাড়িটা কোথায় ?"

আঙুল দিয়া দেখাইয়া উমা কহিল—"ঐ গলিতে। বিয়াল্লিশ নম্বর। যাবেন ? গরীবদের ঘরে পায়ের ধুলো দিতে বাধা নেই ত ?"

—"তুমি কী যে বল উমা!" বলিয়া প্রদীপ উমার হাত ধরিয়া রাস্তাটুকু পার হইয়া গলির মধ্যে আসিয়া পড়িল।

গলিতে পা দিতেই প্রদীপের কেন জানি মনে হইল, সে স্বপ্ন দেখিতেছে। কণ্টক-সঙ্কুল রুক্ষ পথ-প্রান্তে কেহ তাহার জন্য একটি আশ্রয়-নীড় নির্মাণ করিয়া রাখিয়াছে ভাবিয়া বিধাতাকে তাহার বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হইল বোধ হয়। আকাশ-বিস্তীর্ণ মহাশূন্যতায় তাহার উড্ডীন দুই পাখা ক্ষণতরে বিশ্রাম লাভ করিতে পারিবে।

এই মেয়েটি তাহার ছোট দুইটি করতলে এ কী সান্ত্বনা লইয়া আসিয়াছে! নয়, নয় —তাহার জন্য স্নেহ নয়, সেবা নয়—সুধার আস্বাদ সে এই জীবনে নাই বা লাভ করিল! তবু একবার সে এই তিমিরময়ী রাত্রির পার খুঁজিবে—এই নিরানন্দ পথরেখা কোথায় আসিয়া আবার সুখস্বর্গলোকে উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহার সন্ধান না লইলে চলিবে কেন ?

বত্রিশ, তেত্রিশ—বাড়িটার কাছে আসিয়া পড়িয়াছে আর কি! উমার ডাকে সে আরেকটি দুঃখিনী নারীর অনুচ্চারিত অনুনয় শুনিয়া থাকিবে হয় ত। আরেকটু অগ্রসর হইলেই নমিতার দেখা পাইবে ভাবিতেই প্রদীপের মন বাজিয়া উঠিল। আশ্চর্য, এত দিন নমিতার কথা তাহার একটুও মনে হয় নাই। সে এত দিন এত সব ভয়ঙ্কর সমস্যায় জর্জরিত হইয়া ছিল যে, তাহার কাছে কোনো ব্যক্তি-বিশেষের সামান্য দুঃখ-দুর্দশা সমুদ্রের তুলনায় গোষ্পদের চেয়েও হীন ছিল। কিন্তু এখন নিবিষ্টমনে নমিতার নিরাভরণ ব্যথা-মলিন মূর্তির কথা মনে পড়িয়া গেল। তাহার ধ্যানের ভারতবর্ষ ত এমনই। এমনিই বিগতগৌরব, হৃতসর্বস্ব। শুধু অতীতের একটি ক্ষীণায়মান স্মৃতির সুধা সেচন করিয়া নিজের বর্তমান বিকৃত জীবনকে বাঁচাইয়া রাখিতেছে। নমিতার মত তাহারো কোনো ভবিষ্যৎ নাই। এমনি মূক, এমনি প্রতি াদহীন।

বাড়ির দরজা পর্যন্ত আগাইয়া আসিল, কিন্তু নমিতার বিষয়ে উমাকে একটা প্রশ্নও করা হইল না। সে কেমন করিয়া দিন কাটাইতেছে না জানি। প্রশ্ন করা হইল না বটে, কিন্তু উমার পদানুসরণ করিয়া উপরে আসিয়াই তাহার চক্ষু সম্বিৎসু হইয়া উঠিল। একটা তক্তপোষের উপর বসিয়া অরুণা একটি যুবকের সঙ্গে কথা কহিতেছিলেন; প্রদীপ আসিয়া প্রণাম করিলে তিনি পা দুইটাকে একটু সরাইয়া লইলেন মাত্র, কুশল-জিজ্ঞাসা বা আনন্দজ্ঞাপনের সাধারণ সাংসারিক রীতিটুকু পর্যন্ত পালন করিলেন না। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক বটে, কিন্তু ইহার বিসদৃশতাটা প্রথমে প্রদীপের চোখে পড়িল না; সে আপনার খুশিতে বলিয়া চলিল—"দেখা আবার হ'তেই হবে। হয় ত এতক্ষণে কোনো-অতিথি-শালায় গিয়ে পচতে হ'ত, কিন্তু দিব্যি উমার সঙ্গে মা'র কাছে চলে এলাম। আমাকে আর পায় কে?"

এই কথাগুলির সস্নেহ প্রতিধ্বনি মিলিল না। অরুণা একটু দূরে বসিয়া কহিলেন—"তোমার এ বাড়িতে আসাটা উনি পছন্দ করেন না।"

উমা প্রখর-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"কারণ?"

মেয়ের মুখের এই প্রশ্ন শুনিবার জন্য অরুণা প্রস্তুত ছিলেন না। উমাই যে প্রদীপকে ডাকিয়া আনিয়াছে, এবং তাহাকে হঠাৎ বাড়ি হইতে চলিয়া যাইতে বলাটা যে উমার পক্ষেই অপমানকর, তাহা অরুণাকে তখন কে বুঝাইয়া দিবে? তাই তিনি রুক্ষস্বরে কহিলেন—"কারণ আবার কি? সত্যি প্রদীপ, তুমি না এলেই উনি খুশি হবেন।"

প্রদীপ বিস্ময়ে মূক, পাথর হইয়া গেল। মুহূর্তে ব্যাপারটা কি হইয়া গেল সে বুঝিয়া

উঠিতে পারিল না। সে একবার উমার মুখের দিকে তাকাইল। সে মুখ কালো, লজ্জায় বিধুর। কোথায় যে একটা কদর্যতা রহিয়াছে, প্রদীপ ধরিতে পারিল না। তবু কহিল—"কোথাও বসে থাকবার সময় আমাদের এমনিই কম, তবু চেনা লোকের মুখ দেখতে পেলে তাদের পাশে একটুখানি না জিরিয়ে যেতে পারি না মা! আমরাও না। একজনকে ত চিরদিনের জন্যেই হারিয়েছি, কিন্তু নমিতাকে দেখতে পাচ্ছি নে ত। তাকে একবার ডাকবে উমা?"

অরুণার দৃষ্টি কুটিল হইয়া উঠিল; কথা শুনিয়া তিনি এমন সবেগে সরিয়া বসিলেন যে, যেন শারীরিক গ্লানি বোধ করিতেছেন। দৃশ্যটা উমা ও প্রদীপ দুই জনেরই চোখে পড়িল। কিন্তু এই আচরণের একটা বুদ্ধিসম্মত ব্যাখ্যা বাহির করিবার আগেই অরুণা কহিলেন—"তার খোঁজে দরকার কি? সে বাপের বাড়ি আছে।"

কটুকণ্ঠস্বরে প্রদীপ সামান্য বিচলিত হইল। তবু সহজ স্বরে স্মিতমুখে কহিল—"ভালই হ'ল। তার বাপের বাড়ি শুনেছিলাম কলকাতায়ই। ঠিকানাটা ভুলে গেছি। ঠিকানাটা বলুন না, একবার না-হয় দেখা করে রাখি। কখন আবার কোথায় যাই ঠিক নেই।"

প্রদীপের এতটা অবিনয় অরুণার সহ্য হইল না। তিনি একবার উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন—"তার ঠিকানা দিয়ে তোমার কি এমন স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটবে শুনি?"

—"আমার না ঘটলে দেশের কিছুটা ঘটতে পারে হয়ত। নমিতার হাতে এখন আর কি কাজ থাকতে পারে? জীবনে তার যা পরম ক্ষতি ঘটেছে তাকে পরের সেবায় পুষিয়ে নিতে না পারলে নিজের কাছে লজ্জায় যে তার সীমা থাকবে না।"

—"তুমি যে চমৎকার বক্তা হয়েছ দেখছি। নমিতার কি করা উচিত না উচিত তার জন্যে তার অভিভাবক আছে। তোমার মাথা না ঘামালে কোনো ক্ষতি নেই।"

প্রদীপ তবু হাসিল বটে, কিন্তু গলার স্বর ভারি হইয়া উঠিল: "শাস্ত্রবিহিত অভিভাবকের চেয়ে নিজের বিবেকের শাসনই প্রবল হয়ে ওঠে, মা। বিংশ শতাব্দীর ধর্মই এই। নমিতার কি করা উচিত না উচিত সে-পরামর্শ তার সঙ্গেই করা ভালো।"

অরুণার মুখ চোখ রাঙা হইয়া উঠিল; কহিলেন—"তুমি বলতে চাও স্বামীর ধ্যান ছেড়ে তোমাদের এই তুচ্ছ দেশসেবায় তাকে তুমি প্ররোচিত করবে?"

—"আমার সাধ্য কি মা? নিজে না জাগলে কেউ কাউকে ঠেলে জাগাতে পারে না। যদি নমিতা একদিন বোঝে তার এই স্বামী-ধ্যানটাই তুচ্ছ, তাহলে সেটা দেশের পক্ষে পরম সৌভাগ্যসূচনা। কেননা দেশের সেবায়ই সে বেশি মর্যাদা পাবে।

মরা লোককে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে আমরা আমাদের মনগুলিকে মিউজিয়মে রূপান্তরিত করি নি। যাক, ঠিকানাটা দিন, সত্যিই আমারো বেশি সময় নেই।”

অরুণা কহিলেন—“তোমাকে তার ঠিকানা দিতে পারলাম না।”

প্রদীপ স্তব্ধ হইয়া গেল। বলিল—“কারণটা জানতে পারি ?”

—“নিশ্চয়। কারণ, আমরা চাই না বাইরের লোক এসে আমাদের ঘরের বৌর সঙ্গে বাজে আলাপ করে।”

সমস্ত কুয়াসা এতক্ষণে পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। প্রদীপের নিশ্বাস হালকা হইয়া আসিল। যেন সে একটা গভীর সন্দেহ ও আশঙ্কা হইতে এতক্ষণে মুক্তি পাইয়াছে। একটু হাসিয়া কহিল—“আপনার বিধান আমি মেনে নিলাম মা। ঠিকানা আমি তার চাই নে। যদি সত্যিই তার সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছাটা আন্তরিক হয়ে ওঠে, তবে একদিন দেখা তার পাবই—এ একেবারে স্বতঃসিদ্ধ। আগে ভাবতাম, নমিতা আমার বন্ধুর স্ত্রী—তার প্রতি আমারো দায়িত্ব আছে। এখন সে-সম্পর্ক থেকে মুক্তি দিলেন বলে ভালোই হল। এখন যদি নমিতার সঙ্গে কোনোদিন দেখা হয়, সে আর আমার বন্ধুর স্ত্রী নয় মা, খালি বন্ধু। চাই নে ঠিকানা।” বলিয়া প্রদীপ দ্রুত-পদে সিঁড়ি দিয়া সোজা নামিয়া আসিল।

হঠাৎ সিঁড়িতে উমার ব্যগ্র কলকণ্ঠ শোনা গেল : দাঁড়ান, দাঁড়ান দীপদা। বৌদির ঠিকানা নাই বা পেলেন, নিজের ঠিকানা না দিয়ে পালাচ্ছেন কেন ?”

দরজার গোড়ায় প্রদীপকে উমা ধরিয়া ফেলিল। কহিল—“আপনার সঙ্গে দেখা হবার ইচ্ছাটা আমার একান্ত আন্তরিক ছিল বলেই ত আজ বাসএ আমাদের দেখা হয়ে গেল। কিন্তু সেই দেখা অসম্পূর্ণ রাখতে হবে এমন দুর্ঘটনা অবিশ্যি এখনো ঘটে নি।”

প্রদীপ আশ্চর্য হইয়া উমার মুখের পানে তাকাইল। দুইটি উজ্জ্বল আয়ত চক্ষু বুদ্ধিতে দীপ্তি পাইতেছে, ছোট সঙ্কীর্ণ ললাটটিতে প্রতিভার স্থির একটি আভা বিরাজমান। কৃশ দেহটি ঘিরিয়া ম্লানাভ যৌবনের যে একটি লালিত্য লীলায়িত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা মুহূর্তের জন্য প্রদীপের ক্লান্ত মন ও চক্ষু আবিষ্ট করিয়া তুলিল। উমার এই ছুটিয়া ডাকিতে আসাটির মধ্যে কোথায় যে একটি সযত্নসমৃদ্ধ সুস্নিগ্ধ স্নেহের স্বাদ আছে, তাহা আবিষ্কার করিতে গিয়া এই মেয়েটির প্রতি প্রদীপের মায়ার আর

শেষ রহিল না। কিন্তু কি বলিবে তাহাই ভাবিয়া লইবার জন্য প্রদীপ এক পলক অপলক চোখে উমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

উমা কহিল—"এখুনি পালাতে চাইলেই আমি ছাড়ব আর কি। আপনার সঙ্গে আমার কত যে কথা আছে, তা এতদিন ভেবে-ভেবে আমি শেষ করতে পারি নি। দাঁড়ান, সব আমাকে ভেবে নিতে দিন।"

প্রদীপ ম্লান হাসিয়া কহিল—"সময় নেই উমা। তাছাড়া আমার সঙ্গে মিশতে দেখলে মা খুশি হবেন না।"

উমা নির্ভীক কণ্ঠে কহিল—"আপাততঃ নিজে খুশি হলেই আমার স্বচ্ছন্দে চলে যাবে'খন। বেশ ত, এ বাড়িতে ডেকে এনে আপনাকে যদি অপমানিত করে থাকি, দাঁড়ান, আমি আপনার মেসএ যাবো। রাস্তায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সে প্রকাণ্ড ইতিহাস শেষ করা যাবে না।"

—"তুমি পাগলের মতো কী বকতে শুরু করলে!"

—"বকলেই পাগল হয় না এবং ঢের পাগল আছে যারা মোটেই বকে না। আমি বকছিও না, পাগলও হই নি। দেখবার ইচ্ছাটা আন্তরিক হলে দৈবাৎ এক আধবার মাত্র দেখা হতে পারে, কিন্তু দেখাটা যখন আবশ্যকীয় হয় তখন ইচ্ছাটা খালি আন্তরিক হলেই চলে না, দস্তুরমত ঠিকানা জানা দরকার। আপনার ঠিকানা যদি না দেন, তবে বলব মা'র থেকে বৌদির ঠিকানা না পেয়ে আপনি ছোট ছেলের মত অভিমান করেছেন। পুরুষ-মানুষের রাগ আমি সইতে পারি, কিন্তু ছিঁচকাঁদুনের মত অভিমান আপনাদের মানায় না কক্‌খনো।"

প্রদীপ আবার ভালো করিয়া উমাকে না দেখিয়া পারিল না। উহার সাদাসিধে শাড়িখানা যেন নিমেষে তাহার অজস্র স্নেহে মাখিয়া উঠিল, উহার দুই চোখে যেন অদেখা আকাশের ছায়া পড়িয়াছে! কিন্তু নারীর রূপকে সে ধ্যানী বা কবির চোখেই দেখিতে শিখিয়াছে, তাই এই দৃপ্তা সাহসিকাকে ভারতোদ্ধারবাহিনীর অগ্রবর্তিনী করা যায় কি না, তাহাই ভাবিয়া তাহার আশা ও আনন্দ একসঙ্গে উথলিয়া উঠিল। কহিল—"কিন্তু আমাকে নিয়ে তোমার কি প্রয়োজন থাকতে পারে? ভবিষ্যৎ বলে আমার যেমন কিছু নেই, তেমনি আমার ঠিকানাও আমি নিজেই খুঁজে পাই না। স্থায়িত্ব জিনিসটা আমার ধাতে সয় না। আশা, আকাঙ্ক্ষা, ভালোবাসা, স্নেহ, জীবন-মরণ সব কিছু স্বল্পায়ু বলেই আমরা কাজ করতে এত বল পাই এবং তাড়াতাড়ি করে ফেলবার জন্যে এত ব্যস্ত হয়ে পড়ি।"

উমার দুইটি চোখের কোলে তরল হাসি টল্‌টল্‌ করিয়া উঠিল। কহিল—"আমি

দার্শনিকতা বুঝি না। সোজা স্পষ্ট কথা বলতে পারলে বেঁচে যাই। অবশ্যি আপনার দেশসেবায় আমি ব্রতধারিণী হতে পারবো না, সে আমার বোকা মুখ ও বেচারা চেহারা দেখেই বুঝতে পারছেন, কিন্তু দেশসেবা ছাড়া জীবনে আর বড়ো কাজ নেই একথা আপনি বুদ্ধিমান হলে নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন না। তেমন কোনো কাজে আপনাকে দরকার হলে কোথায় আমি কড়া নাড়ব?"

প্রদীপ কহিল—"তোমাকে ঠিকানা দিতে পারলে আমিই বেশি খুশি হতাম উমা, কেননা কড়া-নাড়ার প্রতীক্ষা করে বসে থাকতে আমার হয়ত ভালই লাগত। কিন্তু আজ এখানে আছি, কালকেই হয়ত লাহোর, দুদিন পরেই কে জানে ফের রেঙ্গুন পাড়ি মারতে হবে। এক জায়গায় চুপ করে বসে থাকলে খালি মনে হয় বৃথা আয়ুক্ষয় করছি। অন্তত চলছি—এটুকু চেতনা না থাকলে মরতে আর আমার বাকি থাকে না।"

—"হেঁয়ালি রাখুন দিকি—বড়ো-বড়ো কথা বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়িয়ে বলবেন। ঠিকানা না থাকে, এমন একটা জায়গার নাম করুন যেখানে মাঝে-মাঝে গিয়ে দু'দণ্ড আপনার সঙ্গে বসে কথা কইলে সমাজ বা আইনের চোখে দণ্ডনীয় হবো না। মা বোধ হয় আসছেন নেমে, বলুন শিগ্‌গির করে।"

প্রদীপ ফট্ করিয়া বলিয়া বসিল: "১৬, শ্রীগোপাল মল্লিকের লেইন। ওটা একটা মেস। তোমার যদি কিছু বক্তব্য থাকে, চিঠি লিখো, কেমন?"

উমা হাসিয়া কহিল—"কলমের চেয়ে পা চালাতে আমি বেশি ভালোবাসি। কিন্তু বৌদিদির ঠিকানা আপনি সত্যিই চান? তার সঙ্গে দেখা করবেন?"

কাহার পদশব্দে সচকিত হইয়া প্রদীপ নিদারুণ বিস্ময়ে তাকাইয়া দেখিল, অরুণা সিঁড়িতে নামিয়া আসিয়াছেন। চলিয়া যাইবার শেষ চেষ্টা করিয়া কহিল—"দরকার নেই। ঠিকানা নিয়ে সে-বাড়িতে গেলেও যে ফিরে যেতে হবে না তার ভরসা কি? তবে নমিতার ইচ্ছা যদি কোনোদিন সত্যিই আন্তরিক হয়ে উঠে, আকাশের কোটি গ্রহ-নক্ষত্র ষড়যন্ত্র করলেও আমাদের দেখা হওয়াকে কিছুতেই খণ্ডাতে পারবে না কেউ।" বলিয়া বাহিরের জনাকীর্ণ রাজপথে প্রদীপ মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

মা'র দৃষ্টির সামনে সঙ্কুচিত হইয়া উমা উপরে উঠিয়া আসিল। মা-ও পুনরায় ঘরে আসিলেন। তারপরে এমন একটা তুমুল গোলমাল শুরু হইল যাহাতে শচীপ্রসাদও, প্রদীপের প্রতি যতই কেন না অপ্রসন্ন থাক, সম্পূর্ণ সায় দিতে পারিল না। তক্তপোষের এক ধারে শচীপ্রসাদ এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিল, এখন তাহাকেই মধ্যস্থ মানিয়া মেয়ের এই নির্লজ্জতার বিরুদ্ধে অরুণা বিচার-প্রার্থিনী হইয়া

দাঁড়াইলেন। শচীপ্রসাদ সম্প্রতি পরোক্ষে উমার উমেদারি করিতেছিল বলিয়া তাহার বিপক্ষে কিছু বলিতে তাহার মন উঠিতেছিল না, তাই তাহার সমস্ত রাগ গিয়া পড়িল প্রদীপের উপর। খুব জ্ঞানীর মত মুখ করিয়া শচীপ্রসাদ বলিল—"ওসব **undesirable**দের বাড়িতে ঢুকতে দেয়াই উচিত নয়। সুধী যদি বেঁচে থাকত, তার বন্ধুতার একটা মানে ছিল, কিন্তু এখন তার পক্ষে এ-বাড়িতে ঢোকা অনধিকার প্রবেশ ছাড়া আর কি বলব।"

উমা মা'র অন্যায় তিরস্কার শুনিয়াই বিমুখ হইয়া উঠিয়াছিল, এখন এই অযাচিত সমালোচনায় সে আর সংযত থাকিতে পারিল না। উদ্দীপ্তকণ্ঠে কহিল—"আর কিছু বলবেন কি করে? আপনাদের কি চোখ আছে না চোখের স্বচ্ছতা আছে? উনি নিজে যেচে এখানে আসেন নি, আমিই ওঁকে ডেকে এনেছিলাম। তাছাড়া দাদা মারা গেছেন বলেই ওঁকেও আমরা ভূত বানিয়ে ফেলবো আমাদের এ অকৃতজ্ঞতা বিধাতা ক্ষমা করবেন না। উনি আমাদের সংসারে অবাঞ্ছনীয় হলেন, সেটা আমাদের দুর্ভাগ্য। ওঁর সংস্পর্শে এলে একটা নূতন জগত আবিষ্কারের রোমাঞ্চ অনুভব করতে পেতেন নিশ্চয়।"

শচীপ্রসাদ ভাবিল, উমাকে অযথা চটাইয়া দিয়া সে ঠকিয়া গিয়াছে; কিন্তু কি করিয়া নিক্ষিপ্ত তীর ফিরাইয়া আনা যায়, তাহারই একটা দিশা খুঁজিতেছিল, এমন সময় অরুণাই তাহাকে রক্ষা করিলেন। কহিলেন—"কিন্তু অমন গুণ্ডাকে রাস্তা থেকে ধরে আনবারই বা এমন কি দায় পড়েছিল?"

—"দায় পড়ত যদি আমার বা তোমার প্রাণান্তকর অসুখ হত—তখন রাত জেগে গা-গতর ঢেলে সেবা করবার দরকার পড়ত যে। যদ্দিন তিনি দাদার সেবা করেছেন, ততদিন তিনি মহাপুরুষ, সাধু; আর আজ তিনি তাঁর দেশের সেবা করছেন বলেই গুণ্ডা। আমাদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থের সঙ্গে যে তাঁর সঙ্ঘর্ষ বেঁধেছে।"

শচীপ্রসাদ টিপ্পনি কাটিল: "দেশ কথাটা বানান করা নেহাৎ সোজা বলে সবাই তা নিয়ে ফোঁপরদালালি করে।"

উমা কহিল—"দেশ বানান করা সোজা বটে, কিন্তু বানানো সোজা নয়। সেটা দয়া করে মনে রাখবেন।"

রূঢ় কথা শচীপ্রসাদও কহিতে জানে, কিন্তু কথায়-কথায় কোথায় আসিয়া পৌছিবে তাহার ঠিকানা কি! তাহার চেয়ে চুপ করিয়া সিল্কের রুমাল দিয়া ঘাড়টা বার-পনেরো রগড়াইলে বরং কাজ দিবে।

কথা কহিলেন অরুণা: "কিন্তু এমন বেহেড্ বকাটের সঙ্গে তোর আবার অত ঘটা

করে সম্পর্ক রাখতে যাওয়া কেন? আমি ভাবছি আসচে হপ্তায়ই তোকে হস্টেলে ভর্তি করে দেব।"

উমা চুলগুলি লইয়া টানা-হেঁচ্‌ড়া করিতেছিল; কহিল—"তাঁর মানে, আমাকে প্রদীপদার প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে চাও। হস্টেলে ত আমি যাবই, তা বিশেষ করে মনে করিয়ে দেবারই বা কি দরকার? কিন্তু হস্টেলে গিয়ে সত্যিই যদি আমাকে প্রদীপদা'র সাহচর্য থেকে সরে থাকতে হয়, তাহলে সেটা আমার সীতার বনবাসের চেয়েও অসহনীয় হবে।"

এই প্রগল্‌ভ দুর্বিনীত মেয়েটাকে প্রহার করিতে পারিলেই বুঝি অরুণা সন্তুষ্ট হইতেন, কিন্তু তাহাতে বাধা ছিল। তাই কণ্ঠে বিষ ঢালিয়া তিনি কহিলেন—"তুই আর ওর চরিত্রের কী জানিস? পরের বাড়ির বৌর ওপর কেন ওর এত দরদ, তা তুই বুঝবি কি করে?"

না বুঝিলেও উমাকে বুঝাইয়া না দেওয়া পর্যন্ত অরুণার স্বস্তি ছিল না। শচীপ্রসাদ এবাড়িতে সম্পূর্ণ আগন্তুক নয়, অরুণার দিক হইতে তাহার সঙ্গে একটা সম্পর্কের সূত্র খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন হইবে না। তাই তাহার সামনে প্রদীপের নিন্দাটা শিষ্টাচারের বহির্ভূত হইবে না ভাবিয়াই, অরুণা তাহাকেই সম্বোধন করিলেন: "ভেবেছিলাম সুধী-র বন্ধু, ভদ্রলোক, লেখাপড়া শিখেছে—কিন্তু ভেতরে-ভেতরে যে এমন খারাপ, তা মোটেই আন্দাজ করতে পারি নি শচী। মরা-বন্ধুর প্রতি এতটুকু যার শ্রদ্ধা নেই, তাকে পুলিশেই ঠিক সম্মান দেখাতে পারবে।"

এইটুকু ভূমিকা করিয়া অরুণা সবিস্তারে নমিতার সঙ্গে প্রদীপের নীতিবিরুদ্ধ সান্নিধ্যের একটা বিশ্রী বর্ণনা দিয়া ফেলিলেন। পাছে পুত্রবধূর কল্পিত বিশ্বাসঘাতকতায় স্বর্গগত পুত্রের আঘাত লাগে, সেই ভয়ে স্নেহময়ী অরুণা সমস্ত কলঙ্ক প্রদীপের মুখেই মাখাইয়া দিলেন। অবনীবাবুর কাছে প্রদীপ-নমিতা-সংস্পর্শের যেটুকু বিবরণ পাইয়াছিলেন, তাহাতে সুবিধা-মত একটু বর্ণচ্ছটা না মিশাইলে চলিত না, তাই সহসা উমার সম্মুখে প্রদীপ একেবারে কালো ও কলুষিত হইয়া উঠিল। অরুণা ফোড়ন দিলেন: "দেশের নাম করে যেদিন থেকে গুণ্ডামি শুরু হয়েছে, সেদিন থেকেই ওর প্রতি আমি আস্থা হারিয়েছি।"

শচীপ্রসাদও রসনাকে নিরস্ত করিতে পারিল না: "চেহারা থেকেই যাঁরা মনস্তত্ত্ব আবিষ্কার করেন, সেসব লোকের কথায় বিশ্বাস আমার ষোল আনা। ওঁর চেহারা দেখেই আমার মনে হয়েছিল, লোকটা ভালো নয়। এর পর এসব পাড়ায় পা দিলে ওঁকে রীতিমত অসুবিধায় পড়তে হবে।"

উমার মুখ পাংশু হইয়া, গলা শুকাইয়া, নিমেষে যে কেমন করিয়া উঠিল বুঝা গেল না। না পারিল তীব্র প্রতিবাদ করিতে, না পারিল অভিযোগটা আয়ত্ত করিতে। প্রদীপ উত্তুঙ্গ গিরিচূড়া হইতে নামিয়া আসিয়া একান্ত অকিঞ্চিৎকর পিপীলিকার সমান হইয়া উঠিল। ইচ্ছা হইল প্রদীপকে ডাকিয়া আনে, সে নিমেষে এই সব অতি-মুখর নির্লজ্জ কটুভাষণের বিরুদ্ধে অগ্নিময় ভাষার-বাণ হানিয়া এই দুই আততায়ীকে অভিভূত করিয়া ফেলুক।

আর কিছুই না বলিয়া উমা নিজের ঘরে আসিয়া একটা চেয়ারে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। যাক্, এই সব ব্যাপার লইয়া মাথা না ঘামাইলেও তাহার চলিবে। সে এখানে পড়িতে আসিয়াছে, মন দিয়া পড়িয়া পরীক্ষা-সমুদ্রগুলি পার হইতে পারিলেই তাহার ছুটি মিলিবে। পরে কি হইবে এখন হইতে ভাবিয়া রাখার মত মূর্খতা আর কি আছে? তাহার মত অবস্থার মেয়ে দেশের জন্য কতটুকু কাজ করিতে পারে, সে বিষয়ে প্রদীপদার সঙ্গে খোলাখুলি একটা পরামর্শ করিতে পারিলে মন্দ হইত না, কিন্তু আপাততঃ তাহা স্থগিত রাখাই সমীচীন হইবে। কাজের জন্য প্রথমত খানিকটা যোগ্যতা ত দরকার, মনকে সেই আশ্বাস দিয়া সে সেল্‌ফ হইতে একটা বই টানিয়া লইয়া পড়িতে বসিল।

এমন সময় শচীপ্রসাদ ঘরে ঢুকিয়া তাহাকে ফের উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিল। শচীপ্রসাদের বয়স বাইশ, চেহারা দোহারা, পরনের জামা-কাপড়গুলি অত্যুগ্ররূপে পরিচ্ছন্ন। কামানো দাড়ি-গোঁফ ব্যাক্-ব্রাশড্ চুল—মুখে একটা মেয়েলি-ভাবের কৃত্রিম কমনীয়তা আছে। কলেজের ছাত্র হিসাবে খুবই ভালো, এই বৎসর সসম্মানে বি-এ পাশ করিয়াছে—বোধ হয় শীঘ্রই বিলাত যাইবে আই-সি-এস্ হইবার জন্য। উহার বাবার ইচ্ছা, শচীপ্রসাদ বিলাত যাইবার আগে এখানেই পাণিগ্রহণটা সারিয়া লয়; পিতার ইচ্ছার অনুবর্তী হইয়া শচীও তাই ঘন-ঘন এই বাড়িতে আসা-যাওয়া করিতেছে। অবনীবাবু অস্পষ্ট করিয়া মত দিয়াছেন বটে, কিন্তু উমার আগে এক মেয়ে নিজের অনিচ্ছায় বিবাহ করিয়া,স্বামীর দুর্ব্যবহারের জন্য মারা গিয়াছিল বলিয়া চট্ করিয়া মত দিয়া ফেলিতে অরুণা ইতস্তত করিতেছিলেন। মেয়েকে খোলাখুলি কিছু প্রশ্ন না করিয়া বিবাহের যোগাড়-যন্ত্র করিবারও কোনো অর্থ নাই, কেননা, দেশের হাওয়া বদলাইবার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁহার মেয়েও এমন স্বাতন্ত্র্যসাধিকা হইয়া উঠিয়াছে যে তাহাতে বিয়ের নামে নাক সিঁট্‌কাইয়া একদিন বাহির হইয়া পড়াটা তাহার পক্ষে বিচিত্র নয়। সুতরাং স্বয়ং শচীপ্রসাদকেই বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র ও নির্বিঘ্ন অবকাশের সুবিধা ছাড়িয়া দিয়া তাঁহারা স্বামী-স্ত্রী নেপথ্যে বসিয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন।

খবরটা উহার কানে যাইবে না, উমা তেমন নিরীহ ছিল না, কিন্তু সে বোধ করি বুঝিত যে বিবাহের প্রস্তাবের মধ্য দিয়া প্রেমের শুভাবির্ভাবের সূচনা হয় না। শচীপ্রসাদ তাহার সঙ্গে ব্যবহার করিত ভীরু ভক্তের মত নয়, অনেকটা কর্তৃত্বসম্পন্ন প্রভুর মত। অর্থাৎ উমার চিত্ত জয় করিবার জন্য প্রেম দিয়া নিজের চিত্ত-প্রসাধন করিবার প্রয়োজন সে বুঝিত না। জোয়ারের জলের মত উমার যৌবন উদ্বেল হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া তাহার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিতেছিল। উমার বাবা-মা যখন সঙ্কেত করিয়াছেন, তখন কোনো ব্যতিক্রমের জন্য তাহাকে জবাবদিহি করিতে হইবে না ভাবিয়া সে পরম নিশ্চিন্ত ছিল। নতুবা, তাহারো রোমান্টিক বা কল্পনাপ্রবণ হইবার বয়স ত ইহাই। হাত বাড়াইয়াই যখন উমাকে আয়ত্ত করা যায়, তখন তাহাকে আকাশচারিণী শশীলেখার সঙ্গে তুলনা করিয়া, বামন হইয়া অশ্রুবিসর্জন করিবার কোনো মানে হয় না। উমা সুন্দর, শোভনাঙ্গী; তাহা ছাড়া অবনীবাবুর সম্পত্তি উমার আঙুলের ফাঁক দিয়া নিশ্চয়ই তাহার হাতে আসিয়া পড়িবে। অতএব শচীপ্রসাদ যদি বুদ্ধিমান হয়, তবে অযথা কালবিলম্ব করিলে সৌভাগ্যলক্ষ্মীর কাছে সে হাস্যাস্পদ হইবে।

অথচ, শচীপ্রসাদের এই সকল অধিকার খাটানোর জন্যই তাহার প্রতি উমা প্রসন্ন হইতে পারে নাই। এমন নির্লিপ্তের মত আত্ম-নিবেদনের লজ্জা হয়ত তাহাকে সঙ্গোপনে আহত করিত। সে এমন করিয়া তাহার ব্যক্তিত্বকে মুছিয়া ফেলিতে চাহে না। নিশীথ রাত্রি ভরিয়া তাহাকে ভাবিয়া আকাশের তারাগুলির দিকে তাহার চাহিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে; কেহ আসিবে, এই অসম্ভব একটি বিশ্বাস পালন করিয়া সে তাহার অনতি-উদ্‌ঘাটিত যৌবনকে পূজার দীপশিখার মত আগ্রহ-কম্প্র উন্মুখ করিয়া রাখিবে, সে না আসিলে তাহার পড়ায় মন বসিবে না, চুল বাঁধিতে-বাঁধিতে জন-যান-মুখর রাজপথের পানে চাহিয়া সে সানন্দে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিবে। জীবনের এমন কতকগুলি মুহূর্ত না বাঁচিয়া সে এত অনায়াসে ফুরাইয়া যাইতে চাহে না। শচীপ্রসাদ যদি তাহার ঘরে নিঃশব্দ পদপাতে একটি ভয়-ভঙ্গুর অনুচ্চারিত প্রার্থনা লইয়া প্রবেশ করিত, তাহা হইলে উমার সর্বদেহময় রোমাঞ্চময় হইয়া উঠিত কি না কে জানে!

শচীপ্রসাদ হাসিয়া বলিল—"চল বায়স্কোপে যাই, পর্দায় আবার তোমার সেই লরা লা প্ল্যাঁতে দেখা দিয়েছেন।"

বই হইতে উমা মুখ তুলিল না; কহিল—"ফিল্ম দেখে পয়সা খরচ করাকে আর ক্ষমা

করতে পারবো না। বরং বিকালে বেরিয়ে আমার জন্মে যদি একটা কাজ করতে পারেন ত ভালো হয়।"

শচীপ্রসাদ ঘাবড়াইয়া গিয়া কহিল—"কি ?"

দুইটি স্থির জিজ্ঞাসু চোখ মেলিয়া উমা বলিল—"শ্রীগোপাল মল্লিকের লেইনটা কোথায় জানেন ?"

—"না, কেন ?"

—"তবে দয়া করে একটু খোঁজ নিয়ে আসবেন, ওখানে যেতে হলে বাস থেকে কোথায় নামলে সুবিধে।"

শ্রীগোপাল মল্লিকের লেইনে নিশ্চয় উমার কোনো সহপাঠিনী আছে বিশ্বাস করিয়া শচীপ্রসাদ একটু প্রফুল্ল হইয়া উঠিল হয়ত। উমার পরিচয়ের সূত্রে আরেকটি মেয়ের কাছে আসিতে পারিলে যে ভালোই হয়, সে-দুর্বলতা শচীপ্রসাদের বয়সের ছেলের পক্ষে অমার্জনীয় নয়। এবং সেই অনামা মেয়েটির সান্নিধ্যে যে শচীপ্রসাদ স্বাভাবিক সঙ্কোচে তাহার সমস্ত আচরণটিকে সুমধুর করিয়া তুলিত, তাহাতে আর সন্দেহ কি। তাই সেই গলিটার অবস্থান ও আয়তন-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও সে আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া কহিল—"কারো সঙ্গে দেখা করতে যাবে ? বেশ ত চল না, দু'জনে বেরিয়ে পড়ি। কাছাকাছি কোথাও হবে হয়ত। কলকাতার রাস্তা খুজে বেড়াতে আমার ভালোই লাগে। বেশ একটু বেড়ানোও হবে'খন।"

বইয়ের পৃষ্ঠায় ফের চোখ নামাইয়া উমা বলিল - "না, সেখানে আমাকে একলাই যেতে হবে। আপনি দয়া করে একটু জেনে এলেই চলবে।"

শচীপ্রসাদ ভাবিত হইল। এইবার তাহার স্বরে আর বিনয়স্নিগ্ধ কুণ্ঠা রহিল না। আরেকটু সরিয়া আসিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল—"সেখানে কে আছে শুনতে পাই ?"

উমা টলিল না, কহিল—"সব কথাই কি সব্বাইকে বলতে হয় ?"

—"অন্তত আমাকে তোমার বলা দরকার।"

—"এমন অনেক কথা আছে, যা নিজেকে পর্যন্ত স্পষ্ট করে বলা যায় না।"

রুক্ষস্বরে শচীপ্রসাদ বলিয়া উঠিল—"আমাকে না বললে আমার সাহায্য করাটা অসঙ্গত হবে।"

উমা একটু হাসিল ; বলিল—"আপনি সাহায্য করলেও শ্রীগোপাল মল্লিকের লেইনটা বাড়ীর দরজায় চলে আসত না, হেঁটেই যেতে হত। হাঁটতে আমি একলাই পারি।"

এই বলিয়া বইয়ের পৃষ্ঠাগুলি উল্টাইতে যাইতেই তাহার নজর পড়িল যে, বইটা একটা রেলওয়ে-সম্পর্কিত আইনের ইস্তাহার। এতক্ষণ তাহার মনকে শ্রীগোপাল

মল্লিকের লেইনের সন্ধানে পাঠাইয়া, সে এত মনোযোগ সহকারে ইহাই পড়িতেছিল নাকি!

তাড়াতাড়ি বইটা রাখিয়া উমা উঠিয়া দাঁড়াইল। শচীপ্রসাদের কিছু বলিবার আগেই সে হাসিয়া কহিল—"আপনার বায়স্কোপের পয়সা বাঁচিয়ে দিলাম, ও পয়সাটা চোখ মেলে কোনো পুয়োর ফাণ্ডে দিয়ে দেবেন।"

শচীপ্রসাদের কণ্ঠে বিষ আছে: "ভিক্ষা দেওয়াকে আমি পাপ মনে করি। তুমি না গেলেই যে বায়স্কোপ পটল তুলবে এমন কথা না ভাবলেই তোমার বুদ্ধি আছে স্বীকার করব। আমার পাশে একটা মাড়োয়াড়ি বসলেও ফিল্ম আমি কম enjoy করব না।"

সেই রাত্রি নমিতার আর কাটিতে চাহে না। একে-একে বাড়ির সমস্ত বাতি নিবিয়া গেল, কিন্তু তাহার চোখে কিছুতেই ঘুম আসিল না। ঘুম না আসিলে সে দোতলার বারান্দার রেলিঙের কাছে চুপ করিয়া থাকে; কিন্তু আজ সে স্পন্দমান চঞ্চল হৃদয়কে ঘুম পাড়াইয়া সে উদাসীন হইয়া সীমাশূন্যতার ধ্যান করিবে, তাহা অসম্ভব। প্রথমেই মনে পড়িল রাস্তার দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে চক্ষু দিয়া কিছুতেই সে আজ অজয়ের নাগাল পাইবে না। এই উপলব্ধি করিতেই নমিতা বারান্দায় দ্রুতপদে পায়চারি শুরু করিয়া দিল। সকলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। পাশের বাড়িতে যে-ছাত্রটি রাত জাগিয়া নীরবে পড়া করে, তাহারো টেবিলের মোমবাতিটা নিবিল। সেই ঘনায়মান চতুঃপার্শ্বের নীরবতার মধ্যে নমিতা কি করিবে, কিছুই কূল খুঁজিয়া পাইল না। খালি নিজের ডান হাতখানি বারম্বার কপালের উপর রাখিয়া সে অজয়ের জ্বরের উত্তাপ অনুভব করিতেছে।

নমিতা খোলা চুলগুলি আঁট করিয়া খোঁপা বাঁধিল; পরনের কাপড়ের প্রান্তটাকে পায়ের দিকে আরো একটু প্রসারিত ও বুকের উপর আরো একটু রাশীকৃত করিয়া লইল। চাবির গোছাটা আঁচলের প্রান্ত হইতে খুলিয়া বালিশের তলায় রাখিল ও উত্তুরে হাওয়া জোরে বহিতেছে বলিয়া মা'র পায়ের দিকের জানালাটাও বন্ধ করিতে ভুলিল না। অন্ধকারে পথ ঠাহর করিতে নমিতার বেগ পাইতে হয় না—অতিনিঃশব্দপদে সে সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা নামাইল। আকাশে কৃষ্ণপক্ষের পাণ্ডুর চাঁদ যে অনেকক্ষণই বিবর্ণ বেদনায় মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছে, তাহা সে জানিত; এখন সহসা সামনের ভাঙা দেয়ালের ফাঁকে হঠাৎ চাঁদ দেখিতে পাইয়া তাহার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন লাবণ্যে তরঙ্গিত হইয়া উঠিল। কিন্তু সিঁড়িতে একবার পা রাখিলে

হয়ত মাধ্যাকর্ষণের শক্তিতেই নীচে নামিয়া আসিতে হয়। নমিতা শুধু নীচে নামিয়া আসিল না, একেবারে অজয়ের ঘরের বন্ধ দরজার কাছে আসিয়া অবতীর্ণ হইল।

এক মুহূর্তও দেরি হইল না। তর্ক করিতে চাও, নমিতা তাহাতে কান পাতিবে না। তার পক্ষ হইতেও নীতি-কথা বলা যায় বৈ কি। রুগ্ন পরনির্ভরকামীকে সেবা করা অধর্ম? কিন্তু এত লোক থাকিতে তাহারই বা এমন কোন্ গরজ পড়িল? বচসা করিবার সময় নমিতার আর নাই, কাকিমার মেয়েটার চেঁচাইয়া উঠিবার সময় হইয়াছে।

এক ঠেলা মারিয়া নমিতা বন্ধ দরজা খুলিয়া ফেলিল। যাহা দেখিল, তাহাতে প্রথমে সে কি করিবে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। সে যে কেন অকারণে দেরি করিতেছিল তাহার জন্য সে শতরসনায় নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগিল। দেখিল, সেই শতচ্ছিন্ন তোষকটার উপর উবু হইয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া অজয় গোঙাইতেছে; কবে কি-সব ছাই-ভস্ম গলাধঃকরণ করিয়াছিল, তাহাই বমি করিয়া মেঝেটাকে ভাসাইয়া দিয়াছে। বমির বেগ এখনো প্রশমিত হয় নাই, অন্ধকারেও অজয়ের রোগবিকৃত বীভৎস মুখের ছায়া চোখে পড়িল। নমিতা তাড়াতাড়ি অজয়ের পাশে বসিয়া পড়িয়া তাহার মুখটা দুই হাতের অঞ্জলিতে ভরিয়া একেবারে তাহার কোলের উপর তুলিয়া পাঞ্জাবির তলায় পিঠের উপর অল্প একটুখানি হাত রাখিয়া দেখিল, জ্বরে অজয় দগ্ধ হইতেছে। কপালের সম্মুখের যে-চুলগুলি লুটাইয়া পড়িতেছে, তাহা মাথার উপর ধীরে তুলিয়া দিয়া, নিজের আঁচল দিয়া অজয়ের শুকনো ঠোঁট দুইটা মুছিয়া দিল। মুহূর্তে যে কি হইয়া গেল, জ্বরের ঘোরে মোহাচ্ছন্ন অজয় আনুপূর্বিক কিছুই ধারণা করিতে পারিল না। অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় শুক্লবাসা একটি মেয়েকে তাহার পার্শ্বচারিণী-রূপে ভালো করিয়া তখনো চিনিতে না পারিলেও, আজ রাত্রেই যে তাহার আসিবার কথা, ও এমন করিয়া যে তাহার এই পীড়িত দেহটাকে বুকে টানিয়া নিবার একটা অলৌকিক চুক্তি ছিল, তাহা সে নিমেষে ঠিক করিয়াই ফেলিল। জড়িতস্বরে সে কহিল—"শিগগির আমাকে একটু জল এনে দাও, আমার গলা-জিভ শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে গেল যে।"

নমিতা অজয়ের মাথাটা ধীরে ধীরে নামাইয়া বাহির হইয়া আসিল। দেয়ালের প্রতিটি ইঁট ও মেঝের প্রতিটি ধূলিকণা যে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে সে বিষয়ে তাহার খেয়াল রহিল না। রান্নাঘরের দরজার শিকল নামাইয়া সে গ্লাসে করিয়া কলসী হইতে জল গড়াইয়া লইল ও বাঁ-হাতে এক বালতি জল লইয়া আবার ঘরে

ঢুকিল। বালতিটা দুয়ারের কাছে নামাইয়া তাড়াতাড়ি জলের গ্লাসটা অজয়ের কাছে আনিয়া ধরিল। কহিল—"আমার হাতে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে উঠুন, জলটা খেয়ে নিন।"

এইবার নমিতাকে অজয় ভালো করিয়া চিনিয়াছে। পিপাসা তাহার সত্যই পাইয়াছে বলিয়া মনে হইল না। তবু পরিপূর্ণ নির্ভর করিয়া নমিতার অকুণ্ঠিত বাম-বাহুটি অবলম্বন করিয়া সে উঠিল। ঢক-ঢক করিয়া সমস্তটা জল খাইয়া ফেলিয়া সে ধপ করিয়া শুইয়া পড়িল। নিজে নমিতার আঁচলের প্রান্তটা টানিয়া লইয়া মুখ মুছিল। বলিল—"আজ সমস্ত স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল একসঙ্গে ষড়যন্ত্র করেও তোমাকে আমার কাছ থেকে ঠেকিয়ে রাখতে পারত না। আমার প্রয়োজনের দাবি এত প্রচুর ছিল যে, কোনো প্রাচীরই আর তোমাকে বন্দী রাখতে পারল না নমিতা। কিন্তু আমার প্রয়োজন যে কি অসামান্য, তা তুমি জান?" বলিয়া অজয় নমিতার একখানা হাত চাপিয়া ধরিল।

নমিতা হাত সরাইয়া নিবার স্বল্প চেষ্টা করিয়া বলিল—"ছাড়ুন, ঘরটা পরিষ্কার করে ফেলি। দেশলাই নেই? আলো জ্বালতে হবে।"

—"না না, আলো জ্বালিয়ে কাজ নেই নমিতা। আলোতে তোমাকে সম্পূর্ণ করে দেখা হবে না। তোমাকে কি এই বেশ মানায়? আমি মনে মনে তোমার যে মূর্তি এঁকেছি, আলো জেলে তাকে অক্ষিত কোরো না।" বার কয়েক ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অজয় কহিল—"তোমার পরণে রক্ত-চেলি, চোখে ক্ষুধা, হাতে কৃপাণ, কালো চুলগুলি পিঠের উপর আলুলিত হয়ে পড়েছে—রুক্ষ সুনিবিড় চুল! বজ্রে তোমার কঙ্কণ, বিদ্যুৎ তোমার কণ্ঠস্বর! তুমি আমার সঙ্গে যাবে নমিতা?"

নমিতা ব্যস্ত হইয়া বলিল—"উত্তেজিত হবেন না। চুপ করে ঘুমুবার চেষ্টা করুন, আমি আপনার মাথায় জলপটি দিচ্ছি।"

তাড়াতাড়ি পাশে বসিয়া বালতির জলে ন্যাকড়ার অভাবে নিজের আঁচলটাই ভিজাইয়া লইল। কপালের উপর তাহাই স্তূপীকৃত করিয়া রাখিয়া, পাখার অভাবে সামনের দেওয়াল হইতে একটা ক্যালেণ্ডার পাড়িয়া লইয়া ধীরে-ধীরে হাওয়া করিতে লাগিল। কহিল—"দেশলাই থাকলে আলোটা জ্বালাতুম।"

অজয় কহিল—"আলো জ্বালালেই তোমার আজকের রাতের এই কীর্তিটা উজ্জ্বল হ'য়ে উঠবে না। তোমার কাকিমার কাছ থেকে দেশলাই চেয়ে আনতে পারবে?" বলিয়া অজয় সেই জ্বরের মধ্যেই ভূতের মত হাসিয়া উঠিল। নমিতার পা-দুইটি তক্তপোষের উপর যেখানে গুটাইয়া রহিয়াছে, তাহার অদূর ব্যবধানে নিজের একটা

শিথিল হাত রাখিয়া আস্তে একটা আঙুল বাড়াইয়া দিয়া নমিতার পা এমন আল্‌গোছে একটু ছুঁইল যে, তাহা টের পাইবার সাধ্য নাই। কহিল—"উত্তেজিত আমি হই নি নমিতা। যেটুকু চাঞ্চল্য আজ তুমি আমার দেখছ, সেটা আমার জ্বরের বিকার নয়। ওটা আমার স্নায়ুমণ্ডলীর স্বাভাবিক বৃত্তি মাত্র। আমার কথার উত্তর দেবে নমিতা ?"

নমিতাও কপালের গণ্ডী ছাড়াইয়া হাতখানি অজয়ের গালের উপর ভুলক্রমে আনিয়া ফেলিয়াছে। অস্ফুটস্বরে কহিল—"কি ?"

দৃঢ় স্পষ্ট অনুত্তেজিতকণ্ঠে অজয় কহিল—"তুমি আমার সঙ্গে যাবে ?"

নমিতার স্বর ভীত, বিমূঢ় : "কোথায় ?"

আবার সেই শান্ত শীতল স্পষ্ট স্বর : "মরতে। মরতে তোমার ভয় হয় নমিতা ?"

নমিতা চঞ্চল হইয়া উঠিল : "কি বলছেন আপনি যা-তা ? বলছি ঘুমুন, তা না খালি বক-বক করছেন !"

অজয় শান্ত, উদাস-স্বরে বলিল—"তুমিও যে মরতে ভয় পাও না, তা আমার ঘরে তোমার এই আকস্মিক আবির্ভাবেই আমি বুঝেছি। তাহলে চল আজকের এই রাত্রি শেষ না হতেই একটা গাড়ি ডেকে আমরা বেরিয়ে পড়ি। আমি তোমার খুব বেশি ভার হব না, দেখবে। কাল ভোরেই আবার আমি চাঙ্গা হয়ে উঠব। শুয়ে-শুয়ে এই সব বাবুগিরির কি আমাদের পোষায় ?"

নমিতা আরো জোরে ক্যালেণ্ডারটা চালাইতে লাগিল, অজয়ের পায়ের চাদরটা আরো ঘন করিয়া টানিয়া দিল ; বলিল—"আপনি এমনি বক-বক করলে আমি চলে যাব ঘর ছেড়ে।"

অজয় কহিল—"সত্যিই গায়ে চাদর টেনে পাখার হাওয়া খেয়ে জ্বরের ঘোরে এ-পাশ ও-পাশ করবার বিলাসিতা আমার নয় নমিতা। আমি মরবার পণ করে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছি। রোগে ছাতা ধরে দেহ জীর্ণ হোক, তবু রোগের হাতে জীবন সমর্পণ করে মৃত্যুকে কলঙ্কিত করব না। তুমি যে-জীবন বহন করছ তা ত একটা কলঙ্কিত মৃত্যু, অসতীত্বের চেয়েও লজ্জাকর। সত্যি করে মরে গৌরবান্বিত হতে তোমার ইচ্ছা করে না নমিতা ?" কি ভাবিয়া লইবার জন্য অজয় একটু থামিল, পরে হঠাৎ বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া গা হইতে চাদর সরাইয়া ফেলিল। নমিতার স্তম্ভিত ভাবটা কাটিবার আগেই তক্তপোষের প্রান্তে সরিয়া আসিয়া জুতার জন্য সেই নোংরা মেঝের উপর পা বাড়াইয়া দিল ; কহিল—"তুমি এমনি

চুপ করে এখানে বসে থাক। তুমি আমার সঙ্গে যাবে—এই আনন্দে আমি রাস্তায় বেরিয়ে যে করে হোক একটা গাড়ি ধরে আনতে পারবই ঠিক।"

অজয়ের আর জুতা পরিবার সময় হইল না। নমিতা ভয় পাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার পা দুইটা সহসা অবশ হইয়া আসিল বুঝি! দীপ্তকণ্ঠে কহিল—"আপনি পাগল হয়ে গেলেন নাকি? কোথায় যাব আপনার সঙ্গে?"

অজয় আবার সেই নির্লিপ্ত উদাসীন কণ্ঠে কহিল—"পাগল আমরা সত্যিই। হঠকারিতাকে আর যারাই নিন্দে করুক, আমরা করি নে। ভেবে-চিন্তে কাজ করতে গেলে সময়ই ফুরোয়, কাজ আর এগোয় না। তুমি কি সত্যিই এই অন্ধকূপের অন্তরালে স্বল্প-পরিমিত জীবন নিয়ে তৃপ্ত থাকতে পারবে? নিশান্তে দু'টি ভাত খেয়ে ও দিনান্তে দু'ঘণ্টা ঘুমিয়েই কি তুমি জীবনকে এমন অনায়াসে ক্ষয় করে ফেলবে? তোমার জীবনের ওপর তোমার একার দায়িত্ব নেই, আমাদেরো লোভ আছে। তুমি একা, সংসারে কারো কাছে তোমার এতটুকু ধার নেই—তোমার কত সুবিধে। তুমি একবার হ্যাঁ বল, দেখবে আমার সমস্ত জ্বর নেমে গেছে। নোংরা মেঝে সাফ অন্যে করলে ক্ষতি হবে না, অনেক বড়ো ও অনেক দুঃখময় কলঙ্ক তোমার নির্মল হাতের স্পর্শে শুচিস্নিগ্ধ হবার জন্যে অপেক্ষা করছে। নমিতা, তুমি এস আমার সঙ্গে।" বলিয়া অসহায় শিশুর মত অজয় নমিতার দুই হাত ব্যাকুলভাব চাপিয়া ধরিল।

নমিতা কি ভাবিল কে জানে, সহসা হাত ছাড়াইয়া লইয়া কর্কশস্বরে কহিল—"আপনি আমাকে কী ভাবেন? আপনার অসুখ দেখে আমি ভালো ভেবে আপনার সেবা করতে এলুম, আর আপনি তার এই প্রতিদান দিচ্ছেন? ছি! আপনি যে এত খারাপ তা আমি ভাবি নি।" বলিয়া নমিতা আঁচলে চোখ ঢাকিয়া ফেলিল।

এই কাণ্ড দেখিয়া অজয় প্রথমে একেবারে নিস্পন্দ অসাড় হইয়া গেল, তাহার শরীরে কণামাত্রও আর শক্তি রহিল না। সে যেন একটা পর্বতচূড়া আরোহণ করিতে গিয়া একেবারে সমুদ্রের তলায় আসিয়া ডুবিয়াছে। তাড়াতাড়ি বিছানার উপর শুইয়া পড়িয়া যেন ঘূর্ণমান পৃথিবীর প্রান্ত হইতে ছিট্‌কাইয়া পড়িবার ভয় হইতে সে আত্মরক্ষা করিল। দুই হাত দিয়া মাথার লম্বা চুলগুলি আঁকড়াইয়া ধরিয়া সে কান্না রোধ করিল হয়ত—সে কি না ক্ষীণজীবিনী কোমলকায়া বাঙালি মেয়ের মাঝে আকাশের বিদ্যুদ্বতী বাত্যার মূর্তি দেখিতে চাহিয়াছিল। চাপা স্বরে গোঙাইয়া কহিল—"আমার সত্যিই ভুল হয়েছে নমিতা, আমাকে ক্ষমা কর। আমি জ্বরের ঘোরে প্রলাপই বকছিলুম হয়ত। এখন তুমি স্বচ্ছন্দে বাতি জ্বালতে পার—হাত

বাড়ালেই তাকের ওপর দেশলাই পাবে। অন্ধকারে আর তোমাকে দেখবার প্রয়োজন নেই!"

বাতি না জ্বালাইয়াই নমিতাকে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতে দেখিয়া অজয় কহিয়া উঠিল: "একটা কথা স্পষ্ট করে জেনে যাও। তোমার দেহের ওপর আমার লোভ ছিল, এ-কথা ঘুণাক্ষরে মনে কোরো না—লোভ ছিল তোমার এই জীবনের ওপর।"

এতটা পা বাড়াইয়া আবার ফিরিয়া যাওয়াটা শোভন হইত না, তাছাড়া দুইটা দরজার ফাঁক দিয়া ঘরের বাহিরে অন্ধকারে কাহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া নমিতার আর নিশ্বাস পড়িল না। ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিল, কাকিমা—কোলে খুকি। নমিতা ভাবিয়াছিল আজ হয়ত খুকি স্বভাবের ব্যতিক্রম করিয়া তাহাকে মুক্তি দিয়াছে। কিন্তু কাকিমার নীচে আসিবার আগে রঙ্গমঞ্চের নেপথ্যে কত যে ভয়াবহ কাণ্ড ঘটিয়া গেছে, তাহার ইঙ্গিত স্পষ্ট হইয়া উঠিল। তাহার এই আচরণে যেন কিছুই অস্বাভাবিকতা নাই; কণ্ঠস্বর তেমনি সহজ করিয়া নমিতা কহিল—"অজয়বাবুর জ্বর খুব বেড়ে গেছে কাকিমা। ডাক্তার ডেকে পাঠানো উচিত।"

এই সব কথার চালাকি করিয়া কাকিমাকে ঠকানো যাইবে না। তিনি ভেঙচাইয়া বলিয়া উঠিলেন—"অজয়বাবু বুঝি তোমাকে বিনা তারে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিল যে লোকলজ্জার মাথা খেয়ে দরজা বন্ধ করে তুমি তাঁর জ্বর নামাচ্ছ?" হঠাৎ তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন: "ও দিদি! দেখে যাও তোমার মেয়ের কীর্তি! সামনেই অঘ্রান মাস, নতুন করে মেয়ে-জামাই ঘরে তোলো!"

দরজার বাহিরেই এমন একটা বীভৎস রসের অভিনয় শুনিয়া অজয় বিছানায় আর স্থির থাকিতে পারিল না। টলিতে-টলিতে বাহির হইয়া আসিল। কোন রকমে দেওয়ালে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—"রাত দুপুরে হঠাৎ চেঁচামেচি শুরু করলে কেন? কী এমন কাণ্ড ঘটেছে?"

অজয়ের শরীরের এই অবস্থা দেখিয়া কমলমণির গলায় মন্দা পড়িল না: "এই আমাদের অজয়বাবুর অসুখ! রাত্রিবেলা ক'দিন থেকে এই অসুখ চলছে শুনি?"

এমন সময় উপর হইতে নমিতার মা একটা লণ্ঠন হাতে করিয়া নামিয়া আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই নমিতা তাঁহাকে দুই বাহু দ্বারা বেষ্টন করিয়া একেবারে অবোধ আত্মহারার মত কাঁদিয়া উঠিল। মেয়েকে তাড়াতাড়ি আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়া তিনি কহিলেন—"কি, কি হল?"

হাত ও মুখের একটা কুৎসিত ভঙ্গি করিয়া কমলমণি কহিলেন—"কি আবার হবে।

রাত্রে তোমার মেয়ে অভিসারে বেরিয়েছিলেন। আর ভয় নেই দাদ, মেয়ে তোমার খুব ভালো রোজগারের পথ পেয়েছে।”

নমিতা ফুঁপাইয়া উঠিল, কিন্তু এই অন্যায় ও কদর্য কথা শুনিয়া অজয় আর স্থির থাকিতে পারিল না। আর্তস্বরে কহিল—“মুখে যা আসে তাই বোলো না দিদি। নমিতা কেন নীচে এসেছিল জানি না, কিন্তু আমার বমি করবার আওয়াজ শুনেই ঘরে ঢুকেছিল! রোগীর প্রতি ওর এই করুণার এমন কদর্য অর্থ কর ত ভালো হবে না।”

“কি ভালো হবে না শুনি?” কমলমণি খেঁকাইয়া উঠিলেন: “আর রাতের পর রাত এই ঢলাঢলিই খুব ভালো, না? পরের বাড়ি বসে এই সব কেলেঙ্কারি চলবে না অজয়! আমি বাবাকে লিখে দিচ্ছি, তোমার মতন বাঁদরকে আমি পুষতে পারবো না।” ক্রন্দনরতা মেয়েটার গালে সবেগে এক চিম্‌টি মারিয়া ফের জা-কে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—“আর তোমাকেও বলছি দিদি, এই ধুম্‌সো মেয়ে নিয়ে আর কোথাও গিয়ে পথ দেখ। এইখেনে থেকে আর আত্মীয়-স্বজনের মুখ হাসিয়ো না।”

“নমিতা!” অজয়ের ডাক শুনিয়া নমিতা মায়ের বুকের মধ্যে থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। “তুমি তবু এই মিথ্যাচার এই পাপের মধ্যে বেঁচে থাক্‌বে? সব ছেড়ে-ছুঁড়ে এস আমার সঙ্গে।” বলিয়া হঠাৎ দুর্নিবার আবেগে অজয় হয়ত এক-পা আগাইয়া আসিতে চাহিল। সামনেই সিঁড়ি। টাল সাম্‌লাইতে না পারিয়া একেবারে হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া গেল। লণ্ঠনের অস্পষ্ট আলোতে বেশ বুঝা গেল, কপালের সামনেটা ফাটিয়া গিয়া গল-গল করিয়া রক্ত বাহির হইতেছে। সবাই এক সঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিল। কমলমণি গিরিশবাবুকে খবর দিতে উপরে ছুটিলেন। গিরিশবাবু যখন নামিয়া আসিলেন, তখনো অজয়ের জ্ঞান হয় নাই। নমিতার মা'র কোলে মাথা রাখিয়া সে শুইয়া আছে—আর নমিতা দূরে একেবারে পাথরের মূর্তির মত নিস্পন্দ হইয়া রহিয়াছে।

গিরিশবাবু আসিয়াই হাঁক দিলেন: “এ-সব কি কাণ্ড বৌদি! তুমিও এসে এই অনাছিষ্টি ব্যাপারে হাত দেবে ভাবি নি। রাখ, রাখ—রক্ত বন্ধ হয়েছে ত? শুইয়ে দাও বিছানায়।” বলিয়া চাকরকে উঠাইয়া ধরাধরি করিয়া অজয়কে তাহার বিছানায় আনিয়া ফেলিলেন। নমিতা তখনো মূঢ়ের মত দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া ছিল। গিরিশবাবু তাহাকে দেখিতে পাইয়াই ধমক দিয়া উঠিলেন: “তুই আর এখানে মরতে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? যা এখান থেকে।”

গিরিশবাবু পেছন হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। নমিতার কানে তখনো যেন

অজয়ের করুণ গোঙানি লাগিয়া আছে, তবু তাহাকে উপরেই যাইতে হইল। আর বারান্দায় নয়, একেবারে মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িল। মা উপরে আসিলে নমিতা একবার চোখ চাহিয়াছিল হয়ত; মা ঘৃণার সঙ্গে বলিলেন—"আমাকে আর তুই ছুঁস্ নে পোড়ামুখি! তোর কপালে কেরোসিন তেল জুটল না? এর আগে ছাত থেকে লাফিয়ে পড়তেও ত পারতিস হতভাগী।" বলিয়াই মা পাগলের মত তাঁহার কপালটা বারে বারে ঘরের দেওয়ালে ঠুকিতে লাগিলেন।

পরদিন ভোর হইতেই গিরিশবাবু দরজার গোড়ায় আসিয়া হাঁকিলেন: "বৌদি!" নমিতা সমস্ত রাত্রি আর ঘুমাইতে পারে নাই। কাকার ডাক শুনিয়া মাকে জাগাইয়া দরজা খুলিয়া দিল। নমিতার মা কুণ্ঠিত মুখে কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই গিরিশবাবু কহিলেন—"তোমার মেয়েকে আমার বাড়িতে আর রাখা চলবে না বৌঠান। ওর শ্বশুর ত এখেনেই আছে, একটা চিঠি লিখে দি, নিয়ে যাক। অজয়টাকেও আজ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বললুম।"

নমিতার মা না বলিয়া পারিলেন না: "এত জ্বরের মধ্যে!"

গিরিশবাবু একটা ট্রাঙ্কের উপর জায়গা করিয়া বসিলেন, বলিলেন—"আজ যদি না যায়, সেবা করতে তোমার মেয়েকে ত আর সেখানে পাঠানো চলবে না।" বলিয়া নমিতার দিকে একটা বক্র-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

নমিতা অনেক সহ্য করিয়াছে, কিন্তু এইবার তাহার দেহের সমস্ত শিরা-উপশিরা এক সঙ্গে মোচড় দিয়া উঠিল। সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া কহিল—"একজন পরিত্যক্ত রুগীর পরিচর্যা করার মধ্যে আপনারা যতই কেন না পাপ খুঁজে বেড়ান কাকাবাবু, যিনি মানুষের অন্তর পর্যন্ত তন্ন-তন্ন করে দেখছেন, তিনি কিন্তু ক্ষুণ্ণ হন নি।" বলিতে বলিতেই তাহার দুই চক্ষু বাহিয়া জল নামিয়া আসিল।

গিরিশবাবুকে কোন কথা কহিতে না দিয়াই নমিতার মা কহিলেন—"চুপ কর বলছি। তাই ভাল ঠাকুরপো, বেয়াইকে খবর দাও। ওখেনেই গিয়ে থাকুক কয়েকদিন।"

নমিতা আবার শক্ত হইল। কহিল—"কেন আমি ওখানে গিয়ে থাকবো? আমি কি করেছি? ওটা কি আমার নির্বাসন নাকি?"

গিরিশবাবু দাঁত খিঁচাইলেন: "তবে ঐ গুণ্ডাটার গলা ধরে বেরিয়ে পড়লেই ত পারতিস।"

মাও কাকার কথার সুরে সায় দিলেন: "শ্বশুর বাড়ি না যাবি ত যমের বাড়ি যাস।"

নমিতা গোঁ ধরিয়া বলিল: "এমন একটা কাণ্ড আমি অবশ্য করি নি যাতে

রাতারাতি তোমাদের ঘর-সংসার একেবারে উল্টে ছত্রখান হয়ে গেল। আমি শুধু-শুধু সেখানে যাবো কেন?"

পাশের ঘর হইতে কমলমণি ছুটিয়া আসিলেন—"বসে বসে কে তোমাকে এখানে গেলাবে শুনি? মন্দরও ত বেহদ্দ হয়েছ—এবার রোজগার করে পয়সা আন, নিজেরটা নিজে জোগাড় কর এবার থেকে। বাবাঃ, কী গলগ্রহই যে জুটেছে।"

নমিতা আর কথা না কহিয়া বারান্দায় চলিয়া আসিল। এত বড় পৃথিবীতে কোথাও একটুও বদল হয় নাই, রাস্তার ধুলার উপরে তেমনিই রোদের গুঁড়া পড়িয়াছে। সকাল হইতেই যে কুঠে বুড়োটা বহুলোচ্চারিত ঈশ্বরের নামটাকে একটা বিকৃত-ধ্বনিতে পর্যবসিত করিয়া ফেলিয়াছে, সে লাঠি ভর করিয়া গলির মোড়ে আসিয়া বসিল। কিন্তু কালকের রাত পোহাইতেই নমিতা যেন এক নব-প্রভাতের তীরে আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে। হয়ত এখন অজয় আরেকবার ডাকিলে সে বাহির হইয়া পড়িতে পারিত। কোথায় যাইত তাহা সে জানে না, কিন্তু এমন করিয়া মরিত হয়ত নয়।

রেলিঙে ঝুঁকিয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতেই তাহার নজর পড়িল একটা ছ্যাকড়া গাড়ি এক-রাজ্যের মাল-বোঝাই হইয়া গলি পার হইতেছে। গাড়ির ভিতরে নজর পড়িতেই বাহির হইয়া পড়া দূরের কথা, নমিতার নিশ্বাস পর্যন্ত বন্ধ হইয়া আসিল। পেছনের সিটটাতে হেলান দিয়া অজয় অতি কষ্টে সামনের জায়গাটায় পা দুইটা ছড়াইয়া শুইবার মতন করিয়া বসিয়া আছে—মাথায় তাহার ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। দেখিয়া নমিতা সম্বিৎ হারাইল কিনা কে জানে, সে সহসা হাতছানি দিয়া গাড়োয়ানকে থামিবার জন্য সঙ্কেত করিল। গাড়োয়ান তাহা লক্ষ্য করিল না, ভিতরে যে-ব্যক্তি যন্ত্রণায় মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিল, এই ইঙ্গিতটি তাহারও অগোচর রহিয়া গেল।

গাড়ি অবশ্য অজয় থামাইত না। গাড়ি মোড় পার হইয়া গেলে সে একবার পেছনে বাড়িটা দেখিবার জন্য মুখ বাড়াইল—যাহাকে দেখা গেল না, তাহাকে উদ্দেশ করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিল : আমার সঙ্গে না এসে ভালোই করেছ নমিতা। একদিন যাতে নিজেরই পায়ের জোরে পথের উপর নেমে আসতে পার, তোমার উপর ততটা লাঞ্ছনা হোক। আমি সুখী হব!

নানা জায়গা ঘুরিয়া সন্ধ্যাটা কাটাইয়া প্রদীপ তাহার মেসের ঘরে ঢুকিয়া দেখিল কে একটা লোক তাহার বিছানার উপর উবু হইয়া পড়িয়া আছে। তিন সিটের ঘর —বাকি দুই জনের এত শীঘ্র বাড়ি ফিরিয়া আসিবার কথা নয়। রমেনবাবু শহরের

কি-একটা বায়স্কোপ-ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া টিকিট কুড়ান, আর প্রীতিনিধান রাত্রি করিয়া কোন-একটা কোচিং-ক্লাশে মোক্তারি পড়িতে যায়। তাহারা এই অসময়ে মেসে ফিরিয়া আসিলেও কখনই প্রদীপের বিছানায় গড়াইতে সাহস করিত না। প্রদীপ উহাদের চেয়ে শয্যা-বিলাস সম্বন্ধে উদাসীন বা অপরিচ্ছন্ন বলিয়া নয়, উহাদের সংস্রব হইতে সে নিজেকে দূরে সরাইয়া রাখিত বলিয়া। তাছাড়া ঘরের তালাই বা কে খুলিল—খুলিল ত কষ্ট করিয়া আলোটাই বা জ্বালাইল না কেন!

লণ্ঠন জ্বালাইবার সময় ছিল না; সাহস করিয়া আগন্তুকের গায়ে ঠেলা দিয়া কহিল—"কে?"

লোকটি অনেকক্ষণ পরে সাড়া দিল। মুখ না ফিরাইয়া আন্দাজে উত্তর দিল: "প্রদীপ এলে?"

স্বর পরিচিত। এইবার পকেট হাতড়াইয়া দেশলাই বাহির করিয়া তাড়াতাড়ি আলো জ্বালাইল। দেখিল, অজয়। জীর্ণ ময়লা কাপড়, জামার মধ্যে নিজের শরীরটাকে শামুকের মত সঙ্কুচিত করিয়া পড়িয়া আছে। অজয়ের গলা শুনিয়া প্রদীপ যেমন সুখী হইয়াছিল, ভয়ও হইয়াছিল ততখানি। ভয় হইয়াছিল, অজয় বুঝি তাহার স্বাভাবিক যৌবন-প্রমত্ততায় আবার কোথাও হঠকারিতা করিয়া বিপদে পড়িয়াছে; আর সুখী হইয়াছিল এই ভাবিয়া যে, তাহার আশ্রয়ে সে যখন একবার আসিয়া পড়িয়াছে তখন তাহার কেশাগ্র স্পর্শ করিতে পারে এমন লোককে পৃথিবীতে প্রদীপ নিশ্বাস নিতে দিবে না। কিন্তু আলো জ্বালাইয়া অজয়ের এই শ্রীহীন কাতর চেহারা দেখিয়া প্রদীপ বিমর্ষ হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি অজয়ের গা ঘেঁষিয়া বসিয়া প্রদীপ জিজ্ঞাসা করিল—"কি হল অজয়? কোত্থেকে?"

একটা দুর্বল হাত দিয়া প্রদীপের বাহুটা চাপিয়া ধরিয়া অজয় কহিল—"জানই ত লোকের সন্দেহ এড়াবার জন্যে একটা ভদ্র-আস্তানা ঠিক রেখেছিলুম, আপাতত সেই আস্তানা থেকেই আসছি। ভীষণ জ্বর এসেছে।"

প্রদীপ ব্যাকুল হইয়া কহিল—"জ্বর নিয়ে বাড়ি ছাড়লে কেন? কেউ তাড়া করেছিল না কি?"

ম্লান একটু হাসিয়া অজয় কহিল—"এবার যে তাড়া করেছিল সে আমাদের সকল শত্রুর চেয়ে দুর্দম। তার কাছেই আমরা বার-বার হেরেছি বার-বার হারব—সে আমাদের ভাগ্য।"

অজয়ের চুলের মধ্যে হাত বুলাইতে বুলাইতে স্নিগ্ধস্বরে প্রদীপ কহিল—"তোমার

এই বড় দোষ অজয়, তুমি বড্ড ভাবুক। তুমি সোজা বুদ্ধিকে কল্পনা দিয়ে ঘুলিয়ে তোল। কি হয়েছে স্পষ্ট করে বলবে?"

প্রদীপের ঠাণ্ডা হাতখানি অজয় তাহার উত্তপ্ত গালের উপর চাপিয়া ধরিল, কহিল —"ভাবুকতা না থাকলে কোনো পরাজয়, কোনো ব্যর্থতাকেই মহনীয় করে দেখা যায় না। সে-তর্ক তোমার সঙ্গে পরে করলেও চলবে। সোজা স্পষ্ট করেই বলছি। কিন্তু সব কথা স্পষ্ট করে বললে তার মানেটা সব সময়েই পরিস্ফুট হয় না প্রদীপ। যেমন ধর, আমি যদি বলি, একটি মেয়ে আমার অনুগামিনী হল না বলেই আমি অভিমানে বেরিয়ে পড়লাম—কথাটার আদ্যোপান্ত তুমি বুঝতে পারবে?"

প্রদীপ হাসিয়া কহিল—"কথাটাকে যদিও এর চেয়ে স্পষ্ট করে বলা যেত, তবু এইটুকু আমার কাছে যথেষ্ট অর্থবান হয়ে উঠেছে। মেয়ে! আর আমাকে বলতে হবে না। রোগ শুধু তোমার গাত্রোত্তাপ নয় অজয়।"

অজয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল: "হ্যাঁ জানি। এ আমার আত্মার উত্তাপ প্রদীপ। কিন্তু মেয়েটি তাকে দেহের উত্তাপ বলেই ধরে নিল। তোমাকে স্পষ্ট করেই বলি তাহলে। দেখ কিছু করা যায় কি না।" বলিয়া অজয় তাহার মাথাটা প্রদীপের কোলের উপর তুলিয়া দিল। যেন আপন অন্তরের সঙ্গে কথা কহিতেছে, তেমনি মৃদু গভীর ও বেদনাগদ্‌গদস্বরে বলিতে লাগিল—"মেয়েটি বিধবা, নিরলঙ্কারা, অশ্রুমতী! আমাদের ব্রতচারিণী তপস্বিনী ভারতবর্ষ। কিন্তু হঠাৎ একদিন তারই সেই ম্লান চোখে বিদ্যুৎ দেখতে পেলুম—বুঝলুম সে বিদ্রোহিণী। মনে মনে তাকে প্রার্থনার মত আহ্বান করেছিলুম হয়ত, সে আচার ও কৃত্রিম লজ্জাশীলতার বেড়া টপকে আমার ঘরে চলে এল মর্তাবতীর্ণা মৃত্যুর মত। দুই হাতে সেবা নিয়ে, চোখে নিয়ে করুণা! মনে রেখো প্রদীপ, রাত্রে এল—যে-মুহূর্তে কবির মনে কল্পনা-কায়া কবিতার আবির্ভাব হয়। আমি তাকে বললুম, আমার হাত ধরে বেরিয়ে পড় নমিতা।"

কথার মাঝখানে প্রদীপ হঠাৎ চমকাইয়া উঠিল: "নমিতা?"

অজয় বলিয়া চলিল: "আমাকে শেষ করতে দাও। বললুম, নমিতা, আমার সঙ্গে এস। লাখো লাখো মেয়ে মরছে, সমাজে সংসারে অসংখ্য তাদের অত্যাচার। কেউ মরছে আচারের দাসত্ব করে, কেউ সন্তান-ধারণ করে—কেউ কেরোসিন জ্বালিয়ে, কেউ গলায় দড়ি দিয়ে। তুমি মানুষের মত মরবে, এস।"

প্রদীপ আবার বাধা দিল: "নমিতা কি বললে?"

ম্লান বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া অজয় কহিল—"নমিতার উত্তর শুনে তুমি হেসো না প্রদীপ। ভাবলে আমি বুঝি ওকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে যেতে চাই তুচ্ছ

দেহ-বিলাসের জন্যে। বললে : "আপনি যে এত খারাপ তা আমি ভাবি নি। কথাটা মনের মধ্যে দাগ কেটে বসে আছে। পরে ভাবলুম, বাঙালি মেয়ের কাছ থেকে এর বেশী আর কী উত্তর আমরা প্রত্যাশা করতে পারি ?"

প্রদীপ কহিল—"ও! নমিতা তাহলে তোমার ভগ্নীপতির ভাইঝি হয়! কাছেই আছে তাহলে। আমি এতদিন ওর একটা ঠিকানা পর্যন্ত পাই নি। তোমার সঙ্গে দেখাও ত আজ প্রায় তিন বছর বাদে। প্রথম দেখা কবে হয়েছিল মনে আছে ?"

—"আছে না ? সেই চিতোর-গড়ে, রাণা কুম্ভের জয়স্তম্ভের ওপরে! কিন্তু নমিতাকে তুমি চিনলে কি করে ?"

—"সেই জয়স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে চারদিকের অগণন পাহাড়ের দিকে চেয়ে তুমি কি বলেছিলে মনে আছে অজয় ? বলেছিলে তুমি অতীতে ছিলে জয়মল্ল, দুর্গ রক্ষা করতে গিয়ে আকবরের হাতে প্রাণ দিয়েছ, পরে নতুন দেহ নিয়ে নতুন যুগে বাঙলা দেশে অজয় হয়ে জন্মিয়েছ। কথাটা ভাবুকতার চূড়ান্ত, কিন্তু সেই দিনই তোমার সঙ্গে বন্ধুতা না করে পারলুম না। তারপর দুই জনে ঝড় আর বিদ্যুতের মত সহযাত্রী হয়ে সমস্ত উত্তর-ভারতটা মথিত করে এলুম। আজ এত দিন বাদে তুমি আমার ঠিকানা পেলে কি করে ?"

অজয় হাসিয়া কহিল—"তার চেয়েও বড় জিজ্ঞাস্য, তুমি নমিতাকে চিনলে কি করে ?"

প্রদীপ বলিল—"নমিতার স্বামী সুধীন্দ্র আমার সাহিত্যিক বন্ধু ছিল। রাণীগঞ্জে ও যখন মরে, তখন আমিই ওর পাশে ছিলাম।"

—"তোমার ঠিকানা আমি পেলুম অত্যাশ্চর্যরূপে, প্রায় সতেরোটা মেস্ খুঁজে। অত্যাশ্চর্য বলছি, কারণ তুমি যে এখনো কলকাতায়ই আছ, তা আমি ভেবে নিলুম কি করে ? মনে হল এর আগে রাস্তায় একদিন যেন তোমাকে আমি দেখেছিলুম চিনে-বাদাম খাচ্ছ। দিন-সাতেক আগে হয়ত। এখনো তোমাকে চিনে-বাদাম খেতে হয় নাকি ? ভাবলুম দিব্যি বিয়ে-থা করে ব্যথার সমুদ্র পার হয়ে এসেছ বুঝি!"

অজয়ের মুখে ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া প্রদীপ কহিল—"আমার ইতিহাসটা এমন নয় যে তাকে জাঁকজমক করে বর্ণনা করতে হবে। নমিতার সন্ধান পেলুম, ঐটা আমার একটা সম্পত্তি অজয়। নমিতাকে আর হারাচ্ছি না।"

এইবার অজয় একেবারে খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল; কহিল—"মেয়েমানুষ সব সাধনায় বিঘ্ন, প্রদীপ—সে কবিতায়ই হোক বা ধর্মাচরণেই হোক। আমার

বিশ্বাস আর নেই। একাকী থাকবার মধ্যে সুখের চেয়ে সুবিধা বেশি। সে-বাড়িতে এতক্ষণে ঢি-ঢি পড়েছে—নমিতা সংসারের চোখে কুলটার কলঙ্ক নিয়ে বিরাজ করবে, তবু কুলপ্লাবিনী হয়ে বেরিয়ে পড়বে না!"

—"তুমি বল কি অজয়?"

—"বলেছি না, ভাগ্য! নমিতার ভাগ্য। আমাকে খারাপ বলে বর্জন করে সে তার শুদ্ধাচার সতীত্বের খাপে তার বিদ্রোহাচরণের তলোয়ার ঢেকে রাখছিল এমন সময়ে শাসনকর্তার দণ্ড নিয়ে দিদির আবির্ভাব হল। নমিতা পড়ল ধরা! আর যায় কোথা! নমিতা রাত করে লুকিয়ে পরপুরুষের দুয়ারে পসারিণী হয়ে এসেছে! সমস্ত মুখে কালি মাখিয়ে নমিতা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তবু কালীর মত জেগে উঠতে পারল না। আমি ওকে প্রণাম করতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু এমন নমিতাকে শেষ পর্যন্ত আমি শ্রদ্ধাটুকু পর্যন্ত দিতে পারলুম না ভাই।"

এইবার প্রদীপ আর না-হাসিয়া থাকিতে পারিল না। অবোধ সন্তানকে মা যেমন সান্ত্বনা দেন, তেমনিভাবে কোলের উপর অজয়ের মাথাটাকে আস্তে-আস্তে একটু-একটু দোলা দিতে-দিতে প্রদীপ কহিল—"তুমি এত বেশি হঠকারী যে, ব্যগ্রতাকে সংযত করতে শেখ নি। তোমার মত দ্রুত নিশ্বাস যে নিতে না পারে তাকে তুমি মৃত বলেই ত্যাগ কর—এটা তোমার বাড়াবাড়ি। প্রত্যেক পরিণতির পেছনে প্রচুর প্রতীক্ষা চাই। আমরা এই বলদৃপ্ত যৌবনের পূজায় কত অসংলগ্ন দিন-রাত্রির অঞ্জলি দিয়েছি, তার হিসেব রাখ? ঝড়ে আমি বিশ্বাস করি না, তার চেয়ে একটি স্থির-প্রশান্ত গভীর-নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নের আমি উপাসক। নমিতা সংসারেই বিরাজ করুক, সেখানে থেকেই যদি তার গ্রন্থিও শিথিল করতে পারে তবেই ভালো। তার জন্যে ও লাঞ্ছিত হোক, অপমানিত হোক, সেটা তার আশীর্বাদ।"

নিশ্বাস ফেলিয়া অজয় কহিল—"আমিও তাকে সেই কথাই বলে এসেছি।"

—"সেইটেই সব চেয়ে বড়ো প্রার্থনা। আমার সঙ্গে তার যে একটা ব্যাপার ঘটে গেছে, সেটা তোমাকে পরে বললেও চলবে। এখন তোমাকে কিছু খাওয়াই।"

অজয় কহিল—"ক্ষিদে আমার সত্যিই পেয়েছে। কিন্তু তোমার আছে কি যে খাওয়াবে? এই ত তোমার বিছানার চেহারা! সামান্য একটা বাক্সও তোমার আছে বলে মনে হচ্ছে না।" বলিয়া মাথা তুলিয়া অজয় ঘরের চারিদিকে একবার চাহিল।

প্রদীপ হাসিয়া বলিল—"দুর্ভাগ্যবশত তোমার জ্বর হয়েছে বলে তোমাকে আজ খাওয়াতে পারব না বলে মনে হচ্ছে না। পকেটে দু'আনা এখনো আছে বোধ হয়। তুমি একটু শুয়ে থাক। আমি সাবু আর মিছরি কিনে নিয়ে আসছি।"

'আমিও তাকে সেই কথাই বলে এসেছি।' অজয় মনে-মনে, নিরুচ্চারে, সেই কথাটার পুনরাবৃত্তি করিল। হ্যাঁ, নমিতা নিজের শক্তিতেই বিদ্রোহিনী হোক, নিজের রুচিতেই সে পথের নির্ণয় করুক। এই অচলায়তন ভাঙিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়ানোই তাহার বড় কাজ, একমাত্র কাজ। কিন্তু, না, মনের মধ্যে কোথায় একটা বেদনার তারে ঘা পড়িল—নমিতার মূল্যবোধে ভুল হইবে না তো ?
প্রতীক্ষা না হঠকারিতা! ভাবা যায় না অজয় স্বাধীনতার জন্য দ্বার প্রান্তে বসিয়া সুদীর্ঘ প্রতীক্ষা করিবে, সে ক্ষিপ্র বেগে উন্মত্ত ব্যাকুলতায় ঝাঁপিয়ে পড়ে ছিনিয়ে নেবে স্বাধীনতা। নমিতা তাহার কাছে স্বাধীনতা ছাড়া আর কী !
কিন্তু অজয় খারাপ! নিজের মনেই কষ্টে একবার হাসিল অজয়। নমিতা স্বাধীন নয় বলিয়াই তাহাকে 'খারাপ' দেখিয়াছে, নইলে স্বাধীন দৃষ্টিতে কে খারাপ, কী খারাপ !

আকাঙ্ক্ষা কখনো খারাপ হয় ?

অজয়ের মনে হইল জ্বরটা বুঝি ছাড়িয়া যাইতেছে।

অজয়কে ঘুম পাড়াইয়া প্রদীপ ছাতে চলিয়া আসিল। নিজের তক্তপোষটা বন্ধুকে ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে; তাহা ছাড়া ঘুমও যে আসিবে এমন মনে হইতেছে না। অস্থিরপদে সে ছাদের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত পায়চারি করিতে লাগিল। সে এ কয়দিন প্রচুর আলস্য ভোগ করিয়াছে, এইবার আবার তাহার দুই ব্যাকুল পক্ষ প্রসারিত করিতে হইবে। কিন্তু একটা করিবার মত কিছু না করিতে পারিলে তাহার আর স্বস্তি নাই।

রেলিঙ-হীন ছাতের এক ধারে পা ঝুলাইয়া প্রদীপ বসিয়া পড়িল। অন্ধকার আকাশে অগণন তারা কোটি-কোটি ব্যর্থস্বপ্নের মত উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে; রাস্তায় মুখ বাড়াইয়া চাহিয়া দেখিল একটি লোকও পথ চলিতেছে না। এই অবারিত স্তব্ধতার মধ্যে নিজেকে প্রদীপের কী যে নিঃসঙ্গ ও একাকী লাগিল! নিজের পেশীবহুল দৃঢ় বক্ষতটের দিকে চাহিয়া সে ভাবিল, সে কি জন্য নিশ্বাস ফেলিতেছে—এই পৃথিবীতে সে আসিয়াছ কেন? কি সে করিতে চাহিতেছে? অজয়ের দুই চোখে উগ্র মৃত্যু-পিপাসা; সে বলে: আমরা পৃথিবীতে আসিয়া মরিব এই আমাদের জীবনধারণের পরম পরিপূর্ণতা—কর্মসাধনায় আমাদের মৃত্যুকে মহিমান্বিত করিয়া তোলাই আমাদের কাজ। আমি আয়ুর ভিখারী নহি। স্ফটিক হইয়া চূর্ণ হইব তাহাও ভালো, তবু সামান্য প্রস্তরখণ্ড হইয়া গৃহচূড়ে অবিনশ্বর আলস্যে বিরাজ করিব না। জীবনের মর্যাদা কবিতে হইবে মানুষের মৃত্যুর মূল্যে।

অজয় তাই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে সবলে উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছে—সে তাহা চায় না। তাহার বাবার সম্পত্তির আয় বৎসরে কম করিয়া পনেরো হাজার টাকা, সে দুই হাতে তাহা নিয়া পুতুল খেলিতে পারিত। সে বলে: "বাবা যদি আমার এই ত্যাগ দেখে আমাকে ত্যাজ্যপুত্র না করেন ত এই টাকা দিয়ে আমি মাসিক একটা বৃত্তির ব্যবস্থা করব। সামান্য হোক ক্ষতি নেই, কিন্তু একটা উদার উদাহরণ ত দেখানো যাবে। সুদূর দৃষ্টি আমাদের দেশে অনেকেরই আছে প্রদীপ, কিন্তু সুন্দর একটা দৃষ্টান্ত নেই।"

প্রদীপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল: "কি তোমার সেই উদাহরণ?"

—"মোটামুটি এই। জেল থেকে যে-সব কয়েদি এসে ফের চুরি ও ডাকাতি করা ছাড়া বেকার যন্ত্রণা নিবারণ করবার আর পথ পায় না, তাদের জন্যে ছোটখাট করে একটা ভরণপোষণের সংস্থান করে দেব। যারা চুরি-ডাকাতি করে, তারা যত গর্হিত কাজই করুক না কেন, তাদের বুদ্ধি আছে, সাহস আছে, দলবদ্ধ হবার কৌশল জানা আছে। শুধু তাই নয়, একত্র সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ করার মধ্যে যে-সব গুণ থাকে, তা থেকেও ওরা বঞ্চিত নয়।

প্রদীপ ফের প্রশ্ন করিয়াছিল: "যেমন?"

—"যেমন ধরো কার্য সিদ্ধ করতে কেউ যদি আহত হয়, তবে তাকে তারা নিরাপদ স্থানে বহন করে রক্ষা করে—গোপনে-গোপনে সেবা-শুশ্রূষা করিতে ত্রুটি করে না। এরাও মানুষ প্রদীপ, এদেরো মহত্ত্ব আছে। তোমাদের মত এরাও মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠে চাঁদ দেখে কোনো একখানি মুখের সাদৃশ্য খুঁজে নিতেও হয়ত দেরি করে না। সমাজ থেকে এদের বহিষ্করণের পথ আমি বন্ধ করে দেব।"

প্রদীপ হাসিয়া বলিয়াছিল: "কিন্তু তোমার বাবা যদি তোমাকেই বহিষ্কার করেন?"

উত্তরে অজয়ও হাসিয়াছিল বৈ কি। বলিয়াছিল: "বছরে পনেরো হাজার টাকা! ফুঃ! কেড়ে নিতে কতক্ষণ!"

অদ্ভুত অসাধারণ অজয়। তাহার সঙ্গে পা মিলাইয়া চলে প্রদীপের সাধ্য কি! সে তাহা চাহেও না। সে তাহার দেহের প্রতিটি স্নায়ু ভরিয়া তপ্ত রক্তস্রোত অনুভব করিতে যায়। এই ভাবে মরিয়া বাঁচিতে তাহার ইচ্ছা করে না। অজয় তাহাকে বিলাসী, ভাবুক, অলস—আরো কত-কি বলিবে, তবু আজিকার এই নক্ষত্রপ্লাবিত আকাশের নীচে সে নিজেকে বিরহী মানুষ বলিয়াই অভিনন্দিত করিয়া সুখ পাইল। একটা ছোটখাট চাকুরি পাইলে সে বাঁচে। এমন করিয়া ভূতের বেগার খাটিতে সে

লাহোর হইতে কলিকাতা আর ঘুরিতে পারে না—সে এখন একটু জিরাইয়া লইলে পৃথিবীর দুর্দশা কি এমন ভয়াবহ হইত, তাহা সে ভাবিয়া পায় না। কত দিন পরে সে ছাতে উঠিয়া আকাশ দেখিল কে জানে! সে যে একদিন কল্পিত মানুষের সুখ-দুঃখ, মন-দেওয়া-নেওয়া নিয়া গবেষণা করিয়াছে বা করিতে পারে এমন কথা সে নিজেই ভুলিতে বসিয়াছিল—কিন্তু আজ তাহার রাত জাগিয়া, ভারি মিষ্টি করিয়া একটি ছোট গল্প লিখিতে ইচ্ছা করিতেছে। একটি সাধারণ ঘরোয়া গল্প—দুইটি সংসারানভিজ্ঞ স্বামী-স্ত্রী লইয়া। গল্পের একটি ছত্রেও রোমাঞ্চকর উদ্দীপনা থাকিবে না—পুষ্করিণীর মত নিস্তরঙ্গ প্রশান্ত জীবন।

সে গল্প লিখিতে লিখিতে তন্ময় হইয়া থাকিবে, ঘরের আরেকটি লোক সামনের নিবু-নিবু দীপশিখাটি উস্কাইয়া দিলে তাহার সহসা জ্ঞান হইবে যে, অন্ধকার ঘরে মাটির বাতিটির চেয়েও উজ্জ্বল আরেকখানি মুখ আছে। প্রদীপ চক্ষু বুজিয়া সে-মুখ ভাবিতে গেল। স্তিমিতাভ বিমর্ষ মুখ। আশ্চর্য, কপালে সিন্দুর নাই। মুখখানি দেখিয়া মনে হয়, কত বৎসর আগে যেন তাহাকে একবার দেখিয়াছে। নাম ধরিয়া ডাকিলেই কথা কহিবে।

এই সব কথা শুনিলে অজয়ের দলের লোকেরা তাহাকে যে কি ভাবিবে, তাহা সে জানিত। কিন্তু এমন করিয়া ভণ্ডামি করিবারই বা কি মানে আছে? অনাগত ভবিষ্যৎ বংশধরদের সুখের জন্য সে নিজের সুখকে তুচ্ছ করিতে পারিলে হয়ত কোনো দিন কলিকাতা শহরে তাহারই নামে একটা রাস্তা হইয়া যাইত; কিন্তু নিজের সুখকে যদি সে জুতার সুখতলার মত ছুঁড়িয়া ফেলিতে না পারে তবে কি তাহার ক্ষমা মিলিবে না? সুখ সে পাইবে কি না কে জানে, হয়ত যে-পথে সে পা বাড়াইয়া ভাবিতেছে, সে-পথে দুঃখের রাজ-সমারোহ চলিয়াছে—তবু হয়ত তা সমারোহই। কোথায়ই বা সমারোহ নয়? যে কিছু চাহে না বলিয়া ভগবানকেই চাহে, ঐশ্বর্য সে কম ভোগ করে না। মরিলে সে অমর হইবে, এমন একটা পরম প্রলোভনেই ত অজয়—অজয় হইয়াছে। সে এই মরণের মধ্যে নমিতাকে টানিয়া আনিতে চাহিয়াছিল! ছি ছি! নমিতার মধ্যে সে বন্দী ভারতবর্ষের মৌনী মূর্তি দেখিয়া শিহরিত হইল, কিন্তু তাহার অন্তরালে যে কত কালের স্থবির সমাজের কলুষিত সংস্কার রহিয়াছে, সে দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল না। নমিতার মর্যাদা উচ্ছৃঙ্খল বিদ্রোহে নয়, সংযত আত্ম-প্রতিষ্ঠায়। তাহার মুক্তি কৃপাণে নয়, কল্যাণে। প্রদীপ নমিতার পথ-নির্দেশ করিবে। সে আর স্থির হইয়া বসিতে পারিল না, হাঁটিতে শুরু করিল।

তারাগুলি ক্রমে ক্রমে মিলাইয়া যাইতেছে। প্রদীপ ছাতের উপরই একটু ঘুমাইয়া

পড়িয়াছিল, বোধ করি কি-একটা শব্দ হইতেই তাহার ঘুম ভাঙিল। স্পষ্ট চোখে পড়িল, কে যেন তাহার শিয়রের কাছে বসিয়া আছে। প্রথমটা ভালো করিয়া ঠাহর হইল না। লোকটাকে চিনিবার জন্য সে জামার পকেট হইতে টর্চ বাহির করিতে গেল। একা ছাতে আসিয়াছে অথচ টর্চ লইয়া আসে নাই। এই লোকটা যদি এখন অপ্রতিবাদে অস্ত্র-প্রয়োগ করিয়া বসে! সে এত অসাবধান ও অমনোযোগী, তাহার পক্ষে ত সব ছাড়িয়া-ছুড়িয়া দিব্য বিবাহ করাই প্রশস্ত। ঐ পক্ষ হইতে একটা কাণ্ড হইয়া গেলে কেলেঙ্কারির আর সীমা থাকিবে না। বেচারা অজয় অসহায়!

ভীষণ ঘাবড়াইয়া গিয়া প্রদীপ কি করিয়া বসিবে, ভাবিতে ভাবিতেই লোকটা ভারি স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল: "আমাকে চিনতে পাচ্ছ না?"

—"সুধী?" আতঙ্কে ও বিস্ময়ে প্রদীপ লাফাইয়া উঠিল। নক্ষত্র-মণ্ডলীর প্রভাবে সে হঠাৎ পাগল হইয়া যায় নাই ত? নাকের নীচে ডান হাতের তালুটা পাতিয়া সে নিজের নিশ্বাস অনুভব করিল। মনে ত হইল সে বাঁচিয়া আছে। তবে ছাত বাহিয়া এই লোকটা কোথা হইতে আসিয়া নিজেকে সুধী বলিয়া পরিচয় দিতেছে। ধমক দিবার জন্য সে চেঁচাইতে চাহিল, কিন্তু স্বর বাহির হইল না।

লোকটি কহিল: "আমি বদলেছি বলে ত একটুও মনে হয় না। অনেক দূর দেশে বেড়াতে গিয়েছিলুম—বায়ুকোণে ঐ যে তারাটা দেখছ, সেখানে। সেখানে সাহিত্যিক বলে আমার খুব নাম হয়েছে। তোমাদের ভাষায় আমার বইগুলি অনূদিত হয় নি?"

যাহা হোক, লোকটা মারমুখো নয়, বেশ বিনাইয়া কথা কহিতে জানে। প্রদীপ এবার গলা খুলিয়া বলিতে পারিল: "দূর দেশ থেকে এতদিন বাদে কি মনে করে? বায়ুকোণের তারায়ও বেকার-সমস্যা চলেছে নাকি?"

স্বপ্নের ভিতর হইতে ছায়ামূর্তি কহিল—"অনেকদিন পরে নমিতা আমাকে স্মরণ করেছে প্রদীপ। না এসে থাকতে পারলুম না। আমি এখুনি তার কাছ থেকে আসছি।"

—"নমিতার কাছ থেকে আসছ—তার মানে? ভূত হয়েও তুমি তার ওপর স্বামীত্ব ফলাবে? কে আর তোমার নমিতা? সূর্য অস্ত গেলেও তোমাদের দেশে আলো থাকে নাকি? নমিতার প্রতি তোমার এই রূঢ় আচরণ আর আমি সহ্য করবো না।" প্রদীপ হাত বাড়াইয়া তাহাকে ধরিতে যাইতেছিল, সে একটু সরিয়া বসিল।

ছায়ামূর্তির মুখে স্বল্প-ম্লান হাসি: "আমি সেই কথাই নমিতাকে বুঝিয়ে দিয়ে এলুম।

তার ইহজীবনে আমি যে তার সত্যি করে কেউ ছিলুম না, মরে তার পূজোপচার আমি কি করে গ্রহণ করব ? তার কাছে আমি তোমার নাম করে এসেছি।"

—"আমার নাম কেন করতে যাবে ? আমি কে ? তুমি বলছ কি সুধী ?"

স্বপ্ন নিরুত্তর। তাহাকে নাড়া দিবার জন্য প্রদীপ সামনের দিকে তাহার দুই হাত প্রসারিত করিয়া দিল। কিন্তু কঠিন একটা ইটে হাতের মুঠা দুইটা আহত হইতেই সে দেখিল ভোরের ফিকে আলোতে স্বপ্নকে আর দেখা যাইতেছে না। বার কতক চক্ষু কচলাইয়া নীচু হইয়া ঝুঁকিয়া রাস্তায় তাকাইল—কতকগুলি ময়লা-ফেলার গাড়ি জড়ো হইয়াছে। প্রদীপ কি করিবে ভাবিয়া পাইল না, ছাতে ফের পায়চারি করিতে লাগিল। ভালো করিয়া তাহার ঘুম হয় নাই। এমন স্বপ্নও মানুষ দেখে নাকি ?

মেসের চাকর ছাতে কি একটা কাজে আসিয়াছিল, তাহাকে প্রদীপ জিজ্ঞাসা করিল

—"তুই রাতে একবার উপরে এসেছিলি ?"

একটা পরিত্যক্ত কাপড় গুটাইতে গুটাইতে যদু কহিল—"না ত।"

—"আচ্ছা, আমার ঘরের সবাই উঠেছে ?"

—"অনেকক্ষণ।"

—"আমার বিছানায় কাল যিনি শুয়েছিলেন তিনি উঠেছেন ?"

—"কৈ, জানি না বাবু।"

—"যা, দেখে আয়।"

যদু কাপড় গুছাইয়া নামিয়া গেল। বিনা-সমাধানে হঠাৎ এই ছাত ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার সে নাম করিতে পারিল না। খানিক বাদে যদু ফিরিয়া আসিল ; কহিল —"সে বাবু এখনো ওঠেন নি, শুনলাম তাঁর জ্বর। কিন্তু নীচে আপনাকে কে ডাকছেন।"

—"আমাকে ?" প্রদীপের অন্তরাত্মা শুকাইয়া উঠিল। অত্যন্ত ভীতস্বরে সে চুপি চুপি কহিল—"কে ডাকছে রে ?"

যদু হাসিয়া কহিল—"একটি মেয়ে। চিনি না।"

—"মেয়ে ? কে মেয়ে ?" প্রদীপ দিবালোকেও রাতের স্বপ্নের জের টানিয়া চলিতেছে বোধ হয়।

হাত উল্টাইয়া যদু বলিল—"তা ত আমি জিজ্ঞাসা করি নি বাবু।"

নিশ্চয়ই নমিতা আসিয়াছে। প্রদীপ আর সন্দেহ করিল না। স্যাণ্ডেল দুইটার মধ্যে পা দুইটা ঢুকাইয়া তাড়াতাড়ি নামিয়া চলিল। সেই প্রত্যাশিত প্রভাত আজ আসিল বুঝি—নমিতাকে সে আজ কোন্ মূর্তিতে দেখিবে ? বিদ্রোহিণী বিজয়িনীর

বেশে, না সরমনমিতা স্পর্শভীরু কবিকল্পনার মত? ভগবান করুন, সে যেন এই নির্মল প্রভাতটির সঙ্গে একটি অম্লান সাদৃশ্য রাখিয়াই অবতীর্ণ হয়! সেই অল্প কয়টি মুহূর্তের মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সে যে কত কিছু ভাবিয়া নিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু নীচে আসিয়া যাহাকে সে দেখিল, তাহা স্বপ্নেরও অতীত ছিল বোধ করি।

দম নিয়া প্রদীপ কহিল—"তুমি? এ সময়ে এখানে?"

উমা মিষ্টি করিয়া হাসিয়া বলিল—"সকালবেলা যে আমি মাঠে বেড়াতে যাই। প্রত্যহ। শচীপ্রসাদকে কাল আসতে বারণ করে দিয়েছি। একাই বেরোলুম আজ।"

হতাশার আবেশটা কাটিয়া যাইতেই প্রদীপ যেন সুস্থ ও সচেতন হইল। কহিল—"হঠাৎ আমার কাছে? কোনো দরকার আছে?"

উমা দুইটি টলটলে ডাগর চক্ষু নাচাইয়া কহিল—"বলবার মত দরকার কিছুই নাই তেমন।"

প্রদীপ হাসিয়া কহিল—"না-বলবার মত আছে ত?"

—"তেমন একটা কিছু না থাকলে কার্য-কারণই অচল হয়ে পড়ে শুনেছি। শুনতে চান? আপনার সঙ্গে অনেকদিন দেখা নাই, দেখা করতে এলুম। আমাদের বাড়ির মত আপনিও আমাকে তাড়িয়ে দেবেন নাকি?"

প্রদীপ কহিল—"দিলেই কিন্তু ভালো হত। কেননা এটা মেষ-জাতীয় পুরুষদের একটা মেস। এখানে তোমার পায়ের ধূলো পড়লে অনেকের ব্যঞ্জনই বিস্বাদ হয়ে উঠবে।"

কৌতূহলী হইয়া উমা কহিল—"কারণ?"

—"কারণ, আমাকে সুনজরে দেখে না এমন প্রতিবেশী আমার উঠতে বসতে। প্রকাশ্যে তুমি আমার আতিথ্য স্বীকার করলে, কালক্রমে তুমিই হয়ত আমার ওপর অকরুণ হয়ে উঠবে; কারণ একদিকে তোমার সংসার, অন্য দিকে এই কুৎসিত জনতা।"

উমা একটুও বিচলিত না হইয়া বলিল—"অত সব কথা আমার মুখস্থ নেই। আপনার সঙ্গে দেখা করার দরকার আমার আছে কি নেই, সে বিচার আমি আপনার সঙ্গে করব। অন্য লোকের যদি তাতে গাত্রদাহ বা পিত্তশূল হয়, হবে। তাদের বিনা-দামে আমরা চিকিৎসা করতে যাব কেন? চলুন, ওপরে আপনার ঘরে। বলবার মত দরকার একটা পেয়েছি।"

প্রদীপ ঘামিয়া উঠিল। উমা উত্তেজিত হইয়া সিঁড়ির উপর পা বাড়াইয়া দিয়াছে।

তাহাকে বাধা দিতে গেলেই সে আরো অবাধ্য হইয়া উঠিবে। প্রদীপ তাড়াতাড়ি রাস্তার উপর নামিয়া আসিল। বলিল—"চল পার্কে, তোমার দরকার অদরকারের সমাধান হবে।"

উমা নড়িল না, কহিল—"সেখানেও প্রকাশ্য জনতার ভয় আছে। আমি আপনার এই অন্যায় ও মিথ্যা সমাজহিতৈষণার শাসন করব। কথাটা খুব জমকালো করে বললুম, কেননা সোজা কথা ঘোরালো করে না বললে আপনারা বোঝেন না। আপনার এই আতিথেয়তার প্রতিদান আমি দেব একদিন—আমাদের বাড়িতেই নিমন্ত্রণ করে।"

প্রদীপের তবু সাহস হইতেছিল না; না জানিয়া-শুনিয়া উমা এই বিপদের মুখে কেন পা বাড়াইতেছে? সে ধীরে কহিল—"ব্যাপারটা খুব শোভন হবে না উমা! তা ছাড়া—"

উমা হাসিয়া বলিল—"আপনার 'তা ছাড়া'-টা বলুন। আগের যুক্তিটা বাতিল।" পরে মুখ নিদারুণ গম্ভীর করিয়া সে কহিল—"এত সব অমানুষিক কাজের ভার নিয়েছেন, অথচ একটি মেয়ের সম্পর্কে সামান্য লোকনিন্দা বহন করতে পারবেন না? তার চেয়ে বেত হাতে স্কুল-মাস্টার হাওয়াই আপনার উচিত ছিল। চলুন।"

প্রদীপও গম্ভীর হইল: "তা ছাড়া আমার ঘরে একটি অসুস্থ বন্ধু আছেন। তাঁর জ্বর।"

—"বন্ধু?" ভুরু কুঁচকাইয়া উমা কি ভাবিতে চেষ্টা করিল: "তাঁর নাম কি?"

—"বন্ধুদের নাম যাকে-তাকে বলতে হয় না।"

—"বেশ ত, তাঁরই সঙ্গে আমার দরকার। কি করে আর আমার পথ আটকাবেন। এটা পঞ্চভূতের মেস, আপনার নিজের বাড়ি নয়। আপনার অসুস্থ বন্ধুর হার্টফেল থেকে তাঁকে শিগ্‌গির বাঁচান বলছি।" বলিয়াই উমা পাশের সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে লাগিল।

অগত্যা প্রদীপ আর পদানুসরণ না করিয়া করে কি। তাহাকেই ঘর দেখাইয়া দিতে হইল। অজয়ের ঘুম ভাঙিয়াছে; বালিশটাকে দেয়ালের গায়ে রাখিয়া তাহাতে পিঠ দিয়া সে অন্যমনস্কের মত বসিয়াছিল। ঘরে হঠাৎ একটি অপরিচিতা কিশোরীকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। তাহার সর্বাঙ্গ হইতে চাপল্য যেন পিছলাইয়া পড়িতেছে; মুখখানিতে সাধারণ বাঙালি মেয়ের মুখের মত একটা নিরীহতা নাই, অন্তত নমিতার মুখে সে এই দীপ্তি ও ধী দেখিয়াছে বলিয়া মনে হইল না। সঙ্গে সঙ্গে প্রদীপও ঘরে ঢুকিল। অজয়ের একটু আশ্বস্ত হইবার আগেই প্রদীপ বলিয়া উঠিল—

"নমিতাকে ত তুমি চিনতে, এ তারই ননদ। তোমার একটা সামাজিক পরিচয় দিলুম উমা।"

উমা চক্ষু বড় করিয়া কহিল—"আমার আরেকটা অসামাজিক পরিচয় আছে নাকি ?"

প্রদীপ কহিল—"নেই ? বলব তবে ?"

উমা বলিল—"মিছিমিছি কেন অতিরঞ্জন করবেন ?" আমিই বলছি : "বাড়ির শাসন আমি মানি না, সকাল বেলা একা বেড়াতে বেরুই, মেস্-এর দুয়ারে দাঁড়িয়ে কেউ বাধা দিলে তাকে টপকে উপরে উঠে আসি। এই ত ?"

দুই বন্ধু হাসিয়া উঠিল। অজয় বিছানার উপর একটু সরিয়া বসিল : "বসুন এখানে।"

যে ব্যক্তি মোক্তারি পড়ে সে বাহিরে যাইবে বলিয়া কাছা আঁটিতেছিল চক্ষু দুইটা তেরছা করিয়া সে ফিক ফিক করিয়া হাসিল। বলিল—"একটা চেয়ার এনে দেব ?"

উমা কহিল—"চেয়ারে বসে বক্তৃতা দিতে আমি আসি নি।" (অজয়ের প্রতি) বয়েস আন্দাজে আমাকে আপনার খুব এঁচড়ে-পাকা মনে হচ্ছে, না ? আমি তাই।"

কোটের উপর চাদর চড়াইয়া ভাবী মোক্তার অন্তর্হিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে অজয় কহিয়া উঠিল : "লোকটা ভালো নয় প্রদীপ। কাল রাতে লুকিয়ে ও আমার স্যুটকেশ ঘেঁটেছে। লোকটা হয় চোর, নয় তার চেয়েও জঘন্য। আমাকে কিছু পয়সা দাও। আমিও এক্ষুণি বেরব।"

প্রদীপ চমকাইয়া উঠিল : "বল কি ? এই অসুস্থ শরীরে তুমি কোথায় যাবে ?"

অজয় এমন করিয়া অল্প একটু হাসিল যে, প্রদীপ অধোবদন হইল। তবু কহিল—"পয়সা ত আমার কাছে একটিও নেই।"

—"না থাক ; লাগবে না। এক মুহূর্ত দেরি করা চলবে না।" বলিয়া ক্লান্তপদে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। কোন রকমে সার্টটা গায়ে দিল, পায়ে জুতা ছিল না—স্যুটকেসটা হাতে লইয়া বাঁ হাতে চুলগুলি একবার নাড়িয়া দিয়া কহিল—"আমি চল্লুম।" (উমার প্রতি) "আপনার সঙ্গে ভালো করে আলাপ হল না। আবার যদি কোনো দিন দেখা হয়, আপনাকে ঠিক চিনে নিতে পারব। কিন্তু আবার কি দেখা হবে ?"

উমা ও প্রদীপের মুখে কোনো কথা আসিল না, সমস্ত ঘরের আবহাওয়াটা নিমেষে কেমন ভারি, থমথমে হইয়া উঠিয়াছে। অজয়কে সত্যসত্যই টলিতে-টলিতে দরজার দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া প্রদীপ বাধা দিয়া বলিল—"একটা গাড়ি ডেকে দেব ?"

অজয় হাসিয়া কহিল—"কিন্তু ভাড়া? গাড়ি লাগবে না।"
উমা এইবার কথা পাইল: "যদি কিছু মনে না করেন ত আমার কাছে সামান্য কিছু আছে।"
—"মনে কিছু নিশ্চয়ই করব। দিন শিগ্‌গির।" বলিয়া অজয় হাত পাতিল।
সেমিজের মধ্য হইতে ছোট একটি ব্যাগ খুলিয়া তিনটি টাকা অজয়ের হাতে দিতেই সে মুঠা করিয়া কপালে ঠেকাইল। কহিল—"আমার লোভ যে আরো বেড়ে যাচ্ছে। এবার আপনি যদি কিছু মনে না করেন ত আপনার দু'হাত থেকে এক-গাছি করে সোনার চুড়ি আমাকে উপহার দিন। দু'হাত থেকে একগাছি করে চুড়ি আপনার খোয়া গেলে আপনাকে আরো সুন্দর দেখাবে। আমার একদম ট্রেন-ভাড়া নেই। (হাসিয়া) আমি আমার দেশের বাড়ি ফিরে যাচ্ছি কি না। আসচে সাতাশে তারিখে যে আমার বিয়ে হবে।"
মুহূর্তে যে কি হইয়া গেল, ভাবাবেশে উমা আদ্যোপান্ত কিছু বুঝিতে পারিল না। ধীরে ধীরে চুড়ি দুইগাছি সে খুলিয়া ফেলিল। তাহার হাত হইতে ছিনাইয়া লইবার মত করিয়া তাড়াতাড়ি চুড়ি দুইগাছি টানিয়া নিয়া অজয় কহিল—"তাহলে গাড়ি একটা ডেকে দাও প্রদীপ। পরের পয়সায় বাবুগিরি যখন কপালে আছেই, একটুতেই তা ছাড়ি কেন? যাও দেরি করো না।"
প্রদীপ তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইতেছিল, উমা কহিল—"দাঁড়ান, আমিও যাচ্ছি আপনার সঙ্গে।"
—"আমার সঙ্গে কোথায় যাবে তুমি? একা বাড়ি ফিরতে পারবে না?"
হাসিয়া উমা জবাব দিল: "না, পথ কি আর চিনি? কিন্তু আপনার সঙ্গে দরকারী কথাটাই যে বাকি রইল।"
অজয় কহিল—"চটপট সেরে নিন, বেশিক্ষণ আমি দাঁড়াতে পারছি না।"
উমা পরিহাস করিয়া কহিল,—"আপনার বিয়ের তো এখনো দেরি আছে। অত তাড়া কিসের?" তাহার পর প্রদীপকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—"আপনি একদিন বৌদির ঠিকানা খুঁজছিলেন না? তিনি এখন আমাদের ওখানেই আছেন।"
—"কে? নমিতা? তোমাদের ওখানকার ঠিকানাটা কি শুনি?" বলিয়া অজয় পকেট হাতড়াইয়া এক-টুকরা কাগজ বাহির করিল। সামনের কেরোসিন কাঠের টেবিলটার উপর কোথাও পেন্সিল একটা পাওয়া যায় কি না তাহারই সন্ধানে অন্যমনস্ক অজয় কহিতে লাগিল—"যতই দুর্বল আর সন্দিগ্ধ হোক না কেন, সেবায় নমিতার হাত আছে। একটুও ঘেন্না না করে দু'হাতে আমার বমি কাচালে।

ভেবেছিলুম এ-কথা স্মরণ করে নমিতাকে ভবিষ্যতে একটি অবিনশ্বর মর্যাদা দেব। কিন্তু পরে যখন তার ভেতর থেকে সঙ্কীর্ণদৃষ্টি ভীরু নারীপ্রকৃতি আত্ম-প্রকাশ করল তখন তার সেই অধঃপতনকে ক্ষমা করতে পারলুম না।"

প্রদীপ বলিল—"তাকে তোমার ক্ষমা না করলেও চলবে। স্বল্প পরিচয়ের অবসরে তুমি তাকে ছিনিয়ে নিতে চাইবে, আর আবেগে অন্ধ না হয়ে তোমাকে প্রত্যাখ্যান করল বলেই সে ভীরু? আমি তার বিচক্ষণতাকে প্রশংসা করি। উত্তেজনার কুয়াসায় বুদ্ধিকে সে আচ্ছন্ন করে নি।"

—"ঐ রকম অকর্মণ্য বুদ্ধি নিয়ে সে চিরকাল কৃত্রিম বৈধব্য-পালনই করুক। অকারণ সন্তান-প্রসবের চেয়েও তা নিন্দনীয়।"

প্রদীপের ইহা সহিল না। কহিল—"আত্মীয়ের নিন্দা আত্মীয়ের সামনে শোভন নয়। একটু সংযম শিক্ষা করলে ভালো করতে।"

অজয় উমার দিকে ফিরিয়া কহিল—"ও! আপনি ব্যথিত হচ্ছেন? কিন্তু যেটা সত্যিই নিন্দনীয় সেটা গোপন করে রাখলেই পাপ। এমনি করে আমাদের সমাজে পাপের প্রসার হচ্ছে।"

উমা কহিল—"এখন সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্যটাও আপনাকে শুনতে হলে আপনার এমনি করে অসুস্থ শরীরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়বার মতলবের কোনো মানে থাকবে না। যান দীপদা, গাড়ি নিয়ে আসুন।"

উমাকে নিজের পক্ষে পাইয়া প্রদীপ জোর পাইল। কহিল—"তুমি ভাবছ এমনি সর্বনেশে উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়াটাই জীবন—"

অজয় চেঁচাইয়া উঠিল: "হাঁ, এই সর্বনেশে উচ্ছৃঙ্খলতা! এ-ই জীবনের যথার্থ প্রতিশব্দ! নইলে ঐ ব্যর্থতা আমার সহ্য হয় নি, আমি তাকে বলিষ্ঠ কর্মের মধ্যে আহ্বান করেছিলুম—যে-কর্মের পুরস্কার মহামহিমান্বিত পরাজয়! নমিতা একটা পায়রার চেয়েও ভীরু।"

উমা কহিল—"দুর্ভাগ্যবশত আপনি হাততালি পেলেন না। আমি বৌদিকে আরেকবার বলে দেখব'খন।"

অজয় পেন্সিল পাইল না। কহিল—"তার ঠিকানাটা দিন, দরকার হলে তার কাছে আবার আমার আবির্ভাব হবে। ইতিমধ্যে আকাশের ঝড়ের আকারে তার ওপরে সমাজের অভিশাপ বর্ষিত হতে থাকুক। এবার এলে আমাকে যেন শূন্য হাতে আর ফিরতে না হয় ভগবান।"

উমা হাসিয়া কহিল—"আপনি ভগবানে বিশ্বাস করেন নাকি?"

—"নিশ্চয় করি।"

প্রদীপ ঠাট্টা করিয়া কহিল—"উনি অবতার।"

—"সত্যি তাই। আমি আমার নিজের ভগবান। কিন্তু অযথা বাকবিস্তার আর করবো না। ঠিকানাটা বলুন, মনে করেই রাখব ঠিক। নমিতাকে যদি না ভুলি ত তার ঠিকানাটাও ভুলবো না।"

উমা কহিল—"ঠিকানা জেনে লাভ নেই। আপনার আবির্ভাবের সমস্ত পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে।"

—"কেন? কেন?" অজয় উৎসুক হইয়া উঠিল: "আমার সম্পর্কে তার খুব নিন্দা হচ্ছে বুঝি? তাব চরিত্রে দোষারোপ হয়েছে? তাই হোক। আমি শুনে খুব সুখী হলুম।"

প্রদীপ ঝাঁঝালো গলায় কহিল—"সুখী হ'লে? তুমি দিন-কে-দিন ইতর হচ্ছ।"

অজয় চটিল না, কহিল—"আমি নমিতার উপকার চাই। অপবাদ ওর যত উপকার করবে শত উপদেশেও তা হবে না। নমিতা যদি বাঁচে নিজেকে যেন ঘৃণ্য মনে করেই বাঁচে—তাতে যদি উদ্ধারের একটা উৎসাহ পায়। নিজের সতীত্ব নিজেই যেন লুণ্ঠন না করে।"

—"ঢের হযেছে, এবার থাম। শালীনতা বলে জিনিস তোমার জানা নেই দেখছি। তুমি এখন গেলেই আমবা সুখী হব।"

অজয় চমকাইয়া উঠিল; কহিল—"যাচ্ছি। বলুন ঠিকানাটা।"

—"বলো না উমা, খবরদার। তুমি একে চেন না।"

প্রদীপের মুখের এই কর্কশ কথা শুনিয়া অজয় মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হইয়া গেল, কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। নমিতার প্রতি সে কঠিন হইতেছে বলিয়া প্রদীপের কেন যে আঘাত লাগিতেছে তাহা তলাইয়া দেখিবার সময় ছিল না; এবং সময় থাকিতেও জাতির দুর্দশার দিনে কোনো যুবক সামান্য নারী-প্রেমে মাতোয়ারা হইতে পারে এমন একটা জাজ্বল্যমান সত্যকে সে প্রাণপণে অস্বীকার করে। তবু কি ভাবিয়া সে কহিল—"সত্যিই আমাকে আপনি চেনেন না; চেনেন না বলেই তবু দুয়েকটা কথা বলছেন—আমাকে না চিনিবার আগেই যদি ঠিকানাটা দেন ত পাই, নইলে—"

অজয় জোর দিয়া কহিল—"নইলে ঠিকানা একেবারে পাবই না ভেবেছ প্রদীপ? আমাদের কোটি কোটি কামনার ফলে পৃথিবীর সৌভাগ্যসম্পদ যেমন অনিবার্য,

তেমনি নমিতার প্রতি আমার প্রয়োজনবোধ যদি কোন দিন একান্ত হয়ে ওঠেই, তোমাদের শত-লক্ষ অবরোধ তাকে নিবারণ করতে পারবে না। এ-কথা তোমাকে আমি উঁচু গলায় বলে যাচ্ছি। কিন্তু ভগবান করুন, আমার প্রয়োজনে তাকে যেন মুক্ত না হতে হয়, সে যেন নিজের প্রয়োজনেই প্রতিষ্ঠা লাভ করে।"

—"বলি তুমি যাবে, না দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বক্তৃতার কসরৎ করবে?" প্রদীপ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

অজয় কহিল—"যাব বৈ কি। এক জায়গায় বেশিক্ষণ থাকবার জো কোথায়? (উমার প্রতি) কিন্তু ঠিকানা যখন পেলুমই না, তখন নমিতার সম্বন্ধে বাকি খবরটুকু জেনেই নিই না হয়। তার সঙ্গে দেখা হবার সমস্ত পথ ত আপনারাই বন্ধ করে দিলেন।"

প্রদীপ চঞ্চল হইয়া উঠিল: "বাকি খবরে তোমার দরকার নেই। সে আমাকে উমা আরেক দিন বলবে। তোমার গাড়ি লাগবে কি না, বল। আমার কাজ আছে।"

অজয় হাসিয়া কহিল—"তার চেয়ে আমার কাজ আরো জরুরি। নমিতার খবর আমার চাই। বলুন। আমি নমিতাকে উদ্যত শাসনের ফণা থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলুম, সে স্বেচ্ছায় দাসত্ব চেয়ে নিয়েছে—"

প্রদীপ ফের প্রতিবাদ করিল: "তুমি তার আচরণের এমন কদর্য ব্যাখ্যা করো না বলছি।"

—"হ্যাঁ, সে দাসত্বের যূপকাষ্ঠে আবার গলা বাড়ালে! মেয়েদের আত্মকর্তৃত্ব হয়ত প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ।"

—"তোমার সঙ্গে গেলে তুমি তার আচরণের যত মহান অর্থই দিতে না কেন আমরা তাকে স্বেচ্ছাচারিণী বলতাম। সেখানেও সে তোমার দাসত্ব করত।"

—"ভুল, প্রদীপ। সে দাসত্ব করত জাগ্রত ভাগ্য-বিধাতার। সে-দাসত্ব পূজা, নৈবেদ্য, জীবনোৎসর্গ!"

উমা এতক্ষণে কথা কহিল: "বৌদি ত পুজোই করছেন। বাকি খবরটুকু তাঁর তাই।"

—"পুজো করছে? কার?" প্রশ্নের উত্তর পাইবার আগেই অজয় আপন মনে বলিয়া চলিল: "তার ক্ষণিক দুর্বলতা দেখে সত্যিই আমি একেবারে আশা ছাড়ি নি প্রদীপ। বহু যুগের প্রথা ও সংস্কারের ভস্মে আচ্ছাদিত থেকেও তার মধ্যে আমি বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ দেখেছিলুম। নিজের দৈন্য দেখে একদিন দেশকে সে বড়ো করে অনুভব করবেই। সে পূজার লগ্ন তার জীবনে এল?"

উমা তরলকণ্ঠে কহিল—"দেশ নয়, স্বামী।"

একটা বজ্র ভাঙিয়া পড়িলেও বোধ করি এতটা ঘাবড়াইবার হেতু ছিল না। অজয় যেন স্বপ্নে একটা পর্বতচূড়া হইতে নিচে নিক্ষিপ্ত হইল। রূঢ় রুক্ষস্বরে সে কহিল—"দেশ নয়, স্বামী! স্বামীপূজো করছে সে! স্বামীর ফোটো-পূজো?"

উমা ফিক করিয়া হাসিয়া কহিল—"ঠিক তাই।"

এক মুহূর্তও দেরি হইল না। উমার বাক্যোচ্চারণের সঙ্গে-সঙ্গেই অজয় সমস্ত ঘর-বাড়ি কাঁপাইয়া তুমুল অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। ঐ কয়খানা জীর্ণ-পঞ্জরের মধ্য হইতে এমন একটা বিদ্রূপোচ্ছ্বাস উদ্ভূত হইতে পারে এ-কথা কোনো শারীরতত্ত্বশাস্ত্রে লেখা নাই। উমার কথা শুনিয়া প্রদীপও সামান্য স্তম্ভিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু এমন একটা কুৎসিত অপরিমেয় হাসি শুনিয়া তাহার স্নায়ুতে আর যেন বল রহিল না। উমাও দেয়ালের দিকে পিছাইয়া গিয়াছে। অজয় স্যুটকেসটা হাত বদল করিয়া বলিল—"ঠিকানা আর আমার চাই নে। সে মরুক!" বলিয়াই সে দুর্বল ক্লান্ত পায়ে নিচে নামিতে লাগিল। দুই-তিনটা সিঁড়ি নামিয়া সে কহিল—"আমি শরীরে এখন বেশ জোর পাচ্ছি, তোমার কষ্ট করে আর গাড়ি ডাকতে হবে না।"

প্রদীপ কটুকণ্ঠে কহিল—"পরকে ত মরবার অভিশাপ দিয়ে যাচ্ছ, কিন্তু দেখো, নিজের উচ্ছৃঙ্খলতাই না তোমার শাপের বিপরীত অর্থ করে বসে।"

অজয় প্রায় নিচে নামিয়া আসিয়াছিল, এক ধাপ উঠিয়া কহিল—"আমি বহু পুণ্যাত্মার অভিসম্পাত কুড়িয়েই জীবনে যাত্রা করেছি প্রদীপ। কোনো পরিণামই আমার পক্ষে অপ্রত্যাশিত হবে না। কিন্তু সবাই যদি সর্বান্তঃকরণে নমিতাকে শাপো, তাহলেই তার কল্যাণ হবে। জান, আমি ক্ষণকালের জন্য তার চোখে বিদ্যুৎ দেখেছিলুম। অভিসম্পাতে সে-আগুন হয়ত আরেকবার জ্বলে উঠবে—আরেকবার।"

অজয়কে আর দেখা গেল না।

নমিতা একা এক রাজ্যের লজ্জা লইয়া পুনরায় শ্বশুরালয়ে ফিরিয়া আসিল। গত্যন্তর ছিল না। গিরিশবাবু এ-হেন কুস্বভাবা মেয়ের দায়িত্ব লইবেন কোন্ সাহসে? তাই একদিন অবনীবাবুকে আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা উল্লেখ না করিয়া তিনি মোটামুটি বুঝাইয়া দিলেন যে মেয়েটার সত্যকার পুণ্য-সঞ্চয় হইবে শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা করিয়াই; তাহার সংসার শ্বশুরবাড়ির উঠোনটুকুতেই। শেষকালে এইটুকুও টীকা দিলেন: মেয়ে বড় হইয়াছে, তাহার কার্যকলাপ শাসনের চক্ষে অনুধাবন করিতে

হইবে। কথাগুলি নমিতার সামনেই বলা হইয়াছিল; কিন্তু এত লজ্জাকর উপদেশ শুনিয়াও কেন যে তাহার মরিতে ইচ্ছা করিল না সে নিজেই বুঝিতে পারে নাই।

অবনীবাবু নমিতাকে লইয়া আসিলেন। একখানি ছোট ঘর ছাড়া তাহার জন্য সামান্য একটু বারান্দাও আর রহিল না। সেই ঘরেরই বাহিরে অপরিসর একটু জায়গায় একটা তোলা-উনুনে তাহাকে রাঁধিতে হয়। সমস্ত সংসারযাত্রা হইতে বিচ্ছিন্ন নির্বাসিত নমিতা আর কি করিবে? বড় ঘর হইতে স্বামীর বৃহদায়তন ফোটোটা পাড়িয়া আনিয়া দুই বেলা তাহারি ধ্যান করে। স্বামীর মুখ যেন প্রায় ভুলিয়া গেছে; মনে করাইয়া দিবার জন্য একটা প্রতীকের আবশ্যক আছে বৈকি। এক-এক সময় তাহার মনে হয় এ মুখ যেন অন্য কারুর, তাহার স্বামী এই ছবির চেয়েও জীবন্ত ও সুন্দর ছিল। কিন্তু মনে-মনে স্বামী-ধ্যান করিলে তাহার খ্যাতি বাড়িবে না বলিয়াই এমন একটা সর্বজনগ্রাহ্য লৌকিক উদাহরণকে সে প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়।

আর কোনো কাজে সে মন বসাইতে দেয় না। অজয়ের দেওয়া বইগুলি সে কোথায় ফেলিয়া আসিত? কিন্তু উহাদের একটিরো পৃষ্ঠা উল্টাইলে তাহার স্বামী-পূজার ব্যাঘাত হইবে বলিয়া সে উহাদের স্পর্শ পর্যন্ত করে না। মালী দরজার গোড়ায় ফুল রাখিয়া যায়, তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া সে সেই ফুল লইয়া খেলিতে বসে। পিঠের উপর ভিজা চুলগুলি বিপর্যস্ত হইয়া লুন্ঠিত হয়, সিক্ত শীতল শরীর হইতে এমন একটি সুন্দর পবিত্রতা বিচ্ছুরিত হইতে থাকে যে নমিতার পর্যন্ত নিজের জন্য মায়া করে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে সেই নির্জীব অন্ধ ও বধির ছবির সম্মুখে নিজের এই পরিপূর্ণ দেহ-পাত্রখানি আত্ম-নিবেদনের অর্ঘ্যস্বরূপ তুলিয়া ধরে। কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটে, দেবতা আসিয়া তাহাকে স্পর্শ করে না, না বা সম্ভাষণ! কে সেই দেবতা? চক্ষু বুজিয়া ভাবিতে ভাবিতে ভুল হইয়া যায়, স্বামীর বিস্মৃত মুখকে উজ্জ্বল করিবার জন্য তাকায়, কিন্তু কৃত্রিম ছবি সাহায্য করিতে পারে না। কোথা হইতে আরেক-খানি মুখ অন্ধকার অন্তরে আসিয়া অনধিকার প্রবেশ করে। শত মনঃসংযোগ করিয়াও সে-মুখ নমিতা তাড়াইতে পারে না। তার দুই চোখে কি দুর্নিবার তেজ, ললাটে কি অহঙ্কার—কখনো কখনো ফুল নিবার জন্য সে এমন উৎসাহে হাত বাড়াইয়া দেয় যে ফুল তাহাকে দিতেই হয়। সেই দুরন্ত দেবতাকে প্রত্যাখ্যান করিবার উপায় কৈ? সেই দেবতা নমিতাকে ঘর ছাড়িবার জন্য একদিন শঙ্খ বাজাইয়াছিল। দেবতাকে সে ফিরাইয়া দিয়াছে, কিন্তু তাহার শঙ্খধ্বনি কবে হইতে আর শোনা যাইবে না?

মনের এই চাঞ্চল্য দমন করিতে হইবে। সংসার বলে, বিধবার পক্ষে এই চিত্তবিভ্রম পাপ—তথাস্তু, সংসারের আদেশ শিরোধার্য। নমিতা কৃচ্ছ্র সাধনায় মন দিল। একবেলা আহার করিত, এখন আহারের সংখ্যাগুলি এত কমাইয়া ফেলিল যে অরুণা পর্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। পুত্রবধূর এই স্বামীচর্যা তাঁহার খুব ভালো লাগিয়াছিল, কিন্তু এত বাড়াবাড়ি তাঁহার পছন্দ হইল না। তিনি বাধা দিতে চাহিলেন, কিন্তু নমিতা তাহাতে কান পাতিবে কোন্ লজ্জায়? সে নিরম্বু একাদশী করে, ব্রত-উপবাস তাহার লাগিয়াই আছে। গুরুঠাকুর মন্ত্র দিতে চাহিলে সে পরিষ্কার কণ্ঠে বলে: স্বামীর নামই আমার জপমন্ত্র। আপনারা যদি এক টুকরো পাথরে ভগবান পান, একটা ছবিতে তাঁকে পাওয়ায় আমার হানি কি? আমি স্বামী বুঝি, নারায়ণ বুঝি না।

সমস্ত সংসার নমিতার প্রশংসায় মুখর হইয়া উঠিল। সে তাহার কলঙ্কিত আচরণের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে। সমস্ত সাহসিক ক্রিয়ার বিরুদ্ধে এমনই একটি প্রতিক্রিয়া না পাইলে সংসার তাহার সামঞ্জস্য হারায়। সেই শান্তি ও সামঞ্জস্য রাখিতে নমিতা এমন করিয়া তাহার স্বভাবের প্রতিকূলতা করিতেছিল। কিন্তু ক্রমে-ক্রমে এই কৃত্রিম পূজায় তাহার নেশা লাগিয়া গেল। খুনী সাধু ছদ্মবেশে আত্মরক্ষা করিতে গিয়া সাধু বনিয়াছিল, বহুলাচরিত অভ্যাসে নমিতাও সে তপশ্চারিণী হইয়া উঠিবে তাহাতে বিচিত্রতা কোথায়? কিন্তু স্বামীকে মূর্তি দিতে গেলেই তাহার সমস্ত গোলমাল হইয়া যায়, তখন নিজেকে বৈধব্যচারিণী বঞ্চিতা বলিতে তাহার মন উঠে না। সংসারে তাহার এই আচরণটাই শোভন ও বাঞ্ছনীয়—এই ভাবিয়াই সে রোজ স্নান করিয়া চন্দন-ঘষে, ফুল দিয়া ফটো সাজায়, ভুলিয়াও একবার জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়ায় না। সে এত করে, তবু তাহার মন ভরিয়া উঠে না কেন? না; মানুষের মন একটা ব্যাধি; পায়ের তলায় বিঁধিয়া-থাকা কাঁটার মত তাহাকে উপড়াইয়া ফেলিতে হইবে। মনের টুঁটি টিপিয়া ধরিবার জন্য নমিতা গীতার একটা বাঙলা-সংস্করণ খুলিয়া বসিল।

এত লোক-জন, তবু এ-বাড়িতে তাহার বড় একলা লাগে। মা কাছে থাকিলে তাহার এমন খারাপ লাগিত না। সে-দিন মা তাহাকে মরিবার জন্য এক বোতল কেরোসিন তেল সামনে ধরিয়াছিলেন; তবু সে মরিলে মা-ই বেশি কাঁদিবেন বলিয়া সে স্বচ্ছন্দে বোতলটা স্বস্থানে রাখিয়া আসিয়াছিল। মাকে কাছে পাইলে তাঁহার বুকে মুখ গুঁজিয়া সে এই বলিয়াই কাঁদিত: মা গো, এত পূজা করিয়াও তৃপ্তি পাওয়া যায় না! এমন একটা অকর্মণ্য আলস্যের মধ্যে ভগবানকে পাইয়াই

বা আমি করিব কি ? রাত্রে তাহার একা শুইতে বড় ভয় করে, খালি মনে হয়, কে যেন তাহাকে বাহিরে টানিয়া নিবার জন্য তাহার দৃঢ় ব্যগ্র হাত প্রসারিত করিয়া দিয়াছে। অরুণা প্রথম-প্রথম তাহার কাছে শুইবার জন্য অনুরোধ করিতেন বটে, কিন্তু পূজা-ঘর ছাড়িয়া সে দিনে-রাত্রে কোথাও বাহির হইবে না বলিয়া পণ করিয়াছে, তাহাকে টলায় কাহার সাধ্য। মেঝের উপর বিছানা করিয়া শুইয়া তাহার সহজে ঘুম আসে না ; খোলা জানালা দিয়া বহুদূরের তারাগুলি চোখে পড়ে। ঐ একটি তারার মধ্যেই হয়ত তাহার স্বামীর সস্নেহ সঙ্কেত আছে—এমনি ভাবে সে এই প্রাকৃতিক আকর্ষণের একটা উদার ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু খানিকক্ষণ চাহিতেই তারাগুলি একত্র হইয়া একজনের মুখের মত প্রতিভাত হয়। সেই মুখের প্রত্যেকটি অবয়ব স্পষ্ট হইতে থাক। নমিতা এমন বিভোর হইয়া পড়ে যে, সমস্ত আকাশ ব্যাপিয়া তাহার স্বামীর ইঙ্গিতের একটি কণাও আর কোথাও অবশিষ্ট থাকে না। কখন আবার জ্ঞান হয় ; পরপুরুষের দৃষ্টি হইতে নিজেকে সম্বরণ করিতেছে এমনি ভাবে জানালাটা বন্ধ করিয়া দেয় ; আলো জ্বালাইয়া গীতা পড়িতে বসে। এইবার শুইবার সময় স্বামীর ফটোটা সে পাশে লইয়া শোয়।

উমা ঠাট্টা করিয়া বলে : "তোমার স্বামী-পূজার এত ঘটা দেখে সন্দেহ হয় বৌদি।"

নমিতা প্রশ্ন করে : "কিসের সন্দেহ ?"

—"মনে হয় যে কামনাকে তুমি জয় করছ বলে বিজ্ঞাপন দিচ্ছ সেটাতেই সপ্রমাণ হচ্ছে যে, কামনা তোমার অণুতে-অণুতে।"

নমিতা আঁৎকাইয়া উঠিল : "তার মানে ?"

—"তার মানে স্বামী হারিয়েও তুমি স্বামী চাও। সে-যুগের সাবিত্রী এর চেয়েও কঠিন তপস্যা করেছিল কি না জানি না, কিন্তু যম সত্যবানকে ফিরিয়ে দিয়ে সাবিত্রীর মুখ রেখেছিল ; নইলে স্বামী-বিহনে তার সেই কাঙালপনার লজ্জা সে সইতো কি করে ? তোমার এই বাড়াবাড়ি দেখে মনে হয় পুরুষের সঙ্গ-কামনার ঊর্ধ্বে তুমি আজো ওঠ নি।"

নমিতা প্রতিবাদ করিল : "পুরুষ কি বলছ উমা ? আমার স্বামী দেবতা, ঈশ্বরের প্রতিভূ।"

উমা ঘাড় হেলাইয়া কহিল : "হোক। যে-দেবতার মূর্তি ভাঙে, সেই ভাঙা টুকরো পুজো না করে আরেকটা গোটা মূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেই তার পুজোর অর্থ হয়। যে-মূর্তি তোমার দেশাত্মবোধে হোক, প্রেমে হোক, রোগীসেবায় হোক—প্রতিষ্ঠিত কর। মৃত স্বামী-আরাধনায় নয়। এটা একটা তুচ্ছ আচরণ।"

নমিতা রাগিবার ভান করিল: "অমন ঈশ্বরনিন্দা করো না উমা। স্বামী-পূজা আমার একটা আচরণ মাত্র নয়, আমার ধর্ম। বিরহবোধ মনের একটা পবিত্র প্রসাধন।"

—"ভালো করে ভেবে দেখ সে-বিরহবোধ কি মনের একটা দুর্বলতা নয়?"

—"আমি ভালো করে ভেবে দেখেছি।"

—"আমি হলে কিন্তু ফোটো পাশে না শুইয়ে একটা আস্ত জ্যান্ত লোক পাশে শোয়াতাম। সতীত্বের এমন অপমান করতাম না।"

নমিতা স্নিগ্ধ-কণ্ঠে উত্তর দিয়াছিল: "আমি হয়ত এতদিন তাই করে আসছিলাম।"

দুপুর বেলাটাই তাহার কাছে দুর্বহ হইয়া উঠে। তখন রাস্তায় একটা ফিরিওলার ডাক, একটা মোটরের শব্দ কিম্বা পথচারীদের ছোট ছোট কোলাহল শুনিবার আশায় সে কান পাতিয়া থাকে। কোনো কাজেই মন বসে না, কি কাজই বা সে করিবে? তখন অবাধ্য চিত্ত লঘু একটি প্রজাপতির মত নবীন কুণ্ডু লেইনের বাড়িতে ঘুরিতে থাকে। নিচের তলা ছাড়িয়া উপরে আর উঠিতে চাহে না। সেই অযত্নবিন্যস্ত অপরিষ্কার ছোট ঘরখানিকে সে পরম মমতায় স্পর্শ করে—সেই ছেঁড়া বিছানা, নোংরা মেঝেটা, দেয়াল হইতে চুণ-বালি খসিয়া পড়িয়াছে—কাহারো ভ্রূক্ষেপ নাই। জানালার ও-পিঠে শার্টটা মেলিয়া দিয়াছে, কেহ যদি হাত বাড়াইয়া টানিয়া নেয়, তাহাতে ত ভারি আসিয়া যাইবে! ছেঁড়া হাঁ-করা জুতা জোড়া পর্যন্ত সেলাই করিয়া লইবার নাম নাই। এমনি দুপুরবেলায় আসিয়া ভাত চাহিত। ঘরে যেন তাহার কে আছে, সযত্নে ভাত বাড়িয়া বসিয়া থাকিবে। পাছে স্নান করিতে আসিয়া জল না পায় এই জন্য নমিতা কত দিন চাকরটাকে চৌবাচ্চার জল ছাড়িয়া দিতে চুপি-চুপি বারণ করিয়াছে। তবু যদি তাহার হুঁস থাকিত!

এমনি এক দুপুর বেলায় অস্থির হইয়া নমিতা অবনীবাবুকে আর না বলিয়া পারিল না: "বাবা, আমাকে কোনো একটা ইস্কুলে ভর্তি করে দিন, আমার দিন আর কাটে না।"

অবনীবাবু মায়া করিয়া কহিলেন—"ধর্মের মধ্যে এই ত ভালো পথ পেয়েছ মা, এর চেয়েও ভালো স্কুল কি কিছু আছে?"

নমিতা মাথা হেঁট করিয়া রহিল; অনেক কথা বলিবার ছিল, কিছুই বলিতে পারিল না। আঁচল খুঁটিতে-খুঁটিতে অনেক পরে কহিল—"অন্তঃপুরে লেখা-পড়া শেখবার কোনো বন্দোবস্ত করা যায় না? যেমন সংস্কৃত, ইংরাজি।"

অরুণা বাধা দিলেন : "না, ও-সবে কাজ নেই। দিন না কাটে ঘরের কাজ-কর্মও ত করতে পার। রাত-দিন ধর্ম আমার চোখে ভাল দেখায় না।"

কতটুকু ধর্মাচরণ যে ভালো দেখায় তাহারই হিসাব করিতে-করিতে নমিতা তাহার ঘরে ফিরিয়া আসিল। ঘরের কাজ-কর্ম সে আর কত করিবে? করিবার আছেই বা কি? তবু তাহার অবসরযাপনের ক্লান্তির আর সীমা নাই। এখন দুপুরেও সে স্বামী-পূজা শুরু করিয়াছে।

এতদিনে নির্বাক দেবতা বুঝি কথা কহিলেন। কাল রাতে সুধীকে নমিতা স্বপ্ন দেখিয়াছে—কি বিশ্রী স্বপ্ন। স্বামী তাহাকে বলিতেছেন : "এ-সব তুমি কি ছেলেখেলা করছ নমিতা? আমাকে তুমি এমন করে বেঁধো না।"

যে দিন নমিতা কাকার বাড়ি ছাড়িয়া প্রথম এখানে আসে সেদিনও সুধী স্বপ্নে তাহাকে এই কথা বলিয়াছিল। কিন্তু কাল রাতের স্বর যেন অনেক স্পষ্ট, দৃঢ়।

নমিতা বলিল : "তবে আমি কি নিয়ে থাকবো?"

উত্তর হইয়াছিল : "যে তোমাকে ভালবাসে তাকে নিয়ে।"

—"তুমি আমাকে ভালবাস না?"

—"না।"

কে তবে তাহাকে ভালবাসে এমন একটা প্রশ্ন অপ্রয়োজনীয় জ্ঞানেই নমিতা আর উত্থাপন করে নাই! সে বুঝি মনে-মনে তাহার নাম জানিত। তবু গায়ে পড়িয়া সুধী কহিল—"তোমার প্রদীপকে মনে পড়ে? সে।"

লজ্জায় অরুণবর্ণা উষার মত নমিতা কাঁপিয়া উঠিল। তখন পূর্বদিকে প্রভাত হইতেছে। জাগিয়া উঠিয়া নমিতার ইচ্ছা হইল স্বামীর ফটোটা ছুঁড়িয়া ভাঙিয়া ফেলে।

,

একেবারে নিচেই কেহ পথ আগলাইয়া দাঁড়াইবে প্রদীপ তাহা ভাবে নাই। তাই বসিবার ঘরে অবনীবাবুকে খবরের কাগজে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সে এক মুহূর্ত স্তব্ধ হইয়া রহিল। পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইবার সম্ভাবনা ছিল না। কেন না পাশেই একটা চেয়ারে বসিয়া শচীপ্রসাদ ধীরে-ধীরে টেবিল বাজাইতেছে। নিজের ঠোঁটের উপর তর্জনীটা চাপিয়া ধরিয়া সঙ্কেত করিলে শচীপ্রসাদ ক্ষান্ত হইবে না; বরং দুর্বিনীত ব্যবহার সন্দেহ করিয়া হয়ত এমন ভাবে সম্বর্ধনা করিবে যে, অবনীবাবু তাঁহার তন্ময়তা ভুলিয়া তৎক্ষণাৎ প্রদীপের জামার গলাটা চাপিয়া ধরিবেন। কিন্তু উপরে গিয়া নমিতার সঙ্গে তাহার দেখা না করিলেই নয়—দেখা

তাহাকে করিতেই হইবে। চুরি করিয়া আসিতে তাহার লজ্জা ছিল না, কিন্তু গভীর রাত্রিতে আসিলে দরজা সে খোলা পাইত না নিশ্চয়ই—পাঁচিল ডিঙাইয়া সে তাহার সাহসকে দুর্ধর্ষ করিতে গিয়া হাস্যাস্পদ করিতে চায় না। বেশ ত, অবনীবাবু জানুন, ক্ষতি নাই! নমিতার মুখোমুখি দাঁড়াইয়া সে বোঝা-পড়া করিবেই। কোন বাধাই আজ আর যথেষ্ট নয়।

শচীপ্রসাদই আগে কথা কহিল—"কি মনে করে?"

অবনীবাবু খবরের কাগজ হইতে মুখ তুলিলেন। সামনেই প্রদীপকে দেখিয়া এক নিমেষে তাঁহার মুখ গম্ভীর ও কুটিল হইয়া উঠিল। চোখ দুইটা বাঁকাইয়া তিনি তাহার আপাদমস্তক দেখিয়া লইলেন—সমস্ত অবয়বে স্বাভাবিক ভদ্রতার লেশমাত্র লালিত্যও তাঁহার চোখে পড়িল না। শীর্ণ কঠোর দেহটায় যেন একটা নিষ্ঠুর রুক্ষতা গাঢ় হইয়া আছে—কোথাও এতটুকু বিনয়নম্র কোমলতা নাই। চোখ দুইটা রাঙা কপালের রেখায় কুটিল একটা ষড়যন্ত্র, সমস্ত মুখের ভাবে গূঢ় একটা ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতা! চেহারাটা অবনীবাবুর একটুও ভাল লাগিল না। অমন একটা দৃঢ় স্থিরসঙ্কল্প মূর্তি দেখিয়া তিনি প্রথমে একটু ঘাবড়াইয়া গেলেন। কহিলেন—"অনেক দিন পরে যে! এখানে?"

শেষের প্রশ্নটার হয়ত এই-ই অর্থ ছিল যে, সেদিন অমন অপমানিত হইবার পর আবার কোন্ প্রয়োজনে মুখ দেখাইতেছে? প্রদীপ ঠোঁট দুইটা চাপিয়া ধরিয়া একটু হাসিল—সে-হাসি তলোয়ারের চেয়েও ধারালো। সে-সঙ্কেতকে স্পষ্ট করিবার জন্য কথা বলিতে হয় না।

প্রদীপ একটিও কথা না বলিয়া বাড়ির ভিতরের দরজার দিকে অগ্রসর হইল।

অবনীবাবু বিরক্ত হইয়া কহিলেন—"ওদিকে কোথায় যাচ্ছ?"

প্রদীপ স্পষ্ট, সংযত স্বরে কহিল—"নমিতার সঙ্গে আমার দরকার আছে।"

ইলেক্‌ট্রিক শক পাইয়া অবনীবাবু চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিলেন: "নমিতার সঙ্গে দরকার? তার মানে?"

প্রদীপ কহিল—"মানে বলতে গিয়ে আমি অকারণে সময় নষ্ট করতে চাই না। আমার কাজ আছে। ভীষণ দরকার! আমাকে যেতেই হবে ওপরে।"

অবনীবাবু তাড়াতাড়ি আগাইয়া প্রদীপের পথরোধ করিলেন; শচীপ্রসাদও তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। অবনীবাবু তাঁহার দুই বলিষ্ঠ হাতে প্রদীপের কাঁধ দুইটায় ঝাঁকানি দিয়া বলিলেন—"জান, এটা ভদ্রলোকের বাড়ি? তোমার এ-বেয়াদবিকে আমরা সহ্য করবো না, জান?"

এই সামান্য দৈহিক অত্যাচারে প্রদীপ ধৈর্য হারাইল না। এত অনায়াসে তাহার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিতে দিতে নাই। সে বিদ্রোহী বটে, কিন্তু কৌশলীও। তাই সে স্বচ্ছ অথচ উজ্জ্বল হাসিতে মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া কহিল—"সব জানি। কিন্তু তবুও আমার দেখা না করলেই নয়।"

শচীপ্রসাদ বর্বরের মত খেঁকাইয়া উঠিল : "এ তোমার কোন্ দেশী ভদ্রতা ?"

প্রদীপের মুখে সেই হাসি : "আমরা যে-দেশ সৃষ্টি করতে যাচ্ছি, সেই দেশের। আপনি তা বুঝবেন না।"

পরে কাঁধের উপর অবনীবাবুর আঙুলগুলিতে একটু চাপ দিয়া সে কহিল—"ছাড়ুন, আমার সত্যিই দেরী করবার সময় নেই।"

অবনীবাবু বজ্রের মত হাঁকিয়া উঠিলেন : "না।"

বলিয়া বাঘের থাবার মতো দুই হাতে জোর করিয়া তাহাকে সামনের সোফাটার উপর বসাইয়া দিলেন। প্রদীপ নেহাৎই মাধ্যাকর্ষণের শক্তিতে বিনা প্রতিরোধে সোফার উপরে ধুপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল।

অবনীবাবু তীক্ষ্ণস্বরে কহিলেন—"নমিতার সঙ্গে তোমার কী দরকার ?"

প্রদীপ কহিল—"সে-কথা আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে আসি নি। সেটা গোপনীয়।"

—"গোপনীয় ! তোমার এতদূর আস্পর্ধা ? একজন অন্তঃপুরিকা হিন্দু-কুল-বধূর সঙ্গে তোমার কী দরকার হতে পারে ?"

প্রদীপ হাসিয়া কহিল—"অন্তঃপুরিকা হিন্দু-কুল-বধূ বলেই বেশি দরকার। সে ত আর বাইরে বেরোয় না যে, তাকে গড়ের মাঠে নিয়ে গিয়ে পরামর্শ করব। সে নেহাৎই বন্দিনী, তাই দরকারী কথা সেরে নেবার জন্যে আমাকে এখানে আসতে হয়েছে। এখানে ছাড়া আর ত তার দেখা পাওয়া যাবে না।"

অবনীবাবু বাহিরের দরজার দিকে আঙুল দেখাইয়া কহিলেন—"তুমি আমার বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে কি না বল।"

মাথার চুলগুলিতে হাত বুলাইতে বুলাইতে পরম উদাসীনের মতো প্রদীপ বলিল—"যেতে বললেই সহজে চলে যাওয়া যায় না। ওপরে যাবার যেমন বাধা আছে, তেমনি বাইরেও।"

অবনীবাবু আরো রুখিয়া উঠিলেন : "না। তুমি যাও বেরিয়ে। এক্ষুণি।"

তেমনি নির্বিকার শান্তস্বরে প্রদীপ বলিল—"এক কথা কত বার করে বলব ! আরো স্পষ্ট উত্তর চান নাকি ? আমি যাব না, অর্থাৎ নমিতার সঙ্গে দেখা আমাকে

করতেই হবে। যদি বাধা পাই, সে-বাধা স্বীকার করে পরাস্ত হয়ে ফিরে গেলে আমার লজ্জার সীমা থাকবে না। বেশ ত, তাকেই এখানে ডাকুন। কিম্বা যদি চান, তাকেও রাস্তায় বার করে দিতে পারেন। আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই।"

অবনীবাবু গর্জিয়া উঠিলেন: "জান, তোমাকে এক্ষুণি পুলিশে ধরিয়ে দিতে পারি?"

—"জানি বৈকি। কিন্তু দয়া করে ওটি করবেন না। সামান্য নারী-হরণের অভিযোগে পুলিশের হাতে আত্মসমর্পণের ইচ্ছে নেই। কিন্তু বৃথা বাক্‌বিতণ্ডা করে লাভ কি? যদি বলেন, আমিই না-হয় এখানে নমিতাকে ডাকি। বলিয়া প্রদীপ তাড়াতাড়ি দরজার কাছে গিয়া গলা চড়াইল: "নমিতা! নমিতা!"

অবনীবাবু কহিলেন—"তুমি যাও ত শচীপ্রসাদ! শিগ্‌গির। মোড়ের থেকে একটা পাহারাওয়ালা ডেকে নিয়ে এস ত!"

শচীপ্রসাদ বুক ফুলাইয়া সেনাপতির ভঙ্গীতে তর্জনী হেলাইয়া কহিল—"যান শিগ্‌গির এখান থেকে। নইলে আপনার মতো দু'দশটাকে আমি ঘুষি মেরে সমান করে দিতে পারি।"

একটা হাই তুলিয়া প্রদীপ কহিল—"আর সমান করে কাজ নেই ভাই। মোড়ের থেকে পাহারাওয়ালা ধরে নিয়ে এস গে! (অবনীবাবুর প্রতি) আপনাদের বাড়িতে ত ফোন আছে। থানায় একটা খবর পাঠিয়ে দিন না। লরি-বোঝাই সেপাই এসে যাবে'খন। আমার পালাবার আর পথ থাকবে না। ততক্ষণে নমিতার সঙ্গে দরকারি কথাটা ধীরে-সুস্থে সেরে নেওয়া যাবে।" আড়মোড়া ভাঙিয়া জড়াইয়া-জড়াইয়া কহিল—"কাল সারা রাত্রি আর ঘুম হয় নি। নমিতার অধঃপতনে সমস্ত আকাশ মাটিতে মূর্ছিত হয়ে পড়েছে।"

অবনীবাবু ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন: "কি, কি? নমিতার কি হয়েছে বললে?"

—"পাহারাওয়ালা আগে ডাকুন। বলছি।"

শচীপ্রসাদ দিব্যি একটা ঘুষি পাকাইয়া প্রদীপের মুখের কাছে আগাইয়া আসিল। কহিল—"আবার কথা কইবে ত বত্রিশটা দাঁত গুঁড়ো করে ফেলব।"

প্রদীপ ইচ্ছা করিলে অনেক কিছুই করিতে পারিত হয়ত। কিন্তু শচীপ্রসাদের উদ্ধত ঘুষিকে স্বচ্ছন্দে এড়াইয়া আবার সোফাটায় আসিয়া নির্লিপ্তের মত বসিয়া পড়িল। বলিল—"বেশ, আপনাদের সঙ্গে কথা আমি নাই-বা কইলাম। অধিক বীরত্ব প্রকাশ করলে আমি যে গান্ধী হয়ে বসে থাকব এটা আশা করবেন না। তার

চেয়ে থানায় একটা খবর দিন। দাঁত গুঁড়ো করে লাভ নেই, বাজারে কিনতে পাব, বুঝলেন?"

অবনীবাবু সেই হইতে দরজা আগলাইয়া দাঁড়াইয়া আছেন; তিনি কহিলেন—"তুমি ত ভদ্রলোক, কিন্তু অপমানবোধ বলে কিছুই তোমার নেই নাকি?"

—"আমরা আজো ততটা মহৎ হতে শিখি নি। অপমানিত হয়ে পিঠ দেখানোটাই অপমান, অপমানকে শাসন করাটাই আমাদের ধর্ম।"

অবনীবাবু কহিলেন—"আচ্ছা, দাঁড়াও। তাহলে শচীপ্রসাদ, ডাক ত চাকর দু'টোকে।"

প্রদীপ হাসিয়া কহিল—"কেন পাহারাওয়ালা কি হ'ল? দেরি হয়ে যাবে বুঝি? বাঃ, আমি ত আর পালাচ্ছিলাম না। আচ্ছা, ডাকুন। ক'টা চাকর? দুটো? এই ছোট সংসারে দু'টো চাকর লাগে?"

—"কিসের চাকর?" বলিয়া শচীপ্রসাদ বাঁ-হাতের মুঠিতে প্রদীপের চুলগুলি চাপিয়া ধরিয়া কহিল—"তুমি উঠবে কি না বল; নইলে—"

আবার সে ঘুষি তুলিল।

এমন সময় ভেতরের দরজা দিয়া দ্রুতপদে উমা আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। প্রদীপের কণ্ঠে নমিতার ডাক তাহার কানে গিয়াছিল বুঝি। কিন্তু ঘরে আসিয়া এমন একটা অভাবনীয় দৃশ্য দেখিয়া সে নিমেষে কাঠ হইয়া গেল। শচীপ্রসাদ প্রদীপের চুলের ঝুঁটি ধরিয়া ঘুষি মারিতে উদ্যত, বাবা রাগে গম্ভীর, স্তম্ভিত হইয়া রহিয়াছেন—আর সোফায় বসিয়া উদাসীন প্রদীপ অলস-স্বরে বলিতেছে: "দাঁত ভাঙলে আবার দাঁত পাব, কিন্তু আপনার চশমার ওপর যদি একটা ঘুষি মারি, তবে সমস্ত পৃথিবীর বিনিময়েও চোখ আর ফিরে পাবেন না। হ্যাঁ, দাঁতের চেয়ে চোখটাই বেশি প্রয়োজনীয়। বেশ, ভালো হয়ে বসছি। মারুন।" বলিয়া সে দুই পাটি পরিষ্কার দাঁত বাহির করিয়া ধরিল।

ব্যাপারটা উমা কিছুই বুঝিতে পারিল না। কি এমন হইতে পারে যে শচীপ্রসাদ পর্যন্ত প্রদীপের মুখের উপর ঘুষি বাগাইয়াছে, আর অবনীবাবু তাহারই প্রয়োগনৈপুণ্য নিরীক্ষণ করিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। একটি দোদুল্যমান মুহূর্তমাত্র। উমা তাড়াতাড়ি প্রদীপের সামনে আসিয়া পড়িল। বলিল—"এ কী!"

প্রদীপ হাসিয়া কহিল—"শচীপ্রসাদকে বিয়ে কোরো না উমা! দেখেছ, চুলের ঝুঁটি কেমন শক্ত করে আঁকড়ে ধরেছে! শিগ্‌গির ওর পেটে সুড়সুড়ি দাও। নইলে চুল ও কিছুতেই ছাড়বে না।"

উমা শচীপ্রসাদের হাত ছাড়াইয়া দিয়া কহিল—"আপনার এ কী দুঃসাহস! দীপদা'র গায়ে হাত তোলেন!"

অবনীবাবু স্থান পরিবর্তন করিয়া কহিলেন—"তুই সব তাতে সর্দারি করতে আসিস কেন? যা ভেতরে। ঐ গোঁয়ার ইতরটাকে সায়েস্তা আমরা করবই।"

বার-কতক ইতস্তত চাহিয়া উমা কহিল—"কেন, কি হয়েছে?"

—"সে অনেক কথা।" প্রদীপ সোফাটার উপর একটু সরিয়া বসিয়া কহিল—"বোস আমার পাশে। এবার শচীপ্রসাদ পাহারাওয়ালা ডাকতে যাবেন। পাহারাওয়ালা আসুক। সব শুনতে পাবে।"

সত্য-সত্যই উমা প্রদীপের পাশে সোফায় বসিল। যেন ইহার মধ্যে এতটুকু দ্বিধা করিবার ছিল না। এই সান্নিধ্যের মধ্যে কোথাও জড়তা নাই, না বা ম্লানিমা—যেন পরিচয়-প্রকাশের সামান্য একটি প্রচলিত রীতি মাত্র। কিন্তু অবনীবাবু অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। এইবার শাসনের অত্যাচারে উমাকেই নির্জিত হইতে হইল। প্রদীপ কয়েক মিনিটের জন্য স্বস্তির নিশ্বাস ফেলুক।

অবনীবাবু কহিলেন—"ওঠ্ এখান থেকে। এই বেহায়াটার পাশে বস্‌লি যে!"

শচীপ্রসাদ বলিল—"ওর ছায়া মাড়ালেও অশুচি হতে হয়। ওঠ।"

উমা বিস্ময়ে একেবারে নির্বাক হইয়া গেল। বলিল—"কেন, কি হয়েছে? সেদিনও ত বাস-এ পাশাপাশি বসে এলাম। অশুচি হব? পরে গঙ্গাস্নান করব'খন শচীপ্রসাদবাবু।"

—"ফের মুখে-মুখে তর্ক? ওঠ্ বলছি। অবাধ্য কোথাকার!" বলিয়া অবনীবাবু আগাইয়া আসিয়া মেয়ের হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিলেন।

মুহূর্তের মধ্যে কী যে হইয়া গেল কেহই স্পষ্ট অনুধাবন করিতে পারিল না।

—"আপনারা খানিকক্ষণ তর্ক করুন, আমি এই ফাঁকে নমিতার সঙ্গে কথাটা সেরে আসি।" বলিয়া পলক ফেলিতে না ফেলিতেই প্রদীপ ভিতরের খোলা অরক্ষিত দরজা দিয়া ছুটিয়া বাহির হইল। সামনেই সিঁড়ি। সিঁড়িগুলি লাফাইয়া পার হইতে হইতে সে কহিল—"তাড়াতাড়ি পাহারাওয়ালা ডেকে নিয়ে আসুন শচীপ্রসাদবাবু! আমি নমিতাকে লুট করে নিয়ে যেতে এসেছি।"—কথাটা এইবারে একেবারে উপর হইতে আসিল: "লুণ্ঠনের সময়ে একটা সঙ্ঘর্ষ না বাধলে কোনোই মাধুর্য থাকে না।"

কয়েক মুহূর্তের জন্য সকলেই একেবারে হিম, নিস্পন্দ হইয়া রহিল। সচেতন হইয়া শচীপ্রসাদ পশ্চাদ্ধাবন করিতে যাইতেছিল, অবনীবাবু বাধা দিলেন: "ঐ গুণ্ডাটার

সঙ্গে তুমি একা পারবে না। তা ছাড়া বাড়ির মধ্যে একটা কেলেঙ্কারি হওয়াটা ঠিক নয়।"

শচীপ্রসাদ কহিল—"কিন্তু ঐ স্কাউণ্ড্রেলটাকে unscathed ছেড়ে দেবেন নাকি?"

অবনীবাবু একটু পায়চারি করিয়া কহিলেন—"দেখি। ও ভীষণ বোম্বেটে, শচী! নিজের প্রাণের পরেও ওর একবিন্দু মমতা নেই। ওর সঙ্গে 'পেরে উঠবে না। তুমি যখন ওর চুল টেনে ধরেছিলে তখন ভয়ে জিভ আমার পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে গেছল।"

উমা কহিল—"আপনার চৌদ্দ পুরুষের ভাগ্য যে দীপদা'র চুলের বিনিময়ে মুণ্ডুটা আপনাকে দিতে হয় নি।"

শচীপ্রসাদ বিরক্ত হইয়া কহিল—"তবে ঘরে-বাইরে আপনি মুখ বুজে এ-সব ডাকাত বোম্বেটের অত্যাচার সইবেন নাকি? কিছুই এর বিহিত করবেন না? আইন-আদালত নেই?"

—"আছে। তবে যে লোক সব অত্যাচার হাসিমুখে সইতে প্রস্তুত, তার সঙ্গে পেরে ওঠা সহজ নয়। যত নষ্টের গোড়া ঐ বৌটা। তুই যা ত উমা, বৌমার সঙ্গে ঐ হতচ্ছাড়াটার কি-না-কি দরকারি কথা আছে। ওকে পাশের বাড়ি নিয়ে যা ত লক্ষ্মী। বুঝলি, আবার যেন কিছু মনে না করে। পরে আমি থানায় গিয়ে একটা ট্রেস্‌পাসের এজাহার দিয়ে আসব।"

উমা এইবার কিছু বুঝিতে পারিয়াছে। তাড়াতাড়ি উপরে আসিয়া দেখিল, প্রদীপ বারান্দায় দাঁড়াইয়া একটা ঘরের বন্ধ দরজার ফাঁকে উঁকি দিতেছে। উমা হাসিয়া কহিল—"এটা নিরিমিষ্যি রান্নার ঘর। দুপুর বারোটার আগে এর উনুনে আগুন দেওয়া হয় না। দেখছেন না বাইরে থেকে তালা-বন্ধ আছে?"

প্রদীপ দেখিল। কহিল—"নমিতা তাহলে কোন্ ঘরে?"

দক্ষিণের দিকে আঙুল দেখাইয়া উমা বলিল—"ঐ যে। আসুন আমার সঙ্গে। বৌদি এখন পূজোয় বসেছেন। পূজোয় বসলে কারু সঙ্গে আবার কথা কন না। টুঁ-টি পর্যন্ত না। প্রায় দু' ঘণ্টা।"

প্রদীপ হাসিয়া কহিল—"দু' ঘণ্টা! বল কি? আমি কি দু' ঘণ্টা দাঁড়িয়ে তার এই নির্লজ্জ মৌনব্রতের তারিফ করব নাকি? আমার দু' সেকেণ্ডও সইবে না। চল।"

উমা অবাক হইয়া প্রদীপের মুখের দিকে চাহিল। তাহার মুখের সেই সৌম্য উদারস্নিগ্ধতা কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে, চক্ষু দুইটা অনিদ্রায় তপ্ত, শাণিত—সমস্ত দেহ ঘিরিয়া এমন একটা রুদ্র রুক্ষতা যে, উমার মনটা দুরু-দুরু করিয়া উঠিল। প্রদীপ

কহিল—"নীচে একবার যাবে উমা? দেখ ত ওরা সত্যি সত্যি পাহারাওয়ালা ডেকে আনল কিনা।"

উমা বোধ হয় এই ইঙ্গিতটুকু বুঝিল। তাহার কথার সুরে সুগোপন একটি অভিমান: "যাচ্ছি। কিন্তু বৌদি যে দরজা ভেজিয়ে দিয়েছেন। তাঁর ধ্যান ভাঙানো চলবে না দীপদা। একদিন সামান্য একখানা চিঠি দরজার ফাঁক দিয়ে ফেলে দিয়েছিলাম বলে আমার অপ্রস্তুতের আর শেষ রইলো না। বৌদি সারাদিন খেলেন না, চান করলেন না—সমস্তক্ষণ কেঁদে-কেঁদে ঘর-দোর ভাসিয়ে দিতে লাগলেন। লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছিল। তাঁর ওপর এখন আর উপদ্রব না-ই করলাম আমরা। চলুন আমার ঘরে, আমাকে রাসেল পড়াবেন। খানিক বাদে আমি এসে খোঁজ নিয়ে যাব।"

নমিতার ঘরের সম্মুখে তখন তাহারা আসিয়া পড়িয়াছে। দরজাটা ভেতর থেকে ভেজানো—নিঃশব্দ নিশ্বাসহীন। প্রদীপ কহিল—"উপদ্রবই চাই উমা। ভালবেসে নয়, উপদ্রব করেই জড় অচল প্রস্তরকে দ্রব করা চাই। তোমার সেদিনকার উপদ্রবে সে উপোস করেছে, আজকে না-হয় আত্মহত্যা করবে। তবু সে কিছু একটা করুক।"

বলিয়া উমার কোনো উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই প্রদীপ হাত দিয়া ঠেলা মারিয়া দরজা খুলিয়া দিল। ধ্যানাসীনা তন্ময়ী নমিতা একবার চমকিয়া উঠিল, কিন্তু চোখ মেলিল না—সুকুমার মুখের উপর কোথা হইতে একটা অসহিষ্ণু অথচ অটল দৃঢ়তার তেজ ফুটিয়া উঠিল! দরজা খুলিয়া ফেলিয়া প্রদীপ এ কী দেখিতেছে! কয়েক মুহূর্তের জন্য সে পাথর হইয়া রহিল। নমিতা সদ্য-স্নান করিয়া পুজায় বসিয়াছে, সামনের দেয়ালে তাহার স্বামীর ফোটোটা হেলানো—চন্দনলিপ্ত, মাল্যবিভুষিত। বাঁ পাশে পিতলের পিলসুজে একটা প্রদীপ, ধুপতিতে ধুনা জ্বলিতেছে—সমস্ত ঘরটি আচ্ছন্ন করিয়া একটি সুগভীর বৈরাগ্যের শীতল পবিত্রতা। নমিতার মাথায় ঘোমটা নাই, ভিজা চুলগুলি পিঠের উপর দিয়া নামিয়া আসিয়া মেঝেটা স্পর্শ করিয়াছে—গায়ে বাহুল্যবস্ত্র নাই, একখানি নরম গরদের থান শাড়ি অযত্নে ন্যস্ত হইয়াছে। সর্বাঙ্গে পদ্মাভা, অমৃতগন্ধ। বসিবার সহিষ্ণু ভঙ্গিটিতে কি কঠোর সুষমা, অগ্নিশিখার মত শীর্ণ ও ঋজু শরীরে ব্রাহ্মমুহূর্তের আকাশ-শ্রী। প্রদীপ যেন তাহার চর্মচক্ষুতে পুরাণবর্ণিতা তপস্বিনী শকুন্তলাকে দেখিতেছে—আদিম কবিতায় যে বিরহিণীর মূর্তিকল্পনা হইয়াছিল, সেই শরীরী কল্পনা! তপস্যা-পরীক্ষিত প্রেম! এই মূর্তিকে সে স্পর্শ করিবে।

প্রদীপ কি করিয়া বসে তাহারই প্রতীক্ষায় উমা ঘামিয়া উঠিল। কানে-কানে বৌদিকে সংবাদটা দিবে কি না তাহাই সে বিবেচনা করিতেছিল। ভাবিয়াছিল এমন একটা সমাহিত ধ্যানলীন আননাভাসের প্রভাবে সে তাহার সমস্ত বিদ্রোহভাব দমন করিয়া তাহারই ঘরে আসিয়া উত্তীর্ণ হইবে। কিন্তু বৃথা। প্রদীপ নমিতার মাথায় একটা ঠেলা মারিয়া দীপ্তকণ্ঠে কহিল—"এ-সব কী করেছ নমিতা?"

নমিতা জ্বালাময় চক্ষু মেলিয়া যাহা দেখিল তাহাতে ভয়ে তাহার আকণ্ঠ শুকাইয়া গেল। কিন্তু আজ আর সে এই অনধিকার অত্যাচারের প্রশ্রয় দিতে পারিবে না। উদ্যত শাসনের ফণা তুলিয়া সে কহিল—"আমার পূজোর ঘরে না বলে কয়ে জুতো-পায়ে হঠাৎ ঢুকে পড়লেন যে! ওঁকে কী বলে তুমি এখানে নিয়ে এলে, ঠাকুরঝি! জান না, এটা আমার পূজোর সময়?"

ফোটোটার সামনে নমিতা আবার একটা ঘট রাখিয়াছে—তাহার উপর আম্রপল্লবটি পর্যন্ত অম্লান। কোনো আয়োজনেরই ত্রুটি ঘটে নাই। প্রদীপ জুতা দিয়া সেই ঘটকে লাথি মারিয়া উল্টাইয়া ফেলিল: "কিসের তোমার পূজো? এই ভণ্ডামি তোমাকে শেখালে কে?"

উমা ভয়ে একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া উঠিল—জলে সমস্ত মেঝে ভাসিয়া গিয়াছে। নমিতা খানিকক্ষণ নিষ্পলক চোখে প্রদীপের এই হিংস্র বীভৎস মুখের দিকে নির্বাক হইয়া চাহিয়া রহিল। সে-চোখে সৌজন্যের স্বাভাবিক সঙ্কোচ নাই, উগ্রতেজ তাপসীর নির্দয় নির্লজ্জতা! সহসা সে সমস্ত শূন্য বিদীর্ণ করিয়া চেঁচাইয়া উঠিল: "কেন আপনি আমার ঘট ভাঙলেন? আপনার কী আস্পর্ধা যে ভদ্রমহিলার অন্তঃপুরে ঢুকে এই দস্যুতা করবেন? যাও ত ঠাকুরঝি, বাবাকে শিগ্‌গির ডেকে নিয়ে এস।"

প্রদীপ হাসিয়া কহিল—"সে-পার্টের মহলা নিচে একবার দিয়ে এসেছি। পুনরভিনয় হবে, হোক। যাও উমা, ডেকে আন। কিন্তু তোমার এই জঘন্য অধঃপতনের কারণ কি?"

উমা নিশ্বাস বন্ধ করিয়া এক পাশে ম্লান হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। না পারিল বাহির হইয়া যাইতে, না বা আসিল একটি অস্পষ্ট প্রতিবাদ।

—"অধঃপতন?" নমিতা আসন ফেলিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। সুদূর তিমিরাকাশে নীহারিকার দিগ্‌বর্তিকার মত: "সে-কৈফিয়ৎ আমি আপনাকে দিতে যাব কেন? কে আপনি?"

—"আমি? অশুদ্ধ ভাষায় তোমারই কথার পুনরুক্তি করি—আমি ডাকাত।"

—"কিন্তু আমার উপর এই উৎপাত করবার অধিকার আপনাকে কে দিয়েছে ?"

—"অধিকার কেউ কাউকে দেয় না নমিতা। তাও অধিকার করতে হয়।"

—"সে-অধিকার কেড়ে নেবার ক্ষমতা আপনার আজো হয় নি।" কণ্ঠস্বর আরও তীক্ষ্ণ করিয়া সে কহিল—"আমি আমি-ই। তার থেকে একচুল আমি ভ্রষ্ট হব না।"

প্রদীপ বিহ্বল হইয়া কহিল—"তোমাকে ধন্যবাদ নমিতা। কিন্তু তুমি সত্যিই তুমি নও। তুমি সংস্কারশাসিতা, অন্ধ-প্রথার একটা প্রাণহীন স্তূপমাত্র। নইলে এই সব অপদার্থ উপচার নিয়ে দেবতার পূজো করতে বসেছ ?" বলিয়া উল্টানো ঘটটাকে আবার একটা লাথি মারিয়া সে দূরে দেয়ালের গায়ে ছিটকাইয়া মারিল।

নমিতা কি করিবে কিছুই ভাবিয়া পাইল না। অনুপায় মিনতিতে সে প্রার্থনা করিল —"দয়া করে আপনি এ-ঘর থেকে চলে গেলে বাধিত হব। আমাকে অযথা পীড়ন করে লাভ নেই।"

—"আমি এ-ঘর থেকে চলে যাবার জন্যেই আসি নি। পীড়ন করে লাভ নেই বটে, কিন্তু পীড়িত হওয়াতে লাভ আছে।"

নমিতা আবার চেঁচাইয়া উঠিল : "তুমি বাবাকে ডেকে নিয়ে এলে না ঠাকুরঝি ? আমি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে এই অপমান সইবো নাকি ?"

উমা তবু নড়িল না। নমিতা সাময়িক বিমূঢ়তা বিসর্জন দিয়া বলিয়া উঠিল : "তবে আমিই যাচ্ছি নিচে।"

নমিতা যখন দুয়ারের কাছে আসিয়া পড়িয়াছে, প্রদীপ তৎক্ষণাৎ তাহার দুই বাহু বিস্তার করিয়া গাঢ়স্বরে কহিল—"তুমি এই ব্যূহে প্রবেশ করবারই পথ জানতে, বেরোবার কৌশল এখনো শেখ নি। দাঁড়াও।"

বিদ্যুৎবিকাশের মত একটি ক্ষীণ মুহূর্তে দুইজনের স্পর্শ ঘটিয়াছিল। নমিতা আহত হইয়া সরিয়া গেল। প্রদীপের মনে হইল সে যেন হাতের মুঠোয় ক্ষণকালের জন্য মৃত্যুকে ছুঁইতে পাইয়াছে। তাহার অমৃতস্বাদে সে স্নান করিয়া উঠিল।

নমিতা একেবারে ছেলেমানুষের মত আর্তনাদ করিয়া উঠিল।

অবনীবাবুকে আর ডাকিয়া আনিতে হইল না। পেছনে শচীপ্রসাদও হাজির। দুয়ারের কাছে তাদের দেখা পাইতেই নমিতা কাঁদিয়া ফেলিল : "দেখুন এসে, ইনি আমার পূজার ঘরে ঢুকে কী-সব উৎপাত শুরু করেছেন! আমার ঘট উল্টে দিয়েছেন, আর মুখে যা আসে তাই বলে আমাকে অপমান করছেন। আমি যত না বলছি—"

—"নিশ্চয় নমিতা। এ তোমার অপমান নয়, আশীর্বাণী! কিসের জন্য তোমার এই

তুচ্ছ পূজা ? এই মালা কার গলায় দিচ্ছ ?" বলিয়া সুধী-র ফোটোর গলায় ঝুলানো মালাটা টানিয়া সে টুকরা টুকরা করিয়া দিল : "কিসের এই ধূপধুনো ? দিনের বেলায় কেন আবার আলো জ্বেলেছ ? আকাশে চেয়ে সূর্য দেখতে পাচ্ছ না ?" বলিয়া প্রদীপ লাথি মারিয়া-মারিয়া পিলসুজ ধূপতি সব উল্টাইয়া দিতে লাগিল।

নমিতা রাগে অপমানে থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। তাহার আর সহিল না ; তাহার মুখ রক্তপ্রাচুর্যে একেবারে আগুন হইয়া উঠিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি মেঝে হইতে ঘটটা কুড়াইয়া আনিয়া প্রদীপের মাথা লক্ষ্য করিয়া সজোরে ছুঁড়িয়া মারিল। হয়ত সতী বলিয়াই তাহার সে-লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইল না। প্রদীপের ডান ভুরুর উপরে কপাল ফাটিয়া আনন্দাশ্রুর মত রক্ত ঝরিতে লাগিল।

প্রদীপ যেন এতক্ষণ ধরিয়া এই আঘাতটিকেই কামনা করিতেছিল। নমিতার পরিপূর্ণ পাণ্ডুর ওষ্ঠাধরেও এমন মাদকতা নাই। সে অন্তরের গভীর সুরে কহিল— "তোমাকে নমস্কার নমিতা। কিন্তু তোমার এই তেজ এই বিদ্রোহ সমস্ত পুরুষজাতির অত্যাচারের বিরুদ্ধে, আত্মঘাতী প্রথার বিরুদ্ধে, অভিমানী সমাজের বিরুদ্ধে। তোমার তেজের এই বলিষ্ঠ উলঙ্গ উজ্জ্বলতা সমস্ত পৃথিবীকে দগ্ধ করুক। আর পাহারওয়ালা ডেকে কাজ নেই শচীপ্রসাদবাবু।"

অবনীবাবু কহিলেন—"তোমার শাসন এখনো যথেষ্ট হয় নি। ভাল চাও ত এখনো বিদায় হও বলছি।"

—"যাচ্ছি, কিন্তু অভিনয়ের শেষ অঙ্ক এখনো বাকি আছে।"

—"না, নেই।" বলিয়া অবনীবাবু হঠাৎ তাহার ঘাড় ধরিয়া ফেলিলেন।

প্রদীপ সামান্য একটু হাসিল : "সামান্য ঘাড়-ধরা থেকে ছাড়া পাবার জন্য যুযুৎসুর সোজা প্যাঁচ আমার শেখা আছে। আপনি মাননীয় গুরুজন, আপনাকে ভূপতিত করে অপদস্থ করলে আমার মন খুশি হবে না।"

ভয়ে-ভয়ে অবনীবাবু হাতের মুষ্টি শিথিল করিয়া দিলেন। শচীপ্রসাদ বলিয়া গেল : "আমি দিচ্ছি ফোন করে।"

প্রদীপ শান্তস্বরে কহিল—"পুলিশ আসবার আগেই শেষ অঙ্ক শেষ করে ফেলি নমিতা। তুমি প্রস্তুত হও। তেমন কিছু ভয়ের কারণ নেই। আঘাতের পরিবর্তে স্নেহ নিতে হবে এ-শিক্ষা আমার নতুন লাভ করেছি এ-যুগে। তোমাকে আমি ভালবাসি। কথাটার যদি কিছু অর্থ থাকে, তবে তার উচ্চারণেই আছে, অলস অনুভূতিতে তার প্রমাণ নেই। এ-ভালবাসা তোমাকে জ্যোৎস্নালোকে শোনাবার মত নয়, স্পষ্ট দিনের আলোয় সমস্ত সমাজের মুখের ওপর প্রখর ভাষায়

বলবার মত। তুমি ভারতবর্ষের প্রতিমা কি না জানি না, কিন্তু আমার আত্মার সহোদরা।”

উমা দেয়ালের দিকে পিঠ করিয়া একেবারে পাংশু হইয়া গিয়াছে। নমিতা তখনো ভয়ে উদ্বেগে থম থম করিতেছে—গায়ের বসন তাহার সুসন্নিবেশিত নাই, শ্বশুরকে দেখিয়াও সে মাথায় ঘোমটা তুলিয়া দিল না—সে হতচেতন, বিমূঢ়, স্পন্দহীন। প্রদীপকে তাহারই সম্মুখে অগ্রসর হইতে দেখিয়া সে ভয়ে এতটুকু হইয়া গেল। এমন অবশ্যম্ভাবী মুহূর্তে অবনীবাবু পর্যন্ত তাহাকে বাধা দিতে পারিলেন না।

“যে-রক্ত আমার গৌরবের চিহ্ন হল তাই তোমার কলঙ্ক হোক নমিতা।” বলিয়া দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য প্রদীপ দুই বাহুর মধ্যে হঠাৎ নমিতাকে বেষ্টন করিয়া ধরিল। ঠিক চুম্বন করিল কি না বোঝা গেল না, আলিঙ্গনচ্যুতা হইয়া নমিতা সরিয়া গেলে দেখা গেল প্রদীপেরই কপালের রক্তে তাহার মুখ, বুক একেবারে ভরিয়া গিয়াছে। অস্বাভাবিক উত্তেজনার প্রাবল্য নমিতা আর সহিতে পারিল না, মুহ্যমান অবস্থায় মেঝের উপর বসিয়া পড়িল।

প্রদীপ দুয়ারের দিকে হটিয়া আসিয়া কহিল—“হয়ত এ-জীবনে আর দেখা হবে না নমিতা। কিন্তু সংসারে লক্ষ-কোটি কলঙ্ক নিয়ে বেঁচে থাকবার অবকাশে এটুকু শুধু মনে করে সুখ পেয়ো যে তোমারই কলঙ্কের মূল্যে আরেকজন মহান ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েছে।” বলিয়া আর এক মুহূর্তও দেরি না করিয়া সে ডান হাতে কপালটা চাপিয়া ধরিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

সিঁড়িতে যখন নামিয়াছে তখন উপর হইতে উমার কণ্ঠের ডাক শোনা গেল: “দীপদা, দাঁড়াও, মাথায় একটা ব্যাণ্ডেজ করে দি।”

প্রদীপ একবার উপরে চাহিল, কিন্তু একটিও কথা কহিল না।

প্রদীপ বড় রাস্তায় পড়িয়াই ট্যাক্সি লইয়া কাছাকাছি একটা ডিস্‌পেনসারিতে আসিয়া উঠিল। ডাক্তারটি পরিচিত। ট্যাক্সিভাড়াটা তিনিই দিয়া দিলেন যা হোক। পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন আঘাত গুরুতর হইয়াছে। যে পরিমাণে রক্তক্ষয় হইয়াছে তাহাতে অন্যান্য আনুষঙ্গিক পীড়া হইবার সম্ভাবনা। ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিয়া ডাক্তারবাবু কহিলেন—“বাড়ি গিয়ে চুপ করে শুয়ে থাকুন গে, সঙ্গে এই ওষুধটাও নিয়ে যাবেন।”

ঔষধটা পকেটে পুরিয়া প্রদীপ পায়ে হাঁটিয়াই বাহির হইয়া পড়িল। চুপ করিয়া শুইয়া থাকিবার জন্যই সে মাথা পাতিয়া আঘাত নিয়াছে আর কি! কিন্তু ঘা-টার সুতীব্র যন্ত্রণা তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিতেছিল! অজয়ও এমন করিয়া নমিতারই

জন্য আঘাত নিয়াছে, কিন্তু সেটা আকস্মিক একটা দুর্ঘটনা মাত্র, নমিতার নিজের হাতের পরিবেষণ নয়। অজয়ের আচরণের মধ্যে কোথায় কেন একটা চোরের নীচতা আছে, কিন্তু এমন একটা সুপ্রবল দস্যুতার প্রমত্ততা নাই। প্রতিযোগিতায় সে-ই বোধ হয় বেশি লাভ করিল।

কিন্তু কেন যে তাহার মধ্যে হঠাৎ এই দুর্দাম চঞ্চলতা আসিল সে ইহা বুঝিয়া পাইল না। নমিতা যে আর কাহারো অন্তরের অন্তঃপুরে কায়াহীন কল্পনার মতও বিরাজ করিবে তাহাতেও প্রদীপের ক্ষমা নাই। সে হয়ত নির্জনলালিত ভাবমূর্তিতেই নমিতাকে আস্বাদ করিত—তাহার সমস্ত কর্মমুখর ব্যস্ততায় নিশীথরাত্রির স্বপ্নরঞ্জিনীর মত; তাহার এই বিশ্বাসও ছিল যে, যাহাকে এমন করিয়া কামনা করা যায় সে বিজ্ঞানের স্বাভাবিক রীতিতেই প্রতিধ্বনি করিয়া উঠিবে। কিন্তু অজয়ের ব্যস্ত আচরণে সে-প্রতীক্ষার অবিচল তপস্যা যেন সহসা ভাঙিয়া শূন্যে বিলীন হইয়া গেল। সত্যকে ঘিরিয়া ভাবের যে কুজ্মটিকা ছিল তাহা মিলাইয়া যাইতেই প্রদীপের চোখে পড়িল নমিতাকে না হইলে তাহার চলিবে না। যেমন তাহার বুকের নিশ্বাস, পকেটের পাথেয়। হয়ত নমিতার পক্ষে কোনো লৌকিক উপমাই যথেষ্ট নয়। কিন্তু তাহাকে লাভ করিতেই হইবে। প্রেমকে মহত্তর করিতে গিয়া যাহারা প্রাণায়ামের সাধনা করে, প্রদীপের তত প্রচুর ধৈর্য নাই। তাহাকে ছিনাইয়া, কাড়িয়া, মূলচ্যুত করিয়া তুলিয়া লইতে হইবে। পাওয়াটাই বড় কথা, রীতিটা অনর্থক। অজয় যতই কেন না নারীনিন্দুক হোক, ক্ষণকালের জন্য তাহার চোখে প্রদীপ নেশার ঘোর দেখিয়াছে—সে-নেশার পিছনে নিশ্চয়ই বঞ্চিত উপবাসী যৌবনের তৃষ্ণা ছিল। ছিল না? তাই ত সে যাইবার সময় নমিতার পাতিব্রত্যের প্রতি এমন নিদারুণ কশাঘাত করিতে দ্বিরুক্তি করিল না। নমিতা তাহার কাছে একটা প্রতীক মাত্র, কিন্তু প্রদীপের কাছে সে প্রতিমার অতিরিক্ত—প্রাণবতী, দেহিনী। তাহাকে তাহার চাই—ভোগে, বিরহে, কর্মপ্রেরণায়, প্রদোষ-আলস্যে। মনে পড়ে সেই রাণীগঞ্জে শালবনের তলায় তাহাদের দুই জনকে ফেলিয়া সুধী যখন ইচ্ছা করিয়াই সরিয়া পড়িয়াছিল, তখন সেই ঘনায়িত তিমিরবন্যার উপরে সে যে-দুইটি স্থির আঁখিপদ্মকে দুলিয়া উঠিতে দেখিয়াছিল তাহা তাহার সমস্ত কর্ম-জগতের পারে দুইটি ক্ষুদ্র বাতায়ন হইয়া অ-দেখা আকাশকে উদ্ঘাটিত করিয়া ধরিয়াছে। সে-দুইটি চোখই তাহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া ফিরিয়াছে। কিন্তু সে-দুইটি চোখকে তুলিয়া আনিতে গিয়া নমিতাকে সে অন্ধ করিয়া আসিল বুঝি। কাড়িতে গেলেও পাওয়া যায় না এমন কোন্ রত্নের লোভে সে দিশাহারা হইল! অজয়ের হঠকারিতা

তাহাকে এমন করিয়া পাইয়া বসিল কেন? কিন্তু ঐ জড়স্তূপে প্রাণ সঞ্চার করিতে হইলে আঘাত না করিয়াই বা কী উপায় ছিল!

সমস্ত দুপুরটা টো-টো করিয়া প্রদীপ সন্ধ্যাকালে এক রেষ্টুর‍্যাণ্টে ঢুকিয়া যা-তা কতকগুলি গলাধঃকরণ করিল। এখন সে কোথায় যাইবে? কতকগুলি লোক লইয়া রাত্রিকালে সে নমিতাকে চুরি করিলেই ত পারিত। দলের লোকেরা নারী-হরণের এই নিদারুণ প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত না নিশ্চয়। মূর্খ! মাটির ভারতবর্ষের চেয়ে ঐ মাটির দেহটির মূল্য অনেক বেশি! দেশ সম্বন্ধে প্রীতির আধিক্য ভাবাকুলতার একটা দুর্বল নিদর্শন মাত্র, তাহা প্রত্যক্ষ ও প্রখর নয় বলিয়াই প্রদীপের কাছে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর মনে হইল। তাহার চেয়ে নমিতার প্রতি তাহার এই প্রতি-নিশ্বাসের প্রেমে ঢের বেশি সত্য আছে। সব সত্যই সার্থক নয়। না-ই হোক। তবু এ সত্যকে সে আকাশের রৌদ্রের মত সমস্ত পৃথিবীতে বিকীর্ণ করিয়া দিয়া আসিয়াছে।

অগত্যা মেসেই সে ফিরিয়া আসিল। সমস্ত গা ব্যথা করিয়া জ্বর আসিয়া গেল—মাথাটা ছিঁড়িয়া পড়িতেছে। কিন্তু অজয়ের মত সে পলাইয়া বাঁচিবে না, এই ঘরে সে আত্মহত্যা করিবে। দেশ স্বাধীন না হোক, তাহাতে তাহার কিছু আসিয়া যাইবে না—তাহার চেয়েও বড় ব্যর্থতা তাহাকে গ্রাস করিয়াছে। একেবারে অপ্রয়োজনে এমন করিয়া সে প্রাণ দিবে—তাহাকে যে যতই ব্যঙ্গ করুক, তাহারা হৃদয়হীন, অমানুষ। সে রক্তের মাঝে অশ্রু দেখে, হত্যার অন্তরালে বৈধব্য। নিষ্ফল কর্মের পেছনে সে অতৃপ্তির হাহাকার শুনিতে পায়, প্রচেষ্টার পেছনে অভাবনীয় ব্যর্থতা। সে রাত জাগিয়া তারা দেখিয়াছে, ধূসর অতীতের কুয়াসায় বর্তমানকে ছায়াময় করিয়া তুলিয়াছে, নমিতার দুইটি শুষ্ক-শীর্ণ ঠোঁটের প্রান্তে তাহারই একটি পিপাসা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছে। তাহার জীবন ত ভাগ্য-বিধাতা তাঁহার হিসাবের খাতায় বাজে-খরচের ঘরেই রাখিয়া দিয়াছেন—তাহার জন্য আবার জবাবদিহি কি? ঘরের মধ্যেকার পুঞ্জিত অন্ধকারে যেন তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়াছে—এই তিমির-রাত্রির অবসান কোথায়? এই মেসের ময়লা বিছানায় শুইয়াই সে আকাশের জ্যোৎস্নায় গা ঢালিয়া দিয়াছে—সে-আকাশ সহসা এক নিশ্বাসে ফুরাইয়া গেল নাকি? কোথায় তাহার বাড়ি-ঘর, মা-বাপ, আত্মীয়-স্বজন! কেহ নাই! কোথায় নমিতা!

প্রদীপ ঝট করিয়া উঠিয়া বসিল। না, আলো জ্বালাইতে হইবে না। কাহারো এখনো ফিরিবার সম্ভাবনা নাই। কাজটা এখনই সারিতে হইবে। এমন অকর্মণ্যকে নিজ

হাতে মারিয়া ফেলার মত গৌরব কোথায়। প্রদীপ পকেটে, বাঁ হাতটা ডুবাইয়া দিল।

অমনিই দরজা ঠেলিয়া যদু্র প্রবেশ। সে এমন বোকা, জ্বরের ঘোরে তাড়াতাড়িতে দরজাটায় পর্যন্ত খিল লাগায় নাই। যদু্ কহিল—"আপনার একখানা চিঠি এসেছে।"

—"চিঠি!" প্রদীপ আকাশ থেকে পড়িল—তাহার ঠিকানা লোকে কি করিয়া জানিতে পারিবে? অজয়ের চিঠি নয় ত? নতুন কোনো বিপদে পড়িল নাকি? কিন্তু বিপদে পড়িলেও তাহার ত চিঠি লিখিবার কথা নয়। তাহাদের মধ্যে এমন কোনো সম্বন্ধের সূত্র রাখাও ত আর সমীচীন হইবে না। প্রদীপ হাত বাড়াইয়া চিঠিটা নিয়া কহিল—"আলোটা জ্বালা ত শিগ্‌গির। কী আবার ফ্যাসাদে পড়লাম।"

লণ্ঠনটা জ্বালিতেই প্রদীপ চিঠিটার ঠিকানা দেখিল—এমন হস্তাক্ষর পৃথিবীতে আগে কোথাও দেখিয়াছে বলিয়া মনে পড়িল না। তাহার মা নয় ত? তিনি কি আজো বাঁচিয়া আছেন?

মোড়কটা খুলিয়া ফেলিতেই নিচে নাম দেখিল : নমিতা।

প্রদীপ চীৎকার করিয়া উঠিল : "এই চিঠি তোকে কে দিল? ধাপ্পাবাজ! আমার অসুখের সময় আমার সঙ্গে ইয়ার্কি করতে এসেছিস?"

যদু্ কহিল—"না বাবু, ইয়ার্কি করতে যাব কেন? পিওন এসে দিয়ে গেছে। আপনি তখন বাড়ি ছিলেন না!"

—"পিওন দিয়ে গেছে? আমি বাড়ি ছিলাম না! তুই বলছিস কি যদু্?"

পোস্টাপিসের স্ট্যাম্প দেখিয়া বুঝিল, সত্যই—চিঠিটা ডাকেই আসিয়াছে। দু'টার সময়কার প্রথম ছাপ, এখানে পৌছিয়াছে সন্ধ্যা সাতটায়। তবু যেন প্রদীপের বিশ্বাস হয় না: "পিওন দিয়ে গেছে? তুই ঠিক জানিস? কেউ চালাকি করে নি ত?"

—"কে আবার খামের মধ্যে বসে চালাকি করতে যাবে?"

—"সত্যিই, কে আবার চালাকি করবে! চালাকি করে কার বা কী লাভ? কে বা জানে এ-সব? কিন্তু শচীপ্রসাদ যদি চালাকি করে? ও, তুই তাকে কি করে চিনবি? সে আবার আমার চুলের ঝুঁটি টেনে ধরেছিল। আচ্ছা, আমিও দেখে নেব। তুই বড্ড সময়ে চিঠিটা দিয়ে গেছিস যদু্। নইলে—। শচীপ্রসাদকে শাসন না করেই যে কি করে মরতে যাচ্ছিলাম! হ্যাঁ, তুই যা। বড্ড জ্বর এসে গেল রে যদু্। এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল দিয়ে যাস দিকি। আর, লণ্ঠনটা তক্তপোষের ওপর তুলে দে।"

লণ্ঠনটা তুলিয়া দিয়া যদু জল আনিতে গেল। কিন্তু এত কাছে আলো পাইয়াও চিঠিটা পড়িতে তাহার সাহস হইল না, চিঠিটা হাতে নিয়া মূর্তির মত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। একবার চোখ বুলাইয়াই সে দেখিয়া নিয়াছে পত্রটি একটি কণা মাত্র, সামান্য কয়েক লাইন লিখিয়াই শেষ করিয়াছে। কিন্তু এমন নির্মম আঘাত করিয়া কি-বা তাহার এমন প্রয়োজন ঘটিয়া গেল। অনুতাপ করিয়া ক্ষমা চাহিয়াছে বুঝি। কিম্বা হয়ত আরো ভৎর্সনা করিয়া পাঠাইয়াছে। তাহার জন্য আবার চিঠি কেন? নিশ্বাস বন্ধ করিয়া প্রদীপ চিঠিটা পড়িয়া গেল:

"প্রদীপবাবু,

এ-সংসারে আমার আর স্থান নেই। আত্মহত্যা করতে পারতাম বটে, কিন্তু মরতে আমার ভয় করে। আর, এক মা ছিলেন, তিনিও বিমুখ হয়েছেন। এখন আপনি মাত্র আমার সহায়। এ বাড়ির বৌ হয়ে অবধি কোনদিন পথে বেরই নি, একা বেরুতে আমার পা কাঁপছে। আপনি আজ রাত্রি ঠিক একটার সময় আমাদের গলির মোড়ে অপেক্ষা করবেন—আমি এক-কাপড়ে বেরিয়ে আসব। তারপর আপনি আমাকে যেখানে নেবেন সেখানে যেতে আমি আর দ্বিধা করব না। ইতি—

নমিতা"

যদু জল লইয়া আসিয়াছে; এক ঢোঁকে সবটা গিলিয়া ফেলিয়াও সে ঠাণ্ডা হইল না। যদুর হাতটা চাপিয়া কহিল—"ঠিক বলছিস, পিওন দিয়ে গেছে? গায়ে খাকির জামা, মাথায় পাগড়ি, পায়ে ফেটি বাঁধা। ঠিক বলছিস?"

যদু অপ্রস্তুত হইয়া কহিল—"মিথ্যে বলে আমার লাভ কি বাবু?"

—"না না, তুই মিথ্যে বলবি কেন? তুই কি তেমন ছেলে? তুই লক্ষ্মী, আর-জন্মে তুই আমার ভাই ছিলি। তোকে আমি আমার সব দিয়ে দিলাম।"

হাত ছাড়াইয়া নিয়া যদু কহিল—"কী বলছেন বাবু? সামান্য একটা চিঠি এনে দিয়েছি—তাতে—"

—"তুই তার কিছু বুঝবি নে। লেখাপড়া ত কোনোদিন কিছু শিখলি নে, পরের বাড়িতে খালি বাসনই মাজলি। তুই যে একটি রত্ন, একথা তুই নিজেই ভুলে আছিস। হ্যাঁ, তোর বিশ্বাস হচ্ছে না? এই সব—সব তোর। আর, আমার এমন কিছুই নেই যে তোকে দেওয়ার মত দিতে পারি। ঠিক বলছিস? পায়ে ফেটি বাঁধা, মাথায় পাগড়ি, গায়ে খাকির জামা—ঠিক? তুই যখন দেখেছিস তখন ঠিক না হয়ে পারে? তুই কি আর আমার সঙ্গে চালাকি করবি?"

যদু 'ছি' বলিয়া জিভ কাটিল।

প্রদীপ অস্থির হইয়া উঠিয়াছে : "সব তোকে দিলাম। সব তোর নিতে হবে। কিছুই আর আমার দরকার নেই। সে ভারি মজা—এই বিছানা-বালিশ বাক্স-প্যাঁট্‌রা জামা-কাপড়—সামান্য যা-কিছু মানুষের লাগে—এক-এক সময় একেবারে লাগে না। কিছু দিয়েই কিছু হয় না। হ্যাঁ, তুই বিশ্বাস করছিস না বুঝি? এ আর এমন কি রাজ্য তোকে দিচ্ছি যে প্রকাণ্ড একটা হাঁ করে আছিস! বোকা-টা!"

যদু আমতা-আমতা করিয়া কহিল—"আপনার তাহলে কি করে চলবে?"

—"আমার চলবে না রে পাগলা, চলবে না। আমার আবার আর চলাচলি কিসের? হ্যাঁ, আরেকটা কাজ তোকে করে দিতে হবে ভাই।"

—"বলুন।"

—"মোড় থেকে একটা রিক্‌স নিয়ে আয় দিকি, একটু বেড়াতে বেরুব।"

—"আপনার যে জ্বর। পড়ে গিয়ে মাথা যে আপনার ফেটে গেছে।"

—"দেখছিস না চেহারাটা ভালুকের মত, জ্বরও ভালুকের। কখন যে আসে, কখন যে নেমে যায় ঠাহর করা যায় না।"

প্রদীপের গলার উপরে যদু স্বচ্ছন্দে হাত রাখিল। ভীত হইয়া কহিল—"গা যে পুড়ে যাচ্ছে!"

প্রদীপ ঠাট্টা করিয়া বলিল—"ওটা তোর হাতের দোষ। যা, রিক্‌স আন একটা। জলদি।"

—"বাইরে যে হিম পড়ছে বাবু!"

—"তুত্তোর হিম। বেশ ত ঠাণ্ডায় আবার জ্বর জুড়িয়ে যাবে 'খন। কোনোদিন ত আর লেখাপড়া শিখলি নে, কিসে করে যে কী হয় তোর চোদ্দপুরুষও বুঝে উঠতে পারবে না। যা। তোকে গালাগাল দিলাম না ওটা! কী মূর্খের পাল্লায়ই যে পড়েছি! বেশ জোয়ান দেখে রিক্‌স আনবি। হা হা—জোয়ান রিক্‌স।"

যদু চলিয়া গেলে প্রদীপ আবার নতুন সমস্যায় পড়িল। টাকা কোথায়? পকেটের বাইরে ও ভেতরে দুই দিকেই সমান দুইটা শূন্য। তবে? অবিনাশের কাছে গিয়া সাহায্য চাহিবে? এখন সে কলিকাতায় না কালিঘাট-এ তাহারই বা ঠিকানা কি? হ্যাঁ, যখন সব ছাড়িয়াছে, তখন তাহার টাকাও লাগিবে না। পাগল! সে একা নয়, সঙ্গে নমিতা। সে-কথা সে ভুলিয়া গেল নাকি? না, না, ভুলিতে সে মরিতে গিয়াছিল বটে, কিন্তু এখন মরিলেও সে ভুলিতে পারিত না। কিন্তু টাকা চাই। টাকার জন্য কোথায় সে প্রার্থী হইবে আজ? নমিতা মধ্যরাত্রিতে গলির মোড়টা একলা আসিয়াই ঘুরিয়া যাইবে নাকি? বিশ্বাসঘাতক, প্রদীপ, চরিত্রহীন পাপিষ্ঠ।

কুলনারীকে বাড়ির বাহির করিয়া সে আরামে বিছানায় শুইয়া জ্বর ভোগ করিতেছে। ছি! কিন্তু নমিতা নিশ্চয়ই সেমিজের তলায় টাকা নিয়া আসিবে। আসুক, তবু তার কাছ হইতে খরচ চাহিলে তাহার পুরুষগর্ব ধূলায় লুণ্ঠিত হইবে যে! হোক, যে সহচারিণী বন্ধু,তাহার কাছ হইতে এটুকু সাহায্য লইলে লজ্জা কোথায়? নমিতা কোথায় টাকা পাইবে? গায়ে তাহার একখানা গয়না পর্যন্ত নাই। সে-সব অবনীবাবুর সিন্দুকে নির্বাপিত মৃৎপ্রদীপের মত ঘুমাইয়া আছে। নমিতা সে-সিন্দুকের শক্তি কি করিয়া পরীক্ষা করিবে? না, না, টাকা চাই। কোনো দ্বিধা নাই, টাকা তাহাকে সংগ্রহ করিতেই হইবে।

কি ভাবিয়া প্রদীপ দরজায় খিল দিল। একটা লোহার শলা ঢুকাইয়া সজোরে একটা চাড় দিতেই প্রীতিনিধানের ট্রাঙ্কের তালাটা ফাঁক হইয়া গেল। সে চুরি করিতেছে, হ্যাঁ, সে জানে। চুরিই করিতেছে সে। উদ্দেশ্যবিচারেই মহত্ত্ব প্রমাণিত হোক, রীতিবিচারটা বর্বর প্রথা। ভগবান আছেন। যে চোর, যে নারীহর্তা তার জন্যও ভগবান আছেন। প্রীতিনিধানের কাপড়ের তলায় কতকগুলি নোট।

দরজায় কে টোকা দিল।

প্রদীপ জিজ্ঞাসা করিল: "কে?"

—"আমি, বাবু। রিক্স এসেছে।"

—"এসেছে? বেশ জোয়ান রিক্স ত রে?" বলিয়া হাসিতে-হাসিতে সে দরজা খুলিয়া দিল।

আর এক মুহূর্ত দেরি করিল না: "চললাম রে যদু।"

যদু কহিল—"আর আসবেন না?"

"না।" বলিয়া অন্ধকার সিঁড়ি দিয়া হোঁচট খাইতে-খাইতে সে নামিতে লাগিল। উপর হইতে যদুর প্রশ্ন শোনা গেল: "দড়িতে টাঙানো আপনার ঐ সিল্কের জামাটাও আমার?"

—"হ্যাঁ, তোর। সব। গরদ, তসর, সিল্ক, মটকা, মসলিন, আলপাকা—সব।"

রিক্সয় চাপিয়া প্রদীপ কহিল—"চল কাশিপুর।"

রিক্সওয়ালা অবাক হইয়া কহিল—"সে কি বাবু? সে ত বহুদূর।"

—"আচ্ছা, আচ্ছা, উল্টোমুখো করে নে গাড়িটা। ভবানীপুর চল।"

—"সেও ত ঢের দূর বাবু!"

—"তবে কি সাবু খেয়ে গাড়ি টানিস? নে, হেদোয় যেতে পারবি?"

ডাণ্ডা তুলিয়া ঘণ্টা বাজাইয়া রিক্সওয়ালা টানিতে লাগিল।

প্রদীপ কহিল—"বেশি মেহনৎ হলে আরেকটাতে চাপিয়ে দিস মনে করে। বুঝলি ?"

একটা বাজিবার বহু আগে হইতেই প্রদীপ গলির মোড়ে প্রতীক্ষা করিতেছে। চিঠি পাইবার পর অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, তবু এখনো যেন সে ভালো করিয়া কিছুই ধারণা করিতে পারিতেছে না। যে নির্মম ঘৃণায় আঘাত করিতে পারে, সে-ই আবার কালবিলম্ব না করিয়া সহযাত্রিনী হয় এমন একটা চেতনায় প্রদীপ একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। মানুষের মনে এমন কি পারস্পরিক বৃত্তিবৈষম্য ঘটিতে পারে ভাবিয়া প্রদীপের বিস্ময়ের আর অন্ত ছিল না। ভয়ও করিতেছিল না এমন নয়। যতক্ষণ নমিতা শ্বশুরালয়ে স্থাণুর মত অচল হইয়া বসিয়া ছিল ততক্ষণ তাহাকে সংস্কার ও বুদ্ধি দিয়া আয়ত্ত করা যাইত, কিন্তু যখন সে সেই পরিচিত ঘর-বাড়ি ছাড়িয়া একেবারে কূলপ্লাবিনী নদীর মত নামিয়া আসিল তখন তাহাকে যেন আর সীমার মধ্যে খণ্ডিত ও লাঞ্ছিত করিয়া দেখিবার উপায় নেই। কোথায় একটা অস্বাভাবিক অসামঞ্জস্যের বেসুর বাজিতেছে, অথচ এমন একটা খররুদ্র বিদ্রোহাচরণের মাঝেই ত সে তাহাকে আহ্বান করিয়াছিল! কিন্তু এমন আকস্মিকতার সঙ্গে হয়ত নয়। এই নিদারুণ অসহিষ্ণুতার মাঝে যেন কুশ্রী নির্লজ্জতা আছে। যে-বিদ্রোহ আত্মোপলব্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত নয় তাহাতে সুষমা কোথায় ?

অজয় হইলে ত লাফাইয়া উঠিত—নমিতাকে সঙ্গে নিয়া হয়ত তখনই গলবস্ত্র হইয়া সমাজের উদ্যত খড়্গের নিচে মাথা পাতিত! কিন্তু প্রদীপ নমিতাকে পরিপূর্ণ ও প্রগল্ভ জীবনোৎসবের মাঝখানেই নিমন্ত্রণ করিতে চাহিয়াছে। নমিতাকে নিয়া তাহার তৃপ্তির তপস্যা, সৃষ্টির সমারোহ। সে তাহাকে নিয়া মরণের হোলি খেলিতে চাহে নাই। কিন্তু যে-প্রেম দীর্ঘ প্রতীক্ষার অশ্রুসিঞ্চনে সঞ্জীবিত হইল না, সে-প্রেম শরীরের একটা স্নায়বিক উত্তেজনা মাত্র, তাহার কোথায় লাবণ্য, কী-বা তার ঐশ্বর্য! সাহসিকা অভিসারিকার চেয়ে একটি সাশ্রুলেখাননা বাতায়নবর্তিনী বন্দিনী মেয়ের মাঝে হয়ত বেশি মাধুরী। কিন্তু এখন ইহা নিয়া অনুতাপ করিবার কোন অর্থ নাই। কেন যে সে কী আঘাত পাইয়া হঠাৎ উচ্ছৃঙ্খল ঝড়ের আকারে নমিতাকে লুণ্ঠন করিতে গিয়াছিল, কেনই বা যে নমিতা সেই আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়াও পুনরায় পরাভূত হইল—ইহার কারণ নির্ণয় করিবারও সময় ফুরাইয়াছে।

রিক্স ছাড়িয়া নানা অলি-গলিতে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া প্রদীপ অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। স্নায়ুগুলি শিথিল হইয়া আসিতেই সে নমিতার এই অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবের মধ্যে

আর মাদকতার স্বাদ পাইল না। তবু এখন রাস্তার মাঝখানে নমিতাকে একলা ফেলিয়া সরিয়া পড়িবার মার্জনা নাই। যখন পথে একবার পা দিয়াছে তখন তাহার পার খুঁজিয়া দেখিতে হইবে।

রাস্তা ক্রমে-ক্রমে পাতলা হইয়া আসিল। রাত্রির কলিকাতার স্তব্ধতার মাঝে উন্মুক্ততার একটা প্রাণান্তকর বিশালতা আছে—এত বড় মুক্তির কথা ভাবিয়া প্রদীপের হাঁফ ধরিল। গলির মোড় হইতে অবনীবাবুর বাড়ির একটা হলদে দেয়াল অস্পষ্টাকারে চোখে পড়ে, তাহারই দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া প্রদীপ চক্ষুকে ক্ষয় করিয়া ফেলিতে লাগিল। এ কী—নমিতাই ত, সমস্ত গায়ে চাদর মুড়িয়া এদিকে অগ্রসর হইতেছে। আশ্চর্য, তাহা হইলে চিঠিটার মধ্যে এতটুকু অসত্য ছিল না। নমিতা তাহা হইলে নিতান্তই কলঙ্কের ডালা মাথায় লইয়া কূল ডিঙাইল! সে প্রদীপকে এতখানি বিশ্বাস করে যে একবারো কি এই কথা ভাবে নাই যে, যে অমিতচারী উচ্ছৃঙ্খল-স্বভাব প্রদীপ অন্তঃপুরে ঢুকিয়া নির্লজ্জ ও কদর্য অভিনয় করিয়া আসিতে পারে, তাহার বিশ্বাসঘাতক হইতেও দেরি লাগে না? কে জানে হয়ত সে এই কথাই ভাবিয়াছিল : তাহার উপর যাহার এমন দুর্দমনীয় লুব্ধতা, সে নিশ্চয়ই এমন সোনার সুযোগ সহজে ফসকাইতে দিবে না, দুই লোলুপ বাহু মেলিয়া গলির মোড়ে ঠিক দাঁড়াইয়া থাকিবে। হয়ত সে প্রদীপের আগ্রহকে এমনি একটা কদর্থ করিয়া নিশ্চিন্ত ছিল। পরস্বাপহরণই কি তাহার ব্যবস্থা নাকি? নমিতা তাহাকে কোন সন্দেহ করিল না? কে জানে, নমিতার না আসিলেই বুঝি ভালো হইত। একটা চিঠি লিখিয়া তাহার প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন না করিলে হয়ত তাহার স্বর্গচ্যুতি ঘটিত না।

নমিতা সরাসরি প্রদীপের সম্মুখে হাঁটিয়া আসিল; কহিল—"কোথায় নিয়ে যাবেন, চলুন। গাড়ি ঠিক রেখেছেন?"

প্রদীপ ভালো করিয়া নমিতার মুখের দিকে চাহিতে পারিতেছিল না, তবু ক্ষণিক দৃষ্টিপাতে যেটুকু আভাস পাইল তাহাতে সে স্পষ্ট বুঝিল যে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সে-মুখ নিদারুণ বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। দিনের বেলাকার সেই প্রশান্ত ও গাম্ভীর্য-গদ্‌গদ মুখখানি এখন নিরানন্দ শুষ্কতায় কুটিল ও কৃশ হইয়া গিয়াছে। কথায় পর্যন্ত সেই কুণ্ঠিত মাধুর্যের কণা নাই! সে আমতা-আমতা করিয়া কহিল—"গাড়ি-টাড়ি ঠিক নেই।"

নমিতা সামান্য বিদ্রূপ করিয়া কহিল—"ভাবছিলেন বুঝি চিঠিতে আপনাকে একটা ধোকা দিয়েছি! মিথ্যা কথা সহজে আমি বলি না। চলুন, গাড়ি একটা পাওয়া যাবে হয়ত।"

ক্লান্তস্বরে প্রদীপ কহিল—"কিন্তু কোথায়ই বা যাবে ?"

—"বাঃ, সে ত আপনি জানেন। আমাকে আপনি কোথায় নিয়ে যাবেন তার আমি কী জানি ?"

প্রদীপ ম্লান চক্ষু দুইটি নমিতার মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া কহিল—"সত্যি, কোথায় যাব তার কিছু জানি না।"

নমিতা চঞ্চল হইয়া উঠিল: "কিছুই জানেন না ? এখন এ-কথা বলতে আপনার লজ্জা করে না ? তখন ঘটা করে আমার ঘরে গিয়ে যাত্রা-দলের ভীমের পার্ট করে এসে এখন শকুনি সাজলে চলবে কেন ? চলুন, এগোই। এখানে দাঁড়িয়ে গবেষণা করবার সময় নেই। খানিক বাদেই বাড়িতে তুফান লেগে যাবে। তখন মরবারো আর মুখ থাকবে না। চলুন।" বলিয়া নমিতাই বড় রাস্তা ধরিয়া আগাইতে লাগিল। পিছে-পিছে দুই পা চলিতে-চলিতে প্রদীপ কহিল—"আমাকে ক্ষমা কর নমিতা। তুমি বাড়িতেই ফিরে যাও।"

নমিতা ফিরিয়া দাঁড়াইল। সামনেই গ্যাসপোস্ট। তাহার আলোতে সে-মুখের সব ক'টা রেখা নিমেষে দৃঢ় ও দৃপ্ত হইয়া উঠিল: "আপনি এত বড় কাপুরুষ ? বাড়ির বাইরে টেনে এনে আবার তাকে বাড়িমুখো হবার পরামর্শ দেন কোন্ লজ্জায় ? আর, ফেরবার পথ অত সহজ নয়। কিন্তু ঐ দেখুন, একটা গাড়ি যাচ্ছে। বোধ হয় খালি —ডাকুন না, দেখা যাক।"

গাড়িতে উঠিলে গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায় যাব ?"

প্রদীপ নমিতাকে প্রশ্ন করিল—"কোথায় যেতে বলব ওকে ? তোমার বাপের বাড়ি ?"

—"বাপের বাড়ি ! আপনাকে সঙ্গে নিয়ে এত রাত্রে ওখানে ফিরে গেলে বাপের বাড়ির এয়োরা বরণ-ডালা নিয়ে আসবে না। কোথায় যেতে বলবেন আমি কি জানি ?"

এক মুহূর্ত কি ভাবিয়া প্রদীপ বলিল—"চল শেয়ালদা।"

দুইজনে মুখোমুখি বসিয়াছে। নমিতা জানালা দিয়া রাস্তার উপরে চলমান গাড়ির ছায়াটাই বোধ করি লক্ষ্য করিতেছিল, প্রদীপ একেবারে মূঢ়, স্পন্দহীন। শেয়ালদা হইতে যে কোথায় যাওয়া যাইতে পারে তাহার কোনো কিনারাই সে খুঁজিয়া পাইতেছিল না। এ-সময় অজয়ের দেখা পাইলে মন্দ হইত না। সে সমস্ত সমস্যাই খুব তাড়াতাড়ি সমাধান করিতে পারে, হয়ত ভোর হইলেই সে নমিতাকে নিয়া একটা প্রকাণ্ড শোভাযাত্রার আয়োজন করিয়া ফেলিত। কিন্তু নমিতা যদি

আসিলই, তবে রূঢ় কোলাহলে সে যেন নিজেকে ব্যয় না করে, আকাশের দর্পণে সে তার আত্মার প্রতিবিম্ব দেখুক !

প্রদীপ অনেকক্ষণ পরে কথা কহিল—"তুমি এমন করে হঠাৎ বেরিয়ে পড়বে, এ ভাবতে পারি নি নমিতা।"

নমিতা জানালা হইতে মুখ ফিরাইল না, কহিল—"তবে কি ভাবতে পেরেছিলেন শুনি ?"

একটু দম নিয়া প্রদীপ কহিল—"ভেবেছিলাম মেরুদণ্ডের অভাবে চিরকাল তোমাকে সমাজের অচলায়তনে কুঁকড়েই থাকতে হবে।"

নমিতা ভিতরে মুখ আনিয়া ঠাট্টা করিয়া কহিল—"এখন আমার মেরুদণ্ডটা বুঝি আপনার কাছে প্রকাণ্ড দণ্ড হয়ে উঠেছে, তাই আবার শ্বশুরবাড়ি ফিরে যেতে বলছেন ? কিন্তু আমার জন্য আপনাকে ভাবতে হবে না।" বলিয়া আবার সে জানালার বাহিরে মুখ বাড়াইয়া দিল।

প্রদীপ কহিল—"সংসারে কার জন্য কার ভাবনা করতে হয় কিছু লেখা থাকে না নমিতা। তুমি আমার সঙ্গেই ত চলেছ। এ-যাত্রায় পৃথক ফল যখন কোনদিক থেকেই নেই, তখন ভাবনার অংশটা আমাকেও ত খানিকটা নিতে হবে।"

নমিতা সোজা হইয়া বসিল। ঘোমটার তলা হইতে কতকগুলি রুক্ষ চূর্ণকুন্তল মুখের উপর নুইয়া পড়িয়াছে। সে দুইটি ঠোঁট ঈষৎ চাপিয়া কি-একটা কঠিন কথা সংযত করিয়া নিল। পরে স্পষ্ট করিয়া কহিল—"আপনার সঙ্গে চলছি বটে, কিন্তু আপনার জন্যেই বেরিয়ে আসি নি, দয়া করে তা মনে রাখবেন।"

ম্লান একটু হাসিয়া প্রদীপ কহিল—"সে-কথা আমাকে মনে না করিয়ে দিলেও চলত নমিতা। বেরিয়ে যে এসেছ এইটেই আজকের রাতের পক্ষে সত্য, কিসের জন্য এসেছ সেইটে ভাবান্তর। আমার জন্য বেরিয়ে আসবে এমন একটা অন্যায্য অভিলাষের কলুষে তোমার এ বিজয়গর্বকে আমি ছোট করতে চাই নে। কিন্তু এখন যে তোমার একারই দায়িত্ব, তখন আমাকে আর গাড়ি করে কোথায় টেনে নিয়ে চলেছ ?"

নমিতা চোখের সম্মুখে বিপদ দেখিল। প্রদীপকে এত সহজে মোহমুক্ত করাটা ঠিক হয় নাই। সে হাসিয়া কহিল—"আমি টেনে নিয়ে চলেছি মানে ? আজকে সকালবেলা আমার পূজোর ঘরে কে ঘটোৎকচ-বধের পালা শেষ করে এলো ? বক্তৃতায় পটু, কাজে কপট—এমন লোক দেশের কল্যাণসাধন করবার অহঙ্কার করে কোন্ হিসাবে ? কোনো রমণীকে কুলের বার করে এনে মাঝপথে তাকে ফেলে

চলে যাওয়াটা বীরধর্ম নয়। আপনি যেখানে যাবেন আমাকেও সেখানেই যেতে হবে।"

প্রদীপ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। এক রাতে সেই নির্বাককুন্ঠিতা নমিতা মুখরভাষিণী হইয়া উঠিয়াছে। চোখে চটুলতা, কথায় বিদ্রূপ, ব্যবহারে পরম সাহস। তাহার সেই ধ্যানময় প্রেমগরিমা কোথায় অন্তর্হিত হইল! সেই তেজোদীপ্ত দৃঢ়তার বদলে এ কিসের তরলচাপল্য! তাহার বিদ্রোহাচরণে এমন একটা অপরিচ্ছন্নতা থাকিবে ইহা প্রদীপ কোনদিন বিশ্বাস করে নাই।

প্রদীপ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—"আমি ত মৃত্যু-অভিসারিক।"

নমিতা হাসিয়া বলিল—"কবির ভাষায় আমিও তাহলে মৃত্যুর স্বয়ংবরা।"

প্রদীপ গম্ভীর হইয়া কহিল—"সত্যিই আমি মৃত্যুকে জীবনের মূল্য-নির্ধারক বলে স্বীকার করি না। আমি বাঁচতে চাই, পরিপূর্ণ ও প্রচুর করে বাঁচা।"

নমিতা হাসিয়া কহিল—"এ আপনারই যোগ্য বটে। বিসংবাদী মনোভাব নিয়েই আপনি কারবার করেন দেখছি। একবার বলেন: বেরোও; বেরুলে বলেন: ফেরো। মন খারাপ হলে বলেন: মরব; মরবার সময় গল্পের কাঠুরের মত বলেন: বাঁচাও। আমার উপায় নেই, আপনার কথায় সায় আমাকে দিতেই হবে। আপনি যদি বাঁচান, ত বাঁচবো বৈকি। বাঁচতে চাই বলেই ত বেরিয়ে এলুম। মরলুম আর কৈ!"

নমিতার এতগুলি কথার মধ্যে একটি কথামাত্র প্রদীপ কুড়াইয়া লইল: "আমার সঙ্গে সায় দিতে হবে তোমার এমন কোনো চুক্তি আছে নাকি নমিতা?"

—"না থেকে আর উপায় কি? আপনার সঙ্গেই যখন যেতে হচ্ছে।"

—"আমার সঙ্গে যাবার জন্যে ত তোমার দিক থেকে কোনো আয়োজনই হয় নি নমিতা! আমি তোমার সঙ্গে আছি এ তোমার জীবনের আকস্মিক একটা দুর্ঘটনা মাত্র। তুমি ত আর সত্যি আমার জন্যেই পথে নাম নি।"

নমিতা কহিল—"তা ত নয়ই। সে-কথা বার-বার বললে মানে উল্টে যাবে না কখনই। আমি একলাই বেরুতুম, কিন্তু পুরুষ একজন সঙ্গে থাকলে কিছুটা আমার সুবিধে হবে ভেবেই আপনাকে চিঠি লিখেছি। আপনি আমার পথের অবলম্বন মাত্র, বিশ্রামের আশ্রয় নয়। সত্যভাষণের দীপ্তি যদি সইতে না পারেন, তবে নেমে যান গাড়ি থেকে, আমার আপত্তি নেই। যে-দেবতা আমাকে ডাক দিলেন, রাখতে হয় তিনিই আমাকে রাখবেন। মিছিমিছি আপনাকে ব্যস্ত করলুম হয়ত।"

নমিতা জানালার উপরে বাহুর মাঝে মুখ লুকাইল।

প্রদীপ কহিল—"তোমার মাঝে আমি মুক্তির মহিমা দেখছি নমিতা—"

নমিতা মুখ না তুলিয়াই কহিল—"এটা কবিত্ব করবার সময় নয়।"

—"জানি। নানারকম বিপদের সঙ্গে আমাদের যুঝতে হবে, নানারকম সমস্যা সমাজ, আইন, হৃদয়। সে-সবের মীমাংসা অহিংসামূলকই করে তুলব, আমরা। দাঁড়াও, কথা আমাকে শেষ করতে দাও। তোমার চিঠি পেয়ে এ-কথা যদি একবারো ভেবে থাকি যে, বেরুলেই তুমি আমার হৃদয়ের নিকটবর্তী হবে সেটা নেহাৎই আমার অন্ধতা। দুটো দেহের স্থানিক সান্নিধ্যই মিলন নয় নমিতা। সে-লুব্ধতা আমার ছিল কি ছিল না তেমন বিচার আগে থেকে করতে গিয়ে তুমি খামোকা লাঞ্ছিত হয়ো না। ধরে নাও আমি তোমার বন্ধু। তবে এখন বলতে তোমার দ্বিধা করা উচিত নয়—কেন তুমি এমন বিস্ময়কর কাজ করে ফেললে?"

নমিতা মুখ তুলিল। অন্ধকারেও স্পষ্ট মনে হইল সে কাঁদিতেছে। চাদরের খুঁটে চোখ মুছিয়া সে কহিল—"বিস্মিত আমিও নিজে কম হই নি প্রদীপবাবু। কিন্তু বেরিয়ে না এসে জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে বসে থাকবার মত অমানুষিক সতীত্ব আমার সইলো না। কুরুসভায় দ্রৌপদীও এতদূর লাঞ্ছিত হয়েছিলেন কি না মহাভারত লেখে না। আমার এতদিনকার স্বামিধ্যান কৃচ্ছ্রপালন সমস্তই আমার বৈধব্যের মতই নিষ্ফল হল। ভাবলুম, আপনার সেই হৃদয়হীন দস্যুতাই যখন আমার সকল অত্যাচারের মূল, তখন দায়িত্বও আপনারই। তাই আপনাকে চিঠি লিখলুম। যত বড় অমানুষই হোন না কেন, একজন ভদ্রনারীর করুণ আবেদন হয়ত অগ্রাহ্য নাও করতে পারতেন। তবু যদি রাস্তায় এসে আপনাকে না পেতুম, আমাকে সামনেই চলতে হত, এগোবার সময় ফেরবার সমস্ত গতি নিবৃত্ত করেই বেরিয়েছি।" বলিয়া নমিতা ঝর-ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

প্রদীপ কহিল—"হৃদয়হীন সত্যিই আমি ছিলাম না নমিতা। তবু যদি সন্দেহ কর এই বিদ্রোহাচরণে কোনো কল্যাণ নেই, তবে বল, গাড়ি ফিরতে বলি।"

কান্নার মধ্যেই কর্কশস্বরে নমিতা কহিল—"না।"

প্রদীপ কহিল—"দায়িত্ব আমারই। ভেবেছিলাম, যাকে চাওয়া যায় তাকে পাওয়া যায় না, এ নিয়ম ঈশ্বরের মতই অবধারিত। কিন্তু জোর করে যদি তাকে ছিনিয়ে নেওয়া যায় তবেও ত তাকেই পাওয়া হল। স্তরভেদের সূক্ষ্মতাবিচার ভুলে গিয়েছিলাম নমিতা। ভুল হয়ত আমার ভেঙেছে, কিন্তু সময় যদি একদিন আসে, বুঝবে, সত্যিই আমি হৃদয়হীন ছিলাম না। আমি তোমাকে পাই না পাই, সংসার ব্যাপারে এ একটা অতি তুচ্ছ কথা। তুমি তোমাকে পাও এই খালি প্রার্থনা করি।

কিন্তু যাক, গাড়িটা স্টেশনে ঢুকছে। বাকি রাতটা প্লাটফর্মেই কাটাতে হবে। ভোর বেলা ট্রেনে চাপব।"

ট্রেনে চাপিয়া কোথায় যাইবে এমন একটা কৌতূহলী প্রশ্নও নমিতার মুখ দিয়া বাহির হইল না। তাহার মুখ আবার সহসা রুক্ষ ও বিকৃত হইয়া উঠিয়াছে। মুখের প্রত্যেকটি রেখা একটা আত্মঘাতী প্রতিজ্ঞার সঙ্গে প্রদীপের প্রতি বীভৎস ঘৃণায় প্রখর হইয়া উঠিল। সে কহিল—"দায়িত্ব থেকে আপনাকে আমি মুক্তি দিলুম—স্বচ্ছন্দে, অতি সহজে। আপনি বাড়ি ফিরে যান। প্লাটফর্মে বা কোথায় রাত কাটাতে হবে সে-পরামর্শ আমার চাইনে।" বলিয়া নিজেই গাড়ি হইতে নামিয়া আসিয়া গাড়োয়ানকে প্রশ্ন করিল—"তোমাকে কত দিতে হবে?"

আঁচলের গেরো হইতে পয়সা বাহির করিতে আর হাত উঠিল না, গাড়ির ভিতরে হঠাৎ প্রদীপের আর্তকণ্ঠ শুনিয়া সে জানালা দিয়া চাহিয়া দেখিল, তাহার মাথার ব্যাণ্ডেজটা মুখের উপর নামিয়া আসিয়াছে এবং কপালের যে-জায়গাটা কাটিয়া গিয়াছিল সেই ক্ষতস্থান হইতে নূতন করিয়া রক্ত ঝরিয়া প্রদীপের জামা কাপড় ভাসাইয়া দিতেছে। উদ্বিগ্ন হইয়া নমিতা কহিল—"ঈস! কি করে খুলে গেল ব্যাণ্ডেজ? আসুন, আসুন, নেমে আসুন শিগ্‌গির।"

প্রদীপ নড়িল না। নমিতা আবার গাড়িতেই উঠিয়া বসিল। বলিল—"ঈস! এতটা কেটে গিয়েছিল নাকি? দাঁড়ান, চুপ করে থাকুন, আমি বেঁধে দিচ্ছি।"

—"এখানে হবে না। চল, নামি।" বলিয়া প্রদীপ নমিতার বাহুতে ভর দিয়া নামিয়া আসিল।

—"ভাড়াটা আমিই দিচ্ছি।" প্রদীপ ব্যাগ খুলিল।

গাড়োয়ান চলিয়া গেলে প্রদীপ বলিল—"ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে মাথায়। ভাল করে বেঁধে দাও নমিতা।"

নমিতা বলিল—"শুয়ে পড়ুন। কেমন করে খুললেন?"

প্রদীপ কপালে নমিতার আঙুল ক'টির স্পর্শ অনুভব করিতে করিতে বলিল—"কেমন আপনা থেকে খুলে গেল নমিতা।"

ভোর বেলা দুইজনে চিটাগং-মেইলে চাপিয়া বসিল।

তুচ্ছ দেশ, তুচ্ছ সমাজ-সংস্কার! এতদিন সে বৃথাই অজয়ের সঙ্গে পল্লীর পঙ্কোদ্ধার-ব্রতে মত্ত ছিল! মাইলের পর মাইল হাঁটিয়া চাঁদা কুড়াইয়া গ্রামে স্কুল বসাইয়াছে, এবং সে-স্কুল উঠিয়া গেলে দুই বন্ধু স্বচ্ছন্দে সরিয়া পড়িয়াছে। একটা বঞ্চিত ব্যর্থ

বিকৃত জীবনের বোঝা কাঁধে লইয়া সে এতদিন দেশ হইতে দেশান্তরে ঘুরিয়া মরিতেছিল কেন? নমিতার স্পর্শে তাহার আজ মুক্তিস্নান হইল। পুরানো দিনের সেই খোলস তাহার এক নিশ্বাসে খসিয়া পড়িয়াছে, সে আজ কবি, আনন্দ-উদধি! সে নিজেকে সুন্দর করিবে; পৃথিবীকে সমৃদ্ধ, স্বপ্নরঞ্জিত। আজ তাহার নূতন করিয়া জন্মলাভ হইল—নমিতা সেই বিস্মৃত অতীতের তীর হইতে একটি শুভ সঙ্কেত লইয়া তাহার জীবনে আবির্ভূত হইয়াছে—প্রেমে, মঙ্গলাচরণে, কায়িক-কল্পনায়!

গাড়িটা নির্জন ছিল—একই বার্থে দুই জানালায় দুই জন স্টেশনের দিকে মুখ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। কিন্তু কিছু একটা কথা না বলিলে এই স্তব্ধতা অতিমাত্রায় কুৎসিত ও দুঃসহ হইয়া উঠিবে। কিন্তু কী-ই বা বলিবার ছিল! নমিতা মুখাবয়ব এমন দৃঢ় করিয়া রাখিয়াছে, দুই চোখে তার এমন কঠিন ঔদাসীন্য, বসিবার ভঙ্গিটিতে এমন একটা দৃপ্ততা যে, কোমল করিয়া তাহার নামোচ্চারণটি পর্যন্ত প্রদীপের মুখে আর মানাইবে না। অথচ এমন একটি স্নিগ্ধ-করোজ্জ্বল প্রভাতের জন্য তাহার প্রার্থনার আর অন্ত ছিল না। সেই দিনটি এমন মৃত্যু-মলিন রাত্রির মুখোস পরিয়া দেখা দিল কেন?

গাড়ি ছাড়িবার দেরি ছিল। প্রদীপ কহিল—"তোমাকে একটা বই কিম্বা পত্রিকা কিনে এনে দেব?"

নমিতা অনুদ্বিগ্ন স্পষ্টতায় উত্তর দিল: "ইংরেজি বর্ণমালার পরস্পর সন্নিবেশের কোন মাহাত্ম্যই আমার কাছে নেই। আপনি আমার জন্যে ব্যস্ত হবেন না।"

শেষের কথাটুকুর প্রখরতা প্রদীপের কানে বাজিল: "কিন্তু সারা পথ তুমি এমনি বোবা হয়ে বসে থাকবে?"

নমিতা চোখ ফিরাইল না, একাগ্র দৃষ্টিতে প্লাটফর্মের উপরকার জনপ্রবাহের দিকে চাহিয়া কহিল—"কথা বলবার লোক থাকলেই চলে না, কথা'চাই! কিন্তু আমার জীবনে আবার কথা কী! সব কথা ফুরিয়ে গেছে।"

—"কিন্তু আমার অনেক কথা ছিল।"

—"কিছু দরকার নেই।"

প্রদীপ এক মুহূর্ত স্তব্ধ হইয়া রহিল। পরে কহিল—"কোথায় যাচ্ছ জানতে তোমার একটুও কৌতূহল হচ্ছে না নমিতা?"

নমিতা এইবার প্রদীপের মুখের দিকে দুই চক্ষু তুলিয়া ধরিল। সেই চক্ষু দুইটি অপ্রত্যাশিতের আশঙ্কায় স্তিমিত নয়, ভাবাবেশে গভীর নয়, উলঙ্গ তরবারির মত

প্রখর। তাহার ঠোঁটের প্রান্তে মুমূর্ষু শশিলেখার মত একটি বিবর্ণ হাসি ভাসিয়া উঠিল। কহিল—"যাচ্ছি যে সেইটেই বড়ো কথা, কোথায় যাচ্ছি সেইটে নিতান্ত অবান্তর।"

গাড়ি এতক্ষণে ছাড়িল। রাশীকৃত কোলাহল ক্রমে-ক্রমে টুকরা-টুকরা হইয়া এখানে সেখানে ছিটকাইয়া পড়িতে লাগিল। গাড়ি এখন মাঠের মাঝে আসিয়া পড়িয়াছে।

প্রদীপ কহিল—"কিন্তু একটা জায়গায় গিয়ে ত ঠাঁই নিতে হবে।"

নমিতার স্বরে সেই অনুত্তেজিত ঔদাস্য: "কিন্তু পৃথিবীতে কোনো জায়গাই মানুষের পক্ষে শেষ আশ্রয় নয়। পৃথিবীর আহ্নিক গতির সঙ্গে-সঙ্গে জায়গাও বদলে যায়। তাই জায়গা সম্বন্ধে আমার কৌতূহলও নেই, আশঙ্কাও নেই। আমি সকল আশা-আকাঙ্ক্ষার বাইরে। সেই আমার ভরসা।"

প্রদীপ কাছে সরিয়া আসিল: "তুমি এ-সব কী বলছ নমিতা?"

নমিতা একটুও ব্যস্ত হইল না: "বলছি, আপনি যে-জায়গায় আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন সেখান থেকে ফের সরে পড়তে আমার দ্বিধা থাকবে না। আসবার যাবার দু'দিকের পথই আমার জন্য খোলা আছে। বুঝেছেন?"

জিজ্ঞাসাটুকুর মধ্যে শ্লেষ আছে। প্রদীপও ব্যঙ্গ করিয়া কহিল—"কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাকেই অবলম্বন করে আশ্রয় খুঁজতে বেরুলে; এটার মধ্যেও ত দ্বিধা থাকা উচিত ছিল।"

—"উচিত অনেক কিছুই ত ছিল। উচিত ছিল স্বামী না মরা, উচিত ছিল স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে যৌবন উবে যাওয়া। তার জন্যে আমার ভাবনা নেই। মেয়ে-মানুষ হয়ে জন্মেছি বলে আমার আর অনুশোচনা হয় না। আপনার সঙ্গে কেন বেরুলুম সেটা আপনিই ভেবে দেখুন না একবার।"

প্রদীপ কহিল—"আমার ভেবে দেখাতে ত কিছু এসে যাবে না। কিন্তু পাঁচজনের মুখের দিকে ঘোম্‌টা তুলে চাইতে পারবে ত নমিতা?"

—"আপনার সঙ্গে কেন বেরুলুম সেইটে আপনি ভাল করে ভেবে দেখেন নি বলেই পাঁচজনকে টেনে এনে আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন! আমি ত আর আপনার জন্যে বেরিয়ে আসি নি!"

ম্লান হাসিয়া প্রদীপ কহিল—"সে-কথা মুখ ফুটে না বললেও আমি ঠিক বুঝেছিলাম নমিতা। আমার জন্যেই যদি বেরিয়ে আসতে, তাহলে তোমার তপস্যার তাপে পাঁচজনের তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব ঘটতো। তখন তুমি আপন সত্যে স্থির, আপন

অধিকারে প্রতিষ্ঠিত থাকতে। আমার জন্যেও বেরুলে না, অথচ আমারই সঙ্গ নিলে, তোমার বাড়ির অভিভাবকরা এর সূক্ষ্ম রসটা আবিষ্কার করতে পারবেন কি?"
নমিতা চোখের দৃষ্টিকে কুটিল করিয়া কহিল—"বাড়ির অভিভাবকের রসবোধের অপেক্ষা রেখে ঘর ছাড়ি নি—একথা ভুলে গিয়ে আমার চরিত্রের ওপর কটাক্ষ করবেন না। তাঁরা বুঝুন না বুঝুন, আপনি বুঝলেই যথেষ্ট। রাত একটার সময় সদর দরজা খুলে গুটি-সুটি বেরিয়ে এসে পথের মাঝখানে আপনারই হাত ধরলাম, সংবাদটার মধ্যে যথেষ্ট মাদকতা আছে। সে-মাদকতায় আপনিই যাতে আচ্ছন্ন না হন সেই বিষয়ে আপনাকে সাবধান করে দেওয়া দরকার। কোনো দুর্বল মুহূর্তেই যেন এ ভেবে গর্ব অনুভব না করেন যে, আমি আপনার ব্যক্তিত্বে অভিভূত হয়েই আপনার বশ্যতা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছি। আমি বেরিয়েছি নিজের প্রেরণায়, নিজের দায়িত্বে—আপনি আমার পক্ষে একটা উপকরণ মাত্র,-লক্ষ্য নয়। দয়া করে এ কথা মনে রেখে চলবেন আশা করি।" বলিয়া নমিতা একটা ঢোঁক গিলিল। তাহার উত্তেজনা এখনো শান্ত হয় নাই। জিভ দিয়া ঠোঁট দুইটা ভিজাইয়া আবার সে কহিল—"আমার স্বামীর ফোটোটা আপনি ভেঙে দিয়ে এসে আমার বিপ্লবের সমস্ত মাহাত্ম্য নষ্ট করে দিয়েছেন। ভেবেছিলেন আমিই একদিন ওটাকে ভেঙে-চুরে ছিঁড়ে-ছিঁড়ে কুটি-কুটি করে ফেলবো। মিথ্যাচারকে আর কত দিন প্রশ্রয় দেওয়া চলে?"
প্রদীপের মুখ দিয়া বিস্ময়সূচক একটা ধ্বনি বাহির হইবার আগেই নমিতা কহিল—"হ্যাঁ, মিথ্যাচারই ত। সত্যকে পাব ভেবে সে-নিষ্ঠাকে যত মহৎ করেই দেখি না কেন, তার মধ্যে নিত্যের দেখা না পেলেই দারুণ ঘৃণা ধরে যায়। সেই ঘৃণা প্রকাশ করবার দিনের নাগাল আজ পেয়েছি আমি।"
ঘোমটার তলা হইতে বিপর্যস্ত চুলগুলি দুই হাতে তুলিয়া লইয়া নমিতা খোঁপা বাঁধিতে বসিল।
গাঢ়স্বরে প্রদীপ কহিল—"তোমার সান্নিধ্যের মাদকতায় আমি অবিচল থাকবো, আমার ওপর তোমার এ-বিশ্বাস এলো কি করে? তুমি সাবধান করে দিলেই যে আমার স্নায়ুমণ্ডলী মন্ত্রমুগ্ধ সাপের মত নিস্তেজ হয়ে থাকবে—আমার ভালবাসাকে তুমি এতটা হীন ও দুর্বল করে দেখবার সাহস কোথা থেকে পেলে নমিতা?"
অথচ কথার সুরে মিনতি ঝরিতেছে। নমিতা স্তম্ভিত বিস্ময়ে প্রদীপের মুখের দিকে চাহিল। সে-মুখে সহসা উষাভাসের লাবণ্য আসিয়াছে, নমিতা চোখ ফিরাইতে পারিল না। প্রদীপ আবার কহিল—"তার চেয়ে তুমি বাড়ি ফিরে যাও। কিম্বা

তোমার যদি আর কোনো আত্মীয়-স্বজন থাকে, ঠিকানা বল, তোমাকে সেখানে রেখে আসি। আমার সঙ্গে তুমি এসো না। আমি নিষ্ঠুর হলে বলছি না, আমি লোভী; আমার রক্ত খালি তপ্ত নয়, পিপাসিত। সমাজের কলঙ্কভাজন হতে আমার অশ্রদ্ধা নেই, কিন্তু তোমার আছে আমি কালো হতে পারবো না। আমাকে তুমি বিশ্বাস ক'রো না নমিতা।"

নমিতা স্থির শান্ত কণ্ঠে কহিল—"আমি আপনাকে খুব বিশ্বাস করি।"

—"না, আমার লোভের সীমা নেই নমিতা। না, না, সে তুমি বুঝবে না।"

—"আমি খুব বুঝি।"

—"বোঝ না। তোমাকে পাবার জন্যেই আমি দস্যু সেজেছিলাম। খালি প্রার্থনার মধ্যে পেতে হবে কেন, সংগ্রামের মধ্যেও লাভ করা যায়। তোমাকে আমি কেড়ে ছিনিয়ে নেব এই প্রতিজ্ঞায় আমার হাতের মুঠো দুটো কঠিন হয়েছিল। কিন্তু তোমাকে কোনোদিন পাব না জানলে এমন পিপাসাকে প্রশ্রয় দিতাম না।"

নমিতা ধীরে কহিল—"আপনার এ অস্থিরতা দেখে আমারই ভারি লজ্জা করছে। কোনো মেয়ের কাছে পুরুষের এই নাকি-কান্নার মত বীভৎসতা পৃথিবীতে আর কিছুই নেই। আপনি যা বলেন বলুন, আমি আপনারই সঙ্গে যাব। যেখানে নিয়ে যাবেন সেখানে, অপ্রতিবাদে, যে কোনো সর্বনাশে। নিন, ধরুন আমার হাত।" বলিয়া নমিতা তাহার আঁচলের তলা হইতে একটি শুভ্র শীর্ণ হাত বাড়াইয়া দিল।

প্রদীপ তাহা ছুঁইতেও পারিল না। যেন আগামী জন্মে চলিয়া আসিয়াছে এমনই একটা অভাবনীয় চেতনায় সে খানিকক্ষণ বিমূঢ় হইয়া রহিল। সেই অতটুকু নমিতা এত শীঘ্র এমন করিয়া বদলাইল কিসে? তাহার মেরুদণ্ড কয়েকদিনেই কঠিন দুর্নমনীয় হইয়া উঠিয়াছে। হাত বাড়াইয়া দিবার ভঙ্গিটিতে কী তেজস্বিতা! এত নিভৃতে নিকটে রহিয়াও তাহার স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদাটুকুকে সে সন্দেহে দুর্বল, আশঙ্কায় নিষ্প্রভ করিয়া তুলে নাই। হাসিয়া কহিল—"আপনি ত আমার বন্ধু, দেখি, আপনার হাত দিন।"

প্রদীপ একটিও কথা কহিতে পারিল না, আস্তে তাহার হাতখানি অসীম ভীরুতায় প্রসারিত করিয়া দিল। নমিতা তাহা স্পর্শ করিয়াই ছাড়িয়া দিল না; কহিল—"একদিনেই আমার জন্মদিন আবার ঘুরে এল, এবং এ-জন্ম মনে হচ্ছে পৃথিবীতে নয়, আকাশে। আপনার লোভকে আমি ভয় করব ভাবছেন? কেন, আমি জয় করতে পারি না?" একটুখানি হাসিয়া আবার কহিল—"আপনার লোভ আছে,

আমার দুর্গম দুর্গ নেই? আপনি আক্রমণ করতে পারেন, আর আমি আত্মরক্ষা করতে পারি না?"

না, পার না—প্রদীপ ইচ্ছা করিলেই ত ঐ তপঃশীর্ণা দেহলতাকে তাহার বুকের উপর দলিত করিয়া ফেলিতে পারে। ঐ ভুরু, নাক, ঠোঁট—আভরণহীন দুখানি রিক্ত বাহু—সমস্ত কিছু সে অজস্র অজস্র চুম্বনে সোনা করিয়া দিবে। কিন্তু নমিতার চারিদিকে এমন একটা অব্যাহত কাঠিন্য, এত কাছে বসিয়াও চতুর্দিকে সে একটা দূরতিক্রম্য দূরত্ব বিস্তার করিয়া আছে যে, প্রদীপ একটি আঙুলও নাড়িতে পারিল না। নমিতা কহিল—"তাহলে আপনি যে ঘটা করে অত-সব বক্তৃতা দিয়ে এলেন তা শুধু আমাকেই লাভ করতে, আমাকে মুক্ত করতে নয়?"

প্রদীপ হাত সরাইয়া নিয়া কহিল—"তার মানে?"

—"তার মানে, আপনার সঙ্গে আমার যদি আইনানুমোদনে বিধবা বিবাহ হত, তাহলে স্বচ্ছন্দে আবার আমাকে দাসী বানিয়ে ফেলতেন। অর্থাৎ, আমি যদি কোনোদিন কোনো ছুঁতোয় খাঁচা ভেঙে বেরিয়ে পড়তে পারি, বিশ্রামের জন্য আবার যেন আপনারই শাখায় এসে বসি—এই আপনার কামনা ছিল?"

প্রদীপ কহিল—"ছিল নমিতা। কিন্তু অমন রূঢ় উপমা প্রয়োগ করো না। একদিন এই সব নিষ্ফল পূজোপচার দু'হাতে ছড়িয়ে দিয়ে তুমি ব্যক্তিত্ব-পূজায় বরণীয় হয়ে উঠবে এই কামনা করে তোমার জন্য আমি একটি প্রতীক্ষার বাতি জ্বেলে রেখেছিলাম। যে অসীম-শূন্যচারী পাখী চলার বেগে খালি চলে, থামে না, তার বেগের মাঝে একটা ক্লান্তির কদর্যতা আছে।"

নমিতা হাসিয়া কহিল—"এও আপনার রূঢ় উপমা। জানেনই ত, বড় বড় কথা আমি বুঝি না। দুর্বোধ হবার জন্যেই সে-সব কথা বড় বলে বড়াই করে সেগুলোকে আমার অত্যন্ত বাজে মনে হয়।"

দুই জনে আবার চুপ করিয়া গেল। দিগন্তবিস্তীর্ণ মাঠের শেষে অবনত আকাশের অজস্র প্রসারের পানে চাহিতে-চাহিতে নমিতার দুই চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। আবার অসঙ্কোচে ভাবগদ্‌গদ স্বরে কহিল—"কী সঙ্কীর্ণ সংসার থেকে এই প্রচণ্ড পৃথিবীতে এসে উত্তীর্ণ হলাম, তার জন্যে আপনাকে বহু ধন্যবাদ।"

প্রদীপের বিস্ময়ের অবধি নাই: "আমাকে?"

—"এই উন্মুক্ততার স্বপ্ন আমাকে আরেকজন দেখিয়েছিলেন, কিন্তু আপনার বিদ্রোহ একটা ঝড়ের আকারে আমার ঘরে ঢুকে আমার আরাম ও আলস্য, স্থিরতা ও স্থবিরতা সমস্ত লণ্ডভণ্ড করে দিলে। আপনার আচরণে যতই কেন না একটা

অপরিচ্ছন্নতা থাক, সে-অসহিষ্ণুতার মাঝে শক্তি ছিল, তেজ ছিল। তাই আপনাকেই সঙ্গী করলাম।"

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া নমিতা আবার কহিল—"আমি যে সমাজের প্রতি কী অমানুষিক বিদ্রোহাচরণ করলাম তা আপনিও বুঝবেন না।"

প্রদীপ অনিমেষ চোখে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

নমিতা কহিল—"ঐহিক বা পারত্রিক কোনো লোভের বশবর্তী হয়েই এই বিরুদ্ধাচরণ করি নি। লোকে যতই কলঙ্ক দিক, আমার ভগবান তা শুনবেন না। আর, আমি তারই সঙ্গ নিলাম, যার দুর্ধর্ষ আচরণে সমস্ত সংসারের কাছে আমার মুখ অপমানে ও লজ্জায় কালো হয়ে উঠল।"

—"মানুষের মনোরাজ্যের এমন একটা অস্বাভাবিক বিশৃঙ্খলা আমার কাছেও ভারি অদ্ভুত ঠেকছে নমিতা। যার প্রতি তোমার বিদ্বেষ ও রাগের অন্ত থাকা উচিত নয়, এবং এখনো যার প্রতি তুমি মৌখিক শিষ্টাচারের একটা কৃত্রিম আবরণ মাত্র মেনে চলছ, তোমার এই দুর্দিনে তাকেই তুমি সাথী নিলে, এটার রহস্য সত্যিই রোমাঞ্চকর নমিতা।"

নমিতা দৃঢ় হইয়া কহিল—"না, এটার মাঝে অবাস্তব উপন্যাসের কোনো ইন্দ্রজালই নেই কিন্তু। আমার আচরণটা কোষমুক্ত অসির মতই স্পষ্ট। আপনাকে আগেই বলেছি বেরিয়ে আসাটাই আমার কীর্তি, তার নিমিত্তটা অশরীরী। কিন্তু সংসারে আপনাকে নিয়েই আমার দুর্নাম, আপনাকে দিয়েই আমার উৎপীড়ন—ভাবলাম এমন কীর্তিসঞ্চয়ের দিনে আপনিই আমার উপযুক্ত সহচর। শুধু সমাজ নামে ঐ বধির শাসনস্তূপটা নিজের দাহে নিজেই পুড়ে ছাই হয়ে যাক, সেই আনন্দেই আপনার সাথী হলাম, আপনার কামনার আগুনে নিজেকে পুড়িয়ে ছাই করবার জন্যে নয়।"

মুগ্ধ হইয়া প্রদীপ কহিল—"এত কথা তুমি শিখলে কোথা থেকে?"

নমিতা হাসিয়া কহিল—"এ সব ভাবলেশহীন অসার বক্তৃতা নয় যে, বই বা খবরের কাগজ থেকে মুখস্থ করে এসে চেঁচিয়ে লাফিয়ে সবাইকে চমকে দেব। এ আপন আত্মার কাছ থেকে গভীর করে জানা, আপন অন্তরের খনি খুঁজে এ-মণি আবিষ্কার করতে হয়। তাই এ-শিক্ষা পেতে দিন-ক্ষণ পাঁজি-পুঁথি লাগে না, একটি মুহূর্তস্থায়ী বিদ্যুৎ-বিকাশে সমস্ত আকাশ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। আপনাকে বাহন করার উদ্দেশ্যই হচ্ছে আমার সমাজকে শাসন করা। তদতিরিক্ত কোনো মূল্য আপনাকে আমি দিতে পারছি না।"

প্রদীপ তাহাকে বিরত করিয়া কহিল—"মুক্তি তুমিই খালি লাভ কর নি নমিতা, আমিও। তুমি তোমার আচরণের মুক্তি, আমি আমার অন্তরের স্বাধীনতা। আপন আত্মার কাছ থেকে আমিও গভীর করে সত্য শিখে নিলাম নমিতা, এক মুহূর্তে, চোখের একটি দ্রুত পলক-পতনের আগে। সঙ্কীর্ণ অচলায়তন ছেড়ে আজ আত্মোপলব্ধির পথ পেলাম।"

নমিতা বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। পরে ধীরে কহিল—"আপনার জীবনের এই সব উত্তেজিত মুহূর্তগুলিকে আমি ভয়ানক সন্দেহ করি। এই অন্ধ উত্তেজনাই হচ্ছে সত্যিকারের ম্রিয়মাণতা।"

—"নয়, নয়, তা নয় নমিতা। আমি খালি সংগ্রাম করব এ-উত্তেজনা যেদিন লাভ করেছিলাম, সেদিন আমার কবিত্বের, আমার আত্মবিকাশের সমস্ত বাতায়ন রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেটা একটা উগ্র নেশা মাত্র ছিল, হোলি-খেলার উৎসব জমাতে গিয়ে হিন্দুস্থানিরা যেমন মদ খায়। সেটাতে সৃষ্টির উত্তেজনা ছিল না, স্নায়ুকে সে সহিষ্ণু করে না, সেতারের তারের মত সঙ্গীতময় করে তোলে না। কিন্তু আমিও যে কতদিন রাত্রির আকাশের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আপন অস্তিত্বের প্রসারতা বোধ করেছিলাম সৃষ্টির প্রেরণায়, সে-সত্য আজ আবার তোমাকে কাছে পেয়ে উদ্ঘাটিত হল নমিতা। সমস্ত ভুল আমার ফুল হয়ে বিকশিত হল। আর আমি সৈনিক নই, স্রষ্টা। বুঝলাম, জোর খাটালেই লাভ করা যায় না, তপস্যা চাই। যে-জিনিস সাধ করে হাতে আসে না নমিতা, তার মধ্যে স্বাদ কই?" বলিয়া প্রদীপ হঠাৎ নমিতার দুই হাত চাপিয়া ধরিল।

নমিতা হাত সরাইয়া নিল না। তেমনি উদাসীন নির্লিপ্তের মত কহিল—"আপনার এমন স্নায়ুদৌর্বল্যের খবর পেয়ে আপনার বন্ধু নিশ্চয়ই আর আপনাকে ক্ষমা করবেন না।"

প্রদীপ ব্যস্ত হইয়া প্রশ্ন করিল—"কে? অজয়?"

নমিতা অস্ফুট স্বরে কহিল—"হ্যাঁ; তিনি আপনাকে ভাববিলাসী, অকর্মণ্য বলে ঘৃণা করবেন।"

তাড়াতাড়ি নমিতার হাত ছাড়িয়া দিয়া প্রদীপ উত্তেজিত হইয়া কহিল—"কেন, পদে-পদে আমি ওর প্রতিবিম্ব হয়ে থাকবো, আমাকে সৃষ্টি করবার সময় বিধাতা এমন চুক্তি করেছিলেন নাকি? মানুষের বিশ্বাসেরও সীমা থাকা উচিত। তার জন্যে সমস্ত বিশ্বকে সঙ্কীর্ণ করে রাখতে হবে আত্মার এমন খর্বতা আমি সহ্য করবো না। নতুন সত্যের আলোকে পুরানোকে পরিষ্কৃত করে নেব না, আমার এমন অন্ধ

অনৌদার্য নেই। বহু-বৈচিত্র্যের আস্বাদে যে বদলায় না, তাকে আমি জীবন্মৃত বলি নমিতা। অজয়ের ক্ষমা না-ক্ষমায় আমার কিছু এসে যায় না। তার সত্য তার, আমার আমার। তার পথ থেকে আমি সরে এলাম। আমি একা, আমি নবীন।"

নমিতার ঠোঁটের কিনারে সামান্য একটি ধারালো হাসি ফুটিয়া উঠিতেই প্রদীপ কথা থামাইল। নমিতা কহিল—"বদলানোতে আপনার বাহাদুরি আছে। কিন্তু সে-কথা থাক। আমাকে নিয়ে এখন কি করতে চান?"

প্রদীপ খুশি হইয়া উঠিল: "আমাকে নিয়ে তুমি কি করতে চাও বল?"

নমিতার মুখ গম্ভীর; একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—"দেখা যাক।"

একটা স্টেশনে গাড়ি থামিল। প্রদীপ উঠিয়া পড়িয়া কহিল—"তখন থেকে খালি বাজে কথা বলে চলেছি। তোমার মুখ শুকিয়ে গেছে একেবারে। দেখি স্টেশনে কিছু ফল-টল কিনতে পাই কি না।"

নমিতা বাধা দিয়া কহিল—"আমার জন্যে অকারণে ব্যস্ত হবেন না। শরীরকে আমি স্বচ্ছন্দে শাসন করতে পারি।"

কথায় এমন একটা তেজোদ্দীপ্ত দৃঢ়তা যে প্রদীপের পা দুইটা অচল হইয়া রহিল।

গাড়ি আবার চলিয়াছে।

ম্লান মেঘনার তীরে অখ্যাত একটি পল্লীতে প্রদীপের একখানি নির্জন কুটির ছিল। চারিপাশে অজস্র শ্যামলতায় গ্রামবধূর প্রগল্‌ভ নির্লজ্জতা দেখিয়া নমিতা মনে-মনে পরম তৃপ্তি পাইল। এমন একটি উন্মুক্ত অবারিত শান্তির জন্যই তাহার তৃষ্ণার অবধি ছিল না। মাঠের উপর আসিয়া দাঁড়াইলে আকাশের দর্পণে আত্মার ছায়া পড়ে—নিজের বিরাট সত্তার সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয় ঘটে। এমন একটা মহান মুক্তির স্বাদ হইতে সে এতদিন বঞ্চিত ছিল। মানুষের ভবিষ্যত যে কত সুদূর বিস্তৃত, কত বিচিত্র পরিণামময়—নমিতার চারিদিকে যেন এই সুস্পষ্ট সঙ্কেতটি সহসা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

প্রদীপ কহিল—"নদীর এ-ধারটা একেবারে ফাঁকা; ওধারে কতকগুলো বাগ্দিপাড়া আছে। তুমি স্বচ্ছন্দে স্নান করে এস, আমি পাহারা দিচ্ছি।"

নমিতা হাসিয়া কহিল—"যদি জলে ভেসে যাই, তবে আপনার পাহারায় কি আর সুফল হবে? তার চেয়ে চলুন, দু'জনে বাগ্দিপাড়াটা ঘুরে আসি না হয়।"

প্রদীপ কহিল—“যেতে-যেতে রাত হয়ে যাবে ; কাল সকালে যাওয়া যাবে'খন।”

কথার সুরে যেন শাসনের আভাস আছে। নমিতা একটু হাসিল মাত্র।

গ্রামের মথুর দাস প্রদীপের একসঙ্গে ভাই ও ভৃত্য। সে আসিয়া বিছানা-পত্র হাঁড়িকুঁড়ি লোকজন সমস্ত নিমেষে জোগাড় করিয়া দিল। রাত্রে নমিতার যদি রাঁধিতে কষ্ট হয়, তবে একটি বিধবা ব্রাহ্মণ-কন্যাকেও সে ডাকিয়া আনিতে পারিবে। প্রদীপ মথুরের বাড়িতেই পাত ফেলিবে যা হোক!

প্রদীপ কথাটা পাড়িল। নমিতা রুখিয়া উঠিল—“বিধবারা আবার রাত্রে গেলে নাকি? এটা কোন্ দেশের বিধান?”

প্রদীপ কহিল—“কিন্তু আজ সারাদিন তুমি এক ফোঁটা জলও মুখে তোল নি, রাত্রে খেলে তোমার অধর্ম হবে না।”

নমিতা স্পষ্ট করিয়া কহিল—“কিসে আমার ধর্মাধর্ম হবে সে-পাঠ আপনার কাছ থেকে না নিলেও আমার চলবে। মনে রাখবেন, আমি বিধবা, ব্রহ্মচারিণী।”

প্রদীপ হাসিয়া কহিল—“এই তেজটা এতদূর না এসে শ্বশুরালয়ে দেখালেই ভালো মানাতো। ফের নিয়ে যাব সেখানে?”

শেষের কথাটার মধ্যে এমন একটা কদর্য ঝাঁজ ছিল যে নমিতার সহিল না। সে কহিল—“কোথায় যেতে হবে না হবে সে পরামর্শ আপনার না দিলেও চলবে। পারে এসে নৌকো আমি পায়ে ঠেলে জলে তলিয়ে দিতে পারি যে কোনো মুহূর্তে।”

প্রদীপ ব্যঙ্গের সুরে কহিল—“আর নৌকো যদি ঝড়ের সময় তোমাকে না ডুবিয়ে বরং নিরাপদে পারেই পৌঁছে দেয় তবে তাকে ধন্যবাদ দিয়ো। দয়া করে মনে রেখো তুমি আমার অধীনে, এখানে তোমার এত সব বৈধব্যের আস্ফালন চলবে না।”

নমিতার অধর স্ফুরিত হইয়া উঠিল ; কহিল—“আপনিও দয়া করে মনে রাখবেন আপনার অধীনে আসবার জন্যেই আমি এত আড়ম্বর করিনি। আপনার অধীনতায় বিশেষ মাধুর্য কোথাও নেই। এখন যান, যেখানে আপনার কাজ আছে। আমাকে আর বিরক্ত করবেন না।”

প্রদীপ কহিল—“যথেষ্ট ব্রহ্মচর্য দেখিয়েছ নমিতা। একজন পুরুষকে ধাওয়া করে এতদূর নিয়ে এসে তারপর তার স্পর্শ থেকে সঙ্কুচিত হয়ে থেকে নিজের সতীত্ব ফলাচ্ছো, এর মধ্যে মনুষ্যত্ব নেই।”

নমিতা চিৎকার করিয়া উঠিল—“যান, যান, শিগ্‌গির এ-ঘর ছেড়ে চলে যান। যান শিগ্‌গির।”

ঋজু শীর্ণ দেহ যেন অগ্নিশিখা, বাহুটি বিদ্যুৎবর্তিকার মত প্রসারিত, মুখমণ্ডলে রক্তচ্ছটা। প্রদীপের বলিতে সাহস হইল না ; এ ঘর-বাড়ির মালিক আমি, আমাকে ঠেলিয়া ফেলিলেই দূর করা যায় না। এ ঘরে আমার অপ্রতিহত অধিকার, তুমি আমার বন্দিনী ; আমাকে ছাড়িয়া যাইবার তোমার পথ কোথায় ?

সে নীরবে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সেই যে নমিতা দুয়ার দিল—পরদিন ভোর না হইলে আর সে বাহির হইল না। মাঝরাতে প্রদীপ একবার উঠিয়া আসিল সত্য, কিন্তু দুয়ারে করাঘাত করিয়াও কোনো সাড়া মিলে নাই। সমস্ত রাত্রি সে নিদারুণ অনুতাপে বিদ্ধ হইয়াছে। নমিতার মাঝে ত সে বিদ্রোহিণী দাহিকা-শক্তিরই উদ্বোধন দেখিতে চাহিয়াছিল, অথচ সে তাহার বশবর্তিনী হইতেছে না বলিয়া তাহার এই আক্ষেপ কেন ? কেন যে এই আক্ষেপ, সারা রাত্রি না ঘুমাইয়াও সে তাহার কারণ খুঁজিয়া পাইল না।

ভোরবেলা ঘর ছাড়িয়া বাহির হইতেই প্রদীপ দেখিল নদীর পারে ঘাসের উপর পা ছড়াইয়া নমিতা বসিয়া আছে। মাথায় ঘোমটা নাই, খোলা চুলগুলি হাওয়ায় উড়িতেছে। এত তন্ময় যে প্রদীপের পায়ের শব্দ পর্যন্ত সে শুনিতে পাইল না। প্রদীপ কাছে আসিয়া কহিল—"কালকের দুর্ব্যবহারের জন্যে আমাকে ক্ষমা কর নমিতা।"

নমিতা অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইল। সে-মুখের ও কণ্ঠস্বরের নির্মলতা তাহাকে স্পর্শ করিল। সে হাসিয়া কহিল—"ও-সব ভণিতা ছেড়ে এখানে একটু বসুন। এমন সুন্দর নদী আমি আর কোথাও দেখিনি।"

প্রদীপ একটু দূরে সরিয়া বসিল : "তোমার চোখ দিয়ে আমিও এই সৃষ্টিকে নতুন করে দেখতে শিখেছি নমিতা। এই নদী, তার এই অনর্গল স্রোত, ওপরে অবারিত আকাশ, পারে ছোট একটি নীড়—আর দুটি আত্মা ঘিরে অপরিমেয় নিস্তব্ধতা—মনে হয় নমিতা, সৃষ্টির আদিম যুগে চলে এসেছি আমরা। তোমার মুখ ও এই অবারিত শান্তি ছাড়া পৃথিবীতে আমার আর কী কামনা থাকতে পারে ? সত্যিই এর বেশি আমি আর কোনোদিন কিছুই চাইনি।"

কী-কথায় যে কোন্ কথা মনে পড়িয়া যায় বলা কঠিন। নমিতা জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা, আপনার বন্ধুর ঠিকানা জানেন ?"

প্রদীপ কথাটার সোজাসুজি উত্তর দিল না : "আমার বন্ধু ত একটি দুটি নয়, কার কথা বলছ ?"

—"যার কথা বলছি তাকে আপনি খুব ভাল করেই চিনতে পেরেছেন। আমার মুখে নামটা তার শুনতে চান ?—অজয়।"

ঢোঁক গিলিয়া প্রদীপ কহিল—"তার ঠিকানা জানবার কোনো স্থবিধেই সে কাউকে দেয় না কোনোদিন।"

—"কিন্তু আপনি-আমি এখানে এসেছি জানলে নিশ্চয়ই একবার আসতেন। তিনি এ-বাড়িতে কোনোদিন আসেননি বুঝি?"

—"বহুবার। এটা আমাদের একটা ওয়েটিং-রুম ছিল। জিরোবার হলে আপনিই একদিন চলে আসবে। তাকে কি তোমার খুব দরকার?"

ম্লান হাসিয়া নমিতা কহিল—"না, দরকার আবার কী! তিনি ত এমন মানুষ নন যে দরকারে লাগবেন কারুর। নিজের খেয়ালে নিজে ভেসে চলেছেন। কিন্তু এবার উঠি আস্থন, বাগ্দি-পাড়াটা ঘুরে আসি। তারপর গিয়ে রান্না-বান্নার জোগাড় করা যাবে। এখানকার হাওয়ার এই গুণ যে বেশিক্ষণ রাগ করা যায় না—ভীষণ খিদে পায়। আমি রেঁধে দিলে খাবেন ত? দেখুন।"

ছুই দিন কাটিল। এত শ্রান্তি প্রদীপ কোথায় রাখিবে? আবার ঘন ধোঁয়ার মত কুণ্ডলী পাকাইয়া রাত্রির অন্ধকার নামিয়া আসিতেছে। প্রতিটি মুহূর্তের সঙ্গে এই নিষ্ফল সংগ্রামে লিপ্ত থাকিয়া আর কত শক্তি সে ক্ষয় করিবে?

এত কাছে আসিয়া রহিল, অথচ এমন কঠোর নির্লিপ্ততা—ইহার গভীরতা তলাইয়া বোঝে প্রদীপের সাধ্য কি? সংসারকে শাসন করিবার জন্য সে এমন একটা নিষ্ঠুর আঘাত করিয়াই ক্ষান্ত হইয়া রহিল, এই দুর্বলতার কদর্যতা প্রদীপকে দিবারাত্রি পীড়া দিতেছে। ছুই বেলা রাঁধিয়া দেয়, সান্নিধ্যে সাহচর্যে মুহূর্তের পাত্রগুলি মাধুর্যের রসে ভরিয়া তোলে, অথচ কী স্থদূর একটি ব্যবধান রচনা করিয়া নিজেকে কেন যে নমিতা এমন নিস্পৃহ, নিরাকুল করিয়া রাখিল কে ইহার অর্থ বুঝাইবে? যদি শুশ্রূষাময়ী কল্যাণী নদীলেখাটির মতই একটি স্নেহসেবাপূর্ণ মমতা লইয়া নমিতা না বহিবে, তবে সে এই ঝড়ের পথিককে নীড়ে লইয়া আসিল কেন? প্রদীপের এক এক সময় ইচ্ছা হয় গূঢ় অপরিচয়ের ব্যূহ ভেদ করিয়া প্রবলশক্তিতে নমিতাকে সে সম্পূর্ণ উদঘাটিত করিয়া উদ্ধার করিয়া লয়, কিন্তু কী যে রহস্য তাহাকে আবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে তাহার না মিলে সন্ধান, না বা সমাধান। প্রদীপ হাঁপাইয়া উঠিল।

সকালে ছুইজনে তাহারা বেড়াইতে বাহির হয়, নদীর পার ধরিয়া অনেকটা ঘুরিয়া আসে। পল্লীগৃহগুলি যেখানে স্তূপীকৃত হইয়া আছে, সেটা ছুইদিন নমিতার কাছে তীর্থ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু কাল সন্ধ্যায় সে সেখানে একা গিয়া একটি অর্ধবৃদ্ধা নারীর মুখে তাহার কলঙ্কসূচক তিরস্কার শুনিয়া আর ঐ মুখে পা বাড়াইতে চাহে না। বিধবা হইয়া পুরুষমানুষের এই সান্নিধ্য-সম্ভোগ—ইহার একটা স্থূল ব্যাখ্যা

করিয়া সেই মেয়েটা নমিতাকে একেবারে অপ্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল। নমিতার নাকালের আর অবধি রহিল না, সে না পারিল প্রতিবাদ করিতে, না বা পারিল বুঝাইয়া দিতে যে তাহারা পল্লী-সংস্কার করিতে আসিয়াছে, তাহারা সহকর্মী। গ্রামের লোকের অত-শত বুঝিবার ধৈর্য নাই, আগুনের আগে কলঙ্ক চলে। আজ সকালে নমিতাকে দেখিবার জন্য নদীর পারে লোক জড়ো হইয়াছিল।

প্রদীপ এই কথাটিকেই অবলম্বন করিয়া এমন একটা সঙ্কেত করে যেন তাহাদের পরিচয় ঘনতর হইলেই এই কলঙ্ক চাপা পড়িবে, কিন্তু নমিতা অল্প একটু হাসিয়া সকল সন্দেহের কুয়াসা উড়াইয়া দিয়া বলে: "মানুষের ভুয়ো কথায়ই যদি কান পাতব তবে বাইরে বেরবার আর মর্যাদা কি ছিল! লোকে যা বলে বলুক। একদিন আমিই হব এদের লোকলক্ষ্মী।" বলিয়াই সে নানারূপ গভীর আলোচনায় মত্ত হইয়া উঠে। হাওয়ায় শাড়ি ও আঁচল উড়িতে থাকে, চোখে মহাভবিষ্যতের স্বপ্ন দীপ্ত হইয়া উঠে—মনে হয় নমিতাই যেন সেদিনের আকারময়ী সম্ভাবনা।

প্রদীপ বলে: "ঘরে-বাইরে এ অপমান তুমি বেশি দিন সইতে পারবে না।"

—"খুব পারব। প্রথমত আমার পক্ষে ঘর নেই, সমস্তটাই বাহির। এবং সে বাহির যে কত প্রকাণ্ড তা আমি ধারণাই করতে পারি না। তাই ত আত্মার এত বিস্মৃতি অনুভব করি। আর যাকে অপমান বলছেন, সত্যিই তা অপমান নয়, প্রমাণ।"

—"কিসের?"

—"আমি যে প্রস্তুত হতে পারছি তার।"

—"কিন্তু তোমার জন্যে শুধু-শুধু এই অপমান আমি সইতে যাবো কেন?"

নমিতা চুপ করিয়া থাকে। পরে মুখ তুলিয়া বলে: "বেশ, স্বচ্ছন্দে আমাকে বর্জন করুন।"

—"তোমাকে বর্জন করবার জন্যেই এতটা পথ আসা হয়নি।"

—"তাহলে অপমান সওয়াটা শুধু-শুধু হল কি করে?"

আবার চুপ করিতে হয়। প্রদীপ প্রশ্ন করে: "আর কত দিন থাকবে এখানে?"

নমিতা গম্ভীর হয়ে বলে: "দেখি।"

এই ছোট কথাটির মধ্যে যেন বহু দিনরাত্রি প্রতীক্ষার স্বপ্ন রহিয়াছে। প্রদীপের কছে নমিতার এই কঠোর ধ্যানময়তা সহসা বাঙ্ময় হইয়া উঠিল। কাহার জন্য তাহার এই অবিচল প্রতীক্ষা এতক্ষণে সে বোধ হয় বুঝিতে পারিল। কিন্তু নামটা জিজ্ঞাসা করিতে আর সাহসে কুলাইল না।

সাহসে কুলাইল না বটে, কিন্তু অধিকারবোধের অহঙ্কারে সে নমিতার পরধ্যানলীন

মূর্তির এই নিস্পৃহতাও সহ্য করিতে পারিল না। প্রদীপ এমন ধরণের লোক নয় যে, সমস্যার সমাধান একমাত্র সময়ের বিবর্তনের উপর ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া থাকিবে; সোজাসুজি গোটা কয় তীক্ষ্ণ প্রশ্ন ও তাহাদের স্পষ্ট প্রখর উত্তরের উপরই তার অসীম নির্ভরতা। সেই প্রশ্নোত্তরের পেছনে অনুচ্চারিত কোনো গভীর অর্থ থাকিতে পারে কি না সে-বিষয়ের সন্ধানে তাহার প্রবৃত্তি নাই। তাহার ব্যবহারে যে একটা অপরিচ্ছন্ন অসহিষ্ণুতা আছে তাহাই তাহাকে অস্থির করিয়া রাখিয়াছে।

তাই রাত্রে শুইবার ঘরের দরজায় খিল দিবার আগেই প্রদীপ ঢুকিয়া পড়িল। কম্পমান দীপশিখায় প্রদীপের এই রূঢ় আবির্ভাবে নমিতা চমকিয়া উঠিল। স্পষ্ট দৃঢ় কণ্ঠে কহিল—"এ অসময়ে, হঠাৎ?"

মাথার চুলগুলিতে আঙুল চালাইতে চালাইতে প্রদীপ কহিল—"তোমার সঙ্গে আমার পরামর্শ আছে।"

গম্ভীর হইয়া নমিতা কহিল—"বলুন।"

নমিতার কথাগুলি এমন সংযত ও স্থির যে প্রদীপের সমস্ত ভাবোদ্বেগ কেমন ঘুলাইয়া উঠিল। তবু দৃঢ় করিয়াই কহিল—"আমাদের এমনি করে আর থাকা চলবে না।"

—"কোথায় যেতে হবে?"

—"যেখানেই যাই আমাদের সম্পর্কের একটা স্পষ্ট মীমাংসা দরকার।"

নমিতা বিরক্ত হইয়া বলিল—"যারা সমাজবিধানকে হেয়জ্ঞান করে বাইরে চলে এসেছে তাদের পক্ষে আবার সমাজানুমোদিত সম্পর্কের সার্থকতা কি? অপরাধ যদি সইতে না পারি, সেইটেই আমাদের প্রকাণ্ড অপরাধ।" কিছুক্ষণ থামিয়া থাকিয়া নমিতা জিজ্ঞাসা করিল: "তারপর বলুন?"

প্রদীপ কহিল—"সোজা স্পষ্ট করেই বলি নমিতা, আমি তোমাকে চাই।"

শান্ত স্বরে নমিতা বলিল—"কথাটা আমি আগেই শুনেছি। পুনরুক্তির প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু অর্থের রূপান্তর দরকার। বেশ ত, আমাকে আপনাদের যোগ্য করে নিন—কর্মে, সহনশক্তিতে, আত্মোৎসর্গে। এর চেয়ে আমাকে আর বড়ো করে পাওয়ার কিছু মানে আছে কি?"

বলিয়া নমিতা জানালার কাছে সরিয়া আসিল। জানালার বাহিরে নদীর উপরে অন্ধকার তরঙ্গ তুলিয়া পুঞ্জিত হইয়া রহিয়াছে—তাহারই পটভূমিতে নমিতাকে সর্ববন্ধচ্যুতা একটি শরীরী শিখার মত মনে হইল। প্রদীপ তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া নমিতার একখানি হাত ধরিয়া ফেলিল; কহিল—"তোমাকে চাওয়ার একটা

কায়িক অর্থ, আছে নমিতা। সে শুধু বিরহে নয়, বিবাহে। তোমাকে আমি চাই।"

নমিতা হাত সরাইয়া নিয়া কহিল—"হাত পেতে চাওয়ার দীনতা আপনাকে লজ্জা দেয় না? পাওয়ার জন্য যদি মূল্য না দেন তবে সে-পাওয়ায় স্বাদ থাকে কৈ?"

প্রদীপ কহিল—"আমি সবই বুঝি নমিতা। তবু আজকের এই ক্ষণটিতে মনে হচ্ছে সবার চেয়ে বড়ো হচ্ছে প্রেম—দশের চেয়ে বড় হচ্ছে এক। কোনো মূল্যই তোমার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়, আমাকে তুমি বিশ্বাস কর।" বলিয়া মূঢ়চেতন প্রদীপ নমিতাকে একেবারে বেষ্টন করিয়া ধরিল।

ইহার মধ্যে কোথায় একটু অন্যায় ছিল বলিয়াই হোক, বা প্রদীপের ব্যবহারে বর্বর বন্যতা ছিল না বলিয়াই হোক, নমিতার আকস্মিক আঘাতে প্রদীপ একেবারে ছিটকাইয়া পড়িল। নমিতা কহিল—"সমাজদ্রোহীদের এমন সামাজিক ব্যবহার ক্ষমার যোগ্য নয়। আপনি যে এত স্বার্থপর ও নীচ তা স্বপ্নেও ভাবি নি কোনোদিন। জানেন না আমি বিধবা?"

মাথার সেই ক্ষতস্থানেই বোধ হয় লাগিয়াছিল; তাই প্রদীপ রুখিয়া উঠিল: "আর যাকে মানাক তোমাকে এই সতীত্বের আস্ফালন শোভা পায় না। তুমি যা তুমি তাই। সমাজের হাটে তোমার নারীত্ব একটা পণ্য মাত্র। কিন্তু কাল সকালে তোমার যেখানে ইচ্ছা তুমি চলে যেয়ো, তোমার ওপর আমার দায়িত্ব নেই।"

নমিতা খালি একটু হাসিল।

সকালে যাইবার জন্য নমিতা প্রস্তুত হইতেছিল কিনা কে জানে, কিন্তু যাওয়া আর হইল না। শেষরাত্রি থাকিতেই পুলিশে আসিয়া বাড়ি ঘিরিয়াছে।

অবনীবাবু সহজে পরাস্ত হইবার লোক নহেন। বুঝিতে তাঁহার আর বাকি ছিল না যে নমিতার এই উদ্ধত আচরণের আড়ালে কাহার অঙ্গুলিনির্দেশ ছিল! সেইদিন দুপুর বেলায়ই প্রদীপ চলিয়া গেলে অবনীবাবু যখন বকিয়া-ঝকিয়া নমিতাকে একেবারে নাকাল করিয়া ছাড়িয়াছিলেন, যখন এমন পর্যন্ত বলিতে দ্বিধা করেন নাই: ঘরের বার হয়ে যেতে পার না ঐ গুণ্ডাটার সঙ্গে, এখানে বসে ঢলাঢলি করে আমাদের মুখে আর চুণ-কালি মাখাও কেন? তখন নমিতা নিজেকে আর দমন করিতে না পারিয়া বলিয়া বসিয়াছিল: বেশ ত, যাবই বেরিয়ে। কার সাধ্য আমাকে আটকায়! তাই ভোর হইলে অবনীবাবুর মনে আর লেশমাত্র সন্দেহ রহিল না যে, ঐ প্রদীপের সঙ্গেই ষড়যন্ত্র করিয়া চরিত্রহীন মেয়েটা কুল ডিঙাইয়াছে।

এত সহজে প্রদীপকে ছাড়িয়া দিবার পাত্র তিনি নন। ফল যাহাই হোক, ঐ গুণ্ডাটাকে একবার দেখিয়া লইতে হইবে। তিনি পুলিশে খবর দিলেন।

গাড়ি আবার কলিকাতার দিকে গড়াইল। রাত্রিকাল। একই গাড়িতে সকলে উঠিয়াছে—দু'পাশের বেঞ্চি দুইটাতে নমিতা আর প্রদীপ: মাঝেরটাতে পুলিশের কয়েকজন লোক। অপরিমেয় স্তব্ধতা—কাহারো চোখে ঘুম নাই। অনেক পরে প্রদীপ ইন্‌স্পেক্টারকে জিজ্ঞাসা কহিল—"জবানবন্দি ত টোকা হয়েছে, ওঁর সঙ্গে দুটো কথা বলতে পারি?"

ইন্‌স্পেক্টার নমিতার অনুমতি চাহিলেন—সে কিন্তু অতি সহজেই রাজি হইয়া গেল। হাসিয়া কহিল—"আসুন।"

প্রদীপ ধীরে উঠিয়া আসিল। দূরে বেঞ্চির এক পাশে সরিয়া বসিয়া কহিল—"জবানবন্দিতে কি বল্লে?"

পুলিশকে শুনাইয়া স্পষ্ট করিয়া নমিতা কহিল—"সত্য কথাই বলেছি। আপনি আমাকে ছল করে ওখানে নিয়ে গিয়েছিলেন আর নিতান্ত নির্লজ্জের মতো দৈহিক বলপ্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। বলেছি বৈ কি।"

প্রদীপ স্তব্ধ হইয়া রহিল। গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে কহিল—"জানতাম তুমি তা বলবে। এর চেয়ে সত্য করে কোনো নারী কোনো পুরুষকে দেখতে শেখেনি। কিন্তু কথাটাকে আরো একটু মার্জিত করে বললে না কেন?"

প্রদীপের মুখের দিকে অপলক চোখে চাহিয়া থাকিয়া নমিতা বলিল—"অমন একটা নিদারুণ কথার আরেকটা মার্জিত সংস্করণ আছে নাকি?"

—"আছে বৈ কি।" কণ্ঠস্বর হঠাৎ গাঢ় ও আর্দ্র করিয়া প্রদীপ কহিল—"বললে পারতে আমার ভালোবাসার আকর্ষণে তোমাকে সমস্ত প্রাচীন প্রথা ও শাসনের প্রাচীর থেকে মুক্ত করে উদার আকাশের নীচে নিয়ে এসেছি—যেখানে বিস্তৃত জীবন, বিচিত্র তার উৎসব। বললেই পারতে, সহজ অধিকারের দাবিতে তোমাকে কামনা করেছিলাম নমিতা।"

অন্ধকারের মধ্যে নমিতা হাসিয়া উঠিল। কহিল—"অত কথা পুলিশ বুঝত না যে—"

প্রদীপের মুখে আর কথা আসিল না। চুপ করিয়া একদৃষ্টে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল।

খানিক পরে নমিতা একেবারে ছেলেমানুষের মত তরল সুরে বলিয়া উঠিল: "কেমন মজা! শেষকালে কি না ফুসলিয়ে ঘরের বৌকে বার করার জন্যে জেল খাটবেন।

অদৃষ্টে দুর্গতি থাকলে এমনিই হয়—হাতীও শেষে কাঁটা ফুটে মারা পড়ে।” হঠাৎ কথার মাঝখানে প্রদীপের অত্যন্ত কাছে সরিয়া আসিয়া কানের কাছে মুখ আনিয়া ক্ষীণ অনুচ্চকণ্ঠে নমিতা কহিল—“আরো এমনি মজা যে আপনার হাতে এমন কোনো সম্বলও আজ নেই যে আত্মহত্যা করে এ কলঙ্ক থেকে ত্রাণ পেতে পারেন। আপনার বন্ধু এ কথা শুনলে কী ভাববেন বলুন দিকি ?”

কথা কয়টা কর্ণকুহরে নিক্ষেপ করিয়াই নমিতা আবার দূরে সরিয়া বসিল। প্রদীপ বলিল—“বন্ধু কী ভাববেন তা তিনিই ভাবুন। জেলে যদি আমি যাই-ও, তবু মনে এমন কোনো গ্লানি থাকবে না যে আত্মহত্যার উপকরণ হাতে নেই বলে অনুতাপ করতে হবে। ব্যাখ্যা একটা মনের মধ্যে কখন থেকেই গড়ে উঠেছে—তোমার জন্যেই জেলে গেলাম।”

—“আমার জন্যেই বৈ কি।” নমিতা ইন্‌স্পেক্টারের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল—“একজন অসহায়া বিধবা-মেয়েকে কৌশল করে ঘরের বাইরে এনে তার ওপর পশুর মত উৎপীড়ন করতে চান—আপনাকে লোকে জেলে না পাঠিয়ে ফুল-চন্দন দিয়ে পূজো করবে, আপনার ফোটো সামনে রেখে নিশান উড়িয়ে মিছিল করবে, না ?”

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া প্রদীপ কহিল—“যা খুশি বল। কিন্তু তুমি মনে-মনে ত জান আমি পশুও নই, দেবতাও হতে চাই না। তোমাকে আমি কামনা করেছিলাম বৈকি, সে-কামনা কবিতার মতই সুন্দর। তোমাকে পাইনি, পাওয়ার পেছনে যে প্রচুর তপস্যার প্রয়োজন হয় সে শিক্ষাই না-হয় জেলে বসে লাভ করা যাবে।”

—“যান যান্, আর বক্তৃতা করতে হবে না, এখন ঘুমুন গে।” বলিয়া নমিতা বেঞ্চির কিনারে কাঠের দেয়ালে হেলান দিয়া পা দুইটা সামনে একটু প্রসারিত করিয়া শুইবার ভঙ্গি করিল, এবং তাহারই ইঙ্গিতে ইন্‌স্পেক্টার আসামীর হাত ধরিয়া অন্য বেঞ্চিটাতে সরাইয়া আনিলেন।

কলিকাতা পৌঁছিয়া পুলিশ প্রদীপকে থানায় লইয়া গেল এবং নমিতাকে অবনীবাবুর জিম্মায় রাখিয়া বলিয়া দিল যেন ঠিক এগারোটার সময় তাহাকে চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে হাজির করানো হয়।

ভোর বেলা—উমা ছাড়া সবাইরই ঘুম ভাঙিয়াছে। আত্মীয়-পরিজনের শাসন-প্রখর দৃষ্টির সম্মুখে নমিতার মুখ একটুও ম্লান হইল না, তার দৃষ্টিতে একটু কুণ্ঠা, পদক্ষেপে না একটু জড়তা। চাদরটা গায়ের উপর ভালো করিয়া টানিয়া সে সিঁড়ি

দিয়া সোজা তাহার দোতলার পূজার ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। নির্ভীক বীরাঙ্গনা, অটল ঋজু মেরুদণ্ড, আকাশের অরুণ-রশ্মির মত তাহার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইতে যেন একটা দুঃসহ তেজ বিকীর্ণ হইতেছে। আত্মীয়-পরিজনরা মূঢ় দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, কেহ একটা কথা কহিতে পারিল না, বা না পারিল উহাকে বাধা দিয়া উহার মুখ হইতে এই জঘন্য আচরণের একটা অর্থ বাহির করিতে। অবনীবাবু উৎফুল্ল হইয়া ফোনে শচীপ্রসাদকে প্রদীপের গ্রেপ্তারের সংবাদ দিতে ব্যস্ত হইলেন, আর অরুণা তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া উমাকে জাগাইয়া কহিলেন—"ওঠ্ শিগ্‌গির, দেখবি আয়—পোড়ারমুখি ফিরে এসেছে—"

একলা বিছানায় পশ্চিমের বিধুর দিগন্তলেখাটির মত উমা ঘুমাইয়া ছিল। সুরের মাঝে অনুচ্চারিত বাণীর যে সুষমা, ঘুমন্ত উমার দেহে তেমনি একটি অনির্বচনীয় কান্তি। মায়ের হাতের ঠেলা খাইয়া সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল: "কে ফিরে এসেছে মা? বৌদি? আর, দীপদা?"

অরুণা মুখ বিকৃত করিয়া কহিলেন—"আর দীপদা! সে পাজিটা পুলিশের হাতে—হাতে তার হাতকড়া। এবার ঘানি ঘোরাবেন আর কি।"

উমার ঠোঁট দুইটি সহসা পাণ্ডুর হইয়া উঠিল: "ঘানি ঘোরাবেন মানে? উনি কি করলেন? যদি কেউ পথ ভুল করে বাইরে বেরিয়ে আসে তবে তাকে আশ্রয় দেওয়া পাপ না মহত্ত্ব? ওঁর মহত্ত্ব স্বীকার করে আমাদেরই বরং উচিত মা, ওঁকে একদিন নেমন্তন্ন করে খাইয়ে দেওয়া!"

কোথায় উমা জাগিয়া উঠিয়া মার সঙ্গে নিভৃতে একটুখানি নমিতার চরিত্রালোচনা করিবে, না, একেবারে মোড় ফিরিয়া প্রদীপের প্রশংসায় মুখর হইয়া উঠিল। অরুণা ধমক দিয়া কহিলেন—"এক ফোঁটা মেয়ে, তুই তার কী বুঝবি? যা, ওঠ, এখন। খালি পড়ে-পড়ে ঘুমুনো। মুখ ধুয়ে পড়তে বোস্ এসে।"

উঠিতে হইল। ব্যাপারটার আদ্যোপান্ত তলাইয়া বুঝিতে তাহার আর বাকি নাই। নমিতা নিতান্ত নমিতা বলিয়াই তাহার জীবনে এমন একটা আচরণের উপকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহ-সঙ্কুল প্রশ্ন উঠে, উমার জীবনে এমন একটা সমস্যার আবির্ভাব হইতে পারে এমন কথা সে নিজে ভাবিতেই পারে না। ঘর সে ছাড়িবে কি না, এবং ছাড়িলে কোথায় বা কাহার সঙ্গে সে আবার ঘর বাঁধিবে—এই সব প্রশ্ন তাহার ব্যক্তিগত নির্ধারণের বিষয়। ইহার জন্য পাড়ার পাঁচজনের মুখ চাহিতে হইবে নাকি? উমা হইলে কখনই ফিরিয়া আসিত না, এমনভাবে হয়ত নিজেকে বন্দিনী করিয়া ফেলিত যে দীপদাকে তাহার কাছ হইতে সরাইয়া নেয় কাহার সাধ্য!

নমিতার ঘরের গোড়ায় আসিয়া দেখিল সেখানে ছোটখাটো একটি ভিড় জমিয়া উঠিয়াছে। শচীপ্রসাদ পর্যন্ত হাজির। সবাইরই মুখ প্রসন্ন, নমিতার প্রতি কাহারো ভাষায় স্বাভাবিক রূঢ়তা নাই। ব্যাপারটা উমা চট করিয়া আয়ত্ত করিতে পারিল না। শচীপ্রসাদ হাসিয়া কহিতেছে: "যাক, ও ছোটলোক গুণ্ডাটা যে গ্রেপ্তার হয়েছে তাই ঢের। একেবারে সেসান্‌স্ কেস্,—ছ'টি বচ্ছর শ্রীঘরে! খবর শুনে ফুর্তিতে আমার চা-ও খাওয়া হল না। এই যে উমা, চা করে দাও দিকিন একটু।"

অবনীবাবু ঘরের মধ্যে নমিতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"পুলিশের কাছে যে সত্য কথা বলেছ বৌমা, তাতেই তোমার বুদ্ধির তারিফ করছি। ঐ পাজির পা-ঝাড়া স্কাউণ্ডেলটাকে এবার আমি দেখাবো—"

—"নিশ্চয়।" শচীপ্রসাদ সায় দিল: "মেয়েছেলে যতই কেন না বেয়াড়া হোক, বাড়ির বাইরে যেতে হলে পুরুষমানুষের হেল্‌প তাদের চাই-ই। তার ওপর উনি হিন্দু-বিধবা, পুরস্ত্রী। তা ছাড়া, কলকাতায় নয়—একেবারে ধাপধাড়া গোবিন্দপুরে পিটটান। ও স্কাউণ্ডেলটা যদি বলেও যে বৌদি ইচ্ছে করে বেরিয়ে এসেছেন, ম্যাজিস্ট্রেট তা কক্‌খনো বিশ্বাস করবেন না।"

অবনীবাবু বলিলেন—"ও বললেই হল? বৌমা ত জবানবন্দিতে স্পষ্ট বলেই দিয়েছেন যে প্রদীপই ওকে ছলে-বলে ফুসলিয়ে বাড়ির বার করেছে। কোর্টেও তোমাকে সে-কথাই বলতে হবে বৌমা, বুঝেছ?"

নমিতা অল্প একটু হাসিয়া সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল।

—"বাস্ তাহলে আর আন্‌ডিউ ইনফ্লুয়েন্স-এর কথাও উঠতে পারে না। পুলিশের কাছে ওটুকু না বলে এলেই মুশকিল হ'ত।"

শচীপ্রসাদ কহিল—"বৌদি আমাদের অত বোকা নন। মেয়েমানুষদের অমন এক-আধটু ভুল হয়েই থাকে, কিন্তু যারা সেই সব ভুল খুঁচিয়ে তাদের বিপথে চালিয়ে নেয় তাদেরকে ছেড়ে দিতে নেই। ফাঁদ পেতে ডাকাতটাকে ধরতে পেরেছেন, তাতে আপনাকে বাহবা দিচ্ছি বৌদি।"

নমিতা আবার একটু হাসিল; চোখ তুলিল না, কথা কহিল না।

কথা কহিল উমা: "ফাঁদে যদি ডাকাত আজ ধরা না পড়ত তবে যাদুকরীকে আপনারা আর আস্ত রাখতেন না। ইঁদুর আজ সিংহকে ধরে দিতে পেরেছে বলেই ছুটি পেলো—নইলে সে একা ফিরে এলে তাকে টুকরো-টুকরো করে ফেলতেন।"

অবনীবাবু ধমক দিয়া উঠিলেন: "যা যা, তোকে আর ফর্‌-ফর্‌ করতে হবে না। বৌমাকে শিগ্‌গির দুটো রেঁধে দে দিকিন, এগারোটায় কোর্টে হাজিরা দিতে হবে।"

শচীপ্রসাদ কহিল—"আর আমার চা।"

ঘর খালি হইয়া গেলে উমা রুক্ষ হইয়া প্রশ্ন করিল—"বৌদি, এ তোমার কী নির্লজ্জতা?"

নমিতা চমকাইয়া উঠিল। উমার মুখের উপর দুইটি জিজ্ঞাসু চক্ষু তুলিয়া সে চুপ করিয়া রহিল।

—"ফিরে এসেছ তার জন্যে তোমাকে তিরস্কার করি না, কিন্তু নিজের ঠুনকো খ্যাতি বাঁচাবার জন্যে এ তুমি কী করে বসলে?"

—"কী করে বসলাম?" নমিতা দৃঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করিল।

—"ঢের ন্যাকামি করেছ। কেই বা তোমাকে ঘটা করে বাড়ির বার হতে বলেছিল, আর কেনই বা তুমি নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ করলে? ও-মুখ লুকোবার জন্যে এ-বাড়ির বাইরে কি আর তোমার জায়গা ছিল না?"

নমিতা ধীরে কহিল—"লুকোবার কথা ব'ল না ঠাকুরঝি। এ-মুখ দেখাবো বলেই ত এ-বাড়িতে ফের ফিরে এসেছি।"

উমা তবুও শান্ত হইল না: "কেন ফিরে এলে? যখন বেরুলে ত হার স্বীকার করলে কেন? আবার এসে তুমি হবিষ্যি আর ফোটো-পূজা শুরু করবে? তবে এই অভিনয় করবার কি দরকার ছিল?"

নমিতা হাসিয়া কহিল—"পুলিশে ধরলে আর কি করা যায় বল।"

—"কি করা যায়? স্পষ্ট কণ্ঠে বলা যায়: আমি নিজের ইচ্ছায় বেরিয়ে এসেছি, যাকে তোমরা নারীহর্তা বলে ধরতে এসেছে, সে আমার নবজীবনের প্রভু, তাকে আমি ভালোবাসি। বললে না কেন বৌদি?"

মুখ গম্ভীর করিয়া নমিতা কহিল—"মিথ্যা কথা বলবো কি করে?"

—"ভারি তুমি সত্যবাদী মেয়ে এসেছ। তাই কিনা দীপদার সর্বাঙ্গে কালি ছিটোতে তুমি দ্বিধা করলে না। যে-ভদ্রলোক স্নেহ করে এক নিরাশ্রয় মেয়েকে আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা করবার জন্যে এগিয়ে এলেন, তার মাথায় কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে সত্যের গৌরব করতে তোমার লজ্জা করলো না বৌদি? এই জঘন্য আত্মরক্ষার চেয়ে আত্মহত্যাও ভালো ছিল।"

নমিতা ক্ষীণ একটু হাসিল; কহিল—"কার সত্য কোন পথে এসে দেখা দেয় তুমি সহসা তা বুঝবে না উমা। বরং শচীপ্রসাদের জন্যে চা কর গে। সুসংবাদ পেয়ে উত্তেজনায় বেচারার দারুণ তেষ্টা পেয়েছে নিশ্চয়।"

উমা রুখিয়া উঠিল: "কার জন্যে চা করতে হবে সে-পরামর্শ তোমার কাছ থেকে

নিতে চাই না। নিজের খেলো মান বাঁচাতে গিয়ে ভীরু অপদার্থের মত তুমি যে আরেকজনকে সমাজের চোখে লাঞ্ছিত করবে—এ অত্যাচার আমরা সইবো না। মনে রেখো।"

নমিতা স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিল—"কী আর করবে বল। আইনের কাছে আবদার খাটে কৈ!"

—"খাটেই না ত। সত্য বলে যা নিয়ে তুমি আস্ফালন করছ সেই তোমার অসতীত্ব। স্থান তোমার সংসারের সেই বাইরেই। তবু তুমি এত স্বার্থপর হবে যে—ছি!"

দারুণ ঘৃণায় উমার চোখমুখ বিষাক্ত হইয়া উঠিল। বহুক্ষণ কেহ কোন কথা কহিল না; উমা যখন চলিয়া যাইবার জন্য পা বাড়াইয়াছে, নমিতা তাহাকে বাধা দিল: "শোন। সংসারের প্রাচীরের বাইরে চলে এসে আমারো এ দুটি দিনে কম শিক্ষা হয়নি উমা। আমি বুঝেছি, তোমাদের ঐ সতীত্ব-বোধটা মানুষের ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পক্ষে প্রকাণ্ড একটা বাধা। সে-বাধা আমি খণ্ডন করব—আপন শক্তিতে, আপন স্বাতন্ত্র্যে।"

উমা ফিরিয়া দাঁড়াইল: "তাই যদি হয় তবে নিজের সতীত্বের ওপর মুখোস টানবার জন্যে আরেকজনের মুখে কালি ছিটোতে তোমার বিবেক সায় দেয়?"

উমার মুখের কথা কাড়িয়া নিয়া নমিতা হাসিয়া কহিল—"আরেকজনের জন্যে যে তোমার ভারি দরদ।"

উমা গাঢ়কণ্ঠে কহিল—"সে-দরদের এক কণা তোমার থাকলে এই নির্লজ্জের মত নির্দোষ সেজে সমাজের চোখে সস্তা বাহবা নিতে চাইতে না। কে তোমাকে দীপদার সঙ্গে বেরিয়ে যেতে বলেছিল?"

—"ভাগ্য, উমা—যে-ভাগ্য মানুষের ভবিষ্যত নিয়ে হিজিবিজি ছবি আঁকে। আমার সঙ্গে আর বেশি তর্ক করো না, লক্ষ্মী—আমি ভারি শ্রান্ত হয়েছি। কাল সারা রাত ঘুমুতে পারি নি।"

হঠাৎ উমা নমিতার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া কহিল—"কিন্তু দীপদাকে তুমি জেল থেকে বাঁচাবে—আমাকে কথা দাও বৌদি! তিনি ত তোমাকে জোর করে বাবা-মার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেন নি, তুমিই বরং পথে বেরিয়ে তাঁকে কুড়িয়ে পেলে। তুমিই বরং তাঁকে জখম করলে, তিনি তোমার কোনো ক্ষতিই করেন নি। কপালের সেই ঘা-টা তাঁর কেমন আছে বৌদি?"

নমিতা মুগ্ধ দৃষ্টিতে উমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কখন তাহার পায়ের উপর উমার হাত দুইটি নামিয়া আসিয়াছে তাহাও লক্ষ্য করিতে ভুলিল না। ধীরে কহিল—"তিনি আমার কোনো ক্ষতিই করেন নি, এ তুমি কী করে বুঝলে উমা?"

—"ক্ষতি করেছেন! কী তিনি করতে পারেন শুনি?"

—"যদি বলি উমা, তিনি প্রমত্ত পুরুষত্বের লালসায় আমাকে অধিকার করতে চেয়েছিলেন, তাঁকে শাসন করা দরকার—"

উমা দাঁড়াইয়া পড়িল: "মিথ্যা কথা।"

নমিতা বলিল—"মিথ্যা কথা নয় উমা।"

—"তবু নারীর কাছে তাঁর ক্ষমা আছে; যে-নারী তাঁকে সঙ্গী হতে আহ্বান করে, সে-আহ্বান তিনি যদি নিমন্ত্রণ বলে মনে করেন তার মধ্যে কপটতা কৈ বৌদি! বেশ, তাঁকে তুমি বর্জন কর, কিন্তু মুক্তির যে দায়িত্ব তুমি অর্জন করলে সে তোমারই থাক।"

কথা শুনিয়া নমিতা হাসিয়া ফেলিল। ঠাট্টা করিয়া কহিল—"তাকে ত্যাগ করলেই যে তুমি তার নাগাল পাবে এমন কথা বিশ্বাস হয় না উমা।"

উমার চক্ষু ভিজিয়া উঠিয়াছিল, প্রাণপণে সে চোখের দৃষ্টিকে প্রখর করিয়া রাখিল, কহিল—"আমি কেন, কোন মেয়েই তার নাগাল পাবে না বৌদি। এই বিশ্বাসই যদি তোমার হয়ে থাকে, তবে কেনই বা তাকে ত্যাগ করতে যাবে?"

উমা আর দাঁড়াইতে পারিল না; মা'র কথা শুনিয়া মুখ ধুইতে নীচে নামিয়া গেল।

যথাসময়ে মামলা উঠিল।

উমা অবনীবাবুকে বলিল—"আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব বাবা।"

অবনীবাবু আকাশ হইতে পড়িলেন: "তুই! তুই আবার কোথায় যাবি?"

—"কেন, কোর্টে। যেখানে তোমরা সবাই যাচ্ছ।"

শচীপ্রসাদ আগাইয়া আসিল: "তুমি যাবে মানে? তোমার একটা প্রেসটিজ নেই?"

—"নিশ্চয় আছে। বৌদিও ত তাঁর প্রেসটিজ বাঁচাতেই কাঠগড়ায় দাঁড়াতে চলেছেন। আমি যাবো বাবা, দীপদাকে তাঁর জেলে যাবার আগে একটিবার দেখবো।"

নির্ভীক দুরন্ত মেয়ে। মুখে কিছু বাধে না।

শচীপ্রসাদের সহিল না: "দীপদাকে দেখবে? ঐ র‍্যাগামাফিন, স্কাউণ্ড্রেলটাকে? ওকে দেখলেও ত অশুচি হতে হয়।"

—"না হয় অশুচি একটু হব। তারপর আপনাদের মুখের দিকে চেয়েই ত আমার সে-পাপ কেটে যাবে। দাঁড়াও ভাই বৌদি একটু, আমি কাপড়টা বদ্‌লে আসছি। দু' মিনিটও লাগবে না—এই হ'ল বলে।"

উমা দ্রুতপদে অন্তর্ধান করিল এবং ফিরিয়া আসিয়া দেখিল নীচে তাহার জন্য কেহই আর বসিয়া নাই। হয়ত কাপড় বদলাইয়া আসিতে তাহার দু' মিনিটের চেয়ে বেশি সময় লাগিয়াছে—ইহার মধ্যে ঘটা করিয়া চুল আঁচড়াইয়া সেফটিপিন আঁটিয়া জুতা পরিয়া তাহার বাবু না সাজিলে গোটা মহাভারতটা অশুদ্ধ হইয়া যাইত না। কিন্তু এই বেশে বিছানায় লুটাইয়া অভিমানে ও দুঃখে সে গোঙাইবে—উমা ততটা নির্লজ্জ নয়। মা সংসারের কাজে ব্যস্ত আছেন—তাঁহাকে এড়াইতে হইবে। একটিও শব্দ না করিয়া উমা অতি সন্তর্পণে খোলা দরজা দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। একটা ট্যাক্সি লইয়া চীফ-প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে যাইতে কতক্ষণ!

আদালত লোকে লোকারণ্য, কোন প্রকারে ভিড় ঠেলিয়া উমা ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। ম্যাজিস্ট্রেট তখনো এজলাসে আসেন নাই, সমস্ত ঘরময় একটা চাপা গুঞ্জন চলিতেছে। আসামীর ডকটাও শূন্য, ম্যাজিস্ট্রেট আসিলেই হয়ত প্রদীপকে হাজির করানো হইবে।

অবনীবাবুদের লক্ষ্যের বাহিরে উমা একটা বেঞ্চিতে একটু জায়গা করিয়া বসিল। পাশের ছোকরা উকিলটি চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। কথা না কহিয়া থাকিতে পারিলেন না: "ঐ মহিলাটি বুঝি আপনার কেউ হন?"

উমা তাহার মুখের দিকে পর্যন্ত চাহিল না; খালি কহিল—"না।"

—"কিম্বা আসামী?"

—"তাও না!"

উকিলটি বিস্মিত হইলেন: "তবু এসেছেন?"

—"আপনি এসেছেন কেন? আইন শিখতে, না কৌতূহল নিবৃত্ত করতে? আমাদেরও কৌতূহল হয় মশাই। মেয়েমানুষ নিজে বাড়ি থেকে বেরিয়ে শত্রুতা করে একজন নির্দোষ ভদ্রলোককে যদি জেলে পাঠায়, সে একটা উপন্যাসের মতই থ্রিলিঙ। তাই দেখতে এসেছি।"

উকিলটি কহিলেন—"আপনার কথায় কৌতূহল যে আরো বেড়ে গেল। কী ব্যাপার, খুলে বলুন। যদি পারি উপকার করবো, বিশ্বাস করুন।"

উমা কহিল—"কতদিন প্র্যাক্‌টিস করছেন?"

—"কেন বলুন ত?"

—"বলুন, দরকার আছে।"

—"প্রায় দু' বছর।"

—"মোটে!" উমার মুখ ম্লান হইয়া উঠিল।

ভদ্রলোক হাসিয়া কহিলেন—"কেন, আপনার কোনো কাজ আছে? বেশ ত বত্রিশ বছরের প্র্যাকটিস-করা এক বুড়ো-হাবড়া ধরে নিয়ে আসছি না-হয়।"

—"না, না, ফি দেব কোত্থেকে? আপনি ঠিক উপকার করবেন?"

উমার ভাবাকুল দুইটি চোখের দিকে তাকাইয়া ভদ্রলোকটি স্নিগ্ধস্বরে কহিলেন—"যদি পারি, নিশ্চয় করবো। কেন করবো না?"

—"কেন করবেন না, তার কারণ অনেক থাকতে পারে। ফি পাবেন না যে, কিন্তু সত্যি যদি দীপদাকে খালাস করে দিতে পারেন, একদিন নিশ্চয়ই নেমন্তন্ন করে খাওয়াবো আপনাকে।" বলিয়া উমা নিজেই হাসিয়া ফেলিল।

ভদ্রলোক ব্যবসার খাতিরে গম্ভীর হইয়া উঠিলেন: "কে দীপদা?"

—"এই মোকদ্দমার আসামী।"

—"আসামী? কেন তাঁর পক্ষে উকিল নেই?"

—"বোধ হয় না। দীপদা আমার এমন লোক নন যে কুৎসিত মিথ্যার বিরুদ্ধে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে নিজেকে কলঙ্কিত করে তুলবেন! আমি তাঁকে চিনি না? বরং তিনি হাসিমুখে মিথ্যার অত্যাচার সইবেন, একটিও সামান্য প্রতিবাদ করবেন না।"

ভদ্রলোকটি ভীষণ অস্থির হইয়া উঠিলেন: "কী হয়েছে আমাকে সব খুলে বলুন দিকি শিগ্‌গির, দেখি আমি কী ব্যবস্থা করতে পারি। একটা জামিন পর্যন্ত চাওয়া হয় নি?"

উমা কহিল—"শত্রুতা করে আমার বাবা আর শচীপ্রসাদ বলে একটা ছোঁড়া—"

উকিল বাধা দিলেন: "আপনার বাবা। ঐ মহিলাটি আপনার কে হয়?"

—"বলছি। মহিলাটি আমার বৌদি। সংসারের অত্যাচারে হোক বা যার জন্যেই হোক, পথে বেরোন, আর পথের মোড় থেকে আমার দীপদাকে হাত-ছানি দিয়ে ডেকে নিয়ে এক ঘোড়ার গাড়ি করে ইত্যাদি ইত্যাদি। সব বুঝে নিন শিগ্‌গির। তারপর বাবার নালিশে পুলিশ গিয়ে ধরে—পুলিশের কাছে মোমের পুতুল আপনার ঐ মহিলাটিই এখন বলছেন যে দীপদা তাঁকে বাপের বাড়ি নিয়ে যাবার ছল করে ইত্যাদি ইত্যাদি।"

—"কিন্তু এ-সবের প্রমাণ?"

উমা কহিল—"যদি ভগবানে বিশ্বাস করেন ত তিনি।"

—"আচ্ছা, আচ্ছা, আপনার বৌদির বয়স কত?"

উমা বোধকরি চটিয়া উঠিল : "ঐ চেয়ে দেখুন না। বয়েস দিয়ে আপনার কী হবে ?"

কোনো কথা বলিবার আগেই ম্যাজিস্ট্রেট আসিয়া কোর্টে প্রবেশ করিলেন। সবাই উঠিয়া দাঁড়াইল—উদ্বেল জনকোলাহল স্তব্ধ হইয়া গেল।

এই দীপদার চেহারা হইয়াছে! পরনের কাপড়টা ময়লা, চুলগুলি শুকনো জট-পাকানো, পায়ে জুতা নাই—কোমরে দড়ি বাঁধা। কতদিন যেন ঘুমাইতে পারেন নাই, দাড়ি কামান নাই, গায়ের জামাটা পর্যন্ত ছিঁড়িয়া গেছে। এদিকে একবারও তাকাইতেছেন না কেন? তাঁহার কিসের লজ্জা যে গভীর অনুশোচনায় তাঁহাকে হেঁট হইয়া দাঁড়াইতে হইবে?

উমা সহসা নিতান্ত অবোধের মত উকিলটির দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া ব্যাকুল অথচ অনুচ্চ কণ্ঠে কহিল—"যে করে পারুন, আমার দীপদাকে এই কলঙ্ক থেকে বাঁচান। ফি আপনাকে আমি পরে যেখান থেকে পারি জোগাড় করে দেব। যেখান থেকে পারি—আমার গয়না আছে। বৌদিকে দুটো জেরা করলেই সত্য কথা বেরিয়ে পড়বে। আপনি যদি না পারেন, অন্য কাউকে ডাকুন। বৌদি সতী সেজে কাঠের ফ্রেমে-আঁটা ছবি পূজো করুন ক্ষতি নেই, কিন্তু দীপদাকে এমন করে মরতে দেবেন না ককখনো।"

—"আপনার কিচ্ছু ভয় নেই।" বলিয়া ভদ্রলোক সস্মিত মুখে বেঞ্চি ছাড়িয়া একপাশে সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার মুখের ঐ বন্ধুতাপূর্ণ হাসি ও দাঁড়াইবার এই দৃপ্ত ঋজু ভঙ্গিটি উমাকে যে কী আশ্বাস দিল বলা যায় না।

সরকারের পক্ষের কালো গাউন-পরা উকিল খাড়া হইলেন। নমিতা ধীরে ধীরে কাঠগড়ায় আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার দিকে চাহিয়া উমার দুই চক্ষু ঠিকরাইয়া পড়িতে লাগিল—নির্লজ্জ, স্বেচ্ছাচারী! নমিতা দাঁড়াইল, কিন্তু তাহার সর্বাঙ্গে দুর্নমনীয় কাঠিন্য, মুখে নিষ্ঠুর সাহস—ঘোমটার ফাঁক দিয়া বিস্রস্ত বেণীটা নামিয়া আসিয়াছে—যেন সর্ববন্ধনহীনতার সঙ্কেত। উমা প্রদীপের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহারও মুগ্ধ দৃষ্টি সেই নিরাভরণা দেহাগ্নিশিখাকে বন্দনা করিতেছে।

সমস্ত ঘর মৃত হৃৎপিণ্ডের মত স্তব্ধ।

সরকারের পক্ষের উকিল কথা পাড়িলেন—নমিতার নাম-ধাম বংশপরিচয় সম্বন্ধে অবান্তর প্রশ্ন। তারপর :

—"তুমি ঐ আসামীকে চেন?"

—"চিনি।"

—"বেশ। ঐ লোক ১৭ই কার্তিক রাত্রি একটার সময় তোমার ঘরে এসেছিল?"

—"না।"

—"না? তোমাকে এসে বলে নি যে তোমার মার মরণাপন্ন অসুখ, তোমাকে এক্ষুণি যেতে হবে?"

—"না। মিথ্যা কথা।"

—"এই বলে তোমাকে ভুলিয়ে বাড়ির বাইরে নিয়ে এসে ট্রেনে করে ফুলহাটি গ্রামে নিয়ে যায় নি?"

—"ককখনো না।"

অবনীবাবুর মুখে কে কালি মাখিয়া দিল; শচীপ্রসাদ সামনের টেবিলের উপর একটা ঘুষি মারিয়া বলিয়া বসিল: "স্টুপিড।" সরকারের পক্ষের উকিল কহিলেন—"তবে কী হয়েছিল খুলে বল।"

নমিতার গলার স্বর একটু কাঁপিল না পর্যন্ত। ধীরে সংযত, গভীর কণ্ঠে সে বলিতে লাগিল: "কিছুই বিশেষ হয় নি। আমি স্বেচ্ছায় আপন দায়িত্বে ঘর ছেড়েছি—মুক্তি আমার নিজের সৃষ্টি। প্রদীপবাবু আমার বন্ধু, বিপদের সহায়। তাঁকে সঙ্গে করে আমার নিজের প্ররোচনায় আমি ফুলহাটি বেড়াতে যাই। এর মধ্যে এতটুকু সঙ্কোচ ছিল না, এতটুকু কলুষ নেই! আমি সাবালিকা, আমার বয়স গত আশ্বিনে কুড়ি পূর্ণ হয়েছে। জীবনের কোথায় আমার গন্তব্য, কে আমার সঙ্গী, কেন আমার যাত্রা—এ সবের বিচার করবার আমার বুদ্ধি হয়েছে। যদি ভুল হয়ে থাকে তার পরিণামও আমিই বিচার করবো। প্রদীপবাবু নির্দোষ, নিষ্কলুষ—আমার মুক্তি আমার নিজের রচনা।"

সবাই একসঙ্গে একেবারে থ হইয়া গেল। ঘরের ছাতটা ভাঙিয়া পড়িলেও বোধ করি শচীপ্রসাদের কাছে এত অস্বস্তিকর লাগিত না। সরকারী উকিল কর্কশ হইয়া কহিলেন—"তবে পুলিশের কাছে এত সব উল্টো কথা বলেছ কেন?"

—"পুলিশের কাছে কি বলেছি আমার কিচ্ছু মনে নেই। উল্টো কথা কিছু যদি বলে থাকি, তবে এই জন্যেই হয়ত বলেছিলাম যে, এমনি একটা উন্মুক্ত সভায় সর্বসাধারণের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মুক্তি ঘোষণা করতে পাবো। যা আমি নিজে সৃষ্টি করলাম, তা পরের সাহায্যে যে মোটেই লাভ করি নি, সেইটে উঁচু গলায় বলবার জন্যে আমি একটা সুযোগ চেয়েছিলাম মাত্র। এর চেয়ে সোনার সুযোগ কী হতে পারত? নেপথ্যে বা স্বপ্নে বা পুলিশের কাছে আমি যা বলেছি তার মূল্য

নেই, স্পষ্ট দিবালোকে সজ্ঞানে ধর্মাধিকরণের সামনে যা বলছি তাই আমার সত্য। উল্টো কিছু বলা বা প্রলাপ বকার জন্য যদি শাস্তির বিধান থাকে তা আমি নেব; কিন্তু আহ্বান যদি কেউ কাউকে করে থাকে, তবে আমিই প্রদীপবাবুকে করেছি, উনি আমাকে নয়। উনি আমার বন্ধু, আশ্রয়দাতা। যদি এও শুনতে চান, আমি বলবো, ঐ আসামীকে আমি ভালোবাসি।"

স্তব্ধ ঘর নিশ্বাস ফেলিল; দেয়ালগুলি পর্যন্ত কাঁপিয়া উঠিয়াছে। অবনীবাবু কহিলেন—"চলে এস শচীপ্রসাদ। এর পর ঘাড়ের ওপর মাথা নিয়ে আর লোক-সমাজে ফিরতে পাবে না। ছি ছি ছি!"

উমা ভিড়ের মধ্যে কোনরকমে আত্মগোপন করিয়া রহিল। উকিলবাবুটি কাছে আসিয়া স্নিগ্ধ-স্বরে কহিলেন—"আমাকে কিছু বলতেও হল না। মেয়েদের বয়েসই হচ্ছে বাঁচোয়া, বুঝলেন? কবে খাওয়াচ্ছেন বলুন।"

মুখ বিবর্ণ করিয়া উমা কহিল—"আপনাকে আমি ভুলবো না। আপনি আমাকে খুব সাহস দিয়েছিলেন কিন্তু।"

কিন্তু উমার চেহারায় সাহসের এক কণাও ভদ্রলোকের চোখে পড়িল না। মুখ ছাইয়ের মত সাদা, দুই চোখে কেমন একটা নিরীহ, অসহায় ভাব। কপালের উপর বিন্দু-বিন্দু ঘাম দেখা দিয়াছে। ভদ্রলোকটির কেন জানি মনে হইল সর্বান্তঃকরণে মেয়েটি হয়ত ইহা চাহে নাই। কোথায় যেন একটু আশা-ভঙ্গের মনস্তাপ রহিয়াছে।

প্রদীপ ও নমিতাকে ঘিরিয়া তখনো ভিড় লাগিয়া আছে। দুইজনেই নির্বাক, সবারই প্রতি সমান উপেক্ষা। শচীপ্রসাদেরই আফশোষ ঘুচিতেছে না; সে সক্রোধে দুই হাতে ভিড় ঠেলিয়া নমিতার সামনে আসিয়া কটুকণ্ঠে প্রশ্ন করিল: "কেন এই কেলেঙ্কারি করে বসলেন বলুন ত? আমাদের মুখ ঢাকবার আর জায়গা রইল না যে!"

অবনীবাবু দূর হইতে চেঁচাইয়া উঠিলেন: "ঐ হতভাগীর সঙ্গে কথা বলো না শচীপ্রসাদ। যাক ও জাহান্নমে—চলে এস শচী।"

যাইতে যাইতে শচীপ্রসাদ কহিল—"এর চেয়ে গলায় কলসী বেঁধে জলে ডুবে মরলেও যে ভালো ছিল!"

দুইজনে ধীরে ধীরে জনস্রোত সরাইয়া রাস্তার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রদীপ কহিল—"এখন কোথায় যাবে নমিতা?"

নমিতার মুখে অটল গাম্ভীর্য—যেন পরপার হইতে কথা কহিতেছে: "আমি কি জানি?"

—"সম্প্রতি একটা গাড়ি নেওয়া যাক, নইলে এ-ভিড় এড়ানো সহজ হবে না। দু'দিন কিচ্ছু খেতে পাইনি নমিতা, পেট চোঁ চোঁ করছে। কিছু না খেলে চলবে না যে।"

নমিতা উদাসীনের মত কহিল—"বেশ, তবে গাড়ি করুন।"

—"গাড়ি ত করবো কিন্তু কে এখন আমার জন্যে আর ভাত বেড়ে রেখেছে বল?"

—"কেন, হোটেল। কলকাতা শহরে হোটেল নেই?"

—"তুমি আমার সঙ্গে যাবে হোটেলে?"

—"আপনার সঙ্গে যেতে আমার আর বাধা কোথায়?"

ডালহৌসি স্কোয়ারের পাশে আসিয়া ট্যাক্সিতে উঠিয়াছে—প্রায় ছুটিতে ছুটিতে উমা আসিয়া হাজির: "আমাকে চিনতে পারো দীপদা?"

—"তুমি এখানে উমা?" প্রদীপের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না: "উঠে এস, উঠে এস শিগ্‌গির—"

নমিতা এক পাশে সরিয়া গিয়া উমাকে তাহাদের মধ্যখানে বসিতে দিল।

তবুও গাড়িটা তখনই ছাড়িতে পারিল না। কে একজন ডান হাতে ছাতা তুলিয়া গাড়িটাকে লক্ষ্য করিয়া চেঁচাইতে চেঁচাইতে ছুটিয়া আসিতেছে। নমিতা তাহার গভীর হৃদয়ের মধ্যে যেন কাহার ডাক শুনিয়া চমকাইয়া উঠিল। ইহাকেই সে যেন বিনিদ্র ব্যাকুল চোখে এতদিন প্রতীক্ষা করিয়া ফিরিতেছিল। কিসের বা তাহার মুক্তি, কী বা তাহার সত্য!

কোর্টে আসিতে গিরিশবাবুর দেরী হইয়া গিয়াছিল; দূর হইতে দেখিতে পাইলেন একটা ট্যাক্সিতে করিয়া নমিতা কাহাদের সঙ্গে চলিয়াছে। সামনে আসিয়া চোখে তাঁহার ধাঁধা লাগিল। চোখ কচলাইয়া নমিতাও চাহিয়া দেখিল—তাহার কাকা ছাড়া পিছনে আর কেহ নাই। গিরিশবাবু ট্যাক্সির গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন —"কী হল?"

কথা কহিল উমা: "কী আবার হবে? বৌদি জিতেছেন।"

—"জিতেছে?" গিরিশবাবু লাফাইয়া উঠিলেন: "কয় বচ্ছর জেল হ'ল গুণ্ডাটার?"

উমা তীক্ষ্নস্বরে কহিল—"গুণ্ডা আবার আপনি কাকে দেখলেন?"

—"গুণ্ডা নয় একশো বার গুণ্ডা। ছোঁড়াটার মাথায় যেমন একরাশ চুল, চোখ দুটো ভাঁটার মত, হাতের মুঠো যেন বাঘের থাবা—ওটাকে আমি বরাবরই রাখতে চাই নি বাড়িতে। নেহাৎ ওর দিদির আবদারেই ছিল, তা দিদিকে কি আর কম জ্বালিয়েছেন সোনার চাঁদ! ক' বছর হ'ল?"

—"কার কথা বলছেন আপনি ?"

—"কেন, অজয়ের। সে ইতিমধ্যে এসেছিল একদিন আমার বাড়িতে; এসে বললে : নমিতা কোথায় আছে জানেন ? শ্বশুরবাড়িতে তাকে খুঁজে পেলাম না। কী ভীষণ চটে উঠলাম যে কি বলবো ? বললাম : শিগ্‌গির আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও বলছি, নমিতা তোমার কে শুনি যে আদিখ্যেতা করবার আর জায়গা পাও নি ?"

মুখের কথা কাড়িয়া নিয়া প্রদীপ হাসিয়া কহিল—"দয়া করে একটু সরুন, গাড়িটা যেতে পারছে না।"

নমিতা ধীরে প্রশ্ন করিল : "কতদিন আগে এসেছিলেন ?"

—"এই ত, দিন তিন-চার হবে। ও হরি ! তখন কে জানতো ছোঁড়াটা এত বড় হতচ্ছাড়া, এত বড় জানোয়ার। নমিতাকে নিজে সরিয়ে দিব্যি ন্যাকা সেজে কি না বলে গেল : নমিতার ঠিকানা কি বলতে পারেন ? ব্যাটা পাজি—ক' বচ্ছর হল ওর শুনি ?"

উমা বিরক্ত হইয়া কহিল—"ওঁর জেল হতে যাবে কেন ? কী বলছেন আপনি ?"

গিরিশবাবু হতভম্ব হইয়া কহিলেন—"বা, এই যে বললে নমিতা মামলা জিতেছে ?"

—"জিতেছেনই ত ? সমস্ত পৃথিবীর সামনে সোজা সত্য কথা স্পষ্ট করে বলে আসতে পেরেছেন। মানুষের এর চেয়ে আর বড় জয় কিছু আছে নাকি ? কেউ বৌদিকে ছিনিয়ে নিতে পারেনি, তিনি নিজের আত্মার শক্তিতে নিজের স্বাধীনতা সৃষ্টি করেছেন। যান, জেল-ফেল হয়নি কারুর কোনোদিন।"

গিরিশবাবু আকাশ হইতে পড়িলেন আর কি : "বল কি উমা ? নমিতা নিজের ইচ্ছায় বাড়ির বার হয়েছে ? তবে কার বিরুদ্ধে এই মামলা ? এ্যা ! কোথায় যাচ্ছ তবে তোমরা ?"

নিতান্ত জ্ঞানীর মত মুখ করিয়া উমা কহিল—"তা কে কবে বলতে পারে বলুন, কোথায় কে যাচ্ছে ?"

গাড়িটা চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিল, গিরিশবাবু ধমক দিয়া উঠিলেন : "শোন্ নমিতা, কেন তবে ঘর ছেড়েছিলি শুনি ? কার জন্যে ?"

উমা বলিয়া উঠিল : "কার জন্যে আবার লোকে ঘর ছাড়ে ? নিজের জন্যে।—চালাও জলদি।"

গিরিশবাবুকে আর একটি কথাও বলিতে না দিয়া ট্যাক্সিটা বাহির হইয়া গেল। ছাতা হাতে করিয়া গিরিশবাবু ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলেন।

নমিতা মুগ্ধচোখে উমার মুখের দিকে চাহিয়া আছে! খানিকপরে তাহার একখানি হাত নিজের হাতের উপর টানিয়া আনিয়া কহিল—"এত কথা তুমি কোত্থেকে শিখলে উমা?"

উমা হাসিয়া কহিল—"তোমারই কাছ থেকে বৌদি।"

অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। ট্যাক্সিটা যে কোথায় চলিয়াছে, যেন কাহারো কোনো দিশা নাই। প্রদীপ সহসা সচেতন হইয়া কহিল—"তুমি আমাদের সঙ্গে কোথায় যাবে উমা?"

মানুষের মন, না পদ্মপাতায় জলবিন্দু। নিমেষে উমার সমস্ত উৎসাহ উবিয়া গেল; মুখখানি ম্লান করিয়া সে কহিল—"না, কোথায় আবার যাব? আমার আর আজ কি আছে? এই, রোখো।"

গাড়ির গতিটা একটু কমিতেই দরজা খুলিয়া উমা নামিবার জন্য পাদানিতে পা রাখিল।

প্রদীপ ব্যস্ত হইয়া কহিল—"এখানে নামবে কি? এখান থেকে তোমাদের বাড়ি যে ঢের দূর।"

—"হোক। আপনাদের সঙ্গে গিয়ে আমার আর কী হবে?" বলিয়া উমা সোজা ফুটপাতে নামিয়া আসিল।

প্রদীপ গাড়িটাকে চলিতে বলিতে পারিল না। বরং হাত তুলিয়া অভিমানিনী উমাকে ডাকিতে শুরু করিল।

নমিতা বাধা দিল: "ওকে ডেকে কোথায় নিয়ে যাবেন সঙ্গে করে? ও বাড়ি যাক। চলো।"

গাড়িটা গড়াইয়াছে, অমনি ছুটিয়া উমা ফের হাজির হইল। কহিল—"তোমাকে প্রণাম করা হয়নি বৌদি। মনে যদি কোনোদিন দুঃখ দিয়ে থাকি, ভুলে যেয়ো। আর কোনোদিন দেখা হয় কি না কে জানে।" বলিয়া দরজা খুলিয়া সে নমিতার পদধূলি নিল।

নমিতার দুই চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল; চোখ মুছিয়া ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল, উমা পাশের কোন্ গলি দিয়া সহসা কখন অদৃশ্য হইয়া গেছে।

কিন্তু পরদিন কি ভাবিয়া ভোরবেলাতেই যে উমা একটা টিফিনকেরিয়ার লইয়া স্টেশনে আসিয়া হাজির হইল তাহা সে-ই জানে। কাল সারারাত ধরিয়া প্রতি মুহূর্তে মনে যাহা ডাক দিয়া ফিরিয়াছে তাহা কি পূর্ণ না হইয়া পারে? তাই দূরে

প্ল্যাটফর্মে পাশাপাশি প্রদীপ ও নমিতাকে ট্রেনের দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া সে আর কোনো রোমাঞ্চকর বিস্ময়বোধ করিল না, আজিকার সূর্যোদয়ের মতই যেন তাহা অতি সাধারণ। দূর হইতেই প্রদীপ কহিয়া উঠিল: "তুমি আবার কোত্থেকে হাজির হলে উমা? বাঃ!"

দুইজনে যতক্ষণ না একেবারে কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, উমা শব্দ করিল না। কাছে আসিতেই সে বুঝি প্রদীপের হাত ধরিতে গিয়া নমিতার হাত ধরিয়া ফেলিল। কহিল—"তোমাকে আরেকবার ভারি দেখতে ইচ্ছা করছিল বৌদি। এইজন্যে কাল বারে-বারে আমার ঘুম ভেঙে গেছে। খালি মনে হচ্ছিল তোমার কাছ থেকে ভালো করে বিদায় নেওয়া হয়নি।"

নমিতা যেন উমার মনের বেদনা দেখিয়া ফেলিয়াছে। তাই তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া সস্নেহে কহিল—"তুমিও আমাদের সঙ্গে চল উমা।"

দুইটি আনন্দপূর্ণ চক্ষু তুলিয়া উমা কহিল—"আমারও তাই ভারি সাধ হয় বৌদি। কোথায় যেন চলে যেতে ইচ্ছা করে।"

প্রদীপ কথাটা শুনিয়া ফেলিয়াছিল! হাসিয়া কহিল—"তুমি গেলে এবার আমার জেল আর কেউ ঠেকাতে পারবে না। শচীপ্রসাদ নিশ্চয়ই তাহলে দাঁত বত্রিশটা গুঁড়ো করে দেবে। কাজ নেই উমা, ফুলহাটিতে ফল্স্ দাঁত কিনতে পাবো না।"

দুইজনে ট্রেনের কামরায় গিয়া উঠিল। নমিতা কহিল—"ভেতরে একটু বসবে উমা?"

—"কাজ নেই বৌদি। গাড়ি এক্ষুণি ছেড়ে দেবে। শেষে যদি নামতে না পারি?"

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া নমিতা কহিল—"হাতে তোমার ওটা কী?"

সচেতন হইয়া উমা কহিল—"তোমার জন্যে কিছু খাবার তৈরি করেছিলাম বৌদি। নাও, ধর।"

—"খাবার? কী আছে ওতে?"

—"কিছু কাটলেট—"

হাসিয়া ফেলিয়া নমিতা কহিল—"কাটলেট! আমি যে বিধবা সে-কথা তুমি রাতারাতি ভুলে গেলে নাকি উমা?"

তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলাইয়া উমা কহিল—"না না কচুরি আছে, গজা আছে—লুচি, তরকারি, চাট্‌নি—কাল সন্ধ্যাবেলা সব তৈরি করেছি বসে বসে। মা জিগ্‌গেস করলে বললাম: এক বন্ধুর আজকে নেমন্তন্ন আছে মা। তা, বন্ধু যদি সারা রাতে

না আসে, তবে আমার আর কী দোষ বল? তুমি খেয়ো বৌদি। খুব পরিষ্কার আছে সব—"

হাসিয়া প্রদীপ কহিল—"বৌদির জন্যে তোমার এত মায়া উমা! খাওয়াবার জন্যে মা'র কাছে পর্যন্ত মিথ্যা কথা বললে।"

—"মিথ্যা কথা বৈ কি।" নমিতা রুক্ষস্বরে কহিল—"আত্মতৃপ্তির জন্যে কে কবে না মিথ্যা বলেছে? আমি বলি নি? কাল কোর্টে—সমস্ত লোকের সামনে?"

বিমূঢ় হইয়া প্রদীপ কহিল—"তুমি নিজের ইচ্ছায় বেরিয়ে এসেছ—এ তোমার মিথ্যা কথা?"

নমিতা উদাসীনের মত কহিল—"তা কেন হতে যাবে। দাও তোমার খাবার উমা, কাটলেটগুলো প্রদীপবাবুকে খেতে বল।"

উৎফুল্ল হইবার ভান করিয়া প্রদীপ কহিল—"তা আর বলতে হবে না। কিন্তু মা যখন জিগ্‌গেস করবেন খাবারগুলো কী হ'ল তখন কি বলবে উমা?"

নমিতা উত্তর দিল: "বলবে, রাত্রে বন্ধু না-আসাতে সকালবেলায় সেগুলো আঁস্তাকুঁড়ে ফেলে দিয়ে এসেছি। দাও উমা, গাড়ি এবার ছাড়বে।"

জানালা দিয়া টিফিন-কেরিয়ারটা তুলিয়া দিয়া উমা গাঢ়স্বরে প্রশ্ন করিল—"আবার কবে দেখা হবে বৌদি?"

—"দেখা বোধহয় আর হবে না উমা। নিরুদ্দেশ যাত্রার কি আর কোথাও পার আছে?"

ফ্ল্যাগ নড়িল, বাঁশি বাজিল, আর একটিও কথা বলিবার আগে গাড়ি ছাড়িয়া দিল। উমা নড়িল না; চিত্রার্পিতের মত মূক নিস্পন্দ হইয়া প্ল্যাটফর্মের উপর দাঁড়াইয়া রহিল। জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া নমিতা দেখিল, উমার দৃষ্টি ধাবমান ট্রেনটাকে অনুসরণ করিতেছে, না মাটির উপর নিবদ্ধ হইয়া আছে।

ক্রমে এই দৃশ্যটুকুও অপসৃত হইয়া গেল।

বেঞ্চির এক ধারে উঠিয়া প্রদীপ কহিল—"কী আর মিথ্যা কথা বলে এসেছ নমিতা?"

নমিতা কঠিন হইয়া কহিল—"কোন্‌টা মিথ্যা কোন্‌টা সত্য তা আপনি আজো অনুভব করতে শেখেন নি?"

—"খুব শিখেছি। তাই তোমার আচরণের কোনো কূল-কিনারা খুঁজে পেলাম না। গলার মালার বদলে পায়ের শৃঙ্খল হয়ে যদি আমাকে আটকে রাখতে চাও, সে-বাধা আমি সইবো না নমিতা।"

—"সইতে কে আপনাকে বলছে? আপনি যান না যেখানে খুশি—কপালের নীচে আমারো দুটো চোখ আছে।"

—"তবে শুধু-শুধু কেন আমাকে জেল থেকে টেনে রাখলে? আমি না হয় অমন করেই মরতাম।"

হাসিয়া নমিতা কহিল—"মরবার আর অনেক পথ ছিল প্রদীপবাবু।"

কিন্তু সেই ফুলহাটিতেই ফিরিয়া আসিতে হইল। প্রদীপ কহিল—"আমারই সঙ্গে এলে যে বড়?"

নমিতার মুখে সেই হাসি: "আপনি ছাড়া কে আমার সঙ্গী আছে বলুন। আমার জীবনে আপনার মূল্য কি একটুখানি? আপনি আমাকে কলঙ্ক দিলেন, আপন অধিকারের গর্ব করতে শেখালেন—আমি অত বড় অকৃতজ্ঞ নই যে এই বনে-জঙ্গলে আপনাকে একা ফেলে পালিয়ে যাবো।"

—"কিন্তু বনে-জঙ্গলে তুমি ত আর কোনোদিন ঘর বাঁধবে না।"

—"ঘর বাঁধবার জন্যেই ত আর পথ নিই নি।"

নমিতা ঘর বাঁধিবে না বটে, কিন্তু ফুলহাটির এই শ্রীহীন শূন্য পুরীতে পা দিতে না-দিতেই সে দুইটি কল্যাণময় ক্ষিপ্রহাতে তাহার সংস্কার-সাধনে তৎপর হইয়া উঠিল। তাহার সর্বাঙ্গ ঘিরিয়া সেবানতা গৃহলক্ষ্মীর মঙ্গলমাধুর্য! এইবার আর মথুরকেও ডাকিতে হইল না। যে বিছানা দুইটা দুই কোণে ধূলিলিপ্ত অবস্থায় পড়িয়া ছিল তাহাদের ঝাড়িয়া-পুঁছিয়া রোদে দিয়া সে খটখটে করিয়া তুলিল, ঘর নিকাইল, কাপড় কাচিল এবং সন্ধ্যা হইতে না হইতেই রান্নার জোগাড়ে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। প্রদীপ যখন হাসিয়া কহিল: "আকাশে দিব্যি মেঘ করেছে নমিতা, একবার নদীর ধারটায় বেড়াতে যাবে?"

নমিতা কথাটাকে উপেক্ষা করিয়া কহিল: "আমার এখনো কত কাজ বাকি—কত প্রতীক্ষা।"

হঠাৎ একটা মেঘ ডাকিয়া উঠিতেই নমিতা সন্ত্রস্ত হইয়া বাহিরে চাহিয়া দেখিল ঘন নিবিড় মেঘে সমস্ত আকাশ বেদনার্ত মুখমণ্ডলের মত থম থম করিতেছে। জীবনে সে এত বড় আকাশ দেখে নাই, পুঞ্জিত নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া গর্জমানা নদীর ডাক যেন তাহার বুকে আসিয়া আঘাত করিল। কিসের তাহার গৃহ, কিসের বা তাহার গৃহ-কর্ম! নমিতা মাঠের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল—দিঙ্মণ্ডল ছাপাইয়া অন্ধকারের

অজস্র বন্যা নামিয়া আসিয়াছে। আকাশে মুক্তবেণী ঝটিকা, নীচে নমিতা যেন শরীরিণী বিদ্রোহবহ্নি!

সঙ্গে সঙ্গেই জল আসিয়া গেল বলিয়া সে আর বেশিক্ষণ বাহিরে দাঁড়াইতে পারিল না। নিজের ঘরে আসিয়া বিছানার উপর চুপ করিয়া বসিয়া পড়িল। ঘরের সবগুলি দরজা-জানালা খোলা, জোরে জলের ছাট আসিতেছে, তবু তাহার খেয়াল নাই। চরাচরপ্লাবী অন্ধকারের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সে কাহার অনুসন্ধান করিতেছিল সে-ই জানে। কেন সে এইখানে আসিয়াছে, কোথায়ই বা আবার এমন মুক্তবন্ধ গগন-বিহঙ্গ মেঘের মত কোন অপরিচিত দেশের দিকে ভাসিয়া পড়িবে—আজিকার দিনে সে-সব সমস্যা তাহাকে একটুও আলোড়িত করিতেছে না। সে যেন জানিত আজ আকাশে ঝড় আসিবে। সে যেন আরো অনেক কিছুই জানিত!

কতক্ষণ তন্ময় হইয়া বসিয়া ছিল খেয়াল নাই হঠাৎ তাহার আচ্ছন্ন চোখের সামনে একটা অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি ভাসিয়া উঠিল। নমিতা চঞ্চল হইল না, লোকচক্ষুর অগোচরে আত্মার দর্পণে সে বারে-বারে যাহার ছায়া দেখিয়াছে, আজিকার এই ছায়াচ্ছন্ন প্রদোষে এ বুঝি তাহারই প্রতিচ্ছবি! কিন্তু হঠাৎ ঘরের মধ্যে একটা টর্চ জলিয়া তৎক্ষণাৎ নিবিয়া গেল। এক ছলক তীব্র আলোতে ঘরের রাশীকৃত অন্ধকার যেন বিকট হাস্য করিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছে। আশ্চর্য, নমিতা একটুও ভীত হইল না।

কাহার স্বর শোনা গেল: "ধন্যবাদ।"

আবার সেই স্তূপীভূত স্তব্ধতা। এইবার অজয় টর্চটা তক্ষুণি টিপিয়া আঙুলটা সরাইয়া নিল না। হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি একলা বসে? প্রদীপ কোথায়?"

ইহাতে অভিভূত হইবার কি আছে। উমা যদি কাল রাত্রে ভাবিয়া থাকে যে ভোরবেলা স্টেশনে গেলেই প্রদীপের দেখা পাইবে, তবে নমিতার এত রাত্রের প্রতীক্ষা-স্বপ্ন কি জীবনের একটি দিনেও সফল হইতে পারিবে না? সে মাথার উপর ঘোমটা তুলিয়া দিল না, খোঁপাটা বাঁধিল না পর্যন্ত, সুতীব্র আলোর ঝাঁজে চক্ষু দুইটা আবিষ্ট হইতে না দিয়া অপলক চোখে অজয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কিন্তু অজয়ের এ কী শ্রী! কোথায় সেই দুর্লভ তেজ, সেই গর্বদৃপ্ত ঋজুতা? মুখমণ্ডলে গাঢ় রোগমালিন্য, কত স্বপ্নের ব্যর্থতা যেন মুদ্রিত হইয়া আছে। বেশবাস অপরিচ্ছন্ন, এক হাঁটু কাদা, জলে ভিজিয়া কিছু আর নাই। সেই মূর্তি দেখিয়া নমিতা আনন্দ-ধ্বনি না হাহাকার করিয়া উঠিবে কিছুই বুঝিতে পারিল না।

অজয় হাসিয়া কহিল—"খুব অবাক হয়ে গেছ দেখছি। আমি ভূত নই—নেহাৎই বর্তমান। জলে ভিজে বহু কষ্টে স্টেশন থেকে পথ চিনে এসেছি। প্রদীপ কৈ?"

নমিতা অভিভূতের মত, অথচ স্থির স্বরে কহিল, "এসেছেন? বসুন। উনি পাশের ঘরে আছেন বোধহয়, ডেকে আনছি।"

পাশের ঘরেও প্রদীপ তাহার নিঃসঙ্গ বিছানায় বসিয়া ঝড় দেখিতেছিল। সে-ঝড়ে সে বিপুল সম্ভাবনার সঙ্কেত খুঁজিয়া পায় নাই, এ অন্ধকার যেন তাহার জীবনে রাশি রাশি বিষণ্ণতা নিয়া আসিয়াছে। অচরিতার্থতার এমন রূপ আর সে কবে দেখিয়াছে? এত বড় বিস্তৃতির মধ্যে তাহারই জন্য কোথাও এতটুকু যুক্তি রহিল না। নমিতা তাড়াতাড়ি তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, প্রদীপ টের পায় নাই। কি বলিয়া তাহাকে সে এই সংবাদ দেয়, কিছুই ভাবিয়া পাইল না। হঠাৎ তাহার মাথায় এক ঠেলা দিয়া কহিল—"শিগ্‌গির দেখবেন আসুন—কে এসেছে।"

প্রদীপ ধড়মড় করিয়া উঠিল: "কে? আবার পুলিশ নাকি?"

—"না না। শিগ্‌গির আসুন।"

ঘরের কোণ হইতে লণ্ঠনটা লইয়া নমিতার পিছু-পিছু প্রদীপ অগ্রসর হইল, ঘরের মধ্যে আসিয়া দেখিল ডান হাতে একটা টর্চ জ্বালিয়া দাঁড়াইয়া আছে—আর কেহ নয়, অজয়! সহসা প্রদীপ যেন এতটুকু হইয়া গেল।

প্রদীপকে দেখিয়া বিদ্রূপাত্মক অভিবাদন করিয়া অজয় কহিল—"ধন্যবাদ!"

প্রদীপ আরো একটু আগাইয়া আসিল বটে, কিন্তু বন্ধুর হাত ধরিতে সাহস পাইল না। খালি কহিল—"তুমি? হঠাৎ? কোত্থেকে?"

অজয় কহিল—"আসচি অনেক দূর থেকে। হঠাৎই আমি এসে থাকি। খবরের কাগজে তোমাদের কীর্তির কথা আদ্যোপান্ত পড়লাম—বেশ, তোমাদের মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করছি। তারপর?"

কাহারও মুখে কথা জুয়াইল না। খানিকবাদে স্নিগ্ধস্বরে নমিতা কহিল—"একেবারে ভিজে গেছেন দেখছি—"

—"ভিজতে আমাকে আরো অনেক হবে। রাত্রে আজ আর জল থামবে বলে মনে হয় না।"

প্রদীপ প্রায় তাড়া দিবার মত করিয়া কহিল,—"এক্ষুনি আবার চলে যাবে নাকি?"

—"নিশ্চয়। এক জায়গায় বেশিক্ষণ জিরোবার সময় নেই কিন্তু ঘর-দোরের এ কী হাল-চাল করে রেখেছ? টাকা-পয়সার টানাটানি বুঝি? তা আমার কাছেও কিছু নেই।"

একটু থামিয়া পরে আবার কহিল—"দেশে ফিরে ভারি মজা দেখলুম প্রদীপ; বাবার সেই বাৎসরিক পনেরো হাজার টাকা দিব্যি উড়ে গেছে গ্রাশে আর বিলাসে! আমি যেই একা, সেই একা। তারপর, পল্লী-সংস্কারের বকশিস্ বাবদ সেই যে ম্যালেরিয়া পেয়েছিলুম, তাতে হাড়-মাস আমার ঝরঝরে হয়ে গেল।" তারপর একটি করুণ দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া: "তোমাদের সেই অজয় আর নেই। তোমাদের দেখতে নিদারুণ ইচ্ছা হ'ল বলেই জ্বর নিয়েও জলের মধ্যে চলে এসেছি। এখন ত দিব্যি একটি রানী পেয়েছ, এবার স্বচ্ছন্দে নিরীহ একটি কেরানী বনে যাও, কিম্বা লাইফ ইন্‌সিয়োরেন্সের এজেন্ট, কিম্বা ধরো পাটের বা মাছের দালাল—কি বল?"

প্রদীপ অভিমান করিয়া কহিল—"একটা কিছু নিশ্চয়ই হতে হবে, সে-পরামর্শ তোমার কাছ থেকে না নিলে কিছু এসে যাবে না।"

স্বচ্ছ হাসিতে মুখ উদ্ভাসিত করিয়া অজয় কহিল—"ভালো। একটা ইস্কুল-মাস্টারিও মন্দ হবে না। তারপর নমিতা, ফোটো পূজা করতে করতে সুরাহা একটা কিছু হল তাহলে? বেশ।"

নমিতা একটিও কথা কহিল না, গভীর দৃষ্টিতে অজয়ের মুখের দিকে চুলের দিকে কাপড়ের দিকে পায়ের দিকে চাহিতে লাগিল।

—"কি, কথা কইছ না কেন? আমি তোমাদের এমন সন্ধ্যাবেলাটা মাটি করে দিলাম নাকি?"

নমিতা কহিল—"বসুন, জামা-কাপড়গুলো ছাড়ুন, আপনার প্রত্যেক কথার উত্তর দিচ্ছি।"

—"আমার সময় কৈ? প্রতি নিশ্বাসে আমার বৎসর চলে যাচ্ছে।" তারপর হাসিয়া কহিল—"কী বা আমার কথা, তার আবার উত্তর! কোর্টে দাঁড়িয়ে যাত্রা দলের ঢঙে কী তোফা বক্তৃতাই যে তুমি দিয়েছ—ক্যাপিট্যাল! কিন্তু, কিছু খেতে দিতে পারো নমিতা? ভারি খিদে পেয়েছে।"

নমিতা ব্যস্ত হইয়া উঠিল: "নিশ্চয়ই পারি। কিন্তু আপনার যে জ্বর!"

অজয় বাধা দিয়া কহিল—"হোক জ্বর। তা এমন কিছু মারাত্মক নয় যে তোমার হাতের খাবার খেলে আমাকে চিতেয় উঠতে হবে। আজ আমি তোমার কাছে সেদিনের মত জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকতে আসি নি, নিতান্ত সাদা ভাষায় কিছু খাবার ভিক্ষা করছি মাত্র। আমাকে আজো তোমার সন্দেহ হয় নাকি? আজ আর তোমাকে বাইরে আহ্বান করবার ভাষা নেই, এই ঘরেই তুমি সমস্ত পৃথিবী লাভ

করেছ। ও কি, তুমি রাঁধতে চললে নাকি? পাগল! আমার এত খিদে বা সময় নেই যে বাবু সেজে আসন-পিঁড়ি হয়ে ষোড়শোপচার সাবাড় করব। ঘরে তোমাদের গেলবার কি কিছুই নেই? কী ছাই তবে ঘর করেছ নমিতা!"

পথে খাইতে উমার-দেওয়া খাবারগুলির কথা মনে করিয়া নমিতা কহিল—"আছে কিছু, তবে তা বাসি, কালকের রাতের তৈরি।"

—"বাসি! নিয়ে এসো চট্ করে? বলে কি না বাসি! পেলে বাঁশ চিবিয়ে খেয়ে ফেলতে পারি—"

নমিতা টিফিন কেরিয়ারের বাটিটা লইয়া আসিল।

অজয় একেবারে শিশুর মত হাত বাড়াইয়া বাটিটা গ্রহণ করিল।

নমিতা কহিল—"দাঁড়ান একটা প্লেট নিয়ে আসছি।"

—"প্লেট-ফ্লেট লাগবে না। এই দাও।" বলিয়া অন্ধকারে খাবারগুলি ভাল করিয়া ঠাহর না করিয়াই অজয় গোগ্রাসে গিলিতে শুরু করিল। ভাল করিয়া চিবাইবারও সময় হইল না; একমুখ খাবার লইয়া কহিল—"দু' দিন পেটে কিচ্ছু যায় নি একদম! নেহাৎ ভাগ্য প্রসন্ন বলেই প্রসাদ মিললো। জল? জল লাগবে না—এক্ষুণি যেতে হবে আমাকে। দাঁড়াবার আর এক ফোঁটাও সময় নেই। মাঠের মধ্য দিয়ে হাঁ করে ছুটলেই জল পাওয়া যাবে। তার ওপর যদি নদী সাঁতরাতে হয়, তাহলে ত কথাই নেই—"

নমিতা বাধা দিয়া কহিল—"এক্ষুণি যাবেন কি? দাঁড়ান, জল আনতে কতক্ষণ? সব সময়েই দুরন্তপনা করতে নেই।"

কথার সুরটা অজয়ের কানে কেমন একটু অদ্ভুত ঠেকিল—যাইতে সত্যই পারিল না। নমিতা জল নিয়া আসিল। এক ঢোঁকে সবটা নিঃশেষ করিয়া অজয় কহিল—"পিপাসাও আমাদের পায়, স্নেহময়ী নারীর মুখ দেখতে পেলে আমাদেরও দুটি দণ্ড কৃতজ্ঞতা জানাতে ইচ্ছা করে, কিন্তু সময় নেই। কত কাজ বাকি, কত পথ এখনো উত্তীর্ণ হতে হবে—আমি চললাম। তোমাকে বিশেষ কিছু উপহার দিয়ে যেতে পারলুম না—যদি পারি কিছু টাকা পাঠাবো। তা দিয়ে যা তোমার খুশি কিনে নিয়ো। কিনে দিয়ো হে প্রদীপ। শাড়ি ব্লাউজ জুতো গয়না—যা ওর পছন্দ। এখনো যে ভোল ফেরায় নি দেখছি।" বলিয়া অজয় দরজার বাহিরে পা বাড়াইল। পিছন হইতে নমিতা হঠাৎ তাহার বাঁ হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া আকুলকণ্ঠে কহিল—"আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে চল। তোমার অসুখ, কে তোমাকে দেখবে বল।"

প্রথমটা কথা শুনিয়া অজয়ের সমস্ত চেতনা যেন ঘুলাইয়া উঠিল। অন্ধকারে নমিতার

মুখ স্পষ্ট চোখে পড়িল না ; সে-মুখ দেখিতে পাইলে হয়ত সে একটু দ্বিধা করিত, হয়ত এমন কঠোর ঘৃণায় সে-স্পর্শকে উপেক্ষা করিতে পারিত না।।

অজয় তাহার হাতটা ঠেলিয়া দিয়া কহিল—"আমার সঙ্গে যাবে মানে ?"

—"হ্যাঁ, যাব ; যেখানে তুমি নিয়ে যাবে।" নমিতা স্পষ্ট অথচ গাঢ় কণ্ঠে কহিল, "তুমি আমাকে নিয়ে যাবে বলেই ত এতদিন প্রতীক্ষা করে আছি।"

অজয় আকাশ হইতে পড়িল : "এ এ-সব কী বলছে হে প্রদীপ ? তুমি কোনো কথা কইছ না কেন ?"

প্রদীপ দূরে জানালার কাছে সরিয়া গেল। নমিতাই বলিয়া উঠিল : "কে কী বলবে —কার কী সাধ্য আছে শুনি ? তুমি একদিন আসবে সেই আশায় আমি আজো বেঁচে আছি। কে আমাকে বাধা দেয় ?" বলিয়া নমিতা অজয়কে একেবারে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

নিশ্বাস ফেলিবার সময়টুকু পর্যন্ত কাটিল না ! নমিতাকে ডান হাতে ঠেলিয়া ফেলিয়া অজয় কহিল—"সরে দাঁড়াও, শিগ্‌গির। ছুঁয়ো না আমাকে। তুমি এতদূর নির্লজ্জ হয়েছ জানলে এখানে মরতেও আসতাম না কোনোদিন ! তোমার ছোঁয়া খাবার খেয়েছি ভেবে সারা শরীর আমার অশুচি হয়ে গেছে।"

নমিতা বাঁশের একটা খুঁটি ধরিয়া নিজেকে রক্ষা করিল।

কটু কদর্য কণ্ঠে অজয় কহিল—"একজনকে তার ধর্ম থেকে ভ্রষ্ট করে পথে বসিয়েছ, তবুও তাতে তোমার তৃপ্তি হল না ? এত সহজেই তোমার অরুচি ধরে গেল ? ভেবেছ আমার সঙ্গে চলতে গিয়ে একসময় জিরোতে চাইবে, পথের থেকে কাঁধে উঠতে চাইবে—অজয় অমানুষ মেয়েমানুষকে অতটা প্রাধান্য দিতে শেখে নি। লজ্জা করে না ? কে তোমাকে বাধা দেবে ! বাধা দেবে তোমার লজ্জা, তোমার চরিত্র।"

অজয় পা বাড়াইয়াছিল, নমিতা আবার কাছে ছুটিয়া আসিল। সে কাঁদিতেছে। কহিল—"চরিত্র আমি মানি না, মানি আমার মনকে। সেই আমার মণি, সেই আমার সব। তুমি যেয়ো, তোমার সঙ্গেও আমি যেতে চাই নে, কিন্তু আর খানিকক্ষণ তুমি থেকে যাও। আজকের রাতটা।"

—"তোমার ঘরে ? ঐ বিছানায় ? সরে দাঁড়াও নমিতা।"

নমিতা প্রখর কণ্ঠে কহিল—"কেন, একটা রাত্রি একাকিনী নারীর ঘরে আত্মদমন করে থাকতে পারো না ?"

অজয় উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল : "তুমি আমাকে লোভ দেখাচ্ছ বুঝি ? আত্মদমনের চেয়েও অজয়ের জীবনে মহত্তর আদর্শ আছে। তুমি তার মহিমা বুঝবে না—পথ

ছাড়। যেতে দাও আমাকে। একাকিনী নও, ঐ প্রদীপ দাঁড়িয়ে। নিষ্ঠা বলে জিনিসটাকে একেবারে অমান্য করো না। সতী নাই-বা হলে, কিন্তু তাই বলে অসৎ হতে হবে?"

নমিতা সরিয়া দাঁড়াইল। মুখে একটিও কথা নাই।

—"পথে বেরুবো বললেই কি আর বেরুনো যায়? পথ তোমাকে গ্রহণ করবে কেন? তোমার ছাড়পত্র কোথায়? ঘরে যাও, দরজা-জানালা বন্ধ করে বিছানাটা উত্তপ্ত করে রাখ গে—রাত্রে ত আবার ঘুমুতে হবে। চললাম হে প্রদীপ, সুইট্ ড্রিমস্!" বলিয়া সেই ঝড়-জলের মধ্যেই অজয় অদৃশ্য হইয়া গেল।

প্রদীপ কহিল—"অজয়ের সঙ্গে গেলে না? নিলো না বুঝি?"

নমিতা রুখিয়া উঠিল: "কোথায় মরতে যাব ওর সঙ্গে? তার চেয়ে এই আমার ঢের ভালো।" বলিয়া খোলা জানালাগুলি সে বন্ধ করিতে লাগিল: "জলে কী হয়েছে দেখুন—ঘরের মধ্যে নদী বইছে। মেঝেটা লেপতে হবে।"

—"এখন থাক্।"

—"এখন থাকবে কী! ঘুমুনো যাবে নাকি তাহলে? উনুন-টুনুনও বোধহয় ভেসে গেল। একটা হাঁক দিন না, মথুর কিছু খাবার জোগাড় করে নিয়ে আসুক। টিফিন কেরিয়ারে যা ছিল সব উজোড় করে খেয়ে গেছে—"

—"তোমার খুব খিদে পেয়েছে নাকি?"

তরলকণ্ঠে নমিতা কহিল—"আহা-হা, রাত্রে যেন আমি কত খাই। আপনার জন্যে বলছি—সারাদিন ত পেটে কিছু পড়ে নি। শরীরটা ত গেল। যা হোক, উনুনটা ধরিয়েছিলাম, ঝড় আর আপনার বন্ধু এসে সব মাটি করে দিল। ডাকুন না মথুরকে।"

একটা ন্যাকড়া দিয়া নমিতা ঘর মুছিতেছিল, আভরণহীন সেই হাতখানির দিকে চাহিয়া থাকিয়া প্রদীপ কহিল—"মথুরকে ডেকে কাজ নেই। সত্যি আমার একটুও খিদে পায় নি।"

—"না, পুরুষমানুষের খিদে না পেয়ে পারে? আমার কথা শুনে ত আপনার পেট ভরবে না।"

—"সত্যি বলছি, আমার খিদে নেই। কাল খুব ভোরে উঠে না-হয় দুটি রেঁধে দিয়ো।"

—"রেঁধে আমি এখনই দিচ্ছি। একটিবার মথুরকে ডেকে দিন না।"

—"তুমি রাঁধতে গেলেই আমি আরো থাব না। এই আমি শুয়ে পড়লাম।" বলিয়াই প্রদীপ নমিতার নিজের জন্য পাতা বিছানাটার উপর শুইয়া পড়িল: "তোমার বিছানায়ই শুলাম নমিতা।"

নমিতা ধীরে কহিল—"বেশ ত। ঐ যা, জানালাটা খুলে গেল। শিগ্‌গির বন্ধ করে দিন। নইলে এক্ষুণি ভীষণ ঠাণ্ডা লেগে যাবে। একেই ত আপনার শরীরটা ভালো নেই—"

জানালাটা বন্ধ করিয়া প্রদীপ আবার বিছানায় শুইয়া পড়িল। নিতান্ত ছেলেমানুষের মত আবদারের স্বরে কহিল—"কাল থেকেই মাথাটা কেমন ধরে আছে নমিতা—"

নমিতা শুধু কহিল—"যাচ্ছি। আমার এই হ'ল বলে।"

প্রদীপ অসাড় হইয়া চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া রহিল। কতক্ষণ পরে নমিতা শিয়রের কাছে আসিয়া স্নেহার্দ্র কণ্ঠে কহিল—"বালিশের ওপর মাথাটা ভালো করে রাখুন। কোন্‌খানটায় ধরেছে?" বলিয়া সে প্রদীপের শিয়র ঘেঁষিয়া পা গুটাইয়া বসিল। প্রদীপ একবার ভালো করিয়া নমিতার মুখ দেখিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু সে আগেই লণ্ঠনটা নিবাইয়া দিয়াছে। অন্ধকারে সেই মুখের বিন্দুমাত্র আভাস পাওয়া গেল না। নমিতা প্রদীপের কপালের উপর স্নিগ্ধ আঙুলগুলি ধীরে বুলাইতে বুলাইতে কহিল— "কপালটা টিপে দিই, কেমন? একটু ঘুমুবার চেষ্টা করুন। এ কয়দিন ত শরীরের ওপর আর কম অত্যাচার হয়নি।"

প্রদীপ কহিল— "আমি ঘুমিয়ে পড়ব কি! আর তুমি?"

—"পরে আমিও না হয় ঘুমিয়ে পড়বো। এমন বৃষ্টিতে শরীর ভেঙে ঘুম নেমে আসবে।"

—"তুমি এখানে শোও; আমি আমার বিছানায় যাই।"

নমিতা প্রদীপের ললাটের উপর করতলটি বিস্তৃত করিয়া স্থাপন করিয়া কহিল— "এখানে একা শুতে আমার ভয় করবে যে।"

কপালের উপর নমিতার ঠাণ্ডা হাতখানি মুঠির মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া প্রদীপ কহিল— "তবে?"

প্রদীপের করতলের মধ্যে নিজের ভীরু হাতখানি ছাড়িয়া দিয়া নমিতা বলিল— "তবে আর কি? ঘুম পেলে কখন একসময় আপনারই পাশে শুয়ে পড়বো না-হয়।"

—"আমার পাশে?"

—হ্যাঁ, আপনাকে আমি ভয় করি নাকি?"

নমিতার কথার সুরে একটুও রুক্ষতা নাই— ভারি কোমল, আর্দ্র কণ্ঠস্বর!

এইভাবে বসিবার সুবিধা হইতেছিল না; নমিতা বিছানার উপর পা তুলিয়া ঠিক করিয়া বসিতে না বসিতেই প্রদীপ বালিশটা তাড়াতাড়ি ঠেলিয়া দিয়া তাহার বিস্তৃত কোলের উপর মাথাটা তুলিয়া দিল। নমিতা কিন্তু মাথাটা নামাইয়া রাখিল না। স্নেহ-আনত দুইটি আয়ত চক্ষু প্রদীপের মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া অকুণ্ঠিত আবেগে তাহার কপালে ও গালে হাত বুলাইতে লাগিল।

প্রদীপ কহিল—"তোমার প্রতি অনেক দুর্ব্যবহার করেছি, নমিতা—"

জোরে একটু হাসিয়া নমিতা বলিল—"তার শাস্তিই ত এখন পাচ্ছেন।"

প্রদীপ নমিতার একখানি হাত ধরিয়া ফেলিয়া একেবারে বুকের মধ্যে গুঁজিয়া ফেলিল; কহিল—"বিধাতা সবারই জন্যে সমান পথ তৈরি করে রাখেন নি—"

নমিতা কহিল—"কারুর জন্যেই পথ তিনি তৈরি করে রাখেন না। পথ সৃষ্টি করবার গৌরবও যদি আমাদের না থাকে তবে চলবার আমাদের আর আনন্দ কোথায়?"

—"আমার জন্যে এই ভুবন-ভরা ঋতুর উৎসব—"

—"আর কারুর জন্যে বা ঘন-গহন অন্ধকার!"

—"আমার জন্যে তোমার প্রেম, এই যৌবন, এই অগ্নিশিখা।" বলিয়া মুহ্যমান প্রদীপ সহসা নমিতাকে বুকের মধ্যে আকর্ষণ করিয়া তাহার চিবুকে অধরে চোখের পাতায় চোখের নীচে অজস্র চুম্বন করিতে লাগিল।

প্রতিরোধ করিবার সমস্ত শক্তি নমিতা হারাইয়া ফেলিয়াছে। সে যেন নিষ্প্রাণ একটা দেহপিণ্ড! ঝড়ের রাত্রে সে যেন অসহায়া পৃথিবী!

বুকের উপর নমিতার আলুলিত রুক্ষ চুলগুলিতে হাত বুলাইতে বুলাইতে প্রদীপ কহিল—"যে যা বলে বলুক নমিতা, আমরা ধূলির ধরণীতে স্বর্গ আবিষ্কার করব—আমাদের প্রেমে, সহকর্মিতায়। আমি কবি, তুমি আমার আকারময়ী কল্পনা! নমিতা!"

নমিতা তাড়াতাড়ি মুখ তুলিয়া কহিল—"সারা রাত ভরেও কথা কয়ে শেষ করতে পারবেন না। শেষই যেন তার না থাকে। এই কথা আপনার অক্ষরে ফুটে উঠুক। আনন্দের কথা সন্ধ্যার বর্ণচ্ছটার মত মিলিয়ে যায়, কিন্তু ব্যর্থতার কথা রাত্রির অন্ধকারে তারা হয়ে অক্ষয় অক্ষরে জেগে থাকে!"

প্রদীপ নমিতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বিস্রস্ত অবগুণ্ঠনের নীচে সে-মুখখানিতে অসীম বেদনার মেঘছায়া মাখিয়া রহিয়াছে। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল।

নমিতা বলিল—"মনটাকে খানিকক্ষণ একেবারে ফাঁকা রাখুন, আপনিই ঘুম এসে যাবে। আমি হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। আপনি না ঘুমুলে আমি কি করে শুই।"

প্রদীপ কহিল—"তুমি কি আমাকে একবারো তুমি বলবে না?"

কিছুকাল স্তব্ধ থাকিয়া হঠাৎ নমিতা নত হইয়া মুখটা প্রদীপের কানের কাছে নিয়া গিয়া অতি গাঢ়কণ্ঠে ডাকিল: "তুমি, তুমি, তুমি!"

—"এবার যদি আমি মরতামও নমিতা, আমার দুঃখ থাকতো না।"

নমিতা বলিল—"নিশ্চয়। তোমার জন্যে এই অলস আবেগময় মৃত্যু, কারুর জন্যে বা কণ্টকক্ষত কদর্য জীবন। প্রেমহীন আশ্বাসহীন কঠোর মুহূর্ত। কিন্তু, আর নয়, এবার ঘুমোও।"

প্রদীপ নিঃশব্দে নমিতারই কোলের উপর মাথাটা কাৎ করিয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

একসময়ে স্পষ্ট বুঝিল নমিতা আর হাত বুলাইতেছে না—স্তব্ধ হইয়া পাষাণ-প্রতিমার নিশ্চল অটুট ভঙ্গিতে বসিয়া আছে। তারপর নমিতা যে আর কী করিল বোঝা গেল না। প্রদীপ ততক্ষণে গাঢ় নিদ্রায় ঢলিয়া পড়িয়াছে।

ধীরে ধীরে প্রদীপের মাথাটা বালিশের উপর নামাইয়া রাখিয়া নমিতা উঠিয়া পড়িল। দক্ষিণের জানালাটা খুলিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রাত্রি অনেক হইয়াছে—আকাশে মেঘ কাটিয়া বিবর্ণ ঘোলাটে জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে। ভোর হইয়াছে ভাবিয়া কয়েকটা কাক এখানে-সেখানে চীৎকার করিতেছিল। নদীতে দু'একটি নৌকাও দেখা যায়। কোথায় একটি বাতি জ্বলিতেছে—না জানি কত দূরে!

ঘাটে যেখানে নৌকা যাত্রী লইয়া দূর স্টিমার-স্টেশনে পৌছাইয়া দিবার জন্য সর্বদা গাঁদি করিয়া থাকে সেই ঘাটের পথ সে চিনিতে পারিবে ত? এই রাত্রে নিশ্চয়ই কেহ নৌকা ছাড়িবে না, উত্তর-পশ্চিম কোণে এখনো মেঘ আছে। হয়ত উহারই বিপদের আশঙ্কায় নৌকা ছাড়িবে না। নমিতার জীবনে আবার বিপদ কিসের? তরঙ্গ-সঙ্কুল ফেনোচ্ছ্বাসিত নদী যে তাহার বন্ধু, সহযাত্রিনী। বিধাতা, আজিকার এই অভিসারে যেন অজয়ের সঙ্গে তাহার দেখা না হয়। সে যেন একাই চলিতে পারে, একাই মরিতে পারে যেন। এই গর্বটুকু তাহার নষ্ট করিয়ো না।

এখান হইতে তারপাশা—তার পরে স্টিমারে গোয়ালন্দ। সেখানে ট্রেন দাঁড়াইয়া আছে। তারপর কলিকাতা। তারপর? এখানে বসিয়া থাকিলেও, তারপর? ক্ষণকালবিহারী মানুষের চিত্তে ইহার সমাধান কোথায়!

একেবারে একা—সঙ্গীহীন। সম্মুখে পথ—মুহূর্ত হইতে মহাকালে।

নমিতা একবার ফিরিয়া দাঁড়াইল। যাইবার সময় ঐ ঘুমন্ত অসহায় প্রদীপের চেহারা দেখিয়া তাহার মমতার আর অন্ত রহিল না। একবার সাধ হইল নিজে ইচ্ছা করিয়া প্রদীপের কপালে অস্ফুট একটি বিদায়-চুম্বন উপহার দিয়া আসে; গভীর শব্দহীনতায় গোপনে বলিয়া আসে: এই চুম্বনে তোমার ললাট দগ্ধ করে যাই বন্ধু। আমাদেরই মত তুমি ব্যর্থ হও, ধন্য হও।

কিন্তু না, যদি জাগিয়া ওঠে! যদি দুই ব্যাকুল বাহু-বন্ধনে তাহাকে বন্দী করিয়া রাখিতে চায়! যদি এই অবসন্ন জ্যোৎস্নাটুকুর মতই তাহার সকল সঙ্কল্প স্তিমিত হইয়া আসে!

নমিতা বাহির হইয়া আসিল।

সমস্ত পাড়া নিঝুম। মাঠে জল জমিয়াছে। সেই জল ভাঙিয়া নমিতা অগ্রসর হইল। পথ সে ভাল করিয়া চিনে না, কিন্তু পথ তাহাকে খুঁজিয়া লইতে হইবে। এক পথ হইতে অন্য পথে, এক দিনের পর অন্য রাত্রে। থামিবার সময় কোথায়?

কিছুদূর অগ্রসর হইতেই দূরে কাহাকে যেন দেখা গেল। কে যেন তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে। নমিতা থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। কে যেন তবু তাহাকে সঙ্কেত করিতেছে। তাহারই সম্মুখীন না হইয়া নমিতা আর যায় কোথায়? আরো খানিকটা কাছে আসিতেই তাহাকে যেন চিনিতে পারিয়া নমিতার সর্বদেহ ভয়ে ও উত্তেজনায় কাঁপিয়া উঠিল। এ যে তাহার স্বামী—সুধী! রাণীগঞ্জে শালবনে সেইদিন যে-পোষাকে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন পরনে সেই পোষাক। মুখে সেই অম্লান হাসিটি তেমন করিয়া বাঁ হাতে কোঁচাটা তুলিয়া ধরিয়াছেন!

যেন সেই মূর্তি তাহাকে বলিল: "এস আমার সঙ্গে।"

আর একটু আগাইয়া হাত বাড়াইয়া দিলেই যেন নমিতা সে মূর্তিকে ধরিয়া ফেলিবে। নমিতা ত্বরিত পদে পথ চলিতে লাগিল, কিন্তু তবু তাহার নাগাল পাইল না।

নমিতা চীৎকার করিয়া উঠিল: "কোথায় আমাকে নিয়ে যাচ্ছ?"

সে-মূর্তির কণ্ঠ হইতে স্পষ্ট উত্তর আসিল: "এস আমার সঙ্গে। তোমার কিছু ভয় নেই।"

"আমার কোনো কিছুতেই ভয় নেই।" চলিতে-চলিতে নমিতা থামিল, বলিল, "কিন্তু তোমার সঙ্গে আমি যাব কেন?"

ছায়ামূর্তিও দাঁড়াইয়া পড়িল।

"মৃত অতীতের ছায়ামূর্তির প্রতি আমার কোনো আসক্তি নেই।" জীবন্ত কণ্ঠে বলিল নমিতা।

"তা না থাক, কিন্তু চলো তোমাকে আমি পথ দেখিয়ে দি।" ছায়ামূর্তি আবার হাতছানি দিল।

"সে ত মৃত্যুর পথ, আত্মহত্যার পথ।" নমিতা দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "আমি তোমার পথে যাব না। আমি যাব আমার নিজের পথে। জীবনের পথে—পৃথিবীর পথে।"

"আসবে না আমার সঙ্গে ?"

"না। তুমি তোমার পথ দেখেছ, আমিও আমার পথ দেখি।"

সুধীকে আর দেখা গেল না।

নমিতা অদৃশ্য আর কাহার উদ্দেশে মনে-মনে বলিল, "নিষ্ঠা! নিষ্ঠার কথা বলতে গেলে আমাকে তো এখন এই অশরীরীর পেছনে আত্মাহুতিতে যেতে হয়! সুতরাং—"

ঘাটের পথেই পা বাড়াইল নমিতা। অন্ধকার তরল হইয়া আসিতেছে, ঘাট চিনিতে অসুবিধা হইল না। যখন ঘাটে আসিয়া পৌছিল ভোরের আলো ফুটি-ফুটি করিতেছে। একটা যাত্রী-বোঝাই নৌকা ছাড়িবার উপক্রম করিয়াছে, নমিতা হাতের ইঙ্গিতে থামিতে বলিল। ভিড়ের মধ্যে সকলের মধ্যে একজন হইয়া যাওয়াই নিরাপদ।

"থামো—রাখো, রাখো!" নৌকার ভিতর হইতে কে একজন হঠাৎ আকুল কণ্ঠে চেঁচাইয়া উঠিল : "আরো একজন যাত্রী আছে। একে ফেলে যাওয়া চলবে না।" বলিতে-বলিতে সেই আরোহী নিজেই পারে লাফাইয়া পড়িল।

নমিতা বিস্ফারিত চোখে চাহিয়া দেখিল—অজয়।

"শুধু তুমিই প্রতীক্ষা করোনি, আমিও আপ্রাণ প্রতীক্ষা করে ছিলাম।" অজয় বলিল, "আমি জানতাম তুমি প্রদীপকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে ঠিক নদীর মতই চলে আসবে। এ কী, কথা বলছ না কেন ? চলো, ওঠো নৌকোয়।"

নমিতা মধুর কণ্ঠে বলিল, "ওটায় নয়। একটা আলাদা নৌকো নাও।"

"ঠিক বলেছ। শুধু তুমি আর আমি।" নির্মল নিরাময় আনন্দে অজয় উদ্বেল হইয়া উঠিল : "তারপর ?"

নমিতা নতুন নৌকার উদ্দেশে নদীর দিকে আরো আগাইয়া আসিল। তারপর মৃদু হাসিয়া বলিল, "তারপর নদী জানে আর নৌকো জানে।"

প্যান্

প্যান্ গ্রীক-দেবতা—বনের দেবতা ; সঙ্গীতপ্রিয়। বাংলায় এর ঠিক প্রতিশব্দ নেই। প্রতিশব্দ মিললেও প্রতিমূর্তি মেলে না।

অনুবাদ করবার সময় কখনো-কখনো এক-আধটু স্বাধীন হতে হয়েছে।

টমাস্ গ্লাহ্ন নামে এক শিকারী—তার একমাত্র সহচর কুকুর ঈশপ্—ঘন অরণ্যে তার ছোট কুটিরে একা দিনযাপন করত বিস্তীর্ণ প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় উদার বন্ধুতায়। উপন্যাসের ঘটনাস্থল নর্ডল্যাণ্ড। নর্ডল্যাণ্ড-এর প্রাকৃতিক শোভার মধ্যে যে অনির্বচনীয় রহস্য আছে গ্লাহ্নের আবেগাকুল জীবনে তা মিশে গেছে,—গ্লাহ্ন প্রকৃতির দুলাল! তার সমস্ত ইন্দ্রিয় প্রকৃতির প্রতি স্পন্দনে কম্পনে উন্মুখ ব্যগ্রতায় ছন্দিত হয়ে উঠে—প্রচুর সৌন্দর্য-মদধারা সে তার প্রাণপাত্র পরিপূর্ণ করেই পান করে। তার কামনা যেমন বস্তুজগতের সমগ্রতার জন্য,—তেমনি আবার সে ছোট একটি পাতার মর্মরে, নির্জীব প্রস্তরের বন্ধুর মতো সস্নেহ দৃষ্টিতে অপূর্ব ও অতীন্দ্রিয় আনন্দ-ইঙ্গিত পাঠ করতে শিখেছে। তার ভালোবাসার মধ্যে যে প্রবল আত্ম-উৎসর্গের ভাব আছে তাতেই মহিমান্বিত হয়ে রয়েছে তার সমস্ত না পাওয়া! হাম্‌সুন্-এর রচনায় যে বিপুল প্রাণচাঞ্চল্য ও সজীবতা আছে, যে উচ্ছ্বসিত কল্পনা ও কবিতার প্রাচুর্য আছে ও সমস্ত বস্তুজগতের ঊর্ধ্বে ধ্যানলোকের প্রতি যে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে—তা 'প্যান্'-এর প্রতি পৃষ্ঠায় জাজ্বল্যমান দেখা যায়।

এই কদিন ধরে আমি শুধু নর্ডল্যাণ্ড-এর গ্রীষ্মের কথা ভাবছি, তার অক্লান্ত দিনগুলির কথা। এইখানে বসে বসে ভাবি—আমার সেই কুটির, আর তার পেছনে সেই বনবীথি। আর সময় কাটাবার জন্য আবোল তাবোল লিখছি, নিজেকে খুশি রাখবার জন্য—আর কিছু নয়। সময় ভারি আস্তে যাচ্ছে; যেমনটি চাই তেমনি তাড়াতাড়ি কাটছে না, যদিও দুঃখ করবার আমার কিছুই নেই এতে;—আর আমি বেশ ভালোই ত আছি। সব কিছুতেই আমি খুশি, আর আমার ত্রিশ বছর বয়েস ত কিছুই নয়।

কদিন আগে কে আমাকে দুটি পালক পাঠিয়েছিল। একটি চিঠির কাগজে শিল-মোহর-করা একটি ধুক্‌ধুকির সঙ্গে দুটি পাখীর পালক। অনেক দূর থেকে পাঠিয়েছে। এগুলোকে ফিরিয়ে দেবার কোনো দরকার ছিল না। এ-ও আমাকে বেশ আনন্দ দিয়েছিল,—ঐ দুটি ছোট্ট সবুজ পালক-গুচ্ছি। তাছাড়া আমার কোনোই কষ্ট নেই। শুধু অনেকদিন আগের একটা গুলির ঘায়ের দরুণ বাঁ পায়ে মাঝে মাঝে বাতের ব্যথা টের পাই একটু। এই যা—

দু'বছর আগে, আমার বেশ মনে আছে, সময় বেশ তাড়াতাড়ি কেটেছিল—অন্তত এ দিনগুলির তুলনায়! আমাকে না জানিয়েই গ্রীষ্ম বিদায় নিয়েছিল। দু'বছর আগে—১৮৫৫ সনে—আমার জীবনে যা ঘটেছিল, বা যা স্বপ্ন দেখেছিলাম আমি, নিজেকে একটু আমোদ দেবার জন্য এইখানে তা লিখে রাখি। এখন আমি তখনকার অনেক কথাই ভুলে গেছি। কিন্তু, বেশ মনে করতে পারছি, সে-বছরের রাত্রিগুলি ছিল ভারি হালকা। আর অনেক জিনিসই অপরূপ ও আশ্চর্য লাগত আমার কাছে। বছরে বারোটি মাস,—কিন্তু রাত্রি ছিল দিনেরই মতো, আকাশে একটি তারাও দেখা যেত না। আর যে-সব লোকের দেখা পেতাম,—অদ্ভুত; যাদের চিনতাম এরা যেন তাদের থেকে ঢের আলাদা; এরা যেন এক রাতেই শৈশব থেকে গৌরবান্বিত প্রৌঢ়তায় বিকশিত হয়েছে। কোনো জাদুই এতে নেই; কেবল আমিই এমনটি আর দেখিনি। না, দেখিনি!

সমুদ্রের ধারে শাদা প্রকাণ্ড বাড়িটায় একজনের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। সে

খানিকক্ষণের জন্য আমার মন তোলপাড় করে দিয়েছিল। আমি এখন সব সময় আর তার কথা মনে করি না,—না, ভাবি না আর ; তাকে ভুলে গেছি। কিন্তু আর আর সব কথা ভাবি, সমুদ্র-পাখীদের কান্না, বনে বনে আমার শিকার, আমার রাত্রি, আর সেই নিদাঘের তপ্ত মধুর মুহূর্তগুলি। শুধু একদিন আচমকা তার সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল, নইলে একটি দিনের জন্যও তার কথা মনে পড়ত না।

যে-কুটিরে থাকতাম, তার থেকে এলোমেলো দেখা যেত পাহাড়, জাহাজের পাল, দ্বীপের টুকরোগুলি, সাগরের খানিকটা জল আর নীলাভ পাহাড়ের চূড়ার একটুখানি। আর আমার কুঁড়ের পেছনে ছিল বন,—অগাধ, প্রকাণ্ড। আমার সারা মন খুশিতে ভরে উঠত শিকড় আর পাতার গন্ধ পেয়ে ; ফার-গাছের ভারী গন্ধ আমার নাকে এসে লাগত—চর্বি-গন্ধের মতো মিষ্টি! শুধু এই অরণ্য আমার সমস্ত মন জুড়িয়ে দিত মা'র মতো ; আমার মন শান্ত হত, চাঙ্গা হয়ে উঠত! দিনের পর দিন ঈশপ্‌কে পাশে নিয়ে এই বুনো পাহাড় মাড়িয়ে যেতাম। এ ছাড়া আর কিছুই চাইতাম না,—থাক্ না বরফে আর নরম কাদায় সমস্ত মাটি ঢেকে। ঈশপ্ ছাড়া আমার আর কোনো সাথী ছিল না। এখন কোরা আমার সহচর ; তখন ছিল কিন্তু ঈশপ্—আমার কুকুর, আমি তাকে গুলি করে মেরে ফেলেছি।

সারাদিন গুলি ছুঁড়ে সন্ধ্যায় কুঁড়েয় যখন ফিরতাম, অনুভব করতাম, আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত অনুকম্পায় আর্দ্র একখানি স্নেহস্পর্শ কেঁপে কেঁপে বয়ে যাচ্ছে—মধুর স্নিগ্ধ ক্ষণিক একটি শিহরণ। সে-কথা ঈশপ্‌কেও বলতাম, আমরা কী আরামেই না আছি! "এখন একটা গুলি ছুঁড়ব, আর একটা পাখী ভেজে ফেলব উনুনে।"—ওকে বলতাম, "তুমি কি বল?" তারপর রান্না শেষ হলে আমরা খেতাম। উনুনের পেছনে নিজের জায়গাটিতে গিয়ে ঈশপ্ গুড়ি মেরে শুয়ে পড়ত, আমি পাইপটা জেলে বেঞ্চিটার ওপর শুয়ে শুয়ে গাছের মৃদু মর্মর শুনতাম। একটি ঝিরিঝিরি হাওয়া কুঁড়ের দিকে বয়ে আসত, শুনতাম ঐ পাহাড়ের পেছনে একটা বুনো মোরগ ডাকছে। তাছাড়া আর সব নিঝুম।

শুয়ে থাকতে থাকতে অনেক সময় সেখানেই ঘুমিয়ে পড়ি। সারা গায়ে পোশাক, খেয়াল নেই, সমুদ্র-পাখীদের কলরব শুরু না হওয়া পর্যন্ত ঘুম আর ভাঙে না। জানালা দিয়ে চেয়ে দেখি বড় বড় কারখানার দালান, সিরিল্যাণ্ড-এর বন্দর-ঘাট—ঐখান থেকেই ত রুটি নিয়ে আসি রোজ। আরো খানিকক্ষণ শুয়ে থাকতে ভালো লাগে, আশ্চর্য হয়ে ভাবি এইখানে নর্ডল্যাণ্ড-এ কি করে এলাম!

তারপর ঈশপ্ উনুনের ধার থেকে তার লম্বা কৃশ দেহটি মুড়ি দিয়ে বথ্‌লশ্‌টিতে

একটু আওয়াজ করে হাই তুলে লেজ নেড়ে উঠে দাঁড়াত, আর আমিও লাফিয়ে উঠতাম—তিন চার ঘণ্টা বিশ্রামের পর ত বটেই। নিবিড় আনন্দে তা ভরা… নিবিড় আনন্দে ভরা ত সবই।
এমনি করে, আমার অনেক রাত কেটে গেছে।

ঝড় আর বৃষ্টি—এমন কিছু নয় যাতে বিশেষ কিছু আসে যায়। বাদলা দিনের সঙ্গে প্রায়ই অল্প একটুখানি আনন্দ ভেসে আসে, মানুষকে তার আনন্দ নিয়ে একলা কোথাও উধাও হয়ে চলে যাবার জন্যে উতলা করে তোলে। কোথাও গিয়ে একটু দাঁড়াও, মাথার ওপরে সোজা তাকিয়ে থাক খানিকক্ষণ, ক্ষণে ক্ষণে মৃদু মৃদু একটু হাসো আর চারিদিকে চোখ ফেরাও। কি ভাববার আছে আর? জানলাতে ফর্সা একখানি পর্দা, পর্দার ওপর রৌদ্রের একটু ঝিকিমিকি, একটি ছোট্ট ঝর্ণার করতালি বা হয়ত মেঘের মাঝখানে নীল আকাশের ছোট্ট একটি ফালি। এর বেশি কিছু চাইনে আর—দরকার হয় না।
আর আর সময় অপ্রত্যাশিত জমকালো আনন্দও মানুষকে তার নির্জীবতা ও বিষণ্ণতা থেকে বাঁচাতে পারে না। নাচঘরে বসে কেউ আরাম পেতে পারে বটে, কিন্তু উদাসীন—কিছুই দোলা দিতে পারে না যে। দুঃখ আর আনন্দ নিংড়ে বের করতে হয় আপনার অন্তর থেকে।
এবার আমার একটি দিনের কথা মনে পড়ছে। সমুদ্রের পারে বেড়াতে গিয়েছিলাম। একেবারে না বলে কয়ে বৃষ্টি নেমে এল, খানিকক্ষণ মাথা গোঁজবার জন্যে একটা খোলা নৌকোঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। গুন্‌গুনিয়ে একটা সুর ভাঁজছিলাম, মন খুশি ছিল বলে নয়, এমনি—সময় কাটাবার জন্যে। ঈশপ্ আমার সঙ্গেই ছিল, বসে বসে শুনছিল। আমিও আমার গুন্‌গুন্ বন্ধ করে শুনতে পেলাম বাইরে গলার আওয়াজ—সামনে কারা জানি আসছে। ভাগ্যের কারসাজি; মামুলি মোটেই নয়। একটি ছোট দল—দুটি পুরুষ আর একটি মেয়ে। যেখানে বসেছিলাম, হুড়মুড়িয়ে সেখানে ঢুকে পড়ল। পরস্পরকে ডাকাডাকি করছে আর হাসছে।
—"শিগ্‌গির। যতক্ষণ না ধরে, এখানেই বসে পড়।"
উঠে দাঁড়ালাম।
একজনের শাদা গরম শার্টটার সমুখটা একেবারে ভিজে ফুলে উঠেছে, সেই ভিজা জামাটার সামনে একটা হীরার বোতাম। পায়ে লম্বা ধারালো-মুখ জুতো—তাতে একটু কেমনতর যেন দেখাচ্ছিল। তাকে শুভ দিনের অভিনন্দন জানালাম—সে

ম্যাক্, ব্যবসাদার; রুটির দোকান থেকে ওকে কত দিন দেখেছি; ও আমাকে কতদিন ওর বাড়িতে যেতে বলেছে, যখন খুশি,—আমি যাইনি।

—"আরে, তুমি যে!" আমাকে দেখে ম্যাক্ হেঁকে উঠল। "আমরা কারখানায় যাচ্ছিলাম, কিন্তু ফিরে আসতে হল। এমন বিশ্রী দিন করেছে যে—কি হে লেফ্‌টেনেণ্ট, কবে সিরিল্যাণ্ড-এ আমাদের সঙ্গে দেখা করতে যাবে?"

তার সঙ্গী ছোট কালো দাঁড়িওয়ালা মানুষটির সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলে—ডাক্তার; ঐ গির্জার কাছেই থাকে।

মেয়েটি তার ঘোমটা নাক পর্যন্ত অল্প একটুখানি তুললে, ফিস্‌ফিসিয়ে ঈশপের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেছে। তার জ্যাকেটটি দেখলাম, জামার লাইনিং আর বোতামের গর্তগুলি দেখে বোঝা যায় রং-করা এই জ্যাকেটটি। ম্যাক্ তার সঙ্গেও আমার পরিচয় করিয়ে দিল; তার মেয়ে—এড্‌ভার্ডা।

ঘোমটার আড়াল থেকে এড্‌ভার্ডা আমাকে একটি ভাঙ্গা চাউনি উপহার দিল, আবার কুকুরটার সঙ্গে আলাপ শুরু করেছে, ওর কলারের লেখা পড়ছে।

—"ও! তোমাকে ঈশপ্ বলে ডাকে! ডাক্তার ঈশপ্ কে ছিল? আমি ত জানি—অনেক গল্প লিখেছিল। ফ্রিজিয়ান্ ছিল, না? কিছুই মনে নেই।"

খুকি, পাঠশালার মেয়ে! ওর দিকে চাইলাম—দীর্ঘ, বয়স পনেরো-ষোলো হবে, পেলব দুখানি হাত, দস্তানা নেই। হয়ত সেই সন্ধ্যায় ঈশপের অর্থটা ভালো করে জানতে অভিধান খুঁজেছিল। কে জানে!

ম্যাক্ জিগ্‌গেস করলে কি খেলায় মেতে আছি আজকাল? কি কি বেশি শিকার করি? আমার যখনই দরকার তখনই ওর নৌকো পেতে পারি—ওকে আগে একটু জানাতে হবে মাত্র। ডাক্তার কিছুই বললে না। যখন ওরা চলে গেল, দেখলাম ডাক্তারের হাতে একটা লাঠি, একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে।

আগের মতনই ফাঁকা মন নিয়ে পায়চারি করি, উদাসীনভাবে গুন্‌গুনাই। নৌকো-ঘরের এই পরিচয় আমার মনে কোনো পরিবর্তন আনেনি, শুধু মনে পড়ছে ম্যাকের সেই ভিজা শার্টটা, হীরার সেই চাক্‌তিটা—হীরাটাও ভিজা, তেমন চাকচিক্যও আর তাতে নেই।

আমার কুঁড়ের পেছনে একখানি পাথর আছে—একটি ধূসর পাথর। বন্ধুর মতন আমার চোখের পানে তাকায়,—আমি যখন যাই তখন ও যেন আমাকে দেখেছে, এখন ফিরে আসবার সময় ফের দেখছে। ভোরবেলা বেরুবার সময় এই পাথরের

পাশ দিয়েই হেঁটে গেছি, একটি বন্ধু যেমন পেছনে ফেলে এলাম; জানি, আবার যখন ফিরে যাব আমার সেই বন্ধুটিই তেমনি সেখানে প্রতীক্ষা করে বসে থাকবে। তারপর বনে বনে মৃগয়ায় মাতোয়ারা,—হয়ত শিকার মিলল, হয়ত বা কিছুই না। ঐ দ্বীপগুলির পেছনে সমুদ্র গভীর শান্তিতে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে আছে! কতবার পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে উঁচু থেকে ঐ সমুদ্রকে আমি দেখেছি। শান্ত নিশুতি দিনে জাহাজগুলি যে চলে মনে হয় না, তিন দিন ধরে বকের পালকের মতো সাদা একই পাল যেন আমি দেখতে পাই। তারপর হয়ত যদি-বা বাতাস একবার মেতে ওঠে, দূরের পাহাড়ের চূড়াগুলি মেঘে মেঘে কালো হয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। ঈশান কোণ থেকে ঝড় ক্ষেপলে আমি দাঁড়িয়ে থাকি আর দেখি। আমার এ চমৎকার খেলা। সমস্ত কিছুই একটি বিস্তীর্ণ কুয়াশায় গা ঢেকেছে। মাটি আর আকাশের মিলন; রূপকথার রাজপুত্র আর পক্ষীরাজ ঘোড়ার চেহারা নিয়ে সাগরের ঢেউ লাফালাফি শুরু করে—বাতাসে সর্বনাশের নিশান ওড়ায়। ঝুলে-পড়া পাহাড়ের কোটরে দাঁড়িয়ে কত কথাই ভাবি—আমার সমস্ত হৃদয় ভরা। ভাবি, এ কি দেখছি আমি এখানে, এই সমুদ্র আমার সম্মুখে তার অতল রহস্যের ভাণ্ডার উন্মোচন করেই বা দেখাবে কেন? হয়ত আমি মাটির মস্তিষ্কের যন্ত্র-চালনাই দেখছি—টগ্‌বগিয়ে ফুটছে আর ফেনায় ফেনায় শিউরে উঠছে। কে জানে! ঈশপ্ ভারি চঞ্চল হয়ে ওঠে; বেচারা তার পা দুটো কষ্টে কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে নাক সিঁটকে খালি হাঁচে। তারপর আমাকে কিছু জানতে না দিয়েই কখন যে আমার পায়ের তলায় শুয়ে আমারই মতন সমুদ্রের পানে অনিমেষে চেয়ে থাকে, কিছুই জানিনে। আর একটিও রা নেই, কোথা থেকেও মানুষের একটি আওয়াজ শোনা যায় না, খালি দুরন্ত বাতাসের গোঙানি আমার মাথার চারদিক দিয়ে ডুকরে চলেছে। দূরে বিচ্ছিন্ন পাহাড়ের শ্রেণী দেখা যায়; সমুদ্র রাগে যখন ওদের গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, মনে হয় জলের দানব ভিজা বাতাসে উঠে এসে গর্জন করছে। ওর জটায় শ্মশ্রুতে সমস্ত দিক অন্ধকার কালো হয়ে গেল বলে। আবার ও ঢেউয়ের মাঝে এসে ডুব দেয়।

সেই ঝড়-ঝাপটার মধ্যে কয়লার মতো কালো একটি জাহাজ পথ বেয়ে···

বিকেলবেলা জাহাজঘাটে যখন পৌছুলাম, কয়লা-কালো জাহাজটা এসে পারে ভিড়েছে।—চিঠির জাহাজ। এই দুষ্প্রাপ্য অতিথিটিকে সম্বর্ধনা করবার জন্য ঘাটে লোক জমেছে বিস্তর। লক্ষ্য করলাম সবারই চোখ নীল,—থাক্ গে অন্য সব পার্থক্য, নীল তাদের চোখ! একটি মেয়ে মাথায় সাদা পশমের রুমাল বেঁধে একটু দূরে

দাঁড়িয়ে ছিল, কালো নিবিড় চুলের গুচ্ছ, তার পাশে সাদা রুমালটিকে ভারি সুন্দর অদ্ভুত মানিয়েছিল কিন্তু। মেয়েটি আমার পানে আশ্চর্য হয়ে তাকাচ্ছে,—আমার এই পোশাক, এই বন্দুকটা। তার সঙ্গে যেই কথা কইলাম, একটু থতমত হয়ে মাথাটি সরিয়ে নিলে। বললাম—"তুমি সব সময়েই এমনি সাদা রুমাল প'রো, কেমন? তোমাকে সুন্দর মানায়।"

আইস্‌ল্যাণ্ড-এর ফতুয়া-পরা একটা মোটা লোক ওর কাছে এসে ওকে এভা বলে ডাকল। তবে তারই মেয়ে ও নিশ্চয়। আমি এই মোটা লোকটাকে চিনি, পাড়ার কামার। এই কদিন আগেই ত আমার বন্দুকটা মেরামত করে দিয়েছে।

বাতাস বৃষ্টি তাদের কাজ করে দিয়ে গেল, সমস্ত বরফ গলে গেছে। কদিন ধরেই একটা নিরানন্দ গুমোট পৃথিবীর বুক চেপে বসে ছিল, পচা ডালপাতাগুলি ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছিল, কাকেরা দল বেঁধে নালিশ করছিল। কিন্তু বেশি দিন নয়। সূর্য কাছেই ছিল,—একদিন বনের পেছন থেকে ধীরে ধীরে উঠে এল। যখনি সূর্য উঠে আসে, আমি পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটি মধুর আনন্দের শিহরণ অনুভব করি, নিশ্চিন্ত প্রসন্নতায় কাঁধের ওপর বন্দুকটা তুলে নিই…আমার বন্দুক।

এ দিনগুলিতে আমার শিকারের কমতি হয়নি, যা চাই তাই মারি; খরগোস, বনমোরগ, পাহাড়ে-পাখী। আর কোনো দিন সমুদ্রের ধারে গিয়ে পড়লে যদি সাগর-পাখী নজরে পড়ে তাকেও গুলি করতে ছাড়ি না। ভারি সুন্দর যাচ্ছে এ সময়; দিনগুলি ক্রমেই বড় হয়, বাতাস আরো স্বচ্ছ হয়ে আসে। জিনিসপত্র গুছিয়ে দিন-দুয়েকের জন্য পাহাড়ের চূড়ায় এসে উঠি, ল্যাপ্‌দের দেখা পাই, ওরা আমাকে মাখন খেতে দেয়,—চমৎকার মাখন, ঠিক শাকের মতো স্বাদ। সেই পথ দিয়ে কতবার হেঁটে গেছি। তারপর ফের বাড়ি ফিরে কোনো পাখী মেরে ঝোলাটার মধ্যে পুরে রেখেছি। ঈশপ্‌কে সামনে নিয়ে আমি বসে পড়ি। আমার কত মাইল নীচে সমুদ্র পড়ে আছে, পাহাড়ের গা-গুলি ভিজা, জলের ছোঁয়া লেগে লেগে কালো হয়ে এসেছে, একটি অনবিচ্ছিন্ন মধুর কলরব উঠছে। আমার এই চেয়ে-থাকার সময়টি কত সংক্ষেপ করে দিয়েছে এই পাহাড়ের নীচেকার জলধারার অস্ফুট কলতান! এখানে আমি বসে বসে ভাবি, এই অশ্রান্ত মধুর গানটি নিজের খেয়ালেই বেজে চলেছে; কেউ ত শোনে না, কেউ ভাবেও না এর কথা, তবু নিজের মনে গান গেয়ে যাচ্ছে সব সময়! বেশ অনুভব করি, যখন আমি এই মৃদুল গানটি শুনি তখন এই পাহাড়-গুলি আর নির্জন নেই, ভরে উঠেছে। আবার আচমকা কিছু ঘটে ওঠে। বজ্রের

করতালি শুনে পৃথিবীর বুকে চমক লাগে, পাহাড়গুলি সমুদ্রের বুকের মধ্যে পিছলে পিছলে ডুব দেয়, ধোঁয়াটে ধুলোয় দিগ-দিগন্ত আচ্ছন্ন হয়ে যায়। ঈশপ্ বাতাসে নাক বাড়িয়ে হাঁচে।

এক ঘণ্টা কেটে যায় হয়ত—হয়ত তারও বেশি,—সময়ের বুঝি পাখা আছে! ঈশপ্‌কে ছেড়ে দিই, ঝোলাটা কাঁধে তুলে বাড়ির দিকে পা ফেলি। দেরি হয়ে যায়। নীচে বনের কাছে এসে আমার পুরাণো অতি পরিচিত পথ ধরি, ফিতের মতো সরু আঁকা-বাঁকা পথ। আর প্রত্যেকটি বাঁক আর মোড় ঘুরে চলি সময় কাটাবার জন্যে —কোন তাড়াতাড়ি ত নেই, কেউই ত নেই অপেক্ষা করে বাড়িতে। শাসনকর্তার মতো স্বাধীন, ইচ্ছা-মতো এই প্রশান্ত সুস্নিগ্ধ বনে বনে আমি ঘুরে বেড়াই,—আমার যেমন খুশি। সমস্ত পাখীর কণ্ঠে গান থেমে গেছে, অনেক দূর থেকে শুধু একটা বুনো মোরগ ডেকে উঠছিল—ও সব সময়েই খালি ডাকে।

বন থেকে বেরিয়ে এসেই সামনে দুটি চেহারা দেখলাম, দুটি লোক হাঁটছে। দেখেই চিনলাম। একজন জোমফ্রু এড্‌ভার্ডা—তাকে অভিনন্দন জানালাম—সঙ্গে তার ডাক্তার। তাদের আমাকে বন্দুকটা দেখাতে হ'ল, আমার ঝোলা আর কম্পাসটাও নেড়ে চেড়ে দেখলে। আমার কুঁড়ে ঘরে তাদের নিমন্ত্রণ করলাম, তারা একদিন আসবে বললে।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ঘরে গিয়ে উনুন জ্বালালাম, একটা পাখী সিদ্ধ করে খেলাম। কালকে আবার আর একটি দিন আসবে।···

সমস্ত দিক নিঝুম নীরব হয়ে আসে। জানলা দিয়ে চেয়ে সেই সন্ধ্যায় চুপ করে পড়ে থাকি। বন আর মাঠের ওপর সে সন্ধ্যায় যেন পরীস্থানের আলো ঝিলমিল করে, সূর্য ডগডগে লাল আলোয় আকাশ রাঙিয়ে ডুবে গেছে। সমস্ত আকাশ ভারি স্বচ্ছ নির্মেঘ ; সমুদ্রের পানে তাকাই, মনে হয় যেন সৃষ্টির গভীরতম রহস্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি ; আমার প্রাণে দ্রুত স্পন্দন উঠছে, ভারি আরাম অনুভব করছি কিন্তু। ঈশ্বর জানেন, আপন মনে ভাবি, ঈশ্বর জানেন, কেন আজকের এই আকাশ সোনালি আর বেগুনি রঙে রঙিয়ে উঠেছে, ঈশ্বর জানেন, পৃথিবীতে কোনো উৎসব আজ জমে উঠল কি না, তারায় তারায় কোনো আনন্দের মূর্চ্ছনা বাজল কি না, কোনো নদীতে নৌকো নাচল কিনা, ঈশ্বর জানেন।···চোখ বুজি, নৌকো চালাই, আর চিন্তার পর চিন্তা মনের গাঙে ভেসে বেড়াতে থাকে।

আরো কত দিন চলে যায়।

বেড়াই, দেখি বরফ কেমন করে জল হয়ে গলে পড়ে। কত দিন—ঘরে যখন খাবার

থাকে—একটা গুলিও ছুঁড়িনি। শুধু অগাধ মুক্তির উল্লাসে ঘুরে বেড়িয়েছি, আর সময় চলে গেছে। যে দিকেই তাকাই, সবখানেই কিছু না কিছু দেখবার ও শোনবার পাই, রোজই প্রত্যেক জিনিস একটু না একটু বদলে যাচ্ছে। ওসিয়ার আর জুনিপার-এর ঝোপ বসন্তের জন্যে প্রতীক্ষা করে আছে। একদিন কারখানায় গিয়েছিলাম; তখনো বরফে সব ঢাকা—তবুও তার চারপাশের জমি বছরের পর বছর মানুষের পায়ের ভারে ক্লেশ পাচ্ছে; বোঝা যায়, কত লোকের পর লোক তাদের কাঁধে শস্যের বোঝা নিয়ে এই পথ দিয়ে এসেছে ঐ কারখানায় গুঁড়ো করবার জন্যে। ওখানে যাওয়া মানে মানুষের দলের সঙ্গে পা ফেলে ফেলে হাঁটা; শুনেছি, ওখানকার দেয়ালে নাকি অনেক কথা আর তারিখ খোদা আছে।

বেশ, বেশ···

আরো লিখব? না, না। শুধু নিজেকে একটুখানি আনন্দ দিতে; আর দু'বছর আগে আমার বসন্ত কী রূপ নিয়ে এসেছিল, কি রকম দেখিয়েছিল সমস্ত সৃষ্টির চাউনি—তা লিখতে লিখতে আমার সময় বেশ সুখে কেটে যায়। মাটি আর সমুদ্র সুগন্ধের নিশ্বাস ফেলছে, বনের মরা পাতা থেকে একটা পচা মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে। টুনটুনিরা নীড় বাঁধবার জন্যে ঠোঁটে করে খড়কুটো নিয়ে ফুরফুরিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। আরো দুদিন কাটল, ঝর্ণাগুলি ভরে ভরে ফেনিল হয়ে উঠেছে, দু'একটা প্রজাপতি দেখা যাচ্ছে এখানে সেখানে, জেলেরা ইস্টিশান থেকে বাড়ি ফিরে চলেছে। সওদাগরের নৌকো দুটো মাছে বোঝাই হয়ে শুক্‌নো ডাঙায় এসে ভিড়ল; যেখানে মাছগুলো শুকোতে দেওয়া হবে তাকে ঘিরে প্রকাণ্ড দ্বীপপুঞ্জে অত্যন্ত চাঞ্চল্যের সাড়া পড়ে গেল হঠাৎ। আমার জানলা দিয়ে আমি সব দেখতে পাচ্ছি।

কোনো কোলাহলই এই কুঁড়ের কাছে এসে পৌছুচ্ছে না কিন্তু। আমি একা, এই একলাই আমাকে থাকতে হ'ল। মাঝে মাঝে কেউ সমুখ দিয়ে চলে যায়। এভাকে দেখলাম, সেই কামারের মেয়ে; দেখলাম তার নাকে দুটি ব্রণ উঠেছে।

জিগ্‌গেস করলাম,—"কোথায় যাচ্ছ?"

"জ্বালানি-কাঠের খোঁজে।" ও মৃদুস্বরে বললে। কাঠ বেঁধে নেবার জন্যে হাতে ওর একটা দড়ি, মাথায় সাদা একটি রুমাল। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওকে দেখতে লাগলাম, কিন্তু ও ফিরে চাইল না।

তারপর অনেকদিন আর কাউকে আমি দেখিনি!

বসন্ত ডাকছে, সমস্ত বন কান পেতে সেই ডাক শুনছে। ভারি সুখ হয় যখন দেখি

পাখীরা গাছেরা আগ্‌ডালে বসে রৌদ্রের দিকে চেয়ে গান করছে। কোনো কোনোদিন আমি রাত ছুটোতেই জেগে উঠি, ভোরবেলা পশু-পাখীরা যে নির্মল আনন্দটি অনুভব করে তারই স্বাদ পাবার জন্যে।

বসন্ত হয়ত আমারও মনের দুয়ারে এসেছে, বারে বারে আমার রক্ত কার দুটি পা ফেলার তালের মতো দুলে দুলে উঠছে। আমি আমার কুটিরেই বসে থাকি, ছিপ সুতো বঁড়শিগুলি নেড়ে চেড়ে পরীক্ষা করে দেখব ভাবি, কিন্তু কাজ করবার জন্য একটি আঙুলও নাড়তে ইচ্ছা করে না,—একটি রহস্যময় আনন্দদায়ক চাঞ্চল্য আমার মনের আগাগোড়া আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

হঠাৎ ঈশপ্‌টা লাফিয়ে উঠে গা মুড়ি দিয়ে একটুখানি ঘেউ করলে। কেউ কুঁড়ের দিকে এগিয়ে আসছে বুঝি। তাড়াতাড়ি টুপিটা টেনে ফেলে দিলাম, দোরের কাছে জোমফ্রু এড্‌ভার্ডার গলা শোনা যাচ্ছে। কোনো শিষ্টাচারের দাবী না করে ও আর ডাক্তার ওদের কথা মতো করুণায় আমার বাড়ি বেড়াতে এসেছে।

"হ্যাঁ"—আমি ওকে বলতে শুনলাম—"বাড়িতেই আছে সে।"

এই বলে ও এগিয়ে এসে আমার হাতে ওর হাতখানি শিশুর অপার সরলতায় তুলে দিল। বললে—"আমরা কালকেও এসেছিলাম, কিন্তু তুমি বাড়ি ছিলে না তখন।"

আমার কাঠের তক্তপোষের ওপর ছেঁড়া ময়লা কম্বলটার ওপর বসে ও কুঁড়ের চারদিকে চেয়ে দেখতে লাগল, ডাক্তার লম্বা বেঞ্চিটার ওপর আমার পাশেই বসল। আমরা কথা কইতে শুরু করলাম। খুব আরামের সঙ্গে গালগল্প চলতে লাগল। কত কথা শোনালাম ওদের—এই বনে কত রকম জানোয়ার আছে, এই শীতে আমি কি কি জোগাড় করতে পারিনি। খালি বনমোরগই মিলল।

ডাক্তার বেশি কিছুই বললে না, শুধু আমার বন্দুকের ওপর প্যান্-এর একটি ছোট্ট ছবি আঁকা দেখে তার পৌরাণিক উপাখ্যানের ব্যাখ্যা শুরু করল।

এড্‌ভার্ডা আচমকা জিগ্‌গেস করলে—"কিন্তু যখন কোনো শিকার জোটে না, কি করে চালাও?"

"মাছ। মাছই বেশি। সবসময়ই কিছু না কিছু খাবার জুটে যায়।"

"কিন্তু খাওয়ার জন্য আমাদের ওখানেও ত যেতে পার। এইখানে এই কুঁড়েতেই গেল-বছর এক ইংরেজ ভাড়াটে ছিল, সে প্রায়ই আমাদের ওখানে খেতে যেত।"

এড্‌ভার্ডা আমার দিকে তাকাল, আমিও তাকালাম ওর দিকে। মনে হল একটি মধুর অভিনন্দনের ইঙ্গিত যেন আমার হৃদয় স্পর্শ করছে। এই-ই যেন বসন্তের নির্মল উজ্জ্বল প্রভাত! কি সুন্দর ওর ভুরু দুটির ভঙ্গিমা!

আমার এই ঘর সাজানো সম্বন্ধে কিছু বললে ও। দেখালে, পাখীর ডানা আর নানান রকম চামড়া টাঙিয়েছি, ভেতর থেকে এই ঘরটাকে একটা নোংরা গুহার মতোই দেখায়। ওর কিন্তু ভারি পছন্দ হয়েছে। বললে—"হ্যাঁ, গুহাই বটে।"

এই অভ্যাগতদের দেবার মতো আমার কিছুই ত নেই। ভাবলাম, আমোদ করে একটা পাখী ওদের সিদ্ধ করে দিই, আঙুল দিয়ে শিকারীদের মতো ওরা খাক। আমোদ পাবে।

পাখী একটা রাঁধলাম।

এড্‌ভার্ডা সেই ইংরেজদের কথা বলতে লাগল,—বুড়ো, সঙ্কীর্ণচিত্ত, আপন মনে বিড়বিড় করে বকে। সে ছিল রোমান্ ক্যাথলিক্, যখন যেখানে যেত লাল কালো আখরভরা একটা শোলোকের পুঁথি পকেটে নিয়ে।

ডাক্তার বললে—"সে তাহলে আইরিশ ছিল বল?"

"আইরিশ?"

"হ্যাঁ। কেননা সে যে রোমান্ ক্যাথলিক্।"

এড্‌ভার্ডার মুখ চোখ রাঙা হয়ে উঠল, থতমত খেয়ে একটু এদিক ওদিক তাকিয়ে নিলে।

"হয়ত আইরিশ-ই হবে।"

তারপর ও কিন্তু ওর প্রফুল্লতাটি হারিয়ে ফেললে। ওর জন্য আমার বড় দুঃখ হল। ব্যাপারটাকে সোজা করে দেবার জন্য বললাম—"না, তুমিই ঠিক বলেছ। ইংরেজ-ই ছিল সে। আইরিশরা নরোয়েতে বেড়াতে আসে না।"

একদিন নৌকোয় করে মাছ শুকোবার ক্ষেতগুলি সবাই দেখে আসব ঠিক হল...

যাবার পথে ওদের খানিকটা এগিয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে এসে মাছ ধরবার যন্ত্রগুলো নিয়ে বসলাম। দরজার ধারে পেরেকে আমার ঝাঁকি-জালটা ঝুলছে, মরচেতে অনেক জায়গার গেরোগুলি ছিঁড়ে গেছে। সূঁচ বার করে মেরামত করতে বসলাম, অন্য জালগুলির পানে তাকাতে লাগলাম। আজকে কাজ করা কি ভয়ঙ্কর বিশ্রী শক্ত লাগছে। এই কাজের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই—এমনি নানান আজগুবি চিন্তা মনে খালি ভিড় করে আসছে যাচ্ছে; মনে হচ্ছে, জোমফ্রু এড্‌ভার্ডাকে বেঞ্চিতে জায়গা না দিয়ে সমস্তক্ষণ বিছানায় বসিয়ে রেখে অন্যায় করেছি। ওকে হঠাৎ ফের দেখে ফেললাম—সেই রক্তাভ মুখখানি, সেই গলা, কোমর সরু করবার জন্য ও ঘাঘরাটি সামনের দিকে খানিকটা নীচু করে দিয়েছে; ওর বুড়ো আঙুলটিতে খুকির সারল্যের স্নিগ্ধতা যেন আমাকে বিহ্বল করে তুলেছে। ওর আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে

চামড়ার ছোট ছোট কুঁচকানিগুলি যেন করুণায় ভরা! ওর মুখখানি ডাগর একটা গোলাপের মতো, লাবণ্যময়;

উঠে দরজা খুলে বাইরের দিকে চেয়ে রইলাম। কিছু শুনতে পাচ্ছিলাম না, শোনবার কিছুই ছিল না হয়ত। দরজাটা আবার বন্ধ করে দিলাম। ঈশপ্ ওর বিশ্রামস্থান থেকে উঠে এল, বুঝল—আমি কিছুর জন্য ভারি চঞ্চল হয়ে উঠেছি।

হঠাৎ মনে হল, ছুটে গিয়ে জোমফ্রু এড্ভার্ডার পিছু ধরে ওর কাছ থেকে কিছু রেশমের সুতো চাই গে, আমার ছেঁড়া জাল সেলাই করবার জন্যে! তাতে কোনই ত ফাঁকি বা ছল থাকবে না, আমি এই জালটা নিয়ে গিয়ে ওকে দেখাব, মরচেতে একেবারে ছিঁড়ে গেছে।

দরজার বাইরে বেরিয়ে এলাম। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, আমার মাছ-ধরার মশলা রাখার বাক্সের মধ্যেই রেশমের সুতো আছে,—যা দরকার তার চেয়ে ঢের বেশি। ধীরে ধীরে ফিরে এলাম। নিজের কাছেই রেশম-সুতো আছে বলে মনটা ভারি দমে গেল।

ঘরে যখন ফিরে এলাম, কিসের একটি নিশ্বাস আমাকে স্পর্শ করল। মনে হল, এখানে আর আমি একলা নই।

গুলি ছোঁড়া ছেড়ে দিয়েছি কি না একজন আমাকে জিগ্গেস করলে। দুদিন মাছ ধরতে বেরোলেও, পাহাড়ে পাহাড়ে আমার গুলি ছোঁড়ার সাড়া তার কানে পৌঁছোয়নি। গুলি আর ছুঁড়িনি বটে। যতদিন খাবার ছিল ঘরেই বসেছিলাম।

তৃতীয় দিনে বন্দুক কাঁধে নিয়ে বেরুলাম। অরণ্যানী সবুজ হয়ে আসছে, মাটি আর গাছের গন্ধ পাচ্ছি, স্যাঁৎসেঁতে শ্যাওলার আবরণ ফুঁড়ে তরুণ তৃণ মাথা তুলেছে। মনটা খুব ভারী, খালি বসে থাকতে ইচ্ছা করে।

কাল সেই জেলেটার সঙ্গে দেখা হওয়া ছাড়া এ তিনদিন একটি মুখও দেখিনি। ভাবি, যেখানে, বনের যে-ধারটায় আগে একদিন জোমফ্রু এড্ভার্ডা আর ডাক্তারকে দেখেছিলাম, আজ সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরবার মুখে সেইখানেই কারুর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে হয়ত। হয়ত ওরা সেই পথ ধরেই আবার বেড়াতে বেরিয়েছে, হয়ত—হয়ত বা নয়। আর সব ছেড়ে ওদের দু'জনের কথাই বা কেন ভাবি? দুটো পাখী মেরে তখুনি রেঁধে ফেললাম। কুকুরটা বেঁধে রাখলাম তারপর।

শুক্নো মাটিতে শুয়ে শুয়ে খাই। পৃথিবীকে কে ঘুম পাড়িয়েছে। খালি খোলা হাওয়ার মৃদুল একটি নিশ্বাস আর এখানে সেখানে পাখীদের গুঞ্জন। শুয়ে শুয়ে

দেখি, হাওয়ায় গাছের ডালপালাগুলি আস্তে আস্তে দুলছে ; দুষ্টু হাওয়া শাখায় শাখায় পরাগ চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছে আর যত সরল কিশোরী-কুসুমের মর্মকোষ পরিপূর্ণ করছে। সমস্ত বন আনন্দে ভরে গেছে।

গাছের ডালে শুঁয়োপোকা নিজেকে টেনে নিয়ে চলেছে—অবিশ্রান্ত ওর চলা, বিরাম নেই ওর। কিছুই যেন দেখে না, ওপরে মাথা তুলে কি যেন ধরতে চায়, মাঝে মাঝে মনে হয় একটা নীল সুতোর গুটি দিয়ে ডালটার বরাবর কে তুর্কি-সেলাই করছে। হয়ত সন্ধ্যাশেষে ও ওর চলার শেষ পাবে।

সুষুপ্ত! উঠি, চলি, ফের বলি, ফের উঠে পড়ি। প্রায় চারটে হ'ল। ছ'টার সময় বাড়ি গেলেই চলবে, দেখি কারো সঙ্গে দেখা হয়ে যায় কি না। আরো দু'ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে। এমনিই অস্থির হয়ে উঠেছি,—জুতোর থেকে ধুলো ঝাড়ি, জামার থেকে খড়কুটোগুলো। যেসব জায়গা দিয়ে হাঁটি, সবার সঙ্গেই আমার চেনা আছে। গাছ আর পাথরগুলি তেমনি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, পায়ের নীচে পাতাগুলি খস্‌খস্ ফিস্‌ফিস্ করে ওঠে। এই একঘেয়ে নিশ্বাসের ওঠা-পড়া, এইসব পরিচিত গাছপালা পাথর আমার কাছে অনেকখানি। আমার সমস্ত অন্তরে অব্যক্ত ধন্যবাদ পুঞ্জিত হয়ে উঠে—সবাই আমার প্রতি প্রসন্ন, সব যেন আমার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে—সব কিছুকেই ভালোবাসি আমি।

একটা ছোট মরা ডাল কুড়িয়ে হাতে নিয়ে বসে বসে ওর দিকে চেয়ে থাকি, আর নিজের কথা ভাবি। ডালটা প্রায় পচে এসেছে, ওর জীর্ণ বাকল আমাকে স্পর্শ করছে, সমস্ত হৃদয় করুণায় ভরে উঠেছে। ফের যখন উঠে পড়ি, ডালটা দূরে ছুঁড়ে ফেলি না, ধীরে ধীরে শুইয়ে রাখি, আর ওকে ভালোবাসি—এমন চোখে ওর পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। একেবারে চলে যাবার আগে আর একবার ওর দিকে ভিজা চোখে তাকাই—হয়ত ওখানে ও একলা পড়ে থাকবে।

পাঁচটা। রোদ আজ আর আমাকে সময় ঠিক করে বলে দিতে পারছে না। সমস্ত দিনই ত পশ্চিমমুখে হাঁটছি। কুটিরের কাছে রৌদ্রের যে-চিহ্নটি আমার চেনা, সে-চিহ্নটি পড়বার আধ ঘণ্টা আগেই এসে পড়ি যেন। জানি, তবু মনে হয়, ছ'টা বাজতে আরো এক ঘণ্টা বাকি। তাই ফের উঠে পড়ি, একটু হাঁটি। পায়ের তলে পাতাগুলি তেমনি কথা কয়ে ওঠে। এমনি করে এক ঘণ্টা কাটে।

ছোট ঝর্ণাটির পানে তাকাই—আর সেই কারখানাটার দিকে। সারা শীত বরফেই ঢাকা ছিল ওটা। কারখানা চলছে, ওর গোলমাল আমাকে নাড়া দিল, তক্ষুণিই থামলাম।

"অনেকক্ষণ বাইরে আছি।" জোরে বলি। সমস্ত দেহের মধ্যে ব্যথার শিখা যেন ধেয়ে চলে, তক্ষুণি ফিরি, ঘরমুখো পাড়ি দিই। অনেকক্ষণ বাইরে কাটালাম—এই কেবল মনের মধ্যে গুমরে ওঠে। জোরে চলি, তারপর দৌড়ুই। কি যেন কি একটা কিছু হয়েছে, ঈশপ্ বোঝে, দড়িটা টানে—আমাকে টেনে নিয়ে চলে, মাটি শোঁকে আর সন্দেহে নিশ্বাস ফেলে—চঞ্চল হয়ে উঠেছে যেন। শুক্‌নো পাতা চারিদিকে মর্মরিত হচ্ছে। যখন বনের ধারে এলাম, কেউই নেই সেখানে, না—না, সব নিঝুম, সেখানে কেউ নেই।

"এখানে কেউই নেই।" নিজেকে বলি। আশা মিটল না বলে খুব খারাপ লাগে না কিন্তু।

বেশিক্ষণ দেরি করলাম না, চললাম, কুটির পেরিয়ে গেলাম—একেবারে সিরিল্যাণ্ড-এ। সঙ্গে ঈশপ্, আমার ব্যাগ আর বন্দুক—যা কিছু আমার সম্পত্তি।

ম্যাক্ আন্তরিক বন্ধুত্বায় আমাকে আপ্যায়িত করলে। খাবার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বললে।

আমার চার পাশের লোকদের মন হয়ত পাঠ করতে পারি একটু একটু—এমনি মনে হয়—কিন্তু মোটেই হয়ত তা নয়। যখন আমার দিন ও মন ভালো থাকে, মনে হয় অনেক দূর পর্যন্ত যেন ওদের প্রাণের তল খুঁজে পাই—আমি নাই-বা হলাম বিদ্বান নাই-বা চতুর! একটি ঘরে সবাই বসি—কয়েকজন পুরুষ, কয়েকটি মেয়ে আর আমি, ওদের মনের মধ্যে কি হচ্ছে, ওরা আমার সম্বন্ধে কি ভাবছে সব যেন দেখতে পাই, বুঝি। ওদের চোখের দীপ্তির দ্রুত অল্প একটু পরিবর্তনের মধ্যে কি যেন আছে; মাঝে মাঝে রক্তের ছোপে ওদের গাল রঙিন হয়ে ওঠে, কখনো কখনো বা অন্যদিকে চাইবার ভান করে লুকিয়ে লুকিয়ে আমাকে দেখে। বসে বসে এইসব লক্ষ্য করি। কেউ কিন্তু স্বপ্নেও ভাবে না, আমি ওদের সমস্ত হৃদয় আঁতি-পাঁতি করে খুঁজে ফিরছি—সব দেখে ফেলেছি। অনেকদিন পর্যন্ত তাই মনে হত—যার সঙ্গে দেখা তারই অন্তরখানি আমার চোখের কাছে খোলা রয়েছে। কিন্তু হয়ত তা নয়, নয়।...

সমস্ত সন্ধ্যাটা ম্যাক্-এর বাড়িতেই কাটালাম। তক্ষুণি চলে যেতে পারতাম, ওখানে বেশিক্ষণ বসে থাকতে ভালো লাগছিল না বটে—কিন্তু আমার সমস্ত মন এদিকে ঝুঁকে পড়েছিল বলেই কি এখানে আসিনি? এখুনিই চলে যাই কি করে? হুইষ্ট্ খেললাম আমরা, খাওয়ার পর তাড়ি খেলাম। ঘরের খানিকটা আমার পেছনে, মাথা সমুখের দিকে নোয়ানো—আমার পেছনে এড্‌ভার্ডা যাওয়া-আসা করছিল। ডাক্তার বাড়ি চলে গেছে।

ম্যাক্ তার নতুন বাতিগুলির ঢং আমাকে দেখাতে লাগল—উত্তর-জেলায় এই প্রথম মোমবাতির লণ্ঠন। চমৎকার ওগুলো, তলায় ভারী সিসের পা। ম্যাক্ রোজ সন্ধ্যায় নিজেই ওগুলো জ্বালায়, পাছে দৈবাৎ কোনো দুর্ঘটনা হয়। সে দু'একবার তার ঠাকুরদা কন্‌সাল-এর গল্প করলে।

আঙুল দিয়ে ওর জামার হীরেটা দেখিয়ে বললে—"এই ব্রুচটা কার্ল জোহান্ নিজের হাতে আমার ঠাকুরদা কন্‌সাল ম্যাক্‌কে দিয়েছিলেন।"

ওর স্ত্রী মরে গেছে, একটা ঘরে তার চিত্রিত ফটোটা দেখালো। মেয়েটিকে দেখতে খুব সম্ভ্রান্ত, মাথায় লেস-ওয়ালা টুপি, মুখের হাসিটি ভারি অকুণ্ঠ। সেই ঘরের একটা বইয়ের তাকে কতকগুলি পুরাণো ফরাসী বই, উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সম্পত্তি হয়ত। সোনালিতে মোরা অনেক মালিকই গায়ে গায়ে তাঁদের নাম খুদেছেন। কতগুলি শিক্ষাসম্বন্ধীয় বইও দেখা গেল—ম্যাক্-এর বিদ্যাবুদ্ধি বলে কিছু আছে তাহলে।

গুদাম-ঘর থেকে ওর দুই সহকারীকে ডাকা হল হুইষ্ট-এর খেড়ু হতে। ওরা ভয়ে ভয়ে আস্তে আস্তে খেলে, ভয়ে ভয়ে হিসাব রাখে, গোনে অথচ ভুল করে। একজনকে এড্‌ভার্ডা নিজের হাতে দেখিয়ে দিচ্ছিল।

আমি গ্লাশটা উল্টে দিলাম, দাঁড়িয়ে পড়লাম লজ্জায়।

"ঐ যা—গ্লাশটা উল্টে গেল।" বললাম।

এড্‌ভার্ডা খিলখিল করে হেসে উঠল। বললে—"যাক গে, তাতে আর কি।"

সবাই হেসে আমাকে আশ্বস্ত করলে যে ওতে কিছুই হয়নি। গা-টা মুছে ফেলবার জন্য একটা তোয়ালে দিলে; ফের খেলা চলল। এগারোটা বেজে গেল দেখতে দেখতে।

এড্‌ভার্ডার হাসিতে মনে অস্পষ্ট একটা ব্যথা বোধ হচ্ছিল। ওর মুখের দিকে চাইলাম, ওর মুখ যেন আর তত সুন্দর নয়, যেন নেহাৎ বাজে হয়ে গেছে। সহকারীদের ঘুমুতে যাবার সময় হয়েছে বলে ম্যাক্ খেলা ভেঙে দিলে। তারপর সোফায় হেলান দিয়ে বসে আমার সঙ্গে পরামর্শ শুরু করলে—বাড়ির সমুখে কি রকম সাইন-বোর্ড দেওয়া যায়। আমার মতে কি রঙ সব চেয়ে ভালো মানাবে?

ভালো লাগছিল না এ-সব, কিছু না ভেবেই বললাম—"কালো।"

ম্যাক্ তক্ষুণিই তাতে রাজি হল। বললে—"কালো? হ্যাঁ, আমিও ঠিক তাই ভাবছিলাম। ঘন কালো হরপে 'নুন আর পিপে'—চমৎকার দেখাবে।...এড্‌ভার্ডা, তোমার ঘুমুতে যাবার সময় হয়নি?"

এড্ভার্ডা উঠে আমাদের হাত নেড়ে শুভরাত্রি জানিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল। আমরা বসেই রইলাম। গেল বছরে যে রেল-লাইন খোলা হয়েছে তারই গল্প শুরু হ'ল—প্রথম টেলিগ্রাফ-লাইনের গল্প।

"যখন এখানে টেলিগ্রাফ আসবে, সে ভয়ানক আশ্চর্য কাণ্ড হবে কিন্তু।"

চুপ্চাপ।

"এইরকমই হয়।" ম্যাক্ বললে—"সময় ভেসে চলেছে। আজ আমার ছেচল্লিশ বছর বয়সে চুল দাড়ি পেকে উঠেছে। তুমি আমাকে দিনের বেলায় দেখলে যুবক বলেই ভাববে নিশ্চয়, কিন্তু সন্ধ্যাকালে একলা বসে আমি আমার যৌবনকে বেশি করে অনুভব করি। একা বসে বসে 'পেশান্স্' খেলি। চারদিক একটুখানি অগোছাল করে রাখলেই বেশ বোঝা যায়। হা হা!"

"অগোছাল করে রাখলে?" জিগ্গেস করলাম।

"হ্যাঁ।"

মনে হল ওর চোখে যেন পড়তে পারি···

জায়গা ছেড়ে উঠে ও জানলার কাছে গিয়ে বাইরের পানে তাকাল। একটুখানি নীচু হল, ওর লোমশ ঘাড়টা দেখলাম। আমিও উঠলাম। চারিদিক চেয়ে ও ওর লম্বা ধারালো-মুখ জুতো বাড়িয়ে আমার কাছে হেঁটে এল, ওয়েস্টকোটের পকেটে দুটো বুড়ো আঙুল ঢুকিয়ে বাহু দুটো একটু দোলালে, যেন ও দুটো ওর পাখা,—তারপর হাসল। দরকার হলে ওর নৌকো নেবার কথা ফের বললে। পরে হাত বাড়িয়ে দিলে।

"দাঁড়াও একটু, আমিও যাব।" বলে বাতিগুলি নিবিয়ে দিলে। "হ্যাঁ, একটু হাঁটতে ইচ্ছে করছে; এখনো রাত ত বেশি হয়নি।"

আমরা বেরুলাম।

কামারের বাড়ির ধারের রাস্তা দেখিয়ে ও বললে—"এই পথে—সোজা হবে।"

"না—ঐ ঘাটের রাস্তা ঘুরেই সোজা হবে।"

এই নিয়ে একটু তর্ক হ'ল, কেউ কারু কথায় রাজি হই না। জানতাম, আমারটাই সোজা, তবুও ও কেন যে বারে বারে ঐ রাস্তার পক্ষ নিচ্ছে বোঝা কঠিন। ও বললে, যে যার রাস্তায় যাক, যে আগে যাবে সে কুঁড়েতে অপরের জন্য অপেক্ষা করবে।

দুজনে রওনা হলাম। ও দেখতে না দেখতেই বনের মধ্যে হারিয়ে গেল।

যেমন হাঁটি তেমনি হাঁটছিলাম। মনে হ'ল নিশ্চয়ই পাঁচ মিনিট আগে গিয়ে পৌঁছুব।

কুঁড়েয় গিয়ে দেখি ও আগেই এসেছে কিন্তু। আমাকে দেখেই হেঁকে উঠল—"কি বলেছিলাম হে? আমি বরাবর এ পথ দিয়ে যাওয়া-আসা করি—এ-ই সব চেয়ে সোজা।"

বিস্ময়ে ওর দিকে তাকালাম। ও শ্রান্ত হয়নি, দৌড়ে এসেছে এমনিও মনে হয় না কিন্তু। বেশিক্ষণ দাঁড়াল না, বন্ধুর মতো শুভরাত্রি জানিয়ে চলে গেল সেই পথ দিয়েই।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম, এ ভারি অদ্ভুত ত! দূরত্বের পরিমাণ সম্বন্ধে আমার কিছু ধারণা ছিল বলেই ত জানতাম—দু'পথ দিয়েই ত বহুবার যাতায়াত করেছি। তবে? তুমি ফের ভাল মানুষ সেজে এমনি করে দুষ্টুমি করছ, ম্যাক্! সমস্ত জিনিসই কি ফাঁকি?

বনের মধ্যে মিলিয়ে যেতে-না-যেতে ওর পিঠটা আবার দেখলাম।

ওর পেছনে পেছনে চলেছি তাড়াতাড়ি, কিন্তু অতি সন্তর্পণে। সমস্ত রাস্তা ও ওর মুখ মুছছে; দৌড়ে আসেনি—এ কথা আর বিশ্বাস করব না! আবার খুব আস্তে আস্তে চলি, আর সতর্ক হয়ে ওকে পর্যবেক্ষণ করি। কামারের বাড়ির কাছে ও থামল। লুকিয়ে পড়লাম,—দরজা খুলে গেল; ম্যাক্ বাড়ির মধ্যে ঢুকল।

সমুদ্র আর ঘাসের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারি রাত একটা হয়েছে।

নিশ্চিন্তে আরো ক'টা দিন কাটল, অরণ্য আর এই অসীম নির্জনতাই আমার বন্ধু। একাকী থাকা কাকে বলে আগে জানিনি। এখন ভরা বসন্তের দিন, নানান গুল্মের জন্মোৎসব, কলকণ্ঠে পাখীর দল বেরিয়ে এসেছে,—সব পাখীকেই চিনি। নির্জনতা ভাঙবার জন্য মাঝে মাঝে পকেট থেকে দুটো মুদ্রা বার করে বাজাই। ভাবি, যদি ডাইডেরিক্ আর ইসেলিন্ এসে দাঁড়ায় চোখের কাছে।

রাত ফের ছেয়ে আসে, সূর্য সমুদ্রে ডুবে ফের লাল তাজা হয়ে ওঠে, যেন জল খেতে ডুব দিয়েছিল। এ রাতগুলি ভরে যা-তা সব ভাবছি, কেউ বিশ্বাস করবে না। প্যান্ কি তরুশাখায় বসে আমাকে লক্ষ্য করছে—কি করি আমি? ওর উদর বুঝি উন্মুক্ত, নীচু হয়ে বসে নিজের উদর থেকেই বুঝি পান করছে ও? তবু ভুরু কুঁচকে আমাকে দেখছে, সারা গাছ ওর নিঃশব্দ হাসির আলোড়নে কাঁপছে—আমার মায়াবী চিন্তাস্রোত দেখে।

বনের সবখানে মর্মরধ্বনি জেগেছে, পশুগুলি জোরে নিশ্বাস নিচ্ছে। পাখীরা পরস্পরকে ডাকাডাকি করছে, ওদের ইশারায় বাতাস যেন ভরে গেল। মে-বাগ্

পাখীর বিদায় নেবার তারিখ এল, ওর অস্পষ্ট গুঞ্জন রাতের পোকার গুন্‌গুনানির সঙ্গে মিশে গেছে—যেন বনের আনাচে-কানাচে ফিস্‌ফিসিয়ে আলাপ চলেছে কাদের। এত শোনবার রয়েছে এখানে। দিন-রাত আমি ঘুমুইনি—খালি ডাইডেরিক্ আর ইসেলিন্-এর কথা ভেবেছি।

ভাবি, "হয়ত ওরা এসে পড়বে।" ইসেলিন্ ডাইডেরিক্‌কে হয়ত একটা গাছের তলায় নিয়ে গিয়ে বলবে: "খাড়া থাক এখানে, পাহারা দাও। এই শিকারীকে দিয়ে আমি আমার জুতোর ফিতে বেঁধে নেব।"

সেই শিকারী ত আমিই। আমার দিকে এমন করে ও চাইবে যে, সে দৃষ্টির মানে আমি বুঝব। কখন সে আসে আমার হৃদয় তা জানে, তখন হৃদয় আর দোলে না, ঘণ্টার মতো বেজে ওঠে। ওর পোশাকের তলায় পা থেকে মাথা পর্যন্ত আগাগোড়া ও নগ্ন; ওর গায়ের ওপর আমার হাত রাখি।

"জুতোর ফিতে বেঁধে দাও"—রাঙা গালে ও আমাকে বলে। খানিক বাদে আমার মুখের, ঠোঁটের কাছে ওর মুখ এনে ফিস্‌ফিস্ করে বলে: "বাঃ, তুমি আমার জুতোর ফিতে বাঁধছ না, তুমি বাঁধছ না, বাঁধছ না আমার…"

কিন্তু সূর্য সমুদ্রে ডুবে ফের লাল তাজা হয়ে ওঠে, যেন জল খেতে ডুব দিয়েছিল। বাতাস অস্ফুট গুঞ্জরণে ভরা।

এক ঘণ্টা বাদে মুখের কাছে এসে ফের বলে: "এবার তোমাকে ছেড়ে চললাম।" ফিরে ফিরে আমার পানে হাত নাড়ে, মুখ ওর তখনো রাঙা, কোমল, খুশিতে উছলে ওঠা। আবার ফেরে, আবার হাত নাড়ে।

কিন্তু ডাইডেরিক্ গাছের তলা থেকে বেরিয়ে এসে শুধোয়; "ইসেলিন্, কি করেছ? আমি ত দেখে ফেলেছি।"

ইসেলিন্ বলে: "কি দেখলে? কিছুই করিনি ত।"

"দেখেছি, কি করেছ।" ফের বলে: "দেখে ফেলেছি।"

ইসেলিন্-এর হাসির তরঙ্গ বনে বনে প্রতিধ্বনিত হয় তারপর, ডাইডেরিক্-এর সঙ্গে যায়;—ওর সর্বদেহ আতুর, আনন্দে হিল্লোলিত হচ্ছে। কোথায় চলেছে ও? আর কোন্ মৃত্যুপিপাসু মানুষের দুয়ারে, কোন্ বনের শিকারীর কাছে?

মাঝ রাত। ঈশপ্ দড়ি ছিঁড়ে পালিয়ে নিজের মনে শিকার খুঁজছে। পাহাড়ে পাহাড়ে ওর চীৎকার শুনলাম। ওকে যখন পাকড়াও করলাম, রাত তখন একটা। একটি মেয়ে ছাগল চরিয়ে আসছে, পায়ে মোজা বাঁধা, গুন্‌গুনিয়ে সুর ভাঁজছে আর চারদিক চাইছে। বনে এই মাঝরাতে কি করছিল ও? না না, কিছুই না। অস্থির

হয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছিল বুঝি, হয়ত বা স্থখেই, কে জানে! ভাবলাম, নিশ্চয় ও বনে বনে ঈশপের আর্তনাদ শুনেছে, আর নিশ্চয় ভেবেছে—আমি বাইরে বেরিয়েছি। কাছে আসতেই দাঁড়িয়ে ওর দিকে চাইলাম—ভারি পাত্‌লা টুকটুকে মেয়েটি! ঈশপ্-ও দাঁড়িয়ে ওকে দেখছে।

"কোত্থেকে আসছ?" শুধোই।

"কারখানা থেকে।" মেয়েটি বলে।

কিন্তু এত রাতে কারখানায় ও কী কাজ করে?

"এত রাতে বনে বেরিয়ে আসতে ভয় করে না তোমার?" বলি—"তুমি এত হালকা, এত ছোট্টটি।"

মেয়েটি হাসে, বলে—"আমি আর ছোট্টটি নই—আমার বয়স উনিশ।"

কিন্তু উনিশ ত হতে পারে না, নিশ্চয়ই দু'বছর মিথ্যা করে বেশি বলছে, ও মোটে সতেরো। বয়েস ভাঁড়িয়ে ওর কি হবে?

বলি—"বোস, তোমার নাম কি?"

ও আমার পাশে বসে লজ্জায় একটু রাঙা হ'ল, বলল—"আমার নাম হেন্‌রিয়েট্।"

শুধোই—"তোমাকে কি কেউ ভালোবাসে হেন্‌রিয়েট্? সে কি তোমাকে কখনো বাহুর মাঝে নিয়ে জড়িয়েছে?"

"হ্যাঁ।" লজ্জায় একটু হাসে মেয়েটি।

"ক'বার?"

মেয়েটি কথা কয় না।

"ক'বার?" আবার শুধোই।

"দু'বার।" আস্তে বলে।

ওকে টেনে আনলাম বুকের কাছে। বলি—"কেমন করে জড়াত? এমনি করে?"

"হ্যাঁ!" ও ফিসফিস করে ভয়ে ভয়ে বলে।

তাড়াতাড়ি চারটে বাজে।

এড্‌ভার্ডার সঙ্গে খানিক কথা হ'ল।

"শিগ্‌গিরিই বৃষ্টি এসে পড়বে।" বললাম।

"ক'টা বেজেছে?" ও শুধোল।

সূর্যের দিকে তাকিয়ে বললাম—"পাঁচটা হবে।"

"রোদ দেখে সময় ঠাহর করতে পার?"

"পারি।"

চুপচাপ।

"আর যখন রোদ থাকে না, কি করে বল তখন?"

"তখন আর আর সব জিনিস দেখে বলি। জোয়ার-ভাটা দেখে, ঘাসের রং বদলানো দেখে, পাখীর গান শুনে—এক পাখীর দল বিদায় নেয়, অন্য পাখীর দল গান ধরে। সন্ধ্যায় যে-সব ফুল চোখ বোজে, তাদের দেখে বলতে পারি—ঘাসেরা কখনো তাজা সবুজ, কখনো ফ্যাকাশে। তাছাড়া, আমি অনুভবই করতে পারি।"

"ও।"

বৃষ্টি এসে পড়বে বুঝি, এড্‌ভার্ডাকে বেশিক্ষণ রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখা ঠিক হবে না, টুপিটা তুললাম। কিন্তু তক্ষুণি ও কি একটা প্রশ্ন করে আমাকে বাধা দিলে। দাঁড়ালাম। ও লজ্জিত হয়ে জিগ্‌গেস করলে আমি এখানে এসেছি কেন? কেন গুলি ছুঁড়ি, এ ও তা। খাবার যা দরকার তার বেশি কেন মারি না, কেন কুকুরটাকে আলসে করে রাখি?...

ওকে ভারি রাঙা, নম্র দেখাচ্ছে। মনে হল, কেউ কিছু আমার বিষয় ওকে বলে থাকবে, নিজের থেকে ও এ-সব কিছু জিগ্‌গেস করছে না। কি জানি কেন, ওর প্রতি স্নেহে মন আর্দ্র হয়ে এল, ওকে ভারি অসহায় দুঃখী মনে হচ্ছে; মনে হচ্ছে, বেচারীর মা নেই, ওর শীর্ণ বাহু দুটি দেখে মনে হয়, ওকে কেউ যত্ন করে না। ওর জন্য মন যেন গলে যায়।

আমি গুলি ছুঁড়ি হত্যা করতে নয়, জীবনধারণ করতে মাত্র। আজকে আমার শুধু একটা বিল-মোরগের দরকার ছিল, তাই দুটো মারিনি, কালকে আরেকটা মারব। বেশি মেরে কি হবে? বনে থাকি বনের ছেলের মতো।

জুন্-এর গোড়ায় খরগোশ, পাহাড়ি মোরগ পাওয়া যেত—এখন মারবার কিছুই নেই দেখছি! বেশ, এবার জাল নিয়ে বেরুব, মাছ খেয়েই দিন যাবে। মেয়েটির বাপের কাছ থেকে নৌকো ধার নিয়ে দাঁড় টানতে লেগে যাব। সত্যি সত্যিই, হত্যা করবার আনন্দে নয়, শুধু বনে থাকতে হবে বলেই গুলি ছুঁড়ি।

বন আমার বেশ জায়গা। খাবার সময় সোজা হয়ে চেয়ারে বসতে হয় না, মাটিতে গা ছড়িয়ে শুয়ে শুয়ে খাই—এখানে গ্লাশ উল্টে ফেলি না আর। যা খুশি তাই করি এ বনে, ইচ্ছা করলে চিৎ হয়ে শুয়ে চোখ বুজে থাকি, যা খুশি নিজের মনে আওড়াই। কখনো কখনো কারো কোনো কথা চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছা করতে পারে,—মনে হয় যেন বনের ঘুমন্ত হৃদয় থেকে বাণী উচ্চারিত হচ্ছে।

ওকে জিগে্গেস করি ও এসব কিছু বুঝবে কি না। ও হাঁ বলে।

ওর চোখ দুটি আমার মুখের ওপর, তাই আরো বলে চলি—

"এই বনে যা সব দেখি তা যদি শোন!" বলি, "শীতকালে বরফের ওপর পাহাড়ি মোরগের পায়ের চিহ্ন ধরে ধরে চলি। হঠাৎ আর পথ চেনা যায় না, পাখীটা ডানা মেলে পালিয়েছে! শিকার কোন্ দিকে ভেগেছে, ডানার চিহ্ন দেখে বুঝি, তাকে ধরি। সবসময়েই কিছু না কিছু নতুন জুটে যায়। শরৎকালে উল্কা দেখা যায়। একা বসে বসে ভাবি—কি এটা? কোনো জগতের সহসা বুঝি ওলোট-পালোট হয়ে গেল? আমার চোখের সামনে একটা পৃথিবী টুকরো টুকরো হয়ে গেল বুঝি! ভাবতে কী সুখ লাগে যে জীবনে এই উল্কাপাত দেখতে দৃষ্টি পেয়েছিলাম। তারপর গ্রীষ্ম যখন আসে, মনে হয় প্রত্যেকটি পাতায় যেন একটি করে পোকা বাসা বেঁধেছে। দেখি কারো কারো পাখা নেই, তাদের দিয়ে পৃথিবীতে বিশেষ কিছুই এসে যায় না বটে, কিন্তু ঐ একটুখানি ছোট পাতার পৃথিবীতে ওরা বাঁচে আর মরে যায়।

"মাঝে মাঝে নীল মাছি-ও দেখি। কি ও নেহাৎ-ই এত ছোট যে ওর বিষয় কি আর কইব? যা বলছি তুমি সব বুঝছ ত?"

"হাঁ হাঁ, বুঝছি।"

"বেশ। মাঝে মাঝে ঘাসের দিকেই তাকাই, ও-ও হয়ত আমাকে দেখে, কে বলতে পারে? নিরালা ঘাসের ডগাটি দেখি, একটু একটু কাঁপছে, ও হয়ত আমার সম্বন্ধে কিছু ভাবে। এখানে ছোট একটি তৃণাঙ্কুর কাঁপছে—এই খালি ভাবি। যদি কখনো ফার-গাছের দিকে চোখ পড়ে, ওর একটি শাখা আমার মনকে একটু নাড়া দেয় হয়ত। কখনো ওপারে ঐ জলা-জায়গাটায় কারো সঙ্গে দেখা হয়,—মাঝে মাঝে।"

ওর দিকে তাকালাম, সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে শুনছে। ওকে যেন চিনি না। এত তন্ময় হয়ে গেছে যে নিজের সম্বন্ধে কোন চেতনা নেই—ভারি কুৎসিত বোকার মতন দেখাচ্ছে ওকে, নীচের ঠোঁটটা ঝুলে পড়েছে।

"বেশ।" ও উঠে পড়ল।

বৃষ্টির প্রথম ফোঁটা টপটপ করে পড়তে শুরু করেছে।

"বৃষ্টি এল।" বললাম।

"ও! হাঁ, বৃষ্টি এসে গেল।" বলেই চলে গেল ও।

বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসা হ'ল না, নিজের পথে নিজেই গেল। কুঁড়ের

দিকে তাড়াতাড়ি পা ফেলতে লাগলাম। কয়েক মিনিট বাদে জল জোরে নেমে এল। কে যেন আমার পেছনে ছুটে আসছে, হঠাৎ শুনতে পেলাম, এড্ভার্ডা—দাঁড়ালাম।

হাঁপাতে হাঁপাতে বলছিল ও—"ভুলে গেছলাম বলতে, আমরা দ্বীপগুলিতে বেড়াতে যাচ্ছি—শুক্নো ডাঙায়, জান? ডাক্তার কাল আসবে। তোমার সময় হবে?"

"কাল? হাঁ, খুব। ঢের সময় আছে আমার!"

"বলতে ভুলে গেছলাম।" ও ফের বললে, হাসলে ও।

চলে গেল, ওর পায়ের শীর্ণ সুন্দর পেছন দুটি দেখলাম, গোড়ালি থেকে শুরু করে সবটা ভিজা। ওর জুতো ছিঁড়ে গেছে।

আরেক দিনের কথা আমার বেশ মনে আছে। সেদিন আমার গ্রীষ্ম এসেছিল। রাত থাকতেই রোদ উঠে পড়ল, ভোরবেলাকার ভিজা মাটি শুকিয়ে গেল। গেলদিনের বৃষ্টির পর বাতাস হালকা হয়ে এসেছে।

জলা-মাটিতে বিকেলের দিকে এসে পৌঁছুলাম। জল একটুও নড়ছে না, দ্বীপ থেকে ওদের কথা ও হাসির টুক্রো ভেসে আসছিল, পুরুষ ও মেয়েরা মাছ ধরছে! সুখ-সন্ধ্যা—

সুখের সন্ধ্যাই নয় কি? দুই নৌকায় দল বেঁধে চলেছি, সঙ্গে ঝুড়ি-ভরা খাবার আর মদ, আর তরুণী মেয়েরা—পরনে পাতলা ফুরফুরে পোশাক। এত স্ফূর্তি লাগছিল যে গুন্‌গুনাতে শুরু করলাম।

নৌকোয় বসে ভাবছিলাম এসব তরুণ তরুণীদের বাড়ি কোথায়? লেন্সমেণ্ড-এর আর জেলা-ডাক্তারের মেয়েরা, একটি শিক্ষয়িত্রী, আর মঠের কয়েকটি মহিলা—আগে এদের কাউকে দেখিনি। আমার অচেনা সবাই,. কিন্তু এমন বন্ধুতা বোধ করছিলাম যে আমাদের যেন বহু বছর আগের থেকেই চেনা আছে। কয়েকটা ভুলও করে বসলাম, এত ঘনিষ্ঠতা লাগছিল যে মাঝে মাঝে যুবতী মহিলাদের 'তুমি' বলে ফেলেছি, কিন্তু তারা তাতে কোনো দোষ নেয়নি। একবার 'আমার প্রিয়া' পর্যন্ত বলে ফেলেছিলাম, ওরা আমাকে তাও ক্ষমা করেছে—যেন শোনেনি।

ম্যাক্-এর গায়ে সেই ইস্ত্রি-না-করা শার্টটা—বুকের কাছে সেই হীরেটা। মেজাজ খুব স্ফূর্তিবাজ—পাশের নৌকোর সঙ্গে ডাকাডাকি করছে।

"ঐ পাগলারা, বোতলের ঝুড়ি দেখছ ত? ডাক্তার, মদের জন্য দায়ী কিন্তু তুমি।"

"ঠিক।" ডাক্তার চেঁচাল। পাশাপাশি নৌকো দুটোর আলাপ শুনতে ভারি মিঠা লাগছিল।

কালকের সেই জামাটা এড্‌ভার্ডা আজো পরে এসেছে, যেন ওর আর জামা নেই, বা যেন আর কিছু পরতে চায় না ও। জুতো জোড়াও তেমনি। মনে হল ওর হাত দুখানি আজকে আর তেমন পরিষ্কার নয়, কিন্তু মাথায় ওর আনকোরা নতুন টুপি, তাতে পালক গোঁজা। সঙ্গে সেই রঙ্‌-করা জ্যাকেটটা নিয়ে এসেছে, সেটা পেতে তার ওপর ও বসল।

ম্যাক্‌ অনুরোধ করতে ডাঙায় নামবার আগে একটা গুলি ছুঁড়লাম; দুটোই পাখী —ওরা হুল্লোড় করে উঠল। দ্বীপটা সবাই চুঁড়লাম, মজুররা আমাদের অভিনন্দন করল—ম্যাক্‌ তার স্বজনবর্গের সঙ্গে আলাপ শুরু করল। ডেজি আর গাঁদাফুল বোতামের গর্তে গুঁজলাম, কেউ কেউ বা ঘেঁটুফুল।

আর, সমুদ্র-পাখীদের চীৎকার এপারে আর ওপারে—

ঘাসের ওপর তাঁবু ফেললাম, কয়েকটা বেঁটে ভূর্জগাছ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, বাকলগুলি সব শাদা। ঝুড়ি খোলা হ'ল, ম্যাক্‌ বোতলের তদারক করতে লাগল। ফুরফুরে পোশাক, নীল চোখ, গ্লাশের রিন্‌ঠিন্‌, সমুদ্র, সাদা পাল। একটু গানও হ'ল। গালগুলি সব রাঙা।

এক ঘণ্টা বাদে। আমার মন তাজা হয়ে উঠেছে, ছোট ছোট জিনিসগুলি পর্যন্ত আমাকে নাড়া দেয়। টুপির থেকে একটি ওড়না হাওয়ায় দোলে, একটি মেয়ের চুল নীচের দিকে নেমে এসেছে, হাসির চোটে দুটি ডাগর চোখের পাতা বুজে আসছে —সব আমাকে ছোঁয়। সেই দিন, সেই দিন!

"শুনেছি আপনার ওখানে অদ্ভুত একটি কুঁড়ে আছে।"

"হাঁ, পাখীর-বাসা। সেই আমার 'সব-পেয়েছি'র দেশ। একদিন চলুন না—ধারে পারে কোথাও এমন কুঁড়ে নেই। ওর পেছনে অগাধ বিশাল বন।"

আরেক জন আসে, মিষ্টি করে বলে: "উত্তরে এদিকে আর আসেননি কোনোদিন?"

বলি—"না। সবই জানতাম বটে আগে। রাত্রি আমি পাহাড়ের মুখোমুখি দাঁড়াই, পৃথিবীর, সূর্যের। যাক্‌, কবিত্ব করব না। কী চমৎকার গ্রীষ্ম এখানে! আমাদের ঘুমের মধ্যে হঠাৎ ও জন্ম নেয়, সকালবেলা ওর ছোঁয়া পেয়ে আমরা চমকে উঠি।

সেদিন জানলা দিয়ে চেয়ে থাকতে থাকতে ওকে দেখে ফেললাম। আমার ঘরে ছোট্ট দুটি জানলা আছে।"

আরেক জন আসে। মিষ্টি গলা, ছোট দুটি হাত,—সুন্দর মেয়েটি। বলে: "ফুল বদল করবে?—বরাত খোলে।"

হাত বাড়িয়ে বলি—"করব। তোমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। তুমি কি সুন্দর, কি মিষ্টি গলা, সমস্ত ক্ষণ শুনেছিলাম।"

তক্ষুণি ঘেঁটু ফুলের গুছিটা সরিয়ে নেয়, বলে: "কি বলছেন আপনি? আপনাকে আমি জিগ্‌গেস করিনি।"

আমাকে জিগ্‌গেস করেনি? ভুল করে কথাগুলি বললাম বলে দুঃখ হ'ল। ইচ্ছে হ'ল, আমার সেই অনেক দূরের কুঁড়ের তলায় ফিরে যাই,—খালি হাওয়ার কথা শুনি। বলি—"আপনার কাছে ক্ষমা চাই, ক্ষমা করুন।"

মহিলারা পরস্পরের দিকে তাকায়, চলে যায়—অবশ্যি আমাকে অপমান করতে নয়। কে যেন আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে, সবাই দেখতে পেলে—এড্‌ভার্ডা। একেবারে আমারই কাছে এসে কি যেন বললে, হঠাৎ ওর বাহু দুটি দিয়ে আমার গ্রীবা বেষ্টন করে ঠোঁটের ওপর চুম্বন বৃষ্টি করতে লাগল। প্রত্যেকবারই কি যেন বলে, শুনতে পাই না। কিছুই বুঝলাম না, আমার হৃদয় স্তব্ধ হয়ে গেছে—খালি ওর ক্ষুধার্ত দৃষ্টির তাপ বোধ করছি। তারপর নিজেকে ও মুক্ত করে নিলে, ওর ছোট বুকখানি দুলছে। ও কিন্তু তবু দাঁড়িয়েই আছে, ওর মুখ গ্রীবা কটা, দীর্ঘ ও কৃশ দেহলতা, দুটি উদাস উজ্জ্বল চোখ —সবারই চোখ ওর দিকে। এই দ্বিতীয় বার ওর ঘন ভ্রূর মাধুর্যে মুগ্ধ হলাম—ভ্রূ-রেখা দুটি কেমন বেঁকে কপালের ওপর উঠে গেছে।

কিন্তু আশ্চর্য—সবাইর সামনে আমাকে ও চুম্বন করল!

"এ কি এড্‌ভার্ডা?" জিগ্‌গেস করে ফেললাম। আমার রক্ত তখনো ফুটছে শুনতে পাচ্ছি, আমার গলা দিয়ে যেন নেমে আসছে, কথা কইতে পারছি না।

ও বলে—"কিছুই না। ইচ্ছে হয়েছিল—ও কিছু না।"

টুপিটা তুলে চুলগুলি যন্ত্রচালিতের মতো হাত দিয়ে আঁচড়ে নিয়ে ওর দিকে তাকাই, —"কিছু না?…"

ম্যাক্ দূরে দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে জানি কথা কইছে, এখান থেকে শোনা যাচ্ছিল। ভাগ্যিস কিছুই দেখেনি, কিছু জানেও না এর। ভাগ্যিস এ সময়টা ও দলের থেকে একটু বাইরে ছিল। নিশ্চিন্ত হলাম যেন, আর সবাইর কাছে গিয়ে উদাসীনের মতো

বলি—"আশা করি আগের মুহূর্তের বে-টপ্‌কা ঘটনার জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন, আমি তার জন্য নিতান্ত দুঃখিত। এড্‌ভার্ডা একান্ত করুণায় আমার সঙ্গে ফুল-বদল করতে চেয়েছিলেন, আমি আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়েছিলাম। আরি ওঁর, আপনাদেরও ক্ষমা ভিক্ষা করছি। আমার অবস্থায় নিজেদের দাঁড় করান; আমি একা থাকি, মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশায় আমি মোটেই অভ্যস্ত নই। তাছাড়া, এতক্ষণ মদ খেয়েছি, তাতেও অভ্যস্ত নই। এসব কথা মনে করে আমাকে মার্জনা করুন।"

হাসলাম, বাইরে ঔদাসীন্যের ভান-ও করলাম—যেন এটা একটা সামান্য ব্যাপার, সহজেই ভুলে যাওয়া যাবে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে মনটা ভারী হয়ে উঠছিল। আমার কথা এড্‌ভার্ডাকে একটুও মুগ্ধ করল না কিন্তু, লুকোবারো কিছু চেষ্টা করল না, এই আকস্মিক আচরণের পর কিছু সাফাই পর্যন্ত না, সারাক্ষণ আমার পানে চেয়েই রইল। মাঝে মাঝে দু'টি একটি কথাও কইল। তারপর যখন 'এস্কি' খেলা শুরু হ'ল, ও বললে—"আমি লেফ্‌টেনেণ্ট গ্লাহ্‌নকে চাই,—আর কেউ আমার খেড়ু নয়।"

"দুষ্টু মেয়ে, চুপ কর।" পা ঠুকে বললাম।

ও অবাক হল, ওর মুখ শুকিয়ে এসেছে, যেন আঘাত পেয়েছে, পরে লজ্জায় একটু হাসলে; মনটা ভারি খারাপ হয়ে গেল কিন্তু—ওর সেই দুটি অসহায় আতুর দৃষ্টি, ওর পাতলা শীর্ণ তনুলতা! আমাকে কে যেন টানছিল, ওর লম্বা পাতলা হাতটি মুঠির মধ্যে টেনে এনে বললাম—এখন না, পরে। কালকে ত ফের দেখা হবে।

রাতে হঠাৎ শুনতে পেলাম ঈশপ্‌ ওর কুঁড়ের কোণটি ছেড়ে চেঁচাতে শুরু করেছে। ঘুমের মধ্যে থেকে শুনলাম, গুলি ছোঁড়ার স্বপ্ন দেখছিলাম তখন, তাই কুকুরের ডাকটা স্বপ্নের সঙ্গে খাপ খেয়ে গিয়েছিল; তাই তখুনি জাগিনি বুঝি। রাত দুটোয় যখন কুঁড়ে ছেড়ে বেরুলাম, দেখি ঘাসের ওপর দুটি পায়ের চিহ্ন! কে যেন এসেছিল, আগে প্রথম-জানলাটায় এসে শেষে শেষেরটায় এসেছিল। পদচিহ্ন পথের ধুলায় হারিয়ে গেছে।

গাল দুটি গরম, মুখখানি উজ্জ্বল—এসেই বললে—"আমার জন্য দাঁড়িয়ে আছ বুঝি? তখুনি ভেবেছিলাম তুমি হয়ত দাঁড়িয়ে থাকবে।"

আমি ওর জন্যে অপেক্ষা করে থাকিনি। ও ত পথের ওপর, আমার আগে।

"রাতে ভালো ঘুমিয়েছ ত ?"—কি বলব, বুঝতে পারছিলাম না।

"না, ঘুম আসেনি। জেগেই ছিলাম।" বললে—ও সে-রাতে নাকি একটুও ঘুমোয়নি, চোখ বুজে একটা চেয়ারে পড়ে ছিল। একটুখানি ঘুরে আসবার জন্য ঘরের বাইরে এসেছিল একবার।

বললাম—"কাল রাতে আমার কুঁড়ের বাইরে কে যেন এসেছিল। সকালবেলা ঘাসের ওপর তার পায়ের দাগ দেখলাম।"

ওর মুখ রাঙা হয়ে উঠল, আমার হাত ও টেনে নিল রাস্তার ওপরেই; কোন কথা বললে না। ওর দিকে তাকিয়ে বললাম—"তুমিই কি ?"

"হ্যাঁ," আমার বুকের কাছে এগিয়ে এল ও, "আমিই। তোমার ঘুম ভেঙ্গে দিইনি ত ? যদ্দূর সম্ভব চুপি চুপি এসেছিলাম। হ্যাঁ, আমিই। তোমার কাছে এসেছিলাম আবার। তোমাকে এত ভালোবাসি।"

রোজ, রোজ ওর সঙ্গে দেখা হয়। সত্যি কথা বলতে কি, ভারি খুশি হতাম ওকে দেখে, আমার হৃদয় যেন উড়ত। দু'বছরের পুরাণো কথা, এখনো মাঝে মাঝে মনে পড়ে, সমস্তটা কাহিনী আনন্দও দেয়, বিভ্রান্তও করে। সেই দুটি সবুজ পালকের কথা—সময়-মতো বলব।

নানান জায়গায় আমাদের দেখা হয়—কারখানায়, রাস্তার ওপরে, এমন কি আমার কুটিরেও। যেখানে বলি সেখানেই আসে। "শুভদিন !" ও-ই প্রথম বলে, আমিও বলি—"শুভদিন !"

"তোমাকে ভারি খুশি দেখাচ্ছে।" ও বলে। ওর চোখ চক্‌চক্‌ করে।

"হ্যাঁ, খুশি বৈ কি।" বলি—"তোমার ঘাড়ের ওপর কিসের একটা দাগ, ধুলো হয়ত, রাস্তার কাদার দাগ হবে-ও বা। ঐ ছোট্ট দাগটিতে আমি চুমু্‌ দেব। না, না, এস,—দেব। তোমার সব কিছু আমাকে এমন ছোঁয়, আমি যেন মূর্চ্ছিত হয়ে থাকি। জান, কাল সারা রাত ঘুমুইনি।"

সত্যি সত্যিই। অনেক রাত—অনেক রাতই শুয়ে থাকি বটে, ঘুম আসে না।

পাশাপাশি হাঁটি।

"তুমি আমাকে কি ভাব, বল না ? যেমনটি চাও ঠিক তেমনটি ?" ও জিগ্‌গেস করে—"আমি বড্ড বেশি বকি, না ? বল না আমাকে কি ভাব তুমি ? আমার মাঝে মাঝে মনে হয় এর থেকে কিছুই স্নফল হবে না।"

"কি স্নফল হবে না ?" প্রশ্ন করি।

"এই আমাদের মধ্যে—কোনো সুফল হবে না। তুমি বিশ্বাস কর না কর আমার সমস্ত গা কালিয়ে আসছে; যখুনিই তোমার কাছে আসি আমার সারা পিঠটায় ঠাণ্ডায় কাঁপুনি ধরে। আনন্দে হয়ত।"

"আমারো তাই।" বলি—"তোমাকে দেখলেই থরথর করে ওঠে বুক। কিন্তু কিছু না কিছু সুফল এর হবেই। এস, তোমার পিঠে একটু হাত বুলিয়ে দিই, গরম হয়ে উঠবে।"

একটুখানি অনিচ্ছা থাকলেও পিঠ পেতে দেয়। একবার জোরে একটু চড়ের মতো করে মারি ঠাট্টা করে, হাসি—নিশ্চয়ই এখন ওর খুব ভালো লাগছে, জিগ্‌গেস করি।

"যখন না বলব, তখন আর দিয়ো না।" ও বলে।

ঐ ক'টি কথা। ওর বলার মধ্যে এমন অসহায় একটি সুর: যখন না বলব, তখন দিয়ো না আর।...

ফের রাস্তা ধরে চললাম দুজনে। আমার এ-ঠাট্টায় ও রাগ করেনি ত? ভাবলাম, দেখা যাক! বললাম—"আমার একটা কথা মনে পড়ছে। একবার এক পার্টিতে গেছলাম; একটি তরুণী তার ঘাড়ের থেকে একটি সিল্কের রুমাল খুলে আমার ঘাড়ে বেঁধে দিয়েছিল।

বিকেলে তাকে বললাম—"কাল তুমি তোমার রুমাল ফিরে পাবে,—ওটা ধুয়ে দেব।"

মেয়েটি বললে—"না। এই দাও। তোমার পরার পর যেমনি আছে, তেমনিই ওকে রেখে দেব।" আমি ওকে দিয়ে দিলাম।

তিন বছর পর সেই মেয়েটির সঙ্গে ফের দেখা। বললাম—"সেই রুমাল?" মেয়েটি তখুনি তা বের করে দেখাল। একটা কাগজের মধ্যে তেমনি ভাঁজ করা রয়েছে—ধোয়া হয়নি। আমি নিজে দেখলাম।

এড্‌ভার্ডা আমার দিকে তাকাল।

"সত্যি? তারপর?"

"তারপর আবার কি?" বললাম—"তারপর আর কিছু নেই। কিন্তু মনে হয়, কি সুন্দর!"

চুপচাপ।

"সেই মেয়েটি এখন কোথায়?"

"বিদেশে।"

আর কোনো কথা হল না···বাড়ি যাবার সময় ও বললে—"আচ্ছা···যাই। কিন্তু তুমি ঐ মেয়েটির কথা আর ভাববে না, বল। আমি ত তোমাকে ছাড়া আর কাউকে ভাবি না।"

ওকে আমার ভারি বিশ্বাস হ'ল। ও যেন ওর মনের কথাই বলছে। আমাকে ছাড়া আর কাউকে ও ভাবে না,—সেই আমার পক্ষে যথেষ্ট। ওর পেছনে হাঁটতে লাগলাম।

"তোমাকে ধন্যবাদ, এড্‌ভার্ডা!" তারপর সমস্ত হৃদয় ঢেলে দিলাম—"তোমরা সবাই আমার কাছে অপূর্ব, অতুলনীয়,—আমি সবার চেয়ে তুচ্ছ। কিন্তু, তুমি আমাকে নেবে—ভাবতে, ধন্যবাদে আমার সকল প্রাণ ভরে উঠেছে—বিধাতা তোমাকে পুরস্কৃত করবেন। তোমাদের কারুর মতোই আমি সুন্দর নই, কখনো না; কিন্তু আমি তোমার, একেবারে তোমার,—অনন্ত জীবনের জন্যে তোমার। কি ভাবছ? তোমার চোখে জল এসে পড়ছে কেন?"

"কিছু না।" ও বল্লে। "ভারি অদ্ভুত লাগছিল শুনতে—'বিধাতা তোমাকে পুরস্কৃত করবেন।' তুমি এমন সব কথা বল যে—। আমি তোমাকে এত ভালবাসি।" হঠাৎ ও ওর বাহু দুটি আমার গলার ওপর মালার মতো করে ফেলে আমাকে নিবিড় তপ্ত চুম্বন করলে—রাস্তার মাঝখানেই।

ও চলে গেলে বনের ভিতর গিয়ে লুকোলাম—আমার আনন্দ নিয়ে একা থাকতে। কেউ আবার দেখে ফেললে কি না,—তাই তাড়াতাড়ি ফের রাস্তায় এসে একটু দাঁড়ালাম। কেউ নেই।

নিদাঘ রাত্রি, ঘুমন্ত জল, আর—অনন্ত কালের জন্য সুষুপ্ত অরণ্য। কোনো কোলাহল নেই—রাস্তা থেকে কোনো পদশব্দ আসে না—আমার হৃদয় যেন মদিরায় ভরা।

রাঁধা মাছের গন্ধ পেয়ে রাতের পোকারা আওয়াজ করতে করতে আমার জানলা দিয়ে আসে উনুনের আগুনে লুব্ধ হয়ে। ছাতের গায়ে ধাক্কা খায়, আমার কানের কাছ দিয়ে বোঁ করে ঘুরে যায়—আমার বুক কেঁপে ওঠে, তারপর দেয়ালের সাদা বারুদ-দানের উপর বসে। ওদের দেখি, ওরা কাঁপে আর আমার দিকে তাকায়। কারু কারু পাখা দেখতে ঠিক প্যানসির মতো।

কুটিরের বাইরে আসি, শুনি। কিছু নেই, একটি রা-ও নেই—সব ঘুমিয়েছে। উড়ন্ত পোকায় বাতাস ছেয়ে গেছে। বনের ধারে ছোট ছোট ফুল ফুটেছে—ঐ

ছোট ফুলগুলিকে ভালোবাসি। যে কয়েকটি ফুলন্ত মাঠ দেখলাম তার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ—ওরা যেন আমার পথের ধারের টুকটুকে রাঙা গোলাপ, ওদের প্রতি ভালোবাসায় আমার চোখে জল আসে। কাছেই কোথায় বুনো কারনেশান ফুটেছে —দেখতে পাই না, তবু গন্ধ আসে।

রাতে হঠাৎ সাদা ফুলগুলি ওদের হৃদয় খুলে দিয়েছে, ওরা নিশ্বাস ফেলছে। লোমশ ধূসর পোকারা ওদের পাপড়িতে মুখ গোঁজে—ছোট গাছটা কাঁপে। আমি এক ফুল থেকে আরেক ফুলে যাই—ওরা সব মাতাল, কামাতুর—কি করে ওদের নেশা জমে তাই দেখি।

লঘু পদপাত, মানুষের নিশ্বাস নেওয়ার হালকা শব্দ, আনন্দিত 'শুভসন্ধ্যা'।

আর আমিও উত্তর দিই—রাস্তার ওপর নুয়ে পড়ি, দুটি হাঁটু আর একটি জীর্ণ জামা জড়িয়ে ধরি।

"শুভসন্ধ্যা, এড্‌ভার্ডা!" আবার বলি। আনন্দে আমি শ্রান্ত হয়ে পড়েছি।

"তুমি আমাকে এত স্নেহ কর।" ও আস্তে বলে ফিস্‌ফিস করে। আর আমি বলি —"তুমি যদি জানতে তোমার কাছে আমি কি কৃতজ্ঞ! আমার বুকের মধ্যে আমার হৃদয় সারাদিন স্তব্ধ হয়ে থাকে, যখন ভাবি—তুমি আমার, এই ধূলার পৃথিবীতে তুমি সব চেয়ে সুন্দর, তোমাকে আমি চুম্বন করেছি। আমি তোমাকে চুম্বন করেছি এই কথা যখন ভাবি, মাঝে মাঝে আনন্দে আমি অবশ আত্মহারা হই।"

"আজকে সন্ধ্যায় তুমি আমাকে কেন এত আদর করছ?" ও শুধোয়।

তার ঢের কারণ আছে; ও বুঝুক যে আমি আদর করছি ওকে—এইটুকুই শুধু বুঝাতে চাই। বাঁকানো ভুরুর অন্তরাল থেকে ওর সেই চাউনি;—আর ওর গায়ের চামড়া—উজ্জ্বল, উগ্র।

"আদর করব না তোমাকে? তুমি সুস্থ আর সবল এই কথা ভাবি, আর আমার পথের প্রত্যেকটি গাছকে অভিবাদন করি। একবার এক নাচে একটি তরুণী মেয়ে প্রত্যেকটি নাচের পর নিরালায় বসে জিরোচ্ছিল, আমি ওকে চিনতাম না, কিন্তু ওর মুখখানি আমার হৃদয় স্পর্শ করল—আমি ওকে নমস্কার করলাম। তারপর? না, না, ও শুধু মাথা নাড়ল। 'আমার সঙ্গে নাচবে?'—ওকে জিগ্‌গেস করলাম। ও বললে—'তুমি ভাবতে পার এ-কথা? আমার বাবা সুন্দর কান্তিমান পুরুষ, মা সেরা সুন্দরী, আমার বাবা ঝড়ের মতো তাঁকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। আর আমি খোঁড়া —জন্ম থেকেই।"

এড্‌ভার্ডা আমার দিকে তাকাল।

"এস, বসি।" বললে।

বুনো মাঠটায় দুজনে বসলাম।

"আমার বন্ধু তোমার বিষয় আমাকে কি বলে, জান?' ও বলতে শুরু করল— "তোমার চোখ নাকি জানোয়ারের মতো। মেয়েটি বলে—যখন তুমি ওর দিকে তাকাও, ওকে পাগল করে দাও নাকি। তুমি যেন ওকে স্পর্শ করছ—ও বলে।"

শুনে অপূর্ব সুখে চঞ্চল হয়ে উঠলাম, আমার জন্যে নয়, এড্‌ভার্ডার। ভাবলাম, পৃথিবীতে ত মাত্র একজনকে ভালোবাসি, আমার চোখ দেখে সে কি বলে? বললাম—"কে সে তোমার বন্ধু?"

"তা বলব না।" ও বললে—"সেদিন দ্বীপে যারা গিয়েছিল তাদেরই একজন।"

"তাহলে ত বেশ।"

তারপর আর সব বিষয়ে কথা হল।

"বাবা দু'একদিনের মধ্যেই রাশ্যায় যাচ্ছেন।" ও বললে—"আমি একটা পার্টি দিচ্ছি। তুমি কখনো কোরহোলমার্ন-এ গেছ? এবার কিন্তু আমাদের দুই ধামা মদ চাই, মঠ থেকে সেই মেয়েরাও আসছেন, বাবা আমাকে এর মধ্যে মদ দিয়েও দিয়েছেন। বল, সত্যি করে বল, তুমি সেই বন্ধু-মেয়েটির দিকে ফিরেও চাইবে না? সত্যিই চেয়ো না কিন্তু লক্ষীটি। তাহলে ওকে কখ্‌খনো নিমন্ত্রণ করব না।"

আর কোনো কথা না বলে ও আমার ওপর নিজেকে নিবিড় আবেগে সমর্পণ করলে, আমার মুখের দিকে অপলক চোখে চেয়ে রইল—জোরে নিশ্বাস ফেলছে। ওর দৃষ্টি যেন ঘোর অন্ধকার।

আচমকা উঠে পড়লাম, তাড়াতাড়ি বললাম—"তোমার বাবা তাহলে রাশ্যায় যাচ্ছেন?"

"তুমি ও রকম করে হঠাৎ উঠে পড়লে কেন?"

"দেরী হয়ে গেছে, এড্‌ভার্ডা," বললাম—"সাদা ফুলগুলি বুজছে, সূর্য উঠছে, দেখতে পাচ্ছ না এখুনি ভোর হয়ে যাবে!"

বনের মধ্য দিয়ে ওকে নিয়ে এগোলাম। যদ্দূর চোখ যায় ওকে দেখতে লাগলাম; অনেক দূর গিয়ে ও পেছন ফিরে অতি ধীরে 'শুভরাত্রি' জানালে।···তারপর হারিয়ে গেল। তক্ষুণি কামারের বাড়ির দরজা খুলে গেল, সাদা-সার্ট পরা একটি লোক বেরিয়ে এল, চারদিক চাইতে লাগল, টুপিটা কপালের ওপর আরো একটু টেনে দিল —তারপর সিরিলাণ্ড-এর পথ ধরে পাড়ি দিল।

এড্‌ভার্ডার 'শুভরাত্রি' এখনো আমার কানে লেগে আছে।

মানুষ আনন্দে মাতাল হয়ে যেতে পারে। গুলি ছুঁড়ি, পাহাড়ে-পাহাড়ে প্রতিধ্বনি জাগে—সে-ধ্বনি ভোলা যায় না,—সমুদ্রের ওপর দিয়ে গড়িয়ে যায়, কোনো ঘুমন্ত মাঝির কানে বেজে ওঠে হয়ত। কি জন্যেই বা আনন্দ করব? কি কথা যেন মনে হয়, ক্ষণিকের স্মৃতি, বনের একটি অস্ফুট শব্দ, একটি মেয়ে। ওর কথা ভাবি, চোখ বুজে রাস্তার ওপর দাঁড়াই, মুহূর্ত গুনি।

পিপাসা পায়, ঝরণা থেকে জল খাই। ইচ্ছে হলে সামনের দিকে একশো পা হাঁটি, পেছনের দিকেও; নিশ্চয় এতক্ষণে আসবার সময় ফুরিয়ে গেছে, মনে মনে বলি: কোনো বিপদ হয়নি ত? এক মাস কেটে গেছে—এক মাস আর কি-ই বা সময়—না, কোনো বিপদ হয় নি। ঈশ্বর জানেন এই মাসটা ভারি স্বল্পায়ু। কিন্তু রাত্রি ভারি দীর্ঘ, যতক্ষণ ওর আশায় পথ চেয়ে থাকি, টুপিটা ঝরণার জলে ভিজিয়ে খালি শুকোই,—এই, সময় কাটাবার জন্যে।

রাত দিয়ে সময়ের হিসেব কষি। কোনো কোনো রাতে এড্‌ভার্ডা আসত না, একবার একসঙ্গে দু'রাতও দেখা দেয়নি। দু'রাত! না, কোনো বিপদ হয়নি ওর। কিন্তু তখুনি মনে হল আমার সুখ চরম চূড়ায় পৌচেছে।

তাই কি নয়?

"এড্‌ভার্ডা, শুনতে পাচ্ছ, আজকের বন কি রকম চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তৃণে, আগাছায়, কী অবিশ্রান্ত কোলাহল—বড় বড় পাতাগুলি কাঁপছে। কী যেন চোঁয়াচ্ছে; হবে, থাক সে কথা। ওপরে, পাহাড়ে একটা পাখীর আওয়াজ শুনছি,—ওখানে বনে দু'রাত ধরে ও আলাপ করছে। তুমি সেই, সেই পুরাণো চেনা আওয়াজ শুনতে পাচ্ছ?"

"পাচ্ছি। কেন জিগ্‌গেস করছ এ-কথা?"

"এমনি। দু'রাত ধরে ও ওখানে—শুধু এইটুকু। আজ যে এসেছ তার জন্য ধন্যবাদ, ধন্যবাদ তোমাকে। এখানে বসে আজ সন্ধ্যায় তোমার প্রতীক্ষা করছিলাম; হয়ত বা কাল সন্ধ্যা পর্যন্তও করতাম—কতক্ষণে তুমি আসবে।"

"আমিও তোমার জন্য প্রতীক্ষা করে আছি। খালি তোমার কথা ভাবি।—সেই যে গ্লাশটা ভেঙে দিয়েছিলে—মনে আছে? তার সেই ভাঙা টুকরোগুলি আমি যত্ন করে রেখে দিয়েছি। বাবা কাল রাতে চলে গেলেন। আমি আসতে পারিনি, জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা নিয়ে মহা হাঙ্গামা—সব জিনিস গুছিয়ে মনে করিয়ে দিতে

হচ্ছিল তাঁকে। আমি জানতাম তুমি বনে আমার প্রতীক্ষায় বসে আছ—জিনিসপত্র বাঁধছি, আর কাঁদছি।"

কিন্তু দুটো রাত,—নিজের মনেই ভাবলাম। প্রথম রাতে কি করছিল ও? ওর চোখের কোণে খুশির ছোপ আগের চেয়ে কম কেন?

এক ঘণ্টা কাটল। পাহাড়ের সেই পাখীটা চুপ করে গেছে, বন যেন মরে আছে। না, না, কিছুই বদলায়নি; সবই যে-কে-সে। শুভরাত্রি জানাতে ও ওর হাতখানি বাড়িয়ে দিল, স্নেহে আমার দিকে তাকাল।

"কাল? কেমন?" বললাম।

"না। কাল হবে না।"

কেন নয়, জিগ্‌গেস করলাম না।

"কাল আমাদের পার্টি।" হেসে ও বললে। "তোমাকে অবাক করে দেব ভাবছিলাম, কিন্তু তুমি এমনি মন-মরা হয়ে আছ যে বলে ফেললাম। তোমাকে কাগজে লিখে নিমন্ত্রণ করে পাঠাব ভেবেছিলাম।"

আমার মন একেবারে হালকা হয়ে গেল।

ও চলে গেল ঘাড় নেড়ে বিদায় জানিয়ে।

"আরেক কথা।" যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম সেখান থেকেই বললাম,—"সেই যে গ্লাশের ভাঙা টুকরোগুলি গুছিয়ে রেখেছিলে—কত দিন হ'ল?"

"কেন? এক হপ্তা আগে,…দিন পনেরো আগে হয়ত। হ্যাঁ, দিন পনেরো আগেই। কেন এ কথা জিগ্‌গেস করছ? যাঃ সত্যি কথা বলছি তোমাকে,—কাল।"

কাল! কাল-ও ও আমার কথা ভেবেছে। সব আমার ঠিক হয়ে গেল।

নৌকা দুটো তৈরীই ছিল, সবাই চেপে বসলাম। হল্লা আর গান। দ্বীপ ছাড়িয়ে কোরহোলমার্ন,—দাঁড় বেয়ে যেতে অনেকক্ষণ কেটে গেল, পথে এক নৌকো থেকে আরেক নৌকোয় তেমনি গল্পগুজব করছি। মেয়েদের মতো ডাক্তারও পাতলা পোশাক পরেছে, এর আগে ওকে এত খুশি কোনোদিন দেখিনি। চুপ করে কিছুই শুনছে না, সবারই সঙ্গে খালি কথা কইছে। বোধ হয় বেশ একটু টেনেছে, তাই আজ ও এত দিলখোলা। পারে যখন ভিড়লাম, ও সবাইর মনোযোগ আকর্ষণ করে হঠাৎ আমাদের সবাইকে অভ্যর্থনা করলে। বুঝলাম, এড্‌ভার্ডা ওকে আজ অতিথি-সৎকারের ভার দিয়েছে।

খুব বিনয়ের সঙ্গেই ও মেয়েদের আনন্দবর্ধন করতে লাগল। এড্‌ভার্ডার কাছে ও ত নেহাৎই নম্র, স্নেহশীল—বাপের মতো; আগের মতোই বিদ্যা ফলিয়ে উপদেশ

দিচ্ছে। এড্ভার্ডা হয়ত কোনো তারিখের কথা উল্লেখ করে বলছে,"আমি আটত্রিশ সালে জন্মেছি।" ও জিগ্গেস করলে: "আটারো শো আটত্রিশ নিশ্চয়?" যদি এড্ভার্ডা উত্তর দেয় "না, উনিশ শো আটত্রিশ", ও একটুও না ভড়কে ওকে শুদ্ধ করে দেবার জন্যেই যেন বলে: "তোমার ভুল হয়েছে।" আমি যদি কিছু বলি, ও বিনয়ে মনোযোগ দিয়েই শোনে, আমাকে অশ্রদ্ধা করে না।

একটি মেয়ে এসে আমাকে অভিবাদন করলে। আমার মনে নেই ওকে, আর কোনোদিন দেখিওনি; অবাক হয়ে দু'একটা কথা বললাম, ও হাসল। 'ডিন'-এর মেয়ে হয়ত। যেদিন দ্বীপে বেড়াতে গিয়েছিলাম, দেখেছিলাম ওকে, আমার কুঁড়েতে নিমন্ত্রণ করেছিলাম। কিছুক্ষণ দুজনে আলাপও হয়েছিল।

ঘণ্টাখানেক কেটে গেল। ভাল লাগছিল না কিছুই, মদ খেলাম, সবারই সঙ্গে মিশে কলরব শুরু করলাম। আবার দু'একটা ভুল করে ফেলেছি, ছোটখাটো ভদ্রতার বিনিময়ে বাঁধা বুলি আওড়াতে পারি না। বাজে বকি, কখনো বা মুখে কথাই জুয়ায় না—ভারি বিশ্রী লাগে।

পাহাড়ের টিলাটা আমাদের টেবিল, ডাক্তার ধারে বসে ভঙ্গী করে বলছে—"আত্মা? আত্মা আবার কি?" 'ডিন'-এর মেয়ে ওকে নাস্তিক বলছিল—বাঃ, মানুষ বুঝি স্বাধীনভাবে চিন্তা করবে না? লোকে ভাবে নরক বুঝি মাটির তলার কুঠুরি, শয়তান বুঝি সেখানকার অতিথি-সেবক, সেখানকার রাজা। তারপর ও গির্জার খৃষ্টের মূর্তি সম্বন্ধে বক্তৃতা করলে—ধারে-পাশে নাকি কয়েকটি য়িহুদি ও য়িহুদি-মেয়েও আছে—মদের মধ্যে জল—বেশ, বলুক ওরা যা খুশি। কিন্তু যীশুর মাথার চারিদিকে আলোকমণ্ডল! আলোক-মণ্ডল কাকে বলে? তিনটে চুলের সঙ্গে এটা হলদে রঙের খেলনা-চাকা লাগিয়ে দেওয়া শুধু।

দুটি মহিলা দারুণ বিস্মিত হয়ে ওর হাত আঁকড়ে রইল, কিন্তু ডাক্তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ঠাট্টার সুরে বলে চলল—"খুব ভয়ঙ্কর শোনাচ্ছে, না? মানি। কিন্তু যদি এই কথাই বার সাত আট নিজেদের মনে আওড়ান ও একটু পরে ভাবেন এ কথা, ত শিগ্গিরই সব সোজা হয়ে যাবে।...আপনাদের স্বাস্থ্য কামনা করি।"

এই বলে ও সেই দুটি মেয়ের পায়ের কাছেই ঘাসের ওপর নতজানু হয়ে, মাথাটা পেছনের দিকে ঠেলে গ্লাশটা শেষ করে ফেললে, টুপিটা মাথার থেকে নামিয়ে সামনে রেখে দিলে না পর্যন্ত। ওর ব্যবহারে এ রকম স্বচ্ছন্দতা দেখে আমি একেবারে অবাক হয়ে গেলাম; ওর সঙ্গেই মদ খেতাম, কিন্তু ওর গ্লাশ একদম ফাঁকা হয়ে গেছে।

এড্‌ভার্ডা দুটি চোখে খালি ওকেই দেখে বেড়াচ্ছে। ওর সামনে এসে দাঁড়ালাম। বললাম—" 'এক্কি' খেলব আজ ?"

ও একটু চমকাল। উঠে দাঁড়াল।

"তুমি বলে এখন আর ডেকো না। সাবধান!" আস্তে বললে।

আমি ত এখন ওকে মোটেই 'তুমি' বলে ডাকিনি। চলে গেলাম।

আর এক ঘণ্টা ফুরোল। দিন যেন ক্রমেই লম্বা হচ্ছে—আর একটা নৌকো থাকলে আমি কখন একাই দাঁড় বেয়ে বাড়ি চলে যেতাম—কুঁড়েতে ঈশপ্ বাঁধা রয়েছে, আমারই কথা ভাবছে হয়ত। এড্‌ভার্ডার মন এখন আমার থেকে অনেক দূরে, নিশ্চয়ই; বেড়াতে কি মজা, ও এখন সেই কথাই বলছে, বিদেশ দেখে বেড়াতে কত সুখ। এ কথা ভাবতেই ওর গাল রাঙা হয়ে উঠছে—কথার মধ্যে হোঁচট খেয়ে পড়ছে পর্যন্ত।

"সেই দিন আমার চেয়ে অধিকতর বেশি সুখী কেউ হয়নি…"

"অধিকতর বেশি সুখী…?" ডাক্তার বললে।

"কি ?"

"অধিকতর বেশি সুখী!"

"বুঝতে পারছি না।" ও বললে।

"তুমি বললে কি না, অধিকতর বেশি সুখী, তাই।"

"বলেছি নাকি? ভুল হয়ে গেছে। সেইদিন জাহাজে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম আমার চেয়ে অধিকতর সুখী কেউ নেই। যা নিজে জানি না, দেখিনি, সে-সব জায়গার জন্যেই মন কাঁদে।"

ও দূরে চলে যেতে চাইছে, ও আমার কথা ভাবছে না। ঐখানে দাঁড়িয়ে ওর মুখে যেন পড়তে পেলাম, ও আমাকে ভুলে গেছে। না, কিছুই বলবার নেই এতে,—কিন্তু ঐখানে দাঁড়িয়ে ওর মুখে সেই লেখাটাই পড়লাম। মুহূর্তগুলি কি ভীষণ আস্তেই যে চলেছে। এখুনি আমরা ফিরব কি না কত লোককে জিগ্‌গেস করলাম। ভীষণ দেরি হয়ে যাচ্ছে যে; ঈশপ্‌কে কুঁড়েতে একলা বেঁধে রেখে এসেছি—কত লোককে বললাম, কেউই ফিরে যেতে চায় না।

'ডিন'-এর মেয়ের কাছে ফের গেলাম—তৃতীয় বার মনে হল, ও-ই বলে থাকবে যে আমার চোখ ঠিক জানোয়ারের মতো! দুজনে একত্র মদ খেলাম—ওর চঞ্চল চোখ কখনো জিরোয় না, খালি আমার দিকে তাকায়, আবার ফিরিয়ে নেয়।

বললাম—"আচ্ছা আপনার কি মনে হয় না এদেশেরা লোকেরা এই গ্রীষ্মের মতোই স্বল্পায়ু? মানে, তাদের হৃদয়-ব্যাপারে? সুন্দর, কিন্তু ক্ষণিক।"

কথাটা জোরে বললাম, খুব জোরে,—উদ্দেশ্য ছিল। জোরেই বলে চললাম, জিগ্‌গেস করলাম তরুণী মেয়েটি দয়া করে আমার কুটির দেখতে আসবেন কি না। বেদনায় বলে ফেললাম—"ঈশ্বর আপনার ভাল করুন।" নিজের মনে ভাবছিলাম ও যদি আসে, তবে কেমন করে ওকে কি উপহার দেব? বারুদদান ছাড়া ওকে দেবার ত আমার কিছুই নেই।

ও আসবে বললে।

এড্‌ভার্ডা মুখ ফিরিয়ে বসে আছে, আমাকে যা খুশি তাই বলতে দিচ্ছে। অন্য লোকে যা-যা বলছে তাই শুনছে; মাঝে মাঝে দু'একটা কথাও বলছে। ডাক্তার তরুণী মেয়েদের হাত দেখে ভাগ্য গুণছে—বকছে ঢের! ওরো হাত দু'খানি ছোট, পাতলা, —আঙুলে একটি আঙটি। আমাকে কেউই চায় না, একটা পাথরের ওপর একা চুপচাপ বসে আছি। সন্ধ্যাও কাবার হয়ে এল। এইখানে আমি একেবারে একা —নিজের মনে বলি—পাথরের ওপর বসে আছি, আর যে-লোকটিই একমাত্র আমাকে চঞ্চল করে দিতে পারে, সে আমাকে এমনি স্তব্ধ নিঃসম্বল করে বসিয়ে রেখেছে। বেশ, ওর মতো আমিও কিছু গ্রাহ্য করি নে আর।

আমি নির্বাসিত, নিরালা। আমার পেছনে বসে ওরা কথা কইছে শুনতে পাচ্ছি, এড্‌ভার্ডা কেমন হাসছে তা-ও শুনছি;—চট করে উঠে পড়ে তক্ষুণি পার্টিতে যোগ দিলাম। যেন ক্ষেপে গেছি।

"এক মিনিট।" বললাম—"ওখানে বসে বসে মনে হল আপনাদের কাউকে আমার মাছির খাতাটা দেখানো হয় নি!" মাছির খাতাটা বের করলাম। "এ কথাটা যে কেন আগে মনে হয়নি, তার জন্যে আমার সত্যিই আফশোষ হচ্ছে। দেখুন—আপনারা দেখলে আমি খুব খুশি হব, সবাই দেখুন—লাল আর হলদে মাছি দুইই আছে।" বলে টুপি তুললাম। টুপি তোলাটা অন্যায় হল বুঝলাম, তাড়াতাড়ি ফের মাথায় রাখলাম।

এক মুহূর্তের জন্য গাঢ় নীরবতা—কেউই খাতাটা দেখতে চাইল না। শেষকালে ডাক্তারই হাত বাড়িয়ে নম্রস্বরে বললে—"অশেষ ধন্যবাদ। দেখি, মাছিগুলি কি করে কাগজে জুড়ে রাখা হয়েছে, দেখবার জিনিস বটে, আশ্চর্য।"

ওর প্রতি ধন্যবাদে আমার মন ভরে গেল। বললাম—"ওগুলো আমি নিজেই বানাই।" কি করে কি হ'ল তাই ওকে তখুনি বোঝাতে লাগলাম। খুব সোজা—

পালক আর হুকগুলি আমিই কিনেছি,—খুব ভালো তৈরি হয়নি,—আমারই নিজের ব্যবহারের জন্য কি না! দোকানে তৈরি মাছি কিনতে পাওয়া যায়,—সুন্দর জিনিস।

এড্‌ভার্ডা আমাকে একবার একটি শিথিল চাহনি উপহার দিলে। ওর মেয়ে-বন্ধুদের সঙ্গে কথাই কইছে।

"এই যে কয়েকটি পালক!" ডাক্তার বললে,—"দেখ, ভারি সুন্দর কিন্তু।"

এডভার্ডা তাকাল।

"সবুজগুলি বেশি সুন্দর।" ও বললে—"দেখি ডাক্তার।"

"ওগুলো তোমার কাছে রেখে দাও।" আবেগে বললাম,—"হ্যাঁ, রেখে দাও, আমি বলছি। দুটো সবুজ পালক। আমাকে এই দয়াটুকু কর, আমার স্মৃতিচিহ্ন।"

ও ও-দুটির দিকে তাকাল, বললে—"রোদ্দুরে ধরলে সবুজ আর সোনালি এক হয়ে যায়। আমাকে যদি দাও, তাহলে ধন্যবাদ তোমাকে…"

"আনন্দের সঙ্গে।" বললাম।

ও পালক দুটি নিলে।

খানিক বাদে ডাক্তার ধন্যবাদের সঙ্গে খাতাটা আমাকে ফিরিয়ে দিলে। উঠে পড়ে জিগ্‌গেস করলে—এখন ফিরে যাবার সময় হয়েছে কি?

বললাম,"হ্যাঁ, সত্যিই হয়েছে। ঘরে আমার কুকুর বাঁধা আছে,—আমার একটি কুকুর আছে কি না, ও-ই আমার বন্ধু। ও ওখানে বসে আমার কথা ভাবে, আর যখন ফিরে যাই ও জানলার ওপর ওর সামনের থাবা দুটো বাড়িয়ে দিয়ে আমাকে অভ্যর্থনা করে। চমৎকার দিন গেল আজ,—এখন প্রায় ফুরিয়ে এসেছে, এবার যাই চলুন। আপনাদের সবার কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।"

পারে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম এড্‌ভার্ডা কোন্ নৌকোটায় গিয়ে ওঠে—আমি অন্য নৌকোয় উঠব ঠিক করলাম। হঠাৎ ও আমাকে ডাকলে। বিস্ময়ে ওর দিকে তাকালাম, ওর মুখ রাঙা। আমার কাছে এসে ওর হাতখানি বাড়িয়ে দিয়ে স্নেহে বললে—"পালক দুটির জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। তুমি আমার সঙ্গে এক নৌকোয় আসবে না?—তোমার ইচ্ছে!"

নৌকোয় ও আমার পাশেই বসল—ওর হাঁটু আমার হাঁটুকে স্পর্শ করছে। ওর দিকে তাকালাম; তাই ও-ও আমার দিকে তাকাল—একটি মুহূর্তের জন্য। ওর হাঁটু দিয়ে ও আমাকে স্পর্শ করছে—এ ওর দয়া। এই তেতো দিনটা হঠাৎ যেন মিঠে হয়ে উঠল এখন, আবার খুশি লাগছে। কিন্তু হঠাৎ ও জায়গা বদলে আমার দিকে পিছন

ফিরে বসে দাঁড়ের কাছে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল। প্রায় মিনিট পনেরো আমি ওর কাছে মরে রইলাম।

তারপর এমন একটা কাজ করে ফেললাম যার জন্য আজও অনুতাপ হচ্ছে—আজও ভুলিনি। ওর জুতো খুলে গেল; আমি ওটা তুলে নিয়ে দূরে জলে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম—ও আমার কাছে বসে আছে এই আনন্দেই হয়ত, হয়ত বা আমিও যে ওর কাছেই আছি, বেঁচে আছি—সে-সম্বন্ধে ওকে সচেতন করে দিতে। এত তাড়াতাড়ি ঘটে গেল ব্যাপারটা,—কিছু ভাবলাম না পর্যন্ত, ঝোঁকের মাথায় করে ফেললাম। মেয়েরা চেঁচিয়ে উঠল; আমি যেন পক্ষাহতের মতো পঙ্গু হয়ে গেছি কিন্তু কি হবে? যা হবার তা ত হয়েই গেছে। ডাক্তার আমাকে বাঁচালে, বললে—"দাঁড় টানুন।"

বলে ডুবন্ত জুতোটার দিকে হাল ঘুরিয়ে দিলে, সেই মুহূর্তেই মাঝি জুতোটা ধরে ফেললে—জল খেয়ে এখুনিই ডুবে যাচ্ছিল ওটা। মাঝির হাতটা কনুই পর্যন্ত ভিজা। তারপর অনেকের মুখ থেকেই তুমুল আনন্দধ্বনি উঠল—জুতোটা বেঁচেছে।

আমার দারুণ লজ্জা করতে লাগল, আমার মুখ শাদা হয়ে গেছে—রুমাল দিয়ে জুতোটা মুছে দিলাম। একটিও কথা কইল না এড্ভার্ডা। পরে বললে—"এ-রকম আর কখনো দেখিনি।"

"দেখনি?" বললাম। বলে হাসলাল, এমনি ভান করলাম যেন কোনো বিশেষ কারণেই ঠাট্টাটা করে ফেলেছি। কিন্তু কি-ই বা কারণ? ডাক্তার ঘৃণায় আমার দিকে তাকাল—এই প্রথম।

আরো একটু সময় কাটল—বাড়ির মুখে নৌকো ভেসে চলেছে, ধীরে ধীরে এই ব্যাপারের বিসদৃশতা মুছে গেল; আমরা গান গাইলাম, ডাঙা এসে গেছে।

এড্ভার্ডা বললে—"মদ এখনো ফুরোয় নি, ঢের পড়ে আছে।"

আমাদের আরেকটা পার্টি দিতে হবে, নতুন পার্টি একটা,—একটা প্রকাণ্ড ঘরে নাচ।

পারে নেমে এড্ভার্ডার কাছে মাপ চাইলাম।

"তুমি যদি জানতে কুঁড়েতে ফিরে আসবার জন্যে আমার কি দারুণ ব্যাকুলতা হচ্ছিল!" বললাম—"এ দিনটা বড্ড বড়, ভারি দুঃখের।"

"খুব দুঃখের লেফটেনেণ্ট, না?"

"মানে, নিজের ও অন্যের কাছে কি বিসদৃশ হয়েই দেখা দিলাম।" কথাটা ঘুরিয়ে বললাম—"তোমার জুতো জলে ফেলে দিলাম পর্যন্ত।"

"হ্যাঁ, এ একটা অসাধারণ ব্যাপার বটে।"
"তোমার ক্ষমা চাই।"

এর থেকে কি আর হবে বল? যা হবার হোক, চুপ করে থাকব। আমিই কি গায়ে পড়ে ওর সঙ্গে প্রথম আলাপ করতে গেছি? কখ্খনো না, ওর যাবার পথে একদিন আমি একটু দাঁড়িয়েছিলাম শুধু। কি সুন্দর গ্রীষ্ম এখানে! সূর্যের আলো পেয়ে লোকজন রহস্যময় হয়ে উঠেছে। ওরা ওদের নীল চোখ দিয়ে কি খুঁজে বেড়াচ্ছে, ওদের ঐ ভুরুর তলায় কিসের অভিসন্ধি? যাক, আমি সবার 'পরেই উদাসীন,—এ ক'দিন ছিপ নিয়ে মাছ ধরছি খুব,—রাতে আমার কুঁড়ে ঘরে শুধু চোখ মেলে শুয়ে থাকি।
"এড্ভার্ডা, তোমাকে চার দিন দেখিনি।"
"চার দিন? হ্যাঁ, তাই। কিন্তু আমি এত ব্যস্ত ছিলাম দেখবে এস।"
একটা বড় ঘরে আমাকে নিয়ে এল। টেবিল চেয়ার সব ওলোটপালোট, ঘরের একেবারে অদলবদল হয়ে গেছে। বেলোয়ারি ঝাড়, স্টোভ—সব কিছুই সুন্দর করে সবুজ পাতা দিয়ে সাজানো। পিয়ানোটা কোণে দাঁড়িয়ে।
এই সব ওর নাচের সরঞ্জাম।
"তোমার কি রকম লাগছে?" ও শুধোয়।
"চমৎকার!"
ঘরের বাইরে এলাম।
বললাম—"এড্ভার্ডা, তুমি কি আমাকে একেবারে ভুলে গেছ?"
"কি বলছ বুঝছি না", ও অবাক হয়ে বললে, "দেখছ ত কাজে কত ব্যস্ত ছিলাম। কি করে আসি তোমাকে দেখতে?"
"না, আসতে পার না বটে।" সায় দিলাম। এ ক'দিন ভারি অসুস্থ ছিলাম, ঘুমুতে পারিনি, তাই কি রকম আবোল-তাবোল বকছিলাম বুঝি। সমস্ত দিন ধরেই মন অত্যন্ত বেজুত লাগছে। "না, তুমি আসনি বটে,…কিন্তু, কি যেন হয়েছে, তুমি বদলে গেছ। তোমার ঐ দুটি ভুরুর টানে কি যেন রহস্য রয়েছে, হ্যাঁ, এখন তা বুঝতে পারছি।"
"কিন্তু আমি ত তোমাকে ভুলিনি।" লজ্জার ভান করে ও ওর বাহু আমার বাহুর মধ্যে প্রসারিত করে দিল।
"হয়ত আমাকে ভোলনি। তাই যদি হয় তবে কি বলছি আমি এ সব।"

"কাল তুমি এক নেমন্তন্ন পাবে। আমার সঙ্গে নাচতে হবে কিন্তু। কেমন, দুজনে আমরা নাচব।"

"আমার সঙ্গে রাস্তায় একটু আসবে?"

"এখন? না, এখন না। ডাক্তার এখুনি এসে পড়বে; অনেক কাজ এখনো পড়ে আছে। ঘর-সাজানো তাহলে তোমার বেশ পছন্দ হয়েছে?"

একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল।

"ডাক্তারই হাঁকাচ্ছে নাকি?" বলি।

"হাঁ, ওকে একটা ঘোড়া পাঠিয়েছিলাম। ইচ্ছে ছিল—"

"ওর খোঁড়া পা-টাকে জিরোতে দিতে, না? আচ্ছা, আমি চললাম। শুভদিন ডাক্তার, আপনাকে দেখে খুশি হলাম ফের। বেশ ভালো ত? আমি যাচ্ছি, মনে কিছু করবেন না…"

সিঁড়িতে নেমে আর একবার পিছন ফিরে তাকালাম। এড্‌ভার্ডা জানালায় দাঁড়িয়ে আমাকে দেখছে—দুই হাত দিয়ে জানলার পর্দা টেনে ধরেছে—ওর চোখে নিবিড় ঔদাস্য। ঘর থেকে তাড়াতাড়ি ছুটে বেরিয়ে যাই—চোখে যেন অন্ধকার ছেয়ে এসেছে; আমার হাতের বন্দুকটা ছড়ির মতোই হালকা। যদি ওকে পেতাম ত একেবারে ভালো হয়ে যেতাম,—এই খালি মনে হচ্ছিল। বনে পৌঁছুলাম; ফের মনে হল, ওকে যদি পেতাম,—সবার চেয়ে বেশি সেবা করতাম ওকে; যদি ও অপকৃষ্ট-ই প্রতিপন্ন হত, কোনোদিন তবু ওকে ছাড়তাম না, কোনোদিন না; আকাশের চাঁদ পর্যন্ত ওকে পেড়ে দিতাম—এই ভেবেই সুখ হত, ও আমার—শুধু আমার। ··থামলাম, হাঁটু গেড়ে বসে পড়লাম, কয়েকটি ঘাসের ডগা চুম্বন করলাম, এই আশা করে—যেন ওকে পাই;—পরে উঠে পড়লাম।

মনে আর কোনো সন্দেহ রইল না। সময়ে ওর আচার ব্যবহারেরই যা একটু বদল হয়েছে—ও কিছু নয়। যখন চলে যাই ও আমাকে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল —যতক্ষণ না দেখা যায় ততক্ষণ ওর চোখ দিয়ে ও আমাকে খুঁজে বেড়িয়েছে—এর বেশি আর কি করবে ও? আনন্দে একেবারে অবশ হয়ে গেলাম, ক্ষুধা পর্যন্ত ঘুচে গেল।

ঈশপ্ আগে আগে ছুটছিল, হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল। দেখি, কুঁড়ের কিনারায় একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে, মাথায় শাদা রুমাল বাঁধা। এভা—কামারের মেয়ে।

"শুভদিন, এভা!"

ধূসো পাথরটার পাশে দাঁড়িয়ে—ওর মুখ রাঙা—একটি আঙুল ও চুষছে।

"এ কী এভা? কি হয়েছে?"

"ঈশপ্ আমাকে কামড়েছে।" অপ্রস্তুতের মতো হঠাৎ বলে ফেলে ও চোখ নামাল। ওর আঙুলটি দেখলাম। ও নিজেই কামড়েছে। হঠাৎ কি মনে করে বললাম, "অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছ?"

"না, বেশিক্ষণ নয়।" ও বল্লে।

আর কোনো কথা নেই,—ওর হাত ধরে ওকে কুঁড়ের মধ্যে নিয়ে এলাম।

মাছধরা শেষ করেই নাচঘরে এলাম বন্দুক আর ব্যাগ নিয়ে—সব চেয়ে ভালো পোশাকই পরে ছিলাম!

সিরিল্যাণ্ড-এ যখন পৌছুলাম, বেশ দেরি হয়ে গেছে—ভেতরে ওদের নাচ শুনতে পাচ্ছি। খানিক বাদে কে একজন চেঁচিয়ে উঠল—"এই যে আমাদের শিকারী, লেফটেনেণ্ট। জন কয়েক আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে কি মাছ ও পাখী ধরেছি তাই দেখতে লাগল। এড্ভার্ডা মৃদু একটু হেসে আমাকে অভিবাদন জানালে—ও নাচছে, ওর সর্বাঙ্গ যৌবনচ্ছটায় আরক্তিম হয়ে উঠেছে।

"আমার সঙ্গেই প্রথম নাচবে এস!" ও বললে।

দু'জনে নাচলাম, উদ্ভট কাণ্ড কিছুই ঘটল না যা হোক—মাথা ঘুরছিল বটে, কিন্তু পড়িনি। আমার ভারী বুট্ দুটো খুব আওয়াজ করছিল—নিজেরই ইচ্ছে হচ্ছিল আর নেচে কাজ নেই। ওদের রঙচঙে মেঝেটা পর্যন্ত নষ্ট করে দিয়েছি। কিন্তু এর বেশি আর কিছু বিতিকিচ্ছি কাণ্ড যে হল না, এজন্য ভারি খুশি ছিলাম!

ম্যাক্-এর সহকারী দুজন খুব নাচছে—ডাক্তার প্রায় প্রত্যেক জোড়া-নাচেই যোগ দিচ্ছে। এ ছাড়া আরো চার জন যুবক ছিল। এক বিদেশী—মুশাফির বণিকও—কি সুন্দর ওর গলা, বাজনার সঙ্গে তাল দিচ্ছে—খানিক বাদে-বাদেই পিয়ানো বাজিয়ে বাজনাওয়ালি মেয়েদের শ্রান্তি লঘু করছে।

রাতের গোড়ার দিকের কথা মনে নেই তত—কিন্তু রাত যতই ঘনিয়ে আসছিল—একটি কথাও তার ভুলিনি। জানলা দিয়ে সূর্য চেয়ে আছে—সিন্ধু-শকুনের দল ঘুমিয়ে পড়েছে বুঝি। মদ আর রুটি—গান আর হৈ-চৈ—সমস্ত ঘরে এড্ভার্ডার হাসি বিকীর্ণ হচ্ছে। কিন্তু আমার সঙ্গে ওর কি একটাও কথা নেই আজ? ও যেখানে বসে আছে, এগিয়ে গেলাম; ইচ্ছা হল খুব নম্র হয়ে ওকে দুটি কথা কই—ওর পরনে কালো পোশাক, কন্ফারমেশানের সময়কার হয়ত—এখন কিন্তু ওর

গায়ে খুব ছোট হয়ে গেছে! কিন্তু নাচবার বেলা ঐ পোশাকে ওকে ভারি চমৎকার মানায়, ইচ্ছা হল এই কথাই ওকে বলি।

"এই কালো পোশাক…" শুরু করলাম।

কিন্তু ও উঠে পড়ে ওর এক মেয়ে-বন্ধুর কোমরে হাত জড়িয়ে চলে গেল। বার দুই তিন এরকম হতে লাগল। বেশ,—তাই বটে।…কিন্তু, তাহলে আমার যাবার বেলায় ও কেন চোখে অমন নিঃশব্দ বেদনা ভরে জানলায় এসে দাঁড়ায়? কেন?

একটি মহিলা আমাকে নাচতে অনুরোধ করলেন। এড্‌ভার্ডা কাছেই বসে ছিল; জোরে বললাম, "না, আমি এখুনি বাড়ি যাচ্ছি।"

এড্‌ভার্ডা জিজ্ঞাসু চোখে আমার দিকে চাইল। বললে - "যাচ্ছ? না, তুমি যাবে না।"

চমকে উঠলাম, নিজের ঠোঁট কামড়াচ্ছি বুঝি—উঠে পড়লাম।

"তোমার কথায় বেশ অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত আছে।" উদাসীনের মতো বলে দরজার দিকে কয়েক পা এগিয়ে গেলাম।

ডাক্তার পথ আটকাল, এড্‌ভার্ডা তাড়াতাড়ি পিছু নিলে। গাঢ় গলায় বললে,—"আমাকে ভুল বুঝো না তুমি। আমি বলছিলাম, সকলের শেষেই তুমি যাবে—এখন ত মোটে একটা।…আর, শোন"—ওর দুই চোখ ডাগর হয়ে উঠেছে—"তুমি আমাদের মাঝিকে পাঁচটা ডেলার * দিয়েছ—আমার সেই জুতোটা বাঁচিয়েছিল বলে? এ তোমার বাড়াবাড়ি।" প্রাণ খুলে হেসে ও সবাইকার দিকে তাকাল।

আমি হাঁ হয়ে গেলাম—বিমূঢ়, নির্বাক।

"ঠাট্টায় তোমার বেশ দক্ষতা আছে। আমি কোনোদিন তোমার মাঝিকে ডেলার দিইনি।"

"দাওনি?" ও রান্নাঘরের দরজা খুলে মাঝিকে ডেকে আনলে। "জেকব্‌, তোমার মনে আছে সেই কোরহোলমার্ণ-এ একদিন তুমি আমাদের নৌকো করে নিয়ে গেছলে, আমার জুতো জলে পড়ে গেল,—তুমি বাঁচালে? মনে নেই?"

"আছে।" জেবক বললে।

"আর তার জন্য তোমাকে পাঁচটা ডেলার দেওয়া হল?"

"হ্যাঁ, আপনি দিয়েছিলেন…"

"আচ্ছা, আচ্ছা, যাও—তাই—যাও।"

কি মানে এই চাতুরীর? আমাকে কি লজ্জা দিতে চায়? পারবে না—লজ্জায়

* নরোয়ের মুদ্রা

আমি কখনোও নুয়ে পড়ব না। জোরে, স্পষ্ট করে বললাম—"এখানে সবাইকে বলে রাখা ভালো—এ হয় ভুল, নয় মিথ্যে কথা। তোমার জুতো বাঁচাবার জন্যে মাঝিকে ডেলার দেবার কথা আমার মনেই হয়নি। দেওয়া অবশ্য উচিত ছিল—কিন্তু এ পর্যন্ত হয়ে ওঠেনি তা।"

ভুরু কুঁচকে ও বললে—"নাচ বন্ধ হ'য়ে গেল কেন? ফের শুরু হোক।"

হ্যাঁ—এ-কথার ওর উত্তর দিতে হবে, ওর সঙ্গে এ বিষয়ে কথা কইবার সুযোগ খুঁজতে লাগলাম। ও একটা পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল—আমিও গেলাম।

একটা গ্লাশ মুখের কাছে তুলে ওর স্বাস্থ্য কামনা করলাম।

"আমার গ্লাশ খালি।" ও শুধু বললে।

কিন্তু সামনেই ওর গ্লাশ—ভরা।

"ভেবেছিলাম ঐ বুঝি তোমার গ্লাশ।"

"না, আমার না।" বলে আর কারো সঙ্গে গভীর তত্ত্বালোচনায় ডুবে গেল।

"তাহলে আমাকে মাপ কোরো।"

অতিথিদের কয়েকজন এই ছোট্ট অভিনয়টি দেখে নিয়েছে।

আমার হৃদয় ছি ছি করে উঠল, আহত স্বরে বললাম—"কিন্তু ও-কথা তুমি কেন বললে, আমাকে বুঝিয়ে দাও…"

ও উঠে আমার দুটি হাত ধরে আকুল হয়ে বললে—"আজ না, এখন নয়। আমি এত কষ্ট পাচ্ছি আজ। তুমি আমার দিকে এ রকম করে তাকাচ্ছ কেন? আমরা এককালে বন্ধু ছিলাম…"

বুক ভরে উঠল, নাচওয়ালাদের কাছে গেলাম।

খানিকবাদে এড্‌ভার্ডাও এল, সেই মুসাফির যেখানে বসে পিয়ানোয় একটা নাচের গৎ বাজাচ্ছে সেখানে গিয়ে ও বসল। ওর মুখ দুঃখে করুণ।

নিবিড় চোখে আমার দিকে চেয়ে বললে—"কোনোদিন বাজাতে শিখলাম না। যদি পারতাম!"

কি জবাব দেব এর? আমার হৃদয় ওর দিকে এত নুয়ে রয়েছে, ওর দিকে উড়ে গেছে একেবারে। বললাম—"তুমি হঠাৎ এ রকম ম্লান হয়ে গেলে কেন, এড্‌ভার্ডা? দেখে আমার এত কষ্ট হচ্ছে, তুমি যদি জানতে!"

"কেন, জানি না।" ও বলে—"সব কিছুর জন্যই হয়ত! ভালো লাগে না। ইচ্ছে হচ্ছে, সব এবার চলে যায়—সব্বাই। না, না, তুমি না,—শেষ পর্যন্ত খালি তুমি থাক।"

ওর কথা আবার আমাকে তাজা করলে, ঘরে রৌদ্র দেখে আমার চোখ খুশিতে ভরে গেল। 'ডিন'-এর মেয়ে কাছে এসে কথা কইছে—আমার ভালো লাগছে না এখন—খুব কাটা কাটা উত্তর দিচ্ছি। ইচ্ছে করেই ওর দিকে তাকাই না—ও বলেছিল আমার চোখ নাকি পশুদের মতোই ধারালো। ও এড্ভার্ডাকে বলছিল এখন—একবার এক জায়গায়—'রিগা'য় হয়ত—কে একজন ওর পিছু নিয়েছিল রাস্তার পর রাস্তা।

"আমি যে রাস্তায় যাই, ও-ও সেই রাস্তায়ই আসে, আর আমার দিকে চেয়ে হাসে।" ও বললে।

"কেন, লোকটা কি অন্ধ?" বললাম, এড্ভার্ডাকে খুশি করতে, ঘাড় দুটো নাড়লাম পর্যন্ত।

তরুণী আমর কথার কর্কশতা তখুনি বুঝে ফেলে বললে—"হ্যাঁ, আমার মতো বুড়ি ও কুৎসিত মেয়ের পিছু যে নেয় সে অন্ধই বটে।"

এড্ভার্ডা আমাকে কিছু না বলে ওর বন্ধুকে নিয়ে চলে গেল—ওরা একসঙ্গে মাথা নেড়ে ফিস্ফিসিয়ে কি সব বলাবলি করছে। তারপর থেকে আমি একেবারে একা।

আরেক ঘণ্টা কাটল; সিন্ধু-শকুনরা জেগে উঠেছে পাহাড়ের গায়ে; খোলা জানলা দিয়ে ওদের ডাক বুকে এসে লাগছে। পাখীদের প্রথম ডাক শুনে আমার শরীর যেন আনন্দে কম্পিত হতে লাগল, ইচ্ছে হল—সেই দ্বীপে ফিরে যাই—একা।

ডাক্তারের মেজাজ খুব দরাজ আজ, সবাইকে খুশি রাখছে। মেয়েরা ওর সঙ্গ ও সান্নিধ্যে এতটুকু শ্রান্ত হয় না। ঐ জিনিসটাই কি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী? ওর খোঁড়া পা ও কৃশ চেহারা দেখে—এই মনে হচ্ছে ও বারে বারে অদ্ভুত ভঙ্গী করে কথাবার্তা কয়, আমি জোরে হেসে উঠি। ও আমার প্রতিদ্বন্দ্বী কি না, তাই ওকে সমস্ত কিছু সুবিধা করে দিই—আর আমি নির্জীব হয়ে চেয়ে থাকি। এখানে ওখানে সর্বত্রই ডাক্তার—বলি—"ডাক্তারের কথা শোন সবাই।" আর ও যা বলে সবতাতেই হেসে উঠি।

ডাক্তার বললে—"পৃথিবীকে খুব ভালবাসি আমি। দাঁত ও নখ দিয়ে জীবনকে আমি আঁকড়ে থাকি। আর, যখন মরব, লণ্ডন কি প্যারির কোনোখানে যেন একটু কোণ পাই, আর যেন নাচগানের হল্লা শুনি—সব সময়।"

"চমৎকার।" হেসে-হেসে গড়িয়ে পড়লাম, দম আটকে এল। একটুও মদ খাইনি কিন্তু।

এড্‌ভার্ডাকেও খুশি দেখাচ্ছে।

অতিথিরা সব বিদায় নিচ্ছে—পাশের ছোট্ট ঘরটাতে পালিয়ে গিয়ে চুপ করে বসে-বসে প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। সিঁড়িতে একেরে পর এক সবাইর বিদায়জ্ঞাপন শুনতে পাচ্ছি—ডাক্তারও বিদায় নিয়ে চলে গেল টের পেলাম। সমস্ত কণ্ঠস্বর থেমে গেছে। আমার হৃদয় কাঁপছিল, কখন ও আসে।

এড্‌ভার্ডা এল। আমাকে দেখে ভারি অবাক হয়ে গেল—হেসে বললে—"তুমি আছ? শেষ পর্যন্ত যে থেকে গেলে—এ তোমার অসীম দয়া। আমি ভারি শ্রান্ত হয়েছি আজ।

দাঁড়িয়েই রইল।

উঠে পড়ে বললাম—"তোমার এখন বিশ্রাম নেওয়া দরকার তাহলে। আশা করি, তুমি আমার ওপর বিরক্ত হওনি, এড্‌ভার্ডা। খানিক আগে তুমি ভারি মনমরা ছিলে, আমার এত খারাপ লাগছিল।"

"ঘুমুলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।"

আর কিছু না বলে দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম।

ও ওর হাতখানি বাড়িয়ে দিয়ে বললে—"ধন্যবাদ! সন্ধ্যাটা ভারি সুখে কাটল।" দরজা পর্যন্ত এগিয়ে আসছিল, বাধা দিলাম।

"কিছু দরকার নেই। আমি নিজেই পথ চিনে যেতে পারব।"

তবুও আমার সঙ্গে ও এল। আমি আমার টুপি, বন্দুক ও ব্যাগ গুছিয়ে নিলাম, ও ততক্ষণ বারান্দাতে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। কোণে একটা ছড়ি; বেশ দেখা যাচ্ছিল, ভালো করে তাকিয়ে চিনলাম ওটা কার—ডাক্তারের। ছড়িটা দেখে ফেলেছি বলে ও যেন একটু অপ্রস্তুত হল;—ওর মুখের দিকে চেয়ে মনে হচ্ছিল ও এর কিছুই জানে না। পুরো এক মিনিট কেটে গেল—কোনো কথা নেই। হঠাৎ ও অধৈর্যের সঙ্গে তাড়াতাড়ি বলে উঠল—"তোমার ছড়ি,—তোমার ছড়ি নিতে ভুলো না।"

আমারই চোখের ওপর ডাক্তারের ছড়িটা ও আমার হাতে তুলে দিল।

ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম—ছড়িটা ও এখনো ধরে আছে, ওর হাত কাঁপছে। আমি ছড়িটা নিয়ে আবার কোণে তেমনি ঠেসান দিয়ে রেখে দিলাম। বললাম—"এ তো ডাক্তারের ছড়ি। বুঝতে পাচ্ছি না, কি করে খোঁড়া লোক তার ছড়ি ভুলে ফেলে যেতে পারে।"

"খোঁড়া লোক!" ও চীৎকার করে উঠল—এক পা আমার দিকে এগিয়েও এল—

"তুমি খোঁড়া নও, জানি—খোঁড়া হলেও তার সঙ্গে তোমার তুলনা হয় না, না কখনোই না। তুমি যাও।"

কিছু বলতে চাইলাম হয়ত, কিন্তু বুক সহসা খালি হয়ে গেছে—মুখে রা নেই, গভীর নমস্কার করে দরজার পেছন দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলাম। সামনের দিকে অনেকদূর পর্যন্ত তাকিয়ে যেন কি দেখে নিলাম,—চলে গেলাম তারপর।

তাই ও ওর ছড়ি ফেলে রেখে গেছে—মনে হল—ফের ও ফিরে আসবে ছড়িটা নিয়ে যাবার জন্য। আমিই তাহলে এ রাত্রির শেষ অতিথি নই।

আস্তে হেঁটে চলেছি, বনের কিনারে এসে থামলাম। আধ ঘণ্টা পর দেখা গেল ডাক্তার আমার দিকে এগিয়ে আসছে। আমাকে দেখতে পেয়েই বুঝি খুব জোরে পা চালিয়েছে। ওর কথা কইবার আগেই টুপি তুললাম—ওকে পরখ করতে। ও-ও তুলল। বরাবর ওর কাছে গিয়ে বললাম—"আমি ত তোমাকে কোনো অভিবাদন জানাইনি।"

ও চোখের দিকে চেয়ে রইল।—"অভিবাদন জানাওনি ?"

"না।"

চুপচাপ।

"তাতে আমার কিছুই এসে যায় না।" হঠাৎ ও বিবর্ণ হয়ে গেছে। "আমি আমার ছড়িটা ফিরিয়ে আনতে চলেছি,—ফেলে এসেছি কি না।"

এর কিছু উত্তর দেওয়া যায় না, তাই অন্যদিক দিয়ে প্রতিশোধ নিতে চাইলাম। ওর সামনে বন্দুকটা বাড়িয়ে দিয়ে বললাম—"লাফাও।"

ও যেন একটা কুকুর। ওর লাফাবার জন্য শিস্ দিলাম।

ওর মুখ শুকিয়ে পাংশু হয়ে গেছে, ঠোঁট কামড়াচ্ছে—ওর চোখের দৃষ্টি মাটিতে মিশে গেছে। হঠাৎ আমার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে রইল—অস্ফুট হাসিতে মুখ একটুখানি কোমল হল হয়ত—বললে—"তার মানে ? কি বলতে চাও তুমি ? কি হয়েছে তোমার ?"

কি-ই বা বলব ? ওর কথা বুঝি মন ছুঁয়ে গেল।

তাড়াতাড়ি ও ওর হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললে—"তোমার নিশ্চয়ই কিছু গোলমাল হয়েছে। বল না কি হয়েছে ? আমাকে বলতে কি বাঁধা ?"

লজ্জায়, হতাশায় মন নুয়ে পড়ল। ওর শান্ত কথাগুলি আমাকে দস্তুরমতো নাড়া দিলে! ইচ্ছা করল ওর প্রতি আমিও এমনি সদয় হই,—আমার বাহু দিয়ে ওকে জড়ালাম, বললাম—"এর জন্য আমাকে মাপ কর, ডাক্তার। কি-ই বা আমার হবে ?"

কিছুই হয়নি—তাই তোমার সাহায্যেরো দরকার নেই কিছু। তুমি এড্ভার্ডাকে খুঁজছ, না? বাড়িতেই ওকে পাবে। শিগ্গির যাও, নইলে এখুনি ঘুমিয়ে পড়বে হয়ত। ও আজ ভারি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে—আমি নিজের চোখে দেখে এলাম। তোমাকে সব চেয়ে শুভ সংবাদ দিলাম—বাড়িতেই পাবে ওকে, যাও। শিগ্গির।"

ডাক্তারকে ছেড়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি লম্বা পা ফেলে বন পেরিয়ে কুটিরে এসে পৌঁছুলাম।

এসেই বিছানার ওপর বসলাম—হাতে বন্দুক, কাঁধে সেই ব্যাগটা। মনে নানারকম আজগুবি চিন্তা ভিড় করছিল। ডাক্তারের কাছে নিজেকে এত খেলো করে দিলাম কেন? গলায় বন্ধুর মতো বাহু রেখেছি, ওর দিকে সস্নেহে চেয়েছি—ভাবতে ভারি রাগ হচ্ছিল এখন, হয়ত এই কথা নিয়ে ও মনে মনে ঠাট্টা করবে—হয়ত এতক্ষণে এই নিয়ে এড্ভার্ডার সঙ্গে ও খুব হাসছে। আচ্ছা, ও ওর ছড়িটা দেয়ালের কোণে রেখে এল! হাঁ, আমি যদি খোঁড়া হতাম, তবুও ডাক্তারের সঙ্গে আমার তুলনা চলে না—কথ্খনো না, এড্ভার্ডা আমাকে তাই বললে।

মেঝের মাঝখানে এসে, বন্দুকটা খাড়া করলাম। আমার বাঁ পায়ের পাতার কুঁজোর ওপর-পিঠে বন্দুকের মুখটা লাগিয়ে ঘোড়া টিপে দিলাম। পা ভেদ করে গুলিটা মেঝের মধ্যে গিয়ে সেঁধোল। ঈশপ্ ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠেছে।

খানিক বাদে দরজায় কে টোকা দিলে।

ডাক্তার।

"তোমাকে বিরক্ত করলাম বলে দুঃখিত।" ও বললে—"তুমি তাড়াতাড়ি চলে গেলে, তোমার সঙ্গে একটু কথা কইতে পর্যন্ত পারলাম না। একি, বারুদের গন্ধ?"

ওর মধ্যে একটুও অস্থিরতা নেই।

"এড্ভার্ডার সঙ্গে দেখা হল? ছড়ি পেলে?" শুধোলাম।

"পেয়েছি। কিন্তু এড্ভার্ডা শুতে চলে গেছে।...এ কি, তোমার পা থেকে রক্ত পড়ছে?"

"ও কিছু না। বন্দুকটা সরিয়ে রাখতে যাচ্ছিলাম,—তাইতেই এ কাণ্ড। কিছু না তেমন। যাও, আমি কি তোমাকে এমনি বসে বসে সব মাগনা খবর দেব নাকি? তুমি বল—ছড়ি ফিরে পেলে?"

ও আমার কথা যেন শুনলও না; আমার ছেঁড়া বুট ও রক্তাক্ত পায়ের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। তাড়াতাড়ি ছড়িটা রেখে ও ওর হাতের দস্তানা খুলে ফেললে।

"চুপ করে বসে থাক—নড়ো না—বুটটা আস্তে আস্তে খুলে ফেলছি। বন্দুকের এই আওয়াজটাই হয়ত দূর থেকে শুনেছিলাম।"

বন্দুক নিয়ে কি কাণ্ডটাই করলাম,—পরে কত অনুতাপ হচ্ছে। পাগল হয়ে গিয়েছিলাম বুঝি। কোন কাজই হল না তাতে, শুধু বহুদিন ধরে বিছানায় আটক রইলাম। কী অস্বস্তির মধ্যে দিয়েই দিন কেটেছে, এখনো স্পষ্ট মনে পড়ে। আমার ধোপানি রোজ এসে কাছে থাকত, খাবার কিনে আনত, ঘর গুছিয়ে দিত—কত দিন! তারপর···

ডাক্তার একদিন এড্‌ভার্ডার কথা পাড়লে। ওর নামটি আবার শুনলাম, ও কি করেছে কি বলেছে সব শুনলাম—যেন এ সবে আমার কিছু এসে যায় না, ডাক্তার যেন বাজে গল্প করছে! এত শিগ্‌গির লোকে ভুলে যেতে পারে, ভাবতে অবাক হয়ে যাই।

"আচ্ছা, এড্‌ভার্ডার সম্বন্ধে তোমার নিজেরই বা কি মত? সত্য কথা বলতে কি, আমি ওর কথা কতদিন ভাবিনি। দাঁড়াও, তোমাদের মধ্যে একটা কিছু হয়েছে,— তোমরা এত কাছাকাছি থাকতে। একদিন সেই দ্বীপে চড়ুইভাতির সময় তুমি ছিলে ভোজদাতা আর ও তোমার সহচরী। অস্বীকার করো না ডাক্তার, তোমাদের মধ্যে নিশ্চয়ই একটা কিছু বোঝাপড়া হয়েছে। না, থাক, আমার কথার উত্তর দিয়ে কাজ নেই—আমাকে কেন বলতে যাবে? এস, অন্য কথা পাড়ি। আবার কবে বাইরে বেরুতে পাব?"

কি বললাম তাই ভাবছিলাম বসে। পাছে ডাক্তার কিছু বলে বসে—তার জন্য এত ভয় কেন? এড্‌ভার্ডা আমার কে? আমি ওকে ভুলে গেছি।

ঘুরে ফিরে আবার এড্‌ভার্ডার কথা উঠল,—ওকে বাধা দিলাম। কিন্তু, শুনতে এত ভয় কিসের?

"কেন এমনি করে কথার মাঝে থেমে যাচ্ছ?" ও বললে,—"আমি ওর নাম বলি, এ কি তোমার সহ্য হয় না?"

বললাম—"আচ্ছা, এড্‌ভার্ডার সম্বন্ধে তোমার সত্যিকারের মত কি, বল। শুনব।"

অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল ও।—"সত্যিকারের মত?"

হয়ত তোমার কাছ থেকে আজ কিছু নতুন কথা শুনব। তুমি হয়ত ওর কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেছ, তোমাকে হয়ত ও গ্রহণ করেছে। তোমাকে অভিনন্দিত করব নাকি? না? সে কি?"

"তুমি বুঝি এই ভয় করছিলে ?"

"ভয় ? ডাক্তার—"

চুপচাপ।

"না।" ও বললে—"প্রস্তাবও করিনি, আমাকে ও গ্রহণও করে নি। তুমিই হয়ত করেছ, কেমন ? এড্‌ভার্ডার কাছে প্রস্তাব চলে না—যাকে ও খুশি তাকেই ও নেয়। ও কি শুধু একটি মেঠো মেয়ে ভাব ? শিশুকালে ও শাসন পায়নি—একেবারে খামখেয়ালি, বড় হয়েও। উদাসীন ? তাই বা কি করে বলি ? উত্তপ্ত ? —আমি বলি, বরফ। তবে কি ও ? একটুকরো মেয়ে, ষোলো কি সতেরো—ঠিক তাই। ঐ ঠুনকো একটুখানি মেয়েকে বুঝতে যাও, দিশেহারা হয়ে গিয়ে নিজের বোকামিতে হাসবে। ওর বাপ পর্যন্ত ওকে বশে আনতে পারেনি ; বাইরে ও বাপের কথা একটু আধটু শোনে বটে, কিন্তু আসলে ও-ই কর্ত্রী। ও বলে, তোমার চোখ ঠিক জানোয়ারের মতো…"

"তোমার ভুল হয়েছে ; ও নয়। আর কেউ।"

"আর কেউ ? কে আবার ?"

"তা জানি না। ওর মেয়ে-বন্ধুদের কেউ—এড্‌ভার্ডা না।"

"দাঁড়াও, এড্‌ভার্ডাই…"

"তুমি যখন ওর দিকে তাকাও ও তাই ভাবে, ও বলে। কিন্তু তোমার কি তাতে মনে হল যে তুমি ওর এক চুল কাছে এগিয়েছ ? না। যত খুশি যেমন খুশি ওর দিকে তাকাও, ও দেখে ফেলে আপন মনে বলবে—ঐ লোকটা আমার দিকে খুব চোখ মারছে , ভাবছে ওতেই আমাকে বেঁধে ফেলবে ! এই ভেবে শুধু একটি চাউনি বা একটি কথার খোঁচায় তোমাকে দশ মাইল দূরে ঠেলে দেবে। তুমি কি ভাবছ আমি তাকে চিনি না ? কত বয়েস ওর ?"

" '৩৮ সালে ও জন্মেছে,—ও ত বলে।"

"মিথ্যে কথা। আমি একদিন এমনি খোঁজ নিয়েছিলাম। ওর বয়েস কুড়ি, যদিও পনেরো বলে ওকে চালানো যায়। ও সুখী নয়—ওর ঐ ছোট্ট মাথার মধ্যে অনেক কিছুর বিপ্লব চলেছে। যখন ঐ পাহাড় আর সমুদ্রের পানে তাকিয়ে বেদনায় মুখ ঈষৎ কুঞ্চিত করে ওঠে—তখন, সেইখেনেই ওর দুঃখ। কিন্তু অহঙ্কারে চোখের জল ফেলল না কোনোদিন। একটু বেশি রকম কল্পনাপ্রিয়—ও ওর রাজপুত্রের প্রতীক্ষা করছে। তুমি নাকি একজনকে একবার একটা পাঁচ ডেলার-এর নোট দিয়েছিলে—সত্যি ? কি ব্যাপার ?"

"ঠাট্টা করেছিল। কিছু নয়।"

"কিছু বৈ কি। আমারো সঙ্গে এমনি করেছিল একবার, বছরখানেক আগে। ডাক-জাহাজে আমরা তখন যাচ্ছিলাম—জাহাজ ডাঙায় ভিড়েছে। বৃষ্টি পড়ছিল, ভারি ঠাণ্ডা। কোলে ছেলে নিয়ে একটি মেয়ে ডেক-এ বসে কাঁপছিল। এড্‌ভার্ডা তাকে শুধোল—'বড্ড শীত করছে তোমার?' করছে বৈ কি। 'ছোট্ট খোকাটিরো?' হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। এড্‌ভার্ডা বললে—'ক্যাবিনের মধ্যে যাও না কেন?' মেয়েটি বললে—ডেক-এর এই বাইরে-দিকটার টিকিট আমার।' এড্‌ভার্ডা আমার দিকে তাকাল। বললে—'এই মেয়েটির ডেক-এর বাইরে-দিকের টিকিট।' তাতে কি? কিন্তু ওর চাউনি বুঝতে ত দেরি হল না! খুব বড়লোক ত নিজে নই, যাই পাই তার জন্যে কী ভীষণ খাটতে হয়, এক আধলা খরচ করবার আগে দুবার ভাবি—চলে গেলাম সেখান থেকে। মেয়েটিকে কেউ সাহায্য করুক এই যদি এড্‌ভার্ডা চায়, তবে ও নিজেই দিক না। ও আর ওর বাপ আমার চেয়ে ঢের বড়—টাকায়! সত্যি-সত্যি এড্‌ভার্ডাই দিল। সেদিক দিয়ে ও চমৎকার—কে বলে ওর হৃদয় নেই? কিন্তু আমি ঐ মেয়েটি ও তার ছেলের সেলুন-ভাড়া দিই এই ত ও সর্বান্তঃকরণে চাইছিল—ওর দুই চোখে ত তাই পড়ছিলাম। তারপর কি হল, ভাবতে পার? মেয়েটি উঠে ওকে ধন্যবাদ জানালে। 'ধন্যবাদ আমাকে নয়।' এড্‌ভার্ডা বললে—'ঐ ভদ্রলোকটিকে।' আমার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে। মেয়েটি আমাকেও ধন্যবাদ দিলে;—কি বলব? চলে গেলাম শুধু। ঐ ওর রকম! কিন্তু ওর সম্বন্ধে আরো কত কথা বলা যায়। মাঝিকে সেই পাঁচ ডেলার—ও নিজেই দিয়েছিল তা। তুমি যদি দিতে তবে ও ওর দুই বাহু দিয়ে তোমাকে আলিঙ্গন করে সেখানেই চুম্বন করত। একটা ছেঁড়া জুতোর জন্যে এতগুলি টাকা খরচ করলে তুমি ওর মনে নিশ্চয় রাজপুত্রেরই মতো বিরাজ করতে—তা ওর ভারি মনোমত হত—তোমার কাছ থেকে ও তাই আশা করছিল। তুমি তা করলে না—ও নিজে তোমার নামে তাই করলে। ঐ ওর ধরন—খামখেয়ালি, কিন্তু ভারি হিসেবি।"

"এমন কি কেউ নেই যে, ওকে জয় করতে পারে?" শুধোলাম।

সে-প্রশ্ন এড়িয়ে ডাক্তার বললে—"ওর দরকার শাসন। বড্ড বাড় ওর, যা খুশি তাই ও করে, আর সব সময়েই জেতে।। কেউ ওকে অমান্য করে না,—কিছু-না-কিছু করবার হাতের কাছে আছেই ওর। আমি ওর সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করি, দেখেছ? পাঠশালার মেয়ে, খুকি! ওকে হুকুম করি, ওর কথা বলার ধরণকে নিন্দা করি, কড়া চোখ রাখি—ও কি কিছু বোঝে না, ভাব? গর্বিত, কঠিন—

প্রত্যেকবার ওর ঘা লাগে, প্রত্যেকবার অহঙ্কারে ও মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। কিন্তু ওর সঙ্গে অমনিই ব্যবহার করা উচিত। তুমি যখন এখানে প্রথম এলে—আমি তখন ওর সঙ্গে প্রায় এক বছর মিশছি—সব শুধরে আসছিল; বিরক্ত হতে-হতে বেশ বুঝ হয়ে উঠছিল ও। তুমি এসে সব উল্টে দিলে—সব। এমনি করেই যায় সব—একজন ছাড়ে আরেকজন এসে তুলে নেয়। তোমার পরে তৃতীয় আরেকজন আসবেন,—নিশ্চয়ই—তুমি তাঁকে চেন না।"

মনে হল, ডাক্তার কিসের যেন প্রতিশোধ নিচ্ছে। বললাম—"এত কষ্ট করে আমাকে এ লম্বা গল্প বলবার কি দায় পড়েছে তোমার, ডাক্তার? কেন? ওর শিক্ষা সম্বন্ধে আমাকেও কিছু সাহায্য করতে হবে নাকি।"

আবার একেবারে আগুন। আমার কথায় কান-ও পাতল না, বলে চলল—"জিজ্ঞেস করেছিলে, কেউ ওকে পেতে পারে কি না। কেন পারবে না? ও ওর রাজপুত্রের প্রতীক্ষা করছে, সে এখনো আসেনি। বারে-বারে ও ভাবে, তাকে পেয়েছি বুঝি, বারে-বারে ওর ভুল ভাঙে। তোমাকেও ভেবেছিল—বিশেষ জানোয়ারের চোখের মত তোমার চোখ। হা হা! তোমার ইউনিফর্মটা সঙ্গে নিয়ে এলে পারতে, কাজে লাগত। কেন ওকে পাবে না? কতদিন ওকে দেখেছি, বেদনায় দুই হাত মুচড়ে-মুচড়ে ও কার প্রতীক্ষা করছে, কে এসে ওকে কেড়ে নিয়ে যাবে, ওর প্রাণ আর সর্বদেহের ওপর রাজত্ব করবে···হ্যাঁ, একদিন সে আসবে হঠাৎ—একেবারে অসাধারণের মতো। ম্যাক্ ভ্রমণে বেরিয়েছে, নিশ্চয়ই কিছু মতলব আছে ওর। অনেকদিন আগে এমনি একবার বেরিয়ে গিয়ে সঙ্গে একটি লোক নিয়ে এসেছিল।"

"লোক নিয়ে এসেছিল?"

"সে কোনো কাজের নয়।" মলিন হাসি ডাক্তারের মুখে—"আমারই বয়সী সে—আমারই মতন খোঁড়া। রাজপুত্র হতে পারল না।"

"তারপর চলে গেল? কোথায় চলে গেল?" ওর দিকে অপলক চোখে চেয়ে রইলাম।

"চলে গেল? কোথায়?—জানি না।" অস্পষ্ট ডাক্তারের কথা—"অনেকক্ষণ বাজে বকছি আমরা। তোমার পা—তুমি এক সপ্তাহের মধ্যে বেরুতে পাচ্ছ না। আচ্ছা, চললাম, বিদায়!"

কুটিরের বাইরে নারীকণ্ঠ—রক্ত যেন মাথায় উঠে এল—এডভার্ডা।

"গ্নাহ্‌ন—গ্নাহ্‌নের অসুখ, শুনলাম।"

ধোপানি বাইরে ছিল, বললে—"প্রায় সেরে উঠেছেন।"

ওর মুখে আমার নামোচ্চারণ যেন একেবারে হৃদ্‌পিণ্ডে এসে লাগল, ও দুবার আমার নাম বলেছে, কত ভালো লাগছে তাতে। পরিষ্কার মিষ্টি ওর গলা!

টোকা না দিয়েই দরজা খুলে তাড়াতাড়ি ঢুকে আমার দিকে চাইল ও। হঠাৎ মনে হল—যেন সেই পুরাণো দিনের মতো—সেই রং-করা জ্যাকেট গায়ে, কোমর সরু দেখাবার জন্য সেই নীচু করে ঘাগরা পরা। ওকে আবার দেখলাম, সেই দৃষ্টি, মুখ, কপালের নীচে দুটি বাঁকানো ভ্রু-ধনু, দুটি শিথিল হাত;—আমার মাথা ঘুরে উঠল। ভাবলাম ওকে আমি চুম্বন করেছি! উঠে দাঁড়ালাম।

"আমি এলেই তুমি দাঁড়াও। কেন? বোস, তোমার পায়ে লাগবে। কেন বন্দুক ছুঁড়েছিলে বল ত? আমি কিছুই জানতাম না, সবে শুনলাম। এতদিন কেবল ভেবেছি: গ্নাহ্‌নের কি হল?—আর আসে না। সত্যিই কিছু জানতাম না, জানতাম না। প্রায় একমাসের ওপর তুমি ভুগছ, অথচ কেউ আমাকে কিছু বলেনি। কেমন আছ এখন? ভারি শুকিয়ে গেছ কিন্তু, চেনা যাচ্ছে না। তোমার পা —তুমি খোঁড়া হয়ে যাবে নাকি? ডাক্তার বলছে, কিছু ভয় নেই, পা ঠিক থাকবে। সত্যি, যদি খোঁড়া না হও, কি সুখী যে হই, কত যে ভালোবাসি তোমাকে! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। না বলে হঠাৎ চলে এলাম বলে ক্ষমা করেছ আশা করি—ছুটে আসছি…"

আমার কাছে নুয়ে এল—এত কাছে—মুখের ওপর ওর নিশ্বাস পাচ্ছি। ওকে ধরবার জন্য হাত বাড়ালাম। ও একটু সরে গেল। ওর দুটি চোখ ভিজা!

বললাম—"বন্দুকটা ঐ কোণে ছিল, বোকার মত এমনি ধরে ছিলাম, হঠাৎ গুলি ছুটল। হঠাৎ—"

মাথা নেড়ে ও বললে—"হঠাৎ। দেখি, বাঁ পা,—ডান না হয়ে বাঁ-ই বা কেন? হ্যাঁ, হঠাৎ—"

"সত্যিই হঠাৎ।" বললাম—"কি করে জানব বাঁ না ডান? দেখ না, বন্দুকটা যদি এমনি থাকে, তবে কোন পায়ে লাগে? ডান? যা-তা কাণ্ড—"

অদ্ভুত ভাবে তাকায়। চারিদিকে চেয়ে বলে—"ভালো আছ তাহলে? খাবারের জন্য ঐ মেয়েটাকে কেন আমাদের কাছে পাঠিয়ে দাও নি? কি খাচ্ছ?"

আরো কতক্ষণ আলাপ হ'ল। বললাম—"যখন তুমি এলে, তোমার সমস্ত দেহে চাঞ্চল্য, চোখে অপূর্ব জ্যোতি, তুমি তোমার হাতখানি আমার দিকে বাড়িয়ে

দিয়েছিলে। কিন্তু তোমার চোখ আবার ম্লান হয়ে এসেছে। কিছু কি অপরাধ করেছি ?"

স্তব্ধ !

"মানুষে সব সময়েই একরকম থাকতে পারে না···"

বললাম—"একটা কথা আমাকে বল। তোমাকে কী আঘাত দিলাম—ভবিষ্যতে শোধরাতে পারব তাহলে—"

ও জানলা দিয়ে দূর আকাশের দিকে চাইল, ব্যথিত স্বরে বললে—"কিছুই না, গ্লাহ্ন। শুধু-শুধু মনে ভাবনা আসে। তুমি রাগ করেছ ? কেউ অল্প দেয়—কিন্তু তাদের পক্ষে সেটুকুন দেওয়াই কত দুঃসাধ্য—কেউ বা ঢেলে দেয়, একটুও যায় আসে না তাতে—এদের মধ্যে কে সত্যিই বেশি দেয়—বলতে পার ? অসুখে তুমি ভারি মলিন হয়ে গেছ। আমরা কেন এ সব বাজে বকছি ? হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে বললে—মুখ ওর খুশিতে রাঙা—"শিগ্গিরই তুমি ভালো হয়ে যাবে। আবার দেখা হবে আমাদের।"

ও হাত বাড়িয়ে দিল।

কি যে মাথায় এল—হাত নিলাম না। আমার হাত দুটো পেছনে রেখে উঠে দাঁড়ালাম—নীচু হয়ে নমস্কার জানালাম—দয়া করে আমাকে যে দেখতে এসেছে তার জন্য ওকে ধন্যবাদ।

"তোমাকে বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসতে পারলাম না, মাফ কোরো।"

ও চলে গেলে চুপ করে বসে রইলাম বিছানায়। ইউনিফর্মটা ফিরিয়ে দেবার জন্য একটা চিঠি লিখলাম।

বনে প্রথম দিন।

শ্রান্ত—অথচ সুখী ; সমস্ত প্রাণী কাছে এসে মুখের দিকে তাকাচ্ছে, গাছের পোকা, পথের পোকা। সুপ্রভাত, তোমাদের সঙ্গে দেখা হ'ল ! অরণ্য যেন আমার মধ্যে মর্মরিত হচ্ছে, ওর প্রতি নিবিড় স্নেহ অনুভব করলাম—আমি যেন আনন্দে আর কৃতজ্ঞতায় গলে যাচ্ছি ! বন্ধু অরণ্য, হৃদয় থেকে তোমার জন্যে শুভকামনা করছি, সুখী হও !

থামি, সমস্ত পথ ঘুরি ফিরি, সমস্ত কিছুর নাম ধরে ডাকি, চোখ জলে ভরে ওঠে। পাখী, গাছ, পাথর, ঘাস, পিঁপড়ে—সবাইকে সম্বোধন করি। উঁচু পাহাড়ের দিকে

তাকাই, ভাবি, ওরা যেন আমাকে ডাকে! 'এই যাচ্ছি—' কথা কয়ে উঠি। ঐ বাজপাখীটার বাসা চিনি। পাহাড়ের উপরে ওদের শব্দ শুনে মন উড়ে চলে।

দুপুরে নৌকো নিয়ে একটা ছোট দ্বীপে এসে ভিড়লাম। আমার হাঁটু পর্যন্ত উঁচু, পেলব বৃন্ত—বেগুনি রঙের ফুল—বুনো ঘাস ও কাঁটা-গাছ ভিড় করে আছে, ঠেলে চলেছি। একটা পশু নেই,—মানুষও না। পাহাড়ের নীচে সমুদ্র ধীরে ফেনায়িত হচ্ছে, দূরে পাহাড়ের ওপর দলে-দলে পাখীরা উড়ছে, চেঁচাচ্ছে। চতুর্দিক থেকে সমুদ্র যেন আমাকে প্রিয়ার মত আলিঙ্গন করে ধরেছে; ধন্য এই জীবন ও পৃথিবী ও আকাশ, ধন্য আমার শত্রু ধন্য—আমি এখন আমার নিদারুণ শত্রুকেও বিনীত সম্ভাষণ করতে পারি, তার জুতোর ফিতে বেঁধে দিতে পারি।

ম্যাক্-এর নৌকো থেকে একটা শব্দ ভেসে এল—পরিচিত গানের সুর, সমস্ত মন যেন রৌদ্র লেগে উল্লসিত হয়ে উঠেছে। দাঁড় বেয়ে চলে জেলেদের কুটির পেরিয়ে হেঁটে বাড়ি ফিরি। দিন মরে এসেছে, ঈশপের সঙ্গে একত্র খাওয়া সেরে আবার বনে বেরিয়েছি। আমার মুখে মৃদু বাতাসের স্পর্শ লাগছে। আমার মুখ স্পর্শ করেছে বলে বাতাসকে ধন্যবাদ দিচ্ছি, ওদের বলি-ও সে কথা, ধন্যবাদে আমার শিরায় রক্ত-ধারা চঞ্চল হয়ে ওঠে। আমার হাঁটুর ওপর ঈশপ্ ওর একটি থাবা তুলে দেয়। দেহে ক্লান্তি নামে, ঘুমিয়ে পড়ি।

ঘণ্টা বাজছে। বহুদূরে সমুদ্রের মাঝে একটা পাহাড়। দুইবার প্রার্থনা করি, একবার আমার জন্য, আরেকবার কুকুরের জন্য;—পাহাড়ে যাই।

টকটকে লাল আকাশ—আমার চোখের সুমুখে সূর্য, নমস্কার। রাত্রি যেন আলোকের সঙ্গে প্রতিধ্বনি করছে। আমি ও ঈশপ্—সব শান্ত, সুষুপ্ত। আমরা আর ঘুমুব না—শিকারে বেরুব, কুকুরকে বলি—আমাদের মাথার ওপরে লাল সূর্য হাসছে, ফিরে যাব না আর।…মনে পাগল চিন্তার ভিড় জমে।

উত্তেজিত, অথচ দুর্বল—মনে হল কে যেন আমাকে চুম্বন করছে, ঠোঁটে তার চুম্বন লেগে আছে। বাঃ, কেউ নেই ত। "ইসেলিন্!" ঘাসের ওপর অস্ফুট একটি শব্দ—হয়ত একটি শুকনো পাতা খসল, হয়ত বা পদধ্বনি কার। বনের মধ্যে অপরূপ চাঞ্চল্য—নিশ্চয়ই এ ইসেলিন্-এর নিশ্বাস! এখানেই ওর বাসা, এখানে ও হলদে-জুতো-পরা নীল-কুর্তি-গায়ে কত শিকারীর প্রার্থনা শুনেছে। চার পুরুষ আগে ও ওর জানলায় বসে বনে বনে শিঙা-নাদের প্রতিধ্বনি শুনত। ছিল বলগা হরিণ, নেকড়ে আর ভালুক—অসংখ্য শিকারী। তারা সবাই দেখেছে কেমন করে ও ছোট্টটি

থেকে ডাগর হ'ল, ওরা সবাই ওর জন্য প্রতীক্ষা করে গেছে। কেউ কেউ দেখেছে ওর চোখ, কেউ শুনেছে ওর গলা—কিন্তু এক রাতে এক বিনিদ্র গেঁয়ো শিকারী উঠে পড়ে লুকিয়ে ওর ঘরে গিয়ে ওর কোমরের সুমুখের সাদা মখমলটি দেখে এল। যখন সবে ওর বারো বছর বয়েস, ডাণ্ডাস্ এল। স্কচ, জেলে—দেদার জাহাজ ওর। ছেলে ছিল একটা। যখন ইসেলিন্ ষোলো হ'ল, ডাণ্ডাস্‌কে দেখলে। ঐ ওর প্রথম প্রেমিক…

এমনি সব আজগুবি চিন্তা—মাথা ভারী হয়ে আসে। চোখ বুজে ইসেলিন্-এর চুম্বনের প্রতীক্ষা করি। ইসেলিন্, অন্তরঙ্গ, তুমি কি এখানে? ডাইডেরিক্‌কে কি গাছের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছ?…মাথা আরো ভারী হয়, ঘুমের তরঙ্গের ওপর ভাসি।

কে যেন কথা কইছে, যেন সপ্তর্ষি আমার রক্তের ছন্দে গান গাইছে।—ইসেলিন্-এর গলা: "ঘুমোও, ঘুমোও।"

আমি আমার প্রথম প্রেমের গল্প বলি, প্রথম রাত্রির। মনে আছে দরজা বন্ধ করে রাখতে ভুলে গেছলাম। আমার ষোলো বছর বয়েস, বসন্তের বেলা তখন, মিঠে বাতাস। ডাণ্ডাস্ এল, ঈগলের পাখার ঝাপটের মতো। শিকারে বেরুবার আগে ওর সঙ্গে একদিন মোটে দেখা হয়েছিল, পঁচিশ ওর বয়েস, অনেক দূর থেকে এসেছে। বাগানে আমার পাশে-পাশেই হাঁটল, আর যেমনি আমাকে ছুঁল, ভালবাসলাম। কপালে ওর দুটি লাল দাগ, ইচ্ছে হ'ল ঐ দুটো দাগের ওপর চুমু দিই।

শিকারের পর বিকেলে ওকে বাগানে খুঁজতে বেরুলাম—যদি ওকে না পাই, ভারি ভয় করছিল। আপন মনে ওর নামটা আস্তে একটু আওড়ালাম, ও যেন না শোনে! ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে বললে—"মাঝ রাতের এক ঘণ্টা বাদে।"

চলে গেল।

"এক ঘণ্টা বাদে মাঝ রাতের", নিজের মনে বললাম—"কি তার মানে? জানি না। হয়ত ও দূর দেশে চলে যাচ্ছে, হয়ত মাঝ রাতের এক ঘণ্টা বাদেই, কিন্তু আমার তাতে কি?"

তারপর—আমার দরজা বন্ধ করে রাখতে হঠাৎ ভুল হ'ল…

মাঝরাতের এক ঘণ্টা বাদে ও আসে।

"দোর কি বন্ধ ছিল না?" শুধোই।

"এখন বন্ধ করে দিচ্ছি।" ও বলে।

দরজা বন্ধ করে দেয়। শুধু আমরা।

কি বিশ্রী ওর ভারী বুটের শব্দ! "আমার ঝিকে জাগিয়ে দিয়ো না।" বলি: "চেয়ারটা পর্যন্ত নড়বড়ে, বসলেই আওয়াজ হয়। না না, ঐ চেয়ারটায় বসো না, ভাঙা।"

"তোমার পাশে বসি তাহলে?"

"বসো।" বলি।

শুধু ঐ চেয়ারটা ভাঙা বলে—

সোফায় আমরা দুজনে বসি।

"ঠাণ্ডা গা তোমার।" আমার হাত ধরে ও বললে—"তুমি সত্যিই কি কালিয়ে গেছ!" আমাকে ঘিরে ওর বাহু।

ওর বাহুবন্ধনে তপ্ত হয়ে উঠলাম। তাই আরো একটু বসলাম দুজনে। একটা মোরগ ডেকে উঠল।

"শুনলে, মোরগ ডাকছে?" ও বললে—"ভোর হয়ে এল।"

আমাকে ও ছুঁল! হারিয়ে গেলাম।

"সত্যিই কি মোরগ ডাকছে?" ঢোক গিলে বললাম।

ওর কপালে সেই দুটি জ্বরে-পোড়া লাল দাগ! উঠতে চাইলাম; দিল না উঠতে, ধরে রইল। সেই দুটি মিষ্টি দাগে চুমু দিলাম—ওর সামনে চোখ বুজে আছি।

ভোর হয়ে গেল। উঠলাম—সব অচেনা—এ যেন আমার ঘরের দেয়াল নয়, নিজের জুতো যেন চিনতে পাচ্ছি না—একটা আকুল শিহরণে যেন সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হচ্ছে। কি এ? হাসি পেল। কটা এখন? জানি না—শুধু মনে আছে দোরে খিল দিতে ভুলে গেছলাম।

ঝি আসে।

"ফুল গাছে এখনো জল দেওয়া হয় নি।" বলে।

ফুলের কথা ভুলে গেছি।

"তোমার পোশাক কুঁচকে গেছে—" ও বলে।

হাসি পেল। গত রাত্রে বোধ হয়।

দরজার কাছে একটা গাড়ি দাঁড়ায়।

"বেড়ালটার জন্তে দুধ নিই।" ও বলে।

ফুলের কথা ভাবি না, না পোশাক, না বেড়ালের।

শুধোই, "ডাগুাস্ এল কি না দ্যাখ ত। ওকে আসতে বল, ওর জন্যে বসে আছি।"
...ভাবি, এসে আজও কি দোর বন্ধ করে দেবে?
দরজায় কে টোকা দেয়। খুলে দরজাটা নিজেই বন্ধ করি, ওকেই বরং একটু সাহায্য করা হ'ল।
'ইসেলিন্।' ও ডাকে। পুরো এক মিনিট ধরে ঠোঁটে ঠোঁট রাখে।
'তোমাকে ডেকে পাঠাই নি।' কানে-কানে বলি।
'পাঠাও নি?'
ব্যথা পাই যেন, বলি, 'না, পাঠিয়েছিলাম। তোমার জন্যে এত অপেক্ষা করছিলাম। একটু থাক।'
ওরই জন্য চোখ ঢেকে রইলাম। ও আমাকে ছেড়ে দিল না; ওর কাছে সরে এসে লুকিয়ে আছি।
'মোরগ ডাকছে।' ও বললে।
'না, কোথায় মোরগ?'
ও আমার বুক চুম্বন করল।
'দাঁড়াও দোর বন্ধ করে দিয়ে আসি।' ও উঠতে চাইল।
উঠতে দিলাম না। বললাম কানে-কানে—দরজা বন্ধ আছে।
আবার সন্ধ্যা—চলে গেল ডাগুাস্। আয়নার সামনে দাঁড়ালাম, দুটি প্রেমোজ্জ্বল চক্ষু আমাকে সম্ভাষণ করছে—হৃদয় দুলে কেঁপে শিউরে উঠছে। আমার চোখ যে এত সুন্দর তা ত জানিনি আগে, নিজের ঠোঁটের ওপর আয়নায় চুমু দিলাম—
এই আমার প্রথম রাত্রি—প্রভাত ও সন্ধ্যা। আরেক সময় তোমাকে ভেগু্ হাল্ফ্সেন্-এর গল্প করব। ওকেও ভালবাসতাম, ঐ দূরে দ্বীপে ও থাকত—এখান থেকে দেখা যায়—কতদিন বিকেলে নৌকো করে ঐ পারে গেছি, ওর কাছে। স্টেমার-এর গল্পও বলব তোমাকে। ছিল পুরুত, কিন্তু ভালবাসতাম। সবাইকেই ভালবাসি...
আধ ঘুমের মধ্যে মোরগের ডাক শুনি—নীচে, সিরিল্যাণ্ড-এ।
শোন ইসেলিন্! আমাদের জন্যেও মোরগ ডাকছে—
সুখে চেঁচিয়ে উঠি, দুই হাত বাড়িয়ে দিই। জাগি। ঈশপ্ও নড়ে উঠেছে। চলে গেল—দারুণ বেদনায় বলে ফেলি, চারপাশে তাকাই। কেউ নেই—ফাঁকা। ভোর হয়ে গেছে, নীচে সিরিল্যাণ্ড-এ এখনো মোরগ ডাকছে।
কুঁড়ের ধারে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে—এভা। হাতে একটা দড়ি, কাঠ আনতে যাচ্ছে।

মেয়েটির জীবনের এই ভোরবেলা, তরুণ ওর দেহ—নিশ্বাসে ওর বুক দুলছে, রোদ এসে পড়েছে।

"তুমি ভেবো না…" কথা শেষ করতে পারে না।

"কি ভাবব না এভা ?"

"যে তোমার সঙ্গে দেখা করতেই এ পথে এসেছি। এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম বলে—" লজ্জায় ওর মুখ ঈষৎ রাঙা হয়ে ওঠে।

পা-র ব্যথাটা কিছুতেই সারছে না, রাতে মাঝে মাঝে টন্‌টন্‌ করে—জেগে থাকি। হঠাৎ চিড়িক্ দিয়ে ওঠে, বাদলা নামলেই বাতে ধরে। ঢের দিন হয়ে গেল। কিন্তু খোঁড়া হলাম না একেবারে।

দিন যায়।

ম্যাক্ ফিরেছে, খবর পেলাম। আমার নৌকো নিয়ে গেল; বেজায় অসুবিধায় পড়তে হ'ল কিন্তু—শিকার কিছুই জুটছে না। কিন্তু হঠাৎ নৌকোটা ফিরিয়ে নিয়ে গেল কেন? ম্যাক্-এর দুজন লোক এক বিদেশী লোককে নিয়ে সকালবেলা নৌকো করে হাওয়া খায়।

ডাক্তারের সঙ্গে দেখা।

"আমার নৌকোটা নিয়ে গেল।" বললাম।

"নতুন লোক এসেছে।" বললে ও—"সকালে বেড়াতে নিয়ে বিকেলে ফিরিয়ে আনতে হয়। সমুদ্র দেখছে।"

ফিন্‌ল্যাণ্ডের লোক। স্টিমারে হঠাৎ ম্যাক্-এর সঙ্গে দেখা হয়েছে—ওকে সবাই ব্যারন্ বলে ডাকে। ম্যাক্-এর বাড়িতে ওকে দুটো ঘর দেওয়া হয়েছে। ও আসাতে বেশ একটা সোরগোল পড়ে গেছে যা হোক।

মাংসের জন্যে ভারি অসুবিধা হচ্ছে, বিকেলের জন্যে এড্‌ভার্ডার কাছে কিছু চাইব ভাবলাম। চললাম সিরিল্যাণ্ড-এ। এড্‌ভার্ডার পরনে নতুন পোশাক, ও আরো একটু ঢ্যাঙা হয়েছে—ওর পোশাকের ঝুল আরো একটু লম্বা হয়েছে।

"উঠতে পাচ্ছি না, মাফ কর।" এইটুকু শুধু বললে, হাতখানা বাড়িয়ে দিলে।

"ওর শরীর ভাল না।" ম্যাক্ বললে—"ঠাণ্ডা লেগেছে। একটুও সাবধানতা নেয় না।…তোমার নৌকো চাইতে এসেছ বুঝি? ওটার বদলে তোমাকে আরেকটা দেব—পুরানো, তা হোক—এখানে একজন নতুন লোক এসেছেন কি না—বৈজ্ঞানিক, তায় অতিথি, বুঝছই ত।"…তাঁর একটুও সময় নেই, সারাদিন খাটেন,

সন্ধ্যায় ফিরে আসেন। এক্ষুণি যেয়ো না, আস্থন তিনি, তাঁর সঙ্গে আলাপ করে খুব খুশি হবে। এই ওঁর কার্ড—মুকুট-ছাপ-মারা—তিনি ব্যারন্। ভারি চমৎকার লোক। হঠাৎ দেখা হ'ল।"

যাক, খেতে বললে না। খালি যাচাই করতে এসেছি, বাড়ি ফিরে যাব এবার, ঘরে কিছু মাছ হয়ত এখনো আছে। খুব খাওয়া হ'ল···বেশ!

ব্যারন্ এল। বেঁটে, প্রায় চল্লিশ, চিমসে মুখ, গালের হাড় ঠেলে উঠেছে, পাতলা কালো-দাড়ি। চোখা চোখ, জোরালো চশমা। শার্টের বোতামেও পাঁচ-মুখো মুকুটের ছবি। একটু নীচু হ'ল, কৃশ হাতে নীল শিরা ফুলে উঠেছে, হাতের নখগুলি হলদে।

"খুব খুশি হলাম, লেফ্‌টেনেন্ট্। আপনি কি এ জায়গায় বরাবর আছেন?"

"কয়েক মাস।"

বেশ ভদ্র। ম্যাক্ ওকে ওর সব মাপকাঠি, তৌল-দাঁড়ি, সমুদ্রের নানান খুঁটিনাটি নিয়ে কথা বলতে অনুরোধ করলে—ও-ও খুশি হয়ে বলে চলল—কোথায় কি রকম কাদা, কোথায় কি ঘাস। বারে-বারেই আঙুল দিয়ে মোটা চশমাটা নাকের ওপর ঠিক মতো বসাচ্ছে। ম্যাক্ খুব উৎফুল্ল। এক ঘণ্টা কাটল।

ব্যারন্ আমার সেই তুর্ঘটনার কথাও বললে—সেই বন্দুক নিয়ে বিতিকিচ্ছি কাণ্ডটা। ভালো হয়ে গেছি কি? শুনে খুশি হলাম।

কিন্তু কে ওকে বলেছে এ কথা? বললাম, "কার কাছে শুনলেন?"

"কে আবার? শ্রীমতী ম্যাক্। তুমিই নও?"

এড্‌ভার্ডা লজ্জার ভান করল।

বেচারা আমি—এতদিন ধরে কি দারুণ বেদনা বুক চেপে ছিল, বিদেশীর শেষ কথা শুনে ভারি সুখ হ'ল। এড্‌ভার্ডার দিকে তাকাইনি, কিন্তু মনে-মনে ওকে ধন্যবাদ দিলাম। ধন্যবাদ, তুমি আমার কথা বলেছ, তোমার জিভ দিয়ে আমার নাম উচ্চারণ করেছ—নাই বা রইল তার কিছু দাম—ধন্যবাদ!

বিদায় নিলাম। এড্‌ভার্ডা চুপ করে বসেই রইল, ওর যে অসুখ। উদাসীনের মতো হাত বাড়িয়ে দিলে।

ম্যাক্ উৎসুক হয়ে ব্যারনের সঙ্গে বকে চলেছে। কন্‌সাল ম্যাক্-এর গল্প করছে এখন: "সে-কথা তোমাকে এখনো বলিনি বুঝি? এই হীরেটা রাজা কার্ল জোহান্ আমার ঠাকুরদার বুকে নিজ হাতে পরিয়ে দিয়েছিলেন।"

সিঁড়ি দিয়ে নামছি, কেউই দোর পর্যন্ত এগিয়ে দিল না। যেতে যেতে জানলা দিয়ে একবার চাইলাম, এড্‌ভার্ডা দাঁড়িয়ে তুই হাতে পর্দা সরিয়ে দেখছে—

দীর্ঘাঙ্গী, তন্বী! নমস্কার করতে ভুলে গেলাম, অপ্রতিভ হয়ে চলে গেলাম তাড়াতাড়ি।

বনে এসে পড়েছি। "দাঁড়াও," নিজেকে বলি। বিধাতা, এর শেষ কোথায়? মনে আর কোনো অহঙ্কার নেই। এড্ভার্ডার করুণা আমার প্রতি সাতদিন বর্ষিত হয়েছিল—ফুরিয়ে গেছে! সেই সাতদিনের সম্বল নিয়ে আর কতদূর পথ ভাঙব? এবার থেকে হৃদয় কেঁদে বেড়াবে—ধুলো, হাওয়া, মাটি!…

ঘরে গিয়ে মাছ পেলাম, খেলাম।

একটা পাঠশালার ক্ষুদে মেয়ের জন্য জীবন দগ্ধ করছ, দুর্বহ তোমার রজনী! তপ্ত বাতাস হা হা করছে, গত বছরের দীর্ঘশ্বাস! অনির্বচনীয় নীল আকাশ, পাহাড় ডেকেছে আমাকে। আয় ঈশপ্…

এক সপ্তাহ কাটে। কামারের নৌকো ভাড়া করে মাছ ধরে চালাই। ব্যারন্-এর সমুদ্র-ভ্রমণ বুঝি সাঙ্গ হয়েছে, বাড়িতেই আছে আজকাল, এড্ভার্ডার সঙ্গে থাকে। কারখানায় দেখেছিলাম একদিন। একদিন সন্ধ্যায় আমারই কুঁড়ের দিকে আসছিল ওরা, জানলা থেকে সরে গিয়ে দোর বন্ধ করে দিলাম। ওদের একত্র দেখে কিছুই মনে হয় না, একটু কাঁধ দোলাই শুধু। একদিন রাস্তার ওপরেই দেখা—অভিবাদনের বিনিময় হ'ল; ব্যারন্-ই আমাকে আগে দেখলে, ইচ্ছে করে অভদ্র হবার জন্যে টুপিতে শুধু দুটো আঙুল ঠেকালাম। ওদের পাশ কাটিয়ে আস্তে আস্তে চলে গেলাম—তাচ্ছিল্য করে চেয়েও গেলাম একবার।

অনেক দিন কাটল।

অনেকগুলি দিন কাটেনি? মনমরা হয়ে গেছি—সেই স্নেহার্দ্র ধূসর পাথরটিও পর্যন্ত বেদনা ও হতাশার চোখে আমার দিকে চাইছে; বৃষ্টি—আবার বাতে ধরেছে, বাঁ পায়ে। এই বেরুবার সময়—

ঈশপ্‌কে বেঁধে রেখে ছিপ আর বন্দুক নিয়ে বেরুলাম। মন ভারি অস্থির।

"ডাকের জাহাজ কবে আসবে রে?" একটা জেলেকে শুধোলাম।

"ডাকের জাহাজ? তিন হপ্তার মধ্যে—"

"ইউনিফর্মটার জন্যে অপেক্ষা করছি।" বললাম।

ম্যাক্-এর সহকারীর সঙ্গে দেখা। অভিবাদন হ'ল। বললাম—"তোমরা আর তেমনি হুইষ্ট খেল? সত্যি করে বল না।"

"হ্যাঁ, প্রায়ই।"

চুপচাপ।

"অনেক দিন যাইনি।" বললাম।

মাছ ধরতে বেরুলাম। ভিজা দিন; মশারা ঝাঁক বেঁধেছে, ওদের তাড়াবার জন্য সমস্তক্ষণ তামাকের ধোঁয়া ছাড়তে হয়। কয়েক ক্ষেপ বেশ হ'ল। দুটো জলো-পাখীও শিকার করলাম।

কামার সেখানে কি কাজ করছে। বললাম—"আমার ওদিকে যাচ্ছ?"

"না।" ও বললে—"ম্যাক্ আমাকে একটা কাজ দিয়েছে, অনেক রাত জাগতে হবে।"

কামারের বাড়ির কাছ দিয়ে ঘুরে গেলাম। একা এভা দাঁড়িয়ে।

"সমস্ত মন দিয়ে তোমাকে চাইছিলাম"—ওকে দেখে যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছি, ও কিন্তু বিস্ময়ে আমার মুখের দিকে তাকাতে পর্যন্ত পারছে না—"তোমার ঐ দুটি চোখ আর এই যৌবন খুব ভালবাসি। আজ সমস্ত দিন তোমাকে না ভেবে আরেক জনের কথা ভেবেছি বলে শাস্তি দাও আমাকে। তোমাকে দেখতেই এলাম, তোমাকে দেখলে ভারি সুখ হয়। কাল রাতে তোমাকে ডাকছিলাম, টের পেয়েছিলে?"

"না।" ও যেন ভয় পেয়ে গেছে।

"ডাকছিলাম—এড্ভার্ডা,—জোমফ্রু এড্ভার্ডা—কিন্তু সেই তোমাকেই। জেগে উঠলাম, শুনলাম—সত্যি সত্যিই, তোমাকেই ডাকছিলাম। ভুলে এড্ভার্ডা নামটা মুখে এসেছে। তুমিই আমার প্রিয়া, এভা। কি সুন্দর লাল তোমার ঠোঁট! এড্ভার্ডার চেয়ে কত সুন্দর তোমার দুটি পা—দেখ, চেয়ে দেখ।" ওর পোশাকটা একটু তুলে ওর পা দুটি ওকে দেখালাম।

ওর মুখ খুশিতে ভরে উঠেছে, চলে যেতে চাইল। আবার কি ভেবে ওর বাহুটি আমার কাঁধের ওপর রাখল।

একটু সময় কাটে। একটা লম্বা বেঞ্চিতে বসে দুজনে খানিক কথা কই, কত কথা। বললাম—"তুমি শুনলে বিশ্বাস করবে না যে, জোমফ্রু এড্ভার্ডা ভালো করে কথা বলতে পর্যন্ত শেখেনি?—ও বলে, 'অধিকতর বেশি সুখী।' নিজের কানে শুনেছি। ওর কপাল খুব সুন্দর, সেই কথা বলছ? আমার মোটেই তা মনে হয় না। বিচ্ছিরি কপাল। হাত পর্যন্ত ধোয় না।"

"খালি ওরই কথা কইবে?"

"না না। ভুল হয়ে গেছল।"

আরো একটু সময়। কি যেন ভাবি, চুপ করে থাকি।

"তোমার চোখ ভিজা কেন?" এভা শুধোয়।

বলি—"সুন্দর ওর কপাল, মিষ্টি দু'খানি হাত; একবার শুধু কেন জানি একটু

ময়লা ছিল। সবই ভুল বলেছি।” হঠাৎ রাগ করে দাঁত খিঁচিয়ে বলি—“সমস্তক্ষণ তোমারই কথা ভাবছিলাম, এভা। তুমি শুনলে অবাক হয়ে যাবে, ঈশপ্‌কে প্রথম দেখে ও বললে: ‘ঈশপ্? সে ত প্রকাণ্ড পণ্ডিত—ফ্রিজিয়ান্।’ শুনলে—কি বোকা! সেই দিন ঐ কথাটা ও নিশ্চয়ই কোথাও পড়ে এসেছিল!”

“হ্যাঁ,”—এভা বলে—“তাতে কি?”

“মনে হচ্ছে, আরো বলেছিল ঈশপের মাস্টারের নাম জ্যান্‌থাস! হা হা হা!”

“বটে?”

“কি বোকা! এতগুলি লোকের সামনে বললে জ্যান্‌থাস ঈশপের মাস্টার! তোমার মন নিশ্চয়ই আজ ভালো নেই এভা, নইলে এই কথা শুনে হাসতে হাসতে তোমার পেট ফাটত।”

“হ্যাঁ, এটা মজার কথা বটে।” এভা বলে; জোর করে হাসতে যায়। পরে বলে—“আমি তোমার মতো অত ভালো বুঝি না।”

“তুমি কি এমনি চুপ করে বসে থাকবে নাকি? কথা কইবে না?” ওর চোখে কি অপার সারল্য! আমার চুলের মধ্যে ওর হাতখানি গুঁজে দেয়।

“চমৎকার তুমি।” ওকে বুকের ওপর টেনে আনলাম। “তোমার ভালবাসার ক্ষুধায় আমি জর্জরিত হচ্ছি। তুমি আমার সঙ্গে যাবে?”

“হ্যাঁ।” ও বলে।

ওর সম্মতি আর আমি শুনতে পাই না, ওর নিশ্বাসে অনুভব করি। আমার আলিঙ্গনে ও আত্মদান করে।

একঘণ্টা বাদে ওকে বিদায়চুম্বন জানাই—চলি। দরজার সামনে ম্যাক্।

ম্যাক্ নিজে।

চমকে উঠে চারিদিকে তাকায়, সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়েই থাকে—কিছু বলতে পারে না।

“আমাকে দেখবেন বলে আশা করেননি নিশ্চয়।” টুপি তুলে বলি।

এভা নড়ে না।

ম্যাক্ নিজেকে সামলে নিয়ে বলে—“তোমার ভুল হয়েছে, তোমাকে খুঁজতেই আমি এখানে এসেছি। তোমাকে জানাতে এসেছি যে, পয়লা এপ্রিল থেকে এখানে আধ-মাইলের মধ্যে পাখী মারা বারণ হয়ে গেছে। তুমি আজ দুটো পাখী মেরেছ—সবাই দেখেছে।”

“দুটো জলো-পাখী শুধু।”

"যাই হোক, তাতে কিছু আসে যায় না, তুমি আদেশ অমান্য করেছ।"

"করেছি। আইনের কথা মনে ছিল না।"

"কিন্তু মনে থাকা উচিত ছিল।"

"যে মাসে ঐ জায়গায় আমি আরো দুটো পাখী মেরেছিলাম, সে আপনারই হুকুমে। সেই চড়ুইভাতির দিনে।"

"সে আলাদা কথা।" ম্যাক্ বলে।

"তাহলে আপনাকে কি করতে হয় জানেন ?"

"খুব।"

যাবার পথে এভা আমার পিছু-পিছু একটু এল, মাথায় রুমাল বাঁধা—ঐ দূর দিয়ে চলে গেল। ম্যাক্ বাড়ির মুখে পা বাড়িয়েছে!

ভাবলাম—নিজেকে বাঁচাবার জন্য হঠাৎ কি-সব বাজে কথা পাড়া। কি চোখা চোখ! দুটো গুলি, দুটো পাখী, জরিমানা—কী এ সব? উনিই যেন সব-কিছুর কর্তা।

বৃষ্টি এসেছে, বড়-বড় ফোঁটা—ভারি স্বকোমল। টুনটুনিরা উড়ে চলেছে। বাড়ি এসে ঈশপকে ছেড়ে দিলাম, ঘাস চিবোতে লাগল।

সামনে সমুদ্র, বৃষ্টি হচ্ছে—পাহাড়ের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছি। পাইপ টানছি, অনেকক্ষণ—ধোঁয়া কুণ্ডলি পাকিয়ে উঠছে—তেমনি আমারো যত আজগুবি চিন্তা! মাটির ওপর কতগুলি শুকনো ডাল পড়ে আছে—কোনো পাখীর ঝরা নীড়। তেমনি আমার জীবন।

দিনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি আমার মনে আছে।

সমুদ্র আর বাতাস কথা কয়ে উঠেছে, ওদের আর্তনাদ যেন আর শোনা যায় না। জেলে-নৌকা পাল তুলে ভেসে চলেছে—কোথায় তাদের ঘর কে জানে, কোথায় চলেছে ওরা। ফেনিল সমুদ্র মাথা কুটছে—যেন কোটি দৈত্য পরস্পরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। যেন বা কোন আনন্দ-উৎসব। হয়ত বা মীনকুমার তার সাদা ডানা দিয়ে সমুদ্রকে আঘাত করছে! সুদূর—একাকী সমুদ্র!

একা আছি, এই আমার সুখ; আমার চোখে কারু চোখ পড়ে না। আর কেউ আমাকে দেখছে না ভাবতে বেশ নিরাপদ লাগে—পাহাড়ের গায়ে ঠেস দিয়ে বসি। ভাঙা চীৎকার করে পাখী উড়ে যায়, বাইরে বৃষ্টি পড়ে, আর আমি নিশ্চিন্ত

হয়ে মধুর একটি উত্তাপ ও বিরাম উপভোগ করছি—কত সুখ! জামার বোতামগুলি লাগাই, এই উত্তাপটির জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! খানিক বাদে ঘুমিয়েই পড়ি।

সন্ধ্যা। তখনো বৃষ্টি হচ্ছে, বাড়ি ফিরি। আমার সামনে পথের ওপর এড্‌ভার্ডা দাঁড়িয়ে—অদ্ভুত! একেবারে ভিজে গেছে, যেন বহুক্ষণ ধরে ভিজছে—অথচ মুখে হাসি। হঠাৎ রেগে উঠি মনে মনে, বন্দুকটা মুঠির মধ্যে চেপে ধরে ওর দিকে এগোই। ও তেমনি হাসে।

"সুপ্রভাত।" ও-ই আগে বলে।

আরো কয়েক পা এগিয়ে এসে ঠাট্টার সুরে বলি—"সুন্দরী, তোমাকে অভিবাদন।"

ঠাট্টার সুর শুনে ও একটু চমকে ওঠে। ভীরু ওর হাসি, আমার দিকে তাকায়। "পাহাড়ে গেছলে আজ?" শুধোয়। "তাহলে নিশ্চয়ই ভিজেছ। আমার সঙ্গে একটা রুমাল আছে, নিতে পার দরকার হ'লে—দিয়ে দিতে পারি।···তুমি কি আমাকে চেন না?"

চোখ দুটি ধীরে নামায়, রুমাল নিই না বলে যেন দুঃখিত হয়।

"রুমাল?" রেগে বলি—"আমার জামা আছে গায়ে, তুমি তা ধার নেবে? দিয়ে দিতে পারি এটা। যে চায় তাকেই দিতে পারি, একটা জেলে-মেয়ে চাইলেও।"

ও ওর সমস্ত মন ঢেলে শুনছে, তাই ওকে কুৎসিত দেখাচ্ছে ভারি—ঠোঁট দুটো বুজে রাখতে পর্যন্ত ভুলে গেছে। হাতে রুমাল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সাদা রেশমি রুমাল—এই মাত্র ঘাড়ের থেকে খুলে নিয়েছে। জামাটা গায়ের থেকে খুলে ফেলি।

ও বলে ওঠে—"মাথা খাও, জামাটা খুলো না, পর ফের। এত রাগ করেছ কেন আমার ওপর? সত্যি, পর জামা, একেবারে ভিজে যাবে যে।"

জামা গায়ে দিলাম।

"কোথায় যাচ্ছ?" গম্ভীর হয়ে জিগ্‌গেস করলাম।

"কোথাও না।···কেন যে তুমি জামাটা তখন খুলে ফেললে···"

"ব্যারন্‌-এর সঙ্গে আজ কি হ'ল। এই বিশ্রী দিনে নিশ্চয়ই বেরোয় নি।"

"গ্লাহ্‌ন্‌, একটা কথা তোমাকে বলতে এসেছিলাম···"

বাধা দিয়ে বললাম—"তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানিয়ো।"

দুজনের দিকে দুজনে তাকাই। ও কথা বলতে গেলেই ওকে বাধা দেব। হঠাৎ ওর মুখ যেন বেদনায় করুণ হয়ে ওঠে, ফিরে দাঁড়িয়ে বলি—"সত্যি কথা বলছি,

তুমি এই মহাত্মাটিকে বিদায় দাও, এড্ভার্ডা। ও তোমার উপযুক্ত নয়। এ কয়দিন ধরে ও অনবরত ভাবছে তোমাকে বিয়ে করবে কি না—এ কি তোমার প্রশ্রয় দেওয়া উচিত?"

"না, ও-সব কথা রাখ। গ্লাহ্ন, তোমাকে আমার খালি মনে পড়ে। তুমি আরেক জনের জন্যে এমনি শুধু-শুধু জামা খুলে ভিজে মরবে—কেন? তোমার কাছে আমি এসেছি…"

নিষ্ঠুর হয়ে বলি—"তার চেয়ে ডাক্তারের কাছে যাও। তার বিরুদ্ধে তোমার নিশ্চয়ই কিছু বলবার নেই। টাটকা যৌবন, বুদ্ধিমান—তুমি আর একবার ভেবে দেখলে পার।"

"কিন্তু দাড়াও, এক মিনিট, একটা কথা শোন।"

ঈশপ্ আমার জন্য ঘরে অপেক্ষা করছে। টুপিটা তুলি, একটু নুয়ে পড়ে ফের ওকে বলি—"সুন্দরী, তোমাকে অভিবাদন।"

চলতে পা বাড়াই।

ও কেঁদে ওঠে—"তুমি আমার মন ছিঁড়ে ফেলছ টুকরো-টুকরো করে। তোমার কাছে এসেছিলাম আজ, তোমার জন্যে এতক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়েছিলাম, তুমি আসতেই হাসলাম। কাল সারাদিন ভারি বিমনা ছিলাম, সমস্তক্ষণ কি ভাবছিলাম, মাথা ঘুরছিল—তোমারই কথা ভাবছিলাম খালি। আজ ঘরে বসেছিলাম, কে এল। জানতাম কে, তবু চোখ তুললাম না। 'দেড় মাইল দাঁড় টেনেছি।' ও বললে। বললাম—'শ্রান্ত হও নি?' 'ভীষণ!'—ও বললে—'হাতে ফোসকা পড়েছে।' একটুবাদে ও বললে—'কাল রাতে আমার জানালার ও-পিঠে কে ফিসফিস করে কি কথা কইছিল। নিশ্চয়ই তোমার ঝি, আর ঐ গুদাম ঘরের কেউ—বেশ ভাব দুজনের!' 'হ্যাঁ, শিগ্গিরই ওদের বিয়ে হবে।' বললাম। 'কিন্তু তখন যে রাত দুটো।' 'তাতে কি? সমস্ত রাত্রিই ত ওদের।' সোনার চশমাটা নাকের ওপর আর একটু তুলে ও বললে—'কিন্তু রাত দুটোয়—কি বল। এটা কি ভালো দেখায়?' তবু চোখ তুললাম না, তেমনি আরো দশ মিনিট কেটে গেল। 'একটা শাল এনে তোমার পায়ে জড়িয়ে দেব?' ও শুধোল। 'না, ধন্যবাদ।' 'যদি তোমার একখানি হাত আমাকে ধরতে দাও।' কিছু বললাম না আমি, কি যেন ভাবছিলাম, কার কথা। আমার কোলের ওপর ছোট্ট একটা বাক্স রাখলে, বাক্সের মধ্যে একটা ব্রোচ্। তাতে মুকুটের ছাপ-মারা, দশটা পাথর বসানো তাতে…গ্লাহ্ন, সেই ব্রোচ্টা সঙ্গে নিয়ে এসেছি, দেখবে? পায়ের নীচে ফেলে ওটাকে টুকরো-টুকরো করে গুঁড়ো করে দিয়েছি—এই দেখ।…

'এই ব্রোচ্ নিয়ে আমি কি করব ?' জিগ্‌গেস করলাম। 'পর।' ও বললে। ব্রোচটা ওকে ফিরিয়ে দিয়ে বললাম—'আমাকে একা থাকতে দিন। আমি অন্য একজনের কথা ভাবছি।' 'কে সে ?' 'বনের শিকারী।'—বললাম—'আমাকে সে দুটি মরা পাখীর পালক দিয়েছিল, স্মৃতিচিহ্ন ; আপনার ব্রোচ্ ফিরিয়ে নিন।' কিন্তু কিছুতেই নেবে না। এই প্রথম ওর দিকে তাকালাম, ওর চোখ জ্বলছে। 'আমি কক্ষণো ফিরিয়ে নেব না, তোমার যা ইচ্ছা কর, গুঁড়ো করে ফেল।' ও বললে। দাঁড়ালাম, জুতোর গোড়ালির তলায় ওটাকে রাখলাম, গুড়ো করে ফেললাম। সে হচ্ছে সকাল বেলা।...বহুক্ষণ বাদে রাস্তায় ওর সঙ্গে ফের দেখা হ'ল। জিগ্‌গেস করলে,'কোথায় যাচ্ছ ?' 'গ্লাহনের সঙ্গে দেখা করতে।'—বললাম—"তাকে বলতে সে যেন আমাকে না ভোলে।...একটা থেকে এইখানে ঠায় দাঁড়িয়ে আছি, গাছের তলায় দাঁড়িয়ে তোমাকে দূর থেকে দেখতে পেলাম, তুমি দেবতার মতো দেখতে। তোমার ঐ দেহ ভালবাসি, তোমার চিবুক, তোমার কাঁধ—তোমার সমস্ত।...কেন এত অধীর হচ্ছ ? তুমি শুধু চলে যেতে চাও, শুধু ; আমি যেন তোমার কেউ নই, আমার দিকে একবার ফিরেও চাইবে না।..."

স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। ওর কথা ফুরোল, হাঁটতে লাগলাম। নৈরাশ্যে একেবারে শ্রান্ত হয়ে গেছি, হাসলাম—আমি নিষ্ঠুর।"

হুয়ে পড়ে বললাম—"তাই নাকি ? এই আমার সঙ্গে তোমার কথা ?"

আমার এই ঘৃণায় ও বিমুখ হয়ে উঠল। বললে—"তোমার সঙ্গে কথা ? কই না ত, কোন কথা ছিল না ত।"

ওর স্বর কাঁপে—কাঁপুক, কিছুই এসে যায় না আমার।

পরদিন সকালে এড্‌ভার্ডা তেমনি কুঁড়ের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, বাইরে বেরুতেই দেখা হ'ল।

সারা রাত ভেবে মন ঠিক করে ফেলেছি। একটা খেয়ালি, বাজে জেলে-মেয়ের পেছনে কতদিন ঘুরব ?—ও আমার সমস্ত হৃদয় শুষে নিয়েছে। ঢের হয়েছে। তবু মনে হ'ল ওর প্রতি এই নির্মম আচরণের ফলেই ওর কাছে যেন আরো এগিয়ে এসেছি—ওর এতক্ষণ ধরে বক্তৃতা দেওয়ার পর বললাম কি না—"তাই না কি ? এই আমার সঙ্গে তোমার কথা ?" ওকে ঘৃণা করতে পেরেছি বলে ভালো লাগে। বড় পাথরটার পাশে দাঁড়িয়েছিল। এখুনিই যেন আমার কাছে ছুটে আসবে—এত অস্থির দেখাচ্ছিল ওকে!—ও ওর বাহু মেলে ধরেছে, নীচু হয়ে হাত কচ্‌লাতে লাগল এবার। টুপি তুলে ওকে নিঃশব্দে নমস্কার করলাম।

"তোমাকে একটি কথা তবু বলতে এসেছি, গ্লাহ্ন"—অনুনয় করে ও বলছিল —"শুনলাম তুমি কামারের বাড়ি যাও। একদিন সন্ধ্যায় গেছলে—এভা একা ছিল।"

চম্‌কে উঠলাম, বললাম—"তোমাকে কে বললে?"

ও চেঁচিয়ে উঠল—"আমি গোয়েন্দা নই, বাবার মুখে কাল বিকেলে শুনলাম। কাল রাতে ভিজে যখন বাড়ি ফিরলাম, বাবা বললেন: 'তুমি ব্যারনের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছ আজ।' বললাম: 'না।' তিনি জিগ্‌গেস করলেন: 'কোথায় ছিলে এতক্ষণ? বললাম: 'গ্লাহ্নের কাছে।' তখন বাবা বললেন।"

বলি—"এখানেও ত এভা আসে।"

"এখানে আসে? এই ঘরে?"

"হ্যাঁ, কত দিন। বসে বসে তুজনে কত গল্প করেছি।"

"এখানেও?"

চুপচাপ।

নিজেকে বলি, "কঠিন হও।" তারপর: "আমার ওপর তোমার যখন এত দরদ, তখন আমিই বা পিছিয়ে থাকি কেন? কাল তোমাকে বলেছিলাম ডাক্তারকে বিয়ে করতে—ভেবে দেখেছ সে-কথা? ঐ ব্যারন-রাজপুত্র একেবারে অসম্ভব—"

রাগে ওর চোখ জ্বলে ওঠে; বললে—"না, নয়—তুমি কী জান তার? তোমার চেয়ে ঢের ভালো, তোমার মতো সে গ্লাশ বাটি ভাঙে না, জুতোতে হাত দেয় না কারুর। ভদ্রসমাজে কি করে মিশতে হয় সে তা জানে—তুমি একেবারে বাজে, বুনো—অসহ্য। বুঝলে?"

বুকে এসে ওর কথা বেঁধে। মাথা নত করে বলি—"বুঝেছি। তোমাদের ভদ্রসমাজে মিশবার উপযুক্ত আমি নই। বনে থাকি সেই আমার সুখ। এখানে নিজের মনে একা থাকি, মানুষের ভিড়ে গেলেই ভদ্রতা বাঁচিয়ে চলা তুষ্কর হয়ে ওঠে। তুই বছর ধরেই ত এই বন-নির্বাসন—"

ও বললে—"এর পর তুমি যে কী সর্বনাশ করবে কে জানে! সব সময়েই তোমার ওপর চোখ রাখা অসম্ভব।"

কি নিষ্ঠুর ওর কথা—এখনো ফুরোয়নি, আরো আছে। ও বললে—"এভাকে এনে রাখতে পার, তোমার ওপর চোখ রাখবে। কিন্তু বেচারির যে বিয়ে হয়ে গেছে—"

"এভা? এভার বিয়ে হয়ে গেছে? বল কি?"

"হ্যাঁ, হয়ে গেছে।"

"কার সঙ্গে ?"

"তুমি তা জান নিশ্চয়ই। ও-ই কামারের বৌ।"

"আমি ত জানতাম ওর মেয়ে।"

"না, ওর স্ত্রী। তুমি কি ভাবছ আমি মিথ্যে কথা বলছি ?"

তা ভাবিনি ; একেবারে অবাক হয়ে গেছি। এভার বিয়ে হয়ে গেছে !

"বেশ পছন্দ করেছ যা হোক।" এড্‌ভার্ডা বললে।

এর শেষ নেই ; রেগে বললাম—"তুমিও পছন্দ করে ডাক্তারকে নাও গে, যাও। বন্ধুর পরামর্শ শোন, তোমার ঐ রাজপুত্তুর একটি আস্ত গণ্ডমূর্খ।" রেগে তার বিষয়ে ঢের মিথ্যা কইলাম, ওর বয়েস বাড়িয়ে বললাম—ওর মাথায় প্রকাণ্ড টাক, রাত-কানা, নিজের আভিজাত্য দেখাবার জন্য শার্টের বোতামে মুকুটের ছাপ নিয়ে বেড়ায়। "ওর সঙ্গে আলাপ করতে পর্যন্ত ইচ্ছে যায় না।" বললাম—"কিছুই ওর নেই, ও একটা ভুয়ো, যা তা !"

"ও অনেক, ও অনেক।" এড্‌ভার্ডা বললে—"তুমি ত একটা বুনো জানোয়ার, তুমি ওর কি জান ? দাঁড়াও—ও নিজে এসে তোমার সঙ্গে কথা কইবে, আমিই ওকে বলব এখানে আসতে। তুমি ভাবছ আমি ওকে ভালবাসি না—তোমার ভুল। আমি ওকে খুব ভালবাসি। এভা যদি চায় ও আসুক না এখানে—হাঃ হাঃ—আসুক ও—আমার তাতে কিছুই এসে যাবে না,—আমি পালাই…"

কয়েক পা খুব জোরে ফেলেই একবার পেছনে তাকাল, মড়ার মতো ম্লান মুখে—আর্তনাদ করে উঠল—"তোমার মুখ আর দেখব না।"

গাছের পাতা হলদে হচ্ছে—আলুর চারা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে ; ফুল ধরেছে। আবার শিকারে বেরিয়েছি—খোলা আকাশ, নিস্তব্ধ ; সুশীতল রাত্রি, স্বচ্ছ ভাষা, এবং বনে-বনে সুমধুর মর্মরধ্বনি। পৃথিবী বিশ্রাম নিচ্ছে—বিশাল পৃথিবী, প্রশান্ত পৃথিবী।

"সেই দুটো জলো-পাখী মেরেছিলাম, তার কি হ'ল ম্যাক্‌-এর কাছ থেকে কিছুই জানতে পেলাম না।" ডাক্তারকে বললাম।

ও বললে—"তার জন্যে তুমি এড্‌ভার্ডাকে ধন্যবাদ দাও! আমি জানি, ও-ই তোমাকে বাঁচিয়েছে।"

"সে-জন্যে তাকে আমি ধন্যবাদ দিতে পারব না।"—বললাম। মধুর গ্রীষ্ম! পাণ্ডুর অরণ্যের শিয়রে তারার মালিকা দোলে,—রোজ রাতেই একটি করে নতুন তারা

চোখ চায়। ম্লান চাঁদ—বিষণ্ণ একটি রজতলেখা!
"এভা, তোমার বিয়ে হয়ে গেছে?"
"তুমি কি তা জানতে না?"
"না ত।"
নীরবে ও আমার হাত স্পর্শ করলে।
"কি করব তাহলে এখন?"
"তুমিই জান। এখুনি যাচ্ছ না ত। যতক্ষণ তুমি আমার কাছে থাক, ততক্ষণই খুব ভালো লাগে।"
"না, এভা।"
"হ্যাঁ, যতক্ষণ তুমি কাছে থাক।"
ওকে ভারি নিঃসঙ্গ লাগে—আমার হাত তেমনি নিবিড় স্নেহে ধরে থাকে।
"না, এভা, তুমি যাও—আর না!"

রাত যায়, দিন আসে। তারপর তিন দিন চলে গেল। এভা মোট নিয়ে আসে। ও কতদিন একা-একা এত ভার মাথায় নিয়ে বন পেরিয়ে বাড়ি গেছে—তাই ভাবি।
"তোমার মোট নামিয়ে রাখ, এভা। দেখি, তোমার চোখ তেমনি নীল আছে কি না।"
ওর চোখ লাল।
"না, মুখ ভার করো না এভা, হাস।" আমি নিজেকে আর ধরে রাখতে পারি না, "আমি তোমার—তোমার।"
সন্ধ্যা। এভা গান গায়, তাই শুনি—সমস্ত দেহ-প্রাণ তপ্ত হয়ে ওঠে।
"তুমি আজকে সন্ধ্যায় গান গাইছ।"
"খুব ভালো লাগছে।"
ও আমার থেকে একটু বেঁটে, তাই একটু লাফিয়ে ও আমার কণ্ঠ বেষ্টন করে ধরে।
"এ কি, এভা, তোমার হাত ছড়ে গেছে?"
"ও কিছু না।"
ওর মুখ আশ্চর্য-রকম উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।
"এভা তোমার সঙ্গে ম্যাক্-এর কথা হয়েছে?"
"হ্যাঁ, একবার।"

"কি বললে ও? তুমিই বা কি বললে?"

আমাদের সম্বন্ধে এখন সব কড়াক্কড়ি করেছেন আজকাল···আমার স্বামীকে দিনরাত খাটাচ্ছেন—আমাকেও। আমাকে এখন মুটে-মজুরের কাজে লাগিয়েছেন।"

"কেন এ-সব করছে?"

এভা চোখ নামায়।

"কেন এ-সব ও করছে, এভা?"

"আমি তোমাকে ভালবাসি বলে।"

"কিন্তু কি করে ও জানল?"

"আমিই ওকে বলেছিলাম।"

চুপচাপ।

"এভা, ও যেন তোমার প্রতি নিষ্ঠুর না হয়, ভগবান তাই করুন।"

"তাতে কিছু এসে যায় না। কিছু না।"

ওর কণ্ঠস্বর যেন বনের মধুর মর্মরসঙ্গীত।

অরণ্য আরো পাণ্ডুর—শরৎ কাছে এসেছে; আকাশে আরো কয়েকটি তারা চোখ মেলেছে—চাঁদ এখন যেন স্বর্ণলেখা! শীত নেই—একটি শীতল নিস্তব্ধতা, বনের অন্তরে যেন দুর্নিবার প্রাণ-চাঞ্চল্য! গাছগুলি যেন দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কি ভাবছে। তারপর এল একুশে আগস্ট—তিনটি কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন নিঃসাড় রাত্রি।

তুষারাহত প্রথম রাত্রি।

ন'টায় সূর্য ডোবে। মরা অন্ধকার মাটির বুক জুড়ে বসে—একটি তারাও দেখা যায় না, দুঘণ্টা বাদে চাঁদের আভাস জাগে—একটুখানি। বনে বেড়াই, সঙ্গে বন্দুক আর কুকুর—আলো জ্বালাই। কুয়াশা নেই।

"শীতের প্রথম রাত।"—সমস্ত অরণ্য আমার অন্তরে শিহরিত হচ্ছে!

"মানুষ, পশু ও পাখী, তোমাদের ধন্যবাদ, বনে এই নির্জন রাত্রিটির জন্য ধন্যবাদ তোমাদের। এই অন্ধকার ও এই বনমর্মরের জন্য ধন্যবাদ—নিঃশব্দতার এই কোমল সঙ্গীত—সবুজ পাতা, মুমূর্ষু পাতা—ধন্যবাদ! এই যে প্রাণধারণের ছন্দ—মাটির ওপরে কুকুর নিশ্বাস ফেলছে—চড়ুই-পাখীর ওপরে বন্য বিড়াল থাবা তুলেছে—সব-কিছুর জন্য ধন্যবাদ! ধন্যবাদ! ধরণীর হৃদয়ের এই অবারিত স্তব্ধতার জন্য, তারার—ঐ আধখানা চাঁদের—ধন্যবাদ সব কিছুর জন্য।"

দাঁড়িয়ে শুনি। কেউ নেই। ফের বসে পড়ি।

ধন্যবাদ—এই একাকী রাত্রি, পাহাড়, সমুদ্র ও অন্ধকারের দুর্নিবার স্রোত—আমার আপন বুকের মধ্যে। এই জীবন পেয়েছি বলে ধন্যবাদ—এই যে নিশ্বাস নিচ্ছি অন্তত আজ রাতটি যে বাঁচলাম, ধন্যবাদ—ধন্যবাদ। পুব ও পশ্চিম—শোন তোমরা! যে-নিঃশব্দতা আমার কানে কথা কইছে, এ স্তব্ধতা যেন প্রকৃতির রক্ত! যেন এ-পার থেকে বহুদূরে কে তরী টেনে চলেছে—শেষহীন উত্তরের দিকে—ধন্যবাদ সে-তরীতে আমিই যাত্রী, আমিই!"

স্তব্ধতা। ফার-গাছের শাখা ভেঙে পড়ে।—তাই ভাবি। চাঁদ অনেকটা ওপরে উঠে এসেছে—শেষ রাতে বাড়ি ফিরি।

শীতের দ্বিতীয় রাত্রি—সেই অপূর্ব স্তব্ধতা, সুকোমল শান্তি। গাছে ঠেস দিয়ে বসে ভাবি—তাকিয়ে থাকি।

যন্ত্রচালিতের মতো একটা গাছের দিকে এগিয়ে যাই, চোখের ওপর ঘন করে টুপি টেনে দিই, গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে দাঁড়াই, ঘাড়ের তলায় হাত রেখে। তাকাই আর ভাবি—যে-আগুন করেছিলাম তার শিখা চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, খেয়াল নেই। মুহ্যমান হয়ে খালি আগুন দেখি—আগে পা অবশ শ্রান্ত হয়ে আসে, বসে পড়ি। কি করছি!—আগুনের দিকে এতক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে আছি কেন?

ঈশপ্ মাথা তুলে কি শোনে—কার পদশব্দ যেন; গাছের আড়ালে এভা এসে দাঁড়ায়।

"আজ বিকেলটা খুব খারাপ যাচ্ছে—মনে একটুও সুখ নেই।"—বলি।

সহানুভূতিতে ও কিছু বলে না।

"তিনটে জিনিস আমি খুব ভালবাসি।" বলি—"যে-প্রেম হারিয়েছি, সে প্রেমের স্বপ্ন ভালবাসি, ভালবাসি তোমাকে, আর এই জায়গাটুকুকে।"

"এর মধ্যে সব চেয়ে কা'কে ভালবাস?"

"সেই স্বপ্ন।"

আবার স্তব্ধতা। ঈশপ্ এভাকে চেনে, এক পাশে ঘাড় কাৎ করে ওর দিকে তাকায়। বলি—"রোজ একটি মেয়েকে পথে দেখি, তার প্রেমিকের সঙ্গে বাহুবদ্ধ হয়ে বেড়ায়। আমার দিকে তাকিয়ে মেয়েটি হেসে উঠল—আমি পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম কি না।"

"কেন হাসল?"

"জানি না। আমাকে দেখেই হয়ত। কেন জিগ্গেস করছ?"

"তুমি চেন তাকে?"

"হ্যাঁ, আমি নমস্কার করলাম।"

"আর, ও তোমাকে চেনে না?"

"না, এমন ভাব দেখাল যেন চেনে না।...ওখানে বসে তুমি আমার মনের সব কথা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে বা'র করবে নাকি? তার নাম তোমাকে কিছুতেই বলব না।"

চুপচাপ।

ফের বলি—"কি দেখে হাসছিল? ও একটা ফ্লার্ট।—আমি ওর কি ক্ষতি করেছি?"

"তোমাকে দেখে ও হেসেছিল—ও খুব নিষ্ঠুর।" এভা বলে।

"না, নিষ্ঠুর নয়। কেন তুমি তাকে নিন্দা করছ? কোনোদিন ও কঠিন হয়নি, ও যে আমার দিকে চেয়ে হেসেছে—সে ওর দয়া, ওর অধিকার আছে। চুপ কর, যাও এখান থেকে, আমাকে একা থাকতে দাও। শুনছ?"

এভা ভয় পেয়ে চলে যায়। অনুতাপ হয়, ওর কাছে বসে পড়ে বলি—"বাড়ি যাও এভা—তোমাকেই, তোমাকেই আমি ভালবাসি। লোকে কখনো স্বপ্ন ভালবাসে? তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করছিলাম এতক্ষণ। কিন্তু এখন বাড়ি যাও লক্ষ্মীটি, কাল আমিই তোমার কাছে যাব—মনে রেখো, আমি তোমারই। ভুলো না—বিদায়!"

এভা বাড়ি চলে যায়।

শীতের তৃতীয় রাত্রি—নিদারুণ। আলো জ্বালি।

"এভা, কেউ চুল ধরে যদি হেঁচড়ে টেনে নেয়, বেশ লাগে এক-এক সময়। কি সহজেই মানুষের মন দুমড়ে দেওয়া যায়! পাহাড়, মাঠ—সমস্ত কিছুর উপর দিয়ে মানুষকে চুলে ধরে টেনে নিয়ে যাওয়া যায়—যদি কেউ শুধোয়—কি হচ্ছে? সে আনন্দে বলে ওঠে: 'আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে চুলে ধরে।' যদি কেউ বলে: 'তোমাকে রক্ষা করব?' সে জবাব দেয়: 'না।' যদি তারা বলে: 'কি করে এ যন্ত্রণা সইছ?' সে বলে: 'আমি সইতে পারি, যে-হাত আমাকে চুলে ধরে টানছে সেই হাতকেই আমি ভালবাসি।' এভা, জান—আশা করে চেয়ে থাকায় কী সুখ?"

"জানি বোধ হয়।"

"চমৎকার এই আশা—ভারি অদ্ভুত! ধর, একদিন ভোরবেলা পথে বেরুলে; আশা—তার সঙ্গে তোমার দেখা হবে। তার সঙ্গে তোমার দেখা হয়?—হয় না। কেন হয় না? কেননা সে হয়ত সেই ভোরবেলা কোনো কাজে ব্যস্ত আছে।...

একদিন পাহাড়ে আমার এক বুড়ো অন্ধ ল্যাপ্-এর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল—আটান্ন বছর ধরে ও চোখে কিছু দেখেনি, তখন তার বয়স সত্তর। ওর মাথায় কি করে যেন ঢুকেছে যে, আস্তে-আস্তে ও একটু-একটু করে চোখের দৃষ্টি ফিরে পাচ্ছে। যদি এমনি উন্নতি হতে থাকে তবে ও কয়েক বছরের মধ্যেই সূর্যকে আবিষ্কার করে ফেলবে। ওর চুল এখনো কালো, কিন্তু চোখ একেবারে সাদা। ওর ছোট্ট ঘরটিতে গিয়ে বসে তামাক খেতাম, অন্ধ হবার আগে যত জিনিস ও দেখেছিল সব কিছুর গল্প করত। ওর আশা এখনো অটুট আছে, যেমন অটুট ওর স্বাস্থ্য। আমাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বলত—'এই দক্ষিণ, আর এই উত্তর। এই পথ ধরে চল, বরাবর খানিকটা এগিয়ে ঐ দিকে বেঁকে যেয়ো।' বলতাম—'ঠিক।' বুড়ো খুশি হয়ে হেসে বলত—'নিশ্চয়, চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগে কিছু ঠাহর হত না;—একটু-একটু করে চোখে এখন আলো আসছে।' এই বলে নীচু হয়ে তেমনি ওর ছোট্ট ঘরটিতে গিয়ে ঢুকত—ছোট্ট ঘরটি ওর। আগুনের পাশে গিয়ে আস্তে বসত—মনে সেই আশা, কয়েক বছর বাদেই ও একেবারে ভালো হয়ে যাবে, আকাশ ওর দিকে চেনা বন্ধুর মতো চেয়ে অভিবাদন জানাবে…এভা, আশা জিনিসটা সত্যিই কি মজার! ধর, এইখানে আমি বসে আছি, আর ভাবছি যাকে সত্যিই আজ রাস্তায় দেখিনি, তাকে যেন ভুলে যাই।"

"কি যে মাথামুণ্ডু বলছ!"

"কাল আমি একেবারে বদলে যাব দেখবে। আজ আমাকে একা থাকতে দাও। কাল হতে তুমি আমাকে চিনবেই না—কাল হাসব, তোমাকে চুমু খাব। শুধু আজকের এই রাতটা, তারপর আমি একেবারে তোমার। আর কয়েক ঘণ্টা মোটে বাকি। শুভরাত্রি, এভা।"

"শুভরাত্রি।"

একটি শুকনো ডাল ভেঙে পড়ে। অতলস্পর্শী সমুদ্রের মতো এই রাত্রি। চোখ বুজি।

একঘণ্টা বাদে আমার সমস্ত শিরা-উপশিরা যেন ছন্দে দুলে ওঠে—আমি যে এই বিস্তৃত স্তব্ধতার সঙ্গে এক সুরে অনুরণিত হচ্ছি। ভাঙা চাঁদের পানে তাকাই—ওর প্রতি পরম অনুরাগ অনুভব করি, আমি যেন প্রথম প্রেমের ব্রীড়ায় সঙ্কুচিত হচ্ছি—এমনি মনে হয়। "ঐ আমার চাঁদ" ধীরে বলি—"আমার সুধাংশু।" ওর দিকে চেয়ে-চেয়ে হৃদয় আবেগে স্পন্দিত হয়। হঠাৎ পথচারী বাতাস আসে—

বলে উঠি—কে ? কেউ না। বাতাস আমাকে ডাকে, আমার প্রাণ শব্দ করে ওঠে—মনে হয় যেন অতীত পরিচয়ের সব বন্ধন কাটিয়ে কোন্ অদৃশ্য মহানিঃশব্দ-তার মধ্যে এসে পড়েছি—আমার চোখ ভিজে ওঠে—কাঁপি—ঈশ্বর আমার সামনে দাড়িয়ে আমাকে দেখছেন। আবার বিদেশী বাতাস বিদায় নেয়—মনে হয় কে যেন বনের মধ্য দিয়ে নিঃশব্দে চলে যাচ্ছে…

দারুণ শ্রান্তি বোধ হয়, ঘুমিয়ে পড়ি।

কী অতন্দ্র বেদনায় জ্বলছিলাম ?

যাক, কেটে গেছে।

শরৎ এসেছে। কি চঞ্চলপদেই গ্রীষ্ম বিদায় নিল ! বেশ ঠাণ্ডা পড়ে এসেছে, বনে গান গাই, গুলি ছুঁড়ি, মাছ ধরি। এক-এক দিন সমুদ্র থেকে প্রগাঢ় কুয়াশা ভেসে আসে—নিবিড় অন্ধকার। একদিন ত বনের মধ্যে পথ হারিয়ে ডাক্তারের বাড়ি এসে উঠলাম। ঢের লোক ছিল—মেয়েদের আগে দেখেছি—ছোকরারা নাচছে—পাগলা-ঘোড়ার মতো।

একটা গাড়ি এসে দোরের কাছে থামল। গাড়িতে এড্ভার্ডা। আমাকে দেখে একেবারে চমকে উঠেছে।

আমি বললাম—"যাই।"—ডাক্তার আমাকে যেতে দেবে না।

এড্ভার্ডা আমাকে দেখে যেন বিরক্ত হয়েছে, আমার কথা বলবার সময় ও চোখ নামিয়ে নিল;—পরে অবশ্যি কথা কইলে, এমন কি সেধে দু'একটা প্রশ্নও করলে। ভারি ম্লান মুখখানা—ওর মুখে কুয়াশা লেগে আছে। গাড়ি থেকে নামল না।

"আমি একটা খবর দিতে এসেছি।" ও বললে—"গির্জেয় গেছলাম, কাউকে পেলাম না সেখানে, তোমাদের এতক্ষণ ধরে খুঁজছি। কাল আমাদের ওখানে ছোট-খাটো একটা পার্টি হবে—আসছে সপ্তাহে ব্যারন্ চলে যাচ্ছে—আমার ওপর নিমন্ত্রণ করার ভার। নাচও হবে;—কাল, বিকেলে।"

সবাই ওকে ধন্যবাদ জানালে।

আমাকে বললে ও—"তুমি কিন্তু আবার গা-ঢাকা দিয়ো না। শেষ মুহূর্তে এক চিঠি পাঠিয়ো না যেন—যেতে পারব না, ক্ষমা কোরো। ও সব চলবে না।"—এ-কথা ও আর কাউকে বললে না। খানিকবাদে গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেল।

এই অপ্রত্যাশিত দেখায় মন গোপনে কী অপরিমেয় আহ্লাদে ভরে। গেছে

ডাক্তার ও তার অতিথিদের থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ি চললাম। কি অপার করুণা ওর—অনির্বচনীয়। কি করে এর প্রতিদান দেব? আমার দুই হাত অসহায় লাগছে—মধুর অবসাদে ভরে উঠেছে। ভাবি, এইখানে দাঁড়িয়ে আমি, আনন্দে আমার সর্বাঙ্গ শিথিল হয়ে এসেছে—এই নিরুপায় আনন্দের প্রাবল্যে চোখে আমার অশ্রু দুল্‌ল। কি করব বলতে পার?

বাড়ি ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। একটা জেলের সঙ্গে দেখা; শুধোলাম—"ডাকের জাহাজ কাল আসবে?"

ডাকের জাহাজ আসছে হপ্তার আগে আসছে না।

আমার সব চেয়ে যেটা ভালো জামা সেটা বেছে নিয়ে পরিষ্কার করতে বসলাম—একেবারে চক্‌চকে করে তুলেছি। মাঝে-মাঝে ছেঁদা হয়ে গেছে, সেলাই করতে বসলাম।

তারপর বিছানায় শুলাম একটু—একটুখানি শুধু। হঠাৎ কি মনে হতেই একেবারে লাফিয়ে উঠে মেঝের ওপর এসে দাঁড়ালাম। ছল—সমস্ত ছল! সেখানে যদি আমি গিয়ে না পড়তাম, তাহলে কখনো ও আমাকে নিমন্ত্রণ করত না। আর, ও ত আমাকে স্পষ্ট করে বলেই দিয়েছে যেন শেষ মুহূর্তে ওকে একটা চিঠি পাঠাই—কোনো ছুতো করে যাওয়া বন্ধ রাখি…

সারা রাত ঘুম হ'ল না, ভোরবেলা বনে চলে এলাম—

শীতার্ত, নিদ্রাহীন। আবার পার্টি! তাতে কি? আমি যাবও না, চিঠিও পাঠাব না। ম্যাক্ বেশ সমঝদার লোক—ব্যারনের জন্যই এই পার্টি। কিন্তু আমি যাচ্ছি না, ঠিক জেনো।

চরাচরব্যাপী কুজ্ঝটিকা। মাঝে-মাঝে বাতাস এসে ঘুমন্ত কুয়াশা দুলিয়ে দিয়ে যায়।

সন্ধ্যা; অন্ধকার হয়ে আসছে—কুয়াশায় সব ডুবে গেছে—কে পথ দেখাবে, রোদের একটি টুকরোও নেই কোথাও! তাড়াতাড়ি নেই, আস্তে-আস্তে বাড়ি চলেছি। ভুল পথ ধরলাম বুঝি বনে—অচেনা জায়গায় এসে পড়েছি। গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে বন্দুকটাকে দাঁড় করিয়ে রেখে কম্পাসটা দেখি। পথ ঠিক ঠাহর করে পা চালাই।

কি-একটা কাণ্ড হয়ে গেল—

কুয়াশার মধ্যে কি বাজনা শুনতে পাচ্ছি—আমি কোন্‌খানে? সিরিল্যাণ্ড-এ এসে পড়েছি যে। যে-পথ এতক্ষণ এড়িয়ে চলছিলাম, আমার কম্পাস কি আমাকে সেই

পথই দেখিয়ে দিল? কে চেনা গলায় আমাকে ডাকে—ডাক্তার। বাড়ির ভেতরে যেতে হয়।

হায়, আমার কম্পাসটা নষ্ট হয়ে গেছে···অদৃষ্ট!

সারা সন্ধ্যা ধরেই ভাবছিলাম পার্টিতে না এলেই ভালো ছিল। আমি যে এসেছি, কেউ একবার চেয়েও দেখল না—এত ব্যস্ত সবাই; এড্‌ভার্ডা একটু অভিনন্দন করলে না পর্যন্ত। খুব করে মদ খেতে লাগলাম; আমাকে কেউ চায় না এরা—তবু চলে গেলাম না।

ম্যাক্ বেশ অমায়িক, খুব হাসছে—সুন্দর সেজেছে। একবার এ-ঘরে আরেকবার ও-ঘরে—এমনি ছুটোছুটি করছে, অভ্যাগতদের সঙ্গে ফস্টি-ইয়ার্কি করছে, মাঝে-মাঝে একটু নাচছেও। ওর দুই চোখের তলায় যেন কি একটা লুকোনো ইশারা।

সমস্ত ঘরটার মধ্যে গান ও বাজনার জোয়ার চলেছে। বড় নাচঘরটা ছাড়া আরো পাঁচটা ঘর এই সব নিমন্ত্রিতদের দিয়ে একেবারে ঠাসা। আমি যখন এসে পৌঁছুলাম, রাতের খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। পরিচারিকারা মদের গ্লাশ আর চুরুট নিয়ে ছুটোছুটি করছে—কিছুরই অভাব নেই। বাতিদানে নতুন বাতি জ্বলছে।

এভা রান্নাঘরে থেকে সাহায্য করছিল বুঝি—একবার ওকে দেখলাম। এভা পর্যন্ত এখানে!

ব্যারন্-এর ওপরেই সবাইর চোখ—যদিও আজ ও বেশ নম্র—বেশি চাল দিচ্ছে না, এড্‌ভার্ডার সঙ্গে খুব বকছে, চোখে-চোখে রাখছে, আত্মীয়ের মতো সম্বোধন করছে, —মদও খেল দুজনে। ওর প্রতি তেমনি বিতৃষ্ণা অনুভব করছি, কঠিন ও কটু দৃষ্টি নির্মল না করে ওর দিকে তাকাতে পারছি না। কিছু জিগ্‌গেস করলে দু'এক কথায় জবাব দিচ্ছি।

সে-সন্ধ্যার একটা কথা আজো মনে আছে। একটি মেয়ের সঙ্গে কথা কইছিলাম—কোনো গল্পই বলছিলাম হয়ত—শুনে ও হাসছিল। হাসবার মতো বিশেষ কিছুই নয়—তবু ব্যাপারটাকে এমন ভাবে বলছিলাম যে ও হেসে উঠেছিল—মনে নেই সে-কথা। যাই হোক, চোখ ফিরিয়ে দেখি পেছনে এড্‌ভার্ডা। ও যেন আমাকে চিনতে পেরেছে—এতক্ষণে।

তারপরে দেখলাম ও সেই মেয়েটিকে টেনে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—আমি ওকে কি

বলেছি! সমস্ত সন্ধ্যা অস্থির হয়ে এ-ঘর থেকে ও-ঘর করে এখন এড্‌ভার্ডার এই ভীতু চাহনিটি পেয়ে যে কত সুখী হলাম কেমন করে বলব? মন খুব ভালো লাগল, কত জনের সঙ্গে কত কথা কইলাম!

বাইরে সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে ছিলাম। এভা কি নিয়ে যেন ও-ঘরে যাচ্ছিল। আমাকে দেখেই এগিয়ে এসে তাড়াতাড়ি আমার হাতটা ছুঁয়ে হেসে চলে গেল। একটিও কথা হ'ল না। যেই ওর পেছনে যাচ্ছিলাম—বারান্দায় এড্‌ভার্ডা—আমাকে দেখছে। ও-ও কিছু বললে না। ঘরের মধ্যে গেলাম।

হঠাৎ এড্‌ভার্ডা জোরে বলে উঠল—"লেফ্‌টেনেন্ট গ্লাহ্‌ন সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে চাকর-বাকরদের সঙ্গে রসিকতা করে!" কেউ-কেউ শুনল। যেন ঠাট্টা করে বলছে, তাই ও হাসল একটু, কিন্তু বিবর্ণ ওর মুখ।

এর কিছু প্রতিবাদ করলাম না, শুধু আবছা গলায় বললাম—"হঠাৎ দেখা হয়ে গেল—ও আসছিল, বারান্দায় হঠাৎ..."

কিছুক্ষণ কাটল, এক ঘণ্টা হয়ত। একটি মহিলা তাঁর পোশাকের উপর একটা মদের গ্লাশ উল্টে ফেলে দিলেন। যেমনি দেখা, এড্‌ভার্ডা চেঁচিয়ে উঠল—"কি হ'ল? গ্লাহ্‌ন নিশ্চয়ই ফেলে দিয়েছে।"

'মোটেই নয়'—গ্লাহ্‌ন তখন ঘরের আরেক কোণে বসে গল্প করছে।

ব্যারন্ মেয়েদের নিয়ে খুব মেতেছে—ওর জিনিস-পত্র সব প্যাক্ করা হয়ে গেছে, তাই সেগুলো দেখাতে পারা গেল না বলে ওর আপশোষের অন্ত নেই—শ্বেত-সাগরের আগাছা, কোরহোলমার্ণ-এর মাটি—সমুদ্রের তলা থেকে কত রকম পাথর! মেয়েরা কৌতূহলী হয়ে ওর জামার বোতাম দেখছে—পাঁচমুখ-ওয়ালা রাজমুকুট—ও ব্যারন্‌ই বটে। ডাক্তার কিন্তু চুপচাপ বসে আছে—খালি মাঝে-মাঝে এড্‌ভার্ডার ভাষার ভুল ধরছে।

এড্‌ভার্ডা বললে—"যদ্দিন না আমি মরণের দেশ পেরিয়ে যাই।"

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলে—"কি পেরিয়ে?"

"মরণের দেশ!—তাই কি বলে না?"

"আমি ত শুনেছি মরণের নদী। তুমি কি তাই বলতে চাও?"

দরজার পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি। এক শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে ভাব করে আলাপ শুরু করি—যুদ্ধের কথা, ক্রিমিয়ার অবস্থা, ফ্রান্সের ঘটনা, সম্রাট হিসাবে নেপোলিয়ঁ, —মহিলাটি সব খবর রাখে—আমাকে বহু খবর দিলে। একটা সোফায় বসে দুজনে গল্প করি।

এড্‌ভার্ড আসে, আমাদের সমুখে দাঁড়ায়। হঠাৎ ও বলে—"তুমি আমাকে মাপ কর, লেফ্‌টেনেণ্ট। আমি ও-রকম কাজ আর করব না।"

একটু হাসল, আমার দিকে যদিও চাইল না।

বললাম—"জোমফ্রু এড্‌ভার্ডা, চুপ কর।"

আবার ওর চোখ কুটিল হয়ে উঠেছে। বললে—"রান্নাঘরে যাচ্ছ না যে? এভা সেখানে আছে—তোমার সেখানে যাওয়া উচিত।"

ওর চোখে কী ঘৃণা!

"তোমার কি একটুও ভয় হচ্ছে না যে তোমার কথার মানে লোকে অন্য ভাবে নেবে ভুল বুঝবে?"

"কি করে?—হয়ত, কিন্তু, কি করে আর অন্য অর্থ হবে তার?"

"না বুঝে-শুঝে কি-সব বাজে বক্‌ছ তুমি! যেন তুমি আমাকে সত্যি-সত্যিই রান্নাঘরে যেতে বলছ, লোকে হয়ত তাই ভাববে, কিন্তু তা ত নয়—তুমি ত এত অবুঝ নও।"

চলে গেল—আবার এসে বললে—"কিছুই ভুল বুঝবার নেই লে্‌ফটেনেণ্ট—ঠিকই শুনেছ তুমি, আমি তোমাকে সত্যি-সত্যিই রান্নাঘরে যেতে বলছি।"

"একি এড্‌ভার্ডা!" শিক্ষয়িত্রী চেঁচিয়ে উঠেছে।

আবার আমরা যুদ্ধ ও ক্রিমিয়ার অবস্থা নিয়ে গল্প শুরু করলাম। সব কেমন যেন গুলিয়ে গেছে—যেন মাটিতে কোথাও অবলম্বন নেই। সোফা ছেড়ে উঠে চলে যাচ্ছিলাম, ডাক্তার এসে বাধা দিল।

বললে—"এতক্ষণ তোমার প্রশংসা শুনছিলাম।"

"প্রশংসা? কার কাছে?"

"এড্‌ভার্ডা প্রশংসা করছিল। ঐ কোণে দাঁড়িয়ে ও তোমাকে দীপ্ত মুগ্ধ চোখে দেখছে। সেই চোখ আমি ভুলব না—প্রেমে পরিপূর্ণ দুটি চোখ! জোরে বলছিল পর্যন্ত যে, ও তোমাকে ভালবাসে।"

"বেশ, বেশ! হেসে বললাম।...সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

ব্যারন্‌-এর কাছে গিয়ে নীচু হয়ে ওর কানে-কানে কিছু বলতে চাইলাম—আর যেই ওর কানের কাছে মুখ এনেছি, এক গাদা থুতু ছিটিয়ে দিলাম। ও লাফিয়ে উঠে আমার দিকে বোকার মতো তাকিয়ে রইল। পরে দেখলাম এই কথা আবার এড্‌ভার্ডাকে বলছে—এড্‌ভার্ডার মুখ ঘৃণায় কুঞ্চিত হয়ে গেছে! ওর হয়ত তখন মনে পড়ছিল সেই ওর জুতো জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম, সেই গ্লাশ

বাটিগুলো ভেঙে ফেলেছিলাম—নিশ্চয়ই ভাবছিল সে-সব! ভারি লজ্জিত বোধ করছিলাম—যে-দিকে ফিরি সেই দিকেই বিরক্ত ও বিস্মিত চোখ আমার পানে চেয়ে আছে। বিদায় বা ধন্যবাদ কিছুই না জানিয়ে চুপে-চুপে সিরিল্যাণ্ড থেকে পিট্টান দিলাম।

ব্যারন্ চলে যাচ্ছে—বেশ ভালো কথা। আমি আমার বন্দুক নিয়ে পাহাড়ে গিয়ে এড্ভার্ডার আর ওর সম্মানে একটা গুলি ছুঁড়্ব। একটা পাহাড়ের গায়ে ফুটো করে পাহাড়টাকে উড়িয়ে দেব—ওর আর এড্ভার্ডার সম্মানে। যেই জাহাজ পাল তুলে চলতে শুরু করবে অমনি একটা পাহাড়ের টিপি গড়িয়ে এসে সমুদ্রে আছড়ে পড়ে ভীষণ শব্দ করে উঠবে। আমি জানি, কোন্খান থেকে পাহাড়ের টিপি সোজা সমুদ্রের মধ্যে গড়িয়ে আসে—দিব্যি রাস্তা হয়ে গেছে। নীচে একটি ছোট নৌকোঘর।

কামারকে বলি—"আরো দুটো পাহাড় বিঁধবার স্ঁচ চাই।"

কামার তৈরী করতে বসে যায়।

এভা ম্যাক্-এর একটা ঘোড়া নিয়ে কারখানা থেকে জাহাজঘাটের মধ্যে খালি ছুটোছুটি করছে। ওকে মুটে-মজুরের কাজ দেওয়া হয়েছে—ময়দার বস্তা নিয়ে বেড়ানো। ওর সঙ্গে দেখা—তাজা চোখের কি মিষ্টি চাহনি! কি সুস্নিগ্ধ ওর হাসি! রোজ সন্ধ্যায়ই ওর সঙ্গে দেখা হয়।

"তোমাকে দেখে মনে হয় এভা, তোমার মনে কোনো দুঃখ নেই। তুমি আমার প্রিয়া।"

"তোমার প্রিয়া! আমি অশিক্ষিতা—তাহলেও আমি তোমার বাধ্য থাকব চিরকাল। ম্যাক্ দিন-কে-দিন ভারি কড়া হচ্ছে, কিন্তু আমি তা কেয়ার করি না। মাঝে-মাঝে দারুণ খাপ্পা হয়ে ওঠে, কিন্তু আমি কোনো কথারই জবাব দিই না। একদিন আমার হাত ধরে শাসিয়েছিল। শুধু একটা চিন্তাই আমাকে পীড়া দেয়।"

"কি?"

"ম্যাক্ তোমাকে ভয় দেখায়। আমাকে বলে: 'তোমার মাথায় কেবল লেফ্‌টেনেণ্ট ঘুরে বেড়াচ্ছে।' বলি: 'হ্যাঁ, আমি তার।' তখন সে বলে: 'আচ্ছা, দাঁড়াও,—শিগ্‌গিরই ওকে তাড়াচ্ছি।' কাল-ই এ কথা বলেছিল!"

"বলুক গে—দেখাক ভয়।...এভা, তোমার পা দুটি আরেকবার দেখতে দেবে?—সেই ছোট্ট দুখানি পা। চোখ বুজে থাক, আমি দেখি।"

চোখ বুজে ও আমার ঘাড়ের ওপর মুখ রাখে। কাঁপে। ওকে বনে নিয়ে যাই। ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝিমোয়।

পাহাড়ে বসে পাহাড় খুঁড়ি। স্বচ্ছ শরৎ আমাকে বেষ্টন করে হাসছে। আমার পাহাড় ভাঙবার শব্দ বেজে চলেছে। ঈশপ্ আশ্চর্য হয়ে আমার মুখের দিকে তাকায়। হৃদয় সান্ত্বনায় ভরা—কেউ জানে না যে এই নির্জন পাহাড়ের ওপর একা বসে আছি।

উড়ো-পাখীরা বিদায় নিয়েছে—সুখে উড়ে এসেছিল; আবার ফিরে আসবে বলে তোমাদের অভ্যর্থনা করছি। সব মধুরতর লাগছে;—একটা ঈগল দুই ডানা বিস্তৃত করে পাহাড়ের ওপর উড়ে চলেছে।

সন্ধ্যা। হাতুড়িটা ফেলে রেখে একটু জিরোই। আবছায়া—উত্তরে চাঁদ ওঠে, প্রকাণ্ড ছায়া ফেলে পাহাড়গুলি স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।—পূর্ণিমা; যেন একটা উজ্জ্বল দ্বীপ—অবাক হয়ে চেয়ে থাকি। ঈশপ্ও চঞ্চল হয়ে ওঠে।

"কি ঈশপ্? আমি না হয় বেদনায় শ্রান্ত;—আমি তা ভুলে যাব একদিন, নিশ্চয়ই। চুপ করে শুয়ে থাক, ঈশপ্। আমিও চুপ করে থাকব। এভা আমাকে শুধোয়: 'তুমি আমার কথা মাঝে মাঝে ভাব?' বলি: 'সব সময়।' এভা আবার বলে: 'আমাকে ভাবতে তোমার ভালো লাগে?' বলি: 'সব সময়েই ভালো লাগে।' এভা বলে: 'তোমার চুলে পাক ধরেছে।' বলি: 'হাঁ, পাক ধরতে শুরু করেছে।' এভা বলে: 'নিশ্চয়ই তোমার মাথায় কিসের চিন্তা—তাই।' বলি: 'হতে পারে।' তারপর এভা বলে: 'তাহলে তুমি আমার কথাই খালি ভাব না...' ঈশপ্, চুপ করে থাক—তোমাকে আর একটা গল্প বলছি..."

হঠাৎ ঈশপ্ দাঁড়িয়ে উঠে জোরে নিশ্বাস ফেলে, আমার জামা ধরে টেনে নিয়ে চলে। উঠে পড়ি। বনের মধ্যে আকাশে রক্তের আভা দেখে শিউরে উঠি। জোরে পা ফেলে চলি—সমুখে দেখি, ভীষণ আগুন। স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে থাকি···আরো একটু এগোই—আমার কুঁড়ে ঘরে আগুন লেগেছে।

এই আগুন লাগানো নিশ্চয়ই ম্যাক্-এর কাজ—গোড়া থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম। সব পুড়ে গেল—আমার পাখীর বাসা, পাখীর পালক, হরিণের চামড়া—সব। কি আর করব এখন? খোলা আকাশের তলে শুয়ে দুই রাত্রি কাটাই, আশ্রয় খুঁজতে

কোথাও যাই না, সিরিল্যাণ্ড-এও নয়। শেষে একটা প'ড়ো জেলে-বাড়ি ভাড়া করলাম। রাস্তার ওপর শুয়ে ঘুমোই। আর কি—আমার অভাব মিটে গেছে।
এড্‌ভার্ডা একদিন সংবাদ পাঠাল যে, আমার বিপদের কথা শুনে ও দুঃখিত হয়েছে—ওর বাবার হয়ে সিরিল্যাণ্ড-এ আমাকে একখানা ঘর ছেড়ে দিচ্ছে। এড্‌ভার্ডার মনে লেগেছে! দয়ালু এড্‌ভার্ডা। কোনো জবাব দিলাম না। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আমি আর আশ্রয়হীন নই—এড্‌ভার্ডাকে চিঠি দিলাম না ভেবে খুব গর্ব অনুভব করছি। রাস্তায় ওকে হঠাৎ দেখলাম, সঙ্গে ব্যারন্—বাহুতে বাহু বেঁধে বেড়াচ্ছে দুজন। ওদের দুজনের মুখের দিকে চেয়ে নমস্কার করলাম।
এড্‌ভার্ডা থেমে জিজ্ঞাসা করলে: "তাহলে আমাদের সঙ্গে তুমি থাকবে না?"
"নতুন জায়গা পেয়েছি, সেইখানেই আছি বেশ।" বললাম।
ও আমার মুখের দিকে তাকাল, ওর বুক দুলছে।—"আমাদের কাছে এলে তোমার কিছু ক্ষতি হত না হয়ত।"
ধন্যবাদ তোমাকে, এড্‌ভার্ডা। কিন্তু কথা বলতে পারছিলাম না।
ব্যারন্ আস্তে আস্তে হাঁটছে।
এড্‌ভার্ডা বললে—"তুমি বুঝি আমার সঙ্গে আর দেখা করতে চাও না।"
"আমার ঘর পুড়ে গেছে শুনে তুমি আমাকে আশ্রয় দিতে চেয়েছ, তর জন্য তোমাকে ধন্যবাদ, এড্‌ভার্ডা। তোমার বাবা বিমুখ হ'লেও তোমার এই করুণা অতুলনীয়।" টুপি তুলে ওকে ধন্যবাদ জানালাম।
হঠাৎ ও বললে—"তুমি কি আমার মুখ আর দেখবে না গ্লাহ্ন?"
ব্যারন্ ওকে ডাকছে।
বললাম—"ব্যারন্ তোমাকে ডাকছেন, যাও।" আবার সসম্ভ্রমে টুপি তুললাম।
আবার পাহাড়ে চলে এসেছি, আবার গর্ত করছি। কিছুতেই আর আত্মসংযম হারাচ্ছি না। এভার সঙ্গে দেখা হ'ল। চেঁচিয়ে উঠলাম: "কি বলেছিলাম তখন? ম্যাক্ আমার কি করতে পারে? আমার ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে, আবার ঘর পেয়েছি…"
এভা একটা আলকাতরার গামলা নিয়ে যাচ্ছিল। "কি খবর, এভা?"
ম্যাক্ তার নৌকোয় আলকাতরা লাগাতে ওকে হুকুম করেছে। ওর ওপর লোকটা ভারি চোখা চোখ রাখছে—ওর সমস্ত কথা শুনতেই ও বাধ্য।
"কিন্তু ঐ নৌকোঘরের মধ্যে কেন? জাহাজঘাটে হ'লেও ত পারত।" বললাম।
"ম্যাক্ তাই যে বলেছে, নৌকোঘরে…"
"এভা, এভা, তোমাকে ওরা দাসী বানিয়েছে, তুমি একটুও অভিযোগ কর না?

তুমি হাসছ, তোমার হাসিতে কি অপূর্ব মাদকতা—কিন্তু তবু, তুমি ওদের দাসী।”

খুঁড়ছি—হঠাৎ কি দেখে তাক লেগে যায়! কে যেন এখানে এসেছিল;—পায়ের চিহ্নগুলি পরীক্ষা করি—এ যে ম্যাক্-এর লম্বা-মুখো জুতোর দাগ। ও এখানে কেন এসেছিল? চারদিকে তাকালাম—কেউ নেই।

আবার হাতুড়ি পিটিয়ে শাবল দিয়ে গর্ত করতে লাগলাম। স্বপ্নেও ভাবিনি—

ডাকের জাহাজ এসে গেছে। আমার ইউনিফর্মটা এনেছে নিশ্চয়ই। এই জাহাজে চড়েই ব্যারন্ তার মালপত্র নিয়ে পাড়ি দেবে। এখন বস্তাতে বোঝাই হচ্ছে, বিকেলেই নোঙর তুলবে।

বন্দুক নিই—প্রত্যেকটা পিপেয় বারুদ বোঝাই করি। ঠিক হয়েছে, মাথা নাড়ি। পাহাড়ে গিয়ে গর্তগুলিও বারুদ দিয়ে ভর্তি করি। সব তৈরি। চুপ করে প্রতীক্ষা করি।

অনেকগুলি ঘণ্টা কেটে যায়। জাহাজের চাকা ঘুরছে দেখতে পাই; সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। জাহাজের বাঁশি বেজে ওঠে, এই ছাড়ল বুঝি। আরো কয়েকটা মুহূর্ত অপেক্ষা করতে হবে—চাঁদ এখনো ওঠেনি, সন্ধ্যার অন্ধকারের দিকে উন্মাদের মতো আর্ত চোখ মেলে চেয়ে থাকি।

দেশলাই জ্বালি। এক মিনিট কাটে। হঠাৎ প্রচণ্ড একটা গর্জন শোনা যায়—পাথরগুলি টুকরো-টুকরো হয়ে চারিদিকে বিকীর্ণ হতে থাকে—সমস্ত পৃথিবী যেন কেঁপে উঠেছে—যেন সমস্তটা পাহাড় রসাতলে চলেছে। চতুর্দিকে প্রতিধ্বনি ওঠে। বন্দুকটা কুড়িয়ে নিয়ে বারুদভরা পিপে লক্ষ্য করে আবার ছুঁড়ি—দ্বিতীয় বার—সেই আর্তনাদ যেন দিকে-দিকে বিস্তৃত হয়ে পড়ে। যে-জাহাজটা চলে যাচ্ছে তার বিরুদ্ধে সমস্ত পাহাড়গুলি যেন চীৎকার করে উঠেছে। আরো সময় যায়—বাতাস স্তব্ধ হয়ে আসে, প্রতিধ্বনি আর জাগে না, পৃথিবী যেন ঘুমুচ্ছে—এমনি মনে হয়। অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে জাহাজ অদৃশ্য হয়ে যায়।

উত্তেজনায় তখনো কাঁপছি। তাড়াতাড়ি বন্দুক আর শাবল নিয়ে পাহাড় থেকে নেমে যাই—হাঁটু দুটো কাঁপে। সোজা পথ ধরি। ঈশপ্ শুধু মাথা নাড়ছে আর বারুদের গন্ধে হাঁচছে!

নীচে নৌকোঘরের কাছে এসে একেবারে থ হয়ে যাই—চীৎকার করতে পারি না।

একটা নৌকো ভাঙা পাথরের চাপে গুঁড়িয়ে গেছে—এভা, একপাশে এভা পড়ে আছে—একেবারে পিষে গেছে, চেনা যাচ্ছে না। এভা আর নেই।

আর কি লিখব? বহুদিন আর গুলি ছুঁড়িনি। খাওয়া নেই—শুধু চুপ করে বসে থাকি আর ভাবি। এভার মৃতদেহটা ম্যাক্-এর সাদা রং-করা নৌকো করে গির্জায় নিয়ে গেল—গির্জায় গেলাম।

এভা মরে গেছে। তার ছোট মাথাটি তোমাদের মনে আছে—সেই কোঁকড়ানো কোমল চুলে ভরা? এত আস্তে-আস্তে ও আসত, মাথাটি একপাশে হেলিয়ে মৃদু-মৃদু হাসত। মনে আছে সেই হাসিতে কি মাদকতা ছিল! চুপ কর, ঈশপ্! বহুদিনের পুরানো এক আষাঢ়ে গল্প মনে পড়ে, ইসেলিন্-এর সময়কার গল্প—স্টেমার তখন পুরুত।

রাজপ্রাসাদে বন্দী একটি মেয়ে। এক রাজপুত্রকে ভালবাসত। কেন? বাতাসকে শুধোও, তারাকে, জীবনদেবতাকে—এরা ছাড়া আর কে জানে কাকে বলে ভালবাসা? রাজপুত্র ছিল তার বন্ধু, তার প্রিয়তম—সময় যায়···একদিন আরেক-জনকে দেখে রাজপুত্র ভাবলে তাকেই সে ভালবাসে।

সে প্রেমে কি অপূর্ব মদিরতা ছিল। মেয়েটি ছিল ওর জীবনের আশীর্বাদ, ওর মনের বিহঙ্গম···মেয়েটির আলিঙ্গন কি মধুর উত্তাপে ভরা! রাজপুত্র বলত: 'তোমার হৃদয় আমাকে দাও।' মেয়েটি দিত। রাজপুত্র বলত: 'আরো কিছু চাইব?' অসহ্য সুখে মেয়েটি বলত: 'হ্যাঁ।' তাকে মেয়েটি সব দিত···সব; কিন্তু তবু রাজপুত্র ওকে ধন্যবাদ দিত না, কৃতজ্ঞতা জানাত না।

কিন্তু আরেকজনকে সে ভালবাসত বন্দী ভৃত্যের মতো, পাগলের মতো, ভিক্ষুকের মতো। কেন? পথের ধুলোকে শুধোও, যে পাতা ঝরে তাঁকে, জীবনদেবতাকে—এরা ছাড়া আর কে বলবে কাকে বলে ভালবাসা? মেয়েটি ওকে কিছুই দিত না, কিছুই না—তবু মেয়েটিকে সে কত সুস্নিগ্ধ অভিবাদন কত ধন্যবাদ জানিয়েছে। মেয়েটি বলত: 'আমাকে তোমার বুদ্ধি দাও, বন্ধুত্ব দাও।' রাজপুত্র দুঃখিত হত, কেন ও তার জীবন চাইছে না?

মেয়েটি থাকত রাজপ্রাসাদে······

"ওখানে বসে কি কর তুমি? শুধু বসে থাক আর হাস?"

"দশ বছর আগেকার পুরানো কথা ভাবি। তখন তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল।"

"তাকে তোমার এখনো মনে আছে ?

"এখনো।"

সময় যায়।

"তুমি ওখানে বসে কি কর, কুমারী ? কেন বসে থাক, কেন হাস ?"

"একটা কাপড়ে স্থতো দিয়ে তার নাম লিখছি।"

"কার নাম ?—যে তোমাকে এখানে বন্দী করে রেখেছে ?"

"হ্যাঁ, যাকে আমি কুড়ি বছর আগে দেখেছিলাম !"

"তাকে তোমার এখনো মনে আছে ?"

"এখনো।"

আরো সময় যায়।

"ওখানে বসে কি কর, বন্দিনী ?"

"দিনে-দিনে বুড়িয়ে যাচ্ছি···আর সেলাই করবার চোখ নেই। দেয়াল থেকে চুন বালি খসাই, তাই দিয়ে একটা পেয়ালা তৈরী করছি, তাকে উপহার দেব।"

"কার কথা বলছ ?"

"আমার যে প্রিয়তম, যে আমাকে এখানে বন্দী করে রেখেছে !"

"তাই কি তুমি হাস···সে তোমাকে বন্দী করে রেখেছে বলে ?"

"সে এখন কি বলবে তাই খালি ভাবছি। সে হয়ত বলবে : 'দেখ দেখ, আমার প্রিয়া আমাকে একটি পেয়ালা উপহার দিয়েছে—এই বিশ বছরেও সে আমাকে ভোলেনি !' "

আরো সময় কাটে।

"বন্দিনী, এখনো চুপ করে বসে আছ, আর হাসছ ?"

"বুড়িয়ে গেছি, চোখে আর দেখতে পাচ্ছি না। শুধু ভাবছি।"

"যাকে চল্লিশ বছর আগে দেখেছিলে ?"

"যাকে প্রথম যৌবনে দেখেছিলাম। হয়ত চল্লিশ বছর আগেই।"

"সে যে এতদিনে মরে গেছে···তা কি তুমি জান না ? তুমি মলিন, জরাগ্রস্ত ; তুমি কথার উত্তর দিচ্ছ না, তোমার ঠোঁট দুটো সাদা হয়ে গেছে···তুমি আর নিশ্বাস ফেলছ না···"

তাই। বন্দিনী মেয়ের গল্প। দাঁড়াও, ঈশপ্···একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। একদিন মেয়েটি তার প্রিয়তমের গলার স্বর শুনতে পেয়েছিল, সে হঠাৎ নতজানু হয়ে লজ্জায় পুলকিত হয়ে উঠেছিল। এক দিন !

তোমাকে কবর দিচ্ছি, এভা···তোমার কবরের উপর বালিতে বেদনায় চুম্বন করছি। যখনই তোমার কথা ভাবি স্বপ্নে-স্বপ্নে স্মৃতি রঞ্জিত হয়ে উঠে। তোমার হাসির কথা যখন ভাবি, যেন আনন্দে স্নান করে উঠি। তুমি আমাকে সব দিয়েছিলে···বিনামূল্যে···তুমি সৃষ্টির প্রাণবন্ত শিশু ছিলে। কিন্তু যারা আমাকে তাদের একটি দৃষ্টিও উপহার দেয় না, তাদের কথাই আমার মন জুড়ে থাকবে? কেন? শুধোও বৎসরের প্রতিটি দিবস ও রাত্রিকে, সমুদ্রের জাহাজগুলিকে, জীবনদেবতাকে···

একজন বললে···"তুমি আজকাল আর শিকারে যাও না? ঈশপ্ ত বনে খুব ছুটোছুটি করছে···একটা খরগোশের পিছু।"

বললাম···"আমার হয়ে ওটাকে মেরে এস।"

কয়েকদিন গেল। ম্যাক্-এর সঙ্গে দেখা···আমাকে ডাকলে। চোখ বসে গেছে··· মুখ পাঁশুটে। ভাবলাম·· সত্যিই কি আমি আর সবাইর মনের অবস্থা বুঝতে পারি? পারি হয়ত।

নিজেকেই জানি না।

ম্যাক্ সেই দুর্ঘটনার কথা তুললে, সেই পাহাড়-ভেঙে-পড়ার কথা। ভাগ্যের বিড়ম্বনা বই আর কিছুই অপরাধ নেই ওতে।

বললাম···"আমার আর এভার মধ্যে যদি কেউ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিতে চায় এবং কোনো অসদুপায়ে যদি তার সেই দুরভিসন্ধি সিদ্ধ হয়ে থাকে, তবে তার ওপরে ভগবানের অভিশাপ পড়ুক।"

ম্যাক্ সন্দিগ্ধ চোখে আমার দিকে তাকাল। কবরের কথা নিয়ে প্রশংসা করলে। 'কিছুই বাদ যায়নি।'

আমি ওর কথা ঘুরিয়ে নেওয়ার চাতুরীকে প্রশংসা না করে পারি না।

পাহাড়-পড়ার দরুণ যে নৌকোটা চুরমার হয়ে গেছে, তার জন্য ও কিছু ক্ষতিপূরণ চায় না। ওর দয়া।

বললাম···"সেই নৌকো, আলকাতরার বাক্স ও ব্রাসটার জন্যে কিছু চাই না আপনার?"

"না না···কি বলছ পাগলের মতো?" ওর দুই চোখে ঘৃণা।

এভ্‌ভার্ডাকে আর দেখিনি···তিন সপ্তাহ কেটে গেল। হ্যাঁ, একবার শুধু

দেখেছিলাম···দোকানে। রুটি কিনতে গিয়েছিলাম। ও কাউণ্টারের বাইরে দাঁড়িয়ে নেড়ে-চেড়ে কতকগুলি কাপড়ের ছিট দেখছে।

আমি অভিবাদন করলাম, ও শুধু ফিরে তাকাল, কথা কইল না। মনে হ'ল, যতক্ষণ ও আছে, আমার রুটি কেনা হবে না। আমি দোকানির কাছে কিছু বারুদ আর গুলি চাইলাম। ওরা যখন তা মেপে দিচ্ছিল দুচোখ ভরে এড্ভার্ডাকে দেখছিলাম তখন।

ধূসর পোশাক...এখন তা কত ছোট হয়ে এসেছে; বোতামের গর্তগুলো ছেঁড়া... ওর সমতল বুকটা চঞ্চল হয়ে দুলছে। এক গ্রীষ্মেই কত বদল হয়েছে ওর! চিন্তাকুল দুটি ভুরু,···ওর ললাটের প্রান্তে যেন দুটি জীবন্ত রহস্য!···ওর সমস্ত গতিভঙ্গীই এখন মন্থর হয়ে এসেছে। ওর হাত দুটির দিকে তাকালাম, ওর লীলায়িত আঙুলগুলি মনকে আবার দ্রুত নাড়া দিয়েছে।···এখনো ওর কাপড় দেখা শেষ হল না?

ইচ্ছা করছিল ঈশপ্ এসে কাউণ্টারের পিছন থেকে ওর দিকে ধাওয়া করে, তাহলে আমি ঈশপকে একটু বকে ওর কাছে একটু ক্ষমা চাই। তখন কি বলবে ও?

"এই যে আপনার···" দোকানি বললে।

দাম দিলাম, জিনিসগুলি নিয়ে আবার অভিবাদন জানালাম। ও তাকাল, কিন্তু এবারো কোনো কথা কইল না। ভালো, ভালো।—ভাবলাম ও যে ব্যারন্-এর প্রিয়া···

রুটি না নিয়েই চলে গেলাম।

কতদূরে এসে সেই জানলার দিকে তাকালাম। কেউ আমাকে দেখছে না।

তারপর একরাত্রে বরফ নেমে এল, কুঁড়েতে বেজায় শীত। উনুন একটা ছিল বটে, কিন্তু কাঠগুলির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়; জ্বলছিল না। দেয়াল ফুঁড়ে পর্যন্ত ঠাণ্ডা আসছে। শরৎ আর নেই, দিনগুলি ছোট হয়ে এসেছে। দিনের বেলায় সূর্যের কিরণে বরফ একটু গলে বটে, রাত্রে নিবিড় বেদনার মতো আবার তা সঞ্চিত হয়··· জল ঝরে পড়ে। সব ঘাস, সব পোকা মরে গেল।

সমস্ত লোক যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে···দুই চোখে তাদের আলোকের প্রতীক্ষা। বন্দর চুপচাপ···সূর্য অনন্তকালের জন্য সমুদ্রের বিছানায় ঘুমিয়ে পড়েছে।

একটি নৌকোর শব্দ। দাঁড় বেয়ে একটি মেয়ে এল।

"কোথায় ছিলে এতদিন?"

"কোথাও না ত!"

"কোথাও না? আমি তোমাকে চিনি, গত গ্রীষ্মে তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।"

নৌকোটা ভিড়ালো, পারে নেমেই ছুটে এল।

"তুমি ছাগল চরাচ্ছিলে, মোজার ফিতে বাধবার জন্যে নীচু হয়েছিলে···সেই রাত্রি।"

ওর গাল দুটি রাঙা হয়েছে, লজ্জায় একটু হাসছে।

"তুমি রাখালি। আমার ঘরে এস, তোমাকে ভালো করে দেখি একটু। তোমার নাম পর্যন্ত আমি জানি···হেন্‌রিয়েট্!"

কোন কথা না বলেই ও চলে যায়। এই শীত ওকে পর্যন্ত গ্রাস করেছে। ও-ও যেন অচেতন হয়ে গেছে।

এই প্রথম ইউনিফর্মটা পরে সিরিল্যাণ্ড-এ গেলাম। সমস্ত হৃদয় দুলছে।

সব মনে পড়ে···সেই এড্‌ভার্ডা ছুটে এসে সবারই সামনে আমাকে আলিঙ্গন করেছিল। এখন সে আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে এখানে-সেখানে; সমস্ত চুল পেকে গেছে আমার, আমারই দোষ! হ্যাঁ, আমারই দোষ বই কি। আজ যদি ওর পা দুটি ধরে আমার সমস্ত হৃদয় ওর কাছে উজার করে ঢেলে দিই, তাহলে মনে মনে ও আমাকে কী ঠাট্টাই না করে! হয়ত আমাকে একখানা চেয়ার এগিয়ে দেবে, মদ আনাবে···এবং যেই ও আমার সঙ্গে খাবে বলে গ্লাশটা ঠোঁটের কাছে তুলবে, তখুনি বলবে: "লেফ্‌টেনেণ্ট, এতকাল আমরা একসঙ্গে ছিলাম বলে তোমাকে ধন্যবাদ। আমি তা কখনো ভুলব না।" হয়ত আমি একটু খুশি হয়ে উঠব, হয়ত আবার একটু আশা হবে! ও পান করবার একটু ভান করে গ্লাশটা নামিয়ে রাখবে···একটুও না খেয়ে। আর ও যে ভান করছে, তা পর্যন্ত আমার কাছ থেকে লুকোবে না। বরং চেষ্টা করবে, আমি যেন ওর সেই ভান ধরে ফেলতে পারি! ঐ ওর ধরন।

বেশ···শেষ-বিদায়ের দিন ঘনিয়ে আসছে।

রাস্তা ধরে চলতে চলতে ভাবতে লাগলাম···আমার পোশাক ওকে নিশ্চয়ই মুগ্ধ করবে, ঝালরগুলো এখনো নতুন, জ্বলজ্বলে আছে। তলোয়ারটা বারে-বারে মেঝের সঙ্গে ঠোকাঠুকি লেগে ঝন্‌ঝন্ করে উঠবে। যেন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলাম···মনে মনে বললাম···কী-ই বা না হতে পারে? এখনো আশা আছে। মাথা তুলে হাত প্রসারিত করে দিলাম। আর বিনয় নয়···অহঙ্কার! আমি আর কোনো কিছু গ্রাহ্

করি না, যা হবার হবে। নিজের থেকে প্রেমভিক্ষা করবার আর আমার দুর্বলতা নেই। আমাকে ক্ষমা কোরো প্রিয়তমে, আমি আর তোমার পাণিপ্রার্থী নই।

উঠানে ম্যাক্-এর সঙ্গে দেখা; চক্ষু কোটরে সেঁধিয়েছে, মুখ বিবর্ণ।

"চলে যাচ্ছ? সত্যি? ইদানিং তোমার সময় ভালো যাচ্ছিল না। তোমার ঘর পুড়ে গেল।"—ম্যাক্ হাসল।

পরে বললে—"ভেতরে যাও, এড্‌ভার্ডা আছে। তোমাকে এখান থেকেই আমি বিদায় জানিয়ে যাচ্ছি। জাহাজ ছাড়বার আগে ঘাটে তোমার সঙ্গে দেখা হবে।"

মাথা নীচু করে চলে গেল—যেন কি ভাবছে।

এড্‌ভার্ডা নিরালয়ে বসে আছে—কিছু একটা পড়ছে বোধ হয়। আমার দিকে চেয়েই একটু চমকাল—আমার ইউনিফর্মটা ওর চোখে পড়েছে। একটু লজ্জিতও হ'ল, হয়ত বিস্মিতও।

"তোমাকে বিদায় জানাতে এসেছি।" কোনরকমে বললাম যা হোক।

ও তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ল।—"চলে যাচ্ছ? এখুনি?"

"হ্যাঁ, ঘাটে জাহাজ ভিড়লেই।" হঠাৎ ওর হাত চেপে ধরি, দুটি হাতই—আনন্দে সমস্ত শরীর শিথিল হয়ে আসে, ডাকি: "এড্‌ভার্ডা!", আর ওর দিকে চেয়ে থাকি।

একটি মুহূর্ত শুধু! ও তেমনি উদাসীন, পাষাণ। আমাকে বাধা দেয়, নিজেকে গুটিয়ে নেয়। আমি যেন ওর সামনে ভিক্ষুকের মতো দাঁড়িয়ে আছি; ওর হাত ছেড়ে দিই, ও সরে দাঁড়ায়। মনে আছে তখন শুধু যন্ত্রচালিতের মতো বলে যাচ্ছিলাম: "এড্‌ভার্ডা এডভার্ডা!" কতক্ষণ ধরে বলছিলাম জানি না। ও যখন বললে—"কেন ডাকছ? কি বলতে চাও।" তখন কিছুই বলতে পারলাম না।

ও ফের বললে—"তাহলে সত্যিই চলে যাচ্ছ? আগামী বছরে কে তবে আসবে তোমার জায়গায়?"

"আরেক জন। তার জন্য আবার ঘর তৈরি হবে।"

চুপচাপ। ও ওর বই-র জন্য হাত বাড়িয়েছে।

ও বললে—"বাবা বাড়ি নেই বলে আমি দুঃখিত। তিনি এলে তাঁকে বলব যে তুমি এসেছিলে।"

কিছু বললাম না। এগিয়ে গিয়ে ওর একখানি হাত আবার ধরলাম, আবার বললাম—"বিদায়, এড্‌ভার্ডা!"

ও বললে—"বিদায়।"

দোর খুললাম, যেন যাবার জন্যই। ও এরই মধ্যে ফের বই নিয়ে পড়তে বসেছে, সত্যি-সত্যিই পড়ছে, পাতা উল্টোচ্ছে। আমাকে বিদায় দিয়ে ওর বিন্দুমাত্র দুঃখ নেই, ওর কিছুই এসে যায় না।

একটু কাশলাম।

ও পেছনে তাকিয়ে যেন আশ্চর্য হয়ে বললে—"তুমি এখনো যাওনি। ভেবেছিলাম চলে গেছ বুঝি।"

বললাম—"এই যাচ্ছি।"

হঠাৎ ও উঠে আমার কাছে এল। বললে,—"যাবার সময় তোমার কাছে কিছু একটা চাই যা আমার কাছে তোমার অক্ষয় স্মৃতিচিহ্ন হয়ে থাকবে। একটা জিনিস চাইতে ভারি ইচ্ছা হয় কিন্তু সাহস হয় না। তোমার ঈশপ্‌কে দেবে আমাকে?"

স্বচ্ছন্দে বললাম—"হ্যাঁ, দেব।"

"তাহলে কালকে ওকে নিয়ে এসো, কেমন আসবে ত?"

চলে গেলাম।

জানলায় ফিরে চাইলাম। কেউ নেই। সব ফুরিয়ে গেছে…

কুটিরে এই আমার শেষ রাত্রি। সারারাত বসে বসে ভাবলাম, মুহূর্ত গুনলাম, ভোর হতেই আমার শেষ খাবারটুকু তৈরি করলাম। ভারি ঠাণ্ডা দিন।

ও কেন আমাকে কাল নিজে গিয়ে কুকুরটা উপহার দিয়ে আসতে অনুরোধ করল? বিদায়ের অন্তিম ক্ষণে শেষবার ও কি আমাকে কিছু বলতে চায়? আমার ত আশা করবার আর কিছুই নেই। আর, ঈশপ্‌-এর সঙ্গে ও কেমনই বা ব্যবহার করবে?

ঈশপ্‌, ঈশপ্‌ তোমাকে ও নিশ্চয়ই খুব কষ্ট দেবে। আমার ওপর চটে ও তোমাকে মারবে, একটু আদরও করবে হয়ত, কিন্তু বেত মারবে নিশ্চয়ই, কারণ থাক্ বা না থাক্; তোমার সর্বনাশ করে ছাড়বে—

ঈশপ্‌কে নিজের কাছে ডাকলাম, আদর করলাম, আমার আর ওর মাথা দুটো একত্র পাশাপাশি রেখে চুপ করে বসে রইলাম, তারপর বন্দুকটা কুড়িয়ে নিলাম। ও আনন্দে শব্দ করে উঠেছে; ভেবেছে—আমরা এখুনি শিকারে বেরুব বুঝি।

আবার দুজনের মাথা একসঙ্গে রাখি ; আস্তে আস্তে বন্দুকের মুখটা ঈশপ্-এর ঘাড়ের ওপর রেখে ঘোড়া টিপে দিই।

একটা লোক ভাড়া করে আনলাম—ঈশপ্-এর মৃতদেহটা এড্ভার্ডার কাছে নিয়ে যেতে হবে।

বিকেলের দিকে জাহাজ ছাড়বে।

ঘাটে এসে দেখলাম আমার যা-কিছু জিনিসপত্র সমস্তই জাহাজে তোলা হয়েছে। ম্যাক্ আমার হাত ধরে খুব উৎসাহ দিচ্ছিল—দিব্যি আকাশের অবস্থা, পরিষ্কার, —ও-ও যেতে পারলে খুবই খুশি হত না কি।

ডাক্তার এল, সঙ্গে এড ভার্ডা। নিজেকে অত্যন্ত দুর্বল বোধ হচ্ছিল।

"তোমার যাত্রা নিরাময় হোক।" ডাক্তার বললে।

এড্ভার্ডা আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে—"দয়া করে যে-কুকুর পাঠিয়েছ—তার জন্যে ধন্যবাদ।" ঠোঁট দুটো চেপে বললে; ওর দুটি ঠোঁটই সাদা।

ডাক্তার একজনকে জিগ্গেস করলে—"জাহাজ কখন ছাড়বে?"

"এই আধঘণ্টার মধ্যে।"

এড্ভার্ডা চঞ্চল হয়ে একবার এ-দিক আরবার ও-দিক পানে তাকাচ্ছে।

হঠাৎ ও বললে—"ডাক্তার, এবার বাড়ি চল। যার জন্যে এসেছিলাম তা ত হয়ে গেল—আর কি!"

ডাক্তারের দিকে তাকালাম।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে।

বললাম—"বিদায়। প্রত্যেকটি দিনের জন্যে ধন্যবাদ।"

এড্ভার্ডা বোবার মতো আমার দিকে তাকিয়ে রইল! পরে জাহাজের দিকে।

জাহাজে উঠলাম। এড্ভার্ডা এখনো পারে দাঁড়িয়ে আছে। জাহাজে উঠতেই ডাক্তার চেঁচিয়ে উঠল—"বিদায়।"

ফের পারের দিকে তাকালাম। এড্ভার্ডা তখুনি ফিরে তাড়াতাড়ি বাড়ির মুখে চলেছে, ডাক্তারকে ফেলেই। ওই ওকে শেষ দেখলাম।

মন বিমর্ষ হয়ে উঠল।

জাহাজ চলতে শুরু করেছে। ম্যাক্-এর সেই সাইনবোর্ডটা এখনো দেখা যাচ্ছে :

'নূন ও পিপে।' খানিক পরেই মুছে গেল। চাঁদ ও তারারা ভিড় করে এসেছে, দূরে আমার অসীম অরণ্য। ঐ সেই কারখানাটা—ঐ, ওখানে আমার কুটির ছিল, পুড়ে গেল একদিন, ঐখানে বোধহয় সেই প্রকাণ্ড পাথরটা আজো নিঃশব্দে পড়ে আছে। আমার ইসেলিন্, আমার এভা—বিদায়।

সময় কাটাবার জন্য এতটা লিখলাম। সেই নর্ডল্যাণ্ড-এর গ্রীষ্মের কথা ভাবতে কত আনন্দ লাগে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা গুনে যেতাম—সময় কেমন স্বচ্ছন্দে কাটত। সব বদলে গেছে। এখন আর সময় কাটে না।

সময় যেন থেমে গেছে। ভাবতে অবাক হয়ে যাই। আর আমার কিছু চাকরি-বাকরি নেই, রাজার মতো স্বাধীন—লোকের সঙ্গে দেখা হয়, গাড়ি চড়ি; চোখ বুজে আকাশের স্বপ্ন দেখি, চিবুকটা দিয়ে চাঁদকে যেন আদর করি, আর—ভাবি, লজ্জায় ও যেন হাসছে। সব-কিছুই হাসে মনে হয়। মদের বোতল খুলি, স্ফুর্তিবাজ লোকেরা এসে জড়ো হয়।

এড্‌ভার্ডার কথা আর ভাবি না। ওকে ভুলবই বা না কেন? যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, তোমার কোনো দুঃখ আছে? সোজা বলি—"না।" কোনো দুঃখ নেই।

কোরা শুয়ে শুয়ে আমাকে দেখে। আগে ছিল ঈশপ, এখন কোরা। তাকের ওপর ঘড়িটা *টিক-টিক* করে, আমার জানালার বাইরে সমস্ত নগরীর অশ্রান্ত গর্জন শোনা যায়।

হঠাৎ দরজায় কার টোকা শুনি, পিওন আমার হাতে একটা চিঠি দেয়। চিঠিতে মুকুটের ছবি দেওয়া। এ চিঠি কে পাঠিয়েছে বুঝতে দেরী হয় না, হয়ত এই লেখিকাটিকে কোনোদিন স্বপ্নে দেখে থাকব।

কিন্তু ভিতরে কিছুই লেখা নেই, শুধু সবুজ পাখীর দুটি পালক।

দুটি সবুজ পালক; সর্বাঙ্গ শিথিল হয়ে আসে। নিজেকে বলি, তাতে কি? এতে ব্যথিত বোধ করবার কি আছে!

জানলা দিয়ে খুব ঠাণ্ডা হাওয়া আসছিল বুঝি। জানলা বন্ধ করে দিলাম।

ভাবি—পাখীর ঐ পালক দুটো, ওদের আমি চিনি—নর্ডল্যাণ্ড-এ একটি ছোট দিনের ছোট ঘটনা মনে পড়ে। ওদের আবার দেখতে পেয়ে বেশ লাগছে! হঠাৎ যেন কার একখানি মুখ দেখি, যেন কার কণ্ঠস্বর শুনি, কে যেন বলছে: "এই তোমার পালক ফিরিয়ে নিয়ে যাও, লেফ্‌টেনেণ্ট।"

ঘরের মধ্যে ভারি গরম বোধ হয়—জানলা বন্ধ করেছিলাম কেন? আবার খুলে দাও…দরজাও খোল। উন্মুক্ত করে দাও। সবাই আমার ঘরে অতিথি হয়ে আসুক।

দিন যায়, কিন্তু সময় কাটে না।

কোথায় যেতে চাই—আফ্রিকায় কিম্বা ভারতবর্ষে। আমার স্থান বনে—নির্জনতায়।

দুটি সরাই

মুখোমুখি দুটি সরাই। রাস্তার এ পাশে একটা প্রকাণ্ড দালান, হৈ চৈ ও হল্লাতে মশগুল, সমস্তগুলি দরজা জানলা খোলা, রাস্তায় গাড়ি ঘোড়ার ছড়াছড়ি, ভেতরে অদ্ভুত কোলাহল, টেবিলের ওপর ঘুষি-চাপড়, কাঁচের গ্লাশের টুং টুং আওয়াজ, লেমনেড্ ভাঙার শব্দ এবং গানের ঝঙ্কার।

"ভারী মধুর সুন্দরী সে—
জাগলে প্রভাত আকাশ পারে
নিয়ে রূপোর কলসীটিকে
অমনি চলে কূয়োর ধারে।"

সামনের সরাইখানাটি একেবারে নির্জন, পরিত্যক্ত শ্মশানের মতো। জানলার পাখীগুলি সব ভাঙা, দরজার কাছে বড় বড় আগাছা গজিয়েছে, সামনের পথটি খোয়ায় আচ্ছন্ন, একেবারে নোংরা! এ এমন দরিদ্র করুণ চোখে তাকায় যে এখানে যাওয়া মানে প্রকাণ্ড একটা দয়ার কাজ করা!

ঢুকে দেখলুম নির্জন লম্বা ঘরটা ভয়ানক থমথম করছে। নড়বড়ে কতকগুলি টেবিল, তার ওপরে কতকগুলি ভাঙা ধূলোমাখা গ্লাশ, পায়া-ভাঙা বিলিয়ার্ডের টেবিল আর চূড়ান্ত মশা! আমি এত মশা কোথাও দেখিনি, ছাতে দেয়ালে গ্লাশে জানলায় ঝাঁকে ঝাঁকে দল বেঁধে বসবাস করছে।

ঘরের শেষ কিনারে জানলা ধরে একটি স্ত্রীলোক অনিমেষ চোখে বাইরের পানে চেয়ে রয়েছিল।

আমি তাকে ডাকলুম—শুনুন কর্ত্রী।

সে আস্তে মুখ ফেরাল। দারিদ্র্যচিহ্নিত কুৎসিত করুণ মুখখানি দেখলুম। আদতে সে মোটেই বৃদ্ধা নয়, বেশী কেঁদে কেঁদে তার মুখের সমস্ত রঙ্ ধুয়ে গেছে।

সে চোখ মুছে জিজ্ঞেস করলে—আপনি কি চান?

বললুম—কিছু খাব ও খানিকক্ষণ বসব।

সে আমার পানে অবাক হয়ে চেয়ে রইল যেন সে আমার কথার মানে বুঝতে পারেনি।

জিজ্ঞেস করলুম—এটা কি সরাইখানা নয় ?

মেয়েটি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

—হাঁ, যদি বলেন, সরাইখানাই বটে। কিন্তু আর সবাইর মতো ঐটেতেই আপনি গেলেন না কেন ? ওটায় যে বেশী স্ফূর্তি……

—আমার কাছে এই-ই ভালো। আপনার কাছেই থাকতে চাই এখানে।

তার কোন উত্তরের প্রতীক্ষা না করে একটা টেবিলের কাছে বসে পড়লুম।

যখন সে বুঝলে আমি সত্যিই ঠাট্টা করছি না, সে ভারী ব্যস্ত হয়ে দরজা জানলা খুলে দিলে, বোতল গুছোল, গ্লাশগুলি মুছ্‌ল নেকড়া দিয়ে, আর মশা তাড়াতে লাগল। পেছনের ঘরে গিয়ে চাবির আওয়াজ করে তালা খুলে রুটির বাসন, মদের বোতল ও খাবার প্লেট বার করল। আর মাঝে মাঝে তার ফুঁপিয়ে ওঠা এক গভীর দীর্ঘশ্বাস কানে এসে লাগতে লাগল ক্ষণে ক্ষণে !

—এই নিন বলে খাবারের থালা ও বাটিগুলি আমার কাছে এগিয়ে দিয়ে সে আবার তার জানলাটির সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

আমি খেতে খেতে তাকে জিজ্ঞেস করলুম—আপনার এখানে লোক আসে না, না ?

—না, একটিও না। আমরা যখন একলা ছিলাম এখানে, তখন এ-রকমটি ছিল না, আমাদের ঘরে তখন লোক ধরত না আর। কিন্তু ঐ প্রতিবেশিনী আসতেই সব উল্টে গেল। লোকে বলে—এইটে একদম নীরস নোংরা তাই সবাই ওরা ঐটেয় যায়। এ বাড়ি সত্যিই সুন্দর নয়, আমিও দেখতে একটুও ভালো নই, ঘুরে ঘুরে আমার জ্বর হয়, আমার দুটি মেয়ে মারা গেছে, তাই কাঁদি। ও-সরাইয়ের কর্ত্রী-মেয়েটি চমৎকার দেখতে, দামী পোশাক পরে, গলায় তার সোনার হার, তার দাস দাসীর অন্ত নেই। সমস্ত সহর—গাঁয়ের যুবকরা তার ভক্ত, সবাই তার খরিদ্দার, আর আমার ঘরে কেউ ভুলেও একবার পা ফেলে না একটি দিনের জন্যও।

জানলার কাচের ওপর কপালের ভর রেখে সে তেমনি উদাস হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ও-দিকের সরাইখানাতে তার যেন কি একটি জিনিস দেখবার আছে।

হঠাৎ রাস্তার ও-ধারে একটা হল্লা বেধে গেল। গাড়ি-ঘোড়ার শব্দ গোলমাল—সব কিছু ছাপিয়ে উঠল কার ভারী চওড়া গলার গান।

"নিয়ে রূপোর কলসীটিকে
সামনে কুয়োর দাঁড়িয়ে আছে,

দেখতে মোটেই্‌ পাচ্ছে না যে
তিনটি সেনা আসছে পাছে।"

সেই স্বর শুনে মেয়েটির সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল। আমার দিকে চেয়ে আবছা গলায় বললে—শুনছেন ? ঐ আমার স্বামী, খুব চমৎকার তাঁর গলা, না ?

আমি তার দিকে স্তম্ভিতের মতন চেয়ে রইলুম।

—কি ? আপনার স্বামী ? আপনার স্বামীও ওখানে যায় না কি ?

হৃদয়-নেংড়ানো স্বরে সে বললে—আপনি কি আশা করেন ? মানুষের ঐ স্বভাব, তারা কাঁদুনে লোককে দেখতে পারে না, কান্না সহ্য হয় না কারুর, আমার মেয়ে দুটি চলে গেছে পর আমি রোজ কাঁদি। তারপর এই নির্জন প্রকাণ্ড ঘরটা—যেন বিষাদে মাখামাখি। যখন তিনি ভারী শ্রান্ত বিরক্ত হয়ে ওঠেন তখন তিনি ঐ সরাইখানায় যান। তিনি চমৎকার গাইতে পারেন, ওখানকার কর্ত্রী সুন্দরী মেয়েটি তাঁকে গান গাইতে খালি অনুরোধ করে। চুপ ! ঐ তিনি গাইছেন !

সে জানলা ধরে তেমনি দাঁড়িয়ে রইল, তার দুটি প্রসারিত হাত কাঁপছে, গাল বেয়ে চোখের জল ঝরে পড়ছে, আর তাকে ভারী কুৎসিত দেখাচ্ছে এতে। তার স্বামী তখন সরাইখানার সুন্দরী কর্ত্রীকে সন্তুষ্ট করবার অভিলাষে গেয়ে চলেছেন—

"প্রথম জনে বললে তারে
কেমন আছ লাল পরী গো ?"*

---

* আলফন্‌স্‌ দোদে হইতে।

বিয়ের মিছিল

অনেক বছর আগে ভার্মল্যাণ্ডের Svartsjo গাঁয়ে একটা জাঁকালো বিয়ে হবার কথা ছিল। এ বিয়ে গির্জায় হবে, তিনদিন ধরে অবিশ্রান্ত ভোজ চলবে, আর ভোর থেকে শুরু হয়ে দুপুর রাত্রি পর্যন্ত নাচের মজলিস বসবে।

নাচ-গান জমকালো করতে হলে একজন ভাল বাজিয়ে চাই, তাই বিয়ের কর্তা নিল্‌স্ ইলফ্‌সন্ সবাইর চাইতে বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়লেন একজন ওস্তাদ বাজনাদার যোগাড় করতে। জেন অস্টার নামে যে লোকটা Svartsjo গাঁয়ে বাজনায় নাম কিনেছে তাকে তাঁর পছন্দ হ'ল না, কেননা সে ভারী গরীব, বিয়েতে ছেঁড়া জুতো আর নোংরা কাপড় পরেই হাজির হবে হয়ত।

বিয়ের মিছিলের আগে আগে এই ভিখিরীটা বাজিয়ে চলবে এ তিনি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারলেন না।

তিনি Jossenherad-এ বাজনাওয়ালা মার্টিনের কাছে লোক পাঠালেন। কিন্তু মার্টিন আসতে রাজী হল না, বলে পাঠাল—নিজের গাঁয়ে ভার্মল্যাণ্ডেই তো সবার সেরা বাজিয়ে রয়েছে।

এ খবর পেয়ে নিলস্,ইলফ্‌সন্ দু-একদিন ভাবলেন। শেষে খবর পাঠালেন আর এক বাজনাদারের কাছে গ্রেটরিল্‌স্ গাঁয়ে—ওলি অবসেবির নিকট। তাকে নিমন্ত্রণ করলেন, তাঁর মেয়ের বিয়েতে সে হাজির হতে পারবে কিনা তার বাজনা নিয়ে।

কিন্তু ওলি অব সেবি ফিড্‌লার মার্টিনের সুরেই সুর মিলান। সে নিলস্ ইলফ্‌সন্‌কে নমস্কার পূর্বক জানিয়েছে যে জেন অস্টারের মতো এত বড় ওস্তাদ চমকদার বাজনাওয়ালা থাকতে তার মতো গরীব বেচারীর যাওয়াটা একেবারেই মানায় না।

নিলস্ ইলফ্‌সন্ কিন্তু কিছুতেই রাজী হতে পারলেন না। যাকে তিনি দেখতে পারেন না তাকেই শেষে জোর করে নিতে হবে! না, এত বড় একটা বৃহৎ ব্যাপারকে তিনি খেলো করে দিতে পারেন না। তিনি অন্য বাজিয়ের সন্ধানে লোক পাঠালেন। Ulleried গাঁয়ে থাকত লার্স লার্সন, তার কাছে দূত এল। Lars ছিল বেশ

অবস্থাবান, জমিজমাও কিছু আছে, বেশ চালাক, বুদ্ধিমান, আর আর বাজিয়েদের মতন মাথা গরম সে নয়।

কিন্তু চট্ করে তারও মনে পড়ে গেল জেন অস্টারের কথা। সে লোকটাকে জিগ্‌গেস করলে—এ কেমন কথা যে অস্টার এ বিয়েতে বাজাবে না ?

নিলস্ ইলফ্‌সনের দূত বললে—এক গাঁয়েই থাকে কিনা, লোকটা বেশী জানা হয়ে গেছে। এ রকম একটা জমকালো বিয়েতে নূতন বাজিয়ে হলে জমবে ভাল।

লার্স লার্সন্ বললে—আমার ত মনে হয় না তার চেয়ে আর কেউ বেশী ভালো করতে পারবে।

—তাহলে তুমি তো ফিড্‌লার মার্টিন্ ও ওলি অব সেবির মতনই জবাব দেবে ? দূত বলে উঠল, ও তাকে জানাল তারা কি মত জানিয়েছে।

মন দিয়ে ব্যাপারটা লার্সন্ শুনলে, এবং খানিকক্ষণ চুপ করে বসে কি ভেবে নিলে। পরে বললে—তোমার কর্তাকে নমস্কার জানিও, তাঁর এই নিমন্ত্রণের জন্য ধন্যবাদ দিচ্ছি, আমি যাব।

পরের রবিবার লার্স লার্সন্ Svartsjo গির্জেয় গিয়ে হাজির হল, বিয়ের মিছিল যেমনিই বেরুবে পাহাড়ের উপর গিয়ে তাদের নাগাল ধরল।

ভালো ঘোড়ায় এক্কা হাঁকিয়ে, তার সব চেয়ে ভালো কালো পোশাক গায়ে চড়িয়ে, চক্‌চকে খাপে তার বেহালা নিয়ে সে এসে হাজির হল। নিল্‌স ইলফ্‌সন্ তাকে দেখে ভারী মুগ্ধ হলেন, ও এমন বাজনাদার পেয়েছেন বলে মনে মনে গর্ব অনুভব করতে লাগলেন।

লার্স লার্সন্-এর আসার খানিক পরেই জেন্ অস্টার তার বগলের নীচে বেহালা নিয়ে এসে হাজির গির্জার দুয়ারে। কনেকে ঘিরে যে জনতা জমেছিল সে নির্বিবাদে তার সঙ্গে মিশে গেল, যেন তাকেই এ বিয়েতে বাজাতে বায়না দেওয়া হয়েছে।

জেন অস্টার-এর পরণে ছিল তার সেই পুরোনো মোটা উলের জামা, অনেক প্রভুর অধীনে সে এই জামা পরে কাজ করেছে ; কিন্তু আজ তার স্ত্রী এই বিয়েতে তার স্বামীর সম্মান রক্ষা করবার জন্য কনুইয়ের কাছের গর্তগুলি বড় বড় সবুজ কাপড়ের তালি দিয়ে বুজিয়ে দিয়েছে। দীর্ঘায়ত সুন্দর পুরুষ সে, যদি দুর্ভাগ্য ও দারিদ্র্যের আগুনে পুড়ে তার মুখ অত কুশ্রী না হয়ে যেত, তাহলে তাকে এই বিয়ের চলনদার হয়ে যাওয়াটা সুন্দর মানাত বটে !

জেন অস্টারকে আসতে দেখে লার্স লার্সন্ গেল ক্ষেপে। কর্তাকে সে ফিসফিসিয়ে বললে—আপনি আবার আর একজন লোক পাঠিয়েছিলেন এর কাছে ! এমন

একটা জাঁকালো বিয়েতে দুজন বাজনাওয়ালা থাকলে যে সব ভেস্তে যাবে। নিল্স ইলফ্‌সন্‌ তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন—আমি ককখনো লোক পাঠাইনি তার কাছে। বুঝতে পাচ্ছি না কেন সে এল। দাঁড়াও এক মিনিট, আমি তাকে বলে দিচ্ছি যে আমরা তাকে চাইনে।

লার্স লার্সন্‌ বললে, নিশ্চয়ই কোন উজবুকের কর্ম তাকে ডেকে আনা। তা যাক্‌, আমার পরামর্শ যদি শোনেন তাহলে ওকে কিছু বলবেন না, যান, ওকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসুন। শুনেছি ভারী বদ্‌রাগী লোক ও, কে জানে তাড়িয়ে দিতে গেলে না কোন ক্ষেপে মারতে আসবে।

কর্তাও বুঝলেন বিয়ের সময়টায় ঝগড়াটা বিশেষ সুখরোচক হবে না। তাই তিনি জেন অস্টারের কাছে গিয়ে তাকে অভিনন্দন জানালেন।

তারপরে মিলনছত্রতলে বরবধূ এসে দাঁড়াল, কনের সখীরা আর অভ্যাগতেরা জোড়ায়-জোড়ায় দাঁড়ালেন, তার পিছনে জনক-জননীরা ও অন্যান্য আত্মীয়-বন্ধুরা —ভারী জাঁকালো ও প্রকাণ্ড সে মিছিল।

যখন সব ঠিকঠাক হয়েছে, একজন অতিথি বাজনাদারদের কাছে গিয়ে বললেন বিয়ের মিছিলের বাজনা শুরু করতে।

দু'বাজনাদারই চিবুকের তলায় বেহালা রেখে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। Svartsjoতে একটা প্রথা আছে যে, যে ভাল বাজনাদার সেই প্রথম বাজনা শুরু করবে। সমস্ত অভ্যাগতেরা লার্স লার্সনের দিকে অপলক চোখে চেয়ে রইল, যে সেই প্রথম বেহালায় ছড়ি টানবে। কিন্তু সে জেন্‌ অস্টারের দিকে চেয়ে বলে উঠল—আরম্ভ করবে জেন্‌ অস্টারই।

জেন্‌ অস্টার ভাবছিল যে বেহালাদার এমন সুন্দর পোশাক পরে ভদ্রলোকের মতন এসে দাঁড়িয়েছে সেই স্বভাবত ভালো বাজিয়ে হবে ছেঁড়া-কাপড়-পরা গরীব তার থেকে। তাই সে বলে উঠল—না না, ককখোনো না।

বর এসে নিজে লার্স লার্সনকে বাজাতে বললে। এ দেখে জেন্‌ অস্টার তার বেহালা নিয়ে ধীরে ধীরে সরে পড়ল একধারে।

কিন্তু লার্স লার্সন্‌ নড়ল না, সে তেমনি অনড় ও স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তার হাতের ছড়ি থেমেই রইল। সে খুব জোরে স্থির দৃঢ় কণ্ঠে বলে উঠল—জেন্‌ অস্টারই মিছিল চালিয়ে নেবে।

সমস্ত মিছিল চঞ্চল হয়ে উঠতে লাগল! বরের বাবা লার্স লার্সন্‌কে শুরু করতে

আদেশ দিলেন ; গির্জের থেকে খবর এল যে পুরোহিত এসে বেদীতে অপেক্ষা করছেন।

লার্স লার্সন্ বললে—আপনারা জেন্ অস্টারকে বাজাতে বলুন, আমরা বাজিয়েরা তাকে সব্বাইর সেরা মনে করি।

উত্তর এল—তা হতে পারে, কিন্তু আমরা চাষারা লার্স লার্সন্‌কে সেরা মনে করি।

আর আর চাষারা ঘিরে দাঁড়াল। তারা জোর করে বলতে লাগল—শুরু করুন। পুরোহিত এসে বসে আছে। সমস্ত গাঁয়ের কাছে আমাদের বোকা বানাবেন নাকি ?

কিন্তু লার্স লার্সন্ তেমনিই অনড় রইল। শুধু বললে—আমি বুঝতে পাচ্ছি না, কি করে এরা বুঝছে না যে তাদের গাঁয়ে মস্ত বড় বাজিয়ে আছে।

নিল্‌স্ ইলফ্‌সন্ ক্ষেপে উঠলেন। লার্স লার্সন্‌কে গিয়ে বললেন—আমি এখন বুঝতে পাচ্ছি তুমিই তাকে বোকা বানাবার জন্য নিমন্ত্রণ করেছিলে। শীগ্‌গির শুরু কর, নইলে ভাল হবে না কিন্তু।

লার্স লার্সন্ তাঁর চোখের পানে তাকাল। বললে,—আজকের দিনে মেজাজ দেখিয়ে লাভ নেই। হ্যাঁ, সত্যিই, সব বন্ধ করে দিন,—এ আয়োজন।

সে জেন্ অস্টার্‌কে ইশারায় ডাকলে সেখানে এসে দাঁড়াতে। সে তার ছড়ি ছুড়ে ফেলে দিলে, পকেট থেকে এক ধাঁরালো ছুরি বার করে বেহালার তাঁত গুলি সশব্দে কেটে ছিঁড়ে ফেললে।

সে বলে উঠল—আর কেউই ভাবতে পারবে না আমি জেন্ অস্টারের চাইতে নিজেকে বড় বাজনাদার মনে করেছি।

জেন্ অস্টার আজ তিনটি বছর ধরে, একটি সুরের মূর্চ্ছনার স্বপ্ন দেখছিল। একদিনও সে সেটিকে ঝঙ্কারে মূর্তি দিতে পারেনি। যখনই সে সুরের উন্মাদনা বুকে নিয়ে বাড়ি ফিরেছে তখনই পারিবারিক কোন দুর্ঘটনা বা দারিদ্র্য তার সমস্ত উদ্বেলতাকে কালো করে দিয়েছে। তার গান আর ফোটেনি।

কিন্তু যখন সে লার্স লার্সনের ছিন্ন বেহালার কান্নাটি শুনতে পেলে, তখন সে সোজা হয়ে দাঁড়াল, মাথাটি পেছনের দিকে একটু নুইয়ে বুক ভরে নিশ্বাস গ্রহণ করলে, সে যেন অশ্রুতপূর্ব কোন রাগিণী শুনছে, কোন্ বাণীর মদিরা তাকে মাতাল করে দিয়েছে মনে মনে। তারপর সে বাজাতে শুরু করল। যে রাগিণী এতদিন স্বপ্নের

কুজ্ঝটিকায় লুকিয়ে ছিল আজ তা মূর্তি পেলে সুরের নৃত্যতালে-তালে। বাজনা যেই বাজল সেও তেমনি গর্বিত পদভরে গির্জার দিকে এগিয়ে চলল।

বিয়ের মিছিল এমন বাজনা কোনো দিন শোনেনি। সে বাজনা নিল্‌স্ ইলফ্‌সন্‌কেও এত স্পর্শ করল যে তিনি আর বিষণ্ণ থাকতে পারলেন না।

---

* সেল্‌মা লেগারলফ্ হইতে।

[সেল্‌মা লেগারলফ্ সুইডেনে Vermland গাঁয়ে ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর যেখানে জন্ম হয় সেই গ্রাম্য প্রদেশটি নানা কিম্বদন্তী ও গেঁয়ো কথিকার মাতৃভূমি ছিল। Stockholm এর Royal Women's Superior Training College থেকে বেরিয়ে তিনি Landskronea মেয়ে স্কুলে শিক্ষকতা করতে থাকেন। ১৮৯৫ খৃঃ অব্দে তিনি শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়ে সাহিত্যিক জীবন যাপন করতে মন দেন। তিনি অনেকগুলি নামজাদা বই লিখেছেন— The invisible Link; From a Swedist Homestead; Jerusalem; The Adventures of Nills (ছেলেমেয়েদের বই); The Girl from the Marsh ইত্যাদি। ১৯১০ খৃঃ অব্দে তিনি Upsala বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Doctor উপাধি পান। ১৯০৮ খৃঃ অব্দে Swedish Academy তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেন সাহিত্যের জন্য। এবং পরে তিনি সেই সমিতির আঠারো জন সভ্যের মধ্যে একজন মনোনীত হন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্থাপিত এই সমিতিতে তিনিই প্রথম মহিলা সভ্য।]

বাদল-বাতাস

দীপ্তি থাকত আমহার্স্ট-স্ট্রীটের ওপরে, আর নিপুণ থাকত শোভাবাজার ছাড়িয়ে সরু কুণ্ডলী পাকানো এঁদো একটা নামহারা গলিতে। এ ছিল তাদের স্থানের ব্যবধান কিন্তু আজ তাদের অবাক করে প্রাণের ব্যবধানও ক্রমে ক্রমে ছড়িয়ে পড়চে দিক্-দিগন্তর ছাড়িয়ে, যেন কোন্ আটলান্টিকের এ পার ও-পার! মাঝখানে কান্নার তুফান, দীর্ঘশ্বাসের ঝঞ্ঝা, আহত অভিমানের ভরা গুমোট!···

ছিল তো তারা বেশ সাগরের বুকে পাশাপাশি দুটি ঢেউয়ের মতো, কোকিলের দু-ফের রাগিণীর মতো, আঁখিযুগের দুটি তারার মতো। কিন্তু ভাঁটায় ঢেউ নাচে না, বর্ষায় কোকিল ডাকে না, আঁখি আজ অন্ধ হয়ে যাচ্চে! নিপুণ ভাবচে, দীপ্তি মিথ্যাবাদী! আর দীপ্তি ভাবচে, নিপুণ মর্মহীন!

জাহাজের সামান্য একটা ফুটো থেকে জাহাজের সর্বনাশ হয়, ধূমকেতু তার পুচ্ছ একটুখানি ছোঁয়ালে সারা সৃষ্টি ছারখার হয়ে যায়, আনাড়ির জিভে নেশার সখে একটু আফিং পড়লেই তার সব শেষ হয়ে আসে!···

অনেকদিন নিপুণ দীপ্তির চিঠি পাচ্ছে না। দীপ্তি চিঠি দিচ্চে না এই ভেবে, কেন! সে তো একদিন বিকেলবেলা অনায়াসেই আমার সঙ্গে এসে দেখা করে যেতে পারে। নিপুণ ভাবচে, সে তো অনায়াসেই একখানা ছোট্ট কার্ড লিখে ফেলে দিতে পারে, তাহলেই তো যেতে পারি একদিন!···

এমনি করে অনেকদিন কেটে গেল, দীপ্তি ছায় না চিঠি, নিপুণও আসে না দেখা করতে। দুজনের, বিশেষ করে দীপ্তির বুকে অভিমান গাঢ় হয়ে উঠল। সে ভাবলে, পুরুষ জাতটা এমনি কপট, এমনি নিষ্ঠুর!

কিন্তু পুরুষ নিপুণের ভারী কষ্ট হল, অভিমানী দীপ্তির কথা মনে করে-করে!···

অভিমানের সংগ্রামে মেয়েরা চিরকালই জিতেচে। ব্রহ্মাস্ত্র তাদের সজল চোখ, স্ফুরণ-কাঁপা ঠোঁট, আরক্ত গাল, গর্বিত গতি! তারপর যদি কথা কয়, সে যেন

জলে-ভেজা বাতাসের একটা বিলাপ-কাকলী, যদি ছোঁয় সে যেন শিশির-লাগা গোলাপের গন্ধময় একটা পিছলে-পড়া চুম্বন! মেয়েদের অভিমান মানেই নিরুপদ্রব অসহযোগ—এর জয় অবশ্যম্ভাবী।…তাই একদিন নিপুণ খুব সাজ-সজ্জা করে বেরিয়ে পড়ল তার দীপ্তি-প্রিয়ার অভিমানের ঘোমটা খুলে ফেলতে! তার বর্ষা-ভেজা স্যাঁতা মনটা আকাশ-ফাটা শরৎ-রৌদ্রে মাখিয়ে বেশ তাজা করে তুললে! পা-ফেলার সঙ্গে-সঙ্গে স্ফূর্তির একটা ছন্দ দোদুল হয়ে উঠল! কিন্তু, হায়রে, তাকে ভুতে পেয়ে বসলো। কি খেয়াল যে পেল তার, সে দীপ্তিদের বাড়ির কাছে এসে ভাবলে, ঢুকবে না।…দরজা খুলে এল দীপ্তির ছোট ভাই রুনু—নিপুণ তাড়াতাড়ি বলে উঠল—রুনু, এই বইটা তোমার দিদিকে দিও, বুঝলে—বলেই দীপ্তির চাওয়া একখানি বটানীর বই রুনুর হাতে গুঁজে নিপুণ বড় বড় পা ফেলে কলেজ-স্কোয়ারের মুখে চলল!

দীপ্তি তখন তার স্প্রীং-এর খাটে একটা নরম বালিশে ভর দিয়ে একখানা মাসিক-পত্র পড়ছিল। রুনু তার হাতে বইখানা দিয়ে বললে—নিপুণদা তোমাকে দিলে—

নিপুণ! দীপ্তি চমকে উঠে বললে—কোথায় সে?—

—সে আমাকে দিয়েই চলে গেল।

চলে গেল! দীপ্তি একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললে। এসেছিল তো চলে গেল কেন? তার এই নির্দয়তার অর্থ কি? নিপুণ কি তবে আর দীপ্তিকে ভালবাসে না? দীপ্তির ইচ্ছা হলো, জানলা দিয়ে বইটাকে ছুড়ে ফেলে দেয়! এমন দয়ার প্রত্যাশা সে করে না। সে বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদতে শুরু করলে।

নিপুণ বিকেলে বেড়াতে বেড়াতে ভাবতে লাগল, দীপ্তিকে খুব আঘাত দিয়েছি, না? কেন, সে বুঝি একছত্র একটা কার্ড লিখতে পারত না? ভারী তো গুমর! আমরাই বুঝি চিরকাল কাঙাল হয়ে থাকবো? কেন, ওরা বুঝি সেধে কিছু করতে পারে না?…

দিন যায়। নিপুণ রোজ কলেজ থেকে আসবার সময় ভাবে, টেবিলের ওপর বড় করে লেখা তার নাম-ওয়ালা একখানি চিঠি দেখতে পাবে, উঃ, তাহলে কি সুখই হয়! আর দীপ্তি ভাবে, এই বুঝি নীচের বারান্দায় কোন্ আকাঙ্ক্ষিতের পরিমিত পায়ের শব্দ ধ্বনিয়ে ওঠে, অঃ, তাহলে তার বুকের ভেতরটা কি রকম টিপ্ টিপ্ করতে শুরু করে, না জানি! কিন্তু কই সে চিঠি, কই বা জুতোর মস্মস্? অভিমানের আগুনে দুজনেই খাক হতে লাগল।…

যুদ্ধে নিপুণের আবার হার হল। সে এবার পলায়ন করলে না, দস্তুর মতো বক্তৃতা

স্বীকার করলে; অর্থাৎ অন্য কোন কারসাজি না করে বরাবর দীপ্তিদের বাড়িতে ঢুকে পড়ল। অনিশ্চিতের আশঙ্কায় কি-রকম দুর-দুর করে উঠছিল যে বুকটা!

নীচে নিপুণের গলার আওয়াজ পেয়ে দীপ্তি অভিমানে যেন হিম হয়ে এল। সে তাড়াতাড়ি বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে রইল। নিপুণ দীপ্তি ঘরে ঢুকে দীপ্তিকে স্পর্শ করে ডাকলে—দীপ!

দীপ্তি কথা কইলে না; কান্নায় ফুঁপে বুক তার ফুলে-ফুলে উঠছিল। মাথা থেকে হাতখানা সরিয়ে দীপ্তির নগ্ন নিটোল নরম সাদা বাহুটির ওপর রেখে নিপুণ ধরা গলায় বললে—কথা কইবে না আমার সঙ্গে?

গভীর অভিমানে দীপ্তি তার দিকে এসে হাতটা ছুড়ে দিলে তাকে ঠেলে দেবার জন্যে। নিপুণ ভাবলে দীপ্তি তার স্পর্শ অস্বীকার করচে, তাকে সে চায় না! অসহ দুঃখে নিপুণের অন্তর দুর্বহ হয়ে উঠল। তাকে আরো খানিকক্ষণ আদর করলে হয়ত দীপ্তির মনের মেঘ দূর হয়ে যেত; কিন্তু নিপুণ ব্যথা পেলে বিষম! তাই খেয়ালের মাথায় আবার বড় বড় পা ফেলে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল, মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করলে, এ-বাড়িতে আর না! ··

দীপ্তির ডাগর দুই চোখ তখনো ছলছলাচ্ছে! সে ভাবলে—তার বুকে বড্ড লেগেচে! তবে কেন সে সেদিন এত সামনে এসেও আমার সঙ্গে দেখা করে গেল না? ভারী তো—! আমি বুঝি রাগ করতে পারি না? বেশ হয়েচে। এতদিন না এসে আমাকে কষ্ট দিতে পারে, আর আমি বুঝি···কিন্তু···দীপ্তির কেমন যেন মনে হতে লাগল, ব্যথার মাত্রাটা খুব বেশী হয়ে গেছে!···

নিপুণ বাড়ি এসে ভাবতে লাগল, মেয়ে-জাতটা এমনি কুটিল, এমন অবিশ্বাসী, এমন বিশ্বাসঘাতক! কান্না তার চোখ ছাপিয়ে উঠচে! সে মনে-মনে বললে—আমি তাকে কী ভালোই বাসতাম। সে বুঝবে না! তার জন্য কত সহ্য করেচি,···হায়, সে বুঝলে না!···

কয়েকদিন বাদে নিপুণের কানে বাতাস-ভাসা এক গুজব এল, দীপ্তির বিয়ে হচ্চে। নিপুণ চমকের একটুও ভান করলে না। সে জানে, এই-ই হচ্চে তরুণীর ভালোবাসার প্রতিদান! শুধু তার চোখে অশ্রুর বাঁধনহীন জোয়ার ডেকে এল! সে অনর্থক আবার প্রতিজ্ঞা করলে—তার বাড়িতে আর কখনো না, কখনো না।···

দীপ্তি শুয়ে-শুয়ে ভাবে, হায়, সে কি দয়াহীন পাষাণ। কিন্তু তার ঐ কঠোর মুখখানা

কি কোমল, কি স্নেহময়! সে বুঝি একবারও আসতে পারে না? না, সে আর আমাকে ভালোবাসে না, তাহলে একেবারে কি আসত না আর? যাক গে, ভাবব না তার কথা! তার যা খুশি, তাই করুক সে! আমার কে যে…দীপ্তি চোখের জল আর চেপে রাখতে পারলে না।…

ভাবতে-ভাবতে অনিয়ম-অত্যাচারে নিপুণ-দীপ্তির দুজনেরই বিষম অসুখ হ'ল, একজনের নিউমোনিয়া আর এক জনের টাইফয়েড! তারা দুজনেই একুশ দিন ভুগে ভালো হল। একই সুরের হাওয়া দুটি জীর্ণ শাখাকে পল্লবিত করে তুলল।…

এ-ক'দিন নিষ্ফল বেদনায় গুমরে মরে নিপুণ ককিয়ে উঠেচে—মরে যাই, আমার জীবনের আর কি প্রয়োজন আছে? হায়, আমার সে দীপ্তি যদি একবার আসত আমার মুমূর্ষু দেহের পেয়ালায় শেষবারের মতো তার স্পর্শের অমিয় ঢালত, যদি একটি বার আসত গো!…উঃ, এতদিনে সে হয়ত পর হয়ে গেছে! পর! নইলে আমার এ ব্যারাম শুনে একটা চিঠিও লিখলে না? না, না, সে যে আমাকে ঘৃণা করে, তাই ত সেদিন নীরব ইশারায় আমাকে বলেছিল, বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও, তোমাকে আমি চাই না, কোন দিন না!…

দীপ্তি কাঁদত—মরে যাচ্চি, তবু সে আসচে না, একবার, শুধু শেষবার একটুখানি 'দীপ' বলে ডাকতে! পুরুষের এমনি অভিমান, তা এত উগ্র, এত ভীষণ! না, সে আমাকে ভালোবাসলে একটিবার ও কি আসত না এই জ্বরো কপালটাতে একটুখানি…

একমাস পরে সত্যেনের বিয়েতে নিপুণ নিমন্ত্রণ পেয়েছিল বন্ধু-হিসেবে, আর দীপ্তি পেয়েছিল দূর-সম্পর্কে মাসতুত বোন বলে। একটা লোক-ভরা ঘরে তাদের দেখা হয়ে গেল, এক সন্ধ্যায়। তারা খানিকক্ষণ দুজনের দিকে বচন-হারা অতৃপ্তিতে ফ্যালফেলিয়ে চেয়ে রইল। নিপুণ দেখলে, দীপ্তির মাথায় তো ঘোমটা নেই, সিঁথেয় সিঁদুরের চিহ্নও নেই। আর দীপ্তি দেখলে, নিপুণের কি সে স্নেহাতুর বিরস রঙের দুই চোখ!…

সমস্ত লোকের অস্তিত্ব আমলে না এনে দুজনেই দুজনের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। নিপুণ আবছা-স্বরে বললে—তোমার চেহারা এত বিশ্রী হয়ে গেছে, তোমাকে যে আর চেনাই যাচ্ছে না!…হাতে হাতে তারা পরস্পরকে স্পর্শ করলে!…

এর বছর-খানেক পরে এক মেঘলা রাতে নির্জন ছাতে একটা চেয়ারে ঠেসাঠেসি করে গা-ঘেঁষাঘেঁষি ছুটি তরুণ-তরুণী বসে ছিল। তরুণীর ঘোমটাটা ফেলে দিয়ে গভীর সোহাগে অতি আচমকা তার লাল গালে তরুণ ঠোঁটের একটু পরশ দিলে!

ছু-চোখে টলটলে ইঙ্গিত পুরে তরুণী বললে—তুমি ভারি…

তরুণ তাকে বুকের ওপর টেনে বললে—আর তুমি বুঝি…

আলতার দাগ

জানলায় বসে ছিলাম…

কলেজের গাড়ীটা খানিকদূরে গ্যাস্-পোস্টটার কাছে থামল। একটি তরুণী ছু-হাতের অঞ্জলিতে অনেকগুলি বই নিয়ে নেমে এল। গলির মোড়ে একটা মুচি বসে জুতো সেলাই করছিল। মেয়েটি হঠাৎ তার কাছে থেমে পড়ে মোলায়েম গলায় বললে—এই, আমার জুতোটায় তালি দিয়ে দাও তো! বাবাঃ, এক-হপ্তার চেষ্টায় দেখা পাওয়া গেল!…বলে মেয়েটি ফুটপাথের ওপর বইগুলি নামিয়ে নীচু-হীল-ওয়ালা জুতোটা খুলে ফেললে।…

আলতার দাগ! মেয়েটির পদ্মকলির মতন ছোট ছোট ছুটি পা ঘিরে আলতার লালিম লেপন—একটা যেন রঙীন মায়া, জাগরণের বিচিত্র কোলাহলের মাঝে স্বপ্নের মধুর একটি রেশ, আষাঢ় সন্ধ্যার সুর-ভরা একটি রামধনু।

মেয়েটি চলে গেল, মনে হলো, সরু গলিটা জুতোর ভরে কাঁপছে না, আলতার ছোঁয়ায় শিউরে শিউরে উঠছে!

কথার যত ছন্দ-বাঁধুনীই থাক, সুরটিকে সে হারায়নি।

কারসাজি

—যতীনবাবু, যতীনবাবু, টেলিগ্রাম এসেচে আপনার! নীচের বারান্দা থেকে আমার রুম-মেট প্রমোদ হেঁকে উঠল।

আমার টেলিগ্রাম! হঠাৎ? বুকটা ধক্ করে উঠল—কোত্থেকে?

দেখি, বাবা টেলিগ্রাম করেচেন—মার সাজ্ঘাতিক অসুখ, মরণাপন্ন, শিগ্‌গির এখনি যেতে হবে।…

বুকটা ভীষণ দমে গেল। মার অসুখ! এত কঠিন? বাঁচবেন না?—নীল আকাশে পাখা ছড়িয়ে একটা পাখী উড়ে যাচ্ছিল। হায় পাখী, যদি আমার ডানা থাকত!

গ্রামের দ্বারে ট্রেন এসে থামলো। তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। নামলুম। সারা বুকের ভেতরটা গুমরে উঠচে, মা আমার বাঁচবেন না? যদি মাকে বাড়ি গিয়ে দেখতে না পাই? হাত-পা সব হিম হয়ে আসছিল।

তাড়াতাড়ি পা ফেলে চলছিলুম—ও কি! ঐ দূর মাদার গাছের ওপর দিয়ে শ্মশান থেকে কালো কালো ধোঁয়া উঠচে কিসের? কাদের অস্ফুট হরিধ্বনি, করুণ বেদনা-মথিত দীর্ঘশ্বাসের মতো…

ঝড়ের মতো বুকটা হূ-হূ করে উঠল। মা, মা, মা—চলে গেলেন? ঘাসের ওপর বসে পড়লাম। পৃথিবীটা যেন টলচে, সব যেন এখুনি ভেঙে-চুরে খান খান হয়ে যাবে!

ভারী মন্থর পা ফেলে-ফেলে বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালাম। বাড়িটা থম্ থম্ করছে। কোন্ মুখে ঢুকব, কোন্ মুখে? উঠানে এসেই একটা আহত কান্নায় আছড়ে পড়ে চেঁচিয়ে ডাকলাম—মা!

অশ্রুতে সব ঝাপসা হয়ে গেছে। আমার এই কাতর হাহা-রব শুনে ঘর থেকে কে একজন বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক ছুটে এসে আমার লুণ্ঠিত দেহটা তুলে ধরে বিস্ময়-বেদনা-মাখা কণ্ঠে শুধোলেন—কে? এ কি! যতীন? এ কি রে পাগল? কোত্থেকে এলি? হঠাৎ? এ্যাঁ!

আমি স্বপ্ন দেখচি না তো! এ কি, মা! মা ফিরে এসেছেন? আমি মাকে কঠিন করে জড়িয়ে ধরে বললাম—তুমি ভালো হয়ে গেছ, ভালো হয়ে গেছ? মা!…

মা কিছুই বুঝতে পারলে না, শুধু আমার আলিঙ্গনে নিথর হয়ে রইলেন।…লোকজন জমে গেল। বললুম—কাকে পোড়াচ্ছে ওরা ?…

মা বললেন—নাপিত-বৌকে, দুপুরবেলায় মারা পড়েচে। মার বিস্ময়দীপ্ত চোখের পানে অশ্রু-ঝাপসা চোখ দুটি তুলে তৃপ্তির স্বরে ডাকলাম—মা! বুঝলাম, হারিয়ে পাওয়ার সুখ কী !

মেলে ফিরে এসে দেখি, আমাদের মেশের যতীন বিশি তার মায়ের শোকে দিন-রাত কেবলি কাঁদছে !

বুঝলুম—টেলিগ্রামের খামে 'বিশি'র জায়গায় বিদ্বান টেলিগ্রাফ-মাস্টারটি বসু লিখেছিলেন !

কড়া নাড়া

দুপুরের রোদ্দুর ঝাঁ-ঝাঁ করচে।…

সামনের পড়ো জমিটায় কয়েকটা চড়ুই অবিশ্রাম কিচির-মিচির রব করচে !…

ধানের ক্ষেতের কোলে চুপটি করে গা এলিয়ে গ্রামের পথ যেন ঘুমিয়ে পড়েচে ; মাঝে মাঝে তার ঘুম ভাঙ্গিয়ে কোথাকার পায়ে হাঁটা পথিক এক-হাঁটু ধুলো নিয়ে হাট থেকে মন্থর পদে বাড়ি ফিরচে !…রৌদ্রময়ী প্রকৃতি, নিঝুম স্পন্দনহীন !…

আস্তে-আস্তে আমার বন্ধ দুয়ারে কে যেন কড়া নাড়লে।. উঠে দরজা খুলে দেখি, সে !…

সে তার নগ্ন বাহু দুটি দিয়ে চুলের খোঁপা বাঁধতে বাঁধতে মুচকে হেসে বললে—বাড়ির কেউ ঘুমিয়ে পড়েচে, কেউ গেছে পাড়ায় বেড়াতে! ·আমি সেই ফাঁকে চলে এসেছি।…

ঘরে এসে ঢুকলুম। সে বললে—দোরটা বন্ধ করে দাও, কেউ দেখলে আমাকে আর আস্ত রাখবে না।…

দরজা বন্ধ করে দিলুম।…

সে আমার চেয়ারটায় খানিক বসলে, বইগুলো ওলোট-পালোট করতে লাগল, ড্রয়ার ধরে টান মারলে, ট্রাঙ্কটা খুলে ফেললে, কখনো হাসলে, অভিমানে ঠোঁট ফুলোলে,

কখনো গলাটা জড়িয়ে ধরলে, কখনো হাতের কব্জিতে চিমটি কাটলে! তারপর সন্ধ্যা হবার আগেই সন্ধ্যার মতো করুণা একটি দৃষ্টি হেনে সে বাড়ি চলে গেল!

তারপর কতদিন কাটল, কত দুপুর চলে গেল, কত বসন্ত ধরণীতে আলতা-রাঙা পা ফেললে···আমার কড়া আর নড়ে না! জানি না, কতদূর সে মুঙ্গের—সেখানে গেলে এমনি করেই ভুলে যেতে হয়, যেখানে লোকে চিঠির কাগজও কিনতে পায় না!···

একদিন হঠাৎ আবার কড়া নড়ে উঠল—টুঙ্, টুঙ্, টুঙ! জানলা দিয়ে চেয়ে দেখি—পিয়ন! আথালি-পাথালি করে উঠল বুক! দরজাটা ঝনাৎ করে খুলে ফেললুম!···

···চমকে চেয়ে দেখি, মুঙ্গেরে সাদা চিঠির কাগজ আর পাওয়া যায় না, সেখানে পাওয়া যায় গোলাপী চিঠির কাগজ, আর সেখানকার গোলাপী খামের ওপরে ডগডগে আগুনের তুলি দিয়ে বড় বড় ছাপার অক্ষরে স্পষ্ট লেখা থাকে—শুভবিবাহ!···

সাগর-দোলা

রেঙ্গুনে জাহাজ এসে ভিড়ল। কালো জলের মিল ধরবার জন্য অনেকদিন থেকে আকাশ মেঘ সঞ্চয় করে ফিরেচে, আজ সন্ধ্যায় তাই বুঝি ঝড়ের এই বিপুল সমারোহ!···কেবিনে চুপ করে শুয়ে-শুয়ে আকাশ দেখছি, এলোমেলো মেঘের জটা, বিদ্যুতের ঝিকিমিকি, শীতল কথা-ভরা অন্ধকার,···চোখের কোণে দু-এক ফোঁটা জল জমচে, এলো হাওয়া দু-একটি বৃষ্টির কণা ললাটে চোখের পাতায় উপহার দিয়ে যাচ্চে, মনে হচ্চে কার যেন নরম সরু দুটি আঙুলের পরশ!···

পাখী বলে দিয়েছিল, অনেক করে, রেঙ্গুনে পৌঁছেই তাকে যেন চিঠি লিখি। পাঁচদিন হ'ল কলকাতা থেকে এসেছি, মনে হচ্চে এর মধ্যে কত পরিবর্তন হয়ে গেছে না-জানি সেখানে!···হাঁ, একটা চিঠি তাকে লিখলে হয়—আমাদের জাহাজ মাদ্রাজ যাচ্চে; তার দিদির বিয়ের কদ্দুর এগোল, সোনার কাঠি হাতে নিয়ে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে কোন্ সে রাজপুত্র ধূ-ধূ তেপান্তরের মাঠে পাড়ি দিয়েচে!··· বৃষ্টির সুরে আজ ভারী ব্যথা! কি অপরূপ বিচিত্র এই অন্ধকারটি! আজ যদি তার একটা চিঠি পাই! এই কালো ঘন মেঘের পথে যদি আজ কোনো বারতা আসে!

হাঁ, আসবে বৈ কি! পাখীই হয়ত লিখে পাঠাবে, তার দিদি এক শুভ তিথিতে সলজ্জ মস্তকে রক্তচেলীর একটি দীর্ঘ অবগুণ্ঠন পরিধান করেছে, তনু সুকোমল দুটি হাতে দুখানি কঙ্কণ ও শঙ্খ, সূক্ষ্ম সীমন্তে সিন্দুরের একটি রেখা, পায়ের ধারে আলতার একটু আলপনা! জাহাজটা থেমে আছে বলে ভালো লাগে না, ইচ্ছে করে এই অতল অথই গর্জমান সমুদ্র ভেদ করে সে চলুক আর চলুক—অজানা পথে-পথে কোন হারা জনের সন্ধানে…

বি. এ না দিয়ে 'মার্কনি-ওয়াচার' হয়ে যখন এই কয়লার জাহাজটায় এসে চাকরী নিলুম, তখন এক ধূসর অবসন্ন সন্ধ্যায় পাখীই আমাকে কাতর কণ্ঠে বলেছিল—একেবারে শেষটা দেখে গেলেই ভালো হত! চলে গেলে ভারী কষ্ট হবে যে দিদির! …না, তখন আমাকে সমুদ্র ডেকেচে, মাটি যে আর ভালো লাগে না, কঠিন নীরস মাটি, এই জল, নীল কাল রূপালী সোনালী জল, ঢেউয়ের পর ঢেউ, ফেনিল আবর্তময়!…

ভাল লাগচিল না, ইচ্ছে হচ্চিল, নিজেকে নিজে একটা চিঠি লিখি। তার একটা চিঠি পেতে ভারী ইচ্ছে করচে। মনে করি সে আমাকে আজ একটা চিঠি লিখচে। কী ভালো লাগচে এই সব আবোল-তাবোল ভাবতে! আজকের এই বৃষ্টি-ঝরা ক্লান্ত ঘুমন্ত রাত্রে সে চুপি চুপি শিয়রের মিটিমিটি প্রদীপটি জ্বালিয়ে আমাকে চিঠি লিখতে বসেচে অতি সন্তর্পণে ভয়ে ভয়ে পাছে কেউ দেখে ফেলে। তার চুলের কয়েকটি গুছি নীল কাগজটির ওপর এসে লুটোচ্ছে হাওয়ায়, জলে-ভিজা রজনীগন্ধার একটু গন্ধ চিঠির পাতায় ঘুমিয়ে পড়েচে আলগোছে, তার ছোট ছেটে লালচে আঙুলের ডগায় সবুজ একটু কালী লেগেচে, আঁচলটা একটু এলো হয়ে আছে, মেঝেয় লুটোচ্চে না! সে লিখচে—তুমি ফিরে এসো, কেন তুমি চলে গেলে, আমি রোজ বিকেলে পথের পানে চেয়ে থাকি, গত-বছরের এমনি বৃষ্টির রাতে আমরা দুজনে কত বর্ষা-মঙ্গলের গান গেয়েচি, আমার ভারী কান্না পাচ্ছে, তুমি ভারী নিষ্ঠুর, আমাকে এমনভাবে ব্যথা দিতে খুব বুঝি ভালো লাগে তোমার… এমনি অর্থহারা আপন মনে সে কত কথা না-জানি লিখে যাচ্চে উদ্বেল এই ব্যাকুলতার সুরে-সুরে এই সজল সুপ্তি-ভরা অন্ধকার বর্ষা-রাতে!…

প্রায় আটপাতা চিঠিটা লিখে ইতিতে লিখলাম সুন্দর করে—গীতি। হাতটা একবার কেঁপে উঠল! চিঠিটা মুড়ে মনে হল, এ কী সব ছেলেমানুষি করলাম। কী হবে এ সবে? না তার চিঠি পেতে যে ভারী ইচ্ছে করে। খামে আমার নামে মাদ্রাজের ঠিকানা লিখে দিলুম। মাদ্রাজ গিয়ে যখন পৌছুব, তখন এই চিঠি, পড়বার সময়

আমার কি একটিবার ভুল করে ভাববারও অধিকার থাকবে না, যে এ সত্যি সত্যি তারি চিঠি অধীর বিরহ-ব্যথায় সে আমাকে ফিরে যেতে বলেচে—সে লিখেচে, তোমাকে ছেড়ে আমার আর একটুও ভালো লাগে না যে। আমার ভারী জ্বর হয়েচে, মাথা ধরেছে খুব, তুমি কপালে একটুখানি হাত দাও, একটুখানি আমাকে আদর করে ডাক ?...

হায়রে আকাশ-কল্পনা ! অসহায় বাংলার মেয়ে, বন্দিনী, তার স্বাভিমতের মূল্য নেই, প্রতিবাদের অধিকার নেই, বিদ্রোহের ক্ষমতা নেই। সব ভুয়ো ধাপ্পাবাজি ! তবুও চিঠিটা ছিঁড়ে ফেললুম না ; অনেকদিন পর মাদ্রাজে চিঠিটা পড়তে হয়ত কিছু ভালো লাগবে।...পাখীকেও একটা লেখা হ'ল। দিদির বরের নাম, কি করে, কেমন দেখতে, সব লিখো ! বিয়ের সম্বন্ধ আসতেই তোমার দিদি কলেজ ছেড়ে দিল নাকি, কি বলে, খুব খুশি বুঝি আজকাল !...এই মেয়েটিই শুধু একলা নীরব একটি স্নেহ দিয়ে আমাকে বাধা দিয়ে বলেছিল—যাবেন না ; ভারী কষ্ট হবে যে ..বুঝলেন না তো কিছু, কত লুকিয়ে সে কাঁদে !...

ফেন-শীর্ষ-উচ্ছ্বসিত সমুদ্রের বুকে পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নার প্লাবন ছুটেচে, বাইরে চেয়ে চেয়ে খালি মনে পড়ছিল, তার সেই পুষ্প-শুভ্র সুকুমার একখানি হাত, আমার অসুখের সময় শিয়রের কাছে বসে আমাকে আঙুর ও বেদানা খাইয়ে দিচ্ছিল, কপালের ঘাম মুছে দিচ্ছিল। আর অক্ষম উৎসুক আমার হাতখানা টেনে নিচ্ছিল বারে বারে স্নিগ্ধ মুঠিটির মধ্যে।...সাদা একটা মেঘের কোণে একটা নিদহারা তারা জ্বলচে, মনে পড়ল একদিন এক বিষণ্ন সন্ধ্যায় বিদায় নিতে যাবার বেলায় সে বলেছিল—তুমি তো আর আস না !...মনে পড়ল, একটি স্বচ্ছ হাসি ও স্বল্প একটু ব্রীড়াতে গলার স্বর ভিজিয়ে অপরূপ করে বলেছিল—তোমার জন্যে পথের পানে চেয়ে রয়েছিলাম।

মাদ্রাজ। এখান থেকে জাহাজ সুপারী বোম্বাই হয়ে লণ্ডন যাবে, আর দিন বারো পরে। আবার মাটি—জাহাজটা একেবারে ডাঙার বুকে এসে ভিড়েচে। তবুও একটিবার কেবিন ছেড়ে নামতে ইচ্ছে হয় না। চুপচাপ শুয়ে-শুয়ে আকাশ দেখি, জলের গোল শুনি, আর দুই চোখের কোণে-কোণে অকারণে অশ্রু জমে ওঠে।... একদিন বয় এসে আমার হাতে একটা চিঠি দিয়ে গেল ; বুঝলুম, রেঙ্গুন থেকে গীতির নাম দিয়ে আমাকে যে-চিঠি লিখেছিলুম সেটা এসে হাজির হয়েচে ; কিন্তু কলকাতা থেকে পাখীর তো কোনো চিঠি এলো না ? তবে এতদিনে গীতির বিয়ে

হয়ে গিয়েচে বুঝি ? একটা হাহাকার বারে-বারে বুকে ঠেলে উঠতে চায়···হায়, যদি এই চিঠিটা সত্যি-সত্যিই···

জাহাজ নীল সমুদ্রে আবার পাড়ি দিয়েচে, পাখীর চিঠির জন্য আর সে অপেক্ষা করলে না। ঝড়ের কালো রাত্রি নেমে এসেচে, আকাশে আবার নটরাজ রুদ্রের বিজয়-অভিসার, সাগরের বুকে তাণ্ডবের দুরন্ত দোলা, ডেকটা কি ভীষণ দুলচে, কি মর্মভেদী হাহাকারের উৎসব লেগে গেচে বাহিরে। এই বাত্যা-ক্ষুব্ধ অন্ধকার রাতে তার একখানি চিঠি আমার বুকের ওপর যদি মেলিয়ে দেওয়া থাকত, তাহলে হয়ত চোখ আচ্ছন্ন হয়ে আসত সুকোমল একটি সুষুপ্তিতে···কিন্তু, কোথায় ঘুম, খালি ইচ্ছে করচে, ঐ ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্যথার অট্টহাসি হেসে করতালি দিয়ে উঠি।

ওভার কোটের পকেট থেকে সেই রেঙ্গুন থেকে লেখা চিঠিটা বার করলাম। এই চিঠিটিকে ভুল করে ভাবব, এই ভুল করে ভাবায় যে সুখ, যে না ভেবেচে সে বুঝবে না...চিঠিটা খুলতেই দুটি চুল খামের ভিতর থেকে হাওয়ায় আমার কোলের ওপর এসে পড়ল। এ কার চুল ! আমার চিঠিতে এ এল কি করে ? এ তো আমার নিজের চুল নয়, এ যে মেয়ে-মানুষের।···তবে ? কোত্থেকে এল এ চিঠি ? 'ইতি'তে দেখি, বড় বড় করে লেখা—তোমারি গীতি ! এ কার হাতের লেখা ? এঁ্যা ! এতো আমার হাতের লেখা নয়, আমি তো 'তোমারি' লিখিনি। তবে, তবে...? চিঠিটা তাড়াতাড়ি পড়ে ফেললুম। লেখা আছে—"বাবা রাজী হয়েচেন, শীগ্‌গির চলে এসো !···এঁ্যা ! আমি স্বপ্ন দেখচি না তো ? বাবা রাজী হয়েচেন ? পাগলের মতো ডেকের ওপর ছুটে এলুম, চারিপাশে গহন নিশ্চিন্ত অন্ধকার, বজ্রের হুমকি, বিদ্যুতের ঝিলিক, আর সমুদ্রের অবিশ্রান্ত কল্লোলোচ্ছ্বাস। বাবা রাজী হয়েচেন ? লোহিত সাগরের ওপর দিয়ে সার্চ-লাইট ফেলে জাহাজ সমুদ্রের সঙ্গে তাল রেখে রেখে চলেচে, কোথায় মাটি, কোথায় মাটি···মাটি মা আমার, তোমার কোলে আজ যে ফিরে যেতে চাই ! এই সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে সাৎরে-সাৎরে কোথায় তোমার কোল পাব ?···ঝড়ের ঝাপটায় টলে-টলে আছাড় খেয়ে পড়ে যাচ্চি বারে-বারে, বৃষ্টিতে দৃষ্টি অন্ধ হয়ে যাচ্চে, চীৎকার দিয়ে উঠছি, নিষ্ফল, ব্যর্থ এই হাহাকার ! একেবারে অনুপায় ! মাদ্রাজে যদি চিঠিটা খুলতাম ! এত বৃষ্টিতে আমার বুকের আগুন কি নিভবে না ? বাবা রাজী হয়েচেন ? বলে দাও গীতিমণি, কেমন করে যাই, এই গর্জমান বিপুল সমুদ্র, এই গভীর সূচীভেদ্য অন্ধকার, কেমন করে যাই আজ ?··· ডুবুক-ডুবুক, একটা বরফের পাহাড়ের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে জাহাজটা আজ রাত্রেই ডুবে একেবারে তলিয়ে যাক্...

মাটির ব্যথা

কলকাতার কোলাহল যখন প্রাণে এসে পৌঁছুল, মনে হল এবার যেন বাঁচলুম। এখানে কেউ বসে নেই, সবাই ছুটে চলেছে। ভাবলুম এদের সঙ্গে পা মিলিয়ে মিলিয়ে আমিও চলব, ভুলব, পিছে পড়ে থেকে নিজের কাছে নিজেকে বোঝা করে তুলব না, চলবার চাঞ্চল্যে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে যাব।

গ্রামের মুক্ত আকাশে যে স্বচ্ছন্দ অবকাশটি নিরন্তর উদাস করে তুলেছে মন, সেই অবকাশের আর স্থান নেই এখানকার আকাশে। হাজার চিমনীর ধোঁয়ায় আকাশের নীল রঙ কালো হয়ে গেছে। প্রাচীরের আবডালে বাতাস আটক পড়ে হাঁপিয়ে উঠছে দিনরাত, তার চলার ছন্দে ছুটির ঘর-ছাড়া বাঁশী আর বেজে ওঠে না সন্ধ্যায়। শ্যামাঞ্চিত মৃত্তিকার সুধা-উদ্বেল সুকোমল বুকখানি পাষাণে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে আছে। স্বচ্ছন্দবিহারিণী ভাগীরথী তার দুই পীড়িত সঙ্কুচিত কদর্য তীরের মধ্যে একান্ত কুন্ঠিত হয়ে বয়ে চলেছে। ভাবলুম বাঁচা গেল। এই পাষাণপুরী নগর-দানবী আমার মন ভুলালো। আমি আমার পান্সী বা গাঙশালিক চাই না—চাই না; আমার এই বস্তি চিমনী ড্রেন ট্রামই ভালো।

ভাবলুম, ছুটব। ধূমকেতু যেমন ছোটে, যে অগ্নি-নৃত্য-বেগে কোটি সূর্য ছুটে চলেছে, সেই ছোটার বেগ সমস্ত ধমনীতে অনুভব করতে লাগলুম। জীবনকে বিশ্রাম করতে দোব না। ছুটে ছুটে নিজেকে ক্লান্ত করে একেবারে হারিয়ে ফেলব। একেবারে হারিয়ে যেতে চাই—আমার আকাশ বাতাস মাটি নদী সবাকার শেষে কোন্ সে অপরূপ সব-হারাদের দেশে!

পথে পা খালি বাজতে লাগল। যত বাজে তত চলা থেমে আসে। ধূমাঙ্কিত কালো আকাশের পানে চেয়ে খালি মনে হয়—আমার কেউ নেই। কোলাহল-ক্ষুব্ধ জনতাকীর্ণ নগরীর পথ আমার মুখের পানে করুণ চোখে চেয়ে সুর মিলিয়ে বলে—আমার কেউ নেই।

আর পারলুম না। সেদিন সন্ধ্যার শেষে পথের মোড় ফিরতেই যে-বাড়িখানি হাতে পেলুম, সে-বাড়িতেই বরাবর ঢুকে পড়লুম। কিছু ভাববার দরকার ছিল না। যদি গলা ধাক্কা দিয়ে কেউ তাড়িয়ে দেয়, আবার নির্বিবাদে পথ চলব। আমার পথ-চলা কে কেড়ে নেবে?

বাইরের ঘরে ঢুকতেই দেখলুম একজন ভদ্রলোক একটি সোফায় আড় হয়ে শুয়ে একখানি খবরের কাগজ পড়ছেন। জুতোর আওয়াজ শুনে তিনি আমার মুখের দিকে চেয়ে শুধোলেন—"কি চাই ?"

আমি বললুম—"আজ তিনদিন কিছু খেতে পাইনি, যদি চারটি খেতে দেন আমাকে !"

ভদ্রলোক তাঁর চোখের দৃষ্টিটি সুকোমল স্নেহার্দ্র করে আমার পানে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন। আমার নোংরা অপরিচ্ছন্ন ছিন্ন জামা-কাপড়-জুতো রুক্ষ দীর্ঘ চুলগুলি তাঁর দৃষ্টির আশীর্বাদে সিক্ত হয়ে উঠল। তিনি স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন—'বসুন এই চেয়ারটায়।'

আমি অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। তিনি বললেন—'কিছু খান-নি তিনদিন ? আপনাকে ভারী শ্রান্ত দেখাচ্ছে। বসুন, কুণ্ঠিত হবেন না।'

মেঝেতে বসে পড়লুম।

ভদ্রলোক বললেন, 'ওখানে কেন, এই চেয়ারে বসুন না।'

বললুম—'না, এই নীচে বসতে পেরেছি, এই আমার পরম সৌভাগ্য মনে করি। আমি এ তিনদিন রাস্তার কলের জল ছাড়া আর কিছু খেতে পাইনি। আমি আর চলতে পারি না। মাথা গোঁজবার ঠাঁই ত আমার একটু নেই। আমাকে এখানে একটু থাকতে দেবেন ?'

ভদ্রলোক ঘাড় নেড়ে বললেন, 'হ্যাঁ, স্বচ্ছন্দে। নীচে আমার কত ঘর খালি পড়ে আছে।'

কান্নাধরা গলায় বললুম—'আমাকে আপনি তাড়িয়ে দিলেন না কেন চোর বাটপাড় বলে ? আমাকে কেন বিশ্বাস করছেন আপনি ?'

ভদ্রলোক বললেন—'ছিঃ, আপনি ক্ষুধার্ত হয়ে এসেছেন অতিথির মর্যাদাকে কি আমি ক্ষুণ্ণ করতে পারি ? আশ্রয় চেয়েছেন আপনি, ক্ষমতা থেকেও আশ্রয় যদি না দিই, তবে যিনি আমাদের জীবনে এত আনন্দ এত আশ্রয় দিলেন, তাঁর কাছে কি জবাবদিহি করব ? বলুন, আমি সমস্ত যোগাড় করে দিচ্ছি।"

এ কোথায় এসেছি আমি ? এ তো পাষাণের ঠাঁই নয়—এ যে মানুষের জগৎ—মানুষ !…

সেই নীচের ঘরে রাত্রে শুয়ে শুয়ে বালিশটা বুকে চেপে ধরে অনেকক্ষণ কাঁদলুম। কান্নায় ঘুম ধুয়ে গেল। খালি মাকে মনে পড়ছিল—আমার মা ! যত ভাবছিলুম কাঁদব না, তত অন্ধকারের গায়ে কার জানি না রোগা মুখের ওপর দুটি স্নেহ-

নিবিড় দীর্ঘ নয়নের দৃষ্টি ভাসছিল। উঠে বসলুম। ভাবলুম, আমার কেউ নেই—এ কথা ভাবার মধ্যে ব্যথার একটি অহঙ্কার ও বিলাস আছে। আমার যদি কেউই না থাকত, তবে এ খাট বিছানা বালিশ কোত্থেকে পাঠিয়ে দিল? অন্তরালে কে যেন আমার আছে।

দরজাটা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলুম। চেয়ে দেখি লক্ষ লক্ষ তারায় আকাশ ভরে আছে। রোয়াকটার ওপর বসলুম। কোত্থেকে লুকিয়ে একটুখানি হাওয়া মা'র মতো গায়ে হাত বুলিয়ে বদ্ধ গলির ধূলার ওপর লুটিয়ে পড়ল। মনে হল, কে যেন আছে। বললুম, ওগো আকাশের বিনিদ্র নক্ষত্র পুঞ্জ, অন্ধকার সুষুপ্ত ধরিত্রীর মুখের পানে চেয়ে কি দেখছ, কাকে খুঁজছ তোমরা? ওগো যুগ-যুগান্তরের বিরহী-বিরহিনীর নয়ন-প্রদীপ, যৌবন-জ্যোতি-চাঞ্চল্যে একি অপরূপ রাগিণী বাজাচ্ছ! কাকে চাও, বল? সে কোথায়? এই মূর্চ্ছিত দলিত ম্লান মাটির বুকে সে কোথায়? তাকে চিনে নিতে পারবে?

তারার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে আবার দু'চোখ জলে ভরে উঠল। অনন্ত আকাশের নীচে বসে নিঃসঙ্গ আপনাকে নিজের কাছে ভারী সুন্দর মনে হচ্ছিল। দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ ঢেকে ফুলে ফুলে বলতে লাগলুম—তুমি কতবার কত বেশে আমার ঘরে এলে, কতবার তোমাকে চিনি না বলে তাড়িয়ে দিলুম। এই গুঞ্জন ক্লান্ত নগরীর নিঃশব্দ রাত্রির নক্ষত্র-দীপ্ত প্রহরে এই চোখের জলে তোমাকে আবার দেখছি। তুমি ব্যথায় আমাকে মুক্তি দিয়েছ এবং মুক্তি দিতেও শিখিয়েছ। আমার সমস্ত ব্যথার অর্ঘখানি সমস্ত আকাশে ছড়িয়ে পড়ল অন্ধকারে।—

চোখ চেয়ে দেখি মেঘের ফাটল দিয়ে একফালি রোদ আমার বিছানায় এসে পড়েছে। ভাবলুম, বাইরে এই রৌদ্রের কত অপচয়, কিন্তু আমার এই ঘরে এই হৃদয়ে এই রৌদ্রের আর তুলনা কই? ছোট্ট এক ফালি ম্লান রৌদ্র—আশীর্বাদ ভরা যেন কার কল্যাণ স্পর্শ।

মুখ হাত ধুয়ে চুপ-চাপ বসে কি করব ভাবছি, সামনে মৃদু সুমধুর কার পায়ের আওয়াজ বেজে উঠল। চোখ তুলে দেখলুম একটি দীর্ঘাঙ্গী তরুণী—দুই চোখে তার সজল মাতৃত্বের স্নেহ—একটি রেকাবিতে করে কিছু খাবার এনে আমার কাছে রেখে মধুর কণ্ঠে বললে—'এটুকু খান।' বলে একটুখানি দাঁড়িয়ে চুড়ী দুটি একটু বাজিয়ে ধীরে ধীরে চলে গেল।

না না, এ আমি দেখতে চাইনি। আমার ক্ষুধার্ত মুখের সামনে এই পৃথিবীর কোনো মমতাময়ী নারী অন্নপূর্ণার মতো খাবারের থালা তুলে ধরে স্নেহ-বিহ্বল কণ্ঠে

বলবে—'খান্‌', এ আমি কোনোদিন চাইনি দেখতে। মেয়েটির দুটি পায়ে আলতার একটি ম্লান দাগ লেগে আছে, ইচ্ছে করছে ঐ দুখানি পা স্পর্শ করে তাকে প্রণাম করি। আনন্দ-দীপ্ত স্নেহোজ্জ্বল দুটি চোখে কি সুকোমল একটি আভা! আমার সমস্ত শরীর যেন জুড়িয়ে গেল। কালো চুলের মাঝে সিঁদূরের রেখাটি কি সুন্দর যে জ্বলছে! একদৃষ্টে খাবারের থালাটির দিকে চেয়ে রইলাম।

হুঁশ ছিল না, সেই মেয়েটি আবার এসে পিছনে দাঁড়িয়ে ম্লান কণ্ঠে শুধোলেন—'কাঁদছেন?'

তার মুখের দিকে চাইলুম। বললুম—'কান্না কি এতই সোজা? পুরুষ-মানুষের কান্না কি এত সহজেই আসে?'

আমার কথার মধ্যে একটি অতল হতাশের সুর বাজছিল, তা মেয়েটি বুঝলে। বললে—'এমন বেশী কিছু না, খেয়ে ফেলুন। তারপর আপনার গল্প বলবেন, আমরা শুনব।'

তার এই 'আমরা' কথাটির মধ্যে যে কি একটি নিঃশব্দ গভীর আনন্দপূর্ণ ইঙ্গিত আছে তার শিহরণ কেঁপে উঠল তার চোখের তারায়। সে আবার বললে—'আপনি খান, আমি ওঁকে ডেকে নিয়ে আসছি।' বলে চুলগুলি একটু দুলিয়ে আবার সে চলে গেল।

পারব না এখানে থাকতে। আমি এই স্নেহ-মেদুর স্নিগ্ধ চোখের দৃষ্টি সহ্য করতে পারব না। ধূলি-চিহ্নিত পঙ্কিল পথের পথিক আমি। আমাকে এই প্রভাতে আবার চলে যেতে হবে। খাবারের থালাটির দিকে সজল নয়নে চেয়ে রইলাম—দুটি টুকরো পেঁপে, কয়েকটি বেদানা ও আঙুর, কয়েকটি মিষ্টি···মাগো, এত ঐশ্বর্য কি আমার সইবে? খোলা দরজাটা দিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লুম।

পথে নেমে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। রোদ উঠছে, পথ তাতছে। একটা সরবতের দোকানে ভিড় জমেছে। ফুটপাথটা ভিজা। চেয়ে দেখি একটি নোংরা ছেলে দু'হাত দিয়ে মাটি থেকে সেই নোংরা মিষ্টি জল তুলে কাদা শুদ্ধু হাত দু'খানি দারুণ লালসায় চাটছে। আকাশের নীল নয়ন তখন কনকের সমুদ্রে অবগাহন করে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে। একটি মেঘ সাদা পাল তুলে পান্সীর মতো খুব ধীরে ভেসে চলেছে। চমৎকার এ পৃথিবী!

পথের মোড়ে ভিড়ের মধ্যে ঘাড়ের ওপরে কার একখানি হাতের স্পর্শ পেলুম। চমকে চেয়ে দেখি—সেই ভদ্রলোকটি।

তিনি বললেন—'চলে এলেন যে না-খেয়ে?'

একটু হেসে বললুম—'পথেই আমার ঘর। আমি পথ চলতেই ভালোবাসি।'

উনি বললেন—'চলুন, আগে খেয়ে নিন, তারপর পথ চলবেন। আপনাকে খেতে দিলে, আর আপনি ফেলে চলে গেলেন। উমা ভারী দুঃখ করছিল।'

উমা! ভাবলুম, মানুষ কতখানি আবেগ কতখানি হৃদয় দিয়ে শুধু দুটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ করতে পারে। উ আর মা,...দুটি নীরস প্রাণহীন শব্দ, কিন্তু পৃথিবীতে একজনের বুকের বীণায় ঐ নামটি কী আনন্দেই যে বাজে! ভাবলুম, পারি—আমিও পারি অমনি করে ডাকতে। কিন্তু কাকে?

বললুম—'চলুন।'

ভদ্রলোক বললেন—'আপনার গল্প শুনব।'

'আমার গল্প? আমার আবার গল্প কি? আমি পথিক, পথ আমার ধাত্রী, আমার মা, পথের কোলে আমার জন্ম, এই পথে-পথে আমি চলি, কোথাও আমি দেরী করি না।'

'কিন্তু আপনার মতো ঘরছাড়াকে ঘরে বেঁধে রাখতে চাই। চলুন, আপনাকে আমার প্রয়োজন আছে।'

'আমাকে?'

'হাঁ। আমার একটি ছেলে আছে, তাকে আপনি পড়াবেন।'

'আপনার ছেলে?'

'হাঁ। সেবার বেনারস থেকে বেড়িয়ে ফেরবার সময় পথের কিনারে একটি বছর সাতেকের ছেলে কুড়িয়ে পাই। উমা তাকে মাতৃত্বের পরম গৌরবে লালন করছে।'

'কে, আমার ভাই? তাকে আপনি কুড়িয়ে পেয়েছেন?'

'আপনার ভাই?'

'হ্যাঁ, এই ম্লান পঙ্কিল মাটি-মার বুকে আমার নামহারা ভাই-এরা জন্মায়। আকাশের তারার মতো তাদের চোখ, ফুলের মতো তাদের দেহ, নির্মাল্যের মতো শুচি শুভ্র তাদের জীবন। আমার কলঙ্কিত মার কলঙ্কিত সন্তান—আমার কলঙ্কিত ভাই এরা। তারপর...'

নীচের তলা থেকে দোতলায় একেবারে প্রমোশান হল। সুন্দর ছেলেটিকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বললুম 'আমি তোমার মাস্টারমশাই নই খোকাবাবু, আমি তোমার দাদা।'

ছেলেটি তার আয়ত দুটি চোখ তুলে আমার দিকে চাইল। এই বুকে আজ কাকে পরম নিবিড় স্নেহে জড়িয়ে ধরেছি? আমার মাটি-মার খোকা, দুলাল মাণিক!

হায় আমি নাকি একেবারে রিক্ত নিঃসম্বল হয়েই পথে বেরিয়েছি! অন্ধকার ঘরে আলোটা জ্বালালুম। পকেট থেকে সেই ফটোখানি ও ভাঙা দুটি কাচের চুড়ীর টুকরো, দুটি চিঠির ছেঁড়া কাগজ, দুটি চুল, পায়ের কটি নখ বার করলুম খামটা থেকে। ভাবতে লজ্জা হচ্ছে। সব হারিয়ে সব ফেলে চলে আসতে পারলুম, অথচ —ছি, কি দুর্বল আমি! এগুলির কি মূল্য? আশ্চর্য!

কিন্তু না, তোমাকে আজ আমি দেখেছি। তুমি আমার প্রণাম গ্রহণ কর। তোমার নরম শুভ্র দুই পাণিতলে একটি স্নিগ্ধ প্রেমের প্রদীপ জ্বলছে, তোমার দুই চোখে সন্ধ্যার সৌম্য আশীর্বাদ, তোমার সমস্তটি দেহে আমি সুন্দরের লিপিকা পাঠ করছি। তুমি মণি নও, হীরা-জহরৎ নও, আকাশ নও, তুমি মাটি, মাটি আমার. আমার মাটি-প্রিয়া তুমি, তোমাকে আমি চিনেছি এতদিন বাদে।

মেঘ করছে। আকাশকে ভারী মলিন দেখাচ্ছে। আলোটা নিবিয়ে আস্তে আস্তে ওদের ঘরের কাছে এসে দাঁড়ালুম। আমি ক্ষমা চাই না, আমাকে শাস্তি দাও। আমি কলঙ্কী কলুষ-ক্লিষ্ট, আমি পথবাসী পতিত···আমি মন্দিরের শুচিতা নষ্ট করতে চেয়েছি,...হা'রে বঞ্চিত বুভুক্ষু,...আমার মনের কোণে এত লোভও ছিল!

ঘরের দরজাটা বন্ধ। ছোট্ট একটু ফাঁক দিয়ে আলোর একটি রেখা উঁকি দিচ্ছে। দরজাটার সামনে ধুলোর ওপর আস্তে-আস্তে বসে পড়লুম।

কথা শোনা যাচ্ছিল।

'এসো শুতে এবার। আর কত রাত জাগাবে? দেব পুঁথি-পত্র ছিঁড়ে ফেলে। একলা শুতে ভালো লাগে বুঝি?'

'আর একটু, এই যাচ্ছি।'

একটু চুপচাপ।

'ওকি, ঐ লাল শাড়ীটা পরে শুয়েছ কেন?'

'তবে কোনটা পরব?'

'ঐ অপরাজিতা রঙের নীল ম্লান শাড়ীটি। দেখছ না, কেমন ঠাণ্ডা মেঘ করেছে।'

আবার একটু চুপচাপ। শাড়ীর একটু খস খস।

'ওকি! খোঁপা বেঁধেছ চুলে?'

'না গো না, গেরো দিয়ে রেখেছি। দোর. খুলে দোব। কি যে সব খেয়াল!'

'বেশ।'

'এসো। আলোটা নিবাও। চোখে যে লাগছে।'

দরজার ছোট ফাঁকটি অন্ধকারে ডুবে গেল!

'উমা !'

আবার চুপচাপ। চুড়ীর একটু রুনুঝুনু ! কিসের একটি শব্দ !

চৌকাটটার ওপর ধীরে ধীরে মাথা নুইয়ে দিলুম। তুমি আমাকে ক্ষমা কর। তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিলেও আবার আমি এসেছি তোমাকে দেখতে। তোমাকে দেখার সাঙ্গ যেন আর হতে চায় না। আমাকে তুমি ক্ষমা কর। ভাবছি তোমাকে আমি পাইনি, তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছ, এ কত বড় মিথ্যা কথা! বুঝলুম, তুমি আমার জন্যে দরজা বন্ধ করে দাওনি। বরং সকল দরজা খুলেই দিয়েছ।

ধীরে চলে গেলুম। কোথা থেকে যেন একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। ভারী করুণ! আকাশে সারি সারি মেঘের তাঁবু পড়েছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের প্রহরী সচকিত করে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে এই বর্ষার মেঘ, মানুষের সত্যিকারের মনের রঙ। জল ভরা তেমনি সুশীতল, তেমনি ব্যথা-ভরা করুণ, বিদ্যুতের মতন তেমনি ক্ষিপ্রতা, বজ্রের মতন গুমরানো আর বাদলের মতন বর্ষণ! হায়, এমন রাতে আমি ঘরে থাকতে পারি না, আমার মাটি-মা আকাশের দুই বাহুর তলায় তৃষিত বুক পেতে দিয়েছে।

ঘরে এসে আলোটা জ্বালালুম। পকেট থেকে সেই খামটা বার করলুম। এরা আমার জীবনের গল্প শুনতে চেয়েছেন। খামটা টেবিলের ওপর রেখে দিলুম। ইচ্ছে হল, ওর ওপরে কালি দিয়ে সুন্দর করে একটি নাম লিখে রেখে যাই—নূতন নাম। কিন্তু না ...

আলোতে খোকাবাবুর মুখখানি একটু দেখলুম। কোথাও কালিমা খুঁজে পেলুম না। রজনীগন্ধার মতো সুন্দর। পঙ্কজ আমার, ভাই আমার, নুয়ে পড়ে তার ললাটে একটি চুমু দিলুম। আমার ছোট ভাইটিকে আমি আজ চুমু দিচ্ছি। পথের ওপর যে-ছেলে মাটি থেকে সরবৎ তুলে চেটে খাচ্ছিল, এ যেন তারই মুখ, কিন্তু কি পবিত্র সুন্দর !

বাইরে এসে দাঁড়ালুম। আকাশ তার মেঘের বাহু দিয়ে মাটি-মার নির্যাতিত কণ্টক-ক্ষত পঙ্কিল বক্ষ বেষ্টন করে ধরেছে। এ কি অপূর্ব রঙে-রঙে মেশামেশি! পথ আবার আমাকে ডাকল। ঘূর্ণি-হাওয়ায় শূন্য পকেটে কয়েকটি ধূলিকণা এসে পড়ল। চললুম, ওগো আমার ঘরের বন্দিনী প্রিয়া, আমাকে বিদায় দাও।

মেঘ ডাকছে। ধূলি উড়ছে। যা কিছু ছিল সব খুইয়ে এলুম, দিয়ে এলুম। আজ সঙ্গে রইল, তা একান্ত আমার, আর কারুকে তা দেবার নয়, আমার...

আকাশ ভেঙে বৃষ্টির মহোৎসব শুরু হয়েছে।

ভুখা

রাত একটা।

মরা ছেলেকে নিয়ে আর কতক্ষণ কাঁদবে শৈল! ওকে ছাড়, শ্মশানে নিয়ে যেতে হবে নইলে ডোম-চাঁড়াল রেহাই দেবে না। কিন্তু চিতা কি আজ আর জ্বলবে? এই বিশ্বব্যাপী বর্ষা-রোদনের মাঝে আগুন নিবে যাবে না?

আর কার গায়ে কাঁথা টেনে দিচ্ছ? ঠাণ্ডা লাগবে খোকার? নাও আরো বুকের মাঝে খোকাকে টেনে নাও। ডাক্তার ক্ষমা করে চলে যায়, নিষ্ঠুর পাওনাদারদের পাওনার খাতায় দয়া কথাটা লেখা থাকে না, গরীবকে মুখ-ভাঙচি করে বাজারের জিনিসগুলির দর বেড়ে ওঠে।···খোকা ভারী শান্ত হয়ে ঘুমুচ্ছে, না শৈল! আজ বেচারীর ঘুম এসেছে অনেকদিন বাদে বাদলের গান শুনে। নাও, আরো টেনে নাও, বজ্রের গর্জন শুনে ভয় পাবে হয়ত।···

ভারী চমৎকার আছি, না? চারিদিকের বেড়াগুলি মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে, চাল উড়ে গেছে ঝড়ের ধাক্কায়, বৃষ্টির পশলা তাণ্ডব জুড়ে দিয়েছে আঙ্গিনায়। তুমি কাঁদছ কেন? মনে নেই, সেই বাদলের দিনে মেঘময় বেণী এলিয়ে কোন্ সে কার হারা-প্রিয়া মাটিতে নেমে আসত, ঘরে ধূপ দীপ জ্বেলে খোকাকে ঘুম পাড়িয়ে এই বাতায়নে তুমি আমার বুক ঘেঁষে বসতে আর বর্ষার গান গাইতে! দেখ আজ কেমন অপরূপ বর্ষা নেমে এল তৃষাদীর্ণ বৈরাগিনী ধরণীর তপ্তধূলিপথে। আমাদের আর কোনো গৃহের বন্ধন নেই, ঝঞ্ঝাক্ষিপ্ত রুদ্র উন্মুক্ত আকাশের নীচে আজ আমরা বসেছি। খোকাকে তো ঘুম পাড়িয়েছি, এবার উঠে এস। তোমার সেই আসমানী শাড়ীখানি এলিয়ে দাও দেহে। চুলগুলি তেমনি পিঠে ছড়িয়ে থাক মেঘের মতো, তোমার ছোট কালো চোখের তারায় চিকুর হানুক!

না, আমার মনে পড়ছে। তোমার সে শাড়ীখানি বিক্রী করেছি, দু'মাস আগে তোমার টাইফয়েড হয়েছিল বলে তোমার সমস্ত চুল কেটে ফেলেছিলাম। মনে পড়ছে।···কিন্তু শৈল, এমন বাদল রাত্রি। কতদিন দুজনে মুখোমুখী বসে কথা না কয়ে চোখে চেয়ে চেয়ে এমনি রাত কাটিয়েছি। এসো না, আজ একটু তেমনি খেলা করি। ঝিরি ঝিরি করে বৃষ্টির কণা চুলে এসে লাগত, ভিজতাম। আজ দেখ, কেমন পরিপূর্ণ মত্ততায় বৃষ্টি আমাদের ভিজিয়ে দিচ্ছে। বাইরের এই মহা তাণ্ডবের

নিমন্ত্রণ-আসন আজ ঘরেও পাতা হ'ল শৈল। নূতন জলে ভিজতে তুমি এত ভালোবাসতে! এমন মধুর সুশীতল রাত্রে তুমি কাঁদছ, সর্বাঙ্গে আনন্দ বিচ্ছুরিত করে তোমার করতালি দিয়ে উঠতে ইচ্ছে হয় না?...

না না হাস, কেঁদে কিছু হবে না, হেসে এই জীবনের ওপর প্রতিশোধ নাও শৈল। প্রচণ্ড অট্টহাসি হেসে এই জীবনকে ফোঁফরা করে দাও। জীবনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে, যত দুঃখ যত মৃত্যু যত ভুল সকলকে ধূলোর চেয়ে নীচে ফেলে থেঁৎলে দিতে পার না। চোখের জলে গলবে না দুঃখ, হেসে তাকে ফাটিয়ে দেওয়া চাই। ক্ষয়ক্ষীণ জর্জরিত পঞ্জর ভেদ করে একটা মর্মভেদী বিদ্রূপের অট্টহাসি—একটা জ্বালাময় উদ্গীরণ—তারপর সব শেষ।..

তোমাকে ভালবেসে এই পৃথিবীকে ভালবেসেছিলাম একদিন। একদিন শরতের নিষ্কলঙ্ক নীল আকাশ তার আনন্দ শুভ্র দুই চোখের আশীর্বাদে আমাকে অভিষিক্ত করেছিল মনে আছে। আজ দেখছি সেই আকাশের গা দুর্গন্ধ পারার ঘায়ে জর্জরিত হয়ে শিউরে উঠছে। তোমাকেও আজ কি কুৎসিত বীভৎস দেখাচ্ছে শৈল! ঐ মৃত বিকৃত ছেলেটাকে বুকে করাতে এই অন্ধকারে তোমাকে পিশাচীর মত দেখাচ্ছে। তোমাকে আমি নাকি আবার ভালবেসেছিলাম কোনোদিন! মিথ্যা কথা।

যাক্, চুরমার হয়ে যাক্ পৃথিবী। চেয়ে দেখ, ঘরের যে এক টুকরো ছাউনি ছিল তাও উড়ে গেল ঝড়ে। এবার একেবারে বন্ধনহীন উন্মুক্ত আকাশের তলায় আমরা দুই অভিসারিক যাত্রী শৈল! জীবনে আমাদের সেই অপরূপ বাদল-রাত্রি এসেছে আজ। উঠে বোস লক্ষ্মী! মাটির দীপটি জ্বাল আঙিনায় বন-তুলসীর মূলে, গোহালে ধূপের গন্ধ দাও, তোমার বেণী বেঁধে আমাকে স্মরণ করে সীমন্তে সিঁদূর পরিধান কর, আর খোকাকে পরীর দেশের গল্প বলে শোনাও!·· প্রলাপ বকছি। আর কি! আমি এবার চললাম। এই ঝড়ের রাত এখানে ডাকছে, প্রলয়দেবতার নিমন্ত্রণ-সভায় আমি চললাম, শৈল! এমন করে সব হারাবার দিনে আমি আর পিছনে পড়ে থাকছি না। তুমিও যাবে আমার সঙ্গে? চল। ঐ লাল শাড়ীটা পরে এসো। খোকা? ওকে আর কেন? ঐ যে জলস্রোত পথে পথে ডাক দিয়ে চলেছে, ওতে ওকে ভাসিয়ে দাও ফুলের নৌকোর মতো।

না, আমার খোকা, যাদু আমার, দুলাল আমার, এক মুঠি ভাত খেতে না পেয়ে মরেছে। যাবার বেলায় বললে, 'বাবা ভাত খাব'। আমি তাকে তা দিতে পারিনি। আজ পাঁচ দিন উপোস করে আছি; কোথায় ভাত পাব? পথের কুকুর বেড়ালের জন্যে যা জোটে আমাদের মাণিকের জন্যে তা জুটল না। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করেছি,

লোকে পদাঘাত দিয়েছে, ভ্রূকুটি করেছে, উপহাস করেছে, কিন্তু ভাত দেয়নি এক মুঠো। কাকে বলব? এই বিরাট অন্যায় অবিচারের শাসন কে করবে?

ঐ দেখ শৈল, ঐ বড় ইমারতটা। প্রকাণ্ড বাড়ি, ঘরে ঘরে ইলেক্‌ট্রিক জ্বলছে। ঐ বাড়িতে থাকে একটি যুবক, কিন্তু লাম্পট্যে ব্যভিচারে দেদার টাকা উড়িয়ে দিচ্ছে নির্বিবাদে, যার এক সহস্রতম অংশ পেলে আমাদের খোকামণি এমনভাবে হারিয়ে যেত না। ঐ প্রাসাদতুল্য অট্টালিকায় কত কুঠুরী বাজে খরচ হচ্ছে অব্যবহারে, কিন্তু আমরা যদি একটু মাথা গোঁজবার ঠাঁই পেতাম ওখানে, তাহলে তোমাকে নিয়ে কাল পথের মাঝে বীভৎস সাজে সেজে দাঁড়াবার দরকার হতো না। কিন্তু কেউ মুখ তুলে চায় না শৈল। যে যার ধান্দায় ঘোরে।···কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, তার এত অযথা টাকা ওড়াবার কি অধিকার আছে? প্রশ্নটা ভারী অদ্ভুত শোনাচ্ছে, জানি। কিন্তু···একজন রুগ্ন অশক্ত হতভাগ্য তার স্ত্রী-পুত্র নিয়ে এক মুঠি ভাতের অভাবে চিকিৎসার অভাবে মরছে, আর সে বৃথা বিলাসে ব্যসনে খোলামকুচির মতো টাকার ছিনিমিনি খেলছে। কি বিরাট প্রহসন এ পৃথিবীর! এত কলুষ এত পাপ এত দারিদ্র্য এত অন্যায় এত দম্ভ এত চীৎকার—তাকে আবার ভালোবেসেছিলাম!

আরো আশ্চর্য শৈল, যদি আমি আজ ঐ বিলাসী যুবককে গিয়ে খুন করি ও অর্থ লুট করে আনি, আইন আমাকে রেহাই দেবে না। আমি দরিদ্র, আমার একমাত্র ছেলে না খেতে পেয়ে মরে গেল, আমার স্ত্রীর বসন সেই লজ্জা নিবারণ করবার—আমার কোন কাকুতি শুনবে না সমাজ। অথচ শাস্তি দেবে। যদি বলি, ঐ ডাক্তারকে আমি খুন করেছি, কেননা সে আমার বাড়ি এসেও ভিজিট দিতে পারব না জেনে খোকাকে না দেখে চলে গেল, তবুও সবাই সেই ডাক্তারের পক্ষ নিয়ে আমাকে হাজতে ঠেলে দেবে। তুমি একলা আশ্রয়হীন হলে পথে পড়ে গোঙাবে, তোমার দিকেই কেউ ফিরে চাইবে না। এ সব দেখে তোমার হাসতে ইচ্ছে হয় এমন বিকট উন্মত্ত কুটিল হাসি, যার বিষাক্ত দুর্গন্ধের সামনে পৃথিবীর সমস্ত নিষ্ঠুরতা অত্যাচার কান্না ভয়ে কুঁকড়ে যাবে?

একি! ঝড় যে থেমে গেল শৈল! শুধু খোকাকে ছিনিয়ে নিয়ে আমাদের রেহাই দিয়ে পালিয়ে গেল ও? এ ঝড় যে থামে, তা তো জানতাম না। ও কি শৈল, ভাঙা মেঘের ফাঁক দিয়ে চাঁদের একটুকরো হাসি যে উঁকি দিচ্ছে। এ কি ব্যঙ্গ! শৈল শৈল, ওঠ, চাঁদ উঠেছে আকাশে, আর চুপ করে শুয়ে থেকো না খোকাকে

বুকে নিয়ে। একবার চেয়ে দেখ। আকাশকে কি অপরূপ দেখাচ্ছে। একি, এ্যা, শৈল, কথা কইছ না যে?…শৈল!…খোকা!…

রাত চারটে।

মালতী! এই জানলাটার সামনে বসো। বর্ষণক্লান্ত ম্লান আকাশকে কি সুন্দর যে লাগছে। এমনি কত বাদল রাত্রি জেগে জেগে কাটিয়ে দিয়েছি বৃষ্টির সঙ্গে কান্নার পাল্লা দিয়ে। তার সঙ্গে একটি রাত্রি জেগে কাটাবার ভারী ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তা পূর্ণ হল না। আজ তোমাকে নিয়েই এই রাত কাটিয়ে দিলাম। চমৎকার এ রাত! মালতী! বারে বারে তোমাকে এই নামে ডাকছি। কিন্তু তুমি ত তেমনি সুরে আদর করে ব্রীড়ামধুর কণ্ঠে আমাকে ডাকতে পারছ না। তোমাকে সেই মেঘলা রঙের শাড়ী পরিয়েছি বটে, কিন্তু তোমাকে তো তেমন সুন্দর দেখাচ্ছে না। তার গায়ে শাড়ীটি কেমন আলগোছে একটি সুশীতল ছায়ার মতো বেষ্টন করে থাকত, তাতে তাকে দেখাত একটি পেলব স্নিগ্ধ অপরাজিতার মতো করুণ সুকোমল। তোমার হাসিতে এত রুক্ষতা কেন, তোমার চাহনিতে কেন এত বিষ! তবুও তুমি নারী, তোমার নাম মালতী তাই তোমাকে ছেড়ে দিতে পাচ্ছি না।

তোমাকে যদি শুধাই তুমি আমাকে ভালবাস? তাহলে তুমিও হয়ত আমার এই রূপ এই বিলাস এই অর্থ দেখে বল, 'ভালোবাসি'। আমি তাতে আশ্চর্য হই না একটুও। আমিও বলি, তোমাকে ভালোবাসি। এই সস্তা ভালোবাসার কোনো অর্থ খুঁজে পাই না। যখন শুনি কেউ সেকথা উচ্চারণ করছে, তখন একটা প্রচণ্ড অট্টহাসির চীৎকার দিয়ে উঠতে ইচ্ছা করে।…

কিন্তু একদিন, আজ যেমন সমস্ত আকাশ বৃষ্টির আনন্দছন্দে দুলছে, তেমনি আমার সমস্ত জীবন দুলেছিল তার সুমুখে, যখন তার হাত দুটিকে এমনি করে ধরে তার দুই পরিপূর্ণ চোখের পানে চেয়ে তাকে বলেছিলুম ভালোবাসি!—না, ভাবতে পাচ্ছি না সে কথা।—ছিঃ তোমার হাত কি শক্ত। তোমার চোখে কি বীভৎস জ্বালা জ্বলছে, তোমার ঠোঁটে কি পঙ্কিল কদর্যতা কাঁপছে! তোমাকেই আমি তার সিংহাসনে বসিয়েছি। চমৎকার ভয়ঙ্কর এ মানুষ। তার ভালোবাসা প্রচণ্ড, বিদ্রোহও প্রচণ্ড! না, তোমাকে আমি ঘৃণা করি, তুমি চলে যাও বেরিয়ে।

না, কোথায় যাবে তুমি? আমি এই রাত্রি একলা জাগব? সে তার চুল ভরা মাথাটি তার স্বামীর বুকের কুলায়ে রেখে দেহবল্লরী অপূর্ব ভঙ্গীতে এলিয়ে বাদলের মেদুর স্পর্শটি অনুভব করছে, আর আমি এখানে হাহাকার করে মরব? না। আমার তুমি আছ। তোমাকে নিয়ে আমি মেঘের রাত্রির খেলা খেলব।—কেন

আমার কি হয়েছে? নিজেকে আমি এত বঞ্চিত হতে দেব কেন? আমার অর্থ আছে, স্বাস্থ্য আছে, রূপ আছে, আমার আবার অভাব কিসের? তারপর তোমাকে আবার পেয়েছি।

আবার ঝির্ ঝির্ করে বৃষ্টি নামল। দু'একটা কাক ডেকে উঠল। তার কালো চুলগুলি কেমন আদরে হয়ত বালিশের ওপর ঘুমিয়ে পড়েছে, শিয়রের খোলা জানলা দিয়ে হয়ত ভিজা ঠাণ্ডা হাওয়াটি তার শুভ্র ললাটটি স্পর্শ করছে, অন্ধকারে সাপের চোখের মতন হয়ত কানের দুলটি জ্বলছে। তোমাকে নিয়ে তেমনটি কিছুতেই সাজাতে পারলুম না মালতী। ঐ জানলাটাতেই সেদিন সে কি অপূর্ব সুশ্রীময় ভঙ্গীতে বসেছিল পথের দিকে চেয়ে! কিন্তু তোমাকে কি বিশ্রী দেখাচ্ছে! হায়, তোমাকে দিয়ে আমি তার পিপাসা মেটাতে চেয়েছিলুম!

না, তোমাকে আমি চাইনি, কোনোদিন না। জান, তোমার এ অভিমানকে ভয় করি না। বেশ ত, তোমার মূল্য আমি দেব, তোমার মূল্য দেবার আমার ক্ষমতা আছে, তাই তোমাকে যেমন খুশি তেমনিই আয়ত্ত করতে পারি। কিন্তু যে অমূল্য, যাকে মূল্য দিয়ে সীমাবদ্ধ করা যায় না তাকে হারালুম এ জীবনে। এ জীবনজোড়া কান্না দিয়েও তার মূল্য হলো না পাষাণী।
তাকেই চাই। যাও, যেখান থেকে এসেছ সেই পাঁকের পথেই নেমে যাও চলে।— নিয়ে যাও, যত কিছু টাকা মোহর রূপা সোনা দু'হাত ভরে নিয়ে যাও পিশাচী। আমি ওসব চাই না, ওসব আমার পথের ধূলোর চেয়েও জঘন্য অকিঞ্চিৎকর মনে হয়। আমি তাকে চাই, তার প্রেমকে আস্বাদন করতে চাই। এই বিলাস এই সম্পদ আমাকে পীড়া দেয়, প্রহার করে। আমার কাছে বিষ মনে হচ্ছে এ-সব।

ঐ চেয়ে দেখ মালতী, ভাঙা ঐ কুঁড়েখানি। অন্ধকারে ঠিক দেখা যাচ্ছে না। ঐখানে একটি ছেলে তার প্রিয়তমা স্ত্রী ও আদরের একটি খোকাকে নিয়ে গভীর আনন্দে হয়ত বৃষ্টির তন্দ্রাতুর রাত্রিটিকে ভোগ করছে। আমি যদি তাকে পেতাম মালতী, তবে ঐ কুঁড়েঘরই আমার স্বর্গনিকেতন হয়ে উঠত। তাকে নিয়ে এই বাদলের রাত জাগতাম বেড়ার ফাঁকে ফাঁকে বিদ্যুতের নৃত্যছন্দ দোদুল হয়ে কাঁপত, হাওয়া করতালি দিয়ে যেত কুঁড়ের গায়ে-গায়ে, আর তাকে বুকের মাঝে নিপীড়ন করে বৃষ্টির সুরে তাকে তেমনি ডাকতাম—মালতী!—ব্যঙ্গ বলে মনে হচ্ছে। কত বড় ফাঁকি রয়ে গেল এত আয়োজনের তলায়। না, আমি ভাঙা জীর্ণ পড়ো দরিদ্র একখানি কুঁড়েঘরই চেয়েছিলাম তাকে নিয়ে, তোমাকে নিয়ে এই প্রকাণ্ড অট্টালিকা

আমি চাইনি। এ আমাকে কেন দিলে ভগবান?—না, আমি এ সমস্ত বিলিয়ে দেব, ছড়িয়ে ফেলব চারিদিক দিয়ে।

আঃ কি সুন্দর ছন্দ বাজছে বর্ষার! দাদুরীর আওয়াজ কানে কি মিষ্টি লাগছে! মালতী! লতি!—এ্যাঁ। কে উত্তর দিলে না?—ও! তুমি। আমি ভেবেছিলাম সে বুঝি এসেছে। বৃষ্টির শব্দে তার পায়ের ধ্বনি যেন শুনতে পেলাম। হাওয়ায় তার ভিজা চুলের স্নিগ্ধ গন্ধটি নাকে এসে লাগল, নিজের দীর্ঘশ্বাসে তার মৃদুল মধুর শ্বাসটি যেন বেজে উঠল। আমার এই পরিপূর্ণ ডাকে তুমি সাড়া দিলে? সত্য করে বল—তুমি আমার মালতী? লতি?

অন্ধকারের কান্না

বাতি জ্বালবার সময়। মৌন ম্লান আকাশখানিকে মনে হচ্ছে একটি মধুর তন্দ্রা! রান্নাঘরের কোণে কাঠের ভাঙ্গা সিঁড়িটার ধারে ধারে যে পাতলা অন্ধকার জমাট বাঁধছিল, কাদের কথার ছোঁয়াচ লেগে বারে বারে তা শিউরে উঠছিল।

মৌনতা!

তুমি—

থাক, মুছো না চোখের জল লক্ষ্মীটি, ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে! যেন পদ্মের পাঁপড়ির ওপর দুটি ফোঁটা শিশির।

তুমি যেয়ো না।

হাওয়ায় দেবদারুর কচি পাতাগুলি কী সুন্দর কাঁপছে! আকাশের দুটি চোখে ম্লান কাকুতি ভরা। এই বদ্ধ সংকীর্ণ ঘরের কোণে সুগন্ধ অন্ধকারে এই প্রাচীরের আড়ালে তুমি বাঁচো কেমন করে?

তুমি আমাকে নিয়ে চলো। আর পারি না।

তবু তোমার সৌরভ পাচ্ছি। তুমি আমার মৌনতা। তুমি আমার অন্ধকার। তোমার মাঝে আমার অন্ধকার কাঁদছে!

প্রতি মুহূর্তে দম আটকে 'আসছে আমার।

তুমি যে বন্দিনী! তুমি আমার বাংলার মাটির মত শ্যামল সহিষ্ণু। তোমার দুই চোখে নিবিড় বেদনার ছায়া; তোমাকে ওরা হানছে রাত্রিদিন। অন্ধকারে ওরা

তোমার মুখ চেপে ধরেছে। আমার বাংলাকে তোমার মাঝে দেখছি। তুমি আমার বাংলা।

আমাকে তুমি মুক্তি দাও।

তাই ত চলেছি। মুক্তি মৃত্যুর মত, মায়ের মত আমাকে ডাকছে। যাবার আগে তোমাকে প্রণাম করে যাই।...সরো না! —দাও তোমার দুটি হাত, তোমার হাতে প্রণামের রাখী পরিয়ে দিই।

আমাকে নিয়ে চল।

না, বন্ধনকে দুই হাতে নিংড়াও, মুক্তির আনন্দরস ঝরে পড়বে।

কিন্তু জেলে যাবার আগে আর একবার দেখা করে যেও।

হয়ত আর দেখা হবে না।

আমি তাহলে কাঁদব।

অন্ধকার কাঁদে। তুমি আমার মৌনতা! আমার সমস্ত মৌনতা প্রকাশের অস্থিরতায় কাঁদছে।

ছেলেটি চলে গেল। মাটির ও আকাশের ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বলে উঠছে। মৌনতা সেই অন্ধকার কোণে দুই হাতে মুখ গুঁজে ধুলোর ওপর লুটিয়ে পড়ল জানু পেতে। তার ঘোমটার আড়াল থেকে রুক্ষ ছোট ছোট চুলগুলি ধুলা মাখতে লাগল। রিক্ত তনু আভরণহীন দুখানি শুকনো হাত পেতে মাটিতে মুখ গুঁজে পড়ে রইল অন্ধকারের মতো।

ওপারের নোংরা বস্তির জঘন্য ধোঁয়া ও অন্ধকার ভেদ করে একটি পুত্রহীনা কুলি মেয়ে চীৎকার করছিল।

মৌনতা উঠল। আবার আলগোছে মাথার ওপর ঘোমটাটি টেনে দিলে। মাটির বাতি জ্বালিয়ে দরজার পাশে রাখলে, ধূপ দিলে, তারপর শুভ্র একটি শঙ্খের মুখে নিজের দুটি আর্ত শুকনো ঠোঁট ছুইয়ে শঙ্খের মতোই নিটোল লালচে গাল দুটি ফুলিয়ে সমুদ্রের মতন আওয়াজ করলে। পরে শঙ্খটিকে বুকের ওপর চেপে ধরল।

রাস্তা দিয়ে তখন একদল ছেলে মশাল জেলে মুক্তির গান গেয়ে চলেছে। মৌনতার দু'চোখ জলে ভরে উঠল। সে একবার জানলার দুটো শিক দু' হাতে ধরে সজোরে নেড়ে কি জানি পরীক্ষা করল।

বাতিটার বুকের ওপর একটা পোকা বারে বারে এসে লুটিয়ে পড়ছে। ধূপ পোড়াও তখনও শেষ হয়নি। সব পুড়ছে। কেউ দিচ্ছে প্রাণ কেউ দিচ্ছে গন্ধ।

ছোট্ট একটা পিপীলিকা প্রকাণ্ড দেয়াল বেয়ে কোথায় চলেছে কে জানে? কোথায় তার ঘর? অতদূর সে যেতে পারবে অন্ধকারে? তবু যাচ্ছে।

জানলার শিকটা এটুকু শক্তিতে ভাঙবে না। তবু……

ঐ যে কুলি মেয়েটা কাঁদছে, নীরব নিথর ঐ আকাশ এ কান্না শুনে কী ভাবছে?

অন্ধকার!

বাদল নামবার সময়। মেঘের ভারে ভারে আকাশ নুয়ে পড়েছে প্রেমনত চোখের মতো!

একটা শুকনো আমের ডালে একটা শালিক ঠোঁটে করে তার বাচ্চাদের খাবার খাইয়ে দিচ্ছে।

মৌনতা চুপ করে অন্ধকারে বসেছিল বাতায়নের পাশে।

একটা ছোট্ট ছেলে কেঁদে কেঁদে ভিখ মেগে যাচ্ছে। হয়ত কতদিন খেতে পায়নি সে। তার ত্বটি চোখে বাদল আকাশের করুণ বেদনা ভরা! বেচারীর শীর্ণ ত্বটি হাত পাতবার কি করুণ ভঙ্গীটি!

মৌনতার তুই চোখ বেয়ে সেই অশ্রু ঝরছিল যা চুমুর চেয়েও মিষ্টি!

একটি মেয়ে ধীরে ধীরে কাছে এসে বসল।

মৌনতা!

কি?

আজো খাস নি?

না।

না খেয়ে কতদিন থাকবি?

জানি না।

কিন্তু শরীরকে কষ্ট দিয়ে কিছু লাভ আছে? এতেই কি তোর মুক্তি মিলবে?

জানি না।

তবে?

সে বলে গেছে, আমি তার বাংলা। আমি শুধু এইটুকু জানি। মুক্তি পাই কি না পাই কি আসে যায়? চাই না মুক্তি।

তবে না খেয়ে লাভ?

কে তার বিচার করবে? সে না খেয়ে আছে আজ এগারো দিন, আমার সমস্ত

দেশ আজ ক্ষুধায় চীৎকার করছে, আমার মুখে ভাত রোচে না। তা ছাড়া, আমার আবার খাওয়া।

কিন্তু বাড়ির এ অপমান কি করে সইবি ?

সইব। সইতে হবে। এই সওয়াতেই ত মুক্তি। আমি যে তোর বাংলা।

এই লাঞ্ছনা, অপমান ?

গলার হার করে রাখব। সেই ত আমার ভূষণ, আমার বাসক-শয্যা।

কিন্তু মরে যাবি যে না খেয়ে খেয়ে ?

মনে আছে, একদিন একাদশীতে জল চেয়েছিলুম বলে ওঁরা প্রায় মারতে এসেছিলেন, আজকে কিন্তু আমার না-খাওয়াটাই পাপ। আমি যে বাংলা। এই অন্ধকার ধোঁয়া প্রাচীর কারাগার, আমি যে পাষাণ, মৌনতা ; আমার মুক্তি নেই···

বদ্ধ নালীর জলে একটা পোকা পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে, উঠতে পারছে না।

ভিজে ডালে কাকের বাসায় বসে কাকগুলি মহলা দিচ্ছে।...

অন্ধকারের সুগন্ধ আমার প্রাণ ছুঁয়ে গেল। ঢেকে দিক এক বিভাবরী সমস্ত প্রকাশের লজ্জাকে, দিয়ে যাক গভীর গোপনতার মাধুর্য !

কিন্তু এ যে মৃত্যু !

মৃত্যু নয়, মুক্তির বিরহ।

বৃষ্টি নেমেছে। সমস্ত মাটি পিপাসায় কাঁপছে। গোপনে যাঁরা কুঁকড়ে ছিল, সব তৃণ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে পান করবার জন্য। অন্ধকার !

বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে ভেসে আসছিল ঘুমজাগা কোন রুগ্ন আর্ত শিশুর চীৎকার !

বাতাস হা হা করছে। মেঘের গর্জন নেই, খালি অবিশ্রান্ত কান্না।

এই অন্ধকারের পানে চেয়ে মৌনতার বারে বারে মনে হচ্ছিল আজ, সে বিধবা।

সে তার হাতের লাল রাখীটি খুলে ফেললে।

মনে হ'ল আকাশ জুড়ে দুর্দিনের বিপ্লব জেগেছে।

ইচ্ছে হ'ল আবার শঙ্খে সে ফুঁ দেয় এই রুদ্র রাত্রির বিনিদ্র প্রহরে।

সে দুটি হাত জোড় করে মেঘভৈরবকে প্রণাম করলে।

উপবাসে তার ক্ষীণ দেহটি শীতের লতার মতন কাঁপছিল শীতে। সে দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াল অন্ধকারে, বৃষ্টিতে। ধরণী তার তপ্ত তৃষিত বুক মেলে রয়েছে বৈরাগিনীর মতো। অন্ধকারের ঝুঁটি ধরে ঝঞ্ঝা চীৎকার করছে। আর অন্ধকারের সে কী করুণ কাকুতি !

সে আকাশের নীচে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল একলা। আকাশে একটি তারাও নেই।

একটি বিদ্যুতও চমকাচ্ছে না। একটি ফোঁটা জলও তার চোখ দিয়ে ঝরে পড়ল না। সে যে মৌনতা।

শুধু আর্দ্র মাটি থেকে সৌরভ উঠছিল।

লগ্ন

কলিকাতা আসিলেই মাসিমাদের সঙ্গে দেখা করিয়া যাই। আসিও অবশ্য কালে-ভদ্রে—তাও ব্যবসা সম্পর্কে। কারবারী মহাজনরা দোকানের জিনিসপত্র এখন ধারেই পাঠাইতেছে। এইবারেই যা হোক বেড়াইতে আসিয়াছি—কিছু বাজে খরচ করা এখন নেহাৎ বেমানান হইবে না।

কটকে পড়িবার সময় মাসিমাদের সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছিল। সেই ঘনিষ্ঠতাটা এখন অনেক ফিকে হইয়া আসিলেও একেবারে অলস স্মৃতিতে পর্যবসিত হইয়া যায় নাই। একবেলা নেমন্তন্ন আমার সে-বাড়িতে বাঁধা ছিল ও ভোজনান্তে মেসোমশাই-র সঙ্গে এক ছক্ দাবা আমাকে খেলিতেই হইত।

মেডিকেল-স্কুল থেকে ফেল হইয়া বাহিরে আসিয়া কিষণগঞ্জে এক মনিহারি দোকান খুলিয়াছি—শহরে আমি, মা, তিনটি অপোগণ্ড ভাই-বোন ও মফঃস্বলে যাবতীয় প্রত্যাশী আত্মীয়—এই নিয়া আমার সংসার; অবস্থাটা আরো কয়েক ধাপ না উঠিলে আমি যে আরেকটি বুভুক্ষু গ্রাসের দায়িত্ব গ্রহণ করিব না এই দেবদুর্লভ তেজেই আমার উগ্র আধুনিকতার আভিজাত্যটা কোনোরকমে এ-যাবৎ বাঁচাইয়া আসিতেছিলাম।

কিন্তু মা এইবার মাথার কিরে দিয়া বারে বারে বলিয়া দিয়াছেন যেন শ্যামপুকুরের গৌরীহরবাবুর ভাইঝিটিকে দেখিয়া আসি। বাড়ির নম্বরটাও জানিয়া লইয়াছিলাম। মেয়েটি নাকি সুন্দরী, (যে-ছেলের বিয়েতে আপাতত মত নাই, প্রত্যেক মার মতে সে-ছেলের পক্ষে সব অনূঢ়া মেয়েই সুন্দরী) স্কটিশে আই-এ পড়িতেছে, তাছাড়া—বাপ মেয়ের নামে কিছু সম্পত্তিও রাখিয়া গিয়াছেন। বুঝিলাম শুধু দেখা নয়, দস্তুরমতো পছন্দ করিয়া আসিতে হইবে।

কিন্তু সেসব কথা পরে হইবে, আগে মাসিমাদের সঙ্গে দেখা করিয়া আসি।

আরম্ভে বিশেষ কোনো মৌলিকতা নাই—সেই আদর-আপ্যায়নের ঘটা, চা-পেস্ট্রি,

জোলো রসিকতা। কিন্তু মারাত্মক খবরটা হইতেছে এই যে, পাঁচ দিন পরে কোন্‌-এক সদ্য বি. সি. এস্‌-এর সঙ্গে মড্‌ এর বিবাহ হইবে।

মারাত্মক এইজন্য নয় যে মড্‌ এর বিয়েতে আমার মানসিক কোনো কুসংস্কার আছে, নেহাৎই এইজন্য যে আমাকে এক সপ্তাহ পর্যন্ত এ বাড়িতেই সমানে অবস্থান করিতে হইবে ও আমার ব্যবসাবুদ্ধি পাকা ও ধারালো বলিয়া যাবতীয় জিনিসপত্র কিনিয়াও দিতে হইবে আমাকেই।

বরং কটকে থাকিতে আমি যখন ফার্মোকোলজির বই ফেলিয়া দুই বেলা ও-বাড়ি যাতায়াত করিতাম তখন বন্ধুরা বলাবলি করিত, যে ওষুধটির নির্মাণ ও মিশ্রনব্যাপারে আমি এত ব্যস্ত ও অধ্যবসায়ী হইয়া উঠিয়াছি, বাংলা অর্থে তাহার নাম প্রেম ও তাহার আধার হইতেছেন মাসিমার বুড়ো মেয়ে মিস্‌ এল্‌সি। এত গুজব গুঞ্জনের পর আমারো এক-আধটু সন্দেহ হইতেছিল, কিন্তু এল্‌সির সুষমায়িত যৌবনোচ্ছল দেহের অন্তরালে কোথায় যে তার মন এবং কী যে তাহার ভাষা, আমি কোনোদিন তাহা বুঝিতে চাহি নাই। সেকথা আমি বুঝিলেও বন্ধুরা বুঝিত না। তাই কালক্রমে এল্‌সির যখন বিবাহ হইল তখন আমার চেয়ে আমার বন্ধুরাই বেশী নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল। এবং তবুও আমি ও-বাড়ি যাওয়া বন্ধ করিতেছি না দেখিয়া বন্ধুরা নূতন করিয়া আমার সঙ্গে রবার্ট ব্রুস্‌ ও মড্‌ এর সঙ্গে মাকড়সার উপমা টানিতে লাগিল। মড্‌ তখন কত ছোট।

সেই মড্‌-এর বিবাহ হইবে। কোমর বাঁধিয়া কাজে নামিয়া গেলাম। বন্ধুরা কাছে থাকিলে আমার সঙ্গে আজ ফিলিপ্‌ সিড্‌নির তুলনা করিত কিনা জানি না। কিম্বা নির্লজ্জের মতো হয়ত বলিত যে এই কাণ্ডটা চুকিয়া গেলে একদিন আমি চুপি চুপি গৌরীহরবাবুর সম্পত্তিশালিনী ভাইঝিটিকে গিয়া দেখিয়া আসিব। নিতান্ত ব্যবসায়ী হইয়াছি বলিয়াই এ-যাত্রাও আমি রক্ষা পাইলাম।

কোমর বাঁধিয়া কাজে নামিবার আগে আরো একটা কাজ সারিয়া লইতে হইল। মড্‌কে জিজ্ঞাসা করিলাম—তোমার দিদি কোথায়? তাকে ত দেখতে পেলুম না।

মড্‌ কহিল—দিদি পুজো করছেন, চলুন দেখিগে—হ'ল কিনা।

খবরটা আগেই আমার কানে গিয়াছিল বটে, কিন্তু তাই বলিয়া এল্‌সি একেবারে পূজায় গিয়া বসিবে এ খবরটার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। বিশেষত নাম যাহার ফিরিঙ্গি, তাহার এই আচরণে মর্যাদা দিতেও কেমন অস্বস্তি লাগিল। এমনি নামটি তাহার মন্দ ছিল না, কিন্তু আজ এই নামের সূত্র আবিষ্কার করিতে গিয়া তাহার বাপকেই মনে মনে অপরাধী করিলাম। নামে যিনি বিলিতি আবহাওয়া আনিয়াছেন

তিনি অন্তত মেয়েটাকে পুনরায় পাত্রস্থ না করিয়া মার্বেল-পাথরে তাহার পূজার ঘর তৈরি করিয়া দিবেন—টাইটনিক-ডোবার পরে এত বড়ো দুর্ঘটনা আমি কল্পনা করিতে পারিতাম না।

ঘরের দরজাটা আধখানা খোলা ছিল। তাহারই ফাঁকে দেখিলাম এল্‌সি তাহার শামলা-পরা উকিল-স্বামীর বৃহদায়তন ফটোর গলায় প্রকাণ্ড একটা মালা ঝুলাইতেছে। আমাদের পায়ের শব্দে এল্‌সি ঘুরিয়া দাঁড়াইল।

তাহাকে আগে অনেক দেখিয়াছি বটে, কিন্তু মনে হইল, এই তাহাকে প্রথম দেখিলাম। কুমারী মেয়ে সৌন্দর্যচর্চা করিতে গিয়া কেন যে থান কাপড় পরে না,—কী যে তাহাদের রুচির কুসংস্কার—ভাবিয়া পাইলাম না। ভূষণহীনতা মেয়েদের যে কী অপরূপ রূপশালিনী করিয়া তোলে এই তত্ত্ব বাধ্য হইয়া এল্‌সিকে অবশেষে জানিতে হইল বলিয়া মনে মনে উহার ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিলাম। কথাটা শুনিতে খুব নিষ্ঠুর হইল, কিন্তু আর্টের সমালোচনায় একটু নিষ্ঠুর হইলে আপত্তি কী!

সমস্ত আবরণের নীচে এল্‌সির সর্বাঙ্গে এমন একটি শুভ্র ও উজ্জ্বল নগ্নতা আছে যে আমার মনে চকিতে সে ভিনাস্‌-এর মতো বন্দনীয়া হইয়া উঠিল। ওর শরীরে আভা প্রায় ব্রাহ্ম-মুহূর্তের আকাশের মতো, কিন্তু শরীরকে মনে হইল রাশীকৃত নরম সাবানের ফেনা—উন্মুক্তপক্ষ বিশাল একটা রাজহংস! দেহের ক্ষুদ্র সীমায় আবদ্ধ হইয়া ফেনিল লাবণ্যস্রোত উন্তাল হইয়া উঠিয়াছে।

এল্‌সি জিজ্ঞাসা করিল—কখন এলে?

বলিলাম—এই খানিক আগে। আছো কেমন?

—মন্দ কি? বলিয়া এল্‌সি এমন করিয়া হাসিল যাহাতে মনে হয় রাত্রির চঞ্চল কালো নদীতে তরল একটু জ্যোৎস্না পড়িয়াছে। এমন যে হাসিতে পারে, মুখ মেঘলা করিয়া পূজায় সে বসে কী করিয়া? একলা আসিয়া উঁকি দিয়া দেখিয়া গেলে পারিতাম।

মন্দ নাকি সত্যই সে নাই। মাসিমা বলিলেন—সারা দিন-রাত ঐ পূজো নিয়েই মেতে আছে। ওর দিকে আর তাকাতে পারি না।

আমি বলিলাম—ফের ওর বিয়ে দিয়ে দিলেন না কেন?

—বাবাঃ, কথাটা পেড়ে দেখো একবার, হয়ত আত্মহত্যা করে বসবে। সাধ্য-সাধনা কি আর কম করেছি আমরা?

কিন্তু এল্‌সি সম্বন্ধে বেশী আলোচনা করিতে মাসিমার এখন সময় নাই, কাহাদের নামে নিমন্ত্রণ-পত্র যাইবে তাহার ঠিকানা লইয়া তিনি ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন।

আত্মহত্যা হয়ত এল্‌সি করিত, কিন্তু তাই বলিয়া তিলে তিলে তাহার এই আত্মাবমাননার অভিনয়ও আমাকে দেখিতে হইত না।

সারা বাড়িতে প্রবল কলরব শিলাবৃষ্টির মত চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইতেছে—কিন্তু তাহার মধ্যে নিজের পূজার ঘরটিতে শব্দহীনতার গভীর সমুদ্রে আচ্ছন্ন হইয়া এই যে তাহার তপস্যা, ইহাকে অভিনয় বলিব না ত কী! কেবলই মনে হইতে লাগিল ইহার মধ্যে এল্‌সির একবিন্দু আন্তরিকতা নাই, তাহার বসিবার ঐ অটল ভঙ্গিটা তাহার রিক্ততার প্রতি উদ্ধত একটা তর্জনি-সঙ্কেত!

উৎসবের আর শেষ নাই—কিন্তু তাহা থাক্, পরের বিবাহের খবর লইয়া কি করিব!

উপরে, এল্‌সির পূজার ঘরের পাশের ঘরে আমার থাকিবার জায়গা হইল।

এতদিনে এল্‌সি হাতে একটা কাজ পাইয়াছে। অভ্যাগত-সমাগমে সমস্ত বাড়ি সরগরম, সব ঘর-দুয়ার বিশৃঙ্খল—কোথাকার জিনিস কোথায় পড়িয়া আছে হিসাব নাই—অথবা তাহারই মধ্যে এল্‌সি আমার ঘরটি পর্যাপ্তরূপে পরিচ্ছন্ন, এমন কি কবিতা লিখিবার উপযোগী করিয়া তুলিল। মেঝে হইতে দেয়াল পর্যন্ত সব তাহার হাতের নোখের মত ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। নীচু খাটে সুন্দর করিয়া বিছানা পাতিয়াছে —মনে হইল আমি যেন তাহার দুই হাতের শুভ্র স্পর্শের শত শত পাপড়ির উপর শুইয়া আছি। আমি যে এত প্রসাধন প্রিয় তা আমি নিজেই জানিতাম না, আন্দাজ করিবার এল্‌সিরও কোনো কারণ ছিল না—অথচ এত সব অঙ্গরাগের প্রাচুর্যের মাঝে এল্‌সি যেন তাহার রিক্ততার করুণ অভিযোগটি পাঠাইয়া দিয়াছে। সমস্ত বিলাস-দ্রব্যের মধ্যে যেন তাহার বাসনার গন্ধ পাইতেছি।

পরদিন ঘরের অন্ধকারে এল্‌সিকে ধরিয়া ফেলিলাম। আমাকে সে চুম্‌কাইল—অন্ধকারে নদীর তরল চাঞ্চল্যের মত তাহার দেহ বেষ্টন করিয়া শাড়ির একটা পাতলা ঝড় উঠিল। কহিলাম—বাড়িতে এত সব লোক এসেছে, তাদের সঙ্গে গল্প না করে আমার বিছানা পাতবার তোমার দায় পড়লো কেন? লোকে বলে কি?

কথাটা নির্দয়ের মত শুনাইল জানি, কিন্তু তলাইয়া দেখিলাম অত্যন্ত পরিচিতের মতও শোনায়। এবং তাই বলিয়াই হয়ত এল্‌সি রাগ করিয়া বাহির হইয়া গেল না। বরং কহিল,—তোমারো ত কতো কাজ, লুকিয়ে বিছানা-পাতা দেখবারই বা তোমার কোন্ দায় পড়েছে? অন্ধকারে এমনি দাঁড়িয়ে থাকলে লোকেই বা তোমাকে বলবে কী শুনি? বলিয়া এল্‌সি খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

তাড়াতাড়ি সুইচ টানিয়া আলো জ্বালিলাম। উজ্জ্বল উগ্র আলোতে চোখ উন্মীলন

করিয়া সমস্ত ঘরও যেন সেই হাসিতে স্পন্দিত হইতে লাগিল। চাহিয়া দেখি এল্‌সি আর ঘরে নাই, হাসির স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে।

তবু, বিছানায়ই গা ঢালিয়া শুইয়া পড়িলাম। এই হাসিটা এল্‌সির পূজার যে কোন্ মন্ত্র কিছুতেই আবিষ্কার করিতে পারিলাম না। খানিক পরে পায়ের শব্দে চোখ মেলিয়া দেখি এল্‌সি আবার আসিয়াছে—হাতে এক গ্লাশ সরবৎ। ম্লান হাসিয়া কহিল—অনেক খেটেছো, মা এই সরবৎটুকু পাঠিয়ে দিলেন।

তাহাকে দিয়াই বা কেন পাঠাইলেন এ কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া কাচের গ্লাশটা ধরিবার জন্য হাত বাড়াইলাম। কিন্তু গ্লাশের গায়ে আঙুল ক'টি এল্‌সি এমনভাবে বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছে যে আঙুল বাঁচাইয়া সে-গ্লাশ হাতে লওয়া অসম্ভব ছিল। তাহার আঙুল ক'টির উপর প্রায় মিলাইয়া-মিলাইয়া ধীরে ধীরে আমারো আঙুলগুলির চাপ রাখিয়া গ্লাশ লইতে গেলাম। এবং আঙুলগুলি দিয়া গ্লাশটা সবলে আঁকড়াইয়া ধরিয়াই টের পাইলাম কখন আমার আঙুলের ফাঁক দিয়া তাহার আঙুলগুলি আগেই পলাইয়া গেছে।

তবুও সে-স্পর্শের স্বাদ পাইলাম। তাহার দাঁড়াইবার কোমলতর ভঙ্গিতে, চোখের পরম উদাসীন ও পরম গভীর দৃষ্টির প্রশ্রয়ে, এই স্মিত লজ্জায়। সেই সূক্ষ্ম অনুভূতিটা এই সাময়িক স্তব্ধতার সুযোগ পাইয়া গাঢ়তর হইতে হইতে সর্বাঙ্গ-পরিপূর্ণ আলিঙ্গনের মত আমাকে আচ্ছন্ন, অবশ করিয়া ফেলিল।

খালি মনে হইতে লাগিল, এমন স্পর্শ কি না সে একটা ফোটোর কাঠের ফ্রেমের উপর অপব্যয় করিতেছে!

সারাদিন হাজারো রকম কাজে-অকাজে ব্যস্ত থাকি, মাঝে মাঝে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া এল্‌সিকে চোখে পড়ে—সারা দেহে সেই অটল দৃপ্ততা, চোখে যোগিনীর ঔদাস্য—উৎসারিত কোলাহলের উপর শব্দহীন বর্ণহীন প্রশান্ত আকাশের মতই সে বিরাজ করিতেছে—এতটুকু স্পৃহা নাই, এতটুকু ঔৎসুক্য নাই, ঐ কঠিন পর্বত হইতে একদিন বিপুলপ্রবাহে যে হাসির নির্ঝরিনী নামিয়া আসিয়াছিল তাহা নিজেই বিশ্বাস করিতে পারিলাম না।

এবং কাজ-কর্মের ফাঁকে যখনই নিজের ঘরটিতে গিয়া বসি, তখন পূজার গাম্ভীর্য বিসর্জন দিয়া কোনো ছুতায় এল্‌সিও আসিয়া কাছে দাঁড়ায়—এটা ওটা নাড়ে চাড়ে, তাড়াতাড়িতে ঘরের কোন্ কাজটা সম্পূর্ণ হয় নাই তাহাই সমাধা করিতে বসে। আর পৃথিবীতে ও বিবাহ-বাড়িতে এত সব বিচিত্র কথা থাকিতেও সে কি না নেহাৎ আজকালকার বাজার দর ও অত্যধিক গরম পড়ার কথা পাড়ে।

তারপর আবার কোন্ সময় নিজেই চুপ করিয়া যায়। সেই স্তব্ধতার মাঝে অসহনীয় প্রতীক্ষার একটা তাপ অনুভব করি।

আরো দুই দিন গেল।

বিবাহ সন্ধ্যার পরেই চুকিয়াছে, বাসর ভাঙ্গিয়া সখীর দল আপন আপন বিছানা খুঁজিতেছে—মড্ ও তাহার স্বামী এতক্ষণে নিভৃতে ঘনতর হইবার সুযোগ পাইল। নিমন্ত্রিতদের লাস্ট-ব্যাচ্ উঠাইয়া স্নানান্তে এক সরা মাত্র দই খাইয়া যখন চাঙ্গা হইয়াছি নিচের ক্লকে তখন তিনটা বাজিয়া গেল।

সমস্ত আয়োজন আড়ম্বরের মাঝে একটা প্রখর দারিদ্র্যের রূপ নিরন্তর আমাকে পীড়া দিতেছিল। মড্-এর বহুমূল্য বেনারসী শাড়ির পাশে এল্সির বেশবাসের নিরানন্দ শুভ্রতা আজ আর আমার মনে রসলিপ্সুর সেই সৌন্দর্য প্রসাদ আনিয়া দিতে পারিল না। নিজের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িলাম ও বিবাহ রাত্রির ছবি মনে এমন একটি স্নিগ্ধ আবহাওয়া রচনা করিতে লাগিল যে গৌরীহরবাবুর ভাইঝিটিকে তাহাদের শ্যামপুকুরের বাড়িতে একাকী শয্যায় ফেলিয়া রাখিতে পারিলাম না।

তন্দ্রা লাগিয়া আসিয়াছে—ঘুমের আবছায়ার মধ্যে বিছানাটাকে আরো নরম ও উষ্ণ মনে হইল। স্বপ্ন দেখিতেছি বুঝি—স্পষ্ট দেখিলাম স্বপ্নই দেখিতেছি—দুই বিশাল ডানা প্রসারিত করিয়া আকাশে উড়িয়া চলিতেছি, মেঘের পর মেঘের স্তূপ ভেদ করিয়া, দূর হইতে আরো দূরে, উর্ধ্ব হইতে আরও উর্ধ্বে—শেষে আর পথ খুঁজিয়া পাইতেছি না। যেন আর বাতাস নাই—নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিল।

চট্ করিয়া ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। মুহূর্তে বুঝিতে পারিলাম স্বপ্নে যাহাকে আকাশ ভাবিয়াছি তা আমার এই বিছানা, আর যাহা বিস্ফারিত মেঘস্তূপ বলিয়া মনে হইয়াছিল তাহা একটা দেহ!

ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন হইলে মানুষ যেমন এক মুহূর্ত স্তব্ধ হইয়া যায়, নিশ্চিন্ত থাকিবার ভান করে—তেমনি অবিচলিত চেতনায় ঘটনাটাকে আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিলাম। মনে পড়িল তাড়াতাড়িতে দরজাটায় খিল লাগাই নাই, খিল লাগাইবার দরকারও ছিল না, এবং এই দরজা ঠেলিয়া এল্সি ঘরে প্রবেশ করিয়াছে।

আলো জ্বালিবার জন্য উঠিয়া পড়িবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু এল্সি আমার একটা হাত চাপিয়া ধরিল। দেখিতে দেখিতে সেই হাতটার পঙ্গুতা সমস্ত শরীরে সংক্রামিত হইয়া গেল।

অন্ধকারে স্পষ্ট দেখিলাম আমার সারা বিছানায় আগুন লাগিয়াছে। এল্সির গায়ে তাজা রক্তের মতো টকটকে গাঢ় সিল্ক, ক্ষীণতম চাঞ্চল্যে তাহাতে ঝটিকা-আন্দোলিত

অরণ্যের বিক্ষোভ শুনিতেছি—দ্বিগুণতরো বিস্ময়ে আমার স্নায়ু-শিরা অসার হইয়া আসিল।

কী যে ভাবিলাম বা কি যে ভাবিলাম না—বুঝিতে পারিলাম না।

এক ঝটকায় এল্‌সির পরিপূর্ণতম প্রচুরতম স্পর্শের সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া সুইচ টানিয়া আলো জ্বালিয়া দিলাম ও সেই আলোতে নিজের পায়ের নিচে স্থির ও কঠিন আশ্রয় চোখে পড়িল।

সমুদ্র-দিগন্তে সূর্যাস্ত-রশ্মি বিচ্ছুরিত হইতেছে—এল্‌সির দেহের অনাবৃত অংশ কয়টিও লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। কহিলাম—কুণ্ঠিত হ'বার তোমার কিছুই কারণ নেই, এল্‌সি।

সেই প্রখর আলো সহ্য করিতে না পারিয়া এল্‌সি দুই হাতে চক্ষু ঢাকিয়া ফুপাইয়া উঠিল। কহিল—আমাকে তুমি ক্ষমা করো।

ছোট শিশুটির মতো তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলাম। কহিলাম—এতে ক্ষমা করবার কিছুই নেই। আমি তোমাকে অপমান করতে চাইনি।

এল্‌সি এইবার কান্নায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল: আমার ভীষণ ভুল হয়ে গিয়েছিলো —আমি—

—কিছুই তোমার ভুল হয়নি, এল্‌সি। তাহার পাশে বসিয়া সান্ত্বনার সুরে বলিলাম —তোমাকে এই অবন্ধন অনাবরণের মাঝে পেয়ে কিছুই তৃপ্তি ছিলো না। বেশ ত, উঠে দাঁড়াও এল্‌সি, ভোর হতেই মাসিমা আর মেসোমশায়ের মত নেব—আর বিকেল হ'লেই মড্‌রা হাওড়ায়, আর আমরা শেয়ালদয়ে গিয়ে ট্রেন নেব'খন। তোমার এত সেবা, এমন উৎসর্গ আমি ব্যর্থ হতে দেব না, এই রাতটা একা মড্-এরই সৌভাগ্যের রাত নয়।

দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া গভীরতর অনুশোচনায় এল্‌সি কহিল—কিন্তু এর পরে তুমি কি আমাকে ভালোবাসতে পারবে? না, না, সে কখনই হয় না।

—খুব হয়। হয় বলেই তোমাকে সমস্ত দেহ-মন দিয়ে এমন গভীর সম্মান দেখালাম। সে-আনন্দ আমার চেয়ে তোমারই বেশি, এল্‌সি।

নিঃশব্দ অথচ গভীর শোকের প্রাবল্যে এল্‌সি আলোড়িত হইতে লাগিল। সে যে কী নিদারুণ কষ্ট পাইতেছে বুঝিলাম। বলিলাম—ভালোবাসার চেহারাটা সব সময়েই সমান নয়। জনে-জনে তার প্রকাশের ভঙ্গিটা আলাদা, প্রকাশ রূঢ় হ'লেই যে ভালোবাসাটা গভীর হতে পারে না তার কোনো মানে নেই। আমাকে ভালোবাসতে না পারলে কাকে আর পারবে এল্‌সি?

এল্‌সি অস্থির হইয়া নির্জন কারাবাসীর মতো প্রায় আর্তনাদ করিয়া উঠিল—না, আমি যাই।

—যাবার জন্যেও দরজা খোলা আছে। কিন্তু যেতে যদি আমি না দিই?

এল্‌সি তেমনি নিশ্চেতন পাথরের মূর্তির মতো মুখ ঢাকিয়া বসিয়া রহিল।

বলিলাম—খালি আমি আর তুমি—এতে কোনো লজ্জা, কোনো ভয় নেই। তোমার বাবা মার মত আমি অনায়াসেই পেয়ে যাবো, আর তোমাকে বাড়ি নিয়ে গেলে মা স্বয়ং লক্ষ্মীকেই ঘরে তুলবেন। এতে চোখের জল কোথায়—কিসের বা ক্ষমা!

জানালা দিয়া চাহিয়া দেখিলাম ভোর হইয়া আসিতেছে। দূরে নদীতে কোথায় একটা স্টীমারের গম্ভীর বাঁশি বাজিয়া উঠিয়াছে—তাহা কানে আসিল। সামনের কম্পাউণ্ডে রাশি-রাশি যে শেফালিকা ঝরিতেছে, ভোরের দিকের ঠাণ্ডা হাওয়ায় টের পাইতেছি।

এল্‌সি দ্রুতপায়ে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বাকি রাতটুকু আর ঘুম আসিল না। অবসন্ন অন্ধকারে ম্লান একটি বিরহ বেদনা ক্লান্ত মনে আনন্দের মোহ আনিয়া দিল। বন্ধুরা আজ কাছে থাকিলে কি বলিত জানি না। গৌরীহরবাবুর ভাইঝিটিও প্রতিপদের ইন্দুলেখার মতো মনের আকাশে মিলাইয়া গেছে।

দুই চক্ষু মেলিয়া ভোরের আলোর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

কিন্তু ভোরবেলায় বাহিরে আসিয়া দেখি এল্‌সি তাহার লীলায়িত দেহ হইতে সিল্ক খুলিয়া ফেলিয়া ধবধবে সাদা থান পরিয়াছে, স্নান করিয়া পিঠময় ভিজা চুল এলাইয়া সেই ঋজু কঠিন ভঙ্গিতে পূজায় বসিয়াছে—সামনে বৃহদায়তন সেই ফটোটা ফুলের মালায় সমাচ্ছন্ন—প্রাণহীন ছায়ার পিছনে কোথাও কোনো সত্যবস্তু আছে কিনা তাহা দেখিবার জন্য তাহার আর এতটুকুও ভ্রূক্ষেপ নাই।

সবাই তখন মন্তুকে নিয়া ব্যস্ত—তাহার দিকে কে আর চোখ ফিরাইবে?

মালার জ্বালা

আজো ঘুম এলো না। মেঘলা করে আছে আকাশটা! ঝির্‌ঝির্‌ করে পাতাগুলি কাঁপিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। চোখের পাতা পেতে রেখেছি, চোখের ভেতরে যেন কিসের জ্বালা করছে, ঘুম আসছে না। লেখা কিন্তু নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোচ্ছে। তার একখানা হাত আমার গলা জড়িয়ে রয়েছে। ধীরে ধীরে হাতখানি নামিয়ে রাখলুম বিছানায়। আলো জ্বেলে চুপ করে বসলুম চেয়ারে। মেঘের আঁচলে চোখ ঢেকে তারাগুলি ঘুমিয়ে পড়েছে। আমার চোখে ঘুম নেই।

লেখাকে দেখছি। তার সেই মুখখানা—দেখলেই ভোরবেলাকার শিশিরের কথা মনে পড়ে—ঘন কালো ভুরুর তলায় রাত্রির রহস্যভরা ঐ দুটি মুদ্রিত কালো চোখ! ঐ লাখ দুটিতে অবগাহন করতে চাইতুম। ঐ তার দুখানি ঠোঁট! আনন্দের ফিন্‌কি ঝরে পড়ত! লাখ ডালিমের রাঙা রসে ভিজানো! কালো কোঁকড়ানো চুলগুলি মুখখানির দুপাশে আরামে ঘুমিয়ে পড়েছে। একটি চুলের ঘুম নেই। হাওয়ার সঙ্গে খেলা করছে। আজকের ভিজা আকাশের মেঘের মতন মোলায়েম লেখার চুলগুলি!

মনে পড়ল, অনেকদিন আগে—তখনো আমাদের বিয়ে হয়নি—লেখা সেলাই করছিল দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে। দুটি চুল মেঝের ওপর লুটোচ্ছিল। মনে আছে আমার সমস্তটা হাত সেতারের ঝঙ্কারের মত কাঁপছিল, ঐ চুল দুটি ছোঁবার আশায়। কেমন সন্তর্পণে তার অলক্ষিতে ধীরে ধীরে সেই চুল দুটি ছুঁয়েছিলুম! ইচ্ছা করলে আজ লেখার ঐ চুলগুলি নিয়ে কত খেলা করতে পারি। দুই হাতে জড়াতে পারি, সারা মুখে ছড়িয়ে তার মুখখানি আজকার আকাশের মতন অন্ধকার, মেঘলা করে দিতে পারি, তেমনি বেণী বেঁধে পিঠে দুলিয়ে দিতে পারি। ঐ চুলগুলি ত আমার। সেদিন তার একটি চুলের জন্য হাহাকার করে মরেছিলুম। আজ তার সমস্তগুলি চুল চুমোয় ভরে দিতে পারি। যদি বলি, ঐ চুলগুলি কেটে ফেল, সে হয়ত ফেলে। সে আমাকে ভালোবাসে। কিন্তু ভালো লাগে না চুল নিয়ে খেলা করতে। যদি কতগুলি ছেঁড়া রুক্ষ চুলের গুচ্ছ একটি লেপাফায় পূরে রাখি আজ, সে কি চোখে তেমনি একটি সুন্দর ভৎর্সনা ভরে বলে—'পুড়িয়ে ফেল ঐ খামটি।

তুমি ভারী—'? বলে না। আর আমিই বা লেপাফায় টিকিয়ে রাখব কেন? ও তো আমার। ঐ চুলগুলি যে আমার পায়ের ওপর লুটিয়ে দিয়ে কতদিন প্রণাম করে। তার ডান হাতটি বিছানায় নির্মমের মতো ফেলে এসেছি। ভাবছিলুম, ঐ তার হাতখানি দিয়ে সে কত কাজ করত, আমি চেয়ে থাকতুম। ঐ হাতে সে ছোট ভাই-বোনের জামা পরিয়ে দিয়েছে। ঐ হাতে রোগা দাদাকে চামচে করে দুধ খাইয়েছে। ঐ হাতে সে ছবি আঁকত, অর্গ্যান বাজাত, ছোট ভাইর হাঁটি-হাঁটি-পা-পা-র সঙ্গে করতালি দিত। আমি চেয়ে থাকতুম। আজ সে সেই দুটি হাত দিয়ে আমাকে বেষ্টন করে ধরে, আমি ঘুমিয়ে পড়লে কভু আমার পায়ে কভু বা কপালে হাত বুলিয়ে দেয়, ঐ হাত দিয়ে আমার টেবিল গোছায়, মাথা আঁচড়ে দেয়, আঙুর বা নাস্‌পাতির টুকরো খাওয়ায়, শ্রান্ত হয়ে এলে পাখার বাতাস করে। যার হাতের একটি স্পর্শের জন্য সমস্ত বিনিদ্র রাত্রি ধ্যান করতুম, সেই স্পর্শের অমৃত ভাগীরথীর মতো নেমে এসেছে। ঐ হাত দিয়ে কি না করতে পারি? কিন্তু ভালো লাগে না ওকে নিয়ে খেলা করতে।

উঠলুম। তার চারটি আঙুল বিছানায় নুয়ে নেতিয়ে পড়েছিল, একটি আঙুল যেন চোখ মটকে আমাকে দেখছে। হাতটি তুলে নিলুম হাতে। একদৃষ্টে চেয়ে রইলুম—এ কি সেই হাত? সেই আঙুল ক'টি? সেই দাদার টেবিল গুছোতে গিয়ে এক দোয়াত কালি ফেলে দিয়েছিল, আমার দিকে চেয়ে মুচকে একটু হেসে একটা ব্লটিং পেপার ও নেকড়া দিয়ে কালিগুলি মুছছিল, তার পাঁচটি আঙুলের লালচে ডগায় ডগায় কালি লেগে কি অপরূপ দেখাচ্ছিল—এ কি সেই হাত? যার প্রথম ছোঁয়া পেয়ে সমস্ত দেহ মরু রৌদ্রের মত ঝিম্ ঝিম্ করে উঠেছিল, সেই হাত কি এই? এই হাতটি ছোঁবার জন্যই কি দুর্নিবার লালসা জমে উঠত মনে? আশ্চর্য! মনে হয়, এই হাতের রং বদলেছে। কিন্তু না, বদলায়নি রং। আমিই হয়ত বদলেছি। বুঝি না। যেখানে সে হাতটি রেখে যেত কাঠের রেলিঙে, চেয়ারের হাতলে, জানালার শিকে, আমি লুকিয়ে লুকিয়ে স্পর্শ করতুম সেসব জায়গাগুলি। আজ এই তার দুটি করতল চুমোয় ভরে দিতে পারি। এই হাতের ওপর আমার পরিপূর্ণ অধিকার। কিন্তু না, চুমো দিতে ভালো লাগে না।

ট্রাঙ্ক থেকে সেই লেপাফাটা বার করলুম। তাতে কয়েকটি চুল লুকিয়ে রেখেছিলুম। ভারী ভালো লাগছে দেখতে। এই চুলক'টির মধ্যে কি জানি কি আছে যা আমার সমস্ত রক্ত উতলা করে তুলছে। কিন্তু ঐ তো লেখা চুলের ঢেউ বইয়ে দিয়েছে। আমার এ ক'টি সামান্য চুলে কি হবে? মুঠি মুঠি করে গুছি গুছি ঐ কালো নিবিড়

চুলগুলি স্পর্শ করি। না, এই ক'টি মাত্র চুল আমার কাছে পরম ঐশ্বর্য বলে মনে হচ্ছে। এর মাঝে আমি যেন কিসের বাণী শুনতে পাচ্ছি এই মেঘলা রাতের বাণী! এই চুল ক'টিকে দেখে এই চুলের অধিকারিণীকে ভালোবাসতে ইচ্ছা হয়। ইচ্ছা হয় তার জন্য রাত জাগি। সে কি এই লেখা?

এগিয়ে গেলুম। ডান হাত দিয়ে বালিশে লোটানো ভিজা নরম চুলগুলি তুলে নিলুম, বাঁ হাতে সেই ছেড়া ক'টি চুল। পরশ পাচ্ছি কি না, ভালো ঠাহর হচ্ছে না। কিন্তু মনে হচ্ছে, বাঁ হাতটা যেন বাজছে, ডান হাতটা বোবা। নীচু হয়ে মিলিয়ে দেখলুম। রং বদলেছে। এরা একই জনের চুল নয়। বাঁ হাতের চুলের অধিকারিণী ছিল উপবাসক্ষীণ বিরহ ব্যথিত একটি সন্ধ্যায় ফোটা অপরাজিতার মতো ম্লান মেয়ে। সে চুলে গন্ধ তেল মাখত না, তাই তার চুল ছিল রুক্ষ, জটিল। সে কোনোদিন সিঁথিতে সিঁদুর পরত না, তাই তার চুল ছিল এত স্নিগ্ধ, পেলব। কোনোদিন সে অবগুণ্ঠনের আবরণ রচনা করে তার চুলকে লজ্জা দিত না, তাই তার চুল ছিল এত দুরন্ত, চটুল। কিন্তু এর সব যেন বদলেছে। চুলের আপন গন্ধ কৃত্রিমতায় ঢাকা পড়ে গেছে। এ ভারী সুন্দর করে আচড়ায়। পরিপাটি করে খোঁপা বাঁধে। সোনার চিরুণী গোঁজে, ফুলের মালা জড়ায়। শুনেছি এতে নাকি মেয়েদের সুন্দর দেখায়। আমার চোখে লাগে না কেন?

হাতে সে কত আভরণ পরেছে। ইচ্ছা করে সমস্ত গয়না খুলে ফেলি। শুধু পরিয়ে দিই দুটি কচু পাতার রঙের কাচের চুড়ী। সে কত শাড়ী পরে—ধানী ঘাসী আসমানী আনারসী। তাকে কেমন করে বলব—'তুমি এই সব শাড়ী ছেড়ে ফেলে তোমার সেই ময়লা চওড়া-লালপেড়ে শাড়ীটি পর, আঁচলাটি গোছা করে কোমরে জড়ানো থাক্ এখানে সেখানে! আমি তেমনি মুগ্ধ হয়ে তোমার বসনের পানে অপলক চোখে চেয়ে থাকি।' বলতে পারি না। বললে হয়ত ঠাট্টা করবে।

ব্যাগ থেকে একটা চিঠির টুকরো বার করলুম। বোর্ডিঙ থেকে লেখা! যেদিন পেয়েছিলুম এ ছোট্ট চিঠিটি, সেদিন মনে হয়েছিল আকাশের একখানি নীল মেঘ যেন বুকে নেমে এল। সে লিখেছিল—'তুমি বড় চিঠি লিখতে বলেছ, কিন্তু কি যে লিখব ভেবে পাচ্ছি না। সর্দি হয়েছে, ভারী জ্বর জ্বর করছে। লিখতাম না, কিন্তু বারে বারে বলে গেছ একটা চিঠি দিতে, তাই লিখছি। নইলে হয়ত আবার রাগ করবে। কাল তোমার চলে যাবার পর কতগুলি কথা মনে হয়েছিল তা মনেই রয়ে গেল। খাবার ঘণ্টা বাজছে। চললাম। ইতি। চার বছর আগের চিঠি। সে চিঠিটা পড়ে সেদিন মাতাল হয়ে গিয়েছিলাম যেন। চিঠি কেন, একবার খাতায় আমার

কলমটা দিয়ে শুধু আমার নাম লিখে দিয়েছিল। কত রাত জেগে জেগে সেই নামটি খালি দেখেছি। সামান্য একটি লাইন। তারপর বিয়ের পর সে তার কথা ও কবিতার উৎস খুলে দিয়েছে চিঠিতে চিঠিতে দীর্ঘ আট দশ পাতা ভরে চিঠি—কত বর্ণচ্ছটা কত প্রকাশ-বাহুল্য কত প্লাবন, কত কোলাহল! মনে হয় শুধু মধুচক্রটাই ভাঙল, মৌমাছি কোথায় পালিয়ে গেছে। অথচ এই চিঠিটা কি বিশ্রী তাড়াতাড়ি করে লেখা একটা এক্‌সার-সাইজ খাতার পাতা ছিঁড়ে, পাশে একটা লাল কালিতে মার্জিন দেওয়া!

পুরোনো ডায়রীটা খুললাম। দোসরা আশ্বিন। তখন লিখেছি—'ভগবান, তাকে যদি একটি রাত্রি ভরে পেতুম—এই বর্ষণমুখর আশ্বিনের অন্ধকার একটি রাত্রি! আর আমি তোমার কাছে কিছু চাই না দেবতা! এই অনাদি আকাশের নীচে খালি আমি আর লেখা, লেখা আর আমি। শুধু তার ভোরের ফোটা জুঁইফুলের মতো মুখখানি এই বুকের ওপর টেনে এনে বলতুম—ভূমিকম্পের আলোড়ন শোন এই পাঁজরের তলায়, এই তপ্ত সাহারার ধুলায় তোমার একটি ফোঁটা চোখের জল উপহার দাও। যদি একটি ক্ষুদ্র রাত পেতাম! এত বড় সংসারে তাতে কার কি ক্ষতি হত? ওগো কৃপণ তুমি প্রেমকে এত বঞ্চিত কর কেন? তাকে কেন এত জর্জরিত কর?'

না, ভগবান কৃপণ রননি। তিনি অপর্যাপ্ত আনন্দ ঢেলে দিয়েছেন। একটি রাত চেয়েছিলুম। তিনি কত রাত দিলেন! তারাজাগা স্তব্ধ নিশীথ, ঝঞ্ঝাকম্পিত ক্ষ্যাপা প্রলয়রাত্রি, মৌন-মুগ্ধ জ্যোৎস্না রজনী, তারপর আবার এই নিদ্রাহীন অলস বিভাবরী! কিন্তু যে রাতটি চেয়েছিলুম সে রাতটি যেন এলো না। আষাঢ়ে শ্রাবণে, ভাদরে আশ্বিনে অনেক বৃষ্টি ঝরল, অনেক ছন্দ শুনলুম, লেখাকে বুকের ওপর টেনে আনলুম অনেক ভঙ্গীতে। কিন্তু তেমনটি যেন হ'ল না। ভিজল না। কোথায় যেন ষড়যন্ত্র লেগেছে আমার বিরুদ্ধে। তেমন রাত আর আসে না। আজো ত লেখা না ঘুমিয়ে আমার এই রাত্রির পেয়ালায় অবিশ্রান্ত চুমুক দিতে পারে আনন্দে বেদনায়। কিন্তু না, তার ভারী ঘুম পেয়েছে। সারাদিন খেটে এখন ঘুমুতে না পারলে তার শরীর থাকবে কেন? যদি বৃষ্টি আসে, আসে, তবুও হয়ত ওর ঘুম ভাঙবে না।

অবাক হয়ে যাই। যার একটি স্পর্শ পাবার জন্য তৃষিত হয়ে থাকতুম, সে আজ আমার বিছানায় শুয়ে, একা, এই নিথর রাত্রে? সত্যি? এ কি সেই? মনে হ'ল, না, একে চিনি না। কোথায় যেন আর একটি মেয়ে ছিল। তাকে আমার এখনো

মনে পড়ে। আষাঢ়ের প্রতি রাত্রির মেঘের সঙ্গে সঙ্গে সে আসে, বসন্তের প্রতি নিশ্বাসে তার সাড়া পাই। একখানি আধময়লা কাপড় পরে জানলায় বসে আমাকে বিদায় বেলায় একটি শেষ সজল দৃষ্টি উপহার দিত। আমার দিকে দুটি চোখে অপরূপ নিতল নিঃশব্দ ব্যথা পুরে থমথম করে চেয়ে থাকত। মাঝে মাঝে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদত। এ যেন সেই চাহনি সেই কান্না ভুলে গেছে। এ আর জানলায় দাঁড়ায় না। জানে যে আমি আবার ফিরে আসবই। কিন্তু সেই মেয়েটি জানত, আমি পথে নেমে চলেছি, কোথায়, কেউ জানে না, হয়ত পথ ভুলে আর নাও ফিরতে পারি। তাই সে অমন করে চোখের দীপ জ্বেলে পথের নিশানা বলে দিত। বলত—আবার ফিরে এসো। পথ হারিও না। তোমার জন্য বাতায়নে বসে আছি। কিন্তু এ জানে আমাকে আসতেই হবে ফিরে। তাই সে আর অনাবশ্যক জানলায় দাঁড়ায় না। ভুলে দাঁড়ালেও তেমনি চোখে চাইতে পারে না। তার চোখের চাহনি কথা কইতে ভুলে গেছে। আমিও যাবার বেলায় আর তাকে লুকিয়ে দেখে আসি না। জানি, তাকে ত সম্পূর্ণ করেই পেয়েছি। যখন খুশি, তখনই ত তাকে পেতে পারি। লুকিয়ে দেখবার আর কি দরকার?

বাস্তবিকই এ কে, চিনি না। তাড়াতাড়ি উঠে লেখার হাতখানি নেড়ে দিয়ে ডাকলুম—'লেখা! লেখা!'

লেখা তাকাল। তার দুটি চোখে ঘুম লেগে আছে। এ চোখ ত কোনোদিন দেখিনি। চোখের পাতায় দুটি চুমু দিলুম। বললুম—'আমার ঘুম আসছে না।'

সে বললে—'তাই বুঝি আমাকে জাগালে? বেশ! আমি বুঝি আর ঘুমুব না?' পাশ ফিরল। চোখ বুঁজল আবার।

কথার স্বর অচেনা মনে হচ্ছে। এ যেন কে? ভেবেছিলুম, বলবে—এসো, আমিও আর ঘুমুব না তবে। এসো এই অন্ধকার দেখি! কিম্বা হয়ত বলবে—এসো, শোও লক্ষ্মীটি, তোমাকে আমি ঘুম পাড়িয়ে দিই। বলে চুলে কপালে মুখে তনু নরম হাতখানি বুলিয়ে দেবে আর আবছা স্বরে ছড়া কাটবে—

দুষ্টু ঘুমায় দস্যি ঘুমায়
আমার ঠোঁটের একটি চুমায়!

আবার তাকে জাগিয়ে দিলুম। বললুম—'বল ত, লেখা, তুমি কে?'

সে হাসল। পারল না—তেমন হাসিটি ফুটল না ঠোঁটে। কি রকম জানি জলো হয়ে গেল হাসিটি! এ হাসিতে যেন কি বিদ্রূপ? এতে যেন সুগভীর বেদনাটি মেশানো নেই। ভালো লাগে না এই হাসি!

সে বললে—'আমাকে তুমি চেন না ?'

তার কাছে এসে বসলুম। বললুম—'না, তোমাকে আমি চিনি, চিনে ফেলেছি।'

—'তবে জিগ্‌গেস করছ কেন ?'

—'তোমাকে আমি চিনতে চাইনি এমন করে। তুমি আমাকে এমন করে কেন চেনালে লেখা ? তোমার রহস্যের অবগুণ্ঠনটি এমন সম্পূর্ণ উন্মোচন করে দেখালে কেন ?'

—'পাগল হয়েছ নাকি ?'

এর আর উত্তর দেওয়া চলে না। সেইদিনের ডায়রীটার কথা মনে পড়ল। লিখেছিলুম—প্রেমে পাগল হয়ে গেছি। সেদিন সে একটা তেলের বোতল ভেঙে ফেলেছিল। তেলগুলি তুলতে গিয়ে হাতে তেল লেগেছিল। চারদিকে একবার ভালো করে চেয়ে আমার মাথায় সে হাতখানি রগড়াতে লাগল। তারপর গ্রীবাটি হেলিয়ে দুলিয়ে বলল, এবার চিরুণীটি দিয়ে তোমার মাথাটা আঁচড়ে দিই, কেমন ? লেখা আমার হাতখানি তার বুকের উত্তপ্ত কুলায়ের মধ্যে টেনে নিচ্ছে। ভালো লাগছে না।

বললুম—'তুমি আমাকে এমন করে পেতে দিলে কেন ? তুমি যেন ফুরিয়ে গেছ।'

লেখা ভালো করে তাকাতে পারছিল না। বললে—'চুপ করে ঘুমোও, পাগলামী করো না।'

—'না সত্যিই ঘুম আসছে না। আমার সঙ্গে দুটি কথা কও।'

—'কি ?'

তার মাথাটি কোলের ওপর তুলে নিলুম। বললুম নুয়ে পড়ে—'একেই কি পাওয়া বলে লেখা ? তুমি আমার কোলের ওপর মাথা রেখে শুয়েছ, এই তোমাকে নিবিড় বন্ধনে বেঁধে রাখছি বাহুতে, এই নির্জন নিশীথে আমি আর তুমি—এমনি করেই কি লোকে প্রিয়াকে পায় ? একেই বলে ভালোবাসা ? হারাবার বেদনা নেই, ভয় নেই—এই অখণ্ড অবিচ্ছিন্ন মিলন, ভারী কামনীয়, না ?'

—'জানি না।' বলে লেখা আবার চোখ বুঁজল।

ডাকলুম—'লেখা !'

সে চোখ চেয়ে আবার হাসল। হাসিটি কাঁটার মতো গায়ে এসে বিঁধল। বললুম—'তুমি একটিবার কাঁদতে পার লেখা ?'

—'কেন ?'

—'তোমার চোখের জল আবার দেখতে ইচ্ছা করে।'

—'আমার কিসের দুঃখ যে কাঁদব ?'

—'তোমার বুক ভরে গেছে?'

—'হাঁ, ভরেছে।' বলে ফের চোখ বুঁজল।

লেখাকে এমন বিশ্রী কোনোদিন দেখায়নি। মনে হল মিথ্যা কথা কইছে। এতটুকু ফাঁক তার বুকে নেই আরো কিছুর আশায় উদ্‌গ্রীব হয়ে? আমার কাছ থেকে আর কিছু সে চায় না পেতে? না, বুক ভরতে পারে না। বুক ভরে না কারুর। এ বুকের ব্যাস ও পরিধির পরিমাণ কে করতে পারবে?

আবার জাগালুম। বললুম—'তোমার কোন দুঃখ নেই?'

—'আমার আবার দুঃখ কি? যা চেয়েছিলুম, যার জন্যে সাধনা করেছিলুম তা পেয়েছি।'

চম্‌কে উঠলুম।

—'পেয়েছ? কাকে?'

—'তোমাকে।'

—'পেয়ে ভালো লাগছে? সাধনা সার্থক হয়েছে মনে হচ্ছে লেখা?'

লেখা হেসে ভ্রূকুটি করে আবার চোখ বুঁজল। ওকে বোঝাতে পারি না। এ আমি চাইনি। এ আমার ভালো লাগে না। কেমন করে বোঝাই?

বললুম—'কিন্তু আমিও কাঁদতে পারি না কেন বলতে পার? আমার বুকে এত দুঃখ।'

লেখা চোখ ডাগর করে চেয়ে রইল। বলল—'দুঃখ?'

—'হাঁ।'

—'কিসের?'

—'তোমাকে আমি এমন করে পেয়েছি বলে। তোমাকে আমি পেতে চাইনি।'

প্রাণপণ চেষ্টা করে কথাটা বলে ফেললুম। কিরকম ভাবে যে বলা যেত জানি না।

লেখা শিউরে উঠল। মুখের পানে চেয়ে ভিজা গলায় বললে—'পেতে চাওনি?'

—'না, পেতে থাকতে চেয়েছিলুম। তুমি আমাকে সব দিয়ে দিলে। আর কিছু রাখলে না। তুমি যেন একেবারে ফতুর হয়ে গেছ। এত কাছে তোমাকে পেতে চাইনি বোধহয়, চেয়েছিলুম ত ভুল হয়েছিল।'

—'যাক্' বলে হাঁপ ছাড়ল। লেখার চোখের পাতা আর পড়ল না। মুমূর্ষুর চোখের মতন স্থির হয়ে ছিল। তার-ছেঁড়া সেতারের আওয়াজের মতন সে আর্তকণ্ঠে বলে উঠল—'তাহলে তুমি আমাকে ভালোবাস না?'

চমৎকার! তার চোখ জলে ছলছল করে উঠেছে। সেই হারানো ব্যথাটিকে আবার দেখলুম যেন চোখের তারায়। মুখখানি ম্লান মেঘলা হয়ে যাওয়াতে ভারী

মিষ্টি লাগছে। ভালোবাসি না? এ কথার কি জবাব দেওয়া যায়? শুধু একটি কথা—ভালোবাসি, কিন্তু—

লেখাকে দু' হাতে নিবিড়তম করে জড়িয়ে ধরলুম, তার মুখখানি মুখের কাছে তুলে বললুম—'না, তোমাকে ভালোবাসি। কিন্তু ভালোবাসা কি একেই বলে লেখা?'

তার চোখের কোণ দুটিতে দুটি কণা জল কাঁপছে। সেইখানে দুটি চুমু দিয়ে আবার বললুম—'বল লেখা, বল, ভালোবেসে পাওয়া বলে কি একেই?'

লেখা চোখ বুজে লতার মতন বাহু দিয়ে আমার কণ্ঠ বেষ্টন করে বললে—'হাঁ, একেই।'

দীর্ঘশ্বাসের মতো একটা দমকা হাওয়া ঝির্‌ঝির্ করে পাতাগুলি কাঁপিয়ে ধীরে ধীরে মরে গেল।

বন্দিনী

ওরা খাঁচায় একটি কোকিল-ছানা বন্দী করে রেখেচে।

এক দুর্যোগের রাতে ঝড়ো হাওয়ায় নীড়হারা এই কোকিল-শাবকটি ওদের বাড়ীর ছাতে উড়ে এসে লুটিয়ে পড়েছিল করুণ আর্তস্বরে। ওরা দয়াপরবশ হয়ে ঘরছাড়া পাখীটিকে খাঁচায় জীইয়ে রেখেচে, কোকিলটা বর্ষা বসন্ত মানে না, আকাশের নীলিমা তার চোখের পানে তাকায়, পথভোলা বাতাস এসে খাঁচাটায় একটু দোলা ছায় আর পাখীটা নিদারুণ বেদনায় হাহাকার করে, খাঁচার লৌহ-প্রাচীরে মাথা খোঁড়ে আর সজল নয়নে চেয়ে থাকে!

ওরা ওকে বন্দী করে রেখেচে ইট-পাথরের সংস্কার-শাসনের দুর্ভেদ্য কারাগারে।

মনে আছে ফাল্গুনের এক তন্দ্রাহত অলস মধ্যাহ্নে কলকাতার রুদ্র আকাশে পথহারা কোন কোকিল ডেকে চলেছিল সমস্ত কোলাহলের ওপর একটি সুষুপ্তির মায়া রচনা করে। মনে আছে তাকে বলেছিলাম—'বল ত শোভা, কোকিলটা কুহু বলচে, না উহু?' সে ভিজে চোখে আমার পানে খানিকক্ষণ চেয়ে চোখ নীচু করে বলেছিল—'উহু।' সে কতদিনের কথা।...

তারপর যতদিন ওদের বাড়ী গেচি কোকিলটা ব্যথাভরা নীরব আকুতিতে আমার পানে চেয়ে করুণ কণ্ঠে কেঁদে-কেঁদে উঠেচে, খালি বলেচে—ওগো, আমি এ অবরোধ সইতে পারি না, আমাকে নীল আকাশ ডাকে, চাঁপা করবীর উতল পাতা আমার জন্য নীড় রচনা করে রেখেচে, দখিনা আকাশ নিমন্ত্রণ পাঠিয়েচে, আমাকে তোমরা কেউ মুক্তি দাও, এরা বড় নিষ্ঠুর!

…পাখীটা তার বড় বড় ঠোঁট দুটি নিষ্ফল আক্রোশে লোহার শিকে ঠোকর মারে, গভীর অভিমানে পা দিয়ে সমস্ত খাবার জল ঠেলে ফেলে ছ্যায়।

আকাশে সেদিন মেঘের মিছিল চলেছিল সারা দুপুর ধরে। বিকেলে ঠাণ্ডা দম্‌কা বইতেই বেরিয়ে পড়ি ওদের বাড়ীর মুখে। গিয়ে দেখি তার ঘরের নিরালা অন্ধকার কোণটিতে চুপ করে বসে হাতের ওপর মাথাটি নীচু করে রেখে শোভা কাঁদ্‌চে! খোলা জানলা দিয়ে দুরন্ত বাতাসে তার রুক্ষ আবাঁধা চুল ও ময়লা ধুলোয়-লুটানো শাড়ীর আঁচলটা কাঁপছিল। আমি তার দিকে আর একটু এগিয়ে কান্নার সুরে ডাকলাম, শোভা!…শোভা মুখখানি তুলে আমার পানে তাকালে, আনন্দে কালো চোখ আজ ডাগর হোল না, তাতে আজ বর্ষা-আকাশের মেঘের স্বপ্ন ভরা, সুকোমল একটি ব্যথা তাতে কুয়াশার মতন কাঁপচে। আমার চোখে তার দৃষ্টিটি একটু ছুঁইয়ে নামিয়ে নিলে গভীর অভিমানে। বললাম—'কাঁদ্‌চে কেন?' সে তার কোন জবাব না দিয়ে ঘনিয়ে-ওঠা নিকষমণির মতো কালো মেঘের পানে চেয়ে রইল। তারপর খানিক বাদে মুখটি নীচু করে পরম বেদনার সুরে বললে, 'তুমি আর আমার কাছে এসো না।' বিদ্যুতের স্বপ্ন একটু ঝিকিমিকিতে দেখলাম, তার গাল বেয়ে ঝর্ণার মতো অশ্রু ঝরে পড়চে। সে মাথা নীচু করে বসে রইল দু'হাতের অঞ্জলিতে মুখ লুকিয়ে। বললাম—'এই তোমার শেষ কথা?' সে মুখ না তুলেই বলে—'কিন্তু ওরা যে আমাকে বেঁধে রেখেচে, সারাদিন আজ কিছু খাইনি, আমি এত যন্ত্রণা সইতে পারি না। তুমি শুধু-শুধু এসে নিজেও অপমানিত হও, আমারো কষ্ট বাড়াও। তুমি ফিরে যাও।'

সারা আকাশ ভেঙে বাদলের মাৎলামি শুরু হোল। নীচে নেমে এলে কোকিলটা আমাকে দেখে চেঁচিয়ে উঠল—'আমি এত কান্না সইতে পারি না, এত অন্ধকার। আমাকে বসন্ত ডাক দিয়েচে কোন্ নূতন সবুজের দেশে, সেখানে রাঙা দিনের আলো, কচি পাতার মেলা, দখিন হাওয়ার দোল,…আমার এ লোহার দুয়ার খুলে দাও, আমি পাখা মেলে সেই চাঁদ্‌নী আলোর দেশে উড়ে যাই…

বৃষ্টির মধ্যেই পথে বেরিয়ে এসে দেখি, সেই অন্ধকার ঘরটির খোলা জানলার শিক

ধরে কে দাঁড়িয়ে। তার নিবিড় কালো চুল অন্ধকারকে গাঢ়তর করে ঝড়ের বাতাসে পাগল হয়ে উড়চে, নীল শাড়ীটা লেলিহান বহ্নিশিখার মতন কাঁপ্‌চে, তার আর কিছুই বোঝা যাচ্চে না, আর বর্ষার উতল কোলাহল ভেদ করে কোকিলটার খিন্ন আর্তকণ্ঠ চীৎকার দিয়ে উঠচে—কু-উ উ, কু-উ উ !...

তিমির-রাত্রি

এক

ঘরের আলো নিবিয়ে অনীতা চুপ করে জান্‌লার পাশে বসেছিল। আকাশের পানে চেয়ে যেখানে কালো মেঘের ঘনিমা জমেছে, প্রেমের প্রগাঢ় বেদনার মতো। দমকে-দমকে বৃষ্টি হচ্ছিল। এই মেঘের মধ্যে কি যেন ব্যথা ভরা! তারপর এই উতল বাদল-ধারা যেন অপরূপ সুশীতল একটি সান্ত্বনার মতো ধরণীর তপ্ত বক্ষতল চুম্বন করছে। মেঘের পাথায় চড়ে রাত্রি-পরী অন্ধকার এলিয়ে নীচে নেমে এল।

সহসা পেছন থেকে কে ডাক্‌লে—"কে, কেতকী ? এখানে এক্‌লা বসে যে অন্ধকারে ?"

অনীতা এই স্নিগ্ধ অন্ধকারের পানে চেয়ে এত উদাস হয়েছিল যে পলাশের পদধ্বনি শুনতে পায়নি। ডাক শুনে সে চম্‌কে উঠে ছলছল চোখে ছেলেটির পানে তাকাল।

পলাশ অপ্রস্তুত হ'য়ে বললে—"আপনি, দিদি! অন্ধকারে চিনতে পারিনি ভালো করে।"

অনীতা থান-কাপড়ের আঁচলটা ভালো করে গায়ের ওপর টেনে নিয়ে করুণ কণ্ঠে বললে, "বৃষ্টিতে এই রাতে যে ?"

পলাশ বললে, "এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলুম, ভাবলুম একবার দেখা করে যাই। কেতকী কোথায় ?"

অনীতা সজল চোখে আর একবার পলাশের মুখের পানে তাকাল। তারপর ধীরে বললে, "বোস না, দাঁড়িয়ে রইলে কেন।" বলে দাঁড়িয়ে আলোটা টিপে দেবার জন্য দেয়ালের কাছে উঠে এল।

পলাশ তাড়াতাড়ি বললে, "না, বসব না। কেতকীর সঙ্গে একটা কথা আছে।

কেতকী পড়ছে বুঝি তার ঘরে ?"—বলে পলাশ পাশের ঘরে চলে গেল কেতকীর সন্ধানে।

অনীতা আলো আর জ্বালাল না। দেয়াল ঘেঁষে নীরবে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। ঝর্‌ঝর্‌ করে আবার বর্ষণ নেমে এসেচে। সে মেঝের ওপর বসে পড়ে দুই হাত দিয়ে বুকটা চেপে ধরল। কি নিবিড় মেঘপুঞ্জ জমে উঠেছে তার মর্ম-মরুতে! অন্ধকারবাসিনী তরুণী বর্ষণ-ক্লান্ত তিমির রাত্রের মতো মর্মর মেঝের ওপর বুক রেখে নুয়ে পড়ল। পাশের ঘরে পলাশ আর কেতকীর কথার সুর টুক্‌রো টুক্‌রো হ'য়ে তার কানে বাজছিল বৃষ্টিধারার সঙ্গে সঙ্গে।

ইলেকট্রিক্‌ আলোটা জ্বলচে, টেবিলের ধারে একটা বেতের শোফায় হেলান দিয়ে বসে কেতকী নিবিষ্ট মনে লজিকের সংজ্ঞা মুখস্থ করছিল গুনগুন করে। পলাশ আসতেই আনন্দদীপ্ত চোখ দুটি মেলে কেতকী জিজ্ঞাসা করলে, "এত রাতে, এই বৃষ্টিতে হঠাৎ ?"

পলাশ কাছে এসে হেসে বললে, "বৃষ্টিতে ঘরে এক্‌লা বসে থাকতে ভালো লাগছিল না; রাত্রে তোমাকে একটু দেখতে এলাম। তুমি ত এখন পড়ছ, তোমার পড়ার ব্যাঘাত করছি হয়ত। আমি তবে যাই।"

কেতকী দুটি চোখে অভিমানের ভ্রূকুটি করলে। পরে বললে, "চলে যাবার জন্যেই এসেছ বুঝি ?"

"কিন্তু তোমার পড়ায় বাধা দিতে ত চাই না।"

কেতকী বইটা মুড়ে টেবিলের ওপর রেখে বললে, "ছাই পড়া।"

পলাশ বইটা হাতের মুঠিতে তুলে নিল।

কেতকী বললে, "বা, দাঁড়িয়ে র'ইলে যে, বসো।"

টেবিলটার ওপর ভর দিয়ে বসে পলাশ বললে, "এই বেশ আছি।" পরে উদ্বেলকণ্ঠে বললে, "এই বাদলের রাতে তোমাকে নীলাম্বরী শাড়ী পরাতে বেশ দেখাচ্ছে কিন্তু। এই শাড়ীটা যেন এই অন্ধকার স্নিগ্ধ রাত, তোমার চুলের খোঁপাটা যেন মেঘের গুচ্ছ, গলার সোনার হার যেন বিদ্যুৎ, আর—" বলে টেবিলের ওপর কেতকীর শিথিল হাতখানি একটু টেনে নিয়ে একগাছি সোনার চুড়ী খুলে আবার তা আস্তে আস্তে আলগোছে পরিয়ে দিলে।

কেতকী তার মুখের পানে চেয়ে বললে, "আর তুমি কি ?"

"আমি আবার কি! আমি এই বর্ষণ-মুখর রজনীর সভাকবি।"

"তুমি পাগল।"

পলাশ তাড়াতাড়ি বইটা খুলে বললে, "মুখস্থ বল ত 'বারবারা' 'সেলারেন্ট'..."

কেতকী হেসে বললে, "কবি আবার মাস্টার মশাই হয় নাকি ?"

"খুব হয়, এই বৃষ্টিতে যদি কেউ সেতার না নিয়ে লজিক নিয়ে বসে। বল ত Cause ও Conditionএ কি তফাৎ ?"

"জানি না।"

পলাশ বললে, "মনে কর, আমি বৃষ্টিতে পথে চলতে চলতে আছড়ে পড়লুম। আমার এই আছড়ে পড়বার Cause কি, জিজ্ঞেস করলেই Popular view বলবে, পা পিছলে গেল তাই আছড়ে পড়লুম। কিন্তু এই আদৎ Cause নয় আছড়ে পড়বার ; ও একটা Condition। এ রকম অনেক Condition থাকতে পারে। বলতে পারি, আমি উঁচুয় চোখ করে এই বাড়ির জানলার দিকে চেয়ে চেয়ে পথ চলছিলুম, কারুর ভাবনায় ভারী অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলুম, বৃষ্টি হয়েছিল বলে পথ কাদায় পিছল হয়েছিল, কেউ ছিল না ধরে রাখতে পড়ে যাবার থেকে ইত্যাদি সব গুলিই Condition। এবং সমস্ত Condition যোগ দিয়ে হোল Cause। বুঝলে ?"

কেতকী হেসে বললে, "এই বুঝি সেতার বাজানো হচ্ছে ?"

"হচ্ছে না ?"

"হাঁ, হচ্ছে। ভারী মিষ্টি লাগছে তোমার কথাগুলি। বেশ বুঝে ফেললুম। ভারী বিদঘুটে লাগে এই লজিকটা। তুমি পড়িয়ে দিলে বাস্তবিকই জল হয়ে যায়। দেবে ?"

"কিন্তু বাইরে ভারী জল হচ্ছে। এবার আমি চলি।"

"এই বৃষ্টিতে ?"

"মন্দ কি !"

"ছাতী আছে ?"

"না, এই লাঠি আছে !"

"বৃষ্টি তাড়াবে বুঝি ? পাগলামি করো না, বসো। আমি চা করে আনচি।"

পলাশ বাধা দিয়ে বললে, "তাহলে সত্যিই চলে যাব। তুমি চা করতে চলে যাও আর আমি এখানে একলা বসে থাকি তা হবে না। চা-ফার দরকার নেই। বসচি, তোমার যেতে হবে না আমাকে ছেড়ে।"

জলের ছাট অনীতার চুলে এসে লাগছিল। সে উঠে বসে আবার এই জমাট অন্ধকার দেখলে। এই অন্ধকার তার ভালো লাগে। এই বৃষ্টিধারার অক্লান্ত কলরবে সে তার বুকের রাগিনী শুনতে পায়। এই বৃষ্টি যেন তাকে ডাকে। অনীতা আস্তে আস্তে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে নীচে নেমে গেল।

খানিক্ষণ পর একটা ছোট্ট ট্রেতে করে দুবাটি চা ও কিছু খাবার নিয়ে অনীতা সেই ঘরে এসে হাজির হোল। কেতকী আর পলাশ একান্ত বিস্মিত হয়ে তার মুখের দিকে তাকাল।

কেতকী বললে, "তুমি এ সব আবার কখন করতে গেলে ?"

অনীতা বললে, "এই আনলুম করে। বৃষ্টিতে ভিজে এসেছে পলাশ…" পলাশের দিকে একটা বাটি এগিয়ে দিয়ে বললে, "খাও।" আর একবাটি কেতকীর দিকে এগিয়ে দিল।

পলাশ বললে, "আপনি…" বলে'ই অপ্রতিভ হয়ে থেমে পড়ল।

কেতকী বললে, "দিদি চা পর্যন্ত খায় না।"

অনীতা শূন্য ট্রেটা নিয়ে চলে গেল।

অনীতা দেখতে পেলে পলাশের পিছনে পিছনে কেতকী নেমে গেল নীচে। বৃষ্টি তখন আবার ধরেছে। ভিজা হাওয়া হাস্নাহানার শাখাগুলি একটু দুলিয়ে দিতেই কান্নার মতো ঝর্‌ঝর্‌ করে কয়েকটা জলের ফোঁটা ঝরে পড়ল। কেতকী দুয়ারের গোড়ায় এসে পলাশকে বিদায় দিলে। এই পলাশ কেতকীর ডান হাতখানি একটু স্পর্শ করল কি করল না। এই, রাস্তায় নেমে পকেট থেকে রুমাল বার করে পলাশ একটু নাড়লে কেতকীর পানে ফিরে চেয়ে। কেতকী খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে কতকগুলি হাস্নাহানা ছিড়ল, বুকের উপর অকারণে একটু রাখলে, এই চলে আসচে। ওপরে এলে অনীতা কেতকীর ডান হাতখানা দু'মুঠিতে স্পর্শ করে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললে, "আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে—গানটি একটিবার গা না ভাই কেতকী !"

কেতকী বললে, "এসো।"

অন্ধকার ঘরে কেতকী বেহালা নিয়ে বসল। অনীতা শুনতে লাগল—

"হৃদয়ে এসেছে নয়নে এসেছে ধেয়ে,
আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে।"

দুই

ছাতের রেলিঙ ধরে কেতকী উদাস হয়ে দাঁড়িয়েছিল, পেছন থেকে আলগোছে অনীতা ডাকলে—"কেতকী !"

কেতকী নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

অনীতা তার পাশে ঘেঁষে পিঠে হাত রেখে বললে, "তুই নিরাশ হোস নে কেতকী। বাবা তোর অমঙ্গল করবেন না।"

কেতকী দুই হাতে চুলগুলি খোঁপা করে বাঁধতে বাঁধতে বললে, "না আমি নিরাশ হইনি। আমি এই সমাজকে শাসন করব। এত হীনতা, এত অত্যাচার আমি সইব না। সইতে শিখিনি।"

অনীতা চুপ করে চেয়ে রইল।

কেতকী বললে, "ভালবাসা সামান্য কৃত্রিম মূল্যহীন অসার জাতির দেয়ালে মাথা ঠুকে কুঁকড়ে যাবে, ভেবেছ? আমি তা হতে দেবো না।"

"কি করবি?"

কেতকী বললে,"আমি বাবাকে এই হীনতা থেকে রক্ষা করব। পলাশকে ছাড়া আমি আর কাউকে……" পরে অনীতার চোখের পানে চেয়ে অনুদ্বেল সজল কণ্ঠে বললে, "সমাজ মিথ্যা আচারের দাবীতে এই জীবনজোড়া ব্যর্থতা বুকে চেপে দেবে, সমস্ত জীবন পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে থাকবে, এই কি কল্যাণ? একে প্রশ্রয় দিতে হবে? তুমি কি বল দিদি?"

অনীতা বললে, "হাঁ, তুই যদি পারিস কেতকী, তবে উচিত এই বিদ্রোহ। সমাজের এই ক্ষুদ্রতাকে প্রহার করতে হবে। কিন্তু আমি……" কথা আর ফুটল না।

সেই ঘন তিমির রাত্রে বাতাসে রজনীগন্ধার উতল গন্ধ যখন ঘুমিয়ে পড়েছে, সেই নিঝুম সুষুপ্ত অনাদি আকাশের নীচে এই নিরাভরণা সর্বসুখবঞ্চিতা বিধবাটি তার তনু বক্ষতল ভিজা ছাতের মেঝের ওপর চেপে ধরে বলছিল—এতটুকু শক্তি তার বুকে ধরল না কেন? আকাশে আবার তারা জেগেছে। তাদের চোখে কি করুণ স্নেহ ভরা।

পরদিন সকালে কেতকীর ঘরে গিয়ে অনীতা বিস্ময়ে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল। কেতকী গেরুয়া পরেছে, সদ্যস্নানসিক্ত দীর্ঘ চুলগুলি পিঠের ওপর ছড়ানো, শুধু দুটি হাতে সোনার চুড়িগুলি ঝিকমিক করছে। টেবিলের ওপর পলাশের একখানি ফটো, তাতে বেলফুলের একটি মালা ছড়ানো, আর তার সুমুখে পূজারিণীর মতো কেতকী তার সমস্ত যৌবনজীবনের অর্ঘ নিয়ে প্রণত হয়ে ধুলোয় লুটিয়ে পড়েছে।

অনীতা আর দাঁড়াতে পারল না। নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করলে। ট্রাঙ্ক খুলে অনেক তলা থেকে তার স্বামীর ভাঙা পুরোনো ফটোটা বার করে বুকের মধ্যে খুব জোরে চেপে ধরল। কিন্তু তৃপ্তি নাই, আগুন যেন ঠিকরে বেরুচ্ছে। ঐ যে সুন্দর শুভ্রবেশে কেতকী একান্ত আনন্দভরে লুটিয়ে পড়েছে প্রিয়তমের প্রতিচ্ছবির সুমুখে,

তার সমস্তটি নুয়ে পড়ার ভঙ্গীতে কি একখানি সুকোমল সান্ত্বনা, একটি সুগভীর তৃপ্তির সুর বাজছে, তার কেন তেমনটি হয় না ?

এই যে সারা সন্ধ্যাবেলাটা কেতকী উদাস অস্থির হয়ে সমস্ত বাড়ী পায়চারী করে বেড়ায়, পলাস আসে না, মাঝে মাঝে জানলা দিয়ে অপলক চোখে পথের পানে চেয়ে থাকে, এস্রাজ নিয়ে বসে সন্ধ্যা-বিরহের গান গায়, এই যে মাঝে-মাঝে পলাশের লেখা চিঠিগুলি পড়ে, ফটোখানিতে নানা রকম ফুলের মালা পরায়—সবার মাঝে অনীতা একটি নিগূঢ় আনন্দের ক্ষীণ বর্ণাস্রোতের কলরব শুনতে পায়। তার বুকটা হা হা করে ওঠে। ভাবে সেও তো বিরহিনী। সেও তো বাতায়নে একমনে বসে থাকে পথের পানে চোখ মেলে—কখন সে ফিরে আসবে, সেও তো স্বামীর পুরানো চিঠিগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করে, গুনগুন করে সেও তো দুঃখের গান গায়, কিন্তু তার বুক ভরে না কেন ?

অনীতা মাকে গিয়ে বললে, "এমন নিষ্ঠুর হয়ে কেতকীর জীবনটা ব্যর্থ করে দিও না মা। একটা প্রাণের চাইতে কঠিন কতগুলি ভুয়ো মিথ্যা আচারকে বড় করে দেখো না। তাহলে দেখো, কেতকীরও জীবন এমনি হতাশ এমনি অর্থহীন হয়ে যাবে, তোমার সংসারে শান্তির ঠাঁই হবে না। বাবাকে তুমি বুঝিয়ে বল।" মা অনীতার মুখের পানে চেয়ে শিউরে উঠলেন।

সেদিন দুপুর বেলা একটা গাড়ী করে অনীতা পলাশদের বাড়ী এসে হাজির হোল। পলাশ তখন নিবিষ্টমনে চেয়ারের ওপর ঝুঁকে পড়ে কি লিখছে। অনীতা ধীরে ধীরে পা টিপেটিপে এগিয়ে পলাশের দুটি চোখ দু'হাতে চেপে ধরল। পলাশ চমকে তাড়াতাড়ি অনীতার দুটি হাত ধরে ফেলে ভাবলে—"কে ?"

অনীতা কোনো জবাব দিল না, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। পলাশ অনীতার হাত স্পর্শ করে করে ঠাহর করবার চেষ্টা করছিল। হাত দুটি আভরণহীন বলে মনে হচ্ছিল কোনো পুরুষের হাত, কিন্তু এ যে অশোকগুচ্ছের মন নমনীয়! পলাশ জোর করে হাত দুটি ছিনিয়ে নিয়ে মুখ তুলে চেয়ে স্তম্ভিত হয়ে হাত ছেড়ে দিল।

"আপনি দিদি ? হঠাৎ ? কি মনে করে ?"

অনীতা হেসে বললে, "তোমাকে একটা খুব শুভ সংবাদ দিতে এসেছি, কি দেবে বল ?"

পলাশ উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "কি সংবাদ বলুন।"

"আসচে সাতাশে তারিখে তোমার সঙ্গে কেতকীর বিয়ে হবে।"

আনন্দে চক্ষু বিস্ফারিত করে সহসা অনীতার একখানি হাত আনমনে ধরে ফেলে পলাশ বললে, "সত্য বলছেন, না ঠাট্টা করছেন এসে ?"

"ঠাট্টা করতে আমি আসিনি দুপুর বেলায়। সত্যি কথা। বাবা শেষকালে রাজী হয়েছেন। তিনি বুঝেছেন এমন করে আপন মেয়ের জীবন ব্যর্থ হতে দেওয়াটায় কোনো বাহাদুরীই থাকতে পারে না। তুমি আজ বিকেলে আমাদের ওখানে যেয়ো, বাবা তোমাকে চা খাবার নিমন্ত্রণ করেছেন।"

পলাশ স্তব্ধ বিস্ময়ে অপলক চোখে অনীতার মুখের পানে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল। সে চাহনিতে বিস্ময়োদ্বেল আনন্দের চিহ্ন ছাড়া আর কিছুরই লেশ ছিল না।

তিন

বিবাহ উৎসবে বাড়ীটা সরগরম হয়ে উঠেছে। দূরে বরের মিছিল আসচে, ব্যাণ্ড-পাইপের আওয়াজ ভেসে আসচে, সারা বাড়ীময় বিপুল সাড়া পড়ে গেছে।

অনীতা দূরের বাদ্যধ্বনিতে কার যেন আগমন-বার্তা শুনতে পাচ্ছিল। সেই বার্তা পেয়ে তার সমস্ত দেহ সুরার পেয়ালীর মতো টলমল করছিল। আজ সবাই তাকে উপেক্ষা করে উৎসবে মেতেছে। কিন্তু অনীতা ভাবছিল এই কৃত্রিম আয়োজনের সীমা পেরিয়ে ঐ নক্ষত্রদীপ্ত অনন্ত আকাশে রহস্যলোকের জ্যোতিঃ উৎসবে তার আজ স্থান, দেবতা তাকে নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছেন। কোথায় যেন তার নবমিলনের বিচিত্র সমারোহ জমেছে, যক যেন আসচে তাকে সেখানে নিয়ে যেতে। সবাই তাকে অবজ্ঞা করল বটে, কিন্তু আকাশের দেবতা তাকে নিয়ে যেতে দখিণ বাতাসের রথে মাটিতে নেমে এলেন।

অনীতা তার ট্রাঙ্ক খুলে পুরানো সিল্ক-তসরের শাড়ী ব্লাউশগুলি পরতে লাগল দরজা বন্ধ করে। আলতার মতন লাল একখানি শাড়ী পরলে, গায়ে দিলে সেই ডালিম-রঙের সুন্দর ব্লাউশটি। গন্ধতেলে চুল ভিজিয়ে রুক্ষতা দূর করে চিরুনী দিয়ে পরিপাটী করে আঁচড়ে খোঁপা বানিয়ে পরলে। বাক্স থেকে আভরণ খুলে হাতে পরলে চুড়ী ব্রেসলেট, গলায় দিলে নেকলেশ, কানে দিলে দুল, মাথায় রতন চূড়। তারপর আয়নায় নিজের মুখখানি দেখে ভারী চমকে উঠল। এ কি সে নিজে ? ভস্মাবৃত যৌবন-বহ্নির একি জ্যোতি-স্ফুলিঙ্গ উঠল আজ তার দেহের সুষমায়! সে

বললে, "তোমাকে বরণ করে নেবার জন্য দেবতা, আমি এই আনন্দ রচনা করলাম আমার দেহে, আমাকে তুমি নাও, তোমার দেহের তটে আমাকে চূর্ণ করে ফেল।"
বর তখন এসে পৌঁছেছে, বাড়ীর সমস্ত আনন্দমত্তা চটুল কিশোরী-তরুণীর উলু ও শঙ্খধ্বনিতে আকাশ ধ্বনিত হচ্ছিল। এমনি সময় ওপরে একটি রুদ্ধদ্বার অন্ধকার গৃহে এই উপেক্ষিতা উৎসববর্জিতা ব্যর্থ নারী তার সজ্জা-সমৃদ্ধ আভরণ বিলাসী দেহ মেঝের ধূলোর ওপর লুটিয়ে দিয়ে বলছিল, "তুমি যদি এলে ত বিমুখ হয়ে ফিরে যেও না দেবতা। আমাকে এই তিমির-রাত্রির পারাবার থেকে তোমার জ্যোতির্লোকে তোমার অনন্ত বাসকশয্যায় তুলে নাও, আমার এ সজ্জা এ সৌন্দর্যকে সার্থক কর।

বর কনে বিদায় হয়ে গেছে। উৎসবে যারা এসেছিল তারা একে একে বিদায় নিচ্ছে। সমস্ত বাড়ীটি আবার নিঝুম হয়ে পড়েছে।
সেদিন আবার বাদলের মেঘ করে এসেছিল। বাতায়ন প্রান্তে একটি শুভ্রবসনা তরুণী চুপ করে একমনে বসেছিল, তার দুটি আভরণহীন হাত ছিল জানলার দুটি শিক বেষ্টন করে, তার চুল ছিল রুক্ষ—বুকের ওপর লুয়ে, তার মুখখানি ছিল জবাফুলের মতো ম্লান, আর তার চোখ দুটি ছিল আকাশেব নিবিড় মেঘস্তূপের দিকে উদাস হয়ে চেয়ে।

নাটক

মুক্তি

প্রথম অঙ্ক

[ফাল্গুনের সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। কলিকাতার রাস্তায় এখনও গ্যাস জ্বলিতে শুরু হয় নাই। প্রাচীরের মাথায় হাট বসাইয়া কাকগুলি মহলা বেশ জমাইয়া তুলিয়াছে। একটি ভাঙা বাড়ির একতলার ছাদে দেওয়ালের রেলিঙের কাছে একটি যুবক ও তাহার ডান পাশে একটি তরুণী দাঁড়াইয়া ছিল। তরুণীটির পরণে রঙিন একখানি শাড়ী, মাথায় শিথিল একটি ঘোমটা, সিঁথিতে উজ্জ্বল সিঁদুররেখা, হাতে সোনার আভরণ—বয়সে সতেরো আঠারো হইবে, নাম মুকুল। যুবকটির দোহারা চেহারা, পরণে খদ্দরের একটা পাঞ্জাবী, চোখে একটা মোটা ফ্রেমের চশমা, বয়স পঁচিশ ছাব্বিশের কম হইবে না, নাম হিমাংশু। এম. এ. পাশ করিয়া মার্চেণ্ট অফিসে কাজ করিতেছে। যুবকের হাতে তরুণীর একখানি পুষ্ট শিথিল হাত, সন্ধ্যার একটু কিরণ চুড়িগুলিতে ঝিকিমিকি করিতেছে, বাতাসে মাথার ঘোমটার আড়াল হইতে প্রচুর কালো চুল যুবকটির কাঁধের উপর খেলা করিতেছে, বুকের আঁচলটা এলো. হইয়া রেলিঙের ধুলার উপর লুটাইতেছে। তাহারা পরস্পরের আরো একটু কাছে আগাইয়া আসিল।]

মুকুল। এ আমার স্বপ্নাতীত মনে হচ্ছে! আমি এ-আনন্দে বইতে পারছি না—

হিমাংশু। মুকুল! (হাতখানি বুকের উপর চাপিয়া ধরিল।)

মুকুল। এই ম্লান ধূসর সন্ধ্যা কি অপরূপ লাগছে চোখে! ঐ একটা ভিখারিণী, ঐ গাছের পাতার ঝিরি-ঝিরি, এই মেদুর স্নিগ্ধ আকাশ!—যদি তোমাকে না পেতাম! (দুই চোখে জল ভরিয়া আসিল।)

হিমাংশু। তোমার হাতখানি কি ঠাণ্ডা! তোমার চুলের গন্ধটি নিশ্বাসে এসে লাগছে। কোনোদিন ত এমন মধুর করে কাঁদি না মুকুল।

[দুই জনে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। কাহারও মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইতেছিল না। আবছা অন্ধকারে কয়েকটা তারা জাগিয়া উঠিয়াছে, মই কাঁধে বাতি-ওয়ালা চলিয়াছে, পাখীর কলরব আর বেশী শুনা যায় না।]

মুকুল। ওরা সব আমাকে সাজাচ্ছিল, চন্দন অগুরু আলতা শাড়ী অলঙ্কার—কোন সমারোহেরই আর শেষ ছিল না। সমস্ত সজ্জা ভার মনে হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল, দম যেন বন্ধ হয়ে আসছে! এত আলো, জাঁক্-জমক, আনন্দ সমস্ত বিষ মনে হচ্ছিল··· ভাবতে পারছি না আর! কি চমৎকার অপরূপ এই পৃথিবী! মাছিটা কি মিষ্ট গুন্‌গুন্ করছে!···

হিমাংশু। (মুকুলের আঙুলগুলি লইয়া খেলা করিতে করিতে) কিন্তু আমি তা জানতাম—

মুকুল। (আয়ত চোখ দুইটি হিমাংশুর মুখের পানে তুলিয়া) জানতে?

হিমাংশু। হাঁ, মোটে তিন দিন আগে জানতাম। জানতাম তুমি আমার ছাড়া আর কারুর—(হাতখানি আবার বুকের উপর চাপিয়া ধরিল)

মুকুল। মুখ-চন্দ্রিকার সময় একবার মুখের দিকে চাইলাম। ভাবলাম দেখি, কে সে ধূমকেতুর মতো আমার খুশির বাগান পুড়িয়ে দিল?

হিমাংশু। (উৎসুক কণ্ঠে) কি দেখলে?

মুকুল। কিছুই দেখলাম না। তিনি আমার মুখের দিকে চাইলেন না।

হিমাংশু। (কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া) এদেরই বলে মানুষ, না মুকুল?

মুকুল। (জলভরা চোখে) মানুষ?—না-না দেবতা। রাত্রে খালি ইচ্ছে হচ্ছিল, উঠে ওঁকে প্রণাম করি। কিন্তু তিনি এত দূরে শুয়ে রয়েছিলেন!···

হিমাংশু। কোন কথা বলে নি?—

মুকুল। (কতগুলি চুল দিয়া হিমাংশুর ডান হাতের মণি-বন্ধটি জড়াইতে জড়াইতে) বলেছেন।

হিমাংশু। কি বললে?

মুকুল। বললেন, 'আপনাকে আমি মুক্তি দিতে এসেছি···আমাকে আপনি ক্ষমা করুন।'

হিমাংশু। তারপর?

মুকুল। (ঘোমটা পড়িয়া গিয়াছিল, মাথায় উঠাইয়া দিয়া) আমি কিছু বুঝলুম না। আপনি সম্বোধনটা কানে কি-রকম শোনাল! একটু আশ্চর্য হলুম।

হিমাংশু। ব্যথিত হলে না?

মুকুল। কেন?—

হিমাংশু। (আবছা একটু হাসিয়া) বিংশ-শতাব্দীর শিক্ষিত ছেলে, বাসর-রাতে স্ত্রীকে আপনি বলে সম্বোধন করেছে···

মুকুল। (দুষ্টামির সুরে) যাও! তখন লোকটার ওপর আমার ভারী ঘৃণা হচ্ছিল।

হিমাংশু। (গম্ভীর স্বরে) অসিতকে প্রণাম করেছ ?

মুকুল। যাবার সময় প্রণাম করে যাব।—আচ্ছা, উনি কোথায় ?

হিমাংশু। নীচে, পড়ছে।

মুকুল। এখানে যদি এসে পড়েন ?—

হিমাংশু। পাগল! আমাদের এখন যে সে মুক্তি দিয়েছে—

মুকুল। (মিষ্ট হাসিয়া হিমাংশুর আঙুলের আংটি ঘুরাইতে ঘুরাইতে) তুমি—

হিমাংশু। তারপর তুমি কি বললে ?

মুকুল। উনি বললেন, এই অনুষ্ঠান, এই সামাজিক আচারের কিছু মূল্য নেই। আপনার ভয় নেই, আমি আপনার সত্যের অমর্যাদা করব না।

হিমাংশু। সন্ধ্যাতারাটি আমাদের দিকে কি করুণ চোখে চাইছে।···তুমি কি বললে ?

মুকুল। আমার কাছে সমস্ত রহস্য লাগছিল। উনি বললেন—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনার ওপর আমার কোন দাবী নেই—থাকতে পারে না। (দুই চোখ জলে ছলছল করিয়া উঠিল।)

হিমাংশু। কি সুশীতল স্নিগ্ধ একটি অন্ধকার আমাদের বেষ্টন করে ধরেছে! মুকুল—

মুকুল। উনি বললেন, আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোন, বৃথা উপবাস করায় আপনাকে ভারী ক্লান্ত দেখাচ্ছে। আমি কাল বাড়ি পৌঁছেই হিমাংশুর হাতে আপনাকে সঁপে দেব।···সত্যিই এ স্বপ্ন!—নয় ?

হিমাংশু। অসিত যদি এমন উদার না হত!—

মুকুল। (হিমাংশুর বাহুর উপর মুখ লুকাইয়া) না না, সে চিন্তা আর করো না। কি মধুর তৃপ্তি এ! আমরা দুই সমাজহীন ঘর-ছাড়া ছন্ন-ছাড়া পথিক!

হিমাংশু। একটা পাখী অন্ধকারে দুই ডানা মেলে উধাও হয়ে উড়ে চলেছে!

মুকুল। চল, অসিতবাবুকে প্রণাম ক'রে আসি। আজকে হয়ত তিনি ছেড়ে দেবেন না।

হিমাংশু। মনে পড়ে মুকুল, একদিন এমনি পালিয়ে যাবার মতলব করেছিলুম ? সব ভেস্তে গেল। কি শক্ত লোহার আগল তোমার বাড়ির!···হাঁ, আজ রাত্রেই যাব। এখানকার চাকরী ছেড়ে দিয়েছি, রাওয়ালপিণ্ডি থেকে একটা নিয়োগ-পত্র এসেছে ; চল, বেরিয়ে পড়ি। কিন্তু অসিতের সাহায্য চাই এ বাড়ি থেকে নির্বিঘ্নে যেতে।—অসিত, বন্ধু, দেবতা!···

[তাহারা আবার পাশাপাশি অনেকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিয়াছে। আকাশের অগণিত চোখ মিটি-মিটি করিতেছে। কেহ কিছু না বলিলেও দুই জন পরস্পরের উৎসুক দুইখানি মুখ বাড়াইয়া দিয়া ব্যগ্র অধর-সঙ্গমে আসিয়া স্থির হইল। গীর্জার ঘড়িতে আটটা বাজিতেছে। অসিতের বাবা অক্ষয়বাবু পিছনের দরজা দিয়া ছাদে আসিতেছিলেন। এই দুই তরুণ-তরুণীর অভিনব প্রেম-পরিবেশন দেখিয়া খানিকক্ষণ 'থ' হইয়া থাকিয়া তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেলেন। হিমাংশু ও মুকুল দুইজনে চোখের জল মুছিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল। নীচে রাস্তা দিয়া পাড়ার একটা ছেলে বাঁশের বাঁশীতে ফুঁ দিতে-দিতে চলিয়াছে।]

দ্বিতীয় অঙ্ক

[সেই রাত্রি। নীচে বসিবার ঘরে ইজিচেয়ারে শুইয়া একটি যুবক একখানি ইংরাজি মাসিক-পত্রিকার পাতা উলটাইতেছিল। পাশের টেবিলের উপর অয়েল-ক্লথ পাতা, তাহার উপরে একটা বড় লণ্ঠন, চারিপাশে রাশীকৃত কাগজ-পত্র পুঁথি খাতা বিশৃঙ্খল হইয়া রহিয়াছে। ঘরের সমস্তগুলি জানালা খোলা, বাতাসে লণ্ঠনের আলোটা কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। যুবকটির বলিষ্ঠ দেহ, উন্নত ললাট ও দীপ্ত চক্ষু দেখিলেই সম্ভ্রম করিতে ইচ্ছা হয়। কলিকাতার কোন কলেজে প্রফেসারি করে ও মাঝে মাঝে আদালতে ঢুঁ মারিয়া আসে। মাথায় কোঁকড়ানো চুলগুলি হাওয়ায় দোল খাইতেছে, মুখখানিতে একটি অপরূপ শান্তি মাখানো। বয়স সাতাশের বেশী হইবে না। হঠাৎ অক্ষয়বাবু চটি-জুতার শব্দ করিতে করিতে এক রকম দৌড়াইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, সে চমকাইয়া উঠিল।]

অক্ষয়। এ-কি কাণ্ড অসিত?—

অসিত। (চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া) কি হয়েছে বাবা?

অক্ষয়। (ভাঙা-ভাঙা গলায়) ছাদে হিমাংশু আর বৌ-মা···ছি ছি! এমন কুলটাকে পুত্রবধূ করেছি! (মাথায় হাত দিয়া মেঝের দিকে চাহিয়া রহিলেন।)

অসিত। (ক্ষণকাল মেঝের পানে চাহিয়া থাকিয়া, শান্ত ধীরভাবে) কি করেছে বাবা?

অক্ষয়। (অসিতের গলার স্বরে বিস্মিত হইয়া) কি করেছে? হিমাংশুকে বলি,

এই কি বন্ধুত্বের প্রতিদান? ছি ছি! তার পরিণীতা পত্নীর অঙ্গ স্পর্শ করা! তাকে তুমি এক্ষুণি দারোয়ান দিয়ে চাবকে বাড়ির বার করে দাও অসিত। আর আমি ঐ চরিত্রহীনা বধুকেও ঘরে স্থান দিচ্ছি নে। আমি স্বচক্ষে দেখেছি—স্বচক্ষে—(বৃদ্ধ রাগে ফুলিতে লাগিলেন।)

অসিত। (হাতের মাসিকপত্রটা জোর করিয়া চাপিয়া ধরিয়া গলার স্বরকে সংযত শান্ত করিয়া) ওরা এমন কিছু অন্যায় ত করে নি বাবা—

অক্ষয়। (বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে) এঁ্যা? অন্যায় নয়?—

অসিত। (শান্তস্বরে) না।

অক্ষয়। (শাসাইয়া) তুমি এ-কথা বলছ?—স্বামী হয়ে।

অসিত। আমি তার স্বামী নই।

[অক্ষয়বাবুর কাছে সমস্ত ধাঁধা লাগিতে লাগিল। তিনি ইহার কিছুই সমাধান করিতে পারিলেন না। তিনি একটা চেয়ারে ধুপ্ করিয়া বসিয়া পড়িলেন, অসিতও সামনের একটা চেয়ারে বসিল। অক্ষয়বাবুর ঠোঁট কাঁপিতেছিল, একবার তাহার চোখের দিকে চাহিয়া অসিত চোখ নামাইল।]

অক্ষয়। তুমি কি পাগল হয়েছ অসিত?

অসিত। না বাবা, লাগল হইনি।

অক্ষয়। তবে—

অসিত। তবুও আমি মুকুলের স্বামী নই।

অক্ষয়। (কর্কশকণ্ঠে) স্বামী নও? এ কিরকম কথা? কাল বিয়ে করে বউ ঘরে আনলে আজ তুমি তার স্বামী নও!—পাগলের মুখ ছাড়া এমন আজগুবি কথা আর কার মুখ দিয়ে বেরোয়? দাঁড়াও, আমিই এর একটা হেস্ত-নেস্ত করছি।

[বলিয়া উঠিয়া পড়িলেন। ভিতরের দরজা দিয়া উপরে যাইবেন, অসিত তাঁহাকে বাধা দিল।]

অসিত। যাবেন না, সমস্ত কথা শুনুন। ওদের বাধা দেবার অন্যায় অধিকার আমার বা আপনার কারুর নেই।

অক্ষয়। কেন?

অসিত। কেন না, কালকের বিবাহকে আমি অস্বীকার করি। ঐ প্রাণহীন আচারের দাবীতে আমরা কোনো অধিকারই দেখাতে পারিনে।

অক্ষয়। তার মানে?—

অসিত। তার মানে,—আপনি অত অস্থির হবেন না, সব স্থির হয়ে শুনুন—তার

মানে, যে-বিবাহে দুইটি অপরিচিত প্রাণীর স্থূল-দেহের মিলন ঘটিয়ে দেওয়া হল, সে-মিলন আমার চোখে নেহাৎ অগৌরব ও ক্ষুদ্রতার বিষয় ব'লে মনে হয়। মুখের মন্ত্রের গুরুত্বকে আমি স্বীকার করি নে। আপনি ত জানেন, আমার কোন দিনই বিয়ে করার মত ছিল না। হঠাৎ—

অক্ষয়। (তাড়াতাড়ি) তবে হঠাৎ বিয়ে করার ঝোঁক হল কেন ?—

অসিত। (শান্তস্বরে) বিয়ে করলুম, মুকুলকে মুক্তি দিতে। আপনি ত জানেন, আমাদের বাংলার সমাজে তরুণ-তরুণীর বিয়ে খুব অল্পই পূর্বরাগের থেকে হ'য়ে থাকে। যে ক'টা হয় বা হতে চায়, তাদের দাবিয়ে রাখা অন্যায়—অমানুষিকতা, পাপ।

অক্ষয়। (চঞ্চল হইয়া) তুমি এ-সব কি বললে অসিত ?—

অসিত। ওরা পরস্পরকে ভালবাসে, পেতে চায়, পেলে সুখী হবে।

[একটা দমকা হাওয়া আসিয়া পাখীগুলি নাড়িয়া দিয়া গেল, রজনীগন্ধার একটু গন্ধ বহিয়া বাতাস, পিতা ও পুত্রের ললাট স্পর্শ করিল, পথবাসী কোন পথিকের করুণ বাঁশীর সুর বাজিয়া চলিয়াছে]

অক্ষয়। (বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে) তবে তোমার বিয়ে করার কি দরকার ছিল।

অসিত। (মাসিকপত্রটা দুই হাতে মোচড়াইতে-মোচড়াইতে) বললাম যে, এই হীন সমাজকে ঠকিয়ে মুকুলকে মুক্তি দিতে। নইলে বিয়ে আমি কক্‌খনো করতাম না।

অক্ষয়। মুকুলকে মুক্তি দেবার ভার তোমার ওপর পড়ল কেন ?—হিমাংশুই ত তাকে নিজে বিয়ে করতে পারত ?

অসিত। (একটু হাসিয়া) বিয়ে করতে পারত বটে, কিন্তু মুকুলের বাবা বিয়ে দিত না।

অক্ষয়। কেন ?

অসিত। হিমাংশুরা কায়স্থ।

অক্ষয়। (চমকাইয়া উঠিয়া) কায়স্থ ? ছি—ছি ! বামুনের সঙ্গে কায়েতের পরিণয় ? ছি ছি ছি ! একেবারে—

অসিত। বাবা !

[ডাক শুনিয়া অক্ষয়বাবু শিহরিয়া উঠিলেন। একবার অসিতের সুন্দর দীপ্ত মুখের পানে চাহিলেন, কোন কথা বলিতে পারিলেন না। হাওয়ায় আর একটা কি ফুলের গন্ধ ভাসিয়া আসিল। একটা নিদ-হারা তারা আনন্দে কাঁপিতেছে।]

অক্ষয়। (কপালে হাত রাখিয়া) আমি এ-সব আয়ত্ত করতে পারছি না !

অসিত। (দৃঢ়স্বরে) অনুদার সঙ্কীর্ণ সমাজে আঘাত দেওয়া চাই। আঘাত পেলে সে আর বাঁচবে না।

[অক্ষয়বাবু অসিতের মুখের পানে চাহিয়া চোখ নামাইয়া লইলেন]

অক্ষয়। বল—

অসিত। সমাজের কাছে মন্ত্রই হল মূল্যবান, হৃদয় নয়। গোত্র হল মিলনের মাপকাঠি, প্রেম নয়। আপনি একবার ভাবুন। মানুষ ত শুকনো পুঁথি-কেতাবের জীব নয় বাবা, তার দেহ যে রক্ত-মাংসে গড়া, সেখানে যে সব মাটি!

অক্ষয়। আমি কিছুই বুঝতে পারছি নে, তর্ক করবার ক্ষমতা আমার চলে গেছে।

অসিত। ভেবেছিলুম, বিয়ে কোন দিন করব না জীবনে। হঠাৎ আপনারা একদিন আমার মত বদলে যেতে ভারী খুশী হয়েছিলেন। কেন মত বদলেছিলাম?—

অক্ষয়। বুঝেছি।

অসিত। ভাবলুম, বন্ধুর জীবন নষ্ট হতে দেব না। শুধু মূল্যহীন কতকগুলি কথার জালে মুকুলকে টেনে এনে হিমাংশুর হাতে উপহার দিব। আমি করেওছি তাই। অনেক আগেই ওদের বিয়ে হয়েছিল, আর সেই-ই সত্যিকারের বিয়ে, আর এটা একটা ভূয়ো জুয়ো খেলা। (হাসিয়া) আমি মন্ত্র কিছু শুনিওনি, আওড়াইও নি। সমস্ত জিনিষকে সুন্দর ক'রে দেখবার একটা মনীষা আছে বাবা। ওদেরও সুন্দর ক'রে দেখতে শিখুন।—

[কথা অস্পষ্ট হইয়া আসিল। অন্ধকার মা'র স্নেহের মত নিবিড় হইয়া রহিয়াছে। অক্ষয়বাবু অসিতের একখানি হাত টানিয়া লইয়া তাহাতে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। অসিতের হারা মা'র মুখখানি চাঁদের আলোর মত তাঁহার চোখে ভাসিয়া উঠিল, চোখের পাতা ভিজিয়া আসিল। তারাগুলি আনন্দ-গানের ফিন্‌কির মত দপ-দপ করিয়া জ্বলিতেছে। ঘর-ছাড়া একটা পাপিয়া ব্যথা-বিদীর্ণ কণ্ঠে 'পিউ কাঁহা' ডাক ছাড়িয়া আকশে মিশাইয়া গেল। গীর্জার ঘড়িটা এই সুন্দর সুষুপ্তির হৃদয়ের শব্দ করিতে লাগিল—টং টং টং।]

যবনিকা

কেয়ার কাঁটা

প্রথম অঙ্ক

[আকাশ সবে পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে। বিগত-জ্যোতি পাণ্ডুর চাঁদ পশ্চিমে নুইয়া পড়িয়াছে বিবর্ণ বেদনায়। পাখীদের গানের ফোয়ারা এখনো ঝরিয়া পড়িতে শুরু হয় নাই। প্রভাতের শিশির-আর্দ্র বাতাস গাছের পাতাগুলি কাঁপাইয়া বহিতেছিল।

কলিকাতার প্রান্তবর্তী একটি গাঁ।

ছোট একতলা একখানা দালান—বার্ধক্যের জীর্ণতায় কুঁজো হইয়া পড়িয়াছে। তাহার অপরিসর মেঝে-ওঠা বারান্দায় একটি আধা-বয়সী ভদ্রলোক—বয়স চল্লিশের কাছাকাছি হইবে—দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার সমস্ত মুখে ঘৃণা ও কদর্যতার বিষ যেন ঠিক্‌রাইয়া পড়িতেছে। তাঁহার পা, দুই দীর্ঘ বাহুতে জড়াইয়া ধরিয়া একটি তরুণী মেয়ে সমস্ত বসন ও চুল বিস্রস্ত করিয়া লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতেছিল। পাশে মাথায় হাত দিয়া অর্ধ-অচেতন মূর্চ্ছাহত অবস্থায় বসিয়া ছিলেন একটি কাঁচা বয়সী মহিলা, বয়স ত্রিশের বেশী হইবে না। পাড়ার কয়েকজন টিকিওয়ালা আমুদে মাতব্বররাও এই সকালে ঘুম ভাঙিয়া খড়ম খট্‌খটাইয়া কাঁথা মুড়ি দিয়া আসিয়া হাজির হইয়াছেন।

অস্ফুট ফুলের ঘুম-ভরা চোখের পাতায় সান্ত্বনার চুমু দিয়া এক দমক বাতাস আবার বহিয়া গেল। পূবের আকাশে রঙের ছোঁয়াচ্ একটু লাগিয়াছে। একটি তারায় শেষ বারের মতন একটি দুষ্টু ইশারা, হাসিয়া চোখের উপর ঘোমটা টানিয়া দিল।]

মেয়ে। (কাতর করুণ কণ্ঠে) কিন্তু বাবা আমার ত কিছু অপরাধ নেই। আমাকে ঘুমন্ত দুর্বল পেয়ে কেউ যদি……বাবা! (কান্নায় গলার স্বর বুজিয়া আসিল।)

পিতা। (কঠোর স্বরে) তা আমি বুঝি না।

মেয়ে। (তার আয়ত অশ্রুভারাতুর দুটি চোখ বাপের মুখের কাছে তুলিয়া) কি বোঝ না? আমি নির্দোষ, এই কথাটা বিশ্বাস কর না, তুমি? গভীর রাত্রে নৃশংস দস্যুর দল আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে, সে কি আমার অপরাধ?

পিতা। (পা মুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়া) আমি তবু তোকে গ্রহণ করতে পারি না, ছেড়ে দে।

মেয়ে। (ব্যাকুল আগ্রহে পিতার পা জড়াইয়া ধরিয়া সকাতরে) না বাবা, ছাড়ব না তোমার পা। বল, আমায় কেন তুমি নেবে না ?

[বৃষ্টির মতো তাহার চোখের দুই কোণ দিয়া অশ্রু ঝরিতেছিল।]

পিতা। (কটু কণ্ঠে) তুই এখন অস্পৃশ্যা কুলটা। সমাজে তোর স্থান নেই। আমি সমাজকে ডিঙিয়ে যেতে পারবো না। যা, ছাড়্ ছাড়্ পা।

পাড়ার একজন মাতব্বর। এই ত মরদের মতো কথা বলেছ বটে লোচন। সমাজকে ডিঙোব না আমরা। এ-পাপকে প্রশ্রয় দেওয়া ভীষণতর পাপ। এই ত আদৎ হিন্দুর মতো কথা। (আর একজনকে ইসারা করিয়া) দেখলে, পিতৃত্বের অভিমানে নিজের ধর্ম খোয়ায় না—সে-ই ত খাঁটি মানুষ।

পিতা। (মেয়েকে লক্ষ্য করিয়া) তা ছাড়া তুই ত এখন আস্তাকুঁড়-ছুঁড়ি, ছাড়্ পা হতচ্ছাড়ী নচ্ছার।

মেয়ে। (কাকুতি করিয়া) নাই বা নিল সমাজ, কিন্তু তোমার ঐ পিতৃস্নেহ যে-বুকে বাস করছে, সে-বুকে কি এই হতভাগিনীর জন্য একটুও স্থান নেই বাবা ?…মা !…

[যে মহিলাটি এতক্ষণ হতবাক্ হইয়া চেতনাহীনের মত বসিয়াছিলেন, তিনি সহসা আগাইয়া আসিয়া মেয়েটিকে ব্যগ্র কম্পিত বাহুবন্ধনে বাঁধিলেন। তাঁহার সমস্ত বুক দিয়া আকশের মত মেয়েটিকে যেন নিশ্চিহ্ন লুপ্ত করিয়া দিতে চান—তাঁহার আলিঙ্গনের সেই ভাষা।]

মা। (উদ্বেল কণ্ঠে) না না আমি তোকে ছাড়ব না। আমি পাখীর ডানার মতো আমার সমস্ত স্নেহ প্রসারিত করে তোকে ঢেকে ফেল্ব, তোর সমস্ত কালিমাকে। আমি তোর মা, নারী !…

[মেয়েটি মা'র তপ্ত বুকের মধ্যে অশ্রুসিক্ত আর্ত মুখখানা লুকাইয়া বাদলের মেঘের মত ফুপিয়া উঠিতে লাগিল।]

আর একজন মাতব্বর। (ব্যস্ত হইয়া) এ আপনি কী করছেন ? ছি ছি ! সহধর্মিনী হয়ে এই আপনার ব্যবহার ? যার স্বামী পুণ্যবান, দেবতার মতো ধর্মের জন্য সমস্ত দুর্বলতা জলাঞ্জলি দিলে, তার স্ত্রী হয়ে আপনার এ কাজ একেবারে শোভা পায় না। ধর্মের পথ যে বড় কঠোর। কি বল হে রামহরি ?

[আর একজন মাথা নাড়িল]

মা। (অশ্রুভেজা আকুল স্বরে) না, আমি ধর্ম বুঝি না। আমার মেয়ে ও, আমার পুতুল ! ও অসতী নয়, কলঙ্কিনী নয়। ওকে আমি ঘিরে রাখব অন্ধকারের মতো। মাতৃস্নেহই আমার ধর্ম।

[দু-একটা কাক তন্দ্রালু কণ্ঠে ডাকিয়া উঠিতেছে। সামনের দীঘির জলে অন্ধকারের শেষ স্মৃতিটুকু এখনো ধুইয়া যায় নাই। অনেক দূরের মন্দির হইতে প্রভাতী সানাইয়ের অস্পষ্ট সুর ভাসিয়া আসিতেছে।]

পিতা। (বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে) এ যে একেবারে নাটুকে ভাব আরম্ভ করলে দেখ্‌ছি। দাও ছেড়ে ওটাকে। ওটাকে ত কেউ নেবে না—ও যে এখন পতিতা। আর এই ত তোমার একটামাত্র নয়, গণ্ডেপিণ্ডে ত জন্ম দেওয়া হয়েছে কালনাগিনীর গুষ্টি! ও-গুলোও ত পার করতে হবে! ছাড় নর্দমাটাকে।

[এই বলিয়া তিনি সিংহবিক্রমে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া কঠোর শক্তিতে স্ত্রীকে ছিনাইয়া আনিলেন। মহিলাটি মূর্ছিতার মত মাটিতে মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া রহিল।]

একজন মাতব্বর। (গৌরবের সুরে) ঠিক, এই ঠিক সত্যিকারের মানুষের কাজ।

[আর সকলে কেহ ঘাড় কেহ টিকি নাড়িয়া সায় দিল।]

[মেয়েটি দাঁড়াইল। তাহার অপর্যাপ্ত ঘন কাল চুল তাহার কাঁধের ওপর দিয়া বুকের কাছে লুইয়া পড়িয়াছে। চোখের অশ্রু প্রচণ্ড জ্বালার নিশ্বাসে যেন শুকাইয়া গিয়াছে। সে তাহার বসন বিন্যস্ত করিয়া লইল।]

মেয়ে। (উদ্দীপ্ত রূঢ় কণ্ঠে) তুমি পিশাচ, ঐ দস্যুদের চাইতেও নৃশংস। আমার বাবা তুমি নও। সে অত পাষাণ নয়, কশাই নয়। নারী বলেই আমার এ-অবিচার এ-অত্যাচার সইতে হবে? আর তোমরা, পুরুষেরা? যে দুর্বল নারীকে রক্ষা করতে পারে না, অথচ যাদের হাতেই নারীর সমস্ত জীবন ন্যস্ত, তাদের আবার কিসের বড়াই?

মাতব্বরেরা। অসহ্য, অসহ্য!

মেয়ে। আইন শুধু ডাকাতদের শাস্তি দেবে। কিন্তু তোমরা যে তাদের চেয়েও নৃশংস ডাকাত। তারা শুধু একরাত্রির অত্যাচারী, আর তোমরা অত্যাচার করছ সমস্ত জীবন ধরে। আস্ফালন করতে লজ্জা হয় না তোমাদের? যে কাপুরুষেরা স্ত্রী কন্যার ইজ্জৎ রক্ষা করতে পারে না, তারা কোন্ মুখে তাদের গলার ওপর পা তুলে দেয়? ভেবেছ এ অত্যাচারের শাস্তি নেই? আছে। আমার অভিশাপ ব্যর্থ হবে না।

[মেয়েটির কণ্ঠস্বর হইতে আগুন ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।]

পিতা। (ক্ষিপ্ত হইয়া মেয়ের গলা চাপিয়া ধরিয়া) বেরো হারামজাদী। (বলিয়া তাহাকে সামনের দিকে ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিলেন।)

[মেয়েটি আর ফিরিয়া দাঁড়াইল না। ধুলা হইতে শাড়ীর আঁচলটি বুকে তুলিয়া

লইয়া গাঁয়ের ঘুমন্ত পথ ধরিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। তাহার পিঠে অগোছাল দীর্ঘ চুলগুলি বাতাসে কাঁপিতেছিল। তখন ফর্সা হইয়াছে। সহস্র নামহারা পাখীর কণ্ঠে কণ্ঠে গান জাগিয়াছে। ভোরে পাড়ার মেয়েরা ফুল চয়ন করিবার জন্য সাজি হাতে প্রজাপতির মতন লঘুছন্দে ছুটাছুটি করিতেছে। মেয়েটি ধীরে ধীরে ধানের ক্ষেত পার হইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। একটি রৌদ্রকণা একটি শিশির-সিক্ত ঘাসের ডগার উপর নাচিতেছিল। একটি সাদা পাখী ফুরফুরে হাওয়ায় দুই পাখা মেলিয়া উড়িয়া গেল। মা একবার সংজ্ঞা ফিরিয়া পাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন—পুতুল, আমার পুতুল!]

দ্বিতীয় অঙ্ক

[তেরো বছর পরে।···

কলিকাতার সঙ্কীর্ণ অপরিসর একটা রাস্তা। দুই ধারে পাশাপাশি বাড়ীর সারি। তাহাদের দরজার ধারে ধারে দেহের বেসাতি লইয়া অসংখ্য নানা বয়সের মেয়েরা, কেহ দাঁড়াইয়া, কেহ বসিয়া পথযাত্রীদের দৃষ্টির অভিনন্দন পাইবার আশায় উৎসুক হইয়া চাহিয়া রহিয়াছে।

শ্রাবণের রাত্রি। ন'টা বাজিয়া গিয়াছে! সন্ধ্যা হইতেই টিপিটিপি বাদল নামিয়াছে। বৃষ্টির জলে পথে কাদা হইয়াছে চূড়ান্ত; কাদা বাঁচাইয়া অথচ মেয়েগুলির মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া চলিতে চলিতে পথযাত্রীরা একে অন্যের গায়ের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িতেছে। কেহ ছাতার শিক্ দিয়া মাথায় ঠোকর হানিতেছে। লোক চলাচলের বিরাম নাই। মাঝে মাঝে হুঙ্কার দিয়া মোটর আসিতেছে। স্থান সঙ্কীর্ণ বলিয়া মোটরকে জায়গা ছাড়িয়া দিয়া দুই পাশের লোক কিনারের বাড়ীগুলিতে গিয়া উঠিতেছে। যেখানে কোন মেয়ে, পাছে আলোকের জৌলুসে তার মুখের খড়ির গুঁড়া কিম্বা বিকৃত কদর্য্যতা ধরা পড়ে বলিয়া অন্ধকারে দাঁড়াইয়া আছে, সেখানে যাহারা আশ্রয় লইতেছে, তাহারা তাহাদের মুখের সিগারেটটা খুব জোরে টানিয়া একটু আলো করিয়া দেখিয়া লইতেছে—এটি কত সুন্দরী!

বৃষ্টির মধ্য দিয়া হার্মোনিয়াম, নূপুর ও বিকৃত ভাঙা গলার স্বর বিশ্রী হইয়া সকলের কানে লাগিতেছিল।

বৃষ্টি বেশ দমকে নামিয়া আসিয়াছে। পাহারাওয়ালারা গায়ে ওয়াটার-প্রুফ্ চাপাইয়া ক্রমে ক্রমে সরিয়া পড়িতেছে—কেহ রাস্তা ছাড়িয়া, কেহ বা কাহারো ঘরের তলায় আশ্রয় লইয়া। ইহার মধ্যে একটি কুঁজো বৃদ্ধ চটি-জুতার কল্যাণে পথের প্রায় অর্ধেক কাদা ছেঁড়া লম্বা-ঝুল শার্টটার গায়ে তুলিয়া লইয়া হাঁপাইতে-হাঁপাইতে একটা ঘরের ভিতরকার বারান্দার উপর উঠিয়া আসিল। সেখানে বসিয়া একটি ম্লান শুকনো রোগা মেয়ে ধূমপান করিতেছিল। তাহার পরনে রঙ্-ছুপানো নীল একটা পাৎলা শাড়ী, সারা গায়ে গিলটির গহনা, পায়ে পাম্প্-সু। বৃদ্ধকে ঢুকিতে দেখিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধ চোখ দিয়া ইশারা করিয়া তাহাকে ডাকিল। মেয়েটি দরজা হইতে একটু দূরে অন্ধকারে দাঁড়াইয়া বৃদ্ধের সঙ্গে ফিস্‌ফিস্ করিয়া কি কথা বলিয়া লইল। পরে জলচৌকিটা লইয়া দোতালায় নিজের ঘরের মধ্যে বৃদ্ধকে লইয়া আসিল।]

দৃশ্যান্তর

[ছোট একটি ঘর। ফিটফাট সাজানো। দেয়ালে নানান্ দেব-দেবীর ছবি—কৃষ্ণ রাধা মহাদেব পার্বতী, দিল্লীর দরবার, এমন কি জীস্তান ও বিলিতি ক্যালেণ্ডারেরও ছবি টাঙানো। একপাশে একটা ব্রাকেট ঝুলিতেছে। তাহাতে একখানি ময়লা শাড়ী কোঁচানো। দেয়ালের সঙ্গেই একটা প্রকাণ্ড তাক গাঁথা। আয়না চিরুণী ইত্যাদি, রবীন্দ্রনাথের একখানি গীতাঞ্জলি ও নবরাম শীলের থান কয়েক বটতলার উপন্যাস ও গানের কেতাব। নীচের তাকগুলিতে বিস্তর কাঁচের বাসন ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। পানের আসবাব। এক জোড়া ডার্বি-জুতা, বোধ হয় কেহ ফেলিয়া গিয়াছে, কিম্বা পরিয়া যাইতে পারে নাই।

ঘরের আধখানা জুড়িয়া প্রকাণ্ড একটা উঁচু খাট পাতা, তাহাতে পরিষ্কার করিয়া বিছানা পাতা। নীচে মেঝের উপরে আর একটা বিছানা পাতা রহিয়াছে।]

[বৃদ্ধ ঘরে ঢুকিয়া খাটের উপর বসিল।]

মেয়ে। (বাধা দিয়া) না না ওখানে বসবেন না, নীচে বসুন।

বৃদ্ধ। (কুটিল মুখভঙ্গী করিয়া) কেন বাবু, চেহারাটা বুঝি পছন্দ হচ্ছে না? না হয় দোব, আরো একটাকা বেশীই দোব 'খন। এই বাদলা রাতে কে ওই স্যাঁৎসেঁতে মেঝের ওপর বসে?

মেয়ে। (আগাইয়া আসিয়া) পান খাবেন ত ?

বৃদ্ধ। (তাহার খোঁচা খোঁচা দাড়িগুলি হাসিতে উদ্ভাসিত করিয়া) ছাই পান! বলি টান্‌বে না ?

মেয়ে। টাকা ফেললেই টানা।

বৃদ্ধ। হ্যাঁ, ক'টাকা চাই বল। ডাক না তোর রামধনিয়াকে। নে' আসুক গে।

[বৃদ্ধ জুতা ছাড়িয়া আরাম করিয়া উঠিয়া বসিলেন। মেয়েটি একটু দূরে সরিয়া বসিল। বারে বারে কুতুহলী হইয়া বৃদ্ধের মুখের পানে তাকাইয়া অকারণে শিহরিয়া উঠিতেছিল। উহার মুখটা কি জঘন্যই না দেখাইতেছে! লোল দেহে কি লোলুপতা।

বৃষ্টি তখন খুব জোরে নামিয়া আসিয়াছে। ঘরে ঘরে মাতালেরা তারস্বরে বর্ষা-মঙ্গল শুরু করিয়াছে। তৃষার্ত ধরিত্রীর এই নোংরা অশুচি স্নায়ুটা যেন বৃষ্টির আশীর্বাদে আর্দ্র ও পবিত্র হইয়া উঠিল।]

বৃদ্ধ। (জড়িতস্বরে) বেড়ে বৃষ্টিটাই নেমেছে। ফুর্তি জমানোর রাত বটে! হেঁঃ, দেখ ফুলি—তোমার নাম কি ? আরে বলই না।

মেয়ে। (হাসিয়া) শুকনি।

বৃদ্ধ। খাসা নাম!...দেখ, এমনটি ছিলাম না। সাত বছর হল, গেল বৌটা মরে। চরিত্র থাকে কি ক'রে—হল ভয়! সবাই বললে বিয়ে কর। মেয়েও ঠিক করলাম বিয়ের।......হ্যাঁ, ঐ যে একজটা বাজনা দেখা যাচ্ছে ঢাকনি-দেওয়া, একটা গান গাও না ক্ষেমঙ্করী!

মেয়ে। গান পরে হবে' খন। আপনি বলুন না তারপর কি হল ?

বৃদ্ধ। হাঁ,—বিয়ে করতে রওনা হয়েছি চলন করে', ওমা পাড়ার যত সব গুণ্ডা ছোঁড়ার দল এল আমাকে তেড়ে লাঠি-সোটা হাতে নিয়ে। বললে, বেটা সাতশ ভিমের বাপ—বেটা বিয়ে করবে ছোট্ট নোলকপরা খুকীকে। হাঁঃ হাঁঃ! শালারা দিলে না বিয়ে করতে। সব ভেস্তে দিলে। একটা ছোঁড়া আমার মাথা থেকে টোপরটা কেড়ে নিয়ে বিয়ের পিঁড়িতে গিয়ে বসল। শালারা চরিত্তিরটা আর রাখতে দিলে না......কি গো, ডাক না তোমার রামধনিয়াকে!

মেয়ে। জলটা ধরুক।

বৃদ্ধ। আর ধরেছে! জামাটা খুলি। (আস্তে আস্তে সন্তর্পণে জামাটা খুলিতে-খুলিতে) গেছে জামাটা ছিঁড়ে। সব পয়সা এই অন্নপূর্ণাদের পায়ে ঢেলেই ফতুর হলাম। (জামাটা খুলিয়া ফেলিল।)

[মেয়েটি কি যেন দেখিয়া সহসা অস্ফুট আর্তকণ্ঠে গোঙাইয়া উঠিল। তাহার পায়ের নীচে সমস্ত মেঝেটা যেন কিল্‌বিল্‌ করিতেছে। সাপ কি হিংস্র শ্বাপদ দেখিলেও সে যেন এতখানি চম্‌কাইত না।]

মেয়ে। (আগাইয়া আসিয়া, ভীত ত্রস্ত শুষ্ক কণ্ঠে) এ তাবিজ তুমি কোথায় পেলে—এ মকর তাবিজ ?……

বৃদ্ধ। (একটু হাসিয়া) কেন, এ তাবিজটার ওপর লোভ হল নাকি ? এ যে-সে চীজ নয় হে ভাল্লুক-সুন্দরী ! এতে আমার প্রাণ। অনেকদিন আগে জ্বর-সন্নিপাতে মরেছিলাম আর কি ! বৌটা বড্ড ভালোবাসত আমাকে। মা কালীর দরজায় গিয়ে হত্যা দিয়ে পড়ে রইল রাতদিন না খেয়ে। শেষে মা দয়া করলেন। দয়া না করে আর কি করেন ? ওষুধ বলে দিলেন একটা শেকড় ; বললেন, রাত দুপুরে বনে গিয়ে আপন হাতে গাছের শেকড় কেটে তিন ভরি সোনার তাবিজে পূরে হাতে বেঁধে দিলে সোয়ামী বেঁচে উঠবে। বেঁচে উঠলাম সত্যি-সত্যিই। বড্ড লক্ষ্মী সতী বৌ-ই ছিল। বড় মেয়ের শোকটাই বাজল কিনা বেশী ! আর আমিই বা তখন,……হেঁ, আমার চরিত্র রাখতে দিলে না ত কি ?…যাক্‌গে ও তাবিজ-ফাবিজের কথা, এসো ধনি কাছে, ভারী শীত করছে যে !

[বলিয়াই বৃদ্ধ দুই লোভাতুর ব্যগ্র বাহু দিয়া মেয়েটিকে জড়াইয়া ধরিল। চাহিয়া দেখিল তাহার গলার হারের মধ্যখানে একখানি ধুকধুকি, ও তাহার মধ্যে কাহার একখানি মুখের ছবি। দেখিয়াই বৃদ্ধ সচকিত হইয়া আলিঙ্গন ছাড়িয়া দিয়া ভীত আর্ত কণ্ঠে চেঁচাইয়া উঠিল। তাহার সমস্ত দেহ তখন কাঁপিতেছে। আগুনের স্পর্শকেও সে এত জ্বালাময় মনে করে নাই।]

বৃদ্ধ। (পাগলের সুরে) এ কার ফটো তোর বুকের মধ্যে, মা ? কার ফটো বল ?……সৌদামিনীর ? তোর মা'র ?……বল্‌ তুই কে ?

[মেয়েটি দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল।]

বৃদ্ধ। (উন্মত্তের মত) বল্‌ তুই কে ? তুফান—তুফান মেতেছে বাহিরে। বল্‌ আমি এ কোথায় এসেছি। তোল মুখ মা পুতুল ! ঐ যে, তোর ঘাড়ের ওপর সেই পোড়ার দাগ—সেই, সেই ! এঁ্যা……বৃষ্টি না আগুন !……

মেয়ে। (চাপা মথিতস্বরে) বাবা,……আমার মা !……

[**অক্লান্ত বর্ষণ চলিতেছে। মেঘের গর্জনেরও বিরাম নাই। কলিকাতার রাস্তায় জল উঠিয়াছে। গাড়ী ঘোড়া সব বন্ধ।**

বৃদ্ধ খোলা দরজা দিয়া ঝড়ের ঝাপটার মতো ছুটিয়া বাহির হইয়া রাস্তায় কাদার মধ্যে একেবারে মুখ থুবড়াইয়া পড়িল। আবার সেখান হইতে উঠিয়া উগ্র উন্মত্তের মত লক্ষ্যহীন উদ্দামতায় দৌড়িয়া ছুটিল। তখনো ঘরে ঘরে গানের আলাপের সঙ্গে সঙ্গে কাঁচের পেয়ালার শব্দ জাগিতেছে। নূপুরের আওয়াজ বৃষ্টির ছন্দের সহিত বেশ মিলিতেছিল। প্রচুর অন্ধকারের তলায় অভিমানাহত ব্যথিত আকাশ মেঘে-মেঘে ফুঁপিয়া উঠিতেছে।

তেমনি এই পরিত্যক্ত ঘরটিতে মেঝের উপর বুকটা কঠিন করিয়া চাপিয়া এই হতভাগিনী মেয়েটি আর্তকণ্ঠে ক্ষণে ক্ষণে কাঁদিতেছিল—মা, আমার মা······]